ধীরে বহে ডন

মিখাইল শলোখফ

অনুবাদ

অবন্তী সান্যাল

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ১২

মিখাইল শলোখফের

ধীর প্রবাহিনী ডন

(And Quiet Flows the Don)

প্রকাশ করেছেন
সুরেন দত্ত
ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১২
জুন ১৯৫৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দাম নয় টাকা

ছেপেছেন
শ্রীনন্দীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯ অ্যান্টনি বাগান লেন ॥ কলিকাতা ৯

‘আমাদের প্রিয় গরবিনী মাটি লাঙলে হয়না চষা,—
আমাদের মাটি ফালাফালা হয় হাজারো ঘোড়ার খুরে;
আমাদের প্রিয় গরবী মাটিতে ফসলের বীজ বোনে
কসাকের কাটা-মাথা:
আমাদের ডন, শান্ত সুধীর, রূপের বাহার খোলে
যৌবনবতী বিধবার দঙ্গলে:
আমাদের পিতা ডন ঝলমল পিতাহারা শিশু দিয়ে;
কত পিতা কত মাতার চোখের জলের ধারায় মিশে
অপরূপ এই শান্ত ডনের ঢেউ।’

—পুরনো কসাক গান

‘‘ওগো পিতা, ওগো শান্ত সুধীর ডন!
তুমিতো শান্ত, তবু কেন, হায়, অশান্ত হয়ে বও?’

‘আমি ডন, আমি শান্ত সুধীর, কেন অশান্ত হই?
আমার গভীরে, ডনের গভীর অন্তরতল হতে
হিমেল ফল্গু বয়;
আমি ডন, আমি শান্ত সুধীর,
আমার বুকে সাদা মাছ করে খেলা।’’

—পুরনো কসাক গান

সূচীপত্র

চরিত্র-পরিচিতি

মেলেখফ, প্রকোফে ॥ জনৈক কসাক।
মেলেখফ, পান্তালিমন প্রকোফিয়েভিচ ॥ প্রকোফের ছেলে।
মেলেখফ, ইলিনিচনা ॥ পান্তালিমনের স্ত্রী।
মেলেখফ, পিয়োত্রা পান্তালিয়েভিচ ॥ পান্তালিমনের বড় ছেলে।
মেলেখফ, গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ (গ্রিশ্‌কা) ॥ পান্তালিমনের ছোট ছেলে।
মেলেখফ, দুনিয়া ॥ পান্তালিমনের মেয়ে।
মেলেখফ, দারিয়া ॥ পিয়োত্রার স্ত্রী।
করশুনভ, গ্রিসাকা ॥ জনৈক বৃদ্ধ কসাক।
করশুনভ, মিরণ গ্রিগরিয়েভিচ ॥ গ্রিসাকার ছেলে।
করশুনভ, মারিয়া লুকিনিচনা ॥ মিরণের স্ত্রী।
করশুনভ, মিৎকা মিরণোভিচ্‌ ॥ মিরণের ছেলে।
করশুনভ, নাতালিয়া ॥ মিরণের মেয়ে। পরে গ্রিগরের স্ত্রী।
আস্তাখফ, স্তেপান ॥ জনৈক কসাক।
আস্তাখফ, আক্সিনিয়া ॥ স্তেপানের স্ত্রী।
বোদোভ্‌স্কভ্‌ ফিয়োদোত্‌ ॥ জনৈক কসাক।
কোশেভয়, মিশা ॥ জনৈক কসাক।
কোশেভয়, মাস্‌ৎকা ॥ মিশার বোন।
শামিল, আলেক্সি, মার্তিন ও প্রোখোর ॥ তিনজন কসাক ভ্রাতা।
তোকিন, ক্রিস্তোনিয়া ॥ জনৈক কসাক।
তোমিলিন, ইভান ॥ জনৈক কসাক।
কোতলিয়ারভ, ইভান আলেক্সিয়েভিচ ॥ মোখোভের কারখানার ইঞ্জিনিয়ার। **জনৈক** ভূমিহীন কসাক।
দাভিদ ॥ মোখোভের কারখানার শ্রমিক।
ফিলকা ॥ জুতো তৈরিকারক।
স্তকমান, অসিপ দাভিদোভিচ ॥ তালাচাবির কারিগর ও বলশেভিক।
ভালেত ॥ মোখোভের কারখানার পাল্লাদার।
মোখোফ, সার্জি প্লাতোনোভিচ ॥ ব্যবসায়ী ও কারখানা মালিক।
মোখোফ, এলিজাবিয়েতা ॥ মোখোফের মেয়ে।
মোখোফ, ভ্লাদিমির ॥ মোখোফের ছেলে।
লিস্তনিৎস্কি, নিকোলাই আলেক্সিয়েভিচ ॥ জমিদার ও অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল।
লিস্তনিৎস্কি, ইউজেনে নিকোলাইভিচ ॥ নিকোলাই লিস্তনিৎস্কির ছেলে।
বানচাক, ইলিয়া ॥ জনৈক স্বেচ্ছাসৈনিক, বলশেভিক ও মেশিন-গানার।
গারান্‌ঝা ॥ জনৈক ইউক্রেনীয় সৈনিক।
গ্রোসেভ, ইয়েমেলিয়ান ॥ জনৈক কসাক।
ইভান্‌কোভ, মিখাইল ॥ জনৈক কসাক।
ক্রুচকভ, কোজ্‌মা ॥ জনৈক কসাক।
ঝারকভ, ইয়েগর ॥ জনৈক কসাক।

ঝিকভ, প্রোখর ॥ জনৈক কসাক।
স্‌চেগোলকভ ॥ জনৈক কসাক।
উরিউপিন, আলেক্সি (ডাক নাম ঝুঁটিওয়ালা) ॥ জনৈক কসাক।
আনিকুশকা ॥ জনৈক কসাক।
বোগাতিরিয়েভ ॥ জনৈক কসাক।
লোনিলিন, আর্ভাদিচ ॥ জনৈক কসাক।
গ্রিয়াঝনোভ, মাকসিম ॥ জনৈক কসাক।
কোরোলিয়ভ, ঝাখের ॥ জনৈক কসাক।
ক্রিভোশ্লিকোভ, মিখাইল ॥ ডন-বিপ্লবী-কমিটির সেক্রেটারী।
লাগ্‌তিন, ইভান ॥ জনৈক কসাক। ডন-বিপ্লবী-কমিটির সভ্য।
পোদ্‌তিয়েলকোভ ফিয়োদোর ॥ ডন-বিপ্লবী-কমিটির চেয়ারম্যান।
পোগদ্‌কো, আন্না ॥ ইহুদী ছাত্রী এবং বলশেভিক।
বোগোভয়, গিয়েভোরকিয়ানত্‌স্ক, খ্‌ভিলিচকো, ক্রুতোগোরভ, মিখালিজে, বোরিশ্ডার, স্তেপানোভ ॥ বানচাকের বিপ্লবী মেসিনগানার-দলের সভ্য।
আব্রামসন ॥ জনৈক বলশেভিক সংগঠক।
গলুবোভ ॥ ডন-বিপ্লবী বাহিনীর ক্যাপ্টেন ও সংগঠক।
আলেক্সিয়েভ ॥ জারের জেনারেল।
কোর্নিলোভ ॥ জারের জেনারেল।
আতার্শচিকোভ ॥ কসাক রেজিমেণ্টের লেফটেনাণ্ট।
ইজভারিন ॥ কসাক রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন।
কালমিকোভ ॥ কসাক রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন।
মার্কুলোভ ॥ কসাক রেজিমেণ্টের লেফ্‌টেনাণ্ট।
চুবোভ ॥ কসাক রেজিমেণ্টের লেফ্‌টেনাণ্ট।

॥ শান্তি ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

তাতার্স্ক গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে মেলেখফদের খামার-বাড়ি। গোয়ালের দরজা খুললেই চোখে পড়ে—উত্তরে ডন। খড়ি রঙের, ঘাসে-ঢাকা পাড়ের মাঝখানে হাত-চল্লিশেক খাড়া ঢালু জমি, তারপরেই ডনের তীর। মুক্তোর মত রাশিকৃত ঝিনুকের খোলা, কানা-ভাঙা পাঁশুটে রঙের পাথুরে নুড়ি, আর তারপর ইস্পাত-নীল তরঙ্গায়িত ডনের জলরাশি—বাতাসের বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। উইলো-ডালের বেড়া-ঘেরা উঠোন পেরিয়ে পূর্বে সদর-রাস্তা, ধূসরাভ 'ওয়ার্ম-উড' গাছের ঝোপ, গাঢ় মেটে-রঙের খুরে-দলা 'নট্'-ঘাস, রাস্তার দু'মুখের মোড়ে উপাসনা-বেদী, তারপরেই চঞ্চল মরীচিকায় জড়ানো স্তেপের প্রারম্ভ। দক্ষিণে খড়ি রঙের একসার পাহাড়। পশ্চিমে রাস্তাটা আড়াআড়ি বারোয়ারি-তলা পেরিয়ে হারিয়ে গিয়েছে দূর-প্রান্তরে।

তুর্কীদের সঙ্গে গত যুদ্ধের সময় কসাক প্রোকোফে মেলেখফ গ্রামে ফিরে এসেছিল। সঙ্গে এনেছিল নতুন-বৌ—আপাদমস্তক শালে-ঢাকা ছোটখাট একটা মেয়ে-মানুষ। বৌটি সারাক্ষণ মুখ ঢেকে রাখত, কালেভদ্রে তার জ্বলজ্বলে চোখদুটো দেখা যেত। তার রেশমীশাল এক অজানা খোসবায়ে ভুরভুর করত, শালের রামধনু-রঙা নক্সা চাষী মেয়েদের ঈর্ষা জাগিয়ে তুলত। বন্দিনী তুর্কী মেয়েটা কিন্তু প্রোকোফের পরিবারের সঙ্গে বনিয়ে উঠতে পারল না। বুড়ো মেলেখফ কিছু দিনের মধ্যেই ছেলের হিস্‌সা বুঝিয়ে দিল। কিন্তু আলাদা হ'য়ে যাবার অসম্মান বুড়ো কোনদিন ভুলতে পারেনি, জীবনে সে ছেলের বাড়িতে আর পা-ই দিল না।

প্রোকোফেও দেখতে দেখতে নিজের আলাদা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। ছুতোর-মিস্ত্রিরা ঘর তুলে দিল, নিজের হাতেই সে গোয়ালের বেড়া বাঁধল; তারপর শরতের প্রথম দিকে তার নতমুখী, ভিনদেশী বৌকে নতুন বাড়িতে এনে তুলল। গেরস্থালির জিনিসপত্তর বোঝাই গাড়ির পেছনে পেছনে বৌকে নিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়ে পায়ে হেঁটে এল। ছেলেবুড়ো সবাই রাস্তায় ছুটে এসে দাঁড়াল। কসাকরা দাড়ির আড়ালে বিজ্ঞের হাসি হাসল। মেয়েরা এ ওকে শুনিয়ে মন্তব্য করল, একপাল কসাক-ছোঁড়া প্রোকোফের পেছন থেকে নাম ধরে ডাকতে লাগল। বোতামখোলা ওভারকোট গায়ে, নিজের বিশাল তামাটে হাতের মুঠোয় বৌ-এর পলকা কব্জিটা আঁকড়ে ধরে, কাপাস-সাদা উস্কুখুস্কু মাথাটা গোঁয়ারের মত উঁচু করে, সে কিন্তু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল—যেন হেঁটে গেল নতুন-চষা জমির ওপর দিয়ে। শুধু তার চোয়ালের নীচের মাংস ফুলে ফুলে কেঁপে উঠল, আর পাথুরে ভুরু-দুটোর মাঝখানে জমে উঠল কয়েক ফোঁটা ঘাম।

তারপর থেকে কদাচিৎ সে গ্রামের ভেতরে গিয়েছে, এমন কি বাজারেও কেউ তাকে দেখতে পেত না। সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ডনের ধারের নির্জন বাড়িতে সে বাস করত। তার সম্বন্ধে কত অদ্ভুত গাল-গল্পই না গ্রামে মুখে মুখে ফিরতে শুরু করেছিল।

মেঠো-রাস্তা ছাড়িয়ে যে-সব রাখাল-ছোঁড়া বাছুর চরিয়ে বেড়াত, তারাও জানিয়ে দিয়েছিল, সন্ধ্যের সময় যখন দিনের আলো নিভে আসে, প্রোকোফে তখন নাকি তার বৌ-কে দুহাতে তুলে তাতার-বাঁধের ওধারে নিয়ে যায়। তারা তা দেখেছে। বাঁধের মাথায়, ঝড়-বাদলে জরাজীর্ণ, গর্তে-ভর্তি, এক পুরনো পাথরের ঢিবির দিকে পেছন করিয়ে বৌকে বসিয়ে রাখে; নিজে বসে বৌ'এর পাশে, তারপর দুজনে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে স্তেপের শেষ-প্রান্তে। সূর্যাস্তের পরও আলো-মিলিয়ে না আসা পর্যন্ত তারা অমন করেই তাকিয়ে থাকে; তারপর প্রোকোফে নিজের কোটে বৌকে ঢেকে বাড়ি বয়ে নিয়ে আসে। এই ধরনের আচরণের মানে খুঁজে না পেয়ে, গোটা গ্রাম জল্পনায় মেতে উঠেছিল। মেয়েরা গুজব নিয়ে এমনই মেতেছিল যে, উকুন-বাছার সময়টুকুও ছিল না। প্রোকোফের বৌ'এর সম্পর্কেও গুজব ভারী হয়ে উঠেছিল। কেউ বলত, বৌ-টার রূপ নাকি মাথা ঘুরিয়ে দেয়; কেউ বলত একেবারে উল্টো কথা। একদিন যখন মেয়েদের মধ্যে সবচাইতে ডাক-সাঁইটে, সেপাই-গিন্নি মাউরা দম্বল চাইবার ছুতোয় প্রোকোফের বাড়িতে হানা দিল, তখনই ব্যাপারটার ফয়সালা হ'য়ে গেল। প্রোকোফে দম্বল আনতে ভাঁড়াড়ে ঢুকেছিল, আর সেই ফাঁকে মাউরা দেখল প্রোকোফের বন্দিনী তুর্কী বৌ-টা এক মূর্তিমতী বিভীষিকা।

কয়েকমিনিট পরেই মাউরাকে দেখা গেল একটা ছোট গলির মধ্যে—উত্তেজনায় মুখে রক্ত জমে উঠেছে, রুমাল খসে পড়েছে—একপাল মেয়ের সামনে দাঁড়িয়ে চাটনি ছড়াচ্ছে :

—'তোরাই বল, এমন কি দেখেছে মাগীটার মধ্যে? আর, যদি সে মেয়েমানুষও হত তাহলেও বুঝতাম, পাছাও নেই পেটও নেই; লজ্জায় আর বাঁচিনে! কত সুন্দর সুন্দর ছুঁড়ি তাতারের জন্যে হেদিয়ে মরছে। মাগীর কাঁকালটা খসিয়ে নেওয়া যায়, ঠিক বোলতার মত। কালো কুঁতকুঁতে চোখে তাকায়, না, যেন শয়তানে ঝাপট মারে। বিয়োবার সময়ও হয়ে এসেছে, মাইরি দিব্যি।'

—'সময় হয়ে এসেছে?' হাঁ হয়ে গেল মেয়েরা।

—'আমি কচি খুকী নই। নিজেই তিন তিনটে বিইয়েছি।'

—'ওর মুখখানা কেমন রে?'

—'মুখখানা? হলদে। মুখ নেই, তা চোখে দেখলেই বোঝা যায়—বিদেশ বিভুঁয়ে মেয়েমানুষের জীবন অত সহজ নয়। আরও বলি শোন, মেয়েমানুষ, কিন্তু মাগী পরে...প্রোকোফের পা-জামা!'

—'না, না!' হঠাৎ আকণ্ঠে মেয়েদের দমবন্ধ হয়ে এল।

—'স্বচক্ষে দেখেছি। মাগীটা পা-জামা পরে, তবে ডোরাকাটা নয়। বোধহয় প্রোকোফের আট-পৌরে পা-জামা। গায়ে দেয় লম্বা ঝুলের সেমিজ, মোজার মধ্যে গোঁজা। দেখেই তো আমার রক্ত হিম।'

কানে কানে গ্রামে রটে গিয়েছিল, প্রোকোফের বৌ একটা ডাইনি। আস্তাখফের ব্যাটার বৌ দিব্যি গেলে বলেছিল (আস্তাখফেরা থাকত প্রোকোফের পাশের বাড়ি), সূর্য ওঠার আগে সে প্রোকোফের বউকে স্পষ্ট দেখেছে—এলোচুল, খালি পা, আস্তাখফদের গরুর দুধ দুয়ে নিচ্ছে। সেইদিন থেকেই গরুর বাঁট শুকিয়ে উঠতে উঠতে কচি ছেলের হাতের মুঠোর মত হ'য়ে গেল; গরুটা আর দুধ দেয়নি, মরে গেল কিছুদিন পরেই।

সেবছর এক অভাবনীয় গো-মড়ক দেখা দিয়েছিল। ডনের চরের ধারে বালির

ওপরে প্রতিদিন গরুবলদের মড়া জমে উঠতে লাগল। ঘোড়াগুলোকেও মড়কে ধরল। গ্রামের মাঠে চরবার মত গরুবাছুরের সংখ্যা ভীষণভাবে কমে গেল। আর অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতে লাগল এক অলক্ষুণে গুজব।

কসাকরা পঞ্চায়েত বসাল, তারপর হাজির হল প্রোকোফের বাড়িতে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রোকোফে সেলাম ক'রে সিঁড়ির ওপর দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল :

—'তারপর, কি মনে ক'রে, মাতব্বররা?'

বোবার মত স্তব্ধ জনতা শুধু সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এল। প্রথমে চেঁচিয়ে উঠল এক মাতাল বুড়ো :

—'বার কর্ তোর ডাইনিকে। আমরা ওর বিচার করব...'

প্রোকোফে ঘরের মধ্যে ঢুকতে যেতেই সবাই দিলে তাকে দরজার কাছে আটকে। লুস্নিয়া নামে দৈত্যের মত এক কসাক প্রোকোফের মাথাটা দেয়ালে ঠুকে দিয়ে তড়পাল :

—'চেঁচিও না বাপধন, টুঁ শব্দটি না। কিছু করব না তোমাকে, কিন্তু তোমার বৌকে আজ মাটিতে থেঁতলে দিয়ে যাব। গাইবলদ বিনে গ্রামটা মরার চেয়ে ওটাকে শেষ করে দেওয়াই ভাল। টুঁ-শব্দটি করেছ কি দেয়ালে ঠুকে মগজের ঘিলু বার করে ছাড়ব।'

—'উঠোনে টেনে বার কর্ কুত্তীটাকে!' সিঁড়ির দিক থেকে গর্জন উঠল।

প্রকোফের একই রেজিমেণ্টের এক সহকর্মী, একহাতে তুর্কী মেয়েটির চুলের গোছা চেপে ধরে, অন্য হাতে তার মুখের চীৎকার চাপা দিয়ে, টেনে হিঁচড়ে দরজার বাইরে এনে, জনতার পায়ের নীচে ছুঁড়ে দিল। মত্ত গর্জন ছাপিয়ে দুর্বল কণ্ঠের এক আর্তনাদ শোনা গেল। জন ছ'য়েক কসাককে ধাক্কায় হটিয়ে দিয়ে প্রোকোফে ঘরের ভেতরে ছুটে গেল, দেয়াল থেকে খুলে নিল একখানা তলোয়ার, কসাকরা হুড়পাড় করতে করতে বারান্দা ছেড়ে বাইরে ছুটল। চকচকে, ধারাল তলোয়ারখানা মাথার ওপরে বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে ঘোরাতে প্রোকোফে সিঁড়ির নীচে লাফিয়ে পড়ল। জনতা শিউরে উঠল, উঠোনেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

লুস্নিয়ার বিরাট বপু, প্রোকোফে মাড়াই-উঠোনের পাশে ধরে ফেলল তাকে; তারপর পেছন থেকে আড়াআড়ি এক কোপে বাঁ-কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত চিরে ফেলল। জনতা বেড়া উপড়ে, মাড়াই-উঠোন পেরিয়ে ছুটল স্তেপের মধ্যে।

আধঘণ্টাটেক পরে জনতা আবার সাহস ক'রে প্রোকোফের বাড়ির দিকে এগিয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে দু'জন পা টিপে টিপে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। রান্নাঘরের চৌ-কাঠের কাছে রক্ত-গঙ্গা বইছে, মাথাটা পেছন দিকে বীভৎসভাবে হেলিয়ে তারই মধ্যে প্রোকোফের বৌ পড়ে আছে; ঠোঁট-দুখানা দাঁতের পেছনে মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, দুমড়ানো জিভটা বেরিয়ে পড়েছে। আর মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জ্বলজ্বলে চোখে প্রোকোফে ভেড়ার চামড়ায় মুড়ে তুলছে ট্যাঁ ট্যাঁ করা, লাল টুকটুকে একটা পিচ্ছিল মাংসপিণ্ড—অসময়ে ভূমিষ্ঠ একটি শিশু।

॥ দুই ॥

সেদিন সন্ধ্যেবেলাই প্রোকোফের বউ মারা গিয়েছিল। তার বুড়ি-মার মায়া হল বাচ্চাটার ওপর, সে-ই তার ভার গছিয়ে নিল। তুঁষের গুঁড়োয় মুড়ে রেখে, ঘোড়ার দুধ খাইয়ে মাসখানেক পরে যখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, ময়লা-রঙের, তুর্কী ছাঁদের বাচ্চাটা বাঁচবে, তখন গির্জায় নিয়ে গিয়ে তার নামকরণ করা হল। ঠাকুর্দার নামে তার নাম রাখা হল পান্তালিমন। সরকারী ঘানি টেনে প্রোকোফে ফিরেছিল বার বছর পর। ধূসর-রঙের ছোপলাগা লাল টুকটুকে ছাঁটা দাড়ি, আর রুশ-পোষাকে তাকে মোটেই কসাকের মত দেখাচ্ছিল না। ছেলেকে নিয়ে সে নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল।

বড় হয়ে পান্তালিমনের রঙ হল গাঢ় তামাটে, স্বভাব হল ডানপিটে। মুখের আদল আর দেহের গড়নে তার মায়ের মত। এক কসাক পড়শির মেয়ের সঙ্গে প্রোকোফে তার বিয়ে দিয়েছিল।

সেই থেকে তুর্কী-রক্ত মিশেছে কসাক রক্তে। এমনি করে গ্রামে এসেছে 'তুর্কী' এই ডাকনামে বাঁকা-নাক, ভয়ঙ্কর, সুন্দর মেলেখফ পরিবার।

বাপ মারা যাবার পর পান্তালিমন বাড়িঘরের ভার নিল; ঘর সে নতুন করে ছেয়ে নিল, মাঠে এক একর জমি বাড়িয়ে ফেলল, নতুন গোলা তুলল, ছাদ দিল পাতলোহার। কামারকে দিয়ে টুকরোটাকরা থেকে একজোড়া মোরগ বানিয়ে নিল, সে দুটোকে বসিয়ে দিল ছাদের মাথায়। তাদের বে-পরোয়া চালে তারা খামার-বাড়ি যেন আলো করে বসল, আত্ম-সন্তুষ্টি আর সমৃদ্ধির ছাপ এঁকে দিল।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পান্তালিমন প্রোকোফিয়েভিচ্ মোটা হয়ে পড়ল; গায়ে মাংস লাগল, একটু কুঁজো হয়ে গেল, কিন্তু তবু তাকে দেখায় শক্ত বাঁধুনির বুড়োর মত। হাত তার কড়া, পা খোঁড়া (বয়সকালে রাজকীয় সৈন্য-পরিদর্শনের সময় দৌড়-ঝাঁপ করতে গিয়ে পা ভেঙেছিল), বাঁ-কানে পরে আধখানা চাঁদের মত রুপোর মাকড়ি; দাঁড়-কাকের মত কাল কুচকুচে মাথার চুল আর দাড়ির রঙ বুড়ো বয়স পর্যন্ত অটুট। সে যখন চটে, তখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়; তারই ফলে অমন মোটাসোটা বৌ ইলিনিচ্না নিঃসন্দেহে বুড়িয়ে গিয়েছে অসময়ে; একদিন তার মুখখানা রীতিমত সুন্দর ছিল, আজ যেন ফুটি-ফাটা চষা-জমির মত।

পিয়োত্রা বড় ছেলে, বিয়ে হয়েছে; দেখতে মায়েরই মত, গাঁট্টাগোট্টা, চ্যাপ্টা নাক, রাশ-করা ভুট্টার মত উজ্জ্বল রঙের চুল, হরিণ-চোখ। ছোট ভাই গ্রিগর কিন্তু বাপের মত; পিয়োত্রার চেয়েও মাথায় আধ-হাত লম্বা, বয়সে প্রায় ছ'বছরের ছোট; বাপের মতই দীর্ঘ বাঁকা নাক, ঈষৎ হেলান কোটরে জ্বলজ্বলে দুই চোখের নীলাভ তারা, গালের হাড়ের ওপরে ঠিক তেমনি কোনাকুনি টানা লাল চামড়া। ঠিক বাপের মতই গ্রিগরও একটু ঝুঁকে চলে; এমনকি তাদের হাসিতেও মিল—কেমন একটা বন্য বিশেষত্ব।

বাপের আদুরে মেয়ে দুনিয়া, গোলগাল চেহারা, বড় বড় চোখ; পিয়োত্রার বৌ দারিয়া আর তার কচি ছেলে—এই নিয়েই মেলেখফ পরিবার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

ভোরের ধোঁয়াটে আকাশে তখনো এখানে ওখানে জ্বলজ্বল করছে তারা। হাওয়া দিচ্ছে মেঘের আড়াল থেকে। ডনের বুকে কুয়াসা পাক খেয়ে উঠছে, খড়ি রং পাহাড়ের ঢালুর গায়ে জড়ো হচ্ছে, তারপর ফণাবিহীন সাপের মত বুকে হেঁটে এগিয়ে চলেছে খাড়া পাহাড়ের দিকে। নদীর বাঁ-দিকের পাড়, বালুতট, পেছনের জলা, পাথুরে চরা, শিশিরে ভেজা শেওলা—ভোরের মোহস্পর্শে কেঁপে কেঁপে উঠছে। দিগন্তরালে সূর্য সবে চোখ মেলছে, তখনো ওঠেনি।

মেলেখফদের বাড়িতে সবার আগে উঠল পান্তালিমন। চলতে চলতে আড়াআড়ি সেলাই-করা সার্টের বোতাম আটকে নিয়ে বাইরে সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়াল। ঘাসে-ঢাকা উঠোনটা রুপোলী শিশিরে মোড়া। গরু-বাছুর রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে এল। দারিয়া সেমিজ পরেই দুধ দুইবার জন্যে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল। তার খালিপায়ের সাদা পেশিতে শিশির ছটকে লাগল, আর উঠোনের মাড়িয়ে যাওয়া ঘাসের ওপর ধোঁয়া-ওঠা পায়ের ছাপ পেছনে রেখে গেল। পান্তালিমন মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে দেখল, দারিয়ার পায়ের চাপে নুয়ে পড়া ঘাসগুলো আবার মাথা তুলছে, তারপরেই সে রান্নাঘরে এসে ঢুকল।

হাট-করা জানলার চৌ-কাঠের ওপর সামনের বাগানের চেরী-ফুলের ফ্যাকাশে গোলাপী পাপড়ি ঝরে পড়েছে। হাত দু'খানা পেছনে ছড়িয়ে দিয়ে গ্রিগর উপুড় হয়ে ঘুমুচ্ছে। বাপ ডাকল :

—'মাছ ধরতে যাবি, গ্রিগর?'

—'কি বলছ? কি?' বিছানা থেকে একটা পা নামিয়ে দিয়ে গ্রিগর ফিসফিস করে প্রশ্ন করল।

—'এখুনি নৌকো নিয়ে বেরুতে হবে। সূর্য না ওঠা পর্যন্ত মাছ ধরব!' পান্তালিমন জবাব দিল।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে, আলনা থেকে আট-পৌরে পা-জামাটা টেনে নিয়ে গ্রিগর পরে ফেলল। পা ঢাকল সাদা পশমী মোজায়, জিভ ফাঁক করে ধীরে সুস্থে জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে দিল।

বাপের পেছনে পেছনে বারান্দায় আসতে আসতে গ্রিগর কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল :

—'কিন্তু মা কি চার সেদ্ধ করে রেখেছে?'

—'হ্যাঁ, রেখেছে। নৌকোয় যা। আমি এখুনি আসছি।'

বুড়ো একটা জগে সেদ্ধ-করা ঝাঁঝালো-গন্ধ রাই ঢালল। মাটিতে পড়া দানাগুলো হাতের চেটোয় মন দিয়ে খুঁটে খুঁটে তুলে নিল। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে নদীর ধারে চলে এল। দেখল, ছেলে নৌকোর ওপর বসে উসখুস করছে।

—'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' গ্রিগর জিজ্ঞেস করল।

—'কালো খাড়া-পাহাড়ের দিকে। সেই কাঠটার চারপাশে চেষ্টা করে দেখব, সেদিন ঘাই মারছিল ওখানে।'

খানিক দূর মাটি ঘসড়ে এসে নৌকোটা জল পেল। তারপরেই বেরিয়ে গেল পাড় ছেড়ে; স্রোতেই টেনে নিয়ে চলল। স্রোতের বেগ নৌকোয় ঝাঁকুনি দিতে লাগল, যেন কাত করে উল্টে দিতে চায়। গ্রিগর বাইল না, হাল ধরে বসে রইল। বাপ খেঁকিয়ে উঠল :

—'নৌকো বাইছিস না যে।'

—'আগে মাঝ-নদীতে পেঁছুই।'

নদীর স্রোত কেটে নৌকোটা সোজা বাঁ-পাড়ের দিকে ছুটল। গ্রাম থেকে স্রোতের শব্দে চাপা-পড়া মোরগের ডাক কানে ভেসে এল। নদী থেকে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছে কালো, গম্ভীর, খাড়া-পাহাড়টা, তারই গায়ে পাশ ঘসড়ে নীচের জলার দিকে নৌকোর মুখ ফিরল। পাড় থেকে প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ হাত দূরে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে ডুবন্ত এক এল্ম-গাছের ছাল-ওঠা ডাল-পালা। তারই চারপাশে দুরন্ত ফেনার রাশি আবর্তিত হয়ে উঠছে ঘূর্ণির পাকে পাকে।

—'বঁড়শি ফেল এবারে, আমি সুতো ধরে রাখছি।' পান্তালিমন ফিসফিস করে বলল। ধোঁয়া-ওঠা জগের মুখে হাত চালিয়ে দিল সে। জলের ওপর শব্দ করে সেদ্ধ রাই ছড়িয়ে পড়ল, ঠিক যেন কেউ চাপা গলায় হিস্—স্-স্ করে উঠল। বঁড়শির মাথায় মোটা দানা গেঁথে গ্রিগর একটু হাসল। বুড়ো বলল :

—'মাছ, মাছ! ছোটবড় সবরকমের মাছ এখানে।'

বঁড়শির সুতো পাকিয়ে জলে পড়েই টানটান হয়ে গেল, তারপর ঢিল পড়ল আবার। ছিপের গোড়ায় পা রেখে গ্রিগর সাবধানে তামাকের থলিটা হাতড়াল। মন্তব্য করল :

—'আজ বোধ হয় কিছু জুটবে না, বাবা। চাঁদ ডুবছে।'

—'চকমকি এনেছিস?'

—'হ্যাঁ, এনেছি।'

—'আগুন দে একটু।'

তামাক টানতে টানতে বুড়ো সূর্যের দিকে তাকাল। এল্ম-গাছটার ওধারে সূর্য আটকা পড়ে গিয়েছে।

—'বলা যায় না কখন 'কার্প' বঁড়শি গেলে।' বুড়ো উত্তর দিল। 'চাঁদ ডুববার সময়ও কখনো কখনো গেলে।'

নৌকোর চারপাশের জল সশব্দে চল্‌কে উঠল, আর ঢালাই-তামার মত চকচকে, হাততিনেক লম্বা একটা 'কার্প' চওড়া, বাঁকা ন্যাজা আছড়ে, আর্তনাদ করে ওপরের দিকে লাফিয়ে উঠল। অজস্র জলের কণা ছড়িয়ে পড়ল নৌকোর ভেতরে।

—'সবুর, সবুর!' জামার হাতায় ভেজা দাড়ি মুছল পান্তালিমন।

ডুবন্ত এল্ম-গাছটার পাশে, ছালওঠা ডাল-পালার মধ্যে একই সঙ্গে লাফিয়ে উঠল দু'দুটো 'কার্প'। তৃতীয়টি একটু ছোট, শূন্যে লাফ খেয়ে, খাড়া-পাহাড়ের কাছাকাছি প্রাণপণশক্তিতে খলবল করে উঠল।

বঁড়শির সুতোর ভেজা-প্রান্ত অধৈর্য হয়ে চিবুতে লাগল গ্রিগর। অর্ধেক মাথা তুলেছে কুয়াসায় ঢাকা সূর্য। অবশিষ্ট চার-টুকু ছড়িয়ে দিয়ে, গোমড়ামুখে, কুঞ্চিত ঠোঁটে, হাবার মত বসে বসে পান্তালিমন ছিপের ডগাটা লক্ষ্য করতে লাগল।

গ্রিগর সিগারেটের টুকরোটা থ্ৎথ্ৎ করে ছ্ৎড়ে ফেলে দিল। রাগের মাথায় দ্রুত ভেসে যাওয়া টুকরোটা দেখতে লাগল। অত ভোরে ঘ্ৎম ভাঙানোর জন্যে মনে মনে সে বাপকে গাল দিচ্ছিল। খালি পেটে সিগারেট টানার ম্ৎখ দিয়ে শ্ৎয়োরের পোড়া-লোমের মত ধোঁয়া উঠছে। গ্রিগর নিচু হয়ে হাতের চেটোয় জল নিতে যাচ্ছিল, এমন সময় স্ৎতোর ডগা আলগাভাবে দ্ৎলে উঠল, তারপর আস্তে আস্তে তলিয়ে গেল।

—'খেলা, খেলিয়ে নে!' নিঃশ্বাস পড়ল ব্ৎড়োর।

গ্রিগর সচকিত হয়ে ছিপটা চেপে ধরল; কিন্তু ছিপটা তার হাতের কাছ থেকে, ধন্ৎকের মত বাঁকা হয়ে গেল, আর ডগাটা ভয়ঙ্কর বেগে জলের মধ্যে অদ্ৎশ্য হয়ে গেল।

—'ধরিস, ধরে রাখিস!' পাড় থেকে নৌকোটা ধাক্কায় সরিয়ে নিতে নিতে পান্তালিমন বিড়বিড় করে উঠল।

গ্রিগর প্রাণপণে চেষ্টা করল, ছিপ টেনে তুলতে। মাছটার জোর খ্ৎব বেশি। শক্ত স্ৎতো পট করে ছিঁড়ে গেল, টাল সামলাতে না পেরে সে প্রায় হ্ৎমড়ি খেয়ে পড়ল।

নৌকোর পাশ দিয়ে পিছলে বেরিয়ে যাবার সময় ধরতে না পেরে পান্তালিমন গালাগাল দিয়ে উঠল :

—'কেবল মদ গিলতেই পারিস!'

ছিপে নতুন স্ৎতো বেঁধে জলে ছ্ৎড়ল গ্রিগর। বঁড়শি মাটি ছ্ৎতে না ছ্ৎতেই বাঁকা হয়ে এল ছিপের ডগা। গ্রিগর বিড়বিড় করে উঠল :

—'টোপ গিলেছে শালা।' মাছটা মাঝনদীর স্রোতের দিকে এগ্ৎচ্ছে, ধরে রাখাই কঠিন।

পেছন দিকে সব্ৎজ রঙের ঢাল্ৎ ঢেউ তুলে বঁড়শির স্ৎতো সোঁ সোঁ করে জল কেটে চলল। পান্তালিমন কেঠো আঙ্ৎলের ম্ৎঠোয় জলসেঁচুনির হাতলটা তুলে নিল।

বিরাট একটা লাল-হলদে 'কার্প' জলের ওপর মাথা তুলল। জল আছড়ে, ফেনা তুলে, আবার ডুব মারল জলের নীচে। বাপ চেঁচিয়ে উঠল :

—'ধরে রাখিস।'

—'ধরেই তো আছি।'

—'নৌকোর তলায় সেঁধ্ৎতে দিসনে।'

গ্রিগর দম নিয়ে 'কার্প'টাকে নৌকোর পাশের দিকে টেনে আনল। সেঁচুনির একটা ঘা কসিয়ে দিল ব্ৎড়ো। 'কার্প'টা কিন্তু প্রাণপণ শক্তিকে আবার ডুব মারল জলের নীচে। পান্তালিমন বলে উঠল :

—'মাথাটা টেনে তোল! ঠাণ্ডা হয়ে নিক বাতাস গিলে!'

আর একবার গ্রিগর ক্লান্ত মাছটাকে নৌকোর কাছে টেনে নিয়ে এল। মাছের নাকটা নৌকোর খসখসে ধারে গ্ৎতো খেল, তারপর চিত হয়ে খাবি খেতে লাগল, শ্ৎধ্ৎ নাড়াতে লাগল তার কমলা-সোনালী পাখনাদ্ৎটো।

সেঁচুনিতে মাছটা তুলতে তুলতে পান্তালিমন চেঁচিয়ে উঠল :

—'মার দিয়া কেল্লা!'

আরও আধঘণ্টাটেক তারা বসে রইল, কিন্তু 'কার্পে'র দেখা আর মিলল না। অবশেষে ব্ৎড়ো বলল :

—'নে, স্ৎতো জড়িয়ে তোল। আর ঘাই দেবে না আজ।'

পাড় থেকে নৌকো ছাড়িয়ে নিল গ্রিগর। নৌকো বাইতে বাইতেই বাপের ম্ৎখ

দেখে অনুমান করে নিল, বাপ কিছু বলতে চায়। পান্তালিমন কিন্তু বসেই রইল, চুপচাপ তাকিয়ে রইল পাহাড়ের নীচে ইতস্তত ছড়ানো গ্রামের বাড়িগুলোর দিকে।

—'শোন, গ্রিগর!' পায়ের নীচেকার বোরার গিঁটটা টানতে টানতে অনিশ্চিত-ভাবেই সে শুরু করল, 'লক্ষ্য করছি আমি, তুই আর আক্সিনিয়া আস্তাখফা...'

গ্রিগরের চোখমুখ লাল টকটকে হ'য়ে উঠল, সে মাথাটা ঘুরিয়ে নিল। রোদে-পোড়া পেশল ঘাড়ে সার্টের কলারটা কেটে বসে গেল, সাদা চওড়া দাগ ফুটে উঠল মাংসে।

—'খেয়াল রাখিস, হারামজাদা,' কর্কশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বুড়ো এবার বলে চলল, 'স্তেপান আমাদের পড়শি, তার বৌকে নিয়ে বেলেল্লাগিরি সহ্য করব না আমি। আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, সর্বনাশ হবে ওতে। ফের দেখি তো, চাবকে লাল করে দেব।'

পান্তালিমন গিঁট-পড়া আঙুলগুলো মোচড়াতে লাগল; লক্ষ্য করল, ছেলের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আসছে।

—'সব মিছে কথা।' বাপের চোখে চোখ রেখে গ্রিগরও খেঁকিয়ে উঠল।

—'চোপ্!'

—'লোকে যদি বলে, তাহলে..'

—'চুপ কর, কুত্তার বাচ্চা!'

গ্রিগর দাঁড়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল, নৌকোটা লাফিয়ে উঠে এগিয়ে চলল সামনে। নৌকোর পেছনে ধাক্কা খেয়ে ছোট ছোট ঘূর্ণি তুলে ঢেউগুলো নাচতে লাগল।

দুজনে চুপচাপ বসে রইল। ঘাটের কাছে আসতেই আর একবার তার বাপ শাসালো :

—'মনে রাখিস, যা বলেছি ভুল না হয়, নইলে আজই তোর সব খেলা সাঙ্গ করে দেব। ঘর থেকে একপা বাইরে বেরুতে পারবি না।'

গ্রিগর কোন উত্তর দিল না। ঘাটে নৌকো লাগিয়ে জিজ্ঞেস করল :

—'মাছ কি বাড়ি নিয়ে যাব?'

—'মোখোভ ব্যাপারীকে বেচে দিয়ে আয়।' বুড়ো শান্ত গলায় বলল। 'তামাকের টাকাটা হয়ে যাবে।'

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে গ্রিগর বাপের পেছনে পেছনে চলল। তার ক্রুদ্ধ চোখের দৃষ্টি বুড়োর মাথার পেছনটায় ছোবল মারতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগল, 'কর দেখি, কি করতে পার! আজ রাতেই যাচ্ছি, যতই কেন পথ আটকাও।'

॥ দুই ॥

খামার-বাড়ির গেটের কাছে পুরনো বন্ধু মিত্কা কোরশুনোভের সঙ্গে সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেল। রুপোর বোতামওলা বেল্টের লেজটা নাচাতে নাচাতে মিত্কা পায়চারি করছিল। ক্ষুদে ক্ষুদে কোটরের মধ্যে থেকে তার গোলাকার হলদে চোখদুটো চক্‌চক্ করে উঠল। তার চোখের তারা বেড়ালের মত বড়, তারই ফলে কেমন যেন চঞ্চল, আড়-চোখো দৃষ্টি। মিত্কা জিজ্ঞেস করল :

—'মাছ নিয়ে ছুটছিস কোথায়?'

—'আজই ধরলাম। মোখোভদের বাড়ি যাচ্ছি বেচতে।'...

একপলক দেখেই মিত্‌কা মাছটায় ওজন আন্দাজ করে নিল :

—'সাত সের?'

—'সাড়ে সাত। মেপে দেখেছি।'

—'আমাকে সঙ্গে নে। তোর হয়ে বেচে দেব।' মিত্‌কা প্রস্তাব করল।

—'আয়, তাহলে।'

'কিন্তু আমার ভাগে কি রে?'

—'ঘাবড়াসনে। ও নিয়ে হাতাহাতি করব না।' গ্রিগর হাসল।

সবেমাত্র উপাসনা শেষ হয়েছে, গ্রামের লোকজন রাস্তায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। তিন ভাই—ডাক নাম শামিল—লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে। মাঝখানে বড় ভাই নুলো আলেক্সি; তার শিরাবহুল গলাটাকে সোজা করে রেখেছে ফৌজী পোশাকের আঁটসাঁট কলার। পাতলা, কোঁকড়ানো, সুচালো দাড়িটা দুপাশে উদ্ধতভাবে মোচড়ানো। বাঁ-চোখটা অস্থিরভাবে মিটমিট করছে। অনেক বছর আগে তার হাতের ওপরেই বন্দুকের বাঁটের দিকটা ফেটে গিয়েছিল, একটা লোহার টুকরো ছিট্‌কে চোয়ালে লেগেছিল। তারপর থেকেই কারণে অ-কারণে তার বাঁ-চোখটা নাচে। আর, নীল কাটা দাগটা গাল বেয়ে চুলের গোছার মাঝ অবধি গিয়ে মিশেছে। বাঁ-হাতটা কনুই থেকে একেবারে উড়ে গিয়েছে। কিন্তু আলেক্সি একহাতেই সিগারেট পাকাতে ওস্তাদ। বুকের সঙ্গে তামাকের থলিটা চেপে ধরে, দাঁত দিয়ে ঠিকমত কাগজ ছিঁড়ে গোল করে নিয়ে, তামাক ঘসে কি করছে ঠিক বুঝবার আগেই পাকিয়ে ফেলে সিগারেট।

হাত নুলো হলেও গ্রামের মধ্যে সে মারামারিতে সবচেয়ে ওস্তাদ। হাতের মুঠো হিসেবে তেমন বড়সড় নয় তার মুঠোটা—ছোট একটা লাউ'এর মত; কিন্তু হাল চষতে চষতে যদি বলদের ওপর চটে যায়, বেত খেয়েও বলদটা যদি সজুত না হয়, তাহলে হাতের মুঠোয় এমন ঘুঁসিই সে ঝাড়বে, যে বলদটা চষা জমির ওপরেই লম্বা হয়ে পড়বে, কান ফেটে রক্ত গড়াবে। আর উঠতে হবে না বাছাধনের। অন্য দু'ভাই—মার্তিন আর প্রোখোভের আলেক্সির সঙ্গে নিখুঁত মিল; তারই মত বিরাট বপু, চওড়া কাঁধ, কেবল দুজনের দুখানা করে হাত।

মিত্‌কা আর গ্রিগরকে দেখতে পেয়ে আলেক্সি বার পাঁচেক চোখ মিটমিট করল। জিজ্ঞেস করল :

—'মাল বেচবে?'

—'তুমি কিনবে?' গ্রিগর উত্তর দিল।

—'চাও কত?'

—'এক জোড়া বলদ, আর একটা বউ, ফাউ।'

চোখদুটো ভয়ঙ্কর মিটমিট করে আলেক্সি নুলো-হাতটা দুলিয়ে নিল।

—'বেড়ে ছোকরা! হেঃ—হেঃ—হেঃ, একটা বউ ফাউ! বলি, বাচ্চাগুলো ত নেবে, কেমন?'

—'ভাগো হিঁয়াসে, নইলে এক শামিলের দফা আজ রফা হয়ে যাবে!' গ্রিগর গর্জন করে উঠল।

॥ তিন ॥

বারোয়ারিতলায়, গির্জার বেড়ার চারপাশে গ্রামের লোকজন ভীড় জমিয়েছে। ক্রশ আর মেডেলে বুকভর্তি এক বাহাত্তুরে বুড়ো একদল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে।

—'আমার বুড়ো ঠাকুর্দা। গ্রীসাকা তুর্কী-যুদ্ধের গপ্‌পো জুড়েছে।'

মিত্‌কা গ্রিগরকে চোখ ঠেরে বলল, 'চল, শুনিগে।'

গ্রিগর আপত্তি জানাল।

—'শুনতে গেলে, ওদিকে 'কার্প'টা পচে ফুলে উঠবে।'

বারোয়ারিতলায় জুনালানি-গাড়ির চালার পাশেই মাথা উঁচিয়ে আছে মোখোভের বাড়ির সবুজ-রঙা ছাদ। বড় বড় পা ফেলে চালা পেরিয়ে দুজনে সিঁড়ির ধারে এসে দাঁড়াল। রেলিঙের সঙ্গে লতানো, বুনো আঙুরের ঝোপের বাহারে আলসে। সিঁড়ির ওপরে এলিয়ে পড়েছে ছককাটা মন্থর ছায়া!

—'দেখ, দেখ, মিত্‌কা, একদল ক্যায়সা আরামে দিন কাটায়!'

—'হাতলটা দেখ, গিল্টি-করা আবার!' বারান্দায় ঢুকবার দরজাটা খুলতে খুলতে মিত্‌কা নাক সিঁটকে বলল।

—'কে ওখানে?' দরজার ওপাশ থেকে কে যেন বলে উঠল।

সংকোচে জড়সড় হয়ে গ্রিগর ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। 'কার্পে'র লেজ ঘসড়ালো নক্সাকাটা মেঝের ওপর।

—'কাকে চাই?'

একথালা স্ট্রবেরী হাতে, বেতের দুলুনি চেয়ারে একটি মেয়ে বসে আছে। তার টলটলে, ইস্কাপনের মত ঠোঁটের ফাঁকে একটা স্ট্রবেরী। স্তব্ধদৃষ্টিতে গ্রিগর তাকিয়ে রইল তার দিকে। মেয়েটি মাথা উঁচু করে দুই বন্ধুকে আপাদমস্তক দেখে নিল, উষ্ণ ঠোঁটের ফাঁকে স্ট্রবেরীটা ধরাই রইল।

মিত্‌কা গ্রিগরের হয়ে এগিয়ে এল। একটু কেশে জিজ্ঞেস করল:

—'মাছ রাখবেন?'

—'মাছ? আচ্ছা, এখুনি বলছি।'

চেয়ারটায় সোজা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মেয়েটি উঠল। তারপর সুতোর কাজ-করা চটি ফট্ ফট্ করে চলে গেল। তার ধবধবে সাদা পোষাকের ভেতর সূর্যের আলো ঝলসে উঠল। উরু থেকে পা পর্যন্ত আবছায়া সীমারেখা, আর অন্তর্বাসের লেসটা দেখতে পেল মিত্‌কা। খালিপায়ের সাটিনের মত অমন সাদা রং দেখে অবাক হয়ে গেল সে। নরম চটিতে মোড়া ছোট ছোট গোড়ালির কাছের রঙই যা একটু দুধে-হলদে।

—'দেখ, দেখ, গ্রীস্‌কা ক্যায়সা পোশাক! যেন কাঁচ রে! ভেতরের সবকিছুই দেখা যায়।' গ্রিগরের বদলে 'কার্প'টাকেই একটা ঠেলা দিয়ে মিত্‌কা বলে উঠল।

বারান্দার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল মেয়েটি, ধীরে সুস্থে চেয়ারে বসল। তারপর বলল:

—'রান্নাঘরে চলে যাও।'

পা টিপে টিপে ভেতর বাড়ির দিকে এগুলো গ্রিগর। গ্রিগর চলে যেতেই মিত্‌কা মিটমিটে আড়-চোখে দেখতে লাগল মেয়েটির সাদা সিঁথি, দুটি সোনালী অর্ধ-চক্রের মত সিঁথিটা চুলগুলো ভাগ করেছে। মেয়েটিও চঞ্চল, দুষ্টুমিভরা চোখে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। জিজ্ঞেস করল :

—'এই গ্রামেই তোমার বাড়ি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কাদের বাড়ির ছেলে তুমি?'

—'কোরশুনোভদের।'

—'নাম কি?'

—'মিত্‌কা।'

মেয়েটি গোলাপী নখগুলো মন দিয়ে খুঁটল, তারপর দ্রুত-ভঙ্গিতে পা-দুটো গুটিয়ে নিল। জেরা করেই চলল :

—'তোমাদের মধ্যে কে ধরেছে মাছটা?'

—'আমার বন্ধু গ্রিগর।'

—'তুমিও মাছ ধর?'

—'ইচ্ছে হলেই ধরি।'

—'বড়শি দিয়ে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমারও মাঝে মাঝে মাছ ধরতে ইচ্ছে করে।' খানিক চুপ করে থেকে মেয়েটি বলল।

—'বেশতো! ইচ্ছে হয়, একদিন যাবেন আমার সঙ্গে।'

—'তা কি হয়? সত্যি? সত্যি বলছ?'

—'খুব ভোরে উঠতে হবে কিন্তু।' মিত্‌কা জানাল।

—'তা উঠবো, শুধু জাগিয়ে দিতে হবে তোমাকে।'

—'তা পারবো। কিন্তু আপনার বাবা?'

—'আমার বাবা আবার কি?'

মিত্‌কা হাসল।

—'হয়ত ভাববেন চোর। কুকুর লেলিয়ে দেবেন।'

—'কিচ্ছু না খুব সোজা! আমি কোণের ঘরে একা ঘুমুই। ওইটে হচ্ছে জানলা।' আঙুল দিয়ে সে দেখিয়ে দিল। 'ডাকতে হলে জানলায় টোকা দিও, জেগে উঠব।'

রান্নাঘর থেকে গ্রিগরের ভয় পাওয়া গলা আর রাঁধুনীর গদগদ, ভারী গলার আওয়াজ ভাঙা ভাঙা কানে আসছে। মিত্‌কা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, বেল্টের চটা-ওঠা রুপোয় আঙুল বুলাতে লাগল।

—'বিয়ে করেছ?' গোপন হাসিতে তাতিয়ে নিয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল :

—'হঠাৎ?'

—'এমনিই।' জানতে ইচ্ছে হল। তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

—'না, এখনো করিনি।'

হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল মিত্‌কা। আর মেয়েটি বাগান থেকে আনা একটা

গাছের ছোট ডাল নিয়ে, মেঝেতে ছড়ানো খাবেরীগুলো নাড়তে নাড়তে প্রশ্ন করে বসল :

—'মেয়েরা তোমার পিছনে ঘোরে, মিত্‌কা?'

—'কেউ কেউ ঘোরে, কেউ কেউ ঘোরে না।'

—'সত্যি কথাটা বল না...আচ্ছা, তোমার চোখ দুটো অমন বেড়ালের মত কেন?'

—'বেড়ালের মত?' এবারে মিত্‌কা অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

—'হ্যাঁ, অবিকল! একেবারে বেড়ালের মত।'

—'মার কাছ থেকে পেয়েছি। আমার কোন হাত নেই।'

—'আচ্ছা, তোমাকে ওরা বিয়ে দেয় না কেন, মিত্‌কা?'

মুহূর্তের ধাঁধা-লাগানো ভাবটা কাটিয়ে উঠল মিত্‌কা। মেয়েটির কথার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপটুকু ধরতে পেরে দুই চোখে ঝিলিক মেরে উঠল।

—'আমার বউ এখনো ডাঁটো হয় নি।'

অবাক হয়ে মেয়েটি ভুরু দুটো টেনে তুলল, ঘাড় উঁচিয়ে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, তারপর উঠে পড়ল। তার ক্ষিপ্র হাঁসিটুকু মিত্‌কাকে যেন বিছুটির চাবুক মারল।

রাস্তা থেকে কে যেন উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে, পায়ের শব্দ শোনা গেল। বাড়ির কর্তা সার্জেই প্লাতোনাভিচ্ মোখোভ ভারী কিড্‌বুট পায়ে, তার বিরাট বপু নিয়ে মিত্‌কার পাশ দিয়ে আমীরী চালে ধীরে ধীরে চলে গেল।

—'কাকে চাই? আমাকে?' চলতে চলতে ঘাড় না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করল। মেয়েই উত্তর দিল :

—'মাছ এনেছে বাবা, বেচতে।'

গ্রিগর খালি হাতে বেরিয়ে এল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

সেই সন্ধ্যেবেলা গ্রিগর বেরিয়েছিল, যখন বাড়ি ফিরল, তখন প্রথম মোরগ ডেকে গিয়েছে। বারান্দা থেকে ঝাঁঝালো 'হপ'-লতা আর মসলার মত 'স্টিচ্‌-ওয়াটে'র গন্ধ নাকে এল।

গ্রিগর পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল; জামাকাপড় ছেড়ে রবিবারের ডোরা-কাটা পা-জামাটা সাবধানে ঝুলিয়ে রাখল; তারপর বুকে 'ক্রুশ' করে শুয়ে পড়ল। মেঝের ওপর ছক-কাটা জোছনার সোনালী সমুদ্র। কোণের দিকে নক্সা-কাটা তোয়ালের আড়ালে রুপোর 'আইকন' চকচক করছে। বিছানার ওপর থেকে উত্তেজিত মাছির ভনভনানি কানে আসছে।

ঘুমিয়েই পড়ত গ্রিগর; কিন্তু দাদার ছেলেটা হঠাৎ রান্নাঘর থেকে কেঁদে উঠল।

দোলনাটা তেল না-দেওয়া গাড়ির চাকার মত ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ করল। শুনতে পেল, বৌদি দারিয়া ঘুমজড়ানো কণ্ঠে বকে উঠল :

—'ঘুমো, লক্ষ্মীছাড়া, ঘুমো! তোর জন্যে না পাই শান্তি, না পাই সোয়াস্তি।' তারপর গুণগুণ করে ঘুমপাড়ানি গান ধরল :

দোলনার তৃপ্তিকর একঘেয়ে আওয়াজের তালে তালে তন্দ্রায় ঢুলতে ঢুলতেই গ্রিগরের মনে পড়ে গেল : 'তাইত, কাল পিয়োত্রা যাবে ক্যাম্পে। দারিয়া থাকবে বাচ্চাকে নিয়ে...তাকে বাদ দিয়েই ফসল কাটতে হবে।'

এক সুদীর্ঘ হ্রেষায় গ্রিগরের ঘুম ভাঙল। আওয়াজ শুনেই বুঝল, ওটা পিয়োত্রার পল্টনের ঘোড়া। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, দেরি হচ্ছে সার্টের বোতাম পরাতে। দারিয়ার গানের সুরে আচ্ছন্ন হয়ে আবার প্রায় ঢুলে পড়ল গ্রিগর। দারিয়া গাইছে :

'রাজহাঁসরা কোথায় গেল?
উড়ে গেল নলের বনে।
নলের বন কোথায় গেল?
মেয়েরা সব তুলে নিল?

'মেয়েরা সব কোথায় গেল?
সব মেয়েদের বিয়ে হল।
কসাকরা সব কোথায় গেল?
সবাই তারা যুদ্ধে গেল।'

গ্রিগর চোখ রগড়াতে রগড়াতে আস্তাবলের দিকে চলল; তারপর পিয়োত্রার ঘোড়াটাকে রাস্তায় এনে দাঁড় করাল। একটা উড়ন্ত মাকড়সার জাল মুখে এসে লাগল, অ-প্রত্যাশিতভাবে তার ঘুমের চটকা ভেঙে গেল।

ডনের ওপর দিয়ে চাঁদের আলোর ঈষৎ হেলানো তরঙ্গায়িত পথরেখা; সে পথ-রেখা কোনদিন কেউ পা দিয়ে মাড়ায়নি। ডনের বুকে কুয়াশার পর্দা ঝুলছে, তারও ঊর্ধ্বে একটা তারার টুকরো। ঘোড়াটা পেছনের পা-দুটো রাখল। নামাটা বে-কায়দা হয়ে গেল। নদীর অপর-পাড় থেকে বুনোহাঁসের ডাক শোনা গেল, একটা 'শাঁট্' মাছ লাফিয়ে উঠল, পাড়ের কাদাজলের ওপর দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে, এদিক ওদিক কোন ছোট মাছের ঝাঁকের সন্ধানে ফিরতে লাগল।

নদীর ধারে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গ্রিগর। নদীর পাড় থেকে ভিজে ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। ঘোড়ার মুখ থেকে ছোট্ট এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। এক মধুর শূন্যতায় মন ভরে উঠল গ্রিগরের। জীবনে এত তৃপ্তি, কোন বাধা নেই, কোন বন্ধ নেই! ভোরের রক্তিম ছটা ধূসর আকাশের বুক থেকে তারার শেষ চিহ্নটুকু মুছে নিচ্ছে।

মায়ের সামনে পড়ে গেল আস্তাবলের কাছাকাছি এসে। মা জিজ্ঞেস করল :

—'কে রে? গ্রীস্‌কা নাকি?'

—'তাছাড়া আবার কে?'

—'জল খাওয়ান হয়েছে ঘোড়াটাকে?'

—'হ্যাঁ।' সংক্ষেপে উত্তর দিল গ্রিগর।

কিছু জ্বালানি ঘুঁটে নিয়ে, খালিপায়েই তড়বড় করে, ঘরের ভেতরে ছুটে গেল বুড়ী। চেঁচিয়ে বলল :

—'তুই গিয়ে আস্তাখফদের তুলে দে তো। স্তেপান বলেছিল, সেও যাবে পিয়োত্রার সঙ্গে।'

ভোরের হিমে চাপা কাঁপুনি ধরিয়ে দিল গিগ্রেরের। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল শিরশির করে। আস্তাখফদের বাড়িতে উঠবার সিঁড়ির তিনটে ধাপ সশব্দে পেরিয়ে গেল। দরজায় তখনো খিল আঁটা। রান্নাঘরে কম্বল বিছিয়ে তার ওপর ঘুমুচ্ছে স্তেপান, বুকের ওপর মাথা রেখেছে বৌ।

ভোরের ধুসর আলো-আঁধারিতে গ্রিগর দেখতে পেল, হাঁটুর ওপরে জড়ো হয়ে আছে আকসিনিয়ার ঘাঘরা, বার্চের মত সাদা সাদা পা-দুটো লজ্জাহীনের মত দু পাশে ছড়ানো। মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল গ্রিগর। বুঝতে পারল, শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে তার গলা, মাথার ভেতরে লোহার হাতুড়ি পিটছে, ফেটে যাবে বুঝি।

গ্রিগর চোখ ফিরিয়ে নিল। তারপরই, অদ্ভুত হেঁড়ে গলায় ডেকে উঠল :

—'এ্যাই! কে আছ? উঠে পড়!'

ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠল আকসিনিয়া।

—'কে? কে?' দ্রুত হাতে টেনেটুনে ঘাঘরাটা ঠিক করতে লাগল; নীচের দিকে টানতে গিয়ে নগ্নবাহু পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। বালিসের ওপরে ছোট একফোঁটা লালার দাগ। ভোরের দিকে গাঢ় হয় মেয়েদের ঘুম।

—'আমি, আমি। তোমাদের জাগিয়ে দিতে পাঠাল মা।'

—'আমরা এক্ষুনি উঠছি। মাছির জ্বালায় ঘুমুতে হয় মেঝেতে। স্তেপান, ওঠো, শুনছো?' গলার স্বরেই গ্রিগর বুঝতে পারল, আকসিনিয়া অস্বস্তিবোধ করছে। তাই সে দ্রুত-পায়ে বেরিয়ে এল।

গ্রাম থেকে তিরিশজন কসাক চলেছে মে মাসের শিক্ষা-শিবিরে। সাতটা বাজার আগেই ত্রিপল-ঢাকা গাড়ি নিয়ে, নৌকোর পালের কাপড়ের জামা গায়ে, জিনিসপত্র সঙ্গে, পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে, কসাকরা আসতে লাগল বারোয়ারি-তলার দিকে।

গ্রিগর দেখল, সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে পিয়োত্রা দ্রুত-হাতে একটা ছেঁড়া লাগাম সেলাই করছে।

বাপ পান্তালিমন হাঁড়িতে ওট ঢেলে দিয়ে পিয়োত্রার ঘোড়ার তদারক করছে।

—'এখনো খাওয়া হল না?' ঘোড়ার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে পিয়োত্রা প্রশ্ন করল :

—'খিদে পেয়েছে খুব।' খসখসে হাতে জিনের কাপড়টা পরখ করে নিয়ে ইচ্ছে করেই বাপ উত্তর দিল। 'কাপড়ের টুকরোটাকরা লেগে থাকলে, ঘসা লেগে, এক দৌড়েই ঘা হয়ে যাবে পিঠে।'

—'খাওয়ার পর জল খাইও কিন্তু।'

—'গ্রিগর খাইয়ে আনবে ডন থেকে।' পান্তালিমন উত্তর দিল।

কপালে সাদা তারা, বিশাল, তেজী, ডনের ঘোড়াটাকে গেটের বাইরে নিয়ে এল গ্রিগর। বাঁ-হাতটা আলতোভাবে ঝুঁটির ওপর রেখে, লাফিয়ে উঠল পিঠে। তারপরেই দুলকি চালে বেরিয়ে গেল। নদীতে নামবার মুখে গ্রিগর রাশ টানল, কিন্তু হোঁচট খেল ঘোড়াটা। তাড়াতাড়ি পা ফেলে ছুটে চলল ঢালু বেয়ে। পেছনের দিকে হেলে, ঘোড়ার পিঠের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ে গ্রিগর দেখতে পেল, কলসি নিয়ে একটি মেয়ে নামছে পাহাড়ের নীচের দিকে। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে গ্রিগর ক্ষিপ্রবেগে হুড়মুড় করে জলে গিয়ে পড়ল। ধুলোর মেঘ উড়ল পেছনে।

ঢাল্ বেয়ে দ্লতে দ্লতে আর্কাসিনিয়া আস্তাখফ নামছিল। খানিকদ্রে আগে থাকতেই সে চে'চিয়ে উঠল :

—'এ্যাই, বদমাশ। আর একটু হলেই চাপা পড়তাম যে। দাঁড়াও না, বাপকে বলে দিচ্ছি এমন করে ঘোড়া ছোটাও তুমি।'

—'রাগ করো না গো পড়শি। স্বামীকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে আমাকে হয়ত লাগতে পারে খামারের কাজে।' গ্রিগর উত্তর দিল।

—'তুমি আবার আমার কি কাজে লাগবে?'

—'ফসল কাটার সময় হয়ত আমাকেই ডাকবে।' গ্রিগর হাসল।

নদীর জলে নিপ্ণ হাতে কলসি ভরল আর্কাসিনিয়া। দ্ই হাঁটুর মাঝখানে চেপে ধরল ঘাঘরা, বাতাসে যাতে উড়িয়ে না নিয়ে যায়।

গ্রিগর প্রশ্ন করল :

—'তাহলে, নিয়ে চলল তোমার স্তেপানকে?'

—'তোমার কি তাতে?'

—'বাপরে, যেন আগ্নের হলকা! জিজ্ঞেস করতেও দোষ?'

—'ওকে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে হয়েছেটা কি?'

—'তাহলে তুমি বিরহিনী হয়ে থাকবে?'

—'থাকবই ত!'

জল থেকে ঘোড়াটা ম্খ তুলল। সামনের পা দ্টো জলে ডুবিয়ে তাকিয়ে রইল ডনের দিকে। আর এক কলসি জল ভরল আর্কাসিনিয়া। তারপর বাঁকটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে ঢাল্ বেয়ে উঠতে লাগল। ঘোড়ার ম্খ ফিরিয়ে নিয়ে গ্রিগরও চলল পেছনে পেছনে। বাতাসে পত্ পত্ ক'রে উড়ছে আর্কাসিনিয়ার ঘাঘরা, উড়ছে তার তামাটে ঘাড়ের ফাঁপানো, স্ন্দর চুলগ্লো। চুড়ো-করা চুলের খোঁপার ওপরে ঝলমল করছে নক্সাকাটা, চ্যাপ্টা টুপিটা। গোলাপী রঙের সার্ট ঘাঘরার নীচে কোমরের কাছে গোঁজা। পিঠ আর কাঁধের কাছে আঁটসাঁট হয়ে লেগে আছে সার্ট। ঢাল্ বেয়ে উঠতে সামনের দিকে একটু ঝুকতে হচ্ছে আর্কাসিনিয়াকে। সার্টের নীচে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দ্ কাঁধের মাঝখানটা। তার প্রতিটি পদক্ষেপ নিবিষ্ট মনে লক্ষ্য করতে লাগল গ্রিগর। ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল, তার সঙ্গে আবার কথাবার্তা নতুন করে শ্র্ করে।

—'স্বামীর জন্যে মন কেমন করবে, তাই না?' গ্রিগর জিজ্ঞেস করল।

ঘাড় ফেরাল আর্কাসিনিয়া, না থেমেই একটু হাসল :

—'করবে না? বিয়ে কর!' হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিল। 'বিয়ে কর, তারপর ব্ঝবে বউয়ের জন্যে মন কেমন করে কিনা!'

ঘোড়াটাকে আর্কাসিনিয়ার পাশাপাশি নিয়ে এল গ্রিগর, সোজা তার চোখের দিকে তাকাল। টিপ্পনী কাটল :

—'আর সকলের বৌ কিন্তু স্বামী বিদেয় হলেই খ্শী হয়। পিয়োত্রা ছাড়াই ত ম্টিয়ে যাবে আমাদের দারিয়া।'

—'স্বামী জোঁক নয়, কিন্তু রক্ত চুষে খায় একই রকম। শিগ্গীরই বিয়েটিয়ে হবে নাকি তোমার?' আর্কাসিনিয়া জিজ্ঞেস করল।

—'আমি কি জানি তার। সে ভার ত বাবার 'পর। মনে হয়, পল্টনের কাজ শেষ হলে।'

—'এখনো কাঁচা বয়েস; বিয়ে করতে যেও না।'

—'কেন, কি জন্যে?'

—'সুখ নেই ওতে, শুধুই দুঃখ।' আকসিনিয়া ভুরু তুলে তাকাল। চাপা ঠোঁটে বাঁকা হাসি হাসল। এই প্রথম গ্রিগরের চোখে পড়ল, আকসিনিয়ার ঠোঁটদুটো কি নির্লজ্জ লালসাতুর, আর ফুলোফুলো। আঙুল দিয়ে ঘোড়ার কেশর আঁচড়ে নিয়ে গ্রিগর উত্তর দিল:

—'বিয়ে করার ইচ্ছে নেই আমার। এরই মধ্যে একজন আমাকে ভালবেসে ফেলেছে। আমিও তাকে ভালবাসি।'

—'তাহলে, নজর পড়েছে কারুর ওপর?'

—'আমি আবার কি নজর দিতে যাব? এখন ত স্তেপানকে বিদেয় দিতে হবে..?'

—'আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে এসো না। স্তেপানকে ব'লে দেব।'

—'দেখিয়ে দেব তোমার স্তেপানকে...'

—'মনে থাকে যেন, বাহাদুর, আগেভাগে না চেঁচাও।'

—'ভয় দেখিও না আকসিনিয়া।'

—'ভয় আমি দেখাচ্ছিনে। রুমাল সেলাই করে দেবার অন্য মেয়ে পাবে; আমার দিকে নজর দিতে এসো না।'

—'নজর দেব। এখন থেকে আরও বেশি ক'রে নজর দেব।'

—'বেশ, নজর দাও তাহলে।'

সন্ধির হাসি হাসল আকসিনিয়া। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে যেতে চাইল ঘোড়াটাকে ঘুরে। পাশে সরিয়ে এনে ঘোড়া দিয়ে রাস্তা আটকে দিল গ্রিগর।

—'আমাকে যেতে দাও, গ্রীস্‌কা।'

—'দেব না।'

—'পাগলামো করো না। স্বামীকে দেখতে যেতে হবে।'

মৃদু হেসে ঘোড়াকে খোঁচা মারল গ্রিগর। ঘোড়াটা পাহাড়ের সঙ্গে আকসিনিয়াকে প্রায় চেপে ধরল।

—'বদমাসী করো না, যেতে দাও। লোক রয়েছে আশেপাশে। দেখতে পেলে কি ভাববে বলত?' ফিসফিস করে আকসিনিয়া বলল। চারপাশে ভীতচকিত দৃষ্টি বুলিয়ে চলে গেল পাশ কাটিয়ে। ভুরুদুটো কুঞ্চিত হল। একবার পেছন ফিরে তাকালও না।

সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে পিয়োত্রা তখন বিদায় নিচ্ছে সকলের কাছ থেকে। গ্রিগর ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাল। সিঁড়ি ছেড়ে দ্রুতপায়ে নেমে এসে পিয়োত্রা লাগাম তুলে নিল। রাস্তা শুঁকে ঘোড়াটা নাক ঝাড়ল, তারপর লাগাম চিবুতে শুরু করল। রেকাবে একটা পা তুলে দিয়ে পিয়োত্রা বাপকে বলল:

'টেকো ঘোড়াগুলোকে বেশি খাটিও না, বাবা। সামনের শরতে বেচে দেওয়া যাবে। তাছাড়া, জানোই ত, গ্রিগরের পল্টনের ঘোড়া লাগবে। স্তেপের ঘাসগুলো বেচো না। এবার মাঠে কেমন ঘাস হবে, তাতো তোমার জানাই আছে।'

—'ঠিক আছে। ভগবান মঙ্গল করুন! সময় হয়ে গেছে তোর।' বুকে ক্রশ করে বুড়ো উত্তর দিল।

বিরাট বপু নিয়ে জিনের ওপরে লাফিয়ে উঠল পিয়োত্রা। বেল্টের মধ্যে গুঁজে-গেঁজে ঠিকঠাক করে নিল সার্টের ভাঁজ। ঘোড়া এগুতে লাগল গেটের দিকে। তলোয়ারখানা তালে তালে দুলতে লাগল। রোদ্দুরে তার হাতলটা ঝকমক করে উঠল।

বাচ্চাটাকে কোলে করে পেছনে পেছনে চলল দারিয়া। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মা চোখ মুছতে লাগল জামার হাতায়।

—'ও দাদা! পিঠেগুলো! ফেলে গেলে যে! আলুর পিঠে!' দুনিয়া দৌড়ে গেল গেট পর্যন্ত। 'দাদা পিঠে ফেলে গেল।' ডুকরে কেঁদে উঠল দুনিয়া। হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল গেটের খুঁটির সঙ্গে। তার জ্যাকেটের ওপরে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল তেলতেলে, গরম গাল বেয়ে।

কপালে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দারিয়া। তখনো নজরে পড়ছে স্বামীর ময়লা সাদা সার্টটা। গেটের নড়বড়ে খুঁটিটায় নাড়া দিয়ে, গ্রিগরের দিকে বুড়ো তাকাল :

—'এটা তুলে একটা নতুন খুঁটি পুঁতে দে।' চিন্তান্বিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল মুহূর্তের জন্যে, তারপর অস্ফুটকণ্ঠে জানান দিল :

—'চলে গেল পিয়োত্র।'

ডালের বেড়ার ফাঁক দিয়ে গ্রিগর দেখতে পেল, তৈরি হচ্ছে স্তেপান। সবুজ পশমী ঘাঘরা পরে আকসিনিয়া ঘোড়াটাকে বাইরে নিয়ে এল। স্তেপান একটু হেসে তাকে কি যেন বলল। আমীরীচালে চুমু খেল বৌকে। হাত দুটো বহুক্ষণ কাঁধের দুপাশ আঁকড়ে ধরে রইল। আকসিনিয়ার সাদা জ্যাকেটের ওপরে পোড়া কয়লার মত দেখাচ্ছে তার কালো হাত দুখানা। স্তেপান গ্রিগরের দিকে পেছন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার নিখুঁত চাঁছা, খাড়া গর্দান, চওড়া ভারী কাঁধ, আর (যখন আকসিনিয়ার ওপর ঝুঁকে পড়ছে) তার ফিকে বাদামী রঙের চুমড়ান গোঁফের প্রান্ত, বেড়ার ওধার থেকেই নজরে পড়ছে।

কিসে যেন আকসিনিয়া হেসে উঠল। ঘাড় নাড়ল। স্তেপান জিনের ওপরে গ্যাঁট হয়ে বসে, গেটের ভেতর দিয়ে ঘোড়াটা দ্রুত চালিয়ে দিল। আকসিনিয়া রেকাব ধরে পাশে পাশে চলল। প্রেমার্ত, তৃষ্ণার্ত চোখে বারবার তাকাতে লাগল স্বামীর মুখের দিকে।

তীক্ষ্ম, অপলক দৃষ্টিতে রাস্তার বাঁক পর্যন্ত গ্রিগর তাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

॥ দুই ॥

ঝড় উঠে এল সন্ধ্যের দিকে। গ্রামের মাথায় জমাট বেঁধে উঠল মেঘ। ক্রুদ্ধ ডন বাতাসের ঝাপটায় দুপাড় আছড়ে ফেনা ওগরাতে লাগল। বিদ্যুৎ আকাশ ঝলসাতে লাগল। থেকে থেকে মাটি কেঁপে উঠতে লাগল বাজের গুরুগর্জনে। একটা শকুন ডানা ছড়িয়ে মেঘের নীচে পাক খেতে শুরু করল। কা-কা করে দাঁড়কাকগুলো তার পিছু নিল। ঠাণ্ডা একটা বাতাস ছেড়ে পূবদিকে মেঘ ছুটে চলল ডনের ওপর দিয়ে। বিলের ওধারে আকাশ হয়ে উঠল কালো, ভয়ঙ্কর : উন্মুখ স্তব্ধতায় অসাড় হয়ে রইল স্তেপ। গ্রামের ভেতর থেকে জানলা বন্ধ করার শব্দ উঠতে লাগল। বুড়োরা বুকে ক্রুশ করতে করতে বাড়িমুখো ছুটল। বারোয়ারি-তলার ওপরে ঘুরপাক খেতে লাগল ধূসর ধুলোর স্তম্ভ। রৌদ্রতপ্ত মাটি। বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো শুষে নিতে লাগল।

বাঁধাচুলের বিনুনি দুলিয়ে, উঠোন পেরিয়ে ছুটে গিয়ে, দুনিয়া তাড়াতাড়ি মুরগীর ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। তার নাকের পাশদুটো বিপদের গন্ধ পাওয়া ঘোড়ার মত ফুলে উঠল। রাস্তার ওপরে ছেলেমেয়েরা পা ছুঁড়ছে। আট বছরের মিশ্‌কা বাপের চুড়ো-ওয়ালা টুপিটা চোখ অবধি টেনে, ঘুরপাক খেতে খেতে তারস্বরে চেঁচাচ্ছে :

'এ মেঘটা উড়ে যা,
বাড়ির দিকে বাড়াই পা,
ভগবানের মানত আছে,
প্রণাম করি যিশুর কাছে।'

ঈর্ষার চোখে দুনিয়া দেখতে লাগল, মিশ্‌কার ক্ষতবিক্ষত খালি পাদুটো মাটির বুকে আঘাত হেনে চলেছে নির্মমভাবে। তারও ইচ্ছে করতে লাগল, বৃষ্টির জলে অমনি করে নেচে চুল ভিজিয়ে নেয়; তাহলে তার চুল হবে আরও ঘন, আরও কোঁকড়ান। বিছুটির ঝোপের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বার ভয় থাকলেও, ইচ্ছে করতে লাগল, মিশ্‌কার বন্ধুর মত অমনি করে হাতে ভর দিয়ে ডিগবাজি খায়। কিন্তু মায়ের চোখ রয়েছে এদিকে। জানলার ওপিঠে তার ক্রুদ্ধ ঠোঁট দুটো নড়ছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাড়ির ভেতর ছুটে গেল দুনিয়া। বৃষ্টি জোরে নামল। ঠিক যেন ছাদের ওপরেই একটা বাজ ফেটে পড়ল, তারপর ডনের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে চলে গেল বহুদূরে।

পান্তালিমন আর ঘর্মাক্ত গ্রিগর পাশের ঘর থেকে টানাটানি করে বারান্দায় বার করছে একটা ভাঁজকরা বেড়-জাল।

—'ঝটপট খানিক সুতো আর জালের সূচ নিয়ে আয়!' দুনিয়াকে হুকুম করল গ্রিগর। দারিয়া বসল জাল সারতে। তার বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে বকবক শুরু করল শাশুড়ী :

—'বুড়ো হচ্ছো, আর ভীমরতি ধরছে তোমার। কোথায় এখন ঘুমুবো, তা না, তেল পোড়াচ্ছেন রাত জেগে; তেলের যা দাম আজকাল! কি এমন মাথামুণ্ডু করবে? কোন চুলোয় যাবে শুনি? যাও না ডুবিয়ে মারবে; উঠোনে দাপাদাপি করছে ওঁর দত্যি দানা। ওই শোন, কেমন করে নাড়াচ্ছে বাড়িটা! যিশু যিশু, মেরী মেরী...'

মুহূর্তের জন্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল উজ্জ্বল নীল আলো, স্তব্ধ হয়ে উঠল রান্না-ঘরটা; জানলায় বৃষ্টির ঝাপটার শব্দ শোনা গেল। বাজ গর্জে উঠল কড়কড় করে। অস্ফুট আর্তনাদ করে জালেই মুখ গুঁজল দুনিয়া। দারিয়া জানলার দিকে তাকিয়ে ক্রশ করল। বেড়ালটা গা ঘসছিল পায়ের সঙ্গে। বুড়ী তার দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকাল :

—'ওরে, দুনিয়া, তাড়া, তাড়া বেড়ালটাকে।' বুড়ী চিৎকার করে উঠল। 'হে মা মেরী, সব পাপ ক্ষমা কর মা...দুনিয়া ওটাকে তাড়িয়ে দে উঠোনে! ক্ষ্যান্ত দে, অপয়ারা! তাড়ালি...'

গ্রিগর জালটা ফেলে দিয়ে, নিঃশব্দ হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। বাপ ধমকে উঠল :

—'কিরে, হাসি কিসের এত? খুব হয়েছে! হাত চালিয়ে সেলাই করে ফেল মেয়েরা। সেদিনই বলেছিলাম জালটা দেখে রাখতে।'

—'কি মাছ ধরবে শুনি?' আমতা আমতা করে বুড়ী জিজ্ঞেস করল।

—'যা বোঝো না, মাথা গলাতে এসো না তার মধ্যে; চুপ মেরে থাক। সব মাছ আসবে পাড়ের কাছে। ঝড়কে ওরা ডরায়। ভয় হচ্ছে, জল হয়ত এতক্ষণে কাদায় দাঁড়িয়ে গেছে। তুই, যা ত, দুনিয়া! দেখে আয়, স্রোতের শব্দ শুনতে পাস কিনা।'

অনিচ্ছাসত্ত্বে দুনিয়া এগুলে দরজার দিকে। বুড়ী তবু দমবার পাত্রী নয়।

—'কে যাবে তোমার সঙ্গে কাদা ঠেলতে, শুনি? দারিয়া যাবে না, বুকে ঠাণ্ডা জমবে।' বুড়ী বকবক করেই চলল।

—'আমি যাব, গ্রিগর যাবে। অন্য জালটার জন্যে আকসিনিয়া, আর আরএক-জনকে ডাকলেই চলবে।'

দুনিয়া প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকল। তার চুলের গোছা থেকে জল ঝরছে ফোঁটায় ফোঁটায়। ভেজা, কালোমাটির গন্ধ উঠছে গা থেকে।

—'স্রোতের যা গর্জন শোনা যাচ্ছে'! হাঁপাতে লাগল দুনিয়া।

—'কোটটা জড়িয়ে নে গায়ে, খবর দিয়ে আয় আকসিনিয়াকে।' আবার হুকুম করল বাপ। 'ও যদি যায়, মালাস্কা শ্লোলোভাকেও তাহলে সঙ্গে আনতে বলবি।'

মেয়েদের নিয়ে তাড়াতাড়িই ফিরে এল দুনিয়া। নীল ঘাঘরা আকসিনিয়ার পরনে, একটা ছেঁড়াখোঁড়া জ্যাকেট দড়ি দিয়ে বাঁধা। তাকে দেখাচ্ছে রোগামত ছোট-খাট। দারিয়ার সঙ্গে একটু হাসাহাসি করে আকসিনিয়া মাথার রুমালটা খুলে নিল। চুল শক্ত করে বাঁধল। মাথাটা পেছনে হেলিয়ে নিরুদ্বেগ চোখে গ্রিগরের দিকে তাকাল। মোজা বাঁধতে বাঁধতে কর্কশকণ্ঠে স্থুলাঙ্গী মালাস্কা বলে উঠল :

—'বোরাগুলো তৈরি আছে ত? জলের মাছ আজ ডাঙ্গায় উঠিয়ে ছাড়ব।'

সবাই এসে দাঁড়াল উঠোনে। তখনো মুষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে। ফেনা ছিটিয়ে নালার জল গড়িয়ে পড়ছে ডনে।

নদীর পথে আগে আগে চলল গ্রিগর। খানিক পরেই বাপ জিজ্ঞেস করল :

—'ঘাটের কাছাকাছি এলাম না, গ্রিগর?'

—'হ্যাঁ, বাবা।'

—'তাহলে শুরু কর এখান থেকে।' বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল পান্তালিমন।

—'শুনতে পারছি না, ঠাকুর্দা।' খ্যাসখেসে গলায় মালাস্কা চেঁচাল।

—'...শুরু কর।' বুড়ো উত্তর দিল। 'বেশি জলে নামছি আমি...শুনছিস... বেশি জলে। ওরে, মালাস্কা, কানে-কালা হারামজাদী। টেনে নিয়ে চললি কোথায়? ...বেশি জলে নামছি আমি...এ্যাই, গ্রিগর। পাড়ের দিকে যেতে বল আকসিনিয়াকে।'

ডনের চাপা, ক্রুদ্ধ গর্জন। বাতাসের ঝাপটায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে বৃষ্টির তীর্যক-ধারা। নীচের মাটিতে পা টিপে টিপে এগুতে এগুতে, এক কোমর জলে গিয়ে পড়ল গ্রিগর। কনকনে ঠাণ্ডা বুকে আঠার মত জাপ্টে ধরে হৃদপিণ্ডকে যেন পাকে পাকে বেঁধে ফেলল। ঢেউগুলো ঝাপটা মারতে লাগল মুখে। যেন চাবুকের মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বসতে লাগল চোখে। জালটা ফুলে উঠে গভীর জলে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রিগরের পায়ে গরম মোজা; বেলে-মাটিতে পা হড়কে গেল তার। জাল ফসকে গেল হাত থেকে। জল ক্রমশই গভীর। হঠাৎ পা হড়কাতেই থই পেল না আর। স্রোতে এনে ফেলল মাঝ দরিয়ায়। ডান-হাতে প্রাণপণে জল সাঁতরে পাড়ের দিকে এগুলো গ্রিগর। কালো মিশমিশে, পাক-খাওয়া, গভীর জল দেখে এমন ভয় আগে আর

কোনদিন পারেনি সে। পায়ের নীচে মাটি পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে উঠল। একটা ঝাঁছ খাই মেরে গেল হাঁটুতে।

হাত ফসকে জালটা আবার কাত হয়ে নদীর জলে গিয়ে পড়ল। আবার স্রোতের টানে পায়ের নীচের মাটি সরে গেল। মুখে জল ছুঁড়তে ছুঁড়তে সাঁতরাতে লাগল গ্রিগর। চেঁচিয়ে ডাকল:

--'আকসিনিয়া, ঠিক আছ তুমি?'

—'এখন পর্যন্ত ত আছি।' উত্তর শুনতে পেল তার।

—'বৃষ্টি থামল?'

—'গুঁড়োবৃষ্টি থেমেছে, শুরু হয়েছে বড় বড় ফোঁটা।'

—'চেঁচিও না, বাবা শুনতে পেলে তেড়ে আসবে।'

—'বাপকেও ডরাও?' আকসিনিয়া ফোড়ন কাটল।

মুহূর্তের জন্যে চুপচাপ করে রইল দুজনে।

—'একটা ডুবো 'এল্‌ম' গাছ আছে পাড়ের কাছে, গ্রীস্‌কা; ওর সঙ্গে জালটা জড়িয়ে দিলে কেমন হয়!'

আচমকা বাতাসের এক প্রচণ্ড ঝাপটায় গ্রিগর তার কাছ থেকে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল।

—'আঃ—আঃ,' পাড়ের কাছাকাছি কোথা থেকে যেন আকসিনিয়ার আর্তনাদ উঠল। গ্রিগর ভীত হয়ে, ওই আওয়াজ লক্ষ্য করে সাঁতরাতে লাগল।

--'আকসিনিয়া!'

শুধু বাতাস আর ডনের ক্রুদ্ধ গর্জন।

—'আকসিনিয়া!' গ্রিগর চেঁচিয়ে উঠল। ভয়ে হিম হয়ে গেল সে। এলোপাথাড়ি খুঁজতে লাগল তাকে। পায়ের নীচে কি যেন ঠেকল। চেপে ধরল হাতে। সেটা জাল।

—'গ্রীস্‌কা, তুমি কোথায়?' কান্নায় ভাঙা আকসিনিয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল গ্রিগর।

—'চেঁচাচ্ছিলাম, উত্তর দিচ্ছিলে না কেন?' হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসতে আসতে গ্রিগর রাগে ফেটে পড়ল।

গোড়ালীর ওপর বসেই, কাঁপতে কাঁপতে জালটা খুলে দিল সে। একখানা ভাঙা মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে এল। চাপা গুমগুম মেঘের আওয়াজ কানে এল বিলের ওধার থেকে। ভিজে মাটি ঝকমক করে উঠল। বৃষ্টি-স্নানে আকাশ হয়ে উঠল পরিচ্ছন্ন, নির্মল।

জালটা খুলতে খুলতে গ্রিগর আকসিনিয়ার মুখের দিকে তাকাল। খড়ির মত সাদা হয়ে উঠেছে মুখখানা। কিন্তু তখনও হাসছে তার লাল-টুকটুকে, স্ফুরিত ঠোঁট-দুটো। আকসিনিয়া বলল:

—'পাড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। ভয়ে মরছিলাম তখন। ভেবেছিলাম তুমি হয়ত ডুবে গেছ।'

হাতে হাত রাখল দুজনেই। গ্রিগরের জামার হাতার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করল আকসিনিয়া।

—'তোমার হাতের ওপর দিকটা কি গরম।' নাকীসুরে আকসিনিয়া বলল। 'আমি যে ম'লাম ঠাণ্ডায়।'

কে যেন দৌড়ে এল নদীর ধার দিয়ে। গ্রিগর চিনল, সে দুনিয়া। চেঁচিয়ে বলে উঠল:

—'জালের দড়ি পেয়েছিস?'

—'হ্যাঁ। এখানে বসে কি করছ তোমরা? বাবা এক্ষুনি বাঁকের মুখে যেতে বলল। এক বোরা-ভর্তি স্টারলেট ধরেছি আমরা।' তার কণ্ঠস্বরে প্রকাশ্য জয়ের ঘোষণা।

দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে করতে আর্কিসিনিয়া জালের ফুটোগুলো সেরে নিল। তারপর, গরম হবার জন্যে দুজনে প্রাণপণে ছুটল বাঁকের দিকে।

জলে ভিজে ফুলে ওঠা, ক্ষতবিক্ষত আঙুল দিয়ে সিগারেট পাকাচ্ছিল পান্তালিমন। হাত-পা ছুঁড়ে নেচে উঠল :

—'প্রথমবারে আট। দ্বিতীয়বার...,' একটু থেমে বোরার গায়ে পায়ের গুঁতো মেরে দেখিয়ে দিল। আর্কাসিনিয়া কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল; সদ্যধরা মাছগুলো খলবল করছে ভেতরে।

—'আর একবার নামতে হবে হাঁটু জলে। তারপর বাড়ি। নেমে পড়, গ্রীস্‌কা; দাঁড়িয়ে রইলি কেন?' বাপ বলল গ্রিগরকে।

অসাড় পা-দুটোকে টেনে নিয়ে গ্রিগর চলল। এমন কাঁপছিল আর্কাসিনিয়া, যে জালের আর এক কোণা ধরে গ্রিগর টের পাচ্ছিল তার কাঁপুনি।

—'জাল নাড়িওনা।'

—'আমি কি ইচ্ছে করে নাড়াচ্ছি। দমবন্ধ হয়ে আসছে আমার।'।

—'শোনো! গুঁড়ি মেরে এগুই চল। চুলোয় যাক মাছ।'

সেই মুহূর্তে জালের ভেতরে বিশাল একটা কার্প লাফিয়ে উঠল বোতলের ছিপির মত। গ্রিগর দ্রুতহাতে জালটা জড়িয়ে দিল। আর্কাসিনিয়া ছুটল নদীর পাড় ছেড়ে। বালির ওপরে নদীর জল আছড়ে পড়তে লাগল। একটা মাছ জালের ভেতরে খাবি খেতে লাগল।

—'মাঠের ভেতর দিয়ে ফিরবে?' আর্কাসিনিয়া জিজ্ঞেস করল।

—'জঙ্গলটা কাছে।' গ্রিগর উত্তর দিল।

ভ্রূকুটি করে ঘাঘরাটা গুটিয়ে নিল আর্কাসিনিয়া। হ্যাচকা টানে বোরাটা কাঁধের ওপরে তুলে নিল। তারপর প্রায় উর্ধশ্বাসে ছুটল। গ্রিগরও তুলে নিল জালটা। আধ পোয়াটেক রাস্তা এগুতে না এগুতেই আর্কাসিনিয়া কাতরাতে শুরু করল।

—'আর পারছি না। একটুও জোর নেই গায়ে।'

—'ওই দেখ, ওখানে একটা পুরনো খড়ের গাদা। ওর ভেতরে ঢুকে গা গরম করি গে চল।' গ্রিগর বুদ্ধি বাতলাল।

—'বেশ, তাই চল। বাড়ি যেতে হলে মরেই যাব আজ।'

গ্রিগর খড়ের গাদার মাথাটা খসিয়ে ফেলল। ভেতরটায় একটা ফোঁকড় তৈরি করে নিল। বহুদিন পড়ে-থাকা খড়ের গাদায় গরম, আর ভ্যাপসা গন্ধ। আর্কাসিনিয়াকে ডাকল :

—'একেবারে ভেতরে ঢুকে এসে বসো। এখানটায় উনুনের মত গরম।'

বোরাটা ফেলে দিয়ে খড়ের গাদায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দিল আর্কাসিনিয়া। শীতে কাঁপতে কাঁপতে তার পাশে গ্রিগর সটান শুয়ে পড়ল। মৃদু, উত্তেজক গন্ধ উঠতে লাগল আর্কাসিনিয়ার ভেজা চুল থেকে। মাথা পেছনে হেলিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল সে। আধেক হাঁ-করা মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে লাগল টেনে টেনে।

—'তোমার চুলে 'হেনবেন'-ফুলের গন্ধ। তুমি চেন সে ফুল, সাদা রঙের।' তার

দিকে ঝুঁকে পড়ে প্রায় ফিসফিস করে গ্রিগর বলল। কোন কথা বলল না আকসিনিয়া। কুয়াশাঘন দূরান্তের দৃষ্টি তার চোখে, নিবু নিবু টুকরো চাঁদের দিকে স্থির নিবদ্ধ।

পকেট থেকে হাতখানা বার করে আকসিনিয়ার মাথাটা হঠাৎ কাছে টেনে নিল গ্রিগর। হ্যাচকাটানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আকসিনিয়া উঠে দাঁড়াল খড়ের গাদার ওপরে। ধমক দিয়ে উঠল :

—'যেতে দাও আমাকে।'

—'চুপ, চুপ।'

—'যেতে দাও, নইলে চেঁচাব।'

—'আকসিনিয়া, দাঁড়াও!'

—'পান্তালিমন গো!'

—'পথ হারিয়েছিস নাকি?' খুব কাছেই একটা হথর্ণ ঝোপের পাশ থেকে পান্তালিমনের গলা শোনা গেল। দাঁতে দাঁত ঘসে খড়ের গাদা ছেড়ে লাফিয়ে বাইরে এল গ্রিগর। এগিয়ে আসতে আসতে বুড়ো জিজ্ঞেস করল :

—'কি রে চেঁচাচ্ছিস কেন? পথ হারিয়েছিস?'

খড়ের গাদার পাশে দাঁড়িয়ে আকসিনিয়া রুমালটা ঠিক করে নিতে লাগল। ধোঁয়া উঠতে লাগল তার গা থেকে। উত্তর দিল :

—'পথ হারাইনি। কিন্তু শীতে একেবারে জমে গেলাম যে।'

—'ওই ত, ওখানে একটা খড়ের গাদা রয়েছে। গা গরম করে নে।' বুড়ো তাকে দেখিয়ে দিল।

নীচু হয়ে বোরাটা তুলতে তুলতে আকসিনিয়া একটু মুচকি হাসল।

॥ তিন ॥

তাতার্স্ক গ্রাম থেকে সিয়েত্রোকোভের শিক্ষাশিবির প্রায় মাইল চল্লিশেক দূরে। একই ঢাকা-গাড়িতে চড়ে বসেছে পিয়োত্রা মেলেখফ আর স্তেপান আস্তাখফ, তাদের সঙ্গে রয়েছে গ্রামের আরও তিনজন : ফিয়োদোর বোদোস্কোভ—কালমিকদের মত মুখের গড়ন, মুখে বসন্তের দাগ, অল্পবয়সী এক কসাক; আতামান-রেজিমেণ্টের দু নম্বর সংরক্ষিত দলের ক্রিস্তোনিয়া তোকিন, আর গোলন্দাজ ইভান তোমিলিন। প্রথমবার বিশ্রামের পর গাড়ির সঙ্গে ক্রিস্তোনিয়া আর আস্তাখফের ঘোড়া দুটো জুড়ে নেওয়া হল। অন্য ঘোড়াগুলো পেছনে বাঁধা রইল। আতামান-রেজিমেণ্টের আর দশজনের মতই ক্রিস্তোনিয়ার শক্ত চেহারা, মাথায় ছিট্। সে লাগাম তুলে নিল। গাড়ির ভেতরে আলো আড়াল করে একেবারে সামনে এসে কুঁজো হয়ে বসল। ঘোড়া হাঁকাতে লাগল হেঁড়ে, ভারী গলায়। টান টান করে পাতা ত্রিপলের ওপরে শুয়ে পিয়োত্রা, স্তেপান আর তোমিলিন তামাক টানতে লাগল। বোদোস্কোভ পেছনে পেছনে হেঁটে চলল।

সবার আগে আগে ক্রিস্তোনিয়ার গাড়ি। পেছনে আরও সাত আটজন; জিন-কষা, জিন-ছাড়া ঘোড়াগুলো তাদেরও পেছনে। হাসির হর্রা, চিৎকার, গান, ঘোড়ার ডাক, আর খালি রেকাবের ঝনঝনানিতে মুখর হয়ে উঠল সারা পথ।

পিয়োত্রার মাথার নীচে বিস্কুটের থলে। শুয়ে শুয়ে পাশুটে রঙের গোঁফের ডগা পাকাচ্ছে সে। সে ডাকল :

—'স্তেপান?'

—'কি?'

—'এসো গান ধরি!'

—'বড় গরম। গলা শুকিয়ে উঠেছে।'

—'ধারেকাছে সরাইখানা নেই। ওর জন্যে বসে থেকে লাভ নেই।'

—'বেশ, ধরো গান। কিন্তু তুমি তো এ ব্যাপারে আনাড়ি।। হ্যাঁ, গায় বটে গ্রীস্কা। গলাতো নয়, আসল রুপোর তারে বাঁধা।'

মাথাটা পেছনে হেলিয়ে স্তেপান একটু কাশল। তারপর চাপা গলায় সুর করে গান ধরল,—সুর :

'সোনারবরণ সুয্যি ওঠে ওই আকাশের গায়।'

গালে হাত দিয়ে, সরু নাকীসুরে ধুয়ো ধরল তোমিলিন। হাসি হাসি মুখে পিয়োত্রা দেখতে লাগল, তার কপালের রগের গিঁটগুলো নীল হয়ে উঠল সঙ্গীত প্রচেষ্টায়।

'সেই যুবতী নদীর ঘাটে জল আনিতে যায়॥'

ক্রিস্তোনিয়ার দিকে মাথা রেখে শুয়েছিল স্তেপান, কনুইয়ে ভর দিয়ে তার দিকে ঘুরল :

—'কই হে ক্রিস্তোনিয়া, ধরো!'

'মনের কথা বুঝতে পারে রসিক নাগর ছোঁড়া,
আর অমনি ছুটিল তার লাল বাহারের ঘোড়া॥'

পিয়োত্রার দিকে হাসিমাখা মুখ ফেরাল স্তেপান। পিয়োত্রাও গলা মেলাল। ইয়া ইয়া দাড়িওয়ালা চোয়ালদুটোর বিরাট ফাঁক দিয়ে গর্জন করে ক্রিস্তোনিয়ার কণ্ঠ। সে গর্জনে তেরপলের ঢাকাটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

'আর অমনি ছুটিল তার লাল-বাহারের ঘোড়া।
পবনবেগে রসিক ছোঁড়া আগলে ধরে পথ॥'

গাড়ির মাথালের সঙ্গে খালি পা-দুটো ঠেকিয়ে রাখল ক্রিস্তোনিয়া। একটু থামল, যাতে পিয়োত্রা আবার গানের কলিটা ধরে নিতে পারে। চোখদুটো বুজে, ছায়ায় ঘর্মাক্ত মুখ রেখে, একটানা গেয়ে চলল স্তেপান—কখনো গলা নামিয়ে মৃদুকণ্ঠে, কখনো বা সপ্তমে চড়িয়ে।

'যুবতী গো, সদয় হয়ে, পুরাও মনোরথ,
জল দাও গো ঘোড়ার তরে, পরাণ রাখা দায়॥'

বুক কাঁপানো গর্জনে যোগ দিল ক্রিস্তোনিয়া। পাশের গাড়িগুলোও গানের কলি ধরে নিল। গাড়ির চাকা লোহার ফ্রেমে ধাক্কা খেতে লাগল, ঘোড়াগুলো ধুলোয় নাক ঝাড়তে লাগল। একটা সাদা ডানা-ওয়ালা পি-উইট পাখি রৌদ্রতপ্ত স্তেপের বুক থেকে শিস্ দিয়ে উড়ে গেল। উড়ে গিয়ে বসল একটা গর্তে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, গাড়ি চলেছে সারি সারি, ঘোড়ার খুরের চাটে সাদা ধুলোর মেঘ উড়ছে, রাস্তার ধার ঘেঁসে ধুলোমাখা সাদা পোশাকে মানুষগুলো হেঁটে চলেছে।

স্তেপান গাড়ির ভেতরেই উঠে দাঁড়াল। এক হাতে তেরপল ধরে, তাল দিতে লাগল আরেক হাতে। গান গেয়েই চলল সে। শিস্ দিতে লাগল বোদোস্কোভ।

ঘোড়ার দড়িতে টান পড়তে লাগল। গাড়ি থেকে ঝুঁকে হাসতে হাসতে টুপি দোলাতে লাগল পিয়োত্রা। হাসিতে ডগমগ হয়ে অভদ্রের মত কাঁধ দোলাতে শুরু করল স্তেপান। মেঘের মত ধুলো পথের রেখা ধরে পাক খেয়ে উঠতে লাগল। বেল্ট-খোলা লম্বা-সার্ট গায়েই গাড়ি থেকে ক্রিস্তোনিয়া লাফিয়ে নামল। তার ঘামে ভিজে চুলগুলো লেপটে গিয়েছে। চরকির মত ঘুরপাক খেয়ে, হেলেদুলে, ভুরু কুঁচকে, চাপা গর্জনে কসাক নাচ জুড়ে দিল সে; সিল্কের মত ধুসর-ধুলোর ওপর তার খালি পায়ের অতিকায় ছাপ পড়তে লাগল।

॥ চার ॥

বালির চুড়োওয়ালা এক ঢিবির ধারে এসে তারা রাতের মত থামল। মেঘ উঠে এল পশ্চিম থেকে। মেঘের কালো ডানা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি ঝরতে শুরু করল। একটা পুকুর থেকে ঘোড়াগুলোকে জলখাওয়ানো হল। বাতাসের মুখে বিষণ্ণ উইলো গাছগুলো বাঁধের ওপরে নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল। বদ্ধ পানায় ঢাকা, ছোট ছোট ঢেউ-এর দাগকাটা জলে আঁকাবাঁকাভাবে বিদ্যুতের ছায়া ঝলসাতে লাগল। বাতাসে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ছড়িয়ে দিতে লাগল মাটিতে, ধরিত্রীর প্রসারিত বাদামী হাতের চেটোয় যেন উজাড় করে দিতে লাগল দাক্ষিণ্যের সম্ভার।

পা-ছেঁদে চরতে দেওয়া হল ঘোড়াগুলোকে। তিনজন রইল পাহারায়। আর সকলে আগুন জ্বালাল; হাঁড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হল গাড়ির মাথার সঙ্গে।

ক্রিস্তোনিয়া জনার রাঁধছিল। হাতা নাড়তে নাড়তেই ফেঁদে বসল এক গল্প। তাকে ঘিরে বসে শুনতে লাগল কসাকেরা।

—'সে ঢিবিটা উঁচু হবে ঠিক এটার মতই। বাপকে বললাম, 'না জিজ্ঞেস করেই ত ঢিবিটা খুঁড়ছ, বাধা দেবে না আতামান?'

—'কি গুল মারছে ওটা?' ঘোড়ার কাছ থেকে ফিরে আসতে আসতে স্তেপান বলে উঠল।

—'বলছি, আমার আর বাবার গুপ্তধন খোঁজার গল্প। হ্যাঁ, ঢিবিটা ছিল মারকুলোভদের। বাপ বলল, আয়, ক্রিস্তোনিয়া, মারকুলোভদের ঢিবিটা খুঁড়ি। ওখানে টাকা পোঁতা আছে, কথাটা বাপ শুনেছিল ঠাকুর্দার কাছ থেকে। বাপও মানত করেছিল, ও টাকা আমায় পাইয়ে দাও, ভগবান। দিব্যি গির্জে বানিয়ে দেব তোমাকে। রাজী হলাম আমি। চললাম দুজনে। ও জায়গাটা বারোয়ারি। বাধা দিলে, একমাত্র আতামানই বাধা দিতে পারে। আমরা পৌঁছুলাম বিকেলের দিকে। যতক্ষণ না রাত হয়, বসে রইলাম দুজনে। তারপর শাবল দিয়ে খুঁড়তে শুরু করলাম চুড়োর দিক থেকে। হাত চারেক গর্তও খুঁড়ে ফেললাম। মাটি ত নয়, যেন পাথর। ঘেমে নেয়ে উঠলাম আমি। বাপ বিড়বিড় করে মন্তর পড়তে লাগল। আর, বিশ্বাস করো ভাইসব, পেটে আমার ভীষণভাবে পাক দিয়ে উঠতে লাগল...জানই ত, গ্রীষ্মে আমরা খাই কি: ঘোল আর ক্ভাস্ মদ। বাপ ধমকে উঠল, বেটা নাস্তিক! মন্তর পড়ছি আমি, তোর পেটে কি থাকতে পারে কিছু। বমির গন্ধে দম আটকে আসছে,

বেরিয়ে আয় গর্ত থেকে...নইলে মাথা ফাঁক করে দেব শাবলের ঘায়ে। তোর জন্যেই মাটিতে আরও সেঁধিয়ে যাবে গুপ্তধন। বাইরে এসে পেট ধরে বসে রইলাম আমি। আর আমার বাপ—ইয়া তাগড়াই চেহারা—একাই শুরু করল গর্ত খুঁড়তে। খুঁড়তে খুঁড়তে খুঁড়তে, পাওয়া গেল একখানা পাথরের থালা। বাপ ডাকল আমাকে। সোজা তার নীচে শাবল চালিয়ে দিয়ে চাড় দিতেই উঠে এল পাথরের থালাটা। সেদিন ছিল জোছনা রাত, বিশ্বাস কর ভাইসব, থালার নীচেটা এমন চকচক করে উঠল...'

—'এবার কিন্তু গুল দিচ্ছিস ক্রিস্তোনিয়া।' বাধা দিয়ে পিয়োত্রা বলে উঠল। হাসতে হাসতে গোঁফের ডগা পাকাতে লাগল।

—'গুল দিচ্ছি? গুল হতে যাবে কেন? যিশুর দিব্যি! চকচক করে উঠল চোখের সামনে। তাকিয়ে দেখলাম, একগাদা কাঠ-কয়লা। প্রায় চল্লিশ বুশেল হবে। বাপ বলল, ভেতরে ঢুকে খোঁড়। আমি ত খুঁড়েই চললাম। খুঁড়তে খুঁড়তে ভোর হয়ে এল। তাকাতেই, দেখলাম ব্যাটাকে...ব্যাটা ঠিক হাজির।'

—'কে রে?' তোমিলিন জিজ্ঞেস করল।

—'আবার কে, আতামান। যাচ্ছিল ঘোড়ায় চেপে, দেখে ফেলেছে। 'হুকুম নিয়েছ কার?' মাথায় উঠল গুপ্তধন খোঁজা। বামাল শুদ্ধ আমাদের চালান করে দিল গ্রামের বাইরে। আর বছর সমন এল কামিনস্কায়ার আদালত থেকে। বাপ কিন্তু বিপদটা আঁচ করেছিল, তাই সরে গেল আগেভাগে। আমরাও লিখে পাঠালাম, সে ত ছিল না আসামীদের মধ্যে।'

সেদ্ধকরা জনারের হাঁড়িটা খুলে নিয়ে, হাতার খোঁজে ক্রিস্তোনিয়া চলে গেল গাড়ির দিকে। ফিরে আসতেই স্তেপান জিজ্ঞেস করল :

—'তারপর! বাপের কি হল? মানত করেছিল, গির্জে বানাবে। বানিয়েছিল?'

—'আচ্ছা, মুখ্খু তো তুই স্তেপান। কাটকয়লা দিয়ে বানাবে কোন মাথামুণ্ডু?'

—'কয়লাই উঠুক, আর সোনাই উঠুক, তা নিয়ে ত আর কোনো চুক্তি হয় নি...' হাসির হর্‌রায় আগুনের শিখা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। হাঁড়ি থেকে মুখ তুলল ক্রিস্তোনিয়া। হাসির অর্থ বুঝতে না পেরে, বজ্রগর্জনে সব কিছু ডুবিয়ে দিল।

॥ পাঁচ ॥

স্তেপান আস্তাখফের যখন বিয়ে হয়, আকসিনিয়ার বয়স তখন সতর। ডনের অপরপ্রান্তে দুব্রোভ্‌কা গ্রামে তার বাপের বাড়ি।

বিয়ের প্রায় বছরখানেক আগে, গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে সে স্তেপেতে হাল চষতে গিয়েছিল। সেইসময় একদিন রাত্রে তার বাপ—বয়স তখন বছর পঞ্চাশেক—হাত বেঁধে ধর্ষণ করেছিল তাকে।

—'খুন করে ফেলব টুঁ শব্দ করলে। না চেঁচালে, রেশমের জ্যাকেট, আর গোড়ালি-আঁটা গোলোশ্ কিনে দেব। শুনছিস, খুন করে ফেলব, যদি...' এমনি করে তার বাপ ধমকেছিল।

সেই রাত্রে, ছেঁড়া পেটিকোটেই বাড়িতে ছুটে এসেছিল আকসিনিয়া। মায়ের

পায়ের ওপর আছড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলেছিল সব। মা, আর বড় ভাই তাড়াতাড়ি গাড়িতে ঘোড়া যুতে, আর্কসিনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে তখনই চলে এসেছিল বাপের কাছে। বড় ভাই ঘোড়াগুলোকে পাঁচ-মাইল পথ এমন ছোটানোই ছুটিয়েছিল যে, তারা মরে আর কি! বাপের দেখা পেয়েছিল ক্ষেতের চালার পাশে। ভদ্‌কার খালি বোতল পাশে রেখে, ওভার-কোটের ওপরে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল মাতাল বাপ। আর্কসিনিয়ার চোখের সামনেই বড় ভাই গাড়ির হুড়কোটা খুলে নিয়ে, বাপকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে, দুটো একটা কথা জিজ্ঞেস করে কি না করেই, লোহার হুড়কো দিয়ে দুই ভুরুর মাঝখানে ধাঁই করে বাড়ি কসিয়ে দিয়েছিল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে পিটিয়েছিল সে, আর তার মা। অমন শান্তশিষ্ট বুড়ি মা অজ্ঞান স্বামীর চুলগুলো ক্ষিপ্ত হয়ে মুঠো মুঠো করে ছিঁড়েছিল। ভাই চালিয়েছিল লাথি। আর, ঠক ঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে, মাথা ঢেকে গাড়ির নীচে পড়েছিল আর্কসিনিয়া। সকালের আগেই তারা বাপকে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। বাপ শুয়ে শুয়ে গোঙাতে শুরু করেছিল। চোখদুটো ঘরের চারপাশে খুঁজে বেড়িয়েছিল আর্কসিনিয়াকে। সে তখন পালিয়েছে। ফাটা কানের পাশ থেকে বালিশে রক্ত আর ঘিলু ঝরে পড়েছিল। বাপ মরে গেল সন্ধ্যের দিকে। পাড়া-পড়শিকে তারা বলেছিল, গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে বাপের ওই দশা হয়েছে।

একবছরের মধ্যেই সাজানো-গোজানো এক গাড়িতে চড়ে ঘটকরা আর্কসিনিয়ার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এল। লম্বা, খাড়া-নাক, দীর্ঘদেহ স্তেপান ভাবী বধুকে পাকা দেখা করে গেল। বিয়ের দিন ঠিক করে গেল সামনের শরতেই।

সে দিনটা তুষারাচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা কনকনে। আস্তাখফ বাড়ির নতুন গিন্নির পদে বহাল হল আর্কসিনিয়া। ফুলশয্যার রাত ভোর না হতেই, ঢেঙা চেহারার বুড়ী শাশুড়ী জাগিয়ে দিল তাকে। কি এক মেয়েলি অসুখে বুড়ী একেবারে অষ্টাবক্র। আর্কসিনিয়াকে নিয়ে এল রান্নাঘরে। উদ্দেশ্যহীনভাবে এটা ওটা সরাতে সরাতে অবশেষে বলল :

—'সোহাগ কাড়াতে, কিংবা শুয়ে বসে দিন কাটাতে তোমায় ঘরে আনি নি বৌমা। এখন গিয়ে গরু দুয়ে, খাবার তৈরি করে রাখ। বুড়ী হয়েছি, শক্তিও কমে গেছে। ঘরদোরের ভার তোমাকেই বুঝে নিতে হবে। সবই ত তোমার ঘাড়ে পড়ল।'

সেইদিনই স্তেপান তার নতুন বৌকে গোলাঘরে নিয়ে গিয়ে ইচ্ছে করেই ভীষণ মার মারল। পেটে মারল, বুকে, পিঠে মারল, খেয়াল রাখল যাতে অন্যের চোখে মারের দাগ ধরা না পড়ে। তারপর অনেকদিন তার দিকে ফিরেও তাকাল না। দিন কাটাতে লাগল ঝগড়ুটে, এঁড়ে-ষাঁড়িগুলোর সঙ্গে। ঘরে কিংবা গোলায় আর্কসিনিয়াকে আগে তালা দিয়ে, বেরিয়ে যেতে লাগল প্রায় রাতেই।

আঠার মাস কেটে গেল তবু আর্কসিনিয়ার ছেলেপুলে হল না। এ-লজ্জার জন্যে স্তেপান তাকে ক্ষমা করতে পারল না। কিছুদিন পরে আবার শান্ত হয়ে গেল সে। কিন্তু ক্বচিৎ বুকে জড়িয়ে ধরত বৌকে: রাত্রে খুব কমই থাকত বাড়িতে।

বিরাট গোলাবাড়ির একগাদা গরু-বাছুর নিয়ে আর্কসিনিয়া বাঁধা রইল কাজে। স্তেপান কাজে কুঁড়ে। তামাক খেতে বেরুত, তাস পিটত, দুনিয়ার খবর জোগাড় করে বেড়াত। সব কাজই করতে হত আর্কসিনিয়াকে। শাশুড়ীর যা সাহায্য পাওয়া যেত তা অতি সামান্যই। ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটু আধটু ঘুরেই বুড়ী ধপ্ করে বিছানায় শুয়ে পড়ত। দাঁতে দাঁত চেপে, বড় বড় চোখে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে, শুয়ে

শুয়েই কাতরাত, আর যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খেত। কাজকর্ম ফেলে আর্কাসিনিয়া এক কোণে লুকিয়ে, আতঙ্ক আর করুণার দৃষ্টিতে শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত।

বিয়ের প্রায় আঠার মাস পরে বুড়ী মারা গেল। সকালবেলায় ব্যথা উঠল আর্কাসিনিয়ার। দুপুরের দিকে, নাতি ভূমিষ্ঠ হবার ঘণ্টাখানেক আগে, আস্তাবলের দরজায় মুখ থুবড়ে পড়ল ঠাকুমা। মাতাল স্তেপানকে ঘরে ঢুকতে বারণ করতে দাই ছুটেছিল, দেখতে পেল, দুমড়ান পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে বুড়ী। ছেলে হবার পর স্বামীর কাজে আর্কাসিনিয়া মন ঢেলে দিল। শুধু তিক্ত মেয়েলি করুণা, আর অভ্যাসের প্রেরণা ছাড়া, স্বামী সম্পর্কে তার আর কোন মনোভাবই রইল না। বছরখানেকের মধ্যেই ছেলেটা মারা গেল। আবার ফিরে এল সেই পুরনো তিক্ত জীবন। আর, আর্কাসিনিয়ার পথ দিয়ে যখন গ্রিগর মেলেখফ হেঁটে যেত, আতঙ্কিত বিস্ময়ে অনুভব করত, ওই তরুণের দিকে সে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে গ্রিগরও তার আশায় প্রতীক্ষা করতে লাগল। আর্কাসিনিয়া জানত, গ্রিগর ভয় করে না স্তেপানকে; বুঝতে পারত, স্তেপানের ভয়ে পিছিয়ে যাবে না কিছুতেই। সচেতন মনে গ্রিগরকে কামনা না করলেও, প্রাণপণ শক্তিতে নিজের মনোভাব দমন করলেও, আর্কাসিনিয়ার চোখে পড়ত, রবিবার কিংবা কোন ছুটির দিনে সে বেশ-বিন্যাস করে নিপুণভাবে। গ্রিগরের যাবার পথে ছল করে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হয় তার। যখন দেখত, সমস্ত কামনা আর বাসনা নিয়ে গ্রিগরের দৃষ্টি তাকে আলিঙ্গন করছে, তখন গর্বিত হয়ে উঠত মনে মনে। একদিন সকালে উঠে গরু দুইতে গিয়ে হাসল সে, অকারণেই তার মনে হল: 'আজ দিনটা এত ভাল লাগছে! কিন্তু কেন? . .কেন?...ওহো, গ্রিগর...গ্রীস্কা।' নতুন এই অনুভূতিতে আতঙ্কিত হয়ে উঠল আর্কাসিনিয়া। মনে মনে আরও সতর্ক, আরও উৎকর্ণ হয়ে উঠল সে, যেন মার্চ মাসের ডনের চিড়ধরা বরফের ওপর দিয়ে পথ হাতড়ে চলেছে।

স্তেপানকে ফৌজী-শিবিরে পাঠিয়ে আর্কাসিনিয়া ঠিক করল, যত কম পারে গ্রিগরের সঙ্গে দেখা করবে। মাছধরার ব্যাপারের পর থেকে আরও স্থির হয়ে উঠল তার সিদ্ধান্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

ট্রিনিটি-পরবের দিন দুয়েক আগে গ্রামের ঘাস-জমির ভাগাভাগি হল। ভাগ করার সময় পান্তালিমন হাজির ছিল। বাড়ি ফিরল খাবার সময়। মৃদু আর্তনাদ করে ছুঁড়ে ফেলে দিল বুটজোড়া, তারপর ক্লান্ত পা-দুটো ঘ্যাজ ঘ্যাজ করে চুলকোতে চুলকোতে জানাল:

—'আমাদের অংশটা পড়েছে লাল-পাহাড়ের কাছে। ঘাস হিসেবে খুব ভাল ঘাস নয়। ওপরের দিকটা বনের ধারে গিয়ে ঠেকেছে। জায়গায় জায়গায় শুধু ঝোপঝাড়।'

—'কাটতে শুরু করব কবে থেকে?' গ্রিগর জিজ্ঞেস করল।

—'পরশুর পর।'

ঘটাং করে উনুনের দরজা খুলে বুড়ী বাঁধাকপির গরম করা ঝোলটা বার করে আনল। খাবার সামনে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল পান্তালিমন, সারাদিনের ঘটনা, আর বদমাশ আতামানের কাহিনী বলতে লাগল; বদমাশটা কসাকদের গোটা দলকে শুধু ঠকাতে বাকি রেখেছে।

—'ঘাস শুকিয়ে কে গাদা করবে, বাবা?' ভয়ে ভয়ে দুনিয়া জিজ্ঞেস করল। 'আমি ত একা একা পেরে উঠব না।'

—'আকসিনিয়া আস্তাখফকে ডেকে নেব। স্তেপান তার অংশের ঘাস কাটতে বলে গিয়েছে।'

দুদিন পরে এক সকালে পা-সাদা ঘোড়াটা ছুটিয়ে, মিত্‌কা করশুনফ এসে থামল মেলেখফদের বাড়ির উঠোনের সামনে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। গ্রামের ওপরে ঝুলছে একখানা কুয়াসার পুরু পর্দা। জিনের ওপর থেকেই মিত্‌কা নীচু হয়ে হুড়কোটা খুলল, একেবারে ভেতরে চলে এল। সিঁড়ির ওপর থেকেই বুড়ী চেঁচিয়ে উঠল :

—'এই, হারামজাদা, কি চাই তোর?' স্পষ্ট বিরক্তিমাখা গলায় বুড়ী জিজ্ঞেস করল। ডানপিটে, ঝগড়ুটে মিত্‌কার জন্যে একটুও মমতা নেই বুড়ীর।

—'বলি, তোমার দরকারটা কি, বুড়ী?' সিঁড়ির রেলিংএর সঙ্গে ঘোড়া বাঁধতে বাঁধতে মিত্‌কা পাল্টা প্রশ্ন করল।

—'আমি চাই গ্রিগরকে। কোথায় সে?'

—'ওইত ঘুমুচ্ছে চালার নীচে। কিন্তু বাত ধরেছে নাকি? ঠ্যাং দুটো কি চুলোয় গেছে যে, কেবলই ঘোড়ার পিঠে ঘুরবি?'

—'বুড়ীর কেবল বাগড়া দেওয়া!' চটে গেল মিত্‌কা। পালিশ করা বুটে চমকদার চাবুকের ঘা মরতে মারতে চলে গেল গিগ্রারের খোঁজে। দেখতে পেল, একটা গাড়ির ভেতরে গ্রিগর ঘুমুচ্ছে। যেন তাক করছে এমনভাবে বাঁ-চোখটা কুঞ্চিত করে গ্রিগরের চুল ধরে টান মারল।

—'ওঠ, চাষা।'

যতরকমের গাল আছে, তার মধ্যে 'চাষা' কথাটাই মিত্‌কার কাছে সবচেয়ে জঘন্য গাল। গ্রিগর তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

—'কি রে, কি মতলব করে?'

মিত্‌কা গাড়ির একপাশে বসে পড়ল। একটা কাঠি দিয়ে বুটের গা থেকে শুকনো কাদা ঘসে তুলতে তুলতে বলল :

—'আমায় অপমান করেছে, গ্রীস্‌কা।'

—'তাই নাকি?'

—'বুঝলি, ব্যাটা...,' খিস্তি করে উঠল মিত্‌কা। 'ব্যাটা বলে, সে নাকি ট্রুপ-কমাণ্ডার।' মুখ না খুলেই কথাগুলো যেন ছুঁড়ে মারল সে। পা দুটো কাঁপতে লাগল। গ্রিগর উঠে বসল।

—'কোন ট্রুপ-কমাণ্ডার?'

গ্রিগরের হাতদুটো চেপে ধরে শান্ত গলায় মিত্‌কা বলল :

—'ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এক্ষুনি চল মাঠে। দেখিয়ে দেব ওকে! ব্যাটাকে বলেছি: আসবেন, হুজুর, আমরাও দেখে নেব।' ব্যাটা বলল, 'ইয়ার-দোস্তদেরও সঙ্গে এনো।

হারিয়ে দেব সব কটাকে। পিতর্সবুর্গে অফিসারদের দৌড়ে প্রাইজ পেয়েছিল আমার ঘোড়ার মা।' ওর ঘোড়াই হক, আর তার মা-ই হক, তাতে আমার কি? নিকুচি করি ওদের! আমার ঘোড়াকে হারাতে আমি কিছুতেই দেব না!'

গ্রিগর তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় পরে নিল। রাগে গরগর করতে করতে মিত্কা তাড়া দিতে লাগল।

—'মোখফদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে ব্যাটা। দাঁড়া, নামটা যেন কি? মনে হচ্ছে, লিস্তনিৎস্কি। গাঁট্টা-গোট্টা, হোমড়াচোমড়া চেহারা, চোখে চশমা। আচ্ছা, দাঁড়াও না! ও চশমায় কুলবে না; ঘোড়া আমি ধরতে দিচ্ছি না।'

একটু হেসে, বুড়ী ঘোড়াটায় জিন চাপাল গ্রিগর। বাবার চোখে যাতে না পড়ে, সেইজন্যে মাড়াই-উঠোনের গেট দিয়ে স্তেপেতে বেরিয়ে এল। মাঠের মধ্যে একেবারে পাহাড়ের চড়োয় এসে দাঁড়াল। একটা শুকনো এ্যাশ্-গাছের কাছে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল ঘোরসওয়াররা : একটা সুন্দর, বলিষ্ঠ গড়নের ঘোড়ার পিঠে অফিসার লিস্তনিৎস্কি, আর জিন-ছাড়া ঘোড়ার পিঠে গ্রামের ছেলেদের সাতজন।

—'কোথা থেকে শুরু হবে দৌড় ?' প্যাঁশনেটা ঠিক করে নিয়ে মিত্কার দিকে ফিরল অফিসার, ঘোড়াটার বুকের শক্ত পেশিগুলোর তারিফ করতে লাগল।

'এই এ্যাশ-গাছ থেকে জারের দহ পর্যন্ত।'

—'জারের দহটা কোথায়?' চোখে কম দেখে এমনভাবে ভুরু কোঁচকালো লিস্তনিৎস্কি।

—'ওখানে, হুজুর, ওই বনের কাছে।'

ঘোড়ায় চেপে সার বেঁধে দাঁড়াল সবাই। মাথার ওপরে চাবুক তুলে ধরল অফিসার।

—'যখন তিন বলব। ঠিক আছে? এক...দুই...তিন।'

জিনের-ধনুকের ওপরে নুয়ে পড়ে, হাত দিয়ে টুপিটা চেপে ধরে, আগে বেরিয়ে গেল লিস্তনিৎস্কি। মুহূর্তের জন্যে আগেই রয়ে গেল সে। ছাই-এর মত ফ্যাকাশে-মুখে মিত্কা দাঁড়িয়ে উঠল রেকাবের ওপরে—গ্রিগরের মনে হল, ঘোড়ার পাছায় চাবুক কসাতে বড়ই দেরি করে ফেলছে মিত্কা।

জারের দহ প্রায় দুমাইল হবে। আধাআধি পথ থাকতেই মিত্কার ঘোড়াটা তীরের মত ছুটে গিয়ে লিস্তনিৎস্কির ঘোড়াকে ধরে ফেলল। প্রথম থেকেই পেছনে পড়েছিল গ্রিগর. ঘোড়-সওয়ারদের এলোমেলো দলটাকে দেখতে দেখতে, দুলকি চালে সে এগুতে লাগল।

জারের দহের ধারে একটা বালির পাহাড়, যুগ যুগান্তর ধরে ধুয়ে নেমেছে। উটের পিঠের মত হলদে রঙের কুঁজটা কাঁটাঝোপে ঢেকে গিয়েছে। অফিসার আর মিত্কাকে পাহাড়ে উঠে চুড়োর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল গ্রিগর। আর সকলে পিছনে পিছনে ছুটে গেল। যখন দহে গিয়ে পৌঁছল, ততক্ষণে লিস্তনিৎস্কিকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ঘোড়-সওয়াররা। চাপা উল্লাসে ঝলমল করছে মিত্কা, প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গিতে বিজয়ের স্বাক্ষর। যা ভেবেছিল, অফিসারের ভাবটা তার ঠিক উল্টো, একটুও বিচলিত মনে হল না তাকে। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে সে সিগারেট টানছে। মুখে ফেনা ওঠা ঘোড়াটার দিকে আঙুল তুলে বলল :

—'একশ কুড়ি মাইল ছুটিয়েছি ওকে। গতকালই স্টেশন থেকে এসেছি ওর পিঠে চেপে। যদি তাজা থাকত, কিছুতেই আমাকে ধরতে পারতে না, করশুনভ।'

—'তা হবে।' উদার ভঙ্গিতে মিত্‌কা বলল।

আর সবাইকে ফেলে রেখে, পাহাড়টা ঘ্‌রে বাড়ির দিকে চলল গ্রিগর আর মিত্‌কা। লোক দেখানো ভদ্রতা করে বিদায় নিল লিস্তনিৎস্কি। টুপির ডগায় দ্‌টো আঙ্‌ল ছ্‌ইয়েই ম্‌খ ঘ্‌রিয়ে চলে গেল।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই গ্রিগর দেখতে পেল, আকসিনিয়া তার দিকেই আসছে। চলতে চলতে একটা ডালের ছাল ছাড়াচ্ছে। তার দিকে নজর পড়তেই মাথাটা নিচু করল।

সোজা তাকিয়ে গ্রিগর প্রায় আকসিনিয়ার ঘাড়ের ওপর এনে ফেলল ঘোড়াটাকে, তারপর হঠাৎ শান্তশিষ্ট, ঢিমেতেতালা ঘোড়াটাকে চাব্‌কের খোঁচা মেরে বসল। পেছনের দ্‌পায়ে ভর দিয়ে বসে পড়ল ঘোড়া, একরাশ কাদা ছিটিয়ে দিল আকসিনিয়ার সারা গায়ে।

—'আচ্ছা বদমাশ তো!' আকসিনিয়া চে'চিয়ে উঠল।

বোঁ করে ঘ্‌রে, উত্তেজিত ঘোড়াটাকে আকসিনিয়ার পাশে এনে ফেলে, গ্রিগর জিজ্ঞেস করল:

—'একটুও সময় করে উঠতে পার না?'

—'তুমি তার য্‌গ্যি নও!'

—'সেইজন্যেই তো কাদা ছিটিয়ে দিলাম। অত দেমাক দেখাবে না!'

—'যেতে দাও!' ঘোড়ার নাকের ডগায় হাত নেড়ে আকসিনিয়া চে'চিয়ে উঠল: 'গায়ের ওপর ঘোড়া উঠিয়ে দিচ্ছ কিসের জন্যে?'

—'এটা ঘোড়া নয়, ঘ্‌ড়ী।'

—'ওসব কিচ্ছ্‌ ব্‌ঝি না; যেতে দাও।'

—'চটছ কিসের জন্যে, আকসিনিয়া? সেদিনকার সেই মাঠের ব্যাপারের জন্যে নিশ্চয়ই না?'

গ্রিগর তার চোখের দিকে তাকাল। আকসিনিয়া কি যেন বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু হঠাৎ কালোচোখের কোণে একফোঁটা জল এসে পড়ল, ঠোঁটদ্‌টো কর্‌ণভাবে কে'পে উঠল। শিউরে উঠে ধরা-গলায় ফিসফিস করে বলল:

—'তুমি যাও, গ্রিগর...রাগ করি নি...আমি...।' তারপর চলে গেল সে।

বিস্মিত গ্রিগর, মিত্‌কাকে এসে ধরল গেটের কাছে। মিত্‌কা জিজ্ঞেস করল:

—'সন্ধ্যেবেলায় আসছিস ত?'

—'না।'

—'কেন, কি হল আবার? ওঁর সঙ্গে রাতকাটানোর নেমন্তন্ন করে গেলেন নাকি?'

গ্রিগর হাত দিয়ে কপালের ঘাম ম্‌ছল, কোন উত্তর দিল না।

॥ দুই ॥

গ্রামের ঘরে ঘরে 'ট্রিনিটি'-পরবের চিহ্ন হিসেবে শুধু পড়ে রইল মেঝের ওপরে ছড়ানো শুকনো 'টিম্'-লতা, পায়ে মাড়ানো পাতার গুঁড়ো, ভাঙা ওক্-ডালের শুকনো, কোঁচকানো পাতা, আর গেটে, ফটকে লটকানো এ্যাশ্-গাছের ডাল-পালা।

'ট্রিনিটি'-পরবের ঠিক পরেই শুরু হল ঘাসকাটা। মেয়েদের পরবের ঘাঘরা, চটকদার নক্সাতোলা অঙ্গরাখা, আর রঙিন রুমালে সেই ভোর থেকেই মাঠ করতে লাগল ঝলমল। গোটা গ্রামই মাঠে নেমে পড়েছে। ঘেসেড়া, আর ঝাড়াই যারা করে—সবাই সেজেছে পরবের সাজে। এই রকমই হয়ে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকে। ডনের প্রান্ত থেকে সুদূর অন্ডার- ঝোপ পর্যন্ত বিপর্যস্ত মাঠ, প্রান্তর টগবগ করছে প্রাণ-স্পন্দনে।

মেলেখফদের রওনা হতে দেরি হল। যখন রওনা হল, ততক্ষণে আধখানা গ্রামই নেমে পড়েছে।

—'ঘুম ভাঙতে দেরি হয় বুঝি, পান্তালিমন প্রোকোফিয়েভিচ!' ঘর্মাক্ত ঝাড়াই-ওয়ালারা কলরব করে উঠল।

—'দোষ আমার নয়...মেয়েদের সেই চিরাচরিত!' বুড়ো হাসল, তাড়া দিয়ে বলদের পিঠে কাঁচা-চামড়ার চাবুকের ঘা কসিয়ে দিল।

গাড়ির পেছনে বসেছে আকসিনিয়া। রোদ বাঁচাতে মুখটা একেবারে ঢেকে রেখেছে। চোখের জন্যে সরু ফাঁক দিয়ে শান্ত, কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গ্রিগরের দিকে। গ্রিগর বসেছে তার ঠিক উল্টো দিকে। দারিয়াও রবিবারের সেরা পোষাকে সেজেগুজে, ঢেকে বসে আছে। গাড়ির সিঁড়ির দুদিকে পা ঝুলিয়ে বসে কোণের আধ-ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে মাই দিচ্ছে। সারা রাস্তা নাচতে নাচতে চলেছে দুনিয়া। দু-পাশের লোকজন, মাঠঘাট, সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তার খুশিতে-উপচে-পড়া চোখদুটো।

সুতির সার্টের আস্তিনটা গুটিয়ে নিয়ে টুপির নীচে দিয়ে গড়িয়ে নামা ঘাম মুছল পান্তালিমন। তার ঝুঁকে-পড়া পিঠে আঠার মত লেপ্টানো সার্টের গায়ে ঘামে ভেজা কালো কালো দাগ ফুটে উঠল। ধূসর মেঘের পুঞ্জ ভেদ করে সূর্য উঁকি মারল তীর্যক চোখে। মাঠের ওপরে, গ্রামের গায়ে, ডনের সুদূর রুপালী পাহাড়ে পাহাড়ে ধোঁয়াটে, তীর্যক সূর্যালোক ছড়িয়ে পড়ল।

গুমোট দিন। তন্দ্রাচ্ছন্নের মত ভেসে চলেছে টুকরো টুকরো মেঘ, এত মন্থর গতিতে চলেছে যে, পান্তালিমনের গাড়িটানা বলদ দুটোকেও ছাড়িয়ে যেতে পারছে না। বুড়ো নিজেও চাবুক তুলে দোলাচ্ছে আস্তে আস্তে, অস্থিসার বলদের পাঁজরে মারবে কি মারবে না, যেন সেই সন্দেহে পড়েছে। আর স্পষ্টই তা বুঝতে পেরে বলদ দুটো তাড়াতাড়ি চলার চেষ্টাও করছে না, পা ফেলছে তেমনি ধীর, মন্থর চালে। তাদের মাথার ওপরে গোল হয়ে ঘুরছে একটা ধুলোটে-সোনালী কমলা-ছোপ দেওয়া ডাঁশ।

-'ওই আমাদের অংশ।' পান্তালিমন চাবুক দিয়ে দেখিয়ে দিল।

'গ্রিগর শ্রান্ত বলদ দুটোকে ছেড়ে দিল। অংশের শেষ দিকে যে দাগ কেটে এসেছিল, তাই দেখতে গেল বুড়ো। কানে মাকড়ি দুটো চকচক করে উঠল।

একটু পরে হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলল :

'কাস্তেগুলো আন।'

ঘাস মাড়িয়ে, পেছনে ঢেউ-খেলানো পায়ের দাগ ফেলে গ্রিগর এগিয়ে গেল তার কাছে। দূরের গির্জার ঘণ্টা-চূড়োর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পান্তালিমন ক্রশ করল। নতুন বার্নিশের মত চকচক করে উঠল তার বাঁকা নাকটা, তামাটে গালের খাঁজে খাঁজে ঘাম টলটল করতে লাগল। একটু হাসল সে; দাঁড়কাকের মত কালো কুচকুচে দাড়ির ফাঁক দিয়ে সাদা দাঁত ঝকঝক করে উঠল। তারপর, খাঁজকাটা ঘাড়টা ডাইনে একটু কাত করে কাস্তেটা ঘাসের মধ্যে চালিয়ে দিল। কাটাঘাসের একটা হাত-পাঁচেক অর্ধবৃত্ত তার পায়ের কাছে পড়ে রইল।

কাস্তের ঘায়ে ঘাস নামিয়ে দিতে দিতে গ্রিগর বাপের পেছন পেছন চলল। মেয়েদের অঙ্গ-রাখাগুলো তার চোখের সামনে রামধনুর সপ্তবর্ণছটা মেলে ধরল, তার চোখ কিন্তু খুঁজে ফিরতে লাগল একটিকে—নক্সাকাটা একটি সাদা অঙ্গ-রাখা শুধু; আকসিনিয়ার দিকে তাকাল সে, তারপর বাপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘাস কাটতে শুরু করল।

তার সর্বক্ষণের চিন্তায় শুধুই আকসিনিয়া। চোখদুটো আধেক বুজে সে কল্পনা করতে লাগল, নির্লজ্জভাবে আকসিনিয়াকে চুমু খাচ্ছে মমতাভরে, তপ্ত বাক্যবিন্যাসে কথা বলে চলেছে তার সঙ্গে, কোথা থেকে জাগছে সে ভাষা তা তার জানা নেই। অবশেষে এ চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিল, আবার পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল...এক... দুই... তিন; অতীতের টুকরোটাকরা দৃশ্য ভেসে উঠল স্মৃতিতে ..বসে আছে ভেজা খড়ের গাদায়...চাঁদ উঠেছে মাঠের ওপরে...অনেকক্ষণ পর পর ঝোপের গা থেকে ডোবায় জল ঝরে পড়ছে...এক...দুই...তিন...মধুর! আহা, কি মধুরই না ছিল!

পেছন থেকে হাসির আওয়াজ কানে এল গ্রিগরের। সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল : দারিয়া শুয়ে আছে গাড়ির নীচে, আর মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ে আকসিনিয়া কি যেন তাকে বলছে। হাত নাড়ল দারিয়া, দুজনেই আবার হেসে উঠল।

—'ওই ঝোপটা অবধি যাব, তারপর কাস্তে নামিয়ে রাখব।' গ্রিগর মনে মনে ভাবল। আর সেই মুহূর্তেই গ্রিগর বুঝতে পারল কাস্তের টানে নরমমত কি যেন একটা কেটে এল। গ্রিগর ঝুঁকে পড়ল : বুনো হাঁসের ছোট্ট একটা বাচ্চা কিচ্‌কিচ্‌ করতে করতে ঘাসের মধ্যে ছুটে পালাল। যেখানটায় বাসা ছিল তার গর্তের কাছে উল্টে পড়ে আছে আর একটা, কাস্তের টানে দুটুকরো হয়ে গিয়েছে। হাতের চেটোয় মরা পাখির বাচ্চাটা তুলে নিল গ্রিগর। কয়েকদিন আগেই ডিম ফুটে বেরিয়েছিল, গায়ে এখনো জীবনের উষ্ণতা। অকস্মাৎ মমতার এক তীব্র অনুভূতিতে হাতের নিশ্চল মাংসপিণ্ডটির দিকে তাকিয়ে রইল গ্রিগর।

—'কি পেয়েছ, গ্রীস্‌কা?' ঘাস কাটা রাস্তা ধরে নাচতে নাচতে ছুটে এল দুনিয়া, তার বিনুনি দুটো বুকের ওপর দুলতে লাগল। ভুরু কুঁচকে হাঁসের বাচ্চাটা ছুঁড়ে দিয়ে, রুষ্ট মনে গ্রিগর আবার ঘাস কাটতে শুরু করল।

খাওয়াদাওয়ার পর ঘাস ঝাড়াই করল মেয়েরা। রোদে ফেসে শুকিয়ে নেওয়া ঘাস থেকে চাপা, শ্বাসরোধী গন্ধ উঠতে লাগল। তাড়াহুড়ো করে খাওয়ার পাট চুকিয়ে নেওয়া হল। চর্বিওয়ালা মাংস, আর কসাকদের সর্বক্ষণের মজুত ঘোল; এই ছিল পুরো ভোজ্য-তালিকা।

—'এখন বাড়ি ফিরে লাভ নেই!' পান্তালিমন বলল খাওয়ার পর। 'বলদ দুটোকে জঙ্গলে ছেড়ে দেব, কাল সকালে শিশির মরবার সঙ্গে সঙ্গেই কাটা শেষ করে ফেলব।'

যখন কাজ থামাল, তখন সন্ধ্যের অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। সবার সঙ্গে মিলে শেষ আঁটিটা পর্যন্ত ঝাড়াই করল আর্কাসিনিয়া। তারপর, জনারের পায়েস রাঁধতে গাড়ির দিকে চলে গেল। সারাদিন সে গ্রিগরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শয়তানী হাসি হেসেছে, তার দুচোখে ছিল সুতীব্র ঘৃণা, যেন কোন এক অবিস্মরণীয় আঘাতের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে। বিষণ্ণ, চিন্তিত মনে গ্রিগর বলদগুলোকে ডনের ধারে জল খাওয়াতে নিয়ে গেল। বাপ সারাদিন ধরে তাকে আর আর্কাসিনিয়াকে চোখে চোখে রেখেছে। অপ্রসন্ন মনে গ্রিগরের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল :

—'তুই খেয়ে দেয়ে বলদ পাহারা দিবি। দেখিস যেন ঘাসে মুখ না দেয়! নে, আমার কোটটা ধর।'

বাচ্চাটাকে গাড়ির নীচে শুইয়ে রাখল দারিয়া. তারপর, দুনিয়াকে নিয়ে কুটো-কাটার খোঁজে বনের ভেতরে ঢুকল।

মাঠের ওপরে অন্তহীন, বিস্তীর্ণ কালো আকাশে ক্ষীণ চাঁদ মাথা তুলল। শীতের প্রথম তুষারের মত পোকা উড়তে লাগল আগুনের কুণ্ড ঘিরে। ধূমায়মান মেটে হাঁড়িতে জনার ফুটছে। পেটিকোটের কোণায় হাতা মুছে দারিয়া গ্রিগরকে ডাকল :

—'এসো. খেয়ে নাও।'

অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে গ্রিগর আগুনের সামনে দাঁড়াল। বাপের কোটটা তার কাঁধের ওপরে ছড়ানো।

—'হঠাৎ মেজাজ বিগড়াল কেন গো?' মুচকি হাসল দারিয়া।

—'বলদ পাহারা দিতে চায় না দাদা।' দুনিয়া হেসে উঠল. দাদার পাশে বসে গল্প জমাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বেচারীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। হুসহুস করে ঝোল টেনে নিয়ে, আধ-সেদ্ধ জনারগুলো দাঁতে চিবুতে লাগল পান্তালিমন। আর্কাসিনিয়া চোখ না তুলেই খেয়ে চলল, দারিয়ার হাসিঠাট্টায় উদাসীনের মত হাসল। তার তপ্ত গালদুটো অস্বস্তিকরভাবে লাল হয়ে উঠল।

খাওয়া সেরে প্রথমে উঠল গ্রিগর। উঠেই বলদ দুটোর কাছে চলে গেল।

নিবু নিবু আগুন জ্বলতে লাগল। পোড়া পাতার মদির গন্ধে জ্বলন্ত ডালগুলো ছোট দলটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

মাঝরাতে চোরের মত পা টিপে টিপে ফিরে এল গ্রিগর। হাতদশেক দূরে থমকে দাঁড়াল। গাড়ির ভেতরে বিচিত্র সুরে বাপের নাক ডাকছে। ছাইএর গাদার মধ্যে থেকে জ্বলন্ত কয়লার টুকরোগুলো সোনালী ময়ূরের রক্তচক্ষুর মত অতৃপ্তদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

গাড়ির ভেতর থেকে আপাদমস্তক ঢাকা, এক ধূসর মূর্তি নেমে এল. আস্তে আস্তে এগিয়ে এল গ্রিগরের দিকে। দুতিন হাত দূরে থাকতে সে থমকে দাঁড়াল। আর্কাসিনিয়া! গ্রিগরের বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস শুরু হল। কোটের ধার সরিয়ে দিয়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেল সে। তারপর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল কামনাতপ্ত, আত্মসমর্পিত নারীকে। হাঁটু দুটো ভেঙে পড়ল আর্কাসিনিয়ার; থরথর করে কাঁপতে লাগল, দাঁতে দাঁতে ঠকঠক শব্দ উঠতে লাগল। হঠাৎ তাকে গ্রিগর দু হাতের ওপর তুলে নিল, ঠিক যেমন করে নেকড়ে বাঘ পিঠের ওপরে শিকার-করা ভেড়া তুলে নেয়। তারপর বোতাম-খোলা কোটের কোণায় বেঁধে হোঁচট খেতে খেতে, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে লাগল।

—'ও, গ্রীস্‌কা, গ্রীস্‌কা! তোমার বাবা...'

· —'চুপ!'

গ্রিগরের হাত ছাড়িয়ে নিল আক্‌সিনিয়া। কোটের ভেড়ার লোম নাকেমুখে ঢুকে খাবি খেতে খেতে, আক্ষেপের তিক্ততার হাতে নিজেকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল :

—'নামিয়ে দাও আমাকে, এখন আর কি যায় আসে?...নিজেই যাচ্ছি আমি।'

॥ তিন ॥

গাঢ়-নীল কিংবা রক্তের মত লাল ফুল নয়, নারীর বিলম্বিত প্রেম পথের ধারে ফোটা হেনবেন্‌-ফুলের মত।

ঘাসকাটার ব্যাপারের পর পাল্‌টে গেল আক্‌সিনিয়া; যেন কেউ তার মুখে চিহ্ন এঁকে দিল, আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে গেল। দেখা হলেই অন্য সব মেয়েরা বিদ্বেষে ফুঁসে ওঠে, পেছন থেকে মাথা ঝাঁকায়। কমবয়সীরা হিংসেয় মরে। সে কিন্তু অগাধ আনন্দে, নির্লজ্জের মত, গর্বভরে মাথা উঁচু করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

গ্রিগর মেলেখফের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপার অল্পদিনের মধ্যে সকলেই জানতে পারল। প্রথম প্রথম কানাঘুসা চলল, কেউ বিশ্বাস করল, কেউবা করল না। কিন্তু গ্রামের রাখাল যখন একদিন ভোরবেলায় চাঁদের আলোয় হাওয়া-কলের কাছে নিচু রাইক্ষেতের মধ্যে তাদের দুজনকে শুয়ে থাকতে দেখল, সেদিন থেকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল দুকূলভাসানো বন্যার মত।

একথা পান্তালিমনেরও কানে পেঁছল। এক রবিবারে তাকে যেতে হল মোখোভের দোকানে। সামনে এত ভিড় যে, দরজা দিয়ে সুচ গলাবার জো নেই। ভেতরে ঢুকতে গেলে সবাই যেন তাকে রাস্তা ছেড়ে দিল। সে এসে দাঁড়াল কাপড়বিক্রির কাউন্টারের সামনে। দোকানী মোখোভ নিজেই এল বুড়োর তদ্বির করতে। জিজ্ঞেস করল :

—'এতদিন ছিলে কোথায়, প্রোকোফিয়েভিচ্‌?'

—'বড্ড কাজ পড়েছে। ক্ষেতের কাজের ঝঞ্ঝাট।'

—'বলছ কি হে? এমন ছেলেরা তোমার! তোমার আবার ঝঞ্ঝাট?'

—'ছেলেদের কথা বলছেন? পিয়োত্রা গেছে পল্টনে; গ্রীস্‌কা আর আমাকেই চালাতে হচ্ছে সব।'

আঙুল দিয়ে মোখোভ তার খোঁচা খোঁচা লাল দাড়ি দুভাগ করে নিল, তারপর অর্থময় দৃষ্টিতে আড়চোখে কসাক জনতার দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল :

—'হ্যাঁ, ভাল কথা! এতদিন আমাদের এসব বল নি কেন হে?'

—'কি সব?'

—'কি আবার? ছেলের বিয়ে দিচ্ছ, কাউকে একটি কথাও জানালে না।'

—'কোন ছেলে?'

—'কেন, তোমার গ্রিগরের ত এখনো বিয়ে হয় নি।'

—'এখনও ত বিয়ে করার মত ভাবগতিক দেখছি না তার।'

—'কিন্তু আমি তো শ্নলাম, তোমার ছেলের বৌ হবে স্তেপান আস্তাখফের আকসিনিয়া।'

—'বলেন কি? তার স্বামী বে'চে থাকতে! না, না, প্লাতোনিচ, ঠাট্টা করছেন নিশ্চয়ই? তাই না?' তোতলাতে লাগল পান্তালিমন।

—'ঠাট্টা করছি? আমি কিন্তু অন্যদের ম্খে শ্নেছি।'

কাউণ্টারের ওপরকার কাপড়ের টুকরোটা হাত দিয়ে, ঘসে ঘসে মস্ণ করে তুলল পান্তালিমন; তারপরে, হঠাৎ ঘ্রে দাঁড়িয়ে, খোঁড়াতে খোড়াতে দরজার দিকে এগ্লো। সোজা চলল বাড়ি-ম্খো। চিরাচরিতভাবে নীচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে, আঙ্লগ্লো ম্ঠো করে মটকাতে মটকাতে, খোঁড়া পায়ে ভর দিয়ে আরও বেশি করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে এগ্তে লাগল। আস্তাখফদের বাড়ি পেরিয়ে যাবার সময় ডালের বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকাল। আকসিনিয়া কোমর দোলাতে দোলাতে খালি কলসী নিয়ে ঘরের দিকে চলেছে। আগের চেয়ে অনেক বেশি ফিটফাট, অনেক কাঁচা দেখাচ্ছে তাকে। পান্তালিমন ডাকল :

—'এই শোন!' ডালের গেট খ্লে নিজেই ঢুকে পড়ল ভেতরে : থেমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল আকসিনিয়া। তারপর দ্জনে ঘরের ভেতর ঢুকল। ঝাঁট দেওয়া তকতকে মাটির মেঝেয় লাল বালি ছড়ান; কোণের দিকে বেঞ্চির ওপরে সদ্যভাজা পিঠে। রান্নাঘর থেকে ভিজে ন্যাতা আর মিষ্টি আপেলের গন্ধ ভেসে এল।

একটা মেনি-বেড়াল পান্তালিমনের পা নিয়ে খেলা করতে এগিয়ে এল। বেড়ালটা পিঠ বে'কিয়ে তার ব্টের সঙ্গে গা ঘষতে শ্র্ করল। এক লাথিতে বেড়ালটাকে বেঞ্চির গায়ে ছ্ঁড়ে দিল পান্তালিমন, চিৎকার করে উঠল :

—'এসব কি শ্নছি? এ্যাঁ? স্বামী বাড়ির বাইরে পা দিতে না দিতেই অন্যের দিকে নজর দেওয়া শ্র্ হয়েছে! এর জন্যে রক্তপাত করে ছাড়ব গ্রীস্কার! চিঠি লিখব স্তেপানকে! জান্ক এসব...! খানকি মাগী! জন্মের পর তোর মা কুত্তী ন্ন খাওয়ায় নি তোকে! আজ থেকে আমার উঠোনের ত্রি-সীমানা মাড়াবিনে! এক ছোকরার সঙ্গে ছিনালি করছেন উনি, আর স্তেপান যখন আসে, কিংবা আমিও যখন আসি...'

চোখদ্টো কুঁচকে শ্নে নিল আকসিনিয়া। তারপর হঠাৎ তার ঘাঘরার নীচেটা ধরে নাকের ডগায় দ্লিয়ে দিল। মেয়েমান্ষের কাপড়ের গন্ধ ভক্ করে নাকে এসে লাগল। তারপর, দাঁত খিঁচিয়ে, ঠোঁট বে'কিয়ে আকসিনিয়া এগিয়ে এল ব্ক চিতিয়ে।

'তুমি আমার কে হে, ব্ড়ো হাড়-হাবাতে! এ্যাঁ? বলি কে তুমি? শিক্ষে দিতে এসেছ? যাও, বাড়ি গিয়ে পাছা-মোটা ব্ড়ীকে শেখাও গে! নিজের ঘর সামলাও গে! অনাম্খো, ঠ্যাং-খোঁড়া ব্ড়ো! বেরোও আমার বাড়ি থেকে, ব্নো শ্য়োরের মত ম্খে গাঁজলা তুলে লাভ হবে না, আমাকে ভয় খাওয়াতে পারবে না।'

—'দাঁড়া না, হারামজাদী!'

—'দাঁড়াব আবার কি? যেখান থেকে এসেছ, সেখানেই ফিরে যাও। আমি যদি গ্রীস্কাকে চাই, তাহলে তাকে জ্যান্ত গিলব, হাড়মাস চিব্বে...গ্রীস্কা যদি ভালবাসে তাহলেই বা কি করবে? শাস্তি দেবে? সোয়ামিকে জানাবে?...লিখবে? ইচ্ছে হলে নালিশ করো আতামানের কাছে; কিন্তু গ্রীস্কা আমার! আমার! আমার-ই থাকবে! আমি তাকে পেয়েছি, তাকে ধরে রাখবোই...'

ভীত ত্রস্ত পান্তালিমনের গায়ে ব্ক ঠেকিয়ে দাঁড়াল আকসিনিয়া। পাতলা জ্যাকেটের

আড়ালে তার বুক জালে-পড়া তিতির পাখির মত ওঠানামা করতে লাগল, কালো চোখের আগুনে দগ্ধ করতে লাগল তাকে, আরও ভয়াবহ, আরও নির্লজ্জ, অজস্র বাক্যবাণে নাস্তানাবুদ করে দিল। বুড়োর ভুরু দুটো কাঁপতে লাগল, পিছু হটতে লাগল দরজার দিকে; তার লাঠিখানা দরজার কোণে রেখেছিল, হাতড়ে সেটা তুলে নিল; হাত দুলিয়ে, পাছা দিয়ে ঠেলে দরজাটা খুলে ফেলল। তাকে বারান্দার বাইরে হঁটিয়ে দিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে ক্ষিপ্তের মত আকসিনিয়া চেঁচাতে লাগল :

—'সারাজীবন ভালবাসব ওকে! খুশী হয়, খুন কর ওকে। আমার গ্রীস্‌কা ও! আমার!'

পান্তালিমন কি যেন বলতে গেল, দাড়ির ভেতর থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠল; তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়িতে এসে ঢুকল।

গ্রিগরের দেখা পেল রান্নাঘরেই। কোন কথা না বলে, ছেলের পিঠে ধাঁই করে লাঠির ঘা বসিয়ে দিল। বেঁকে গিয়ে বাপের হাত ধরে ফেলল গ্রিগর। ধমকে উঠল :

—'কি হচ্ছে, বাবা?'

—'তোর নষ্টামির জন্যে, শুয়োরের বাচ্চা!'

—'কিসের নষ্টামি?'

—'আর কখনো পড়শীর ইজ্জত নষ্ট করবি না! বাপের মুখ হাসাবি না! কখনো আর মেয়েমানুষের পেছনে ছুটবি না, কুত্তা!' পান্তালিমন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল। গ্রিগর বাপের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নেবার চেষ্টা করল। পান্তালিমন ঘরের চারধারে ছেলেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল।

—'মারতে আমি কিছুতেই দেব না।' কর্কশকণ্ঠে গ্রিগর চেঁচিয়ে উঠল। দাঁত খিঁচিয়ে বাপের হাত থেকে লাঠি ছিনিয়ে নিল। তারপর হাঁটুতে ঠেকিয়ে ভেঙে ফেলল, মটাৎ করে শব্দ হল।

—'তোকে আমি সবার সামনে চাবকাব। হারামজাদা, শয়তানের বাচ্চা! গাঁয়ের হাবা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব তোকে। তোকে খাসী বানাব।' বাপ গর্জন করতে লাগল।

ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে বুড়ী মা ছুটে এল। চেঁচাতে লাগল :

—'ওগো, ওগো! ঠান্ডা হও একটু. দাঁড়াও!'

বুড়ো তখন একেবারেই কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলল। বৌকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল; সেলাই-কল বসানো টেবিলটা উল্টে ফেলে দিল, তারপর বিজয়ীর মত উঠোনে ছুটে গেল। ধস্তাধস্তিতে গ্রিগরের সার্ট ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেটা ছাড়বারও সময় পেল না সশব্দে দরজা খুলে গেল। ঝোড়ো মেঘের মত আবার দরজার চৌকাঠের ওপর বাপ এসে দাঁড়াল :

—'বাস্তৎ ছেলেকে আমি বিয়ে দেব।' ঘোড়ার মত পা ঠুকে স্থিরদৃষ্টিতে সে ছেলের পেশীবহুল পিঠের দিকে তাকাল। 'কালই বেরুব সম্বন্ধ করতে।' ছেলে মুখের ওপর চোপা করবে, তাই বেঁচে থেকে দেখব, ভেবেছ!

—'সার্ট পরতে দাও আগে, পরে বিয়ে দিও।' বিদ্রূপ করে উঠল গ্রিগর।

—'বিয়ে দেবই তোকে। বিয়ে দেব গ্রামের হাবা মেয়ের সঙ্গে।' দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বুড়োর পায়ের খটখট শব্দ সিঁড়ি দিয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল, তারপর মিলিয়ে এল।

॥ চার ॥

সিয়েত্রাকোভ্‌ গ্রামের পেছনে, স্তেপের বুকে তেরপলে-ঢাকা গাড়ির সারি সারি লাইন। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে গড়ে উঠেছে সাদা ছাউনিওয়ালা, এক ঝকঝকে, তকতকে ছোট শহর। সোজা সোজা রাস্তা; মাঝখানে ছোট একটা চত্বর, শান্ত্রীরা সেখানে পাহারা দেয়।

সেখানকার মানুষগুলোর দিন কাটে শিক্ষাশিবিরের চিরাচরিত একঘেয়েমির মধ্যে। সকালে কসাকদল চরতে দেওয়া ঘোড়াগুলোকে পাহারা দিয়ে, তাড়িয়ে নিয়ে যায় ক্যাম্পে। তারপরই শুরু হয় ঘসামাজা, ঘোড়ার দলাইমলাই করা, জিন আঁটা, নাম-ডাকা আর জড়ো হওয়া। ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত স্টাফ অফিসারের ভীমগর্জন শুরু হয়, সামরিক কমিশার দৌড়ঝাঁপ জুড়ে দেয়; তরুণ কসাকদের শিক্ষাদাতা সার্জেণ্টরা নির্দেশ দিতে থাকে। সবাই জড়ো হয় ঝুঁটো আক্রমণের জন্যে ছোট টিলার পেছনে, বুদ্ধি খাটিয়ে ঘেরাও করে ফেলে 'শত্রুকে'। চাঁদমারি শুরু হয়। তরুণ কসাকরা এ ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তলোয়ারের কসরৎ দেখায়। বয়স্ক কসাকেরা বসে বসে ঝিমোয়।

ক্যাম্প তুলে নেবার প্রায় সপ্তাহখানেক আগে তোমিলিনের বৌ এল দেখা করতে। স্বামীর জন্যে নিয়ে এল ঘরে তৈরি খাস্তা বিস্কুট, ভালমন্দ জিনিস, আর গ্রামের একগাদা খবর।

খুব ভোরেই আবার ফিরে গেল সে। গ্রামের পরিবার আর আত্মীয়স্বজনের জন্যে কসাকদের কাছ থেকে নিয়ে গেল শুভেচ্ছা আর উপদেশের বোঝা। শুধু স্তেপান আস্তাখফই তার মারফতে কোন সংবাদ পাঠাল না। আগের দিন সন্ধ্যে থেকে অসুখে পড়েছিল সে: ভদ্‌কা টেনেছিল সুস্থ হবার জন্যে। ফলে, তোমিলিনের বৌ সমেত ইহলোকের কোনকিছুই চোখ মেলে চেয়ে দেখার মত অবস্থা তার ছিল না। কুচ-কাওয়াজের সময়েও সে এল না। তার অনুরোধে ডাক্তারের সহকারী রক্ত-মোক্ষনের জন্যে বুকে লাগিয়ে দিয়েছিল এক ডজন জোঁক। গাড়ির একটা চাকায় হেলান দিয়ে স্তেপান বসেছিল গেঞ্জি গায়ে (চাকার তেলে নোংরা হয়ে যাচ্ছিল টুপির সাদা ঘেরটা), হাঁ করে দেখছিল, ফোলা বুক থেকে চুষে চুষে কালো রক্তে জোঁকগুলো কেমন ফুলে ঢোল হয়ে উঠছিল।

এমন সময় হাজির হল তোমিলিন। চোখদুটো পিটপিট করে বলল:

—'কথা আছে স্তেপান।'

—'কি কথা, বলে ফেল।'

—'আমার বৌ এসেছিল দেখা করতে। আজ সকালেই চলে গেল।'

—'হুঁ...'

—'তোমার বৌকে নিয়ে অনেক কথা উঠেছে গাঁয়ে।'

—'কি বললে?'

—'মোটেই শ্রুতিকর নয় সে কথা।'

—'তাই নাকি?'

—'গ্রিগর মেলেখফের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করে বেড়াচ্ছে, একেবারে খোলাখুলি।'

ফ্যাকাশে হয়ে গেল স্তেপান। বুক থেকে জোঁকগুলো ছিঁড়ে নিয়ে পায়ের নীচে মাড়াতে লাগল। শেষ জোঁকটাও সে মাড়িয়ে থেঁতো করে ফেলল, সার্টের বোতাম এঁটে দিল; তারপর, হঠাৎ যেন ভীত হয়ে, আবার খুলে ফেলল বোতামগুলো। একটানা থর থর করে কাঁপতে লাগল ঠোঁটদুটো: কাঁপতে কাঁপতে বিশ্রী একটা হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে, ঠোঁটদুটো কুঁচকে নীল হয়ে উঠল। তোমিলিনের মনে হল, যেন শক্ত কঠিন কিছু চিবুচ্ছে স্তেপান। ধীরে ধীরে রং ফিরে এল মুখের। দাঁতে কামড়ে-ধরা ঠোঁটদুটো নিশ্চলতায় কঠিন হয়ে এল। টুপি খুলে, জামার হাতা দিয়ে টুপির সাদা ঘেরের তেল-ময়লা মুছে নিয়ে উঁচু গলায় বলে উঠল:

—'এ কথা জানাবার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

—'তোমাকে শুধু হুঁসিয়ার করে দিলাম...কিছু মনে করো না, ভাই।'

অনুকম্পাভরে তার পা-জামায় হাতের একটা চাপড় মারল তোমিলিন, তারপর তার ঘোড়ার কাছে চলে গেল। টুপির মাথার কালো দাগের দিকে স্থির, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে রইল স্তেপান। তার বুট বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল আধ-থেঁতলানো মুমূর্ষু একটা জোঁক।

॥ পাঁচ ॥

আর দিনদশেক পরেই কসাকরা ক্যাম্প থেকে গ্রামে ফিরে আসবে।

বিলম্বিত, তিক্ত প্রেমের উন্মাদনায় দিন কাটছে আকসিনিয়ার। বাপের ভয় দেখানো সত্ত্বেও লুকিয়ে তার কাছে রাতের বেলায় গ্রিগর আসে, ভোরেই বাড়ি ফিরে যায়।

দু সপ্তাহ ধরে গ্রিগর শক্তির অসাধ্য আয়াসে ঘোড়ার মত ছটফটিয়ে বেড়াল। অনিদ্রায় নীল-ছোপ লাগল তামাটে মুখে। বসে যাওয়া কোটরে ক্লান্ত চোখের ম্লান-দৃষ্টি। মুখ একেবারে না ঢেকেই বাইরে যাতায়াত করে আকসিনিয়া; চোখের গভীর কোটরে শোককৃত্যের মত ঘনীভূত কালিমা; পুরন্ত, ঈষৎ ফোলানো, লালসাঘন দুই ঠোঁটে পীড়াদায়ক, প্রতিস্পর্ধী হাসি।

প্রেমোন্মাদনায় একই নির্লজ্জ আগুনের শিখায় তারা দুজনে পুড়তে লাগল: বিবেকের কোন দংশন নেই, পৃথিবীর কাছ থেকে তাদের প্রেম গোপন করার কোন চেষ্টা নেই,—তাদের উন্মত্ত মিলন এমনই অদ্ভুত, এমনই প্রকাশ্য হয়ে উঠল যে, রাস্তায় তাদের দেখতে পেলে দশজনই বরং লজ্জা বোধ করতে লাগল। আকসিনিয়ার ব্যাপার নিয়ে আগে যারা ঠাট্টা রসিকতা করত, গ্রিগরের সেই ইয়ার-বন্ধুরা এখন তার সঙ্গে ঘুরতে কেমন বিসদৃশ, কেমন সংকোচ বোধ করতে লাগল। মেয়েরা মনে মনে আকসিনিয়াকে হিংসে করতে লাগল, কিন্তু মুখে নিন্দে রটাতে লাগল, আর স্তেপানের ফিরে আসার সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়ে পাশবিক কৌতূহলে ছটফট করতে লাগল।

এই অবৈধ প্রেমের ব্যাপারে গ্রিগর যদি সকলের কাছ থেকে লুকোবার ভাণও

করত, কিংবা আকসিনিয়া যদি গ্রিগরের সঙ্গে তার সম্পর্কের কিছুটা গোপনতা বজায় রেখে চলত, তাহলে এতে জগৎসংসার কিছুই অসাধারণত্ব খুঁজে পেত না। সারা গ্রাম হয়ত রসালোচনায় মেতে উঠত, পরে সবই ভুলে যেত। কিন্তু তারা দুজনে প্রায় প্রকাশ্যেই ওঠাবসা শুরু করে দিল। যে প্রচণ্ড হৃদয়াবেগের নাগপাশে তারা বাঁধা পড়ল, তার সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কের কোন সাদৃশ্যই নেই। আর সমস্ত গ্রামের লোকেরা রুদ্ধশ্বাসে, লোলুপ প্রতীক্ষায় বসে রইল, কবে স্তেপান আসবে, কবে এই নাগপাশের গ্রন্থিচ্ছেদ হবে।

আস্তাখফদের বিছানার ওপর নক্সাকাটা, সাদা-কালো, তুলোর খালি নাটাইএর ভেতর দিয়ে একটা দড়ি টাঙানো। নাটাইগুলোর ওপরেই রাত কাটায় মাছিরা, ওখান থেকে ছাদ পর্যন্ত মাকড়সায় জাল বুনেছে। আকসিনিয়ার শীতল, নগ্নবাহুর ওপর মাথা রেখে শুয়ে, নাটাইএর শিকলির দিকে তাকিয়েছিল গ্রিগর। অন্য হাত দিয়ে গ্রিগরের ঘন চুলে বিলি কাটছিল আকসিনিয়া। তার আঙুলে গরম দুধের গন্ধ। গ্রিগর মুখ ঘোরালো, আকসিনিয়ার বগলে নাক চেপে ধরতেই ঝাঁঝালো, মিষ্টি মিষ্টি মেয়েলি ঘামের গন্ধে নাক ভরে উঠল।

চার কোণে পাইনের খাঁজওয়ালা, রং-করা কাঠের খাট ছাড়াও, ঘরের ভেতরে দরজার কাছাকাছি একটা বড়সড়, লোহা-বাঁধানো সিন্দুক রয়েছে। তার ভেতরে আছে আকসিনিয়ার বিয়ের যৌতুক, আর টুকিটাকি ভালমন্দ জিনিস। কোণে একটা টেবিল। জেনারেল স্কোবোলিওভের একখানা ছাপা ছবি : উড়ন্ত ঝাণ্ডা পোঁতা রয়েছে, ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন সামনে দিয়ে। দুটো চেয়ার। চেয়ারের ওপরে বিবর্ণ কাগজের গায়ে আইকন। পাশের দেয়াল বরাবর মাছিতে-খাওয়া ফটো। একখানায় একদল কসাক, উস্কুখুস্কু চুল, ঘড়ির চেনে অলংকৃত প্রশস্ত বুক, খোলা তলোয়ার : স্তেপান ও তার ফৌজী ইয়ার-বন্ধুদের ছবি। স্তেপানের উর্দি ঝুলছে হুক থেকে। চাঁদ উঁকি মারল জানলার ফাঁক দিয়ে, কাঁধের-পট্টির সাদা গিঁটে হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গ্রিগরের দুই চোখের মাঝখানের ভুরুতে চুমু খেল আকসিনিয়া। ডাকল :

—'গ্রীস্‌কা ওগো।'

—'কি বলছ?'

—'আর মাত্র নদিন যে..'

—'তাই বা কম কি।'

—'আমি কি করব, গ্রীস্‌কা?'

—'আমি তা কি করে বলব?'

আকসিনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে গেল। আবার সে গ্রিগরের জটধরা চুলগুলো দুভাগ করতে লাগল। অর্ধ-জিজ্ঞাসার মত, অর্ধ-উচ্চারণের মত বলল :

—'আমাকে মেরেই ফেলবে স্তেপান।'

গ্রিগর চুপ করে রইল। ঘুম আসছিল তার। বুঁজে আসা চোখের পাতাদুটো জোর করে খুলতেই দেখতে পেল, তার ঠিক মুখের ওপরেই নত হয়ে আছে আকসিনিয়ার দুচোখের সুনীল গভীরতা।

—'ও যখন ফিরে আসবে, মনে হয়, তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে। তুমি ভয় পেয়েছ, না?' আকসিনিয়া জিজ্ঞেস করল।

—'কেন? আমি ওকে ভয় করতে যাব কেন? তুমি ওর বৌ, তোমারই ভয় পাবার কথা।'

'তোমার সঙ্গে যখন থাকি তখন ভয় করে না। কিন্তু দিনের বেলায় ভাবতে গেলেই ভয় করে।'

হাই তুলে গ্রিগর বলল :

—'স্তেপানের ফিরে আসায় কিছুই আসে যায় না। কিন্তু বাবা বলছে, আমার বিয়ে দিয়ে দেবে।'

গ্রিগর হাসল। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু অনুভব করল, তার মাথার নীচে আকসিনিয়ার হাতখানা নেতিয়ে পড়ে গেল, ঢুকে গেল বালিশের নীচে, পরক্ষণেই আবার শক্ত হয়ে উঠল।

—'কার সঙ্গে বলছিল?' চাপা-গলায় আকসিনিয়া জিজ্ঞেস করল।

—'বাবা শুধু কথাই উত্থাপন করেছে। মা বলছিল, বাবা ভাবছে করশুনভদের নাতালিয়ার কথা।'

—'নাতালিয়া...পরমাসুন্দরী মেয়ে। অদ্ভুত সুন্দরী...ওকেই বিয়ে করবে তাহলে! সেদিন ওকে গির্জায় দেখলাম। সেজেছে যেন..'

—'ওর রূপের ব্যাখ্যান করতে হবে না আমার কাছে। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।'

গ্রিগরের মাথার নীচে থেকে হঠাৎ হাতখানা সরিয়ে নিল আকসিনিয়া। তাকিয়ে রইল জানলার দিকে। উঠোনে তুষারের মত হলদে কুয়াশা। ঘরের চালের ছায়া পড়েছে গাঢ় হয়ে। ঝিঁঝির ঐকতান বাজছে। সারস ডেকে উঠল ডনের ধার থেকে, তাদের গম্ভীর স্বর ভেসে এল জানলা দিয়ে। আকসিনিয়া ডাকল :

—'গ্রীস্‌কা!'

—'কিছু ভাবছো?'

গ্রিগরের অনিচ্ছুক কর্কশ হাতদুখানা তুলে নিল আকসিনিয়া। চেপে ধরল বুকে, শীতল মৃত্যুপাণ্ডুর গালে, তারপর আর্তনাদ করে উঠল :

—'কেন মরতে আমার সঙ্গে ভাব হল তোমার! আমি এখন কি করবো? গ্রীস্‌কা! সব শেষ হয়ে গেল আমার. স্তেপান আসছে, কি জবাব দেব তাকে?... আমাকে কে দেখবে?'

গ্রিগর চুপ করে রইল। আকসিনিয়া শোকার্ত-চোখে তাকিয়ে রইল তার তীক্ষ্ণ-নাসা, ছায়ানিবিড়-চোখ, নির্বাক ঠোঁটের দিকে...তারপর অকস্মাৎ আবেগের বন্যায় সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। গ্রিগরের মুখে, ঘাড়ে, হাতে, বুকের কর্কশ লোমে চুমু খেতে লাগল পাগলের মত। দম নিয়ে ফিস ফিস করে বলতে লাগল (গ্রিগর বুঝতে পারল, তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে) :

—'গ্রীস্‌কা...ধন আমার.. সোনা আমার...চলো আমরা পালাই। ওগো! আমরা সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাবো। স্বামীকে ছাড়বো, যতক্ষণ তুমি আমার কাছে থাকবে, সবাইকে ছাড়বো আমি। আমরা পালিয়ে যাব অনেক দূরে, খনি মুলুকে। আমি তোমাকে ভালবাসব, তোমার সব ভার নেব। পারোমোনোভ খনির দারোয়ান আমার কাকা : সে সাহায্য করবে।...গ্রীস্‌কা! বলো, শুধু একটিবার হ্যাঁ বলো।'

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল গ্রিগর। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে তার জ্বলন্ত, তাতার চোখদুটো খুলল, দুচোখে বিদ্রূপ মেশানো হাসি।

—'বোকা, আকসিনিয়া, তুমি একটা বোকা! কেবলি বকবক করছ, কিছুই মাথা-মুণ্ডু নেই তার। কোথায় যাব বাড়ি ছেড়ে? আসছে বছর আমার ফৌজী-বেগার রয়েছে যে। এ জায়গা ছেড়ে আমি কোথাও, কক্ষনো যাব না। এখানে রয়েছে স্তেপ, তবু ত নিঃশ্বাস নিতে আটকায় না। কিন্তু ওখানে? গত বছর গরমের সময় রেল-স্টেশনে গিয়েছিলাম।* আমি ত মরি আর কি! ইঞ্জিন গোঙাচ্ছে, পোড়া কয়লায় বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। কেমন করে যে মানুষ বেঁচে থাকে, তা ভগবানই জানেন। হয়ত ওদের অভ্যাস!' গ্রিগর থুথু ফেলল। তারপর আবার বলল, 'গ্রাম আমি ছেড়ে যেতে পারব না।'

জানলার বাইরে অন্ধকার রাত গাঢ়তর হয়ে উঠল। এক টুকরো মেঘ ভেসে গেল চাঁদের ওপর দিয়ে। উঠোনের ওপর থেকে তুষারের মত হলদে কুয়াশা মিলিয়ে গেল। ছায়ার দাগ মুছে এল। জানলার বাইরে, বেড়ার পেছনে, আবছা আবছা কালো কালো মনে হল যাকে, তা গত বছরের, না আরও পুরনো কোন কাঁটা-ঝোপ, বুঝবার আর কোন উপায় রইল না।

ঘরের ভেতরেও গাঢ় হয়ে উঠল ছায়া। স্তেপানের উর্দির গিঁটগুলো অস্পষ্ট হয়ে এল। মৃদু শিহরণে আকসিনিয়ার কাঁধ দুটো থরথর করতে লাগল, দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরা মাথাটা বালিশের ওপরে নিঃশব্দে কাঁপতে লাগল—সেই অচঞ্চল, নীরন্ধ্রতায় এ সবের কিছুই দেখতে পেল না গ্রিগর।

॥ ছয় ॥

তোমিলিনের বৌ দেখা করে যাবার পর থেকেই কে যেন স্তেপানের চোখেমুখে কালি মাখিয়ে দিয়ে গেল। ভুরু ঝুলে পড়ল চোখের ওপর, তীব্র কুটিল ভ্রূকুটি কপালে খাজ ফেলল। সোয়ার-কাঁধে ঘোড়ার মত মৌন, ধূমায়িত ক্রোধে স্তেপান তার দুঃখের বোঝা বয়ে চলল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে একেবারেই কথাবার্তা বন্ধ করে দিল, পিয়োত্রা মেলেখফের দিকে ফিরেও তাকাল না। যে বন্ধুত্বের বন্ধনে তারা আগে এক ছিল, তা ছিন্ন হল। দুজন দুজনের শত্রু হয়ে দাঁড়াল।

আগের মতই একই সঙ্গে দল বেঁধে গ্রামে ফিরে চলল সবাই। গাড়িতে জোতা হল স্তেপান পিয়োত্রার ঘোড়া। নিজের ঘোড়ায় চড়ে ক্রিস্তোনিয়া চলল পেছনে পেছনে। জ্বরে ভুগছিল তোমিলিন, গাড়ির ভেতরে কোট মুড়ি দিয়ে সে পড়ে রইল। গাড়ি চালানোর ব্যাপারে ফিয়োদোতটা আলসে, পিয়োত্রা তাই লাগাম তুলে নিল হাতে। পথের ধারের বেগুনি কাঁটা-ঝোপের মাথা চাবুকের ঘায়ে নুইয়ে দিতে দিতে স্তেপান হেঁটে চলল। বৃষ্টি পড়া শুরু হল। কালো কাদা গাড়ির চাকার সঙ্গে তেল-আঠার মত জড়িয়ে যেতে লাগল। শরতের সুনীল আকাশ মেঘে মেঘে পাণ্ডুর। রাত হল। কোনো গ্রামেরই আলো চোখ পড়ল না। পিয়োত্রা ঘোড়া দুটোর পিঠে হরদম চাবুক কসাতে লাগল। হঠাৎ অন্ধকারের মাঝ থেকে স্তেপান চেঁচিয়ে উঠল :

—'এ্যাই, হচ্ছে কি...! নিজের ঘোড়া বাদ দিয়ে সারাক্ষণ আমার ঘোড়াটাই পিটিয়ে চলেছ যে।'

—'চোখ তাকিয়ে দেখ। যে-টা টানছে না, সেটাকেই পিটছি।'

স্তেপান কোন উত্তর দিল না। নিঃশব্দে আরও আধ-ঘণ্টার রাস্তা পার হয়ে এল। চাকার নীচে কাদা প্যাচ প্যাচ করতে লাগল। বৃষ্টির ধারা আছড়াতে লাগল তেরপলের গায়ে। লাগাম ফেলে তামাক ধরাল পিয়োত্রা। মনে মনে ঠিক করতে লাগল, পরের ঝগড়ায় কি কি গাল দিয়ে অপমান করবে স্তেপানকে।

গাড়িটা হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল। পা পেছলাতেই কাদার মধ্যে পা বসে গেল ঘোড়াদুটোর।

—'কি হল, কি হল?' ভয় পেয়ে গেল স্তেপান।

—'আলো জ্বালাও কেউ।' পিয়োত্রা খেঁকিয়ে উঠল।

উঠবার জন্যে ছটফট করে নাক ঝাড়তে শুরু করল সামনের ঘোড়াদুটো। কে যেন দেশলাই জ্বালল। কমলারঙের আলোর একটা বৃত্ত, তারপরেই আবার অন্ধকার। কম্পিত হাতে লাগাম ধরে, পড়ে যাওয়া ঘোড়াটাকে টেনে রইল পিয়োত্রা।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা। মাঝের ডাণ্ডাটা মচমচ করে উঠল। একগাদা কাঠি একসঙ্গে জ্বালল স্তেপান। তার ঘোড়াটাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে গিয়েছে একটা ইঁদুরের গর্তে।

ক্রিস্তোনিয়া ঘোড়ার দড়ি খুলে দিল। চেঁচিয়ে উঠল .

—'শিগ্‌গীর পিয়োত্রার ঘোড়াটা খুলে ফেল। শিগ্‌গীর।'

অবশেষে স্তেপানের ঘোড়া অতিকষ্টে পা টেনে তুলল। পিয়োত্রা লাগাম টেনে রইল; কাদার মধ্যে হাঁটু গেড়ে, হামাগুড়ি দিয়ে ক্রিস্তোনিয়া ঘোড়ার অসহায়ভাবে ঝোলানো পা-টা পরখ করে, হেঁড়ে গলায় বলে উঠল :

—'খুব সম্ভব ভেঙে গিয়েছে। হাঁটিয়ে দেখত, পারে কিনা।'

লাগাম ধরে টানল পিয়োত্রা। সামনের পা-টা মাটিতে না-ফেলে, ঘোড়াটা লাফিয়ে দু-একপা এগিয়ে গেল, তারপর চিঁহিঁ করে চেঁচিয়ে উঠল। লম্বা কোটটা টেনে-টুনে আক্ষেপে মাটিতে পা ঠুকল তোমিলিন :

—'ভেঙেছে, তাই না? একটা ঘোড়া গেল তাহলে!'

এতক্ষণ ধরে একটা কথাও বলে নি স্তেপান, যেন এমনি একটা মন্তব্যের জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। ক্রিস্তোনিয়াকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল পিয়োত্রার ওপরে। পিয়োত্রার মাথাই সে তাক করেছিল, কিন্তু ফসকে গিয়ে ঘা পড়ল তার কাঁধে। দুজনে জড়াজড়ি করে কাদার মধ্যে গিয়ে পড়ল। পড়্ পড়্ করে সার্ট ছেঁড়ার আওয়াজ শোনা গেল। পিয়োত্রাকে মাটিতে ফেলে, মাথাটা হাঁটুতে চেপে ধরে, স্তেপান দমাদ্দম ঘুসি চালাতে লাগল। তাকে টেনে তুলল ক্রিস্তোনিয়া।

—'বলি, ব্যাপারখানা কি?' রক্ত থুথু করে ফেলে চেঁচিয়ে উঠল পিয়োত্রা।

—'আর বে-রাস্তায় গাড়ি চালাবে, বদমাশ!'

ঝট্‌কা মেরে ক্রিস্তোনিয়ার হাত ছাড়িয়ে নিল পিয়োত্রা।

—'হয়েছে, হয়েছে! আমার সঙ্গেই লড়বে নাকি!' ক্রিস্তোনিয়া গর্জন করে উঠল। একহাতে গাড়ির সঙ্গে চেপে ধরে রইল পিয়োত্রাকে।

বোদোস্কোভের ছোট্ট তাগড়াই ঘোড়াটাকে জুতে নেওয়া হল পিয়োত্রার ঘোড়ার সঙ্গে। স্তেপানকে তার ঘোড়ার পিঠে চাপতে বলে, পিয়োত্রাকে সঙ্গে নিয়ে ক্রিস্তোনিয়া গুঁড়ি মেরে গাড়ির ভেতরে ঢুকল। যখন একটা গ্রামে এসে পৌঁছুল, তখন মাঝ-রাত্রি। তারা থামল প্রথম বাড়ির কাছেই। রাতকাটানোর জায়গা চাইল ক্রিস্তোনিয়া।

বোদোস্কোভ ঘোড়াগ্‌লোকে ভেতরে নিয়ে গেল। উঠোনে শ্‌য়োরের জল-খাওয়ার একটা লোহার পাত্র পড়েছিল; তাতে হোঁচট খেয়ে খিস্তি করে উঠল সে। চালার নীচে নিয়ে গেল ঘোড়াগ্‌লোকে। দাঁতে দাঁত ঠক্‌ ঠক্‌ করতে করতে তোমিলিন ঘরের ভেতরে ঢুকল। পিয়োত্রা আর ক্রিস্তোনিয়া রইল গাড়ির ভেতরে।

সকালে আবার তারা তৈরি হল রওনা হওয়ার জন্যে। স্তেপান বেরিয়ে এল ঘর থেকে। এক কুঁজো ব্‌ড়ী ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে তার পেছন পেছন চালার নীচে গেল। ব্‌ড়ী জিজ্ঞেস করল :

—'কোন ঘোড়াটা?'

—'কালোটা।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্তেপান দেখিয়ে দিল।

লাঠিটা মাটিতে রেখে ব্‌ড়ী এক অপ্রত্যাশিত, প্‌র্‌ষোচিত ভঙ্গিতে ঘোড়ার খোঁড়া পা-টা তুলে নিল। সর্‌, বাঁকা আঙ্‌ল দিয়ে ঘোড়ার হাঁটুটা পরীক্ষা করতে লাগল। যন্ত্রণায় ঘোড়াটা কান ন্‌ইয়ে পেছনের পায়ের ওপর বসে পড়ল।

—'না, ভাঙে নি। রেখে যাও, সারিয়ে দেব।'

হাত নাড়ল স্তেপান, তারপর ঘোড়ার দিকে এগ্‌ল।

—'কি গো, রেখে যাবে নাকি?' তার দিকে তাকিয়ে ব্‌ড়ী চোখদ্‌টো কুঞ্চিত করল।

—'আচ্ছা, থাকুক।' স্তেপান উত্তর দিল।

॥ সাত ॥

'ওর জন্যে হেদিয়ে মলাম ব্‌ড়ীমা! চোখ আমার ক্ষয়ে এল। গায়ে কাপড় তুলে দিতেও হাত ওঠে না আমার। ও আঙিনা দিয়ে হে'টে গেলে, আমার ব্‌কের মধ্যে আগ্‌ন জবলে। ইচ্ছে করে, মাটিতে আছড়ে পড়ে ওর পায়ের দাগে চুম্‌ খাই। বাঁচাও ব্‌ড়ীমা! ওর বিয়ে দেবে ওরা। বাঁচাও আমাকে.. যা লাগে তাই দেব তোমাকে . আমার শেষ কামিজটা পর্যন্ত তোমাকে দেব। শ্‌ধ্‌ বাঁচাও আমাকে!'

ফুটি-ফাটা, খাঁজ-পড়া চোখের কোটরে জবলজবলে চোখের দ্‌ষ্টি। হাড়গিলে ব্‌ড়ী দ্রোঝ্‌দিখা আকসিনিয়ার দিকে তাকাল। ঘাড় নাড়তে নাড়তে শ্‌নতে লাগল তার যন্ত্রণার কাহিনী।

—'কাদেব ছোঁড়ারে?'

—'পান্তালিমন মেলেখফের

—'তুর্কী ছোঁড়াটা, না?'

—'হ্যাঁ।'

দন্তহীন মাড়িদ্‌টো চিব্‌তে চিব্‌তে ব্‌ড়ী রসিয়ে রসিয়ে তার উত্তর শ্‌নতে লাগল।

—'কাল ভোরে আলো ওঠার আগেভাগেই আসিস, বাছা। ডনের জলে নামব কাল। তোর দ্‌খ্‌খ্‌ ধ্‌য়ে দেব। আর এক খিমচে ন্‌ন আনিস সঙ্গে।'

হলদে শালে ম্‌খ ঢেকে সন্তর্পণে গেট পেরিয়ে গেল আকসিনিয়া। রাতের

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তার দেহ-রেখা। মিলিয়ে গেল পায়ের শব্দ। গ্রামের একেবারে শেষপ্রান্তে কোথা থেকে যেন গানের সুর ভেসে আসতে লাগল।

আকসিনিয়া সারা রাত দুচোখের পাতা এক করল না। খুব ভোরে দ্রোঝ্‌দিখার জানলায় এসে দাঁড়াল। ডাকল :

—'বুড়ীমা, ও বুড়ীমা!

—'কে গা?'

—'আমি আকসিনিয়া! উঠে পড়!'

এ পথ ও পথ দিয়ে নদীর ধারে এল তারা। জলের কাছাকাছি বালির স্পর্শ বরফের মত তীক্ষ্ণ। ভ্যাপসা, ঠাণ্ডা কুয়াসা উঠছে ডনের বুক থেকে।

হাড় জিরজিরে হাতে আকসিনিয়ার হাতখানা নিয়ে তাকে জলের ধারে টেনে আনল দ্রোঝ্‌দিখা। বলল :

—'নুনটুকু দে, পুবমুখো 'ক্রুশ্‌' কর।'

বুকে ক্রুশ করে আকসিনিয়া রক্তিম পুব আকাশের দিকে বিদ্বেষের চোখে তাকাল।

—'হাতে জল নিয়ে খেয়ে ফেল, তাড়াতাড়ি।'

জল খেয়ে নিল আকসিনিয়া। এক মন্থর ঘূর্ণির ওপরে বুড়ী পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রইল একটা কালো মাকড়শার মত। পরে বসে পড়ে বিড় বিড় করতে লাগল :

—'গায়ে কাঁটা দেওয়া ঠাণ্ডা, বইছে তল থেকে...তপ্ত মাংস...মনের মধ্যে জানোয়ার ...মনের ইচ্ছে আর জ্বর...ক্রুশের দোহাই, নিষ্পাপ মেরী মার দোহাই...ভগবানের দাস গ্রিগর...' টুকরো টুকরো কথা আকসিনিয়ার কানে আসতে লাগল।

দ্রোঝ্‌দিখা কিছু নুন ছিটিয়ে দিল পায়ের নীচের ভেজা বালির ওপর, আর বেশি কিছুটা জলে, বাকিটুকু দিল আকসিনিয়ার হাতে।

—'তোর ঘাড়ে জল ছিটিয়ে দে! তাড়াতাড়ি।'

তাই করল আকসিনিয়া। বিষাদ আর বিদ্বেষের চোখে তাকিয়ে রইল দ্রোঝ্‌দিখার কটা গাল দুটোর দিকে।

—জিজ্ঞেস করল :

—'হল? এতেই হবে?'

—'হ্যাঁ, এতেই হবে।'

আকসিনিয়া রুদ্ধশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটল। উঠোনে গরুগুলো ডাকতে শুরু করেছে। গ্রামের গরুর পাল খুলবার জন্যে, ঘুমজড়ানো চোখে, রক্তিম মুখে দারিয়া গরুগুলো তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল। আকসিনিয়াকে তাড়াতাড়ি ছুটে যেতে দেখে মুচকি হাসল। জিজ্ঞেস করল :

—'কি গো, পড়শী, ভাল ঘুম হয়েছিল ত?'

—'হ্যাঁ ভাই, ভাল!'

—'এত সকালে গিয়েছিলে কোথায়?'

—'একটু কাজ ছিল গাঁয়ের ভেতরে।'

সকালের উপাসনার ঘণ্টা বাজছে গির্জায়। তামার জিভ-ওয়ালা ঘণ্টাটা থেমে থেমে বাজছে। পাশের রাস্তায় গ্রামের রাখাল পথচলতি চাবুক হাঁকাচ্ছে। আকসিনিয়া তাড়াতাড়ি গরুগুলো বার করে দিল। বারান্দায় দুধ এনে রাখল ছাঁকার জন্যে। আঙরাখায় হাত মুছে, ভাবনায় বিভোর হয়ে, ছাঁকার হাঁড়িতে দুধ ঢেলে দিল।

চাকার ঝনঝনানি আর ঘোড়ার নাক-ঝাড়ার জোরালো শব্দ উঠল রাস্তায়। দুধের

হাঁড়ি নামিয়ে রেখে আর্কাসিনিয়া সামনের জানলা দিয়ে দেখতে গেল কে এল। তলোয়ারের মুঠো হাতে ধরে গেট পেরিয়ে স্তেপান ঢুকছে ভেতরে। আঙুলে আঙুরাখা খিমচে ধরল আর্কাসিনিয়া, তারপর বসে পড়ল বেঞ্চির ওপর। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ... পায়ের শব্দ বারান্দায়, দরজার সামনে।

স্তেপান দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কৃশ, নিস্পৃহ চেহারা তার। স্তেপান বলল :

— তারপর. .'

গোলগাল দেহটাকে একটা পাক দিয়ে, আর্কাসিনিয়া সোজা হয়ে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল স্তেপানের দিকে। পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বলল :

—'মার আমাকে।'

- -'ব্যাপার কি, আর্কাসিনিয়া ?'

—'কিছু লুকোবো না তোমার কাছে, স্তেপান।'

মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল, জড়পিণ্ডের মত শুধু হাতদুটো দিয়ে পেট বাঁচিয়ে স্তেপানের মুখোমুখি দাঁড়াল। ভয়-বিকৃত নির্বাকমুখে, কালো চোখের তারার নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। একটু কাৎ হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল স্তেপান। তার আ-ধোয়া সার্ট থেকে পুরুষের ঘাম আর পথ-চলার কটু গন্ধ নাকে এল। টুপি না খুলেই ধপ্ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তলোয়ারের বেল্টটা কোমর থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, শুয়ে শুয়ে কাঁধ ঝাঁকাতে লাগল। কটারঙের গোঁফজোড়া গালের দুপাশে ঝুলে পড়ল। ঘাড় না ফিরিয়েই তাকে তীর্যকদৃষ্টিতে দেখতে লাগল আর্কাসিনিয়া। স্তেপান খাটের পায়াতে পাদুটো তুলে নিল, একটু একটু করে বুট থেকে কাদা ঝরতে লাগল। ঘরের কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে তলোয়ারের বেল্টের ফিতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

—'খেয়ে নিয়েছ সকালে?' স্তেপান জিজ্ঞেস করল।

—'না...'

—'খাবার দাও আমাকে।'

স্তেপান গোঁফ ভিজিয়ে খানিকটা দুধ চুমুক দিয়ে খেল। আস্তে আস্তে রুটির কোণা চিবুতে লাগল। আর্কাসিনিয়া দাঁড়িয়ে রইল উনুনের কাছে। দুর্নিবার আতংকে দেখতে লাগল, স্বামীর নরম কানদুটো চিবুনো সঙ্গে সঙ্গে কেমন উঠছে নামছে।

হঠাৎ টেবিল ছেড়ে উঠে এল স্তেপান; ক্রশ করে নিয়ে আচমকা জিজ্ঞেস করে বসল .

'এইবার বল দেখি, কি ব্যাপার।'

আর্কাসিনিয়া মাথা নীচু করে টেবিল পরিষ্কার করতে লাগল। কোন কথা বলল না।

—'বল দেখি, কেমন করে স্বামীর পথ চেয়ে দিন কাটিয়েছ। কেমন করে স্বামীর মান বজায় রেখেছ। কি?'

মাথায় একটা প্রচণ্ড ঘুঁসির চোটে আর্কাসিনিয়ার পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে গেল। ছিটকে পড়ল দরজার দিকে। পিঠ ঠুকে গেল চৌকাঠের সঙ্গে। আর্কাসিনিয়া আর্তনাদ করে উঠল।

স্তেপানের তাক-করা ঘুঁসি মাথায় লাগলে রোগা, নির্জীব মেয়েছেলে তো দূরের কথা, যে কোন দৃঢ়-বপু, ষণ্ডামার্ককেও ছিটকে পড়তে হয়। আর্কাসিনিয়া ভয়েই উঠল, কি নারীত্বের প্রাণ-শক্তিই তাকে টেনে তুলল—এক মুহূর্ত চুপচাপ পড়ে থেকেই হাতে পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

স্তেপান সিগারেট ধরিয়েছিল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আর্কাসিনিয়াকে পায়ের

ওপর উঠে দাঁড়াতে দেখেই হাই ছাড়ল। তামাকের থলিটা টেবিলের ওপরে ছ‍ুড়ে দিল, কিন্তু ইতিমধ্যেই আকসিনিয়া বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। তাকে তাড়া করল স্তেপান। আকসিনিয়ার দরদর করে রক্ত ঝরছে, সে মেলেখফ আর তাদের উঠোনের মাঝখানের বেড়ার দিকে ছ‍ুটল। বেড়ার কাছাকাছি তাকে ধরে ফেলল স্তেপান। বাজ যেমন করে শিকার ধরে, তেমনি করে কালো হাতের ম‍ুঠোয় চেপে ধরল মাথাটা। আঙ‍ুলের ফাঁকে চুলের গোছা ধরা পড়ল, টেনে শ‍ুইয়ে ফেলল মাটিতে।

স্বামী যদি বৌকে জ‍ুতোর নীচে থে'তলায়, তাতে কি আসে যায়? গেটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে, বাঁকা চোখে একবার তাকাল ন‍ুলো আলেক্সি শামিল। ম‍ুচকি হেসে ঝোপের মত দাড়িটা দ‍ুভাগ করে নিল। স্তেপান যে তার বিয়ে করা বৌকে ঠেঙাবে, সে ত জানা কথাই। শামিলের একবার ইচ্ছে হল, বৌকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয় কিনা, দাঁড়িয়ে দেখে। কিন্তু তার বিবেক বাধা দিল। আর যাই হক, সে তো আর মেয়েমান‍ুষ নয়।

দ‍ূর থেকে স্তেপানকে দেখে মনে হবে, কেউ যেন কসাক-নাচ নাচছে। রান্নাঘরের জানলা দিয়ে স্তেপানকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে নামতে দেখে গ্রিগরও প্রথম তাই ভেবেছিল। কিন্তু আর একবার ভাল করে তাকাতেই সে ঘর ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে এল। ম‍ুঠো করা হাতটা ব‍ুকের সঙ্গে চেপে ধরে ছ‍ুটে গেল বেড়ার কাছে। পিয়োত্রাও ছ‍ুটল পেছনে পেছনে।

উ'চু বেড়াটা টপকে পেরিয়ে গেল গ্রিগর। প্রাণপণে দৌড়ে হাজির হল স্তেপানের পেছন দিকে। ঘ‍ুরে দাঁড়িয়ে দ‍ুলতে দ‍ুলতে স্তেপান ভাল‍ুকের মত তার দিকে তেড়ে গেল।

বীরবিক্রমে লড়তে লাগল দ‍ুই ভাই। দাঁড়কাক যেমন করে মড়া ঠোকরায়, তেমনি করে স্তেপানকে ঠোকরাতে লাগল দ‍ুজনে। স্তেপানের ঘ‍ুঁসি খেয়ে বহ‍ুবার গ্রিগর মাটিতে ছটকে পড়ল। গায়ের জোরে স্তেপান কম যায় না। কিন্তু পিয়োত্রার ঘ‍ুসির চোটে বাতাসের ম‍ুখে শরের মতই সে ন‍ুয়ে ন‍ুয়ে পড়তে লাগল, তব‍ু খাড়া রইল।

স্তেপান পিছ‍ু হটল। একটা চোখ দিয়ে আগ‍ুন ঠিকরে বের‍ুতে লাগল (আর একটা চোখে ঘ‍ুঁসির চোটে আধ-পাকা কুলের রং ধরল)।

স্তেপানের কাছ থেকে ঘোড়ার সাজ ধার নিতে ক্রিস্তোনিয়া এদিকে হঠাৎ এসে পড়েছিল। তিনজনকে ছাড়িয়ে দিল সে।

—'থামাও, থামাও!' হাত তুলে সে চে'চিয়ে উঠল। 'কেটে পড় সব, নইলে নালিশ ঠুকে দেব আতামানের কাছে।'

ম‍ুখ থেকে রক্ত থ‍ুথ‍ু করে ফেলতেই পিয়োত্রার হাতে আধ-ভাঙা একটা দাঁত খসে পড়ল। সে গর্জন করে উঠল :

—'চলে আয়, গ্রিগর। পরে দেখে নেব ওকে।'

—ওঁৎ পাতার চেষ্টাও করো না।' সি'ড়ির ওপর থেকে তড়পে উঠল স্তেপান।

—'আচ্ছা, আচ্ছা।'

—'আচ্ছা, আচ্ছা না এসব। তোদের নাড়িভু'ড়ি টেনে বার করব তাহলে, হাড়মাস আলাদা করে ছাড়ব।'

—'বলি এটা ঠাট্টা, না মরদের বাত?'

স্তেপান লাফিয়ে নামল সি'ড়ি থেকে। মহড়া নেবার জন্যে গ্রিগরও এগিয়ে গেল।

—'এগিয়ে দেখ দেখি, চামড়া তুলে ফেলব ক্রিস্তোনিয়া ধমক দিল।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

—'পিয়োত্রাকে বল ঘুড়ীটাকে আর তার নিজের ঘোড়াটায় সাজ চাপাতে।' ভারিক্কী-চালে গ্রিগরকে হুকুম করল পান্তালিমন। ষাঁড়ের মত ঘামতে ঘামতে ঝোলটুকু উদরস্থ করে ফেলল। দুনিয়া সাগ্রহে গ্রিগরের প্রতিটি ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছিল। লেবুর মত হলদে রঙের রবিবারের শালটা জড়িয়ে ইলিনিচ্‌নাকে গিন্নী গিন্নী লাগছে, খোঁপা বেঁধেছে খাটো করে, ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে রয়েছে মাতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠা। বুড়োকে বলল :

—'আরও কিছু খেয়ে নাও গো। ক্ষিদেয় নিজে কষ্ট পাবে।'

—'খাবার সময় নেই এখন।' বুড়ো উত্তর দিল।

পিয়োত্রার গমের মত হলদে, দীর্ঘ গোঁফজোড়া দরজার কাছে দেখা দিল। পিয়োত্রা জানাল :

—'গাড়ি তৈরি, উঠতে পারেন।'

সশব্দে হেসে উঠেই হাতের ভেতরে মুখ লুকাল দুনিয়া।

ইলিনিচ্‌নার দূরসম্পর্কের এক সেয়ানা বিধবা বোন ভাসিলিজা মাসী, ঘটকী হিসাবে সে সঙ্গে যাবে। মাথা ঘুরিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে, হাসতে হাসতে, ঠোঁটের ভাঁজের নীচের কালো দাঁতের বোঝা বার করে সকলের আগে সে গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসল। পান্তালিমন ধমক দিল :

—'তোর দাঁতের বোঝা বার করবি নে, বুঝলি। দাঁত দেখিয়েই সব মাটি করবি তুই। দাঁতগুলো এমন এবড়োখেবড়ো; একটা এদিক আর একটা ওদিক...'

—'আরে কত্তা, আমি ত আর বর নই...'

—'আচ্ছা তুই ন'স, কিন্তু তুই বাপু হাসিস নে অমন করে।'

ভাসিলিজা চটল। কিন্তু তখনই গেট খুলে দিল পিয়োত্রা। কাঁচা-চামড়ার লাগামটা ঠিক করে নিয়ে গ্রিগর লাফিয়ে উঠল কোচোয়ানের আসনে। তরুণ-তরুণীর মত ঠাসাঠাসি করে পান্তালিমন আর ইলিনিচ্‌না বসেছে পেছন দিকে। এতটুকু জায়গাও ফাঁক রইল না।

ঠোঁট কামড়ে ঘোড়াদুটোর পিঠে চাবুক কসিয়ে দিল গ্রিগর। জানান না দিয়েই গাড়ির দড়িতে টান দিয়ে ঘোড়াদুটো ছুট মারল।

—'সাবধান, চাকায় ধাক্কা খাবে।' সরুগলায় দারিয়া চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু গাড়িটা আচমকা কাত হয়ে, পথের ধারের ঢিবিগুলোর ওপর দিয়ে টক্কর খেয়ে, গড়গড়িয়ে রাস্তা ধরে চলতে শুরু করল।

একদিকে কাত হয়ে, পিয়োত্রার পিছিয়ে পড়া ঘোড়াটাকে চাবুক মারল গ্রিগর। বাতাসে যাতে উড়িয়ে না নিয়ে যায় সেই ভয়ে দাড়িটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরল পান্তালিমন; গ্রিগরের পিঠের দিকে ঝুঁকে পড়ে কর্কশ কণ্ঠে বলল :

—'মাদীটাকে চাবুক মার।'

বাতাসের ঝাপটায় চোখে জল এসে পড়েছিল, জ্যাকেটের লেস-হাতায় জল মুছে নিয়ে কুঞ্চিত চোখে ইলিনিচ্না দেখতে লাগল, গ্রিগরের নীল সাটিনের জামাটা পতপত করে উড়ছে, পিঠের দিকে ফুলে ফুলে উঠছে। কসাকরা রাস্তা ছেড়ে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের দেখতে লাগল। উঠোন থেকে কুকুরগুলো ছুটে এল, ঘোড়াদুটোর পায়ের কাছে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

না ঘোড়াদুটো, না চাবুক, কাউকেই রেহাই দিল না গ্রিগর। দশ মিনিটের মধ্যেই গ্রাম পেছনে ফেলে এল। দেখতে দেখতে তক্তার বেড়া-দেওয়া কোরশুনভের বড় বাড়িটার সামনে এসে হাজির হল। লাগাম টেনে ধরতেই হঠাৎ রংকরা, নক্সাকাটা গেটের সামনে গাড়ি থেমে গেল।

গ্রিগর রইল ঘোড়া নিয়ে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে পান্তালিমন সিঁড়ির দিকে এগুল। ঘাঘরার খসখস আওয়াজ তুলে ইলিনিচ্না আর ভাসিলিজা চলল পেছনে পেছনে। বুড়ো তাড়াতাড়ি করছিল, ভয় হচ্ছিল, গাড়িতে আসেতে আসতে যে সাহসটুকু সঞ্চয় করেছিল তা আবার না মিইয়ে যায়। উঁচু সিঁড়িতে ধাক্কা খেল সে, খোঁড়া পায়ে লাগল; ব্যথায় ভুরু কুঁচকে, ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করা সিঁড়ি বেয়ে খট্ খট্ করে উঠতে লাগল।

সে আর ইলিনিচ্না প্রায় একই সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকল। বৌয়ের পাশে দাঁড়ান তার পছন্দ নয়, তার চেয়ে বৌ প্রায় ইঞ্চি ছয়েক লম্বা হবে। তাই সে এক পা এগিযে গেল। টুপি খুলে নিয়ে কালো আইকনকে ক্রুশ করল। তারপর বলল :

—'সব খবর ভাল ত?'

—'ভাল; আপনাদের?' বাড়ির কর্তার শণের মত চুল, মোটাসোটা চেহারা। বেঞ্চি থেকে উঠে উত্তর দিল।

—'আপনার বাড়িতে জনকয়েক অতিথি এসেছে, মিরন গ্রিগরিয়েভিচ্।' পান্তা-লিমন বলে চলল।

—'অতিথির জন্যে দরজা সব সময়েই খোলা। কৈ গো মারিয়া, অতিথিদের জন্যে বসতে টসতে দাও কিছু।'

তিনটে টুল এগিয়ে দিল তার বয়স্কা, বিগত যৌবনা স্ত্রী। ধুলো না থাকলেও একবার ঝেড়ে দিল। একটার ধারে বসল পান্তালিমন, ঘেমে ওঠা ভুরুদুটো রুমাল দিয়ে মুছতে লাগল।

—'একটা দরকারে এসেছি আমরা।' ভনিতা না করেই শুরু করে দিল সে। তাই দেখে, ঘাঘরা উঁচু করে ইলিনিচ্না আর ভাসিলিজা বসে পড়ল।

—'নিশ্চয়, নিশ্চয়: বলুন, কিসের দরকার?' বাড়ির কর্তা মুচকি হাসল।

গ্রিগর ঘরে ঢুকল, চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে কোরশুনভদের নমস্কার করল। মিরনের আঁচিলভরা মুখে লালচে আভা দেখা দিল। এইবার সে বুঝতে পারল, ওদের আসার হেতু কি। বৌকে বলল :

—'ঘোড়াগুলোকে উঠোনে আনিয়ে কিছু খড় পাঠিয়ে দাও।'

—'একটা কথা বলবার আছে আমাদের।' কোঁকড়ান দাড়িটা পাকাতে পাকাতে, উত্তেজনায় কানের মাকড়িটা টানতে টানতে পান্তালিমন বলে চলল · 'আপনার এক বয়স্থা মেয়ে আছে, আমারও এক ছেলে আছে, এদের দুজনের যোগাযোগ ঘটানো যায় না? সেইকথা জিজ্ঞেস করছি। মেয়েটাকে এখন পাত্রস্থ করার ইচ্ছে আছে, না, কি? আমরা যদি কুটুম হতে চাই?'

—'কি করে বলি?' মিরন টাক চুলকাল। 'সত্যি বলতে কি, এই শরতে ওর বিয়ে দেবার কথা এখনও ভাবি নি। এখন হাতে অনেক কাজ, তা ওর বয়সও বেশি নয়। এই ত সবে আঠার ছাড়িয়েছে। তাই না, মারিয়া?'

—'ওই রকমই হবে।'

—'তাহলে ত বিয়ের বয়সই হয়েছে।' ভাসিলিজা নাক গলাল কথার মধ্যে। 'মেয়েরা ত কুড়িতেই বুড়ী।' চত্বর থেকে ঝাঁটা কুড়িয়ে সে জ্যাকেটের ভেতর লুকিয়ে রেখেছিল, তারই খোঁচায় চুলবুল করে উঠল টুলের ওপরে। নিয়ম হচ্ছে, যে ঘটকী কনের ঝাঁটা লুকোয়, তাকে আর ফেরান যায় না।

—'গত বসন্তেই মেয়ের সম্বন্ধ এসেছিল। মেয়ে আমাদের আলমারিতে রেখে দেবার মত নয়। ভগবানের ওপর ত হাত নেই. মাঠ, ঘরের সব কাজই সে পারে. .।' কোরশুনভের বৌ উত্তর দিল।

—'ভাল কোন সম্বন্ধ এলে নিশ্চয়ই 'না' বলবেন না।' বুড়ীর কথার মধ্যে পান্তালিমন বলে উঠল।

—'ব্যাপারটা ঠিক 'না' বলার মত নয়।' মাথা চুলকে বাড়ির কর্তা উত্তর দিল। 'আমরা যে কোন সময়েই বিয়ে দিতে পারি।'

কথাবার্তা ফেঁসে যাবার উপক্রম হল। উত্তেজিত হতে শুরু করল পান্তালিমন, মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠল। মেয়ের মা-ত ছোঁ-মারা চিলের ছায়া-দেখা তা-দেওয়া মুরগীর মত বকবক করে চলল। কিন্তু ঠিক সময়ে নাক গলাল ভাসিলিজা। শান্ত গলায় তড়বড় করে ঘসামাজা কথার বন্যা ছুটিয়ে দিল সে, যেন নিভন্ত আগুনে নুন ঢেলে দিল। ফাটল জুড়ে দিল সে।

—'দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে এই। এমনি ধরনের কথাবার্তা উঠলে, বেশ ভাল করে, আপনাদের মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে, সমাধান করা দরকার। আর নাতালিয়ার কথা যদি বলি—সত্যি বলতে কি, সারা দিনমান ঢুঁড়েও ওর জুড়ি পাবেন না। ওর হাতে কাজের তুর্বাড় ছোটে! কি কাজের মেয়ে! একেবারে গিন্নী। আর, তার জন্যে আপনারাই ভেবে দেখুন,' পান্তালিমন আর গর্বিত ইলিনিচ্‌নার দিকে উদারভাবে হাত তুলে ভাসিলিজা বলে চলল : 'ওঁর মত কর্তা পাবে কে। ওঁর দিকে তাকালেই মন আমার আঁকুপাকু করে ওঠে, আমার মৃত স্বামীর মতই উনি। ওঁর পরিবারের মত খাটিয়ে পরিবার দুটি নেই। এ তল্লাটের যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করুন প্রোকোফিচের কথা। সৎ আর ভালো মানুষ বলে সবাই ওঁকে জানে। আর এও বলি, আপনার মেয়ের খারাপ কি আর আমরা ভাবতে পারি?'

তার ধমক মেশানো ক্ষীণ কণ্ঠস্বর পান্তালিমনের কানে মধু ঢেলে দিল। মাঝের দুটো আঙুল দিয়ে নাকের চুল খুঁটতে খুঁটতে সে শুনছিল, আর উল্লসিত মনে ভাবছিল : 'বেটীর জিভ ত নয়, মিছরির ছুরি। কেমন বলছে দেখ না! কি বলতে চায় বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে! অন্য কোন মেয়েছেলে এমন কথা বলে পুরুষের তাক লাগাতে পারবে না...' ভাসিলিজার প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। ভাসিলিজা তখন প্রাণপণে কনে আর তার উর্ধ্বতন পঞ্চম-পুরুষের গুণকীর্তন করে চলেছে।

—'বালাই, মেয়ের মন্দ চাইব কেন আমরা।' মারিয়া বলে উঠল।

—'কথা হচ্ছে, এত সকাল সকাল বিয়ে দেওয়া নিয়ে।' হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে শান্ত গলায় বাড়ির কর্তা বলল।

—'মোটেই সকাল নয়! মোটেই সকাল নয়!' এবার ওদের সঙ্গে যোগ দিল পান্তালিমন।

—'আজ হক, কাল হক, মেয়েকে পার ত করতেই হবে।' গিন্নী এবার আধা-ছল, আধা-সত্যি করে ফুঁপিয়ে উঠল।

—'আপনার মেয়েকে ডাকুন, মিরন গ্রিগরিয়েভিচ্। একবার দেখি তাকে।'

—'নাতালিয়া '

তামাটে আঙুলে অঙ্গরাখা খুঁটতে খুঁটতে একটি মেয়ে ভীতত্রস্তভাবে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

—'আয়, আয়! মেয়ের আমার লজ্জা বেশি।' চোখে জল, তবু হাসতে হাসতে মা উৎসাহ দিতে লাগল।

গ্রিগর তাকাল তার দিকে।

ধুলোমাথা কালো স্কার্ফের নীচে বড় বড় ধূসর চোখ, তুলতুলে গালে ছোট্ট, গোলাপী একটা টোল। হাতের দিকে তাকাল গ্রিগর, বড়সড় হাত দুখানায় খাটুনির দাগ। আঁটসাঁট সবুজ জ্যাকেট শক্ত শরীরে লেপ্টে রয়েছে; তার নীচে কুমারী মেয়ের ছোট ছোট স্তন দুটি উঠছে*আর নামছে, অকপটে, করুণভাবে রেখায়িত হয়ে উঠছে। স্তনের তীক্ষ্ণবৃন্ত দুটি ছোট ছোট বোতামের মত দেখাচ্ছে।

মুহূর্তের মধ্যেই মাথা থেকে তার বঙ্কিমসুন্দর পায়ের পাতা অবধি সবই দেখে নিল গ্রিগর। মাদী ঘোড়া কেনার আগে খরিদ্দারে যেমন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, তেমনি করে সে দেখতে লাগল। মনে মনে ভাবল, 'এতেই চলবে;' চোখে চোখে তাকাতেই বুঝতে পারল, তারই দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কনে। তার ঈষৎ লজ্জায় রাঙা, সরল, আন্তরিক চোখের দৃষ্টি যেন বলছে: 'এই আমি, এই আমার সব। দেখো, দেখে নাও, যেমন তোমার খুশি।' মৃদু হেসে চোখে চোখেই গ্রিগর বলে উঠল, 'অপূর্ব!'

—'হয়েছে, দেখা হয়েছে।' হাত নেড়ে বাপ তাকে বাইরে যেতে বলল।

পেছনে দরজা বন্ধ করে যাবার সময় হাসি আর কৌতূহল লুকোবার চেষ্টা না করেই, নাতালিয়া গ্রিগরের দিকে তাকিয়ে গেল একবার।

স্ত্রীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে এবারে কোরশুনভ বলল:

—'শুনুন, পান্তালিমন প্রোকোফিয়েভিচ্! আপনার যা বলবার আছে বলে যান, আমরাও বাড়িতে কথাবার্তা বলি। পরে দেখি, কাজকর্ম করা যায় কিনা।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পান্তালিমন শেষবারের মত বলল:

—'আবার আমরা সামনের রবিবারে আসব।'

ইচ্ছে করেই চুপ করে রইল কোরশুনভ। ভাব দেখাল, যেন সে শুনতেই পায় নি।

॥ দুই ॥

তোমিলিনের কাছ থেকে আকসিনিয়ার ব্যবহার জানবার পরই শুধু যন্ত্রণা আর ঘৃণায় মনে মনে ফুঁসতে ফুঁসতে স্তেপান অনুভব করেছিল, এমন শোচনীয় জীবন সত্ত্বেও আকসিনিয়াকে সে ভালবাসে—আনন্দহীন, ঘৃণিত স্রে ভালবাসা। মাথার ওপরে হাতুদুখানা ছড়িয়ে, রাত্রে গাড়ির ভেতর কোট মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকত; শুয়ে শুয়ে ভাবত, বাড়ি ফিরলে বৌ কিভাবে তাকে নেবে। চোখের কালো পাতাদুটো মুড়ে, শুয়ে শুয়ে হাজার রকমের প্রতিশোধের কথা চিন্তা করত।

যেদিন সে বাড়ি ফিরল, সেদিন থেকে আতঙ্কের ছায়া নামল আস্তাখফেদের বাড়িতে। আকসিনিয়া পা টিপে টিপে হাঁটে, ফিসফিস করে কথা বলে। কিন্তু ভয়ের ছাই মাখানো তার দুই চোখে লুকিয়ে থাকে ছোট্ট এক ফুলকি—গ্রিগর যে আগুনের শিখা জালিয়েছিল তারই একটি অবশিষ্ট কণা।

তার দিকে তাকালে চোখে দেখার চেয়ে স্তেপান তা অনুভব করতে পারে। নিজেই নিজেকে পীড়িত করে। রাত্রে কড়িকাঠের ওপরে মাছির ঝাঁক ঘুমিয়ে পড়লে আকসিনিয়া যখন বিছানা পাতে, স্তেপান তাকে মারে, লোমশহাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে। গ্রিগরের সঙ্গে তার সম্পর্কের খুটিনাটি, নির্লজ্জকাহিনী জানাবার দাবি করে। শক্ত বিছানার ওপরে আকসিনিয়া গড়াগড়ি দেয়, তার দম আটকে আসে। তার কোমল দেহটাকে যন্ত্রণা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে স্তেপ্যান মুখে হাত বুলিয়ে দেখে, চোখের জল বেরিয়েছে কিনা। কিন্তু তপ্ত শুষ্ক হয়ে ওঠে আকসিনিয়ার গাল।

—'বলবে না আমাকে?'

—'না।'

—'খুন করব তোমাকে।'

—'খুনই কর। দোহাই তোমার। এভাবে না বাঁচাই ভাল '

দাঁত কড়কড় করে ঘামেভেজা স্তনের কোমল, মসৃণ মাংস পেঁচিয়ে ধরে স্তেপান। শিউরে আর্তনাদ করে ওঠে আকসিনিয়া।

—'ব্যথা লাগছে, তাই না?' স্তেপান ব্যঙ্গভরে বলে।

—'লাগছে, হ্যাঁ, লাগছে।'

—'তুমি কি ভাব, ব্যথা আমার লাগে নি?'

ঘুমোতে অনেক রাত হয়ে যায়। ঘুমের ঘোরেই স্তেপান হাতের মুঠি পাকায়। কনুইয়ে ভর দিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকায় আকসিনিয়া, সুন্দর মুখখানা বদলে যায় ঘুমের ছোপ লেগে। ধপ্ করে বালিশে মাথা ফেলে সে নিজে নিজেই ফিসফিস করে।

গ্রিগরের আজকাল কমই দেখা পাওয়া যায়। তবু একদিন ডনের ধারে দেখা হয়ে গেল গ্রিগরের সঙ্গে। গরু তাড়িয়ে জল খাওয়াতে এনেছিল গ্রিগর। হাতের বেত দুলিয়ে, পায়ের দিকে নজর রেখে ঢালু বেয়ে উঠছিল সে। আকসিনিয়া জলের দিকে নামছিল। তাকে দেখেই বালতির বাঁকটা হিমশীতল হয়ে উঠল হাতের মধ্যে, শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ করে উঠল।

পরে যখনই এই সাক্ষাৎকারের কথা মনে হয়েছে, তার মনকে বোঝানো কঠিন হয়েছে, যে এমন সাক্ষাৎ সত্যিই ঘটেছিল। পাশ কাটিয়ে যাবার সময় গ্রিগর তাকে দেখতে পেল। বালতির একটানা দুলুনির শব্দে চোখ তুলে তাকাল। ভুরুদুটো কেঁপে উঠল, বোকার মত হাসল। আকসিনিয়া তার মাথা-সোজা ডনের সবুজ তরঙ্গ-রাশি আর তারও পেছনের বালির চরের খাড়া পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইল। গ্রিগর ডাকল :

—'আকসিনিয়া!'

কয়েকপা এগিয়ে এসে অপরাধীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়াল আকসিনিয়া। পিছিয়ে পড়া একটা গরুর পিঠে রাগের মাথায় চাবুক কসিয়ে, মুখ না ফিরিয়েই গ্রিগর জিজ্ঞেস করল :

—'স্তেপান কখন রাই কাটতে যাবে?'

—'এখনই তৈরি হচ্ছে।'

—'ওকে পাঠিয়ে দিয়ে সূর্যমুখীর ক্ষেতে এসো, আমি আসব ওখানে।'

শব্দ করে বালতি নাড়াতে নাড়াতে জলে নামল আকসিনিয়া। জলের ফেনা ঢেউ'এর সবুজ কিনারায়, হলুদ রঙের বিচিত্র নক্সায়, ডনের পাড় বরাবর সাপের মত এঁকেবেঁকে উঠছে। সাদা গাং-চিল উড়ছে নদীর ওপরে, তীক্ষ্ম স্বরে ডাকছে। চুনো-মাছ জলের ওপরে রুপোর বুটি ঝরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। নদীর অপর পাড়ে, সাদা বালির চরের পেছনে বৃদ্ধ পপ্‌লার গাছের ধূসর চূড়োগুলো উঁচু হয়ে আছে উদ্ধত, গম্ভীর ভঙ্গিতে। জলের কাছাকাছি আসতেই বালতি ছুঁড়ে দিল আকসিনিয়া। ঘাঘরা তুলে ধরে হাঁটু জলে নেমে গেল। পাকখাওয়া জল পায়ের পেশীতে সুড়সুড়ি দিতে লাগল। স্তেপান ফিরে আসার পর এই প্রথম সে হাসল—নিঃশব্দ অনির্দেশ্য সে হাসি।

আকসিনিয়া পেছন ফিরে তাকাল গ্রিগরের দিকে। তখনো চাবুক দোলাতে দোলাতে ধীরে সুস্থে ঢালু বেয়ে উঠছে। শক্ত সমর্থ পায়ের ওপর অনায়াসে দেহের ভার রেখে রেখে চলেছে। আকসিনিয়ার চোখের জলে-ঝাপসা-দৃষ্টি তার পা-দুটোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফিরতে লাগল। পা-জামার চওড়া পা-দুটো সাদা পশমী মোজার মধ্যে গোঁজা; গাঢ় লাল ডোরা-দাগে ঝলমলে। পিঠের একধারে ময়লা সার্টটা সদ্য সদ্য ছিঁড়ে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। তারই ফুটো দিয়ে চোখে পড়ছে তামাটে গায়ের চামড়ার ত্রিকোণ একটা অংশ। একদিন যে লোভনীয় দেহটাই তার অধিকারে ছিল, তার ওই ছোট্ট একটু অংশকেই আকসিনিয়ার দৃষ্টি চুম্বন করতে লাগল। হাসি-ম্লান, বিবর্ণ ঠোঁটে চোখের জল ঝরে পড়ল।

বাঁকের সঙ্গে আটকে নেবার জন্যে বালতি নামিয়ে রেখে সে তাকাল গ্রিগরের বুটের দাগগুলোর দিকে। চোরের মত চারপাশে একবার দেখে নিল। দূরের চরে গোটাকয়েক ছোট ছেলে স্নান করছে, তাছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। আকসিনিয়া মাটিতে বসে পড়ে হাত দিয়ে পায়ের দাগগুলো ঢেকে ফেলল, তারপর উঠে দাঁড়াল। কাঁধে বাঁক ঝুলিয়ে নিয়ে মনেমনে হাসতে হাসতে তাড়াতাড়ি পা চালাল বাড়ির দিকে।

মসলিনের মত কুয়াসায় ঢাকা সূর্য এগিয়ে চলেছে গ্রামের মাথার ওপর দিয়ে। ছোট ছোট কোঁকড়ান মেঘের পেছনে ধু ধু করছে গাঢ় নীল শীতল প্রান্তর। উত্তপ্ত-টিনের ছাদের মাথায়, জনহীন রাস্তার ওপরে, রোদে-ঝলসানো-ঘাসে-বোঝাই খামার বাড়ির উঠোনে মৃত্যুর মত গুমট উষ্ণতা থমকে আছে।

আকসিনিয়া সিঁড়ির ধাপে পা দিল। চওড়া ধারওয়ালা ঘাসের টুপি মাথায় দিয়ে

স্তেপান তখন কাটাই-কলে ঘোড়া জুতছে। সামনে বসবার আসনে কোটটা ছুড়ে দিয়ে সে লাগাম তুলে নিল। আকসিনিয়াকে বলল :

—'গেটটা খুলে দাও।'

গেট খুলে দিয়ে সাহস করে জিজ্ঞেস করল :

—'কখন ফিরবে?'

—'সন্ধ্যের দিকে। আনিকুশ্‌কার সঙ্গে কাটাব ভেবেছি। তার কাছে খাবার পাঠিয়ে দিও। কামার-বাড়ির কাজ শেষ করেই সে মাঠে যাবে।'

কাটাই-কলের চাকা ক্যাঁচ্‌ক্যাঁচ্‌ করে উঠল, ধূসর ধুলোর রাশ ছিটিয়ে বেরিয়ে গেল গড় গড় করে। ঘরের ভেতর গিয়ে হাতের মধ্যে মাথাটা চেপে ধরে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল আকসিনিয়া, তারপর রুমালে চুল ঢেকে নিয়ে নদীর ধারে ছুটল।

—'ধরো, যদি সে ফিরে আসে? কি হবে তাহলে?' হঠাৎ এই কথাটা তার মনে আগুন ছুঁইয়ে গেল। সে দাঁড়িয়ে পড়ল, যেন পায়ের সামনেই দেখতে পেয়েছে গভীর খাদ। পেছনে ফিরে তাকাল একবার। তারপর নদীর পাড় বরাবর মাঠের দিকে প্রায় দৌড়ুতে শুরু করে দিল।

বেড়া আর বেড়া। বাগানের পর বাগান। সূর্যমুখীর হলুদ সমুদ্র উদগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে। আলু-শাকের সবুজ ফ্যাকাসে রং। শামিলদের বাড়ির বৌরা আলুক্ষেতে আগাছা নিড়ুচ্ছে। নুয়েপড়া পিঠের গোলাপী জামাগুলো চোখে পড়ছে। মেলেখফদের বাগানে পৌঁছে আকসিনিয়া ডালের খিল তুলে গেট খুলে ফেলল। সূর্যমুখীর ডাঁটার সবুজ ঝোপ ঠেলে সরু জুলি-পথ ধরে এগিয়ে চলল। একেবারে মাঝখানে চলে এল গুঁড়ি মেরে। সারামুখে সোনালী রেণু লাগল। ঘাঘরা তুলে বসে পড়ল মাটিতে।

আকসিনিয়া কান পেতে শুনতে লাগল। শুধুই নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতা। মাথার ওপরে কোথায় যেন মৌমাছির নিঃসঙ্গ গুঞ্জন উঠছে। নিজেকে সন্দেহে পীড়িত করে প্রায় আধ-ঘণ্টা এমনি করে সে বসে রইল। ও কি আসবে? ফিরছিলই সে, মাথার রুমাল ঠিকঠাক করছিল, হঠাৎ গেটখোলার ভারী আওয়াজ কানে এল।

—'আকসিনিয়া!'

– 'এই দিকে।' আকসিনিয়া ডাকল।

—'আরে তুমি এসেছ, তাহলে!' পাতা সরানোর সরসর আওয়াজ তুলে এগিয়ে এসে গ্রিগর তার পাশে বসে পড়ল।

চোখে চোখ পড়ল দুজনেরই। গ্রিগরের নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার উত্তরে আকসিনিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ল।

—'আমার আর শক্তি নেই.. আমার সব শেষ হয়ে গিয়েছে, গ্রীস্‌কা।'

—'ও কি করে বলত?'

রাগে ক্ষোভে জ্যাকেটের কলার টেনে খুলে ফেলল আকসিনিয়া। কুমারীর মত উচ্ছ্বসিত গোলাপী স্তনদুটিতে আঘাতের অসংখ্য কালসিটে দাগ।

—'তুমি কি জান? রোজ ধরে ধরে মারে। রক্ত চুষে খাচ্ছে আমার ..আর তুমি মানুষটিও বেশ...কুকুরের মত কাদা মাখিয়ে, নিজে পালিয়ে বাঁচলে.. তোমরা সবাই সমান,. কম্পিত আঙুলে জ্যাকেটের বোতাম আঁটল আকসিনিয়া; তারপর, হয়ত অসন্তুষ্ট হয়েছে ভেবে তাকাল গ্রিগরের দিকে। গ্রিগর তখন অন্যদিকে মুখ লুকিয়ে নিয়েছে।

—'তাহলে আমার ঘাড়েই এখন সব দোষ চাপাতে চাও?' ঘাসের শিস্ চিবুতে চিবুতে গ্রিগর বলল।

—'তোমার কি কোন দোষই নেই?' আর্কাসিনিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল।

—'অনিচ্ছুক কুত্তীর পেছনে কুত্তা কখনো ঘোরে না।'

আর্কাসিনিয়া হাতে মুখ লুকিয়ে ফেলল। হিসেব-করা তীব্র অপমান চাবুকের ঘা মারল।

ভুরু কুঁচকে বাঁকা চোখে তার দিকে তাকাল গ্রিগর। তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁকে একফোঁটা জল টলমল করছে। ছটকে আসা রোদ্দুরের ধুলোজড়ানো একটি রেখা চোখের জলের টলটলে ফোঁটার ওপর বর্ণচ্ছটা মেলে ধরেছে। তাতেই তার ভেজা দাগ শুকিয়ে উঠছে।

চোখের জল সইতে পারে না গ্রিগর। সে চঞ্চল হয়ে উঠল। পা-জামা থেকে একটা মেটে পিঁপড়ে খুঁটে নিয়ে নির্মমভাবে পিষে মারল। তারপর আবার তাকাল আর্কাসিনিয়ার দিকে। ঠিক তেমনিভাবেই আর্কাসিনিয়া বসে আছে। শুধু হাতের পেছন বেয়ে জলের তিনটি ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে।

—'হল কি তোমার? ব্যথা দিলাম নাকি? আর্কাসিনিয়া! আরে থামাও...কিছু বলার আছে তোমাকে।'

আর্কাসিনিয়া মুখ থেকে হাত খসিয়ে নিল।

—'তোমার পরামর্শ নিতে এসেছি। কেন এসেছ তুমি? এরকম আর সহ্য করা অসম্ভব। আর তুমি...তোমার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে আসি নি আমি। ভয় পেয়ো না।' আর্কাসিনিয়া হাঁপাতে লাগল।

ঠিক এই মুহূর্তে সত্যিই তার মনে হল, গ্রিগরের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে সে আসে নি; কিন্তু ডনের ধার দিয়ে ছুটে আসার সময় সে আবছা আবছা ভেবেছিল : 'আবার ওকে ফিরে পাব। ওকে ছাড়া বাঁচব কাকে নিয়ে?' তারপরেই মনে পড়েছিল স্তেপানকে; তবু দুর্বিনীতের মত মাথা ঝাঁকিয়ে যন্ত্রণাকর ভাবনা ঝেড়ে ফেলেছিল।

—'তাহলে আমাদের ভালবাসার শেষ এখানেই?' গ্রিগর জিজ্ঞেস করল। উপুড় হয়ে কনুয়ে ভর দিয়ে চিবানো সূর্যমুখীর পাঁপড়ি মুখ থেকে ছিটিয়ে ফেলতে লাগল।

—'শেষ হবে কেন?' ভয় পেল আর্কাসিনিয়া। আবার জিজ্ঞেস করল, 'কি করে শেষ হল?'

গ্রিগর চোখ ফিরিয়ে নিল।

রোদের তাপের নীরস শুকনো মাটি থেকে সোঁদা গন্ধ উঠছে। সূর্যমুখীর পাতায় পাতায় সরসর আওয়াজ তুলে বাতাস বয়ে গেল। ভাসমান মেঘের টুকরোয় সূর্য ঢাকা পড়ে গেল; স্তেপের ওপরে, গ্রামের ওপরে, চিন্তিত আর্কাসিনিয়ার মাথার ওপরে ধোঁয়াটে ছায়া নেমে এল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল গ্রিগর—কণ্ঠনালীতে ঘা হলে ঘোড়া যেমন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—চিৎ হয়ে শুয়ে গরম মাটিতে পিঠ তাতাতে লাগল।

—'শোন, আর্কাসিনিয়া!' গ্রিগর ধীরে ধীরে বলতে লাগল। 'আমি... আমি ভেবেছি একটা... আমি ভেবেছি...'

বাগানের ভেতর থেকে গাড়ির চাকার আওয়াজ শোনা গেল। সেই সঙ্গে মেয়েলি কণ্ঠস্বর : 'হট্ হট্, চল টেকো-বুড়ো!'

আকসিনিয়ার মনে হল, আওয়াজটা একেবারে কাছে। তাই তখনই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। মাথা উঁচু করে গ্রিগর ফিসফিস করে বলল :

—'রুমালটা খুলে নাও... দেখতে পাওয়া যাচ্ছে... আমাদের বোধহয় দেখতে পায় নি।'

রুমাল খুলে নিল আকসিনিয়া। সূর্যমুখীর বন থেকে তপ্ত বাতাস ছুটে এসে ঘাড়ের নীচের সোনালী চুলের গুচ্ছ নিয়ে খেলতে শুরু করে দিল। গাড়ির শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

—'আমি যা ভেবেছি, তা হচ্ছে এই।' গ্রিগর আবার শুরু করল। আরও উত্তেজিত হয়ে বলল, 'যা হবার তা হয়েছে, আর ত ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। দোষারোপ করে লাভ কি? যেমন করেই হক দিন ত আমাদের কাটাতেই হবে।'

হাত দিয়ে ডাঁটা ভাঙতে ভাঙতে উদগ্রীব হয়ে শুনতে লাগল আকসিনিয়া। গ্রিগরের মুখের দিতে তাকাতেই তার দৃষ্টির শুষ্ক, কঠিন, ঔজ্জ্বল্য চোখে পড়ল।

—'আমি ভাবছি, শেষ করে দাও...'

আর্কসিনিয়া দুলে উঠল। কথার শেষটুকু শুনবার উদগ্র উৎকণ্ঠায় তার আঙুলগুলো কুঁকড়ে গেল, নাকের পাশদুটো ফুলে উঠল। আতঙ্ক আর অসহিষ্ণুতার আগুনে ঝলসে গেল মুখ। গলা শুকিয়ে গেল। সে ভাবল, গ্রিগর হযত বলতে যাচ্ছে : 'শেষ করে দাও স্তেপানেব সম্পর্ক।' কিন্তু বিরক্তিভরে কুঞ্চিত ঠোঁটদুটো চেটে নিয়ে গ্রিগর বলে ফেলল :

—'. শেষ করে দাও আমাদের সম্পর্ক।'

দাঁড়িয়ে উঠল আর্কসিনিয়া। বাতাসে দোল খাওয়া সূর্যমুখীব হলুদ মাথাগুলো ঠেলতে ঠেলতে গেটের দিকে দৌড়ুল।

—'আর্কসিনিয়া।' চপাস্বরে গ্রিগর ডাকল। গেটখোলার শব্দ হল।

মাথার টুপিটা খুলে ফেলল গ্রিগর। টুপির লাল চুড়োটা যাতে চোখে না পড়ে। তারপর আকসিনিয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখের সামনে যে নারীকে সে দেখতে পেল, সে আর্কসিনিযা নয়—আকসিনিয়ার সেই পরিচিত, প্রাণবন্ত, গজরাজ-গতি-ভঙ্গিমা নয—সে গতি-ভঙ্গিমা আর একজনের, আর এক অজানা, অপরিচিত নারীর।

॥ তিন ॥

রাই-কাটা শেষ করে গোলায় তুলতে না তুলতেই গম পাকল। কর্দমাক্ত মাঠ আর নাবাল জমিতে ঝলসানো পাতায় হলুদ রং ধরল; পাতা কুঁকড়ে নলের মত হয়ে গেল, ডাঁটাগুলো শুকিয়ে উঠল।

মহানন্দে সবাই বলাবলি করতে লাগল, এবাব ফসল হয়েছে চমৎকার। শিষগুলো পুরন্ত. দানাগুলো বড়সড়, নিটোল। কিন্তু বসন্তের পর পুব অঞ্চলের অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল কিছু ঘা খেয়েছিল, তাই ডাঁটাগুলো হয়েছে ছোট ছোট, খড়ে কোন কাজই হবে না।

ইলিনিচ্‌নার সঙ্গে কথাবার্তা বলে পান্তালিমন ঠিক করল, কোরশ্‌নভ বিয়ে দিতে রাজী হলে, পয়লা আগস্ট পর্যন্ত বিয়ে পিছিয়ে দিতে হবে। পাকাকথার জন্যে এখনও সে কোরশ্‌নভদের ওখানে যেতে পারে নি। তার কারণ, প্রথমত, ফসলকাটা শেষ করতে হবে, দ্বিতীয়ত, পছন্দমত একটা ছুটির দিন ঠিক করতে হবে।

মেলেখফরা ফসল কাটতে নামল শুক্রবারে। গাড়ির ছই খুলে ফেলে পান্তালিমন আটি বইবার মাচা বাঁধতে বসল। পিয়োত্রা আর গ্রিগর মাঠে চলল। পিয়োত্রা গেল ঘোড়ায়, গ্রিগর পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। গ্রিগর গুম হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে মুখের মাংসপেশী থরথর করে কেঁপে নীচের চোয়াল থেকে গালের হাড় অবধি উঠে আসছে। পিয়োত্রা দেখেই বুঝল, ভাই মনে মনে ফুঁসছে, এখুনি ফেটে পড়বে। গমের মত হলদে গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে তবু গ্রিগরের পেছনে লাগল। বলে উঠল :

—'সত্যি বলছি, মাগী নিজেই আমাকে বলছিল!'

—'যদি বলেই থাকে, তাতে কি হয়েছে?' গোঁফের প্রান্ত কামড়ে ধরে আমতা আমতা করে গ্রিগর বলল।

—'বলছিল, শহর থেকে যখন ফিরে আসছিলাম, মেলেখফদের সূর্যমুখীর ক্ষেতে গলার আওয়াজ পেলাম।'

—'থাম, পিয়োত্রা!'

—'সত্যিই গলার আওয়াজ। আর আমি বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকালাম..'

গ্রিগর চোখ পিটপিট করল, একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পিয়োত্রাকে ধমক দিয়ে বলল :

—'তুমি থামবে, না, কি?'

—'তুই ত আচ্ছা ছেলে! শেষ করতে দে না!'

—'খবরদার, পিয়োত্রা; হাতাহাতি হয়ে যাবে কিন্তু।' পিছিয়ে পড়ে গ্রিগর শাসালে। ভুরু উঁচিয়ে গ্রিগরের দিকে মুখ করে আসনে ঘুরে বসল পিয়োত্রা।

—'বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকালাম, তাকাতেই দেখি কি, দুই মানিকজোড় জড়াজড়ি করে শুয়ে আছেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কারা গো?' সে বলল, 'কারা আবার? আকসিনিয়া আর তোমার ভ্রাতা।' আমি বললাম...'

কাটাই-কলের পেছনে একটা দোফলা নিড়ুনি পড়েছিল, তারই বাঁটটা মুঠো করে ধরে পিয়োত্রার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল গ্রিগর্। লাগাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠল পিয়োত্রা, একেবারে ঘোড়াদুটোর সামনে গিয়ে পড়ল।

—'হেই দ্যাখ, বদমাশ!' পিয়োত্রা চেঁচিয়ে উঠল। 'ক্ষেপেছে রে একদম ক্ষেপে গেছে! মুখখানা তাকিয়ে দেখ একবার...'

নেকড়ের মত দাঁত খিঁচিয়ে গ্রিগর দোফলা নিড়ুনিটা দাদার দিকে ছুঁড়ে মারল। হাতে হাঁটুতে ভর দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল পিয়োত্রা। দোফলা নিড়ুনিটা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে মাটিতে কয়েক ইঞ্চি গিঁথে গেল, খাড়া হয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

চোখ পাকিয়ে সন্ত্রস্ত ঘোড়াটার লাগাম চেপে ধরে পিয়োত্রা খিস্তি করে উঠল।

—'আমাকে যে খুন করে ফেলছিলি, হারামজাদা!'

—'হ্যাঁ, খুনই করে ফেলতাম!'

—'আচ্ছা, হাঁদারাম ত তুই, একেবারে ক্যাপা। বাপের বেটাই বটে, খাঁটি তুর্কী।'

গ্রিগর মাটি থেকে নিড়ুনিটা টেনে তুলল, তারপর কাটাই-কলের পেছন পেছন চলল। আঙুল দিয়ে ইশারা করে পিয়োত্রা তাকে ডাকল :

—'এদিকে আয়। নিড়ুনিটা দে আমাকে।'

বাঁ-হাতে লাগাম রেখে, ফলার দিকটা ধরে নিড়ুনিটা টেনে নিল পিয়োত্রা। তারপর বাঁট দিয়ে গ্রিগরের শিরদাঁড়ায় আড়াআড়ি একটা ঘা কসিয়ে দিল।

—'তোকে চাবকানো দরকার।' গ্রিগরের দিকে চোখ রেখে রাগে গজগজ করতে করতে পিয়োত্রা বলল। সে তখন লাফ মেরে সরে গিয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই তারা সিগারেট ধরাল, চোখে চোখে তাকাল দুজনেই; তারপরই হো হো করে হেসে উঠল।

আর এক রাস্তা ধরে ক্রিস্তোনিয়ার বউ চলেছিল ঘর-মুখো। গ্রিগরকে দাদার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখল সে। রাই'এর আঁটির ওপর কোনরকমে টাল রেখে উঠে দাঁড়াল গাড়ির ভেতরে। কিন্তু তারপর কিছুই দেখতে পেলনা। মেলেখফদের কাটাই-কল আর ঘোড়াদুটো আড়াল করে ফেলল। গ্রামের রাস্তায় পেঁছুতে না পেঁছুতেই এক পড়শীকে চিৎকার করে বলল :

—'ক্লিমোফনা! ছুটে যা, তুর্কী বুড়োকে বল গে, তাতার-বাঁধের কাছে তার দুই ছেলে দো-ফলা নিড়ুনি নিয়ে মারামারি করছে। গ্রিগর নিড়ুনি বিঁধিয়ে দিয়েছে পিয়োত্রার পাঁজড়ায়, পিয়োত্রাও দিয়েছে..গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। কী বীভৎস!'

ওদিকে দুভাই তখন ফসল কাটা শুরু করে দিয়েছে। ক্লান্ত ঘোড়াদুটোকে ধমকে ধমকে পিয়োত্রার গলাটা বসে যাবার উপক্রম। আড়কাঠের ওপর ধুলোমাখা পা তুলে দিয়ে, কাটাই-কল থেকে বেরুনো আঁটিগুলো নিড়িয়ে চলেছে গ্রিগর। সারা স্তেপ জুড়ে নিড়ুনির কাজ চলছে। ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ উঠছে। স্তেপের সর্বত্র ফসলের আঁটি ছড়ানো। গাড়োয়ানদের নকল করে গর্তে গর্তে মেঠো ইঁদুর কিচমিচ করে ফিরছে।

—'আর দু-ফেরতা। তারপর থামিয়ে তামাক টেনে নেব।' কলের আওয়াজ ছাপিয়েই পিয়োত্রা চেঁচিয়ে বলল। গ্রিগর মাথা নাড়ল। শুকনো ঠোঁটদুটো ফাঁক করার সাধ্য নেই তার। গাদা-করা আঁটিতে ভাল করে নিড়ুনি দেবার জন্যে নিড়ুনির ফলার কাছাকাছি মুঠো করে ধরল গ্রিগর। দমকে দমকে নিঃশ্বাস নিতে লাগল, নোনা ঘাম কপাল বেয়ে নামতে লাগল, সাবানের মত চোখের মধ্যে এঁটে বসল। দুজনে ঘোড়া থামিয়ে মদ খেল, তারপর তামাক খেতে বসল।

—'কে যেন জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এদিকে আসছে রে।' হাতে চোখ আড়াল করে পিয়োত্রা বলল।

স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে, বিস্ময়ে ভুরু টান করল গ্রিগর।

—'বাবা আসছে, নিশ্চয়ই?'

—'পাগল হলি নাকি! কি চড়ে আসবে? দুটো ঘোড়াই তো আমরা নিয়ে এসেছি।'

—'না, বাবাই! বাবা ছাড়া কেউ নয়।'

ঘোড়-সওয়ার কাছে এসে পড়ল, মুহূর্ত পরেই তাকে স্পষ্ট দেখা গেল।

—'আরে, বাবাই তো?' উৎকণ্ঠিত বিস্ময়ে পিয়োত্রা যেন নাচ জুড়ে দিল।

—'বাড়িতে কিছু হয়েছে বোধহয়।' যে আশংকা দুজনের মনকে পীড়িত করছিল, তা প্রকাশ হয়ে পড়ল গ্রিগরের কথায়।

প্রায় দু'শহাত দূর থেকেই রাশ টানল পান্তালিমন। চামড়ার চাবুকটা মাথার ওপরে ঘুরিয়ে গর্জন করে উঠল :

—'আজ তোদের চাবকাব, হারামজাদারা!'

—'ব্যাপারটা কি!' পিয়োত্রা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল, গোঁফের অর্ধেকটাই মুখের ভেতরে ঢুকে গেল।

—'কাটাই-কলের ওদিকটায় তুমি যাও! আজ চাবকে লাল করবে, দেখছি। নীচে সেঁধুতে সেঁধুতেই চাবকে ছাল ছাড়াবে।' বাপ আর তার মাঝখানে কলটা রেখে গ্রিগর মুচকি হাসল।

দুলকি চালে ছুটতে ছুটতে ফসলের গাদার কাছে এসে ঘোড়াটা থামল। তার মুখ দিয়ে ফেনা উড়ছে। বাপের পাদুটো ঘোড়ার দুপাশে আছড়াচ্ছে (রেকাব ছাড়াই ঘোড়ায় চেপেছিল সে)। চাবুকটা ঘুরিয়ে নিয়ে পান্তালিমন ধমকে উঠল :

—'এখানে হচ্ছিল কি, শয়তানের বাচ্চারা?'

—'দেখছই ত, আমরা ফসল কাটছি!' চাবুকটার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে হাত দোলাল পিয়োত্রা।

—'কে কাকে নিড়ুনি দিয়ে মেরেছে? মারামারি হচ্ছিল কেন?'

গ্রিগর বাপের দিকে পেছন ফিরে জোরে ফিসফিস করে টুকরো টুকরো মেঘগুলো গুনতে শুরু করে দিল। বাপের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে পিয়োত্রা জবাব দিল :

—'কিসের নিড়ুনি? কে মারামারি করছে?'

—'কেন? মাগী ছুটে এসে যে... ডুকরে পড়ল, তোমার ছেলেরা নিড়ুনি নিয়ে মারামারি করছে? এ্যাঁ? বল না কি হয়েছে?' উত্তেজনায় পান্তালিমন মাথা ঝাঁকাতে লাগল। তারপর লাগাম ফেলে দিয়ে, ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল। 'তাই একটা ঘোড়া চেয়ে নিয়ে ছুটিয়ে এলাম...এ্যাঁ?'

—'কে বলেছে এসব?' গ্রিগর জিজ্ঞেস করল।

—'এক মাগী।'

—'মিথ্যে কথা বলেছে, বাবা। গাড়িতে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যাচ্ছিল, স্বপ্ন দেখেছে।

—'তাহলে ওই মাগীই,' আধা-চিৎকার, আধা-শিষ দিয়ে উঠল পান্তালিমন। মুখের লালা ছটকে মাখামাখি হয়ে গেল দাড়িতে। 'ওই ক্রিমোফনা! তাই বল! আচ্ছা? হারামজাদীকে চাবকাব আমি; চাবকে...' রাগের চোটে পান্তালিমন দাপাদাপি শুরু করে দিল।

নিঃশব্দ হাসিতে থরথর করে কাঁপছিল গ্রিগর। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মাটির দিকে। পান্তালিমন ভুরু থেকে ঘাম মুছতে লাগল; পিয়োত্রা বাপের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল না।

বহুক্ষণ দাপাদাপি করে একসময় ঠাণ্ডা মেরে গেল পান্তালিমন। কাটাই-কলের ওপর বসে কয়েক ফেরতা ফসল কাটল, তারপর ঘোড়ায় চেপে গ্রামে ফিরে গেল। চাবুকটা ভুলে ওখানে মাটিতে ফেলে গেল: সেটা তুলে নিয়ে নাচাতে নাচাতে পিয়োত্রা ভাইকে বলল :

—'বড় একটা ফাঁড়া কাটল রে! এটা চাবুক নয়! ঘা খেলে থে'তো করে ছাড়ত। তোর মুণ্ডু খসিয়ে দিত একেবারে।'

॥ চার ॥

সবচেয়ে অবস্থাপন্ন পরিবার বলে তাতার্স্ক গ্রামে কোরশ‍ুনভদের নামডাক আছে। তাদের চোদ্দজোড়া মোষ, ঘোড়া, প্রজননাগার থেকে কেনা মাদী ঘোড়া, গোটা পনর গাই, অসংখ্য গরুবাছুর, আর কয়েকশো ভেড়ার পাল। ব্যবসাদার মোখোভের মত টিনের চাল দেওয়া বাড়ি, খোপ খোপ দুটা ঘর। সুন্দর নতুন টালিতে বাঁধানো উঠোন, একর তিনেক জমি নিয়ে বাগান। মানুষ আর বেশি কি চায়?

তাই প্রায় ভয়ে ভয়ে, গোপন অনিচ্ছাতেই পান্তালিমন বিয়ের সম্বন্ধ করতে এ বাড়িতে প্রথমবার পা দিয়েছিল। কোরশ‍ুনভরা মেয়ের জন্যে গ্রিগরের চেয়ে অনেক বেশি অবস্থাপন্ন জামাই পেতে পারে, একথা পান্তালিমন জানত। সম্বন্ধ ফিরিয়ে দেবার ভয়ে তাই সে শঙ্কিতও ছিল। কোরশ‍ুনভদের কাছে সাধ্যসাধনা করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না তার কিন্তু ইলিনিচনা জোঁকের মত লেগে রইল। শেষ পর্যন্ত সে-ই বুড়োর একগ‍ুঁয়েমি ভাঙল। তাই একদিন গ্রিগর, ইলিনিচ্‌না আর জগৎসংসারের মুন্ডপাত করতে করতে গাড়ি নিয়ে পান্তালিমন কোরশ‍ুনভদের বাড়ির দিকে ছুটল।

ওদিকে কোরশ‍ুনভদের বাড়িতে ঘনিয়ে উঠেছিল এক তীব্র মতবিরোধ। মেলেখফরা চলে যাবার পরই নাতালিয়া বাপমাকে বলেছিল :

—'গ্রিগর যদি আমাকে ভালবাসে, আর কাউকে আমি ভালবাসব না।'

—'পছন্দ দেখ, বোকা মেয়ের,' বাপ উত্তর দিয়েছিল; 'রংটাই শুধু জিপ্‌সীদের মত পোড়া। লক্ষ্মী মা আমার! তোর ওরকম বর হক এ আমি চাই নি।'

—'আমি আর কাউকেই চাইনে বাবা।' চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল মেয়ের। তারপর কাঁদতে শুরু করে দিয়েছিল : 'তারচেয়ে আমাকে মঠে পাঠিয়ে দিও।'

—'ছোঁড়াটা একেবারে বাউন্ডুলে, মেয়ে ঘেঁসা, এঁড়ে-রাঁড়িদের পেছনে ঘুরে বেড়ায়।' তার বাপ শেষ অস্ত্র ছুঁড়েছিল।

'তাই হোক!'

নাতালিয়া বড় মেয়ে। বাপের আদুরে। বিয়ের জন্যে কোনদিন পীড়াপীড়ি করে নি তাকে। তার জন্যে কত সম্বন্ধই এসেছে : সম্বন্ধ এসেছে দূরের গ্রাম থেকে, অবস্থাপন্ন ঘর থেকে, পুরনো-আস্তিক পরিবার থেকে। কিন্তু কোন বরই পছন্দ হয় নি নাতালিয়ার। তাই সে সবের কোন ফলও হয় নি।

গ্রিগরের নিপুণতা, চাষ-বাসে অনুরক্তি আর কঠিন পরিশ্রমের জন্যে মিরন তাকে মনে মনে পছন্দই করত। ঘোড়-দৌড়ে যেদিন গ্রিগর প্রথম পুরস্কার পেল, তরুণদের ভিড়ের মধ্যে থেকে সেদিনই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তবু গরীব কাউকে, বিশেষ করে, বদনাম রটেছে এমন কোন ছেলের হাতে মেয়েকে তুলে দেওয়াটা একটু সম্মান হানিকর বলেই সে ভেবেছিল।

—'ছেলেটা খাটতে পারে খুব, দেখতে শুনতেও বেশ। নাতালিয়া একেবারে মজে গেছে।' তার লোমশ এবড়োখেবড়ো হাতে আলতো হাত বুলাতে বুলাতে রাত্রে ফিসফিস করে বৌ বলল।

বৌএর ঠান্ডা, শ্বকনো ব্বকের দিকে পেছন ফিরে ক্রুদ্ধকণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল মিরন:
—'তুমি থাম ত!'
—'তোমার ব্বদ্ধিশ্বদ্ধিও গোল্লায় গেল দেখছি। দেখতে শ্বনতে বেশ!' আমতা আমতা করে বলল, 'ওর ম্বখ দেখিয়ে ফসল কাটাবে তুমি? শেষটায় তুর্কীর হাতে মেয়ে দিতে হবে, এও বরাতে ছিল!'
—'ওদের পরিবার খাটিয়ে, অবস্থা স্বচ্ছলও,' আবার বউ বলল ফিসফিস করে। স্বামীর পিঠের কাছে সরে এসে শান্ত করার জন্যে তার হাতে হাত ব্বলাতে শ্বর্ব করল।
—'আরে, মোলো যা! সরে যাও, সরলে না? একটু জায়গা দাও আমাকে। হাত ব্বলাচ্ছ কেন? আমি কি বাছ্বরওলা গাই? জানো, তোমার নাতালিয়া কি! প্বর্ব্ব দেখলেই মজে যায়।'
—'মেয়েটার কথাও একটু ভাবা উচিত।' তার লোমশ কানে ম্বখ রেখে বিড়বিড় করে বৌ বলল। মিরন কিন্তু দেয়ালের সঙ্গে লেপ্টে, নাক ডাকিয়ে প্রমাণ করতে চাইল সে ঘ্বমিয়ে পড়েছে।

জবাবের জন্যে মেলেখফরা যখন এসে হাজির তখন ম্বস্কিলেই পড়ল কোরশ্বনভ। তারা এল ঠিক সকালের উপাসনার পর। গাড়ির পা-দানে পা দিতে গিয়ে ইলিনিচ্না গাড়ি উল্টে দিয়েছিল আর কি। পান্তালিমন কিন্তু আসন থেকে লাফিয়ে নামল তাজা মোরগের বাচ্চার মত।
—'ওই এসেছে ওরা! আজই এল কেন মরতে?' জানলা দিয়ে দেখতে পেয়ে মিরন আর্তনাদ করে উঠল।
—'ভাল আছেন তো!' দরজার চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে কর্কশ কণ্ঠে পান্তালিমন বলে উঠল। নিজের গলার চড়া স্বরে লজ্জা পেয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। আর, তাই কালো দাড়ির আধ-গোছা ম্বখে প্বরে, আইকনের সামনে অহেতুক ক্রশ করে ব্যাপারটা সামলে নেবার চেষ্টা করল।
—'ভালই।' তাদের দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে মিরন উত্তর দিল।
—'এবারে আবহাওয়াটা বেশ ভালই আছে।'
—'তাই হোক, ভালই থাকুক।'
—'এবার সবারই অবস্থা কিছ্ব ভাল যাবে।'
—'তাই ত মনে হচ্ছে।'
—'হ্যাঁ—এ্যা—এ্যা।'
—'হ্বঁম্।'
—'তাই আমরাও এসে পড়লাম মিরন গিগরিয়েভিচ্; এলাম, আপনারা কি ঠিক করলেন—সম্বন্ধ করতে ইচ্ছে আছে কি নেই, তাই জানতে।'
—'ভেতরে আস্বন, এসে বস্বন।' ফোলা, ম্বড়ি ভাঙা ঘাঘরার প্রান্ত দিয়ে মেঝের ধ্বলো প্রায় ঝেঁটিয়ে, ন্বয়ে পড়ে সবাইকে অভ্যর্থনা জানাল মারিয়া।
ইলিনিচ্না বসল, তার পপলিনের কোটটা খসখস করে উঠল। টেবিলের ফরাসী-কাপড়ের ঢাকনার ওপর কন্বই রেখে মিরন গ্রিগরিয়েভিচ্ চুপচাপ বসে রইল। কাপড়ের কোণে কোণে ম্বত জার, জারিনার, মাঝখানে সাদা টুপি মাথায় মাননীয়া রাজকুমারী আর জার নিকোলাস আলেকজান্দ্রোভিচের মাছি-খাওয়া, আঁকা ছবি।
স্তব্ধতা ভাঙল মিরন।

—'হ্যাঁ...আমরা ঠিক করেছি মেয়ে দেব। দেনা-পাওনা ঠিক হলেই আমরা কুটুম হতে পারি।'

কথাটা শোনা মাত্রই, ইলিনিচ্না তার চকচকে, ফুলোহাতা জ্যাকেটের কোন এক রহস্যময় গহ্বর থেকে—মনে হল, পিঠের ওপাশ থেকেই—টেনে বার করল বিরাট একখণ্ড সাদা-রুটি। ধপাস্ করে রুটিটা রাখল টেবিলের ওপরে। কোন এক অনির্দেশ্য কারণে ক্রশ ঝবতে চাইল পান্তালিমন, ঈপ্সিত পথের অর্ধেক পর্যন্ত উঠে, যথাযোগ্য আকৃতিতে বিন্যস্ত হয়েও তার সরু সরু আঙুলগুলো কিন্তু হঠাৎ তদের ভঙ্গি পরিবর্তন করে ফেলল। কর্তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই থ্যাবড়া, কালো, বুড়ো আঙুলটা তর্জনী আর মধ্যমার মাঝখানে অপ্রত্যাশিতভাবে ঘসা খেল, আর নির্লজ্জ আঙুলগুলো চোরের মত নীল রঙের ওভার-কোটের খোলা প্রান্তের পেছনে ঢুকে পড়ল, টেনে বার করল একটা বোতল, মাথাটা তার লাল।

উত্তেজনায় চোখ মিটমিট করে, মিরনের এবড়োখেবড়ো মুখের দিকে তাকাল পান্তালিমন। বোতলটা জড়িয়ে ধরে চওড়া পেটে চাপড় মেরে প্রস্তাব করল :

—'এবার তাহলে, আসুন বন্ধুগণ, ভগবানের নামে নিবেদন করে মদ খেয়ে, বরকনে আর বিয়ের চুক্তিটুক্তি আলোচনা করা যাক।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুজনে এত কাছাকাছি ঘেঁসে বসল যে, কোরশুনভের খোঁচা খোঁচা লাল দাড়ির গায়ে পান্তালিমনের তৈলাক্ত পাকানো দাড়ি ঘসা খেতে লাগল। দাবিদাওয়ার পরিমাণ নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে পান্তালিমনেব নিঃশ্বাসে শশার আচারের মিঠে গন্ধ ছড়াতে লাগল।

—'বেয়াইমশাই গো।' কর্কশকণ্ঠে ফিসফিস করে সে শুরু করল।

—'ওগো বেয়াইমশাই।' চড়া-গলায় চিৎকার করে আবার বলল।

—'ও বেয়াইমশাই।' বড় বড় ভোঁতা দাঁত বার করে গর্জন করে উঠল সে।

—'আপনার দাবি মেটানো আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়। ভাবুন, আপনি নিজেই ভেবে দেখুন বেয়াইমশাই, কি লজ্জায় ফেলাব চেষ্টা করছেন। গেইটার, তার সঙ্গে গোলোশ—এক; লোমের কোট—দুই; পশমী জামা—তিন; একটা বেশমের রুমাল—চার। তার মানে, আমার সর্বনাশ।'

পান্তালিমন হাতদুটো ছড়িয়ে দিল। মাথা নীচু করল মিরন; স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল টেবিল ঢাকনার দিকে। ভদকা আর শশার আচারের রসে ঢাকনাটা একেবারে মাখামাখি। ঢাকনার মাথার দিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাহারের লেখাটা পড়তে লাগল : 'রুশ স্বৈর শাসক দল।' চোখ নামাল নীচের দিকে। 'মহামান্য, সাম্রাট বাহাদুর নিকোলাস...' আর সবটুকু ঢাকা পড়েছে একটা আলুর খোসায়। সে স্থির-দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছবির দিকে। সম্রাটের সবটা চেহারা চোখে পড়ছে না, একটা খালি ভদ্কার বোতল রয়েছে তার উপরে। সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চোখ মিটমিট করে, সাদা কোমরবন্ধওয়ালা দামী উর্দির কাযদাটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু তা ঢাকা পড়েছে শশার পিচ্ছিল বিচিতে। চওড়া ধারওয়ালা টুপির ভেতর থেকে আত্মতৃপ্তির ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন সম্রাজ্ঞী, চারপাশে গোল হয়ে ফিরে আছে ফ্যাকাশে মেয়ের দল। মিরন এমন অপমান বোধ করল যে, তার চোখে জল এসে পড়ল। মনে মনে ভাবতে লাগল : 'খুব ত বাবা ফুটুনি এখন, দেখাচ্ছে যেন ঝুড়ির ভেতর থেকে মাদী রাজহাঁস তাকিয়ে আছেন। থাক অমন করে, মেয়েগুলোকে যদ্দিন না পরের হাতে তুলে দিতে হয়। তখন আমিও তাকিয়ে দেখব, হাঁউমাউ করে বেড়াবে।'

পান্তালিমন তার কানের কাছে কালো ভ্রমরের মত গুণগুণ করতে লাগল। জলভরা ঝাপসা চোখদুটো তুলল মিরন, শুনতে লাগল :

—'এখন পণ হিসেবে এইসব আপনাদের মেয়েকে—আর এখন ত বলতে পারি আমাদের মেয়েকে—এই গেইটার, এই গোলোস আর পশমের কোট দিতে হলে হাটে নিয়ে একটা গাই বেচতে হবে।'

—'তাহলে, এতে আপত্তি করছেন আপনি?' টেবিলের ওপরে একটা ঘুসি মারল মিরন।

—'ঠিক যে আপত্তি করছি, তা নয়...'

—'আপত্তি করছেন আপনি?'

—'সবুর, বেয়াই!'

—'যদি আপত্তি থাকে চুলোয় যান, তাহলে।' ঘামে ভেজা হাতখানা টেবিলের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিল মিরন, গেলাসগুলো মেঝের ওপরে ছটকে পড়ল।

—'গোয়ালের গাই বেচতে হবে একটা!' পান্তালিমন মাথা নাড়ল।

—'পণের জিনিস দিতেই হবে। ওর একটা নিজের যৌতুকের বাক্স আছে। ওকে যদি পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে যা বলি, জেনে রাখুন। এই আমাদের কসাক-প্রথা। আগের কালে এমনি হত, আমরা আগের কালের প্রথা মেনে চলি।'

—'জেনে রাখলাম।'

—'জেনে রাখুন!'

—'এবার ছেলে-ছোকরারা নিজেদেরটা ঠেকাক। আমরা আমাদেরটা ঠেকিয়েছি, আর সকলের মতই বেঁচেবর্তে আছি। ওদেরও ওই রকম করতে দিন।'

দুজনের দাড়ি মিশে বিচিত্র বর্ণ ধারণ করল। পান্তালিমন একটা রসকসহীন শুঁটকো শশা খেতে শুরু করল, তারপর পাঁচ-মেশালি অনুভূতির দ্বন্দ্বে ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল।

দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে দুই বেয়ানঠাকরুণ বসে আছে সিন্ধুকের ওপর। বকবকানির চোটে দুজনেই কালা হবার উপক্রম। চেরির মত লাল ছোপ লেগেছে ইলিনিচ্‌নার, ভদ্‌কার কৃপায় সবুজ হয়ে উঠেছে মারিয়া, যেন বরফের ঝাপটা-খাওয়া শীতের 'পিয়ার'। বলল :

—'অমন মানিক-জোড় দুনিয়া ঢুঁড়েও পাবেন না। মেয়ে আমার কর্মিষ্ঠা, মান্যি-জনের মান্যি জানে, আপনার কথায় চোপ্য করবে না কক্ষনো।'

—'আমিও ত তাই বলি।' বাধা দিয়ে ইলিনিচনা বলে উঠল। বাঁহাতে চিবুক রেখে, ডানহাতে মারিয়ার বাঁ-কনুই জড়িয়ে ধরল। 'আমিও ত তাই বলেছি ওকে, বলে বলে মুখ ব্যথা হয়ে গিয়েছে, শুয়োরের বাচ্চাকে। এই ত সেদিন রবিবারে বেরুচ্ছিল, ডেকে বললাম: 'হারামজাদীকে ঝেঁটিয়ে কবে তাড়াবি, অলপ্পেয়ে? বুড়ো হলাম, আর কতদিন এ বেলেল্লা-পানা দেখা কপালে আছে? ওই স্তেপানই একদিন তোর ফস্টিনস্টি ঘুচিয়ে দেবে!'

দরজার ফাটল দিয়ে ভেতরের দিকে তাকাল মিত্‌কা, তার নীচে নাতালিয়ার ছোট বোন দুটি নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করতে লাগল। নাতালিয়া বসে রইল কোণের ঘরে। জ্যাকেটের আঁটসাঁট-হাতায় চোখের জল মুছতে লাগল। তার সামনে যে নতুন জীবনের দরজা খুলছে তাতে ভীত, শঙ্কিত হয়ে উঠল সে, অজানার পীড়নে পীড়িত বোধ করতে লাগল।

সামনের ঘরে ভদ্‌কার তৃতীয় বোতল খালি হয়ে গেল। ঠিক হল, পয়লা আগস্ট বরকনের দুহাত এক করা হবে।

॥ পাঁচ ॥

বিয়ের তোড়জোড়ের হাঁকডাকে কোরশুনভদের বাড়িখানা মৌ-চাকের মত সরব হয়ে উঠল। অতিদ্রুত কনের জামাকাপড় সেলাই-ফোঁড়াই চলল। রোজ সন্ধ্যায় বসে বসে নাতালিয়া চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বরের জন্যে ছাগলের লোমের দস্তানা আর স্কার্ফ বুনতে লাগল। ভাড়া-করা এক মেয়ে-দর্জিকে নিয়ে অন্ধকার নেমে না আসা পর্যন্ত তার মা সেলাই-কল চালিয়ে যেতে লাগল। বাপ আর মুনিষদের সঙ্গে মিত্‌কা যখন ক্ষেতের কাজ সেরে ফেরে হাত-পা না ধুয়ে, চাষের ভারী বুট না খুলেই নাতালিয়ার কাছে ছোটে। বোনের পেছনে লাগতে তার ভারী আনন্দ।

—'কি রে, বুনছিস?' স্কার্ফের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সংক্ষেপে প্রশ্ন করে।

—'হ্যাঁ; কি হয়েছে তাতে?'

—'বোন, বোন, বোকার হদ্দ তুই! তোর ওপর খুশী না হয়ে উল্টে তোর নাক থ্যাবড়া করে দেবে।'

—'কিসের জন্যে?'

—'আরে, চিনি ত গ্রিগরকে; বন্ধুলোক আমার। মানুষটাই ওই রকম; কামড়াবে, বলবে না কেন কামড়াল।'

—'মিছে বলো না, দাদা। ভাবো, আমি যেন জানি না তাকে।'

—'আমার চেয়ে ভাল জানিস না। একই সঙ্গে স্কুলে যেতাম আমরা।'

নাতালিয়া চটে ওঠে, চোখের জল চেপে, কাঁদকাঁদ মুখে ঝুঁকে পড়ে স্কার্ফের ওপর।

—'কিন্তু সবচেয়ে সাংঘাতিক, ওর যক্ষ্মা আছে। তুই একটা বোকা মেয়ে নাতালিয়া! ওকে ভাগা! ঘোরায় জিন চাপাই, বলে আসি ওদের সবাইকে...'

মিত্‌কার হাত থেকে নাতালিয়াকে বাঁচায় ঠাকুরদা গ্রীসাকা; গিঁটওয়ালা লাঠি ভর দিয়ে মেঝেয় ঠুক ঠুক করতে করতে, শনের মত দাড়ির ভেতরে অঙুল চালাতে চালাতে ঘরে ঢোকে; মিত্‌কার কোমরে লাঠির খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করে:

—'বলি, এখানে হচ্ছে কি, এ্যাঁ?'

—'এই একটু দেখা করতে এলাম, দাদু।' সবিনয়ে উত্তর দেয় মিত্‌কা।

—'দেখা করতে? হুঁ, এখুনি বেরিয়ে যাও, যাও। কুইক মার্চ।'

ঊন-সত্তরটি বছর ধরাধামে বিচরণ করছে গ্রীসাকা ঠাকুরদা। ১৮৭৭ সালের তুর্কী-যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, হয়েছিল জেনারেল গুর্কোর আরদালি; কিন্তু কু-নজরে পড়ে ফেরত এসেছিল নিজের রেজিমেণ্টে। দুটো ক্রশ আর একটা সেণ্ট জর্জ মেডেল পেয়েছিল প্লেভ্‌না আর রোস্‌সিৎঝের গোলাবর্ষণে বীরত্বের জন্যে। এখন ছেলের সঙ্গেই আছে। তার সরল মন, নিষ্কলুষ সাধুতা আর অতিথেয়তায় ছেলে বুড়োর সম্মান কুড়িয়ে, জীবনের বাকি বছরগুলো কাটছে পুরনো স্মৃতির পাতা উল্টে।

গ্রীষ্মকালে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে মাটিতে লাঠি ঠেকিয়ে, মাথা নীচু করে, বাড়ির সামনের রোয়াকের ওপর বসে থাকে। টুপির থ্যাবড়ানো চুড়োটা বোজা চোখের ওপর কালো ছায়া ফেলে। লাঠি মুঠো করে ধরে থাকায় বাঁকা আঙুলগুলোর ভেতর দিয়ে, হাতে ফুলো ফুলো শিরাগুলোর মাঝ দিয়ে ধীর মন্থর গতিতে রক্ত চলাচল করে। নাতালিয়া জিজ্ঞেস করে :

—'তুমি কি মরতে ভয় পাও, দাদু?'

বুড়ো সরু ঘাড়টা বাঁকায়, যেন তার উর্দির কড়কড়ে কলার ছাড়াই অমনি করে ঘাড়টা বেঁকে; তারপর, সবজে-ধূসর জুলপি-দুটো কাঁপায়। হেসে উত্তর দেয় :

—'মরণের জন্যেই ত বসে আছি, অতিথি-নারায়ণের জন্যে যেমন করে বসে থাকে। সময় ত হয়েই গিয়েছে—আমার দিনও কাটিয়ে গেলাম, জারের সেবা করলাম, অঢেল ভদ্‌কা খেলাম।'

ঠাকুরদার হাতে চাপড় মেরে নাতালিয়া চলে যায়। বুড়ো তেমনিভাবে বসে থাকে, মাথা নীচু করে লাঠি দিয়ে মাটি খোঁড়ে। নাতালিয়ার আসন্ন বিয়ের সংবাদে সে বাহ্যিক শান্তভাব দেখিয়েছে, কিন্তু ভেতর ভেতর রেগে আগুন হয়ে উঠেছে। খাবার টেবিলে নাতালিয়া তাকে সব সময়ে বাছাবাছা জিনিস দেয়, কাপড়চোপড় কাচে, মোজা বোনে, পা-জামা, সার্ট সেলাই করে। আর তাই, তার কানে যখন খবরটা পৌঁছুল, তখন দিন কয়েক নাতালিয়ার দিকে রুক্ষচোখে তাকাল।

—'মেলেখফেরা নাম-করা কসাক। প্রোকোফের সঙ্গে আমি একই রেজিমেণ্টে ছিলাম। কিন্তু ওর নাতিটা কেমন? হ্যাঁ রে?' সে মিরনকে জিজ্ঞেস করল।

—'খুব খারাপ নয়।' এড়িয়ে যাবার মত উত্তর দিল মিরন।

—'কিন্তু একটা কথা পর্যন্ত না বলে চলে গেল। আজকাল বুড়োদের কেউ মান্যি করে না আর। তা হোক গে, নাতালিয়ার যখন পছন্দ...'

কথাবার্তার ভেতরে সে প্রায় মাথাই গলায় না। রান্নাঘর থকে বেরিয়ে মিনিটখানেক টেবিলের ধারে বসে, এক গেলাস, কি দু গেলাস ভদ্‌কা খায়, তারপর মৌতাত হয়েছে বুঝতে পারলেই বাইরে চলে যায়। দুদিন ধরে নিঃশব্দে সে খুশী খুশী নাতালিয়াকে লক্ষ্য করল। তারপর স্পষ্টতই ব্যবহারে নরম হয়ে গেল। তাকে কাছে ডাকল :

—'নাতালিয়া রে, ও নাতালিয়া! নাতনি আমার তাহলে ভারী খুশী, এ্যাঁ?'

—'নিজেই ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি না, দাদু।' বিশ্বাস করে নাতালিয়া বলল।

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে; যিশু তোর মঙ্গল করুন। ভগবান তোর...'তারপর তিক্ত, বিদ্বিষ্ট কণ্ঠে তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'আমি বেঁচে থাকতেই তুই চলে যাবি, এ আমি ভাবতেও পারি নি... তোকে ছাড়া আমার দিনগুলো তেতো হয়ে যাবে রে।'?

মিত্‌কা শুনছিল কথাগুলো, মন্তব্য করল :

—'তুমি ত আরও প্রায় একশ বছর বাঁচবে, দাদু। ততদিনও ওকে অপেক্ষা করতে বল নাকি— বেশ লোক ত তুমি!'

বুড়ো চটে আগুন হয়ে গেল, মাটিতে পা ঠুকে চেঁচিয়ে উঠল :

—'ভাগ, ভাগ, কুত্তীর বাচ্চা! ভাগ বলছি! শয়তান কাঁহাকা! কে তোকে আমাদের কথা শুনতে বলেছে?'

॥ ছয় ॥

ভোজের পর প্রথম দিনই বিয়ের দিন ঠিক হল। 'মাতা মেরীর স্বর্গারোহণের দিন' গ্রিগর এল ভাবী বধূকে দেখতে। সবচেয়ে সেরা ঘরে গোল-টেবিলের ধারে বসল, কনের সইদের সঙ্গে সূর্যমুখীর বিচি আর বাদাম ছোঁড়াছুঁড়ি করল; তারপর আবার গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। নাতালিয়া তাকে এগিয়ে দিতে এল। চকচকে নতুন জিন চাপানো ঘোড়াটা বাঁধা ছিল চালার নীচে। সেখানে দাঁড়িয়ে নাতালিয়া বুকের ভেতরে হাত চালিয়ে দিল; লজ্জায় লাল হয়ে, প্রেমার্ত চোখে গ্রিগরের মুখের দিকে তাকিয়ে, বুকের ছোঁয়ায় গরম একটা পুঁটুলি গুঁজে দিল তার হাতে। গ্রিগর উপহারটা হাতে নিতে গিয়ে নেকড়ের মত দাঁতগুলোর শুভ্রতায় নাতালিয়ার চোখ ধাঁধিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল :

—'জিনিসটা কি?'

—'খুলে দেখো তোমার জন্যে নিজে হাতে একটা তামাকের থলি বুনেছি।'

চুমু খাবার জন্যে নাতালিয়াকে ছেলেমানুষের মত কাছে টেনে আনল গ্রিগর। নাতালিয়া কিন্তু বুকে হাত ঠেকিয়ে, পিছনে পিঠ বেঁকিয়ে, প্রাণপণে সরিয়ে রাখল তাকে। ঘরের জানলার দিকে শঙ্কিত চোখে তাকাল।

'দেখবে, ওরা দেখে ফেলবে আমাদের।' নাতালিয়া ফিসফিস করে বলল।

—'দেখুক গে!'

—'লজ্জা করছে আমার।'

গ্রিগর যখন ঘোড়ায় চড়ল, নাতালিয়া লাগাম ধরে রইল। ভুরু কুঁচকে পায়ে রেকাব ধরে নিল গ্রিগর। ঠিকঠাক হয়ে বসে উঠোন পেরিয়ে চলে গেল। নাতালিয়া গেট খুলে দিল, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

—'এগারো দিন আরও।' মনে মনে হিসেব কবল নাতালিয়া। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একটু হাসল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

সবুজ বর্শা-ফলকের মত গমের চারা মাটি ভেদ করে মাথা তুলে বেড়ে ওঠে দিনে দিনে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়-কাক উড়ে পড়লেও চোখে পড়ে না আর। মাটির বুক থেকে পান করা রস এসে পেঁছোয় ফসলেব শিষে, মিষ্টি, সুগন্ধী দুধে স্ফীত হয়ে ওঠে ফসলের কণা; তারপর ফুল ফোটে, সোনালী ধুলোর আস্তরণ পড়ে শিষে। স্তেপের বুকে চাষী এসে দাঁড়ায়, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

তবু আনন্দ জাগে না তার মনে। যতদূরে তাকায়—ফসলের ক্ষেত মাড়িয়ে গিয়েছে একপাল গরু-বাছুর; পাকা ফসল মাড়িয়ে মাঠ করে দিয়ে গিয়েছে। তারা যেখানে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানেই বৃত্তাকারে ছড়িয়ে আছে খুরে দলা গম। জ্বলে ওঠে চাষী, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তাই দেখে।

আর্কসিনিয়ারও হল তাই। সোনালী ফুল হয়ে ফুটে ওঠা তার হৃদয়ের অনুভূতি-গুলোকে কাঁচা-চামড়ার ভারী বুট দিয়ে মাড়িয়ে গিয়েছে গ্রিগর। কালি মাখিয়ে দিয়েছে তাদের, পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে—আর সব কিছুর ইতি হয়েছে এখানে।

মেলেখফদের সূর্যমুখীর বাগান থেকে ফেরবার পর থেকেই আর্কসিনিয়ার মনটা শূন্য হয়ে গেল, যেন আগাছা আর কাঁটাঝোপ গজানো একখানা অনাদৃত উঠোনের মত বন্য হয়ে উঠল। রুমালের কোণা চিবুতে চিবুতে পথ হাঁটে, কান্নার তোড়ে গলা বুজে আসে। ঘরে ঢুকে, কান্নায় দম আটকে তীব্র যন্ত্রণায়, মাথার ভেতরে চাবুক-হানা অগাধ শূন্যতায় মেঝের ওপরে আছড়ে পড়ে। তারপরই সব ঠিক হয়ে যায়। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা মন্দীভূত হয়ে আসে, বুকের তলায় চাপা পড়ে যায়।

গরু-বাছুরের খুরে-দলা ফসল আবার মাথা তোলে। শিশিরে ভিজে, রোদে পুড়ে আবার খাড়া হয়ে ওঠে ফসলের শিষ; প্রথম প্রথম ভারী বোঝার ভারে নুয়ে পড়া মানুষের মত নেতিয়ে থাকে, তারপর মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়; তাদের মাথার ওপরে দিনগুলো উজ্জ্বল হয়ে ঝরে, বাতাস দোল দিয়ে ফেরে।

আর্কসিনিয়া রাত্রে যখন তীব্র কামনায় স্বামীকে আলিঙ্গনে বাঁধে, তখনও ভাবে আর একজনের কথা, বুকের ভেতরে ঘৃণা মেশে এক গভীর প্রেমের সঙ্গে। সে নারী, নবতর অপযশের পথ খুঁজে বেড়ায়—কিন্তু সে ত পুরনো কলঙ্কই; যে নাতালিয়া প্রেমের জ্বালাও জানে না, প্রেমের মাধুর্যও বোঝে না, তারই কাছ থেকে গ্রিগরকে ছিনিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত করে। স্তেপানের ভারী মাথাটা ডানহাতের ওপর রেখে, রাতে শুয়ে শুয়ে সে পথ খোঁজে। আর্কসিনিয়া শুয়ে শুয়ে পথ খোঁজে, কিন্তু একটি মাত্র সিদ্ধান্তেই সে দৃঢ় হয়ে ওঠে; সে ছিনিয়ে নেবে গ্রিগরকে, ছিনিয়ে নেবে সকলের কাছ থেকে, তাকে ভাসিয়ে দেবে প্রেমের বন্যায়। তাকে সে ধরে রাখবে, যেমন করে ধরে রেখেছিল আগের দিনে।

দিনের বেলা কিন্তু আর্কসিনিয়া তার চিন্তাকে ডুবিয়ে দেয় গেরস্থালির সমস্যায় আর কাজে। মাঝে মাঝে গ্রিগরের সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হলেই সে ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে; গর্বভরে তুলে ধরে তার অনিন্দ্যসুন্দর দেহ, যে দেহ কেঁদে মরে গ্রিগরের জন্যে। দৃষ্টি তুলে ধরে নির্লজ্জের মত, তার চোখের অতলস্পর্শ কৃষ্ণ-তারকার দিকে, প্রতিদ্বন্দ্বে আহ্বান করে যেন।

প্রতিবার দেখা হবার পরই আর্কসিনিয়ার প্রতি এক তীব্র কামনায় গ্রিগরকে অভিভূত করে ফেলে। বিনা কারণেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে সে, ঝাল ঝাড়ে দুনিয়া আর মায়ের ওপরে; কিন্তু প্রায় সময়ই টুপিটা তুলে নিয়ে, উঠোনের পেছনে গিয়ে মোটা মোটা বুনো-গাছের ডাল কাটতে শুরু করে, যতক্ষণ না ঘেমে নেয়ে ওঠে। তাই দেখে পান্তালিমন গালমন্দ করে :

—'বেটা বদমাশ; যা ডাল কেটেছে, তাতে দুটো বেড়া হয়ে ভেসে যায়। দাঁড়া না, বেটা! বিয়ের পর এমন করে কাটতে পারিস যদি, তবে ত বুঝি!'

॥ দুই ॥

রঙ্‌বেরঙে সাজানো চার-জোড়া ঘোড়ায় বরের গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে। মেলেখফদের উঠোনে রয়েছে গাড়িগুলো, আর, পরবের পোশাকপরা একদল গ্রামের লোক তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

পিয়োত্রা বরকর্তা। গায়ে দিয়েছে ফ্রক-কোট, পরনে নীল ডোরা দেওয়া পা-জামা, মাথায় বেঁধেছে দুটো সাদা রুমাল। তার গমের মত গোঁফের ফাঁকে পরিবর্তনহীন একটুকরো হাসি পাকাপাকিভাবে লেগে আছে। ভাইকে বলল :

—'লজ্জা পাস নে, গ্রিগর; মাথা উঁচু করে রাখিস বাচ্চা মোরগের মত।'

উইলো-ডালের মত সজীব তন্বী দারিয়া। পরনে একটা র‍্যাপ্‌সবেরী রঙের পশমী ঘাঘরা। পিয়োত্রাকে কনুয়ের একটা খোঁচা মেরে মনে করিয়ে দিল :

—'যাবার সময় হল যে।'

—'তোমরা উঠে পড়।' পিয়োত্রা হুকুম করল, 'আমার গাড়িতে পাঁচজন, আর বর।' লাল টকটক করছে ইলিনিচ্‌নার মুখ; বিজয়ীর ভঙ্গিতে সে গেট খুলে দিল। একটার পেছনে একটা—চারখানা গাড়ি ছুটল রাস্তা দিয়ে।

পিয়োত্রা বসল গ্রিগরের পাশে। তাদের উল্টো দিকে বসে লেসের রুমাল দোলাল দারিয়া। গান ধরেছিল তারা, চাকার দাগ ধরে চলতে চলতে ঝাঁকুনি লেগে বাধা পড়তে লাগল। কসাক-টুপির গোলাপী ফিতে, নীল-কালো উর্দি, ফ্রক-কোট, সাদা রুমাল-বাঁধা জামার হাতা, মেয়েদের রুমালে বিকীর্ণ রামধনু রঙ, আন্দোলিত স্কার্ফ, আর গাড়ির পেছনে উৎক্ষিপ্ত মসলিনের মত ধুলোর রাশি—সব কিছু মিলিয়ে একখানা বিচিত্রবর্ণ ছবির মত হয়ে উঠল।

গ্রিগরের খুড়তুতো ভাই আনিখি চালাচ্ছে বরের গাড়ি। ঘোড়ার লেজের কাছে হুমড়ি খেয়ে, আসন থেকে ঝুঁকে পড়ে চাবুক মারছে আর শিষ্ দিচ্ছে। ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলো আরও জোরে দড়িতে টান মারছে।

—'গাড়ি পাশে হটাও।' বরের মামা ইলিয়া ওঝোগিন দ্বিতীয় গাড়িখানা নিয়ে তাদের ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে করতে চিৎকার করে উঠল। মামার পেছনে দুনিয়ার হাসিমাখা মুখখানা গ্রিগরের চোখে পড়ল। আনিখিও চেঁচিয়ে উঠল :

—'কভি নেহি!' পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে উঠে কান-ফাটা শিষ্ দিয়ে উঠল। চাবুকের চোটে পাগলের মত কদমে ছুটল ঘোড়া। আনিখির পালিশকরা বুট জোড়া হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে দারিয়া বলে উঠল, 'পড়ে যাবে যে, পড়ে যাবে!' তাদের পাশ থেকে ইলিয়া মামা বলে উঠল, 'জোরসে চালাও!' কিন্তু চাকার একটানা আর্তনাদ আর ঘড়ঘড়ানিতে তার কণ্ঠস্বর ডুবে গেল।

মেয়ে পুরুষে ঠাসাঠাসি করা আর দুটো গাড়ি চলল পাশাপাশি। কাগজের লাল, নীল বিবর্ণ গোলাপ আর ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে ঘোড়াগুলোকে। কপাল আর কেশরের ভেতর দিয়ে ফিতে পরানো হয়েছে। উঁচুনীচু রাস্তায় গাড়িগুলো ঝড়াং ঝড়াং শব্দ তুলছে, সাবানের মত ফেণার চূর্ণ উড়ছে ঘোড়ার মুখ থেকে, আর তাদের ঘর্মাক্ত, ভিজে পিঠের ওপর কাগজের গোলাপগুলো নাচছে, বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

কোরশুনেভদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একদল বাচ্চা আরোহীদের অপেক্ষায় তাকিয়ে ছিল। রাস্তায় ধুলো উড়তে দেখেই চেঁচাতে চেঁচাতে উঠোনে ঢুকল :

—'আসছে, ওরা আসছে!'

ঘড়ঘড় করতে করতে গাড়িগুলো গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। গ্রিগরকে ধরে সিঁড়ি'র দিকে নিয়ে গেল পিয়োত্রা, আর সবাই পেছনে পেছনে এগুলো।

বারান্দার দিকে রান্নাঘরের দরজাটা তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। পিয়োত্রা ঘা মারল, সুর করে বলল ঃ

—'ভগবান যিশু, দয়া করুন!'

—'আমেন!' দরজার ওপাশ থেকে উত্তর এল।

আবার পিয়োত্রা আউড়ে গেল কথাগুলো, তিনবার ঘা মারল দরজায়। প্রতিবারই একই উত্তর এল। অবশেষে সে জিজ্ঞেস করল :

—'ভেতরে আসতে পারি?'

— 'স্বচ্ছন্দে।'

দরজা খুলে গেল। বাপ-মা'র তরফ থেকে নাতালিয়ার ধর্ম-মা র‍্যাপসুবেরীর মত লাল টুকটুক ঠোঁটের হাঁসি দিয়ে সসম্মানে অভ্যর্থনা জানাল। এক গেলাস তাজা টলটলে ক্‌ভাস্‌ মদ হাতে দিয়ে বলল, 'বরকর্তা, খেয়ে দেখুন এটা, স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। গোঁফটা একটু সমান করে নিয়ে খেয়ে ফেলল পিয়োত্রা; সকলের চাপা হাসির মধ্যে আমতা আমতা করে বলল :

—'বেশ, অভ্যর্থনা ত জানালেন! এবার দাঁড়ান, আমি অবিশ্যি ও পথে যাব না। সুদে আসলে তুলে ছাড়ব।'

বরকর্তা আর নাতালিয়ার ধর্ম-মা'র বুদ্ধির প্রতিযোগিতা চলতে চলতেই বরযাত্রীদের প্রত্যেকের জন্যে, বিয়ের চুক্তি অনুসারে, তিন গেলাস করে ভদ্‌কা এসে হাজির হল।

ইতিমধ্যেই বিয়ের জামাকাপড়ে ঘোমটা দিয়ে, দুই বোনের পাহারায়, নাতালিয়া টেবিলের পেছনে এসে দাঁড়াল। মারিয়া একটা বেলুন উঁচিয়ে রইল, চোখে প্রতিদ্বন্দ্বের ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়ে আগ্রিপিনা একটা আগুন উস্কাবার লোহার ডাণ্ডা নাচাল। গলগল করে ঘামতে ঘামতে, ভদ্‌কার ঈষৎ নেশার ঝোঁকে মাথা নোয়াল পিয়োত্রা। তার গেলাসের মধ্যে পঞ্চাশ কোপেক ফেলে দিল। বেলুন দিয়ে টেবিলে ঘা মেরে মারিয়া হেঁকে উঠল ঃ

—'এত কমে হবে না! মেয়ে আমরা বেচব না!'

গেলাসের মধ্যে আর একবার পিয়োত্রা একটা ছোট রৌপ্য-মুদ্রা ফেলে দিল।

—'ওকে দিচ্ছিনা আমরা।' নতমুখী নাতালিয়াকে কনুয়ের ধাক্‌কা মেরে ছোট-বোনরা দৃঢ়-কণ্ঠে বলে উঠল।

—'এসব আবার কি? যা দেবার, আমরা আগেই দিয়ে দিয়েছি, বেশিই দিয়েছি।' পিয়োত্রা প্রতিবাদ জানাল।

—'ভাগ মেয়েরা, ভাগ এখান থেকে!' মিরন ধমক দিল, হাসতে হাসতে এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। কনের আত্মীয় যারা টেবিলের চারপাশে বসেছিল, তাই দেখে উঠে দাঁড়াল, নবাগতদের জায়গা ছেড়ে দিল।

গ্রিগরের হাতে একটা শালের কোনা ধরিয়ে দিল পিয়োত্রা, বেঞ্চের ওপরে লাফিয়ে উঠে তাকে কনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। কনে বসেছিল আইকনের নীচে। ঘেমে

ওঠা কম্পিত হাতে শালের আর এক কোনা ধরে রইল। গ্রিগর তার পাশে বসল।

টেবিলের চারপাশে হাড় চিবুনোর কড়মড় শব্দ উঠল। অতিথিরা সেদ্ধমুরগী হাত দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ল, তারপর চুলে হাত মুছে ফেলল। মুঠোভর্তি মুরগীর মাংস চিবুনোর সময় আনিখির চিবুক বেয়ে জামার কলার অবধি হলদে চর্বি ছড়িয়ে পড়ল।

গ্রিগর প্রথমে রুমাল দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা তার আর নাতালিয়ার চামচদুটোর দিকে করুণচোখে তাকাল, তারপর তাকাল পায়েসের বাটির দিকে। পায়েসের বাটি থেকে ধোঁয়া উঠছে। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে তার, ক্ষিদের চোটে পেটের ভেতরে তালগোল পাকাচ্ছে। কিন্তু বিয়ের আইনে খাওয়া নিষেধ।

বরযাত্রীরা অনেকক্ষণ ধরে মনের আনন্দে খেয়ে চলল। পুরুষের গায়ের ঘামের ধুনোর মত গন্ধের সঙ্গে, মেয়েদের গায়ের তীব্র, জ্বালাকর, মসলার মত গন্ধ মিশেছে। বহুদিন বাক্সে বন্ধ করে রাখা ঘাঘরা, ফ্রক কোট, আর শাল থেকে ন্যাপথালিনের গন্ধ উঠছে।

নাতালিয়ার দিকে গ্রিগর আড়-চোখে তাকাল। আর এই প্রথম তার চোখে পড়ল, নাতালিয়ার ওপরের ঠোঁটটা একটু ফোলা, নীচের ঠোঁটের ওপর টুপির মাথার মত ঝুলে পড়েছে। আরও দেখল, ডান গালে চোয়ালের নীচে একটা আঁচিল, দুটো সোনালী চুল গজিয়েছে সেই আঁচিলের ওপর। আর এতে কেন যেন তার মেজাজ খিঁচড়ে গেল। মনে পড়ে গেল আকসিনিয়ার সরু ঘাড়টা, আর ঘাড়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়া ফুলো ফুলো কোঁকড়া চুল। মনে হল, কে যেন তার পিঠের ওপরে এক মুঠো রোঁয়াওলা খড় ফেলে দিল। গাযে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। চাপা অসহায় মনোভাব নিয়ে গ্রিগর দেখতে লাগল, আর সকলে মুখ বুজে চিবুচ্ছে, হাপুস হুপুস শব্দ উঠছে, জিব চাটছে।

টেবিল ছেড়ে সে যখন উঠল, কে একজন তার গায়ের ওপরেই নিঃশ্বাস ফেলল। সে নিঃশ্বাসে গমের রুটির ঝাঁঝালো গন্ধ। অপদেবতার নজর থেকে রক্ষা করার জন্যে তার পায়ের বুটের ফাঁকে একমুঠো গম ঢেলে দিল। বাড়িফেরার সারাটা রাস্তা তার পায়ের নীচে গমের দানাগুলো খচখচ করতে লাগল। সবার ওপরে সার্টের আঁটো কলারের ফিতেয় তার দমবন্ধ হবার উপক্রম হল, আর রাগের চোটে মরিয়া হয়ে সে নিজেনিজেই বিড়বিড় কবে শাপমন্যি করতে শুরু করল।

॥ তিন ॥

শোভাযাত্রা ফিরে আসতেই দেখা হল মেলেখভ বুড়োবুড়ীর সঙ্গে। পান্তালিমনের রুপোলি ছোপ দেওয়া দাড়ী ঝকমক করছে, হাতে ধরে রেখেছে আইকন; বৌ পাশে দাঁড়িয়ে, পাতলা ঠোঁট দুটো পাথরের মত শক্ত হয়ে লেপ্টে আছে।

'হপ্'-ফল আর গমবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গ্রিগর আর নাতালিয়া এগিয়ে গেল তাদের আশীর্বাদ নিতে। আশীর্বাদ করতে গিয়ে পান্তালিমনের দু'গাল বেয়ে চোখের জল

নেমে এল। পান্তালিমন ভুরু কোঁচকাল, চঞ্চল হয়ে উঠল সে, মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল, তার এই দুর্বলতা পাছে কারুর নজরে পড়ে।

বরকনে ঘরের ভেতরে চলে গেল। পিয়োত্রাকে খুঁজতে সিঁড়ি পর্যন্ত এসে দারিয়া ছুটে গেল দুনিয়ার কাছে। জিজ্ঞেস করলঃ

—'পিয়োত্রা কোথায়?'

—'দেখিনি ত!'

—'সে যাবে পুরুত ডাকতে, আর তারই টিকি দেখা যাচ্ছে না, চুলোয় যাক!'

পিয়োত্রাকে সে খুঁজে বার করল। যতটা ক্ষমতায় কুলোয় তার চেয়েও বেশি ভদ্‌কা টেনেছে সে, গাড়ির ভেতরে শুয়ে গোঁ গোঁ করছে। চিল যেমন করে ছোঁ মেরে ভেড়ার বাচ্চা ধরে, তেমনি করে তাকে চেপে ধরল দারিয়া। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললঃ 'গণ্ডেপিণ্ডে গিলেছ, জড়ভরত! এখন ওঠো, পুরুত ডেকে আনো।'

—'ভাগো হিয়াঁসে! হুকুম চালাচ্ছ, বলি, লোকটা কে হে তুমি?' পিয়োত্রা প্রতিবাদ জানাল।

দারিয়ার চোখে জল এসে পড়ল। স্বামীর মুখের মধ্যে আঙুল চালিয়ে জিভ টেনে ধরল, বমি করাবার চেষ্টা করল। তারপর একবালতি কুয়োর ঠাণ্ডাজল ঢেলে দিল গায়ে; যতটা পারে তাকে মুছিয়ে শুকনো করে পুরুতের কাছে নিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেখা গেল, গির্জায় গ্রিগর নাতালিয়ার পাশে হাতে একটা মোমবাতি ধরে দাঁড়িয়ে আছে, তার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িযে একদল লোক ফিসফাস করছে। তাদেরই গায়ে তার চঞ্চল দৃষ্টি ঘুরছে, আর বারংবার মনে মনে অস্বস্তিকর কথাগুলো আবৃত্তি করছেঃ 'আমার সব গেল। সব শেষ হয়ে গেল।' পেছন থেকে পিয়োত্রা কাশল। ভিড়ের মধ্যে কোথায় যেন দেখল, দুনিয়ার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। তার মনে হল, সব মুখই সে চিনতে পারছে। সকলের গলার বেসুরো ঐক্যতান আর পুরুতের একঘেয়ে ধুয়োটা ধরে নিল সে। চরম বৈরাগ্যে পেয়ে বসল তাকে। ফাদার ভিস্‌সারিঅনের গোড়ালি-নীচু জুতোটা মাড়িয়ে সে মণ্ডটার চারপাশে ঘুরতে লাগল। পিয়োত্রা ফ্রক-কোটে মৃদু টান দিতেই থেমে গেল; মোমবাতির দপদপ করা ছোট ছোট শিখাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। ঘুমঘুম আলসেমিতে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, সেটা ঝেড়ে ফেলার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। শুনতে পেল ফাদার ভিস্‌সারিঅন বললঃ

—'এবার আংটি বদল কর।'

তারা আংটি বদল করল। পিয়োত্রার চোখে চোখ পড়তেই গ্রিগর যেন নিঃশব্দে প্রশ্ন করল, 'দেরি হবে আর?' পিয়োত্রার ঠোঁটের কোনদুটো কুঁচকে গেল, সে হাসি চেপে নিলঃ 'এইত হয়ে গেল আর কি!' তারপর, গ্রিগর স্ত্রীর ভেজা, পানসে ঠোঁটে চুমু খেল। নেভানো মোমবাতি থেকে গির্জার ভেতরে কটু গন্ধ ছড়াতে লাগল, জনতা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল দরজার দিকে।

নাতালিয়ার বড়সড় কর্কশ হাতখানা হাতের মুঠোয় ধরে গ্রিগর বাইরের বারান্দায় চলে এল। কে যেন তার মাথার টুপিতে চাপড় মারল। এক ঝাপটা উষ্ণ পুবের হাওয়ায় 'ওয়ার্ম-উডে'র গন্ধ নাকে এল। স্তেপের বুক থেকে সন্ধ্যার শীতলতা ভেসে আসছে। ডনের ওপিঠে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বৃষ্টি নামল বলে। গির্জার সাদা রঙের বেড়ার বাইরে থেকে, কল-কোলাহল ছাপিয়ে, তার কানে এল উসখুস করা ঘোড়ার গলায়-বাঁধা ঘণ্টার আমন্ত্রণ-জানানো মৃদুমন্থর টুংটাং শব্দ।

॥ চার ॥

বরকনে গির্জায় না-যাওয়া পর্যন্ত কোরশ্নোভরা মেলেখফদের বাড়িতে এসে পৌঁছল না। তারা এল কিনা দেখতে, পান্তালিমন কয়েকবার গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেল। কিন্তু ফনিমনসার সার দেওয়া ধূসর রাস্তাটা একেবারে জনমানবহীন। ডনের দিকে চোখ পড়ল তার। সোনালী-হলুদ রং লেগেছে বনে বনে। ডনের ধারে পাতা শর-গুলো ক্লান্তিভরে জলাভূমির ওপরে নুয়ে পড়েছে। গোধূলির সঙ্গে মিশে প্রথম শরতের তন্দ্রাঘন নীলাভ কুয়াশা গ্রামখানাকে জড়িয়ে রেখেছে। সে তাকিয়ে রইল ডনের দিকে, খড়ি-রঙের পাহাড়, নদীর ওপারে রক্তিম আবছায়ায় ঘাপটি মেরে থাকা বনভূমি, আর স্তেপের দিকে। চৌ-মাথার পেছনটায়, যেখানে রাস্তা মোড় নিয়েছে, সেখানে আকাশের গায়ে সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে রাস্তার ধারের উপাসনা-বেদিটার রেখায়িত দৃশ্য।

পান্তালিমনের কানে এল প্রায়-অস্পষ্ট চাকার শব্দ, আর কুকুরের ডাক। বারোয়ারি-তলা পেরিয়ে দু'খানা গাড়ি এসে পড়ল রাস্তায়। প্রথমটায় বসে আছে মিরন, পাশে বৌ। উল্টোদিকে নতুন উর্দিগায়ে গ্রীসাকা ঠাকুর্দা। বুকে সেণ্ট জর্জ ক্রশ আর মেডেলগুলো ঝোলানো। কোচোয়ানের জায়গায় মিত্কা বসে আছে উদাসীনের মত। সে-ই চালাচ্ছে গাড়ি। মুখে ফেনা ওঠা ঘোড়াগুলোকে চাবুকও মারতে হচ্ছে না।

পান্তালিমন গেট খুলে দিলে, গাড়ি দু'খানা উঠোনে ঢুকে পড়ল। ঘাঘরার প্রান্ত ধুলোয় লুটোতে লুটোতে ইলিনিচ্না যেন বারান্দা থেকে উড়ে এল।

—'কি ভাগ্যি! কি ভাগ্যি! গরীবের কুঁড়ে ঘরে পায়ের ধুলো দিয়ে কৃতার্থ করুন!' অতি-স্থূল কোমরটা নুইয়ে সে নমস্কার করল।

ঘাড়টা একপাশে কাত করে, হাতদুটো ছড়িয়ে দিয়ে পান্তালিমন অভ্যর্থনা জানাল ঃ

—'ভেতরে আসতে আজ্ঞা হোক, অধীনের বিনীত নিমন্ত্রণ।'

ঘোড়াগুলো খুলে নিতে হুকুম করে সে নবাগতদের কাছে চলে এল। নমস্কারের পালা শেষ করে বাড়ির কর্তা-গিন্নির পেছন পেছন তারা সবচেয়ে সেরা ঘরে এসে ঢুকল। সেখানে টেবিলের চারপাশে আধামাতাল অভ্যাগতেরা অপেক্ষা করছিল। তাদের পৌঁছনোর কিছুক্ষণ পরেই নব-দম্পতি ফিরে এল গির্জা থেকে। তারা ঘরে ঢুকতেই এক গেলাস ভদ্কা ঢালল পান্তালিমন, চোখে জল এসে পড়ল তার।

—'তাহলে, মিরন গ্রিগরিয়েভিচ্, আমাদের ছেলে মেয়ের জন্যে এই গেলাস। আমাদের মতই ওদের জীবনের পথ শুভ হক। সুখে ঘরকন্না করুক, সুস্থদেহে বেঁচে বর্তে থাক!'

বড়সড় একটা গেলাস থেকে ভদ্কা খাইয়ে দেওয়া হল গ্রীসাকা ঠাকুর্দাকে, অর্ধেক গেল তার মুখে, অর্ধেক ঢুকল তার উর্দির শক্ত কলারের পেছনে। গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকির আওয়াজ উঠতে লাগল। বোতলের পর বোতল উড়তে লাগল। এমনই হল্লা শুরু হল যেন বাজার বসেছে। কোরশ্নোভদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় কোলোভেইদিন টেবিলের প্রান্তে বসেছিল, গেলাস উঁচু করে ধরে গর্জন করে উঠল ঃ

—'এ মদ তেতো!'

—'তেতো! তেতো!' টেবিলের চারপাশে অভ্যাগতরা বসেছিল, তারা সঙ্গে সঙ্গে কলরব করে উঠল।

—'সত্যি, তেতো!' লোকভর্তি রান্নাঘর থেকে সমর্থন এল।

ভুরু কুঁচকে গ্রিগর বউ-এর পানসে ঠোঁটে চুমু খেল। বিষ-নজরে তাকাল চারপাশে। উত্তেজিত, আরক্ত মুখগুলো। রুক্ষ, নেশা-জড়িত এলোমেলো দৃষ্টি আর হাসি। লোভীর মত চিবিয়ে চলেছে মুখে, নক্সা-তোলা টেবিল ঢাকনার ওপরে লালা ঝরে পড়ছে। বহুকণ্ঠের বিকট চিৎকার।

ফোকলা-দেঁতো কোলোভেইদিন মুখ হাঁ করে গেলাসটা উঁচু করলঃ

—'এ মদ তেতো!'

—'তেতো!' আর একবার চিৎকারের পুনরাবৃত্তি হল।

ঘৃণামাখানো দৃষ্টিতে গ্রিগর তার মুখের দিকে তাকাল। 'তেতো' বলে চিৎকার করে উঠবার সময়, দাঁতের মাঝখানে কালসিটেপড়া তার জিভটা চোখে পড়ল গ্রিগরের।

—'চুমু খাওগো, চুমু খাও, মানিক-জোড়!' পিয়োত্রার মুখ থেকে থুথু ছটকাল।

রান্নাঘরের ভেতরে দারিয়া, চোখমুখ তার লাল হয়ে উঠেছে। নেশার ঝোঁকে সে গান জুড়ে দিল। সবাই ধরল তার সঙ্গে। সে গান সংক্রামিত হল অভ্যাগতদের ঘরে। সকলেরই গলা মিশল, কিন্তু সবাইকে ছাড়িয়ে উঠল ত্রিস্তোনিয়ার শার্সি-কাঁপানো বৃষভকণ্ঠস্বর।

গান থামল। আবার খাওয়াদাওয়া শুরু হল।

—'এই মাংসটা চেখে দেখুন!'

—'হাতটা সরান, আমার স্বামী তাকিয়ে আছে।'

—'তেতো! তেতো!'

রান্নাঘরের মেঝেটা আর্তনাদ করে কাঁপতে শুরু করল। গোড়ালি ঠোকার আওয়াজ উঠল। একটা গেলাস আছড়ে পড়ল মাটিতে; কাচ ভাঙার ঝনঝন আওয়াজ হুল্লোড়ে চাপা পড়ে গেল। টেবিলের পাশে যারা বসে আছে, তাদের মাথার ওপর দিয়ে রান্নাঘরের ভেতরটা দেখতে পেল গ্রিগর। চিৎকার আর শিষের তালে তালে মেয়েরা নাচতে শুরু করেছে। চওড়া পাছাগুলো নাচাচ্ছে (সরু পাছা কারুরই নেই, কারণ প্রত্যেকেই পাঁচটা, ছটা করে ঘাঘরা পরেছে), লেসের রুমাল দোলাচ্ছে, নাচের তালে তালে কনুই উঠছে, নামছে।

তিন-থাকের 'একর্ডিয়ন'-বাজনা বাজছে তাল রেখে। বাজনদার শুরু করল কসাকনাচের গৎ। একটা চিৎকার উঠলঃ

—'গোল হও, গোল হয়ে দাঁড়াও সবাই!'

—'একটু চেপে দাঁড়াও!' মেয়েদের ধাক্কা দিয়ে পাশে সরিয়ে পিয়োত্রা ধমক দিল।

গ্রিগর নড়েচড়ে বসল, নাতালিয়াকে চোখ ইসারা করল।

—'পিয়োত্রা কসাক-নাচ নাচবে! দেখো তাকিয়ে!'

—'কার সঙ্গে নাচবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

—'দেখছ না? তোমার মার সঙ্গে।'

বাঁ-হাতে রুমাল নিয়ে মারিয়া লুকিনিচ্না কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। ছোট

ছোট পা ফেলে পিয়োত্রা তার কাছে এগিয়ে গেল, পিঠ নুইয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে, উঠে দাঁড়াল, আবার পেছনে পা-ফেলে নিজের জায়গায় চলে এল। লুকিনিচনা ঘাঘরা উঁচু করে ধরল, যেন জলা-মাঠের ভেতর দিয়ে হাঁটবে, বুড়ো আঙ্গুল ঢুকে তালটা তুলে নিল, তারপর পুরুষের মত পা ছুঁড়ে, সমর্থনসূচক বিকট কলরবের মধ্যে নাচ জুড়ে দিল।

'একর্ডিয়ন'-বাজনার গৎ তুললো উঁচু পর্দায়। পিয়োত্রা কিন্তু অবিশ্বাস্যরকমের ছোট ছোট পা ফেলে বাজনার সঙ্গে তাল রেখে চলল, তারপরই চেঁচিয়ে উঠে উবু-হয়ে বসে পড়ল; ঠোঁটের কোনে গোঁফ কামড়ে, বুটের গোড়ায় হাতের চেটো দিয়ে চাপড় মারতে মারতে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। দ্রুততালে ওপরনীচে করে হাঁটু দুলিয়ে চলল, সামনের কয়েকটা চুল মাথার ওপরে লাফাতে লাগল।

একদল দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, তাদের ভিড়ে গ্রিগরের দৃষ্টি আটকে গেল। শুধু তার কানে আসতে লাগল অভ্যাগতদের চিৎকার, আর লোহার নাল লাগানো গোড়ালির একটানা চড়্‌বড়্ আওয়াজ, যেন পাইন-কাঠ পুড়ছে আগুনে।

তারপর মিরন নাচল ইলিনিচনার সঙ্গে; গম্ভীর মুখে অভ্যস্ত কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে তালে তালে এগিয়ে এল তারা। একটা টুলের ওপরে দাঁড়িয়ে পান্তালিমন দেখতে লাগল তাদের; খোঁড়া পাটা দোলাতে দোলাতে জিভ দিয়ে টক্‌টক্ আওয়াজ করতে লাগল। পায়েব বদলে নাচতে লাগল তার জিভ আর কানের মাকড়ি।

যারা নাচে পাকা নয়, তারাও কসাক নাচ ও কয়েকটা কঠিন নাচের চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সবাই চেঁচাতে লাগলঃ

—'মাটি করো না হে!'

—'ছোট ছোট পা ফেল! আরে, তুমি, এ্যাই !'

—'ওর পা-টা আলগোছেই পড়ে, কিন্তু পাছাটা বড় ভারী।'

—'চালাও চালাও চালিয়ে যাও দাদা।'

এসবকিছুর অনেক আগেই নেশায় একেবারে বুঁদ হয়ে বসেছিল গ্রীসাকা ঠাকুর্দা। বেঞ্চের ওপর বসে থাকা পাশের লোকটার হাড় বাবকবা পিঠ জড়িয়ে ধরে ভোঁমরার মত তার কানে কানে গুন গুন করে বললঃ

—'কোনবছর প্রথম ফৌজে ঢুকেছিলেন?'

পাশের লোকটা বুড়ো। প্রাচীন ওক-গাছের মতই স্থবির। সে উত্তর দিলঃ

—'১৮৩৯ সনে।'

—'কবে?' কান বাড়িয়ে দিল গ্রীসাকা।

—'বললাম ত, ১৮৩৯ সনে।'

—'কি নাম আপনার? কোন রেজিমেণ্টে ছিলেন?'

—'মাক্‌সিম্ বোগোতিরিয়েভ। বাকলানোভের রেজিমেণ্টে কর্পোরাল ছিলাম।'

—'মেলেখফদের কেউ হন আপনি?'

—'কি বললে?'

—'জিজ্ঞেস করছিলাম, পরিবারের নাম?'

—'হ্যাঁ আমি বরের দাদু, মায়ের দিক থেকে।'

—'বাকলানোভের রেজিমেণ্ট বললেন না?'

বুড়ো গ্রীসাকার দিকে ছানিপড়া চোখ তুলে তাকাল। তারপর ঘাড় নাড়ল।

—'আপনি তাহলে ককেশাস অভিযানের সময় সঙ্গে ছিলেন নিশ্চয়ই?'

'—আমি খোদ বাকলানোভের অধীনেই ছিলাম, ককেশাস অভিযানেও সাহায্য করেছি। জনকয়েক বাছাবাছা কসাক ছিল আমাদের রেজিমেণ্টে। 'গার্ড'-দের মত মাথায় লম্বা, কিন্তু একটু কুঁজো, লম্বা হাত, চওড়া কাঁধ। এই রকম লোক ছিল আমাদের, বাছা! কার্পেট চুরি করার জন্যে আমাদের স্বর্গীয় জেনারেল আমাকে পর্যন্ত চাবুক মেরেছিলেন...'

—'আর আমি ছিলাম তুর্কি-অভিযানে। হ্যাঁ? সত্যি, আমি ছিলাম সেই অভিযানে।' চুপসে যাওয়া বুকখানা ফোলাল গ্রীসাকা, মেডেলগুলো টুং টাং করে উঠল।

—'...সকালে একটা গ্রাম দখল করেছি আমরা। দুপুরেই বেজে উঠল পাগলা ঘণ্টি।' গ্রীসাকার কথায় কান না দিয়ে বুড়ো বলে চলল।

—'তখন আমাদের রেজিমেণ্ট লড়ছিল রোস্‌সিত্‌ঝের আশেপাশে। আমাদেরটা ছিল বারো নং ডন কসাক। লড়ছিল তুর্কী 'জেনিজারি'-দের সঙ্গে।' তাকে বলল গ্রীসাকা।

—'পাগলা ঘণ্টি যখন শুনতে পেলাম, আমি একটা ঘরের মধ্যে...'

—'হ্যাঁ,' গ্রীসাকা বলে চলল। বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগল সে, ক্রুদ্ধ হয়ে হাত দোলাল। 'তুর্কী 'জেনিজারি'রা মাথায় সাদা থলে পরে। হ্যাঁ? সাদা থলে মাথায়।'

—'...পাগলা-ঘণ্টি ত বাজল। আমি স্যাঙাতকে বললাম, 'এবার আমাদের হটতে ত হবেই, তিমোফি, কিন্তু তার আগে দেয়ালের কার্পেটটা নিতে হবে।'

—'গুলিগোলার মধ্যে হিম্মত দেখিয়ে আমি পেলাম দু'টো জর্জ মেডেল। এক তুর্কী মেজরকে জ্যান্ত ধরেছিলাম আমি।' গ্রীসাকা ঠাকুর্দা কান্না জুড়ে দিল, বুড়োর শুকনো শির-দাঁড়ার ওপর একটা কিল মেরে বসল। চেরির জেলিতে মুরগীর মাংসের টুকরো চুবিয়ে নিয়ে বুড়ো কিন্তু নোংরা টেবিল ঢাকনার দিকে নির্জীবের মত তাকিয়ে রইল। আমতা আমতা করে বলে চলল:

—'এবার শোন, বাছা, শয়তান মাথার মধ্যে কি পোকাই না ঢোকাল। যা নিজের নয়, তা কোনদিন ছুঁইনি। কিন্তু দেখলাম সেই কার্পেট, ভাবলাম, ঘোড়ার পেটি হবে ভাল...'

—'ও সব জায়গা আমি দেখেছি নিজের চোখে. কালাপানি পেরিয়ে ওদেশেও গিয়েছি আমি।' গ্রীসাকা বুড়োর চোখের দিকে তাকাতে চাইল, কিন্তু লোমশ ভুরু আর দাড়ির জঙ্গলে তার চোখদুটো ঢাকা। তাই সে কৌশল করল। তার গল্পের মোক্ষম জায়গায় বুড়ো কান দেয়, এই তার ইচ্ছে। গৌরচন্দ্রিকা না করেই সে তখন তখনই একেবারে গল্পের মাঝখান থেকে শুরু করে দিল: 'ক্যাপ্টেন হুকুম দিল, ঘোড়া হাঁকাও সওয়াররা! এগিয়ে চল! এগিয়ে চল!'

কিন্তু বাকলানোভ রেজিমেণ্টের কসাক-বুড়ো মাথাটা পেছনে সরিয়ে নিল. যেন তূরী ভেরীর আওয়াজে আক্রমণের জন্যে উদ্যত হয়ে উঠেছে; টেবিলে কিল মেরে ফিস ফিস করে উঠল:

—'বর্শা তাক করো! তলোয়ার খোলো, বাকলানোভ জোয়ানরা।' হঠাৎ তার গলার স্বর জোরালো হয়ে উঠল, ছানিপড়া চোখদুটো ধকধক করে উঠল, আগুন জ্বলে উঠল যেন। দন্তহীন মাড়ি বিস্তৃত করে সে গর্জন করল, 'বাকলানোভ জোয়ানরা! আক্রমণ কর...এগিয়ে চলো!'

বুড়ো তারপর গ্রীসাকার দিকে তাকাল। তার দৃষ্টিতে তারুণ্য আর বুদ্ধির ছোপ। আর দাড়ির ওপর টপটপ করে চোখের জল ঝরতে লাগল। জল সে মুছল না।

গ্রীসাকাও উত্তেজিত হয়ে উঠল:

—'হুকুম দিল, তলোয়ার তুলে ধরল; ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলাম আমরা। তুর্কী 'জেনিজারি'-রা এইভাবে রয়েছে।' আঙুল দিয়ে টেবিল ঢাকনার ওপরে একটা আঁকাবাঁকা চতুষ্কোণ আঁকল। 'আমাদেরও কামান দাগছে। তিন তিনবার চার্জ করলাম আমরা। তিনবারই ওরা হটিয়ে দিল। যতবারই চেষ্টা করি, পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে ঘোড়সওয়াররা। ট্রুপ-কমাণ্ডার হুকুম দিতেই আমরা ফিরলাম। ধাওয়া করলাম পেছন পেছন। চুরমার করে দিলাম তাদের। ঘোড়ার খুরের নীচে পিষে ফেললাম। দুনিয়ার কোন ঘোড়সওয়ার দাঁড়াবে কসাকদের সামনে? ওরা জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেল। চোখে পড়ল, ওদের অফিসার ঠিক সামনে দিয়ে একটা বাদামি রঙের ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। দেখতে বেশ খাপসুরত, কালো জুলপি। পেছনে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেয়েই পিস্তল বার করল। গুলি ছুঁড়ল, কিন্তু লাগল না। জোরসে ছুটিয়ে পাকড়াও করলাম তাকে। দু'টুকরোই করছিলাম তাকে, কিন্তু কি ভাবলাম যেন। হাজার হক, একটা মানুষ ত বটে। ডান হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরতেই, জিন থেকে লাফিয়ে পড়ল। হাত কামড়ে দিল, তবু তাকে ছাড়লাম না কিন্তু...'

বিজয়ীর ভঙ্গিতে গ্রীসাকা বুড়োর দিকে তাকাল। কিন্তু বুড়োর তেরচা বিশাল মাথাটা বুকের ওপর নেতিয়ে পড়েছে; আরাম করে সে নাক ডাকাচ্ছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

সার্জেই মোখোভ তার বংশের ইতিহাস অনেক পুরুষ পেছন থেকে টানতে পাবে।

প্রথম পিতরের রাজত্বকালে বিস্কুট আর বারুদ বোঝাই একখানা সরকারী বজরা ডনের ভাটিতে আঝভ-সাগরের দিকে চলেছিল। ডনের উজান-পথে ডাকাতদের ছোট্ট শহর চিগোনক। সেই শহরের কসাকরা একদিন রাত্রে বজরার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুমন্ত প্রহরীদের মেরে ফেলেছিল; বিস্কুট আর বারুদ লুট করে বজরাখানা ডুবিয়ে দিয়েছিল।

জার ভোরোনেবা থেকে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন। তারা চিগোনক শহর পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল, দোষী কসাকদের নির্মমভাবে জবাই করেছিল। একটা ভাসন্ত ফাঁসিকাঠে চল্লিশজনকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। উচ্ছৃঙ্খল গ্রামগুলোকে ভয় দেখানোর জন্যে সেটাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল ডনের ভাটির স্রোতে।

চিগোনকের যেখানে যেখানে মানুষের বাস্তুভিটে পড়েছিল, বছর দশেক পরে সেসব জায়গায় আবার বসতি গড়ে উঠতে লাগল। আর তারই সঙ্গে জারের নির্দেশে মোখোভ নামে এক রুশ চাষী গোয়েন্দা হিসেবে সেখানে বাস করতে এল। তার ব্যবসা ছিল ছুরির বাঁট, তামাক, চকমকি পাথর, আর কসাকদের প্রতিদিনকার টুকিটাকি জিনিস-

পত্তরের। সে চোরাই মাল কিনে আবার বিক্রি করত; বছরে একবার কি দ্বার ভোরোনেঝ্ যেত, ওপরে ওপরে দেখাত যেন মালপত্তর কিনতে যাচ্ছে; কিন্তু আসলে যেত কর্তৃপক্ষকে জেলার হালচাল সম্পর্কে খবরাখবর দিতে।

এই র্শ-চাষী নিকিতা মোখোভ থেকেই ব্যবসায়ী মোখোভ পরিবারের জন্ম। কসাকদের দেশে তারা বহুদিনের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল। মেঠো ঝোপের মত সারা জেলায় তাদের বংশ ছড়িয়ে গেল। ভোরোনেঝের লাট-সাহেব তাদের প্র্বপ্র্ষকে যে নিদর্শন-পত্র দিয়েছিল, সেটা অর্ধেক পচে গেলেও তারা সসম্মানে সেটা টিকিয়ে রেখেছিল; আজও বোধহয় টিকে থাকত যদি সার্জেই মোখোভের ঠাকুর্দার আমলে অমন ভীষণ অগ্নিকান্ড না ঘটত। এই মোখোভ একবার তিনতাসের জ্য়ো খেলতে গিয়ে সর্বস্ব খ্ইয়েছিল। তব্ আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় আগ্ন লেগে গেল। পক্ষাঘাতে পঙ্গ্-বাপের শেষকৃত্য সেরে সার্জি প্লাতোনোভিচ্ মোখোভকে শ্য়োরের লোম আর পাখির পালক কিনে গোড়া থেকে শ্র্ করতে হল। প্রতিটি পাই পয়সার জন্যে জেলার কসাকদের ঠকিয়ে, নিংড়ে বছর পাঁচেক সে কষ্টেস্ষ্টে দিন কাটাল। তারপর 'গর্বাছুরের দালাল সেরিওঝ্কা' থেকে একদিন একেবারে সার্জি প্লাতোনোভিচ্ হয়ে দাঁড়াল। স্চ, কাঁটা, ফিতের একটা ছোট দোকান খ্লল। এক পাগলা প্র্তের মেয়েকে বিয়ে করল; যৌতুকও কম পেল না। তারপর একটা কাপড়ের দোকান খ্লল। সার্জি প্লাতোনোভিচ্ ঠিক সময়েই কাপড়ের ব্যবসা শ্র্ করেছিল। এই সময় ফৌজী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, যেখানে যেখানে অন্বর বালি-জমি—ডনের বাঁ-পাড়ের সেইসব জায়গা ছেড়ে দিয়ে কসাকদের গ্রামকে গ্রাম ডান-পাড়ের দিকে সরে আসছিল। জিনিস পত্তরের জন্যে মাইল তিরিশেক কি আরও বেশি হাঁটার বদলে তারা হাতের কাছেই মনোহারী জিনিসে বোঝাই মোখোভের দোকানটা পেয়ে গেল। মোখোভ তার ব্যবসা তিন-থাক-দেওয়া 'একর্ডিয়নে'র মত বাড়িয়ে ফেলল। সাধারণ গ্রামজীবনের সবকিছ্রই ব্যবসা করতে লাগল। এমনকি চাষের জিনিস পত্তরও সরবরাহ করতে আরম্ভ করল। ব্যবসাব্দ্ধিতে চতুর সার্জির প্রচুর পয়সা এল। তিনবছরের মধ্যেই একটা ফসল-তোলা কল বসাল। আগের পক্ষের বৌ মারা যাবার বছর দ্য়েক পর একটা ময়দাকল তৈরি করতে শ্র্ করে দিল।

শক্তম্ঠোয় সে তাতার্স্ক আর আশেপাশের গ্রামগ্লোকে নিংড়ে নিতে লাগল। এমন কোন পরিবার নেই যার মোখোভের কাছে দেনা নেই। ময়দাকলের জন্যে নয়জন খাটে, সাতজন দোকানে, চারজন দেখাশোনার কাজে। মোটমাট কুড়িটি পরিবারের উদরান্ন নির্ভর করে মোখোভের মর্জির ওপরে। তার আগের পক্ষের দ্টো ছেলেমেয়েঃ মেযে এলিজাবিয়েতা, আর ছেলে ভ্লাদিমির, আল্সে, গলার রোগে ভোগে। দ্বিতীয় পক্ষের বৌ আন্না বাঁজা। তার দিক্‌ভ্রান্ত মাতৃত্ব আর সঞ্চিত বিদ্বেষের বর্ষণ হয় ছেলেমেয়ের ওপর। আন্নার স্নায়বিক দ্র্বলতা ছেলেমেয়ের ওপরে খারাপ প্রভাব ফেলেছে। আস্তাবলের ম্নিষ কি রাঁধ্নীর ওপরে যতখানি নজর রাখে, তাদের ওপরে বাপ তার চেয়ে বেশি নজর রাখে না। বাপ ব্যবসায়ের কাজকর্মেই ব্যস্ত থাকে। ছেলেমেয়ে দ্টো তাই অবাধ্য হয়ে উঠল। তার অন্ভূতিহীন বৌ শিশ্মনের রহস্য জানবার কোন চেষ্টাই করল না। ভাইবোন পরস্পরের অচেনা হয়ে রইল; দ্জনের চরিত্র হল আলাদা, বাপ-মায়ের ঠিক বিপরীত। ভ্লাদিমির হল আল্সে, ম্খে ধ্র্তামির ছাপ, এঁচড়েপাকা ভাবসাব। লিজা মান্ষ হল ঝি আর রাঁধ্নীদের মহলে (রাঁধ্নীটি নষ্টা, অনেক ঘাটের ঘোল খাওয়া), অল্পবয়সেই সে জীবনের কদর্য দিকটা

চিনে নিল। ঝি, রাঁধুনী তার মধ্যে এক অসুস্থ কৌতূহল জাগিয়ে তুলল, আর তাই, অপরিণত, লজ্জানম্র কৈশোরেই সে দেহেমনে বুনো কাঁটা-লতার মত বেড়ে উঠল।

॥ দুই ॥

অস্থির বছরগুলো গড়িয়ে চলল। প্রৌঢ় বৃদ্ধ হল, কিশোর তরুণ হল।

ভ্ল্যাদিমির মোখোভের রোগা, একহারা চেহারা, ফ্যাকাসে রং। হাই স্কুলের ফিফ্‌থ ক্লাসের ছাত্র। কারখানার আঙ্গিনার ভেতরে সে হাঁটছিল। গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ি ফিরেছে। রোজকার মত সে বেরিয়েছে কারখানা দেখতে, ভিড়ের মধ্যে গুঁতোগুঁতি করতে। কসাক গাড়োয়ানরা যখন স-সম্ভ্রমে গুঞ্জন করে, 'ওই যে কর্তার ওয়ারিশ...', শুনলে তার ডাঁট বেড়ে যায়।

গাড়িগুলো আর গোবরের স্তূপের মধ্যে দিয়ে সাবধানে পথ করে নিয়ে ভ্ল্যাদিমির গেটের কাছে এসে পৌঁছল। তখন মনে পড়ল স্টীম-ইঞ্জিনটা দেখা হয়নি তার, তাই আবার ফিরল।

লালরঙের তেলের চৌবাচ্চার কাছে, মেসিনঘরে ঢুকতেই সামনে, কলের মজুর তিমোফি, ওজনদার ভালেত আর তিমোফির সহকারী দাভিদ হাঁটুর ওপর পা-জামা গুটিয়ে, খালি পায়ে একতাল কাদা মাখছিল।

—'আরে! কর্তা যে!' ওজনদার তাকে ঠাট্টার সুরে অভ্যর্থনা জানাল।

-'ভালো ত? কি করছ তোমরা?'

—'আমরা কাদা মাখছি।' লেপটে-ধরা কাদা থেকে পা-দুটো টেনে তুলতে তুলতে অস্বস্তির হাসি হেসে দাভিদ বলল। 'আপনার বাপ পয়সা চেনেন বেশ; এর জন্যে মেয়ে মজুর রাখবেন না। আপনার বাপ আচ্ছা কঞ্জুস।'

ভ্ল্যাদিমিরের মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। সদাসর্বদা হাসি হাসি মুখ দাভিদ আর তার বিদ্বেষ-মাখা কণ্ঠস্বরের প্রতি অপ্রতিরোধ্য বিতৃষ্ণা জেগে উঠল।

—'কঞ্জুস? মানে, কি বলতে চাও?'

—'আপনার বাপ একটা চামার!' হেসে দাভিদ তাকে বুঝিয়ে দিলে। সমর্থন করে হেসে উঠল সবাই। অপমানের সবটুকু ঝাঁঝ ভ্ল্যাদিমিরের মনে গিয়ে লাগল। সে স্থিরদৃষ্টিতে দাভিদের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করলঃ

—'তাহলে তোমরা কাজে খুশী নও?'

– 'আসুন আমাদের সঙ্গে কাদা ঘাঁটুন, তাহলেই টের পাবেন। কোন গাধা খুশী হয় এতে? এর দু'একটা কাজ করলে আপনার পিতাঠাকুরের মঙ্গল হত। তাঁর ভুঁড়িতে খিঁচ ধরত।' দাভিদ উত্তর দিল। এক মুখ হাসি নিয়ে কাদার তালের ওপর জোরে জোরে মাড়াতে লাগল, পা দিয়ে মাখতে লাগল। চমৎকার একটা প্রতিশোধের কথা ভেবে ভ্ল্যাদিমির মনে মনে একটা জুৎসই উত্তর ঠিক করে নিল।

—'বেশ!' সে আস্তে আস্তে বলল। 'বাবাকে বলব, ওকাজে তোমরা খুশী নও।'

আড়চোখে সে লোকটার মুখের দিকে তাকাল। তার কথার যা প্রতিক্রিয়া হল, তা দেখে চমকে গেল। অতিকষ্টে, জোরকরে হাসছে দাভিদ, আর সকলের মুখে আষাঢ়ের

'মেঘ নেমেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ করে সকলেই কাদা মেখে চলল। তারপর, দাভিদ তার কাদামাখা পা থেকে দৃষ্টি ছিনিয়ে মন ভোলানোর জন্যে বিরক্তিভরে বলে উঠল:

—'আমি শুধু ঠাট্টা করছিলাম, ভলোদিয়া!'

—'তুমি যা বলেছ, বাবাকে সব বলব।' বাপ আর তার নিজের অপমানে চোখে জল এসে পড়েছিল, সে এগিয়ে চলে গেল।

—'ভলোদিয়া! সার্জিভিচ্!' দাভিদ হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এল।

—'আপনার বাবাকে বলবেন না, মাফ করে দিন! আমি একটা আস্ত গাধা। সত্যি বলছি, না বুঝেই বলেছি সব!'

—'বেশ, বাবাকে বলব না।' ভুরু কুঁচকে ভ্যাদিমির উত্তর দিল। তারপর গেটের দিকে এগিয়ে গেল। কানে এল ভালেতের হেঁড়ে গলা:

—'কি জন্যে ওসব বলতে গেলি তুই? ওদের ঘাঁটাসনে, ওরাও দেখিস বিরক্ত করবে না।'

—'শুয়োরের বাচ্চারা!' রাগের মাথায় ভ্যাদিমির মনে মনে ভাবতে লাগল: 'বাবাকে সব বলব কি?' সে পেছন ফিরে তাকাল, দাভিদের মুখের সেই চিরাচরিত হাসি চোখে পড়ল। তারপরই স্থির করে ফেলল, 'বলবোই বাবাকে।'

ভ্যাদিমির বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। বারান্দা আর অলিন্দে জড়াজড়ি করে লতিয়ে ওঠা বুনো আঙুর ঝোপের পাতা মাথার ওপরে দুলতে লাগল। বাপের খাস-কামরার সামনে পৌঁছে দরজায় ঘা মারল। চামড়ার কৌচে বসে 'জুন' পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল সার্জি প্লাতোনোভিচ্। পায়ের কাছে একটা হাড়ের কাগজ-কাটা ছুরি পড়ে আছে।

—'কি রে, কি চাই?'

—'আমি যখন কারখানা থেকে ফিরছিলাম—', অনিশ্চিতভাবেই ভ্যাদিমির শুরু করে দিল। কিন্তু তখনই মনে পড়ে গেল দাভিদের ঝকমকে হাসির দীপ্তি। বাপের ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে সে স্থিরকণ্ঠে বলে চলল:

—'শুনতে পেলাম, মজুর দাভিদ বলছিল. '

সার্জি প্লাতোনোভিচ্ মন দিয়ে ছেলের কাহিনী শুনল। তারপর বলল, 'আচ্ছা, ওকে বরখাস্ত করে দেব।'

কাগজকাটা ছুরিটা তুলে নেবার জন্যে অস্ফুট আর্তধ্বনি করে নীচের দিকে ঝুঁকল।

॥ তিন ॥

গ্রামের শিক্ষিতরা কোন কোন সন্ধ্যায় মোখোভের বাড়িতে আসর জমাতে অভ্যস্ত। সেখানে আসে মস্কোর কারিগরি-শিক্ষায়তনের ছাত্র বোয়ারিশ্খিন; যক্ষ্মা আর আত্ম-গর্বে অন্তঃসারশূন্য শিক্ষক বালান্দা; তার সহকারিণী আর সহবাসিনী মার্থা গেরাশিংমোভ্না —এক স্থিরযৌবনা তরুণী, পেটিকোটটা সব সময়েই অশ্লীলভাবে বেরিয়ে থাকে; চিরকুমার পোস্টমাস্টার—গায়ে গালা আর সস্তা আতরের গন্ধ। বাপের জমিদারি থেকে

মাঝে মাঝে ঘোড়া ছুটিয়ে আসে তরুণ ট্রুপ-কমাণ্ডার ইউজেনে লিস্‌ত্‌নিত্‌স্কি। সকলে বারান্দায় বসে বসে চা খায় আর অর্থহীন আলোচনা করে, আলোচনার স্রোতে ভাটা পড়লে কেউ হয়ত উঠে গিয়ে দামী গ্রামোফোনটা দম দিয়ে চালিয়ে দেয়।

বড় কোন পরবে—খুব কম ক্ষেত্রে—সার্জি প্লাতানোভিচ্‌ আমীরি চাল দেখাতে পছন্দ করেঃ লোক নিমন্ত্রণ করে আনে, দামী মদ, নুন-জরানো তাজা ডিম, আর সবচেয়ে সেরা জলপাই কিংবা সার্ডিনের টাকনা গণ্ডেপিণ্ডে গেলায়। অন্য সময় সে হিসেব করে চলে। একটি মাত্র জিনিস যার ব্যাপারে সে আত্মসংযমের নিয়ম মানে না, তা হচ্ছে বই কেনা। পড়তে সে ভালবাসে, যা পড়ে, তার সব কিছুই দ্রুত আত্মস্থ করার মেধা আছে তার।

গ্রামের দুই পাদ্রী—ফাদার ভিস্‌সারিঅন আর ফাদার প্যাংক্রাটীর সার্জি প্লাতোনোভিচের সঙ্গে সদ্ভাব নেই। তার সঙ্গে তাদের বহুদিনের ঝগড়া। তাদের নিজেদের মধ্যেও অবশ্য খুব সম্প্রীতি নেই। ঝগড়াটে, কূটচক্রী ফাদার প্যাংক্রাটী সাধারণ লোককে বুদ্ধি খাটিয়ে বিপথে চালায়। আর স্বভাব-অমায়িক, সিফিলিসে ভোগা বিপত্নীক ফাদার ভিস্‌সারিঅন এক ইউক্রেনীয় ঝি'র সঙ্গে থাকে, নিজেকে দূরে দূরে রাখে। অত্যধিক অহঙ্কার, আর চক্রান্তকরা স্বভাবের জন্যে ফাদার প্যাংক্রাটীকে সে মোটেই প্রীতির চোখে দেখে না।

শিক্ষক বালান্দা ছাড়া সকলেরই নিজের নিজের বাড়ি আছে। বারোয়ারিতলার ওপরে মোখোভের নীল-রঙা বাড়ি; ঠিক উল্টোদিকে, বারোয়ারিতলার মাঝখানে কাঁচের দরজা আর আবছা সাইন-বোর্ড ঝুলিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে দোকানঘর। দোকানের সঙ্গে লাগানো একটা লম্বা চালা, নীচে মদের ভাঁড়ার। তার দু'শ হাত দূরে মাথা উঁচু করে আছে গির্জার বাগানের ইঁটের পাঁচিল আর খোদ গির্জার সবুজ রঙের, পেঁয়াজের মত আকারের গম্বুজ। গির্জার পেছনে ইস্কুলবাড়ির চুনকাম করা, চোখ-রাঙানো, নিষ্করুণ দেওয়াল, আর দু'খানা ছিমছাম বাড়ি। কাঠের বেড়ায় নীল-রঙ্‌ দেওয়া একখানা নীল রঙের—সেটার মালিক ফাদার প্যাংক্রাটী; অন্যখানা বাদামী রঙের (সাদৃশ্য এড়াবার জন্যে), বাঁকানো বেড়া, চওড়া ঝুল বারান্দা—তার মালিক ফাদার ভিস্‌সারিঅন। তারপর আর একখানা দো'তালা বাড়ি, তারপর পোষ্টাফিস, কসাকদের খড় আর টিনের চালা, সবশেষে—কারখানার ঢালু ছাদ, চূড়োর মাথায় মরচেধরা টিনের মোরগ।

বাদবাকি জগৎ থেকে—গ্রামের বাইরে ও ভেতরে—সব ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রামের লোকেরা বন্ধ দরজা আর ছিটকিনি তোলা জানালার আড়ালে দিন কাটায়। প্রতিবেশীর বাড়িতে দেখা করতে যাওয়া ছাড়া প্রতি সন্ধ্যায় প্রতিটি পরিবার দরজার হুড়কো তুলে দেয়, শেকল খুলে কুকুরটাকে উঠোনে ছেড়ে দেয় আর শুধু চৌকিদারের আওয়াজেই স্তব্ধতার যা ব্যাঘাত ঘটে।

॥ চার ॥

আগস্ট মাসের শেষদিকে একদিন নদীর ধারে এলিজাবিয়েতা মোখোভের সঙ্গে মিত্‌কা কোরশুনোভের দেখা হয়ে গেল। নদীর ওপার থেকে নৌকো বেয়ে এসে বাঁধতে যাবে, এমন সময় চোখে পড়ল, বাহারের নক্সাকাটা ছোটো একখানা পানসী তরতর করে স্রোতে ছুটেছে। তরুণ ছাত্র বোয়ারিস্‌খিন পানসী বাইছে। তার ঘামে ভেজা খালি মাথাটা চকচক করছে, কপালের শিরগুলো ফুলে ফুলে উঠছে।

খড়ের টুপির ছায়ায় এলিজাবিয়েতার মুখ ঢাকা পড়েছে, তাই মিত্‌কা প্রথমটায় পানসীর ওপরে তাকে ঠাওর করে উঠতে পারেনি। রোদে পোড়া হাতে বুকের সঙ্গে এককগোছা জল-পদ্ম ধরে আছে।

—'কোরশুনোভ!' মিত্‌কাকে দেখতে পেয়েই সে ডাকল। 'তুমি আমাকে ঠকিয়েছ।'

—'ঠকিয়েছি?'

—'মনে নেই, তুমি কথা দিয়েছিলে, আমাকে মাছ ধরতে নিয়ে যাবে?'

দাঁড় ফেলে দিয়ে বোয়ারিস্‌খিন পিঠ সোজা করে বসল। ঘ্যাঁচ্ করে পানসীর গলুই পাড়ের মাটিতে এসে ঠেকল।

—'মনে নেই তোমার?' পানসী থেকে লাফিয়ে নেমে আসতে আসতে এলিজাবিয়েতা হাসল।

—'সময় করে উঠতে পারিনি, তাই। ভীষণ কাজের চাপ।' মেয়েটাকে এগিয়ে আসতে দেখে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে মিত্‌কা উত্তর দিল।

—'বেশ, তাহলে কবে মাছ ধরতে যাবে বলো?' মিত্‌কার হাতে ঝাঁকুনি দিতে দিতে সে বলল।

—'যদি বলেন তো, কালই। ঝাড়াই, মাড়াই শেষ হয়ে গেছে। হাতে এখন সময়ও আছে।'

—'এবারও ঠকাচ্ছ নাতো?'

—'না, এবার আর নয়!'

—'তোমার জন্যে বসে থাকব কিন্তু। সেই জানলাটা মনে আছে ত? আমাকে শীগ্‌গিরই চলে যেতে হবে বোধ হয়। তাই আগেই মাছ ধরতে যেতে চাই।' মুহূর্তের জন্যে চুপ করল সে, নিজের মনেই একটু হেসে আবার জিজ্ঞেস করলঃ

—'তোমাদের বাড়িতে বিয়ে ছিল, তাই না?'

—'হ্যাঁ, আমার বোনের।'

—'তোমার বোন কাকে বিয়ে করল?' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই আবার সেই রহস্যময় চটুল হাসি হাসল।

—'তাহলে, এসো ঠিক সময়ে, কেমন?' আর একবার তার সেই নাগপাশের মত হাসি মিত্‌কাকে জড়িয়ে ধরল।

মিত্‌কা তাকিয়ে দেখল, মেয়েটি নৌকোয় গিয়ে বসল। অধৈর্য হয়ে বোয়ারিস্‌খিন

নৌকো ঠেলে নামাল, তার মাথার ওপর দিয়ে মেয়েটি মিত্‌কার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বিদায়ের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল।

নৌকো বেশ কিছুদূর যেতেই মিত্‌কা শুনতে পেল, বোয়ারিস্‌খিন শান্তগলায় জিজ্ঞেস করল:

—'কে ছোকরাটা?'

—'এমনিই আলাপ!' এলিজাবিয়েতা উত্তর দিল।

—'হৃদয়-গত কিছু নয়?'

দাঁড়ের ক্যাঁচক্যাঁচানিতে তার উত্তর শুনতে পেল না মিত্‌কা। তার চোখে পড়ল, বোয়ারিস্‌খিন হেসে উঠে পেছনে ঝুঁকে পড়ল। এলিজাবিয়েতার মুখ দেখা গেল না। একটা লাল ফিতে বাতাসে একটু একটু উড়ছে, তার টুপি থেকে কাঁধের প্রান্ত পর্যন্ত ঝুলছে।

যে-মিত্‌কা কালেভদ্রে বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে যায়, তাকে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় যেমনটি দেখা গেল, তেমন উৎসাহ নিয়ে তোড়জোড় করতে আর কোনদিন কেউ তাকে দেখেনি। সব ঠিকঠাক করে, সে ঢুকল সামনের ঘরে। ঠাকুর্দা জানলার ধারে বসেছিল, তামার ফ্রেমের গোল চশমা নাকে লাগিয়ে যিশুর বাণী পড়ছিল। দরজার চৌ-কাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মিত্‌কা ডাকল:

—'দাদু!'

চশমার ওপর দিয়ে বুড়ো তাকাল।

—'এ্যাঁ?'

–'মোরগের প্রথম ডাকেই আমাকে তুলে দিও।'

—'অত সকালে কোথায় যাবি?'

—'মাছ ধরতে।'

মাছ-ধরা সম্পর্কে বুড়োর দুর্বলতা আছে, তবু মিত্‌কার ইচ্ছেয় বাধা দেবার ভাণ করে বলল:

—'তোর বাপ বলছিল, শনগুলো ছাড়াতে। শুয়ে বসে দিনকাটাবার সময় কই রে?'

মিত্‌কা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল, একটা প্যাঁচ কসল।

—'বেশ তাই হক! ভেবেছিলাম, তোমাকে একটা ভাল মাছ খাওয়াব। কিন্তু শন ছাড়ানো রয়েছে যখন, নাইবা গেলাম।'

—'দাঁড়া, যাচ্ছিস কোথায়?' বুড়ো ভয় পেল; চশমা খুলে নিয়ে বলল, 'তোর বাপকে আমি বলব অখন। তুই যা। আমি তুলে দেব।'

মাঝরাতে বুড়ো এক-হাতে সুতির পা-জামাটা তুলে ধরে, অন্যহাতে লাঠিটা মুঠো করে চেপে, হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি বেয়ে গোলাঘরের দিকে চলল। মিত্‌কা একটা কম্বলের ওপরে শুয়ে ঘুমুচ্ছিল। গ্রীসাকা লাঠি দিয়ে খোঁচা মারল, কিন্তু ঘুমই ভাঙাতে পারল না। প্রথমে আস্তে আস্তে খোঁচা মেরে ফিসফিস করে ডাকল:

—'মিত্‌কা! মিত্‌কা! এ্যাই মিত্‌কা!'

মিত্‌কা বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে পা দুটো মুড়ল। গ্রীসাকা আরও নির্মম হয়ে উঠল। মিত্‌কার পেটে লাঠি ঢুকিয়ে দিতে লাগল। হঠাৎ জেগে উঠে মিত্‌কা লাঠির গোড়াটা চেপে ধরল। বুড়ো গাল দিল:

'বলি, ঘুমোস কেমন করে!'

নিঃশব্দে উঠোন পেরিয়ে এসে মিত্‌কা তাড়াতাড়ি বারোয়ারিতলার দিকে পা চালিয়ে দিল। মোখোভের বাড়ি পেঁছে ছিপবঁড়শি মাটিতে নামিয়ে রাখল; কুকুরগুলো যাতে না জেগে ওঠে সেইজন্যে পা টিপে টিপে বারান্দায় উঠে পড়ল। ঠাণ্ডা লোহার ছিটকিনি হাত দিয়ে খুলতে গেল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বারান্দার রেলিং টপকে একেবারে জানলার কাছে এসে পেঁছুল। জানলাটা আধ-ভেজানো। কালো ফাঁক দিয়ে উষ্ণ নারীদেহের সৌরভ আর অপরিচিত সুগন্ধ ভেসে এল।

—'এলিজাবিয়েতা সারজিভনা।'

মিত্‌কার মনে হল, খুব জোরে ডেকে ফেলেছে। চুপ করে সে দাঁড়িয়ে রইল। সব চুপচাপ। যদি এটা ভুল জানলা হয়! যদি মোখোভ শুয়ে থাকে, তাহলে! হয়ত বন্দুক ছুঁড়ে বসবে!

—'এলিজাবিয়েতা সারজিভ্‌না, মাছ ধরতে যাবেন না?'

যদি জানলা ভুল হয়ে থাকে তাহলে আসল মাছই ধরা পড়বে।

—'উঠবেন না, না কি?' আবার বিরক্ত হয়ে ডাকল। খোলা জানলা দিয়ে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

—'কে? কে?' অন্ধকারের ভেতর থেকে ঈষৎ শঙ্কিত চাপাগলার আওয়াজ শোনা গেল।

—'আমি, কোরশুনোভ। মাছ ধরতে যাবেন না?'

—'ও! একটু দাঁড়াও।'

ভেতরে নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেল। তার উষ্ণ, ঘুমজড়ানো কণ্ঠস্বরে পুদিনার গন্ধ মনে হল। মিত্‌কার চোখে পড়ল, সাদামত কি একটা খসখস করে ঘরের ভেতরে ঘুরতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই একটা সাদা রুমাল-বাঁধা তার হাসি হাসি মুখখানা জানলার ধারে দেখা গেল।

—'এদিক দিয়েই বাইরে নামছি। হাতটা বাড়িয়ে দাওত।' মিত্‌কার হাতটা হাতের মধ্যে নিয়ে চাপ দিতে দিতে তার চোখের কাছে চোখ নিয়ে এসে গাঢ় দৃষ্টিতে তাকাল।

ডনের দিকে চলল দুজনে। নদীর জল রাতের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে। সন্ধ্যের সময় যে নৌকোটাকে টেনে শুকনো মাটিতে রেখে এসেছিল, সেটা এখন একটু দূরে জলের ওপর দুলছে।

—'আমার যে জুতো খুলতে হবে।' এলিজাবিয়েতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

—'কোলে করে পার করে দিচ্ছি।' মিত্‌কা প্রস্তাব করল।

—'না, না, তার চেয়ে জুতো খুলে নিই।'

—'কোলে করে নিয়ে যেতে মজা লাগবে!'

—'না, থাক বরং!' কুণ্ঠাজড়িত স্বরে মেয়েটি বলল।

আর তর্ক না করে মিত্‌কা বাঁ-হাত দিয়ে তার হাঁটুর ওপরে জড়িয়ে ধরল, অনায়াসে তুলে ধরল তাকে। তারপর জল ভেঙ্গে এগুতে লাগল। মিত্‌কার শক্ত ঘাড়টা মেয়েটি আঁকড়ে ধরল, নিঃশব্দে হাসল।

গ্রামের মেয়েদের কাপড় কাচবার পাথরটায় মিত্‌কা যদি হোঁচট না খেত, তাহলে ছোট্ট আকস্মিক চুমু খাওয়াটা হয়ত সম্ভব হত না। মৃদু আর্তনাদ করে মেয়েটি মিত্‌কার ঠোঁটে মুখটা চেপে ধরল। নৌকো থেকে হাত দুয়েক দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মিত্‌কা। পায়ের বুটের ওপর দিয়ে কলকল করে জলের ধারা বইতে লাগল। পাদুটো কনকন করে উঠল।

নৌকোর বাঁধন খুলে, ধাক্কা দিয়ে লাফিয়ে চড়ল মিত্কা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইতে লাগল। আস্তে আস্তে স্রোত ঠেলে নৌকোটা চলল অপর পাড়ের দিকে। পাড়ের সঙ্গে নৌকোর তলা ঘসড়াবার শব্দ উঠল। মেয়েটির সম্মতি না নিয়েই তাকে দু'হাতে তুলে নিল মিত্কা, বয়ে আনল একটা হথর্ন-ঝোপের মধ্যে। তার গালে কামড়ে দিল মেয়েটি, আঁচড়াল, একবার কি দুবার অস্ফুট আর্তনাদ করল, তারপর তার বাধা দেবার শক্তি কমে আসছে বুঝতে পেরে, রাগের চোটে কেঁদে ফেলল, এক ফোঁটাও জল পড়ল না কিন্তু।

সকাল প্রায় ন'টায় তারা ফিরে এল। লাল-হলদে কুয়াশায় আকাশ ঢাকা পড়েছে। দমকা বাতাস নদীর জলে নেচে ফিরছে, ঢেউএর মাথায় ফেনা জেগে উঠছে। নৌকোটা ঢেউএর ওপর নাচছে। বরফের মত ঠাণ্ডা জলের কণা ছটকে লাগছে এলিজাবিয়েতার পাণ্ডুর গালে, ঝুলছে তার চোখের পাতায়, চুলের গোছায়। ক্লান্তভাবে নিষ্প্রাণ চোখ দুটো কোঁচকাল সে, তারপর উদাসীনের মত একটা ফুলের বোঁটা হাত দিয়ে ছিঁড়তে লাগল। মিত্কা তার দিকে না তাকিয়েই নৌকো বেয়ে চলল। পায়ের কাছে একটা ছোট কার্প আর একটা ছোট ব্রিম-মাছ পড়ে আছে। অপরাধ, তৃপ্তি আর উদ্বেগের মিশ্রিত ছাপ তার মুখে। স্রোতের মুখে নৌকো ধরাতে ধরাতে সে বলল:

—'আপনাকে সেমিওনোভের ঘাটে নামিয়ে দেব। কাছে হবে আপনার পক্ষে।'

পাড়ের ধারে ধুলোমাখা ডালের বেড়া গরম বাতাসে শুকিয়ে উঠেছে। চড়ুই-পাখিতে ঠুকরে-খাওয়া সূর্যমুখীর পুরস্ত মাথাগুলো পুরোপুরি পেকে উঠেছে। ফোলা ফোলা বীজগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়ছে। সদ্যগজানো নতুন দুর্বাঘাস মাঠে মাঠে মরকত পান্না ছড়িয়ে দিয়েছে, দূরে ঘোড়াগুলো পা ছুঁড়ছে ও তপ্ত দক্ষিণে হাওয়া নদীর ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে।

এলিজাবিয়েতা নৌকো থেকে নামতে যাচ্ছিল, একটা মাছ নিয়ে মিত্কা তার সামনে তুলে ধরল। বলল:

—'এই যে, আপনার ভাগেরটা নিয়ে যান।'

বিস্ময়ে সে ভুরু তুলে তাকাল, কিন্তু মাছটা নিল। বলল:

—'তাহলে, চললাম।'

একটা গাছের ডালে মাছটা আটকে নিয়ে সে করুণভাবে এগিয়ে চলল। তার সাম্প্রতিক আত্মবিশ্বাস আর প্রফুল্লতার সবটুকু ফেলে এসেছে পেছনের সেই হথর্ন-ঝোপের মধ্যে।

—'এলিজাবিয়েতা!'

বিস্ময় আর বিরক্তি গোপন করে সে ঘুরে দাঁড়াল। সে কাছে আসতেই নিজের কুণ্ঠাবোধে চটে গিয়ে মিত্কা বলল:

—'আপনার পেছনের কাপড়ে...একটা লাল দাগ। ছোট্ট একটা গোল মত...'

রাঙা হয়ে গেল এলিজাবিয়েতা, কান পর্যন্ত লাল টকটকে হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে মিত্কা উপদেশ দিল: 'পেছন দিকের রাস্তা ধরে চলে যান।'

—'যেদিক দিয়েই যাই, আমাকে বারোয়ারিতলা পেরুতেই হবে। আমি চেয়েছিলাম কালো ঘাঘরাটা পরে আসতে।' এলিজাবিয়েতা ফিসফিস করে বলল। তার গলার স্বরে আক্ষেপ আর অপ্রত্যাশিত ঘৃণা।

—'পাতা ঘসে সবুজ করে দেব?' মিত্কা সরলভাবে প্রস্তাব করেন। এলিজাবিয়েতার চোখে জল ভরে আসতে দেখে সে অবাক হয়ে গেল।

॥ পাঁচ ॥

মৃদুমন্দ পশ্চিমে হাওয়ার মর্মরধ্বনির মত খবরটা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লঃ মিত্কা কোরশুনোভের সঙ্গে সার্জি প্লাতোনোভিচের মেয়ে সারারাত বাইরে কাটিয়ে এসেছে। সকালের দিকে গ্রামের গরুরপালে গরুবাছুর দিয়ে আসার সময়, কুয়োর পাড়ে জমায়েত হয়ে, কিংবা নদীর ধারে পাথরে আছড়ে কাপড় কাচতে কাচতে, এই নিয়ে মেয়েরা গুলতানি শুরু করল।

—'জানোই তো, মেয়েটার মা মরেছে অনেকদিন।'

—'বাপটা এক সময়ও কাজ বন্ধ রাখে না, আর সৎমা তো মাথাই ঘামায় না।'

—'গুদামঘরের পাহারাদার বলেছে, মাঝরাতে একটা লোককে কোনের জানলায় দেখেছিল। প্রথমে ভেবেছিল, বুঝি চোর। দৌড়ে গেল দেখতে, দেখল শ্রীমান মিত্কা দাঁড়িয়ে।'

আজকাল মেয়েরা পাপে ডুবে আছে, ওরা কোন কাজেরই নয়।'

–'মিত্কা আমার মাইকেলকে বলেছে, ওই মেয়েকেই ও বিয়ে করবে।'

–'ওরা বলছে, জোর করেছিল মিত্কাই।'

—'না গো, না, যে কুত্তী রাজী হয় না তাকে কুত্তা কখনো বিরক্ত করে না।'

গুজবটা শেষ পর্যন্ত খোদ মোখোভের কানে পৌঁছুল। তার মাথায় যেন দালানেব কড়িকাঠ ভেঙে পড়ল, তাকে মাটির সঙ্গে পিষে দিয়ে গেল। পুরো দুদিন সে না গেল দোকানে না কারখানায়।

তিন দিনের দিন ধূসর ছিট দেওয়া ঘোড়াদুটো স্লোঝ্কিতে জুড়ে সার্জি প্লাতোনোভিচ্ জেলা শহরের দিকে ছুটল। স্লোঝ্কির পেছনে পেছনে একজোড়া কালো টগবগে ঘোড়া চমৎকার বার্নিশকরা একখানা গাড়ি টেনে নিয়ে চলল। কোচো-য়ানের পেছনে বসে রইল এলিজাবিয়েতা। মৃত্যুর মত পাণ্ডুর। হাঁটুর ওপরে একটা হালকা সুটকেশ। মুখে করুণ হাসি। গেটের কাছে এসে ভ্যাদিমির আর সৎমার উদ্দেশে দস্তানা নাড়ল।

ঠিক এমনি সময়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে দোকান থেকে বেরিয়ে আসছিল পান্তালিমন। দাঁড়িয়ে গিয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলঃ

—'কর্তার মেয়ে চলল কোথায়?'

আর তার এই সহজ মানবিক দুর্বলতায় উপেক্ষা না দেখিয়ে নিকিতাও উত্তর দিলঃ

—'মস্কোয়, ইস্কুলে।'

পরদিন যে ঘটনা ঘটল, তা বহুদিনের জন্যে নদীর ধারে, কুয়োর পাড়ে, আর গরুবাছুর চরাতে নিয়ে যাবার সময়কার আলোচনার বস্তু হয়ে রইল। সন্ধ্যের ঠিক আগে (তখন সবে স্তেপ থেকে গ্রামের গরুবাছুর ফিরে এসেছে) সার্জি প্লাতোনভিচের সঙ্গে মিত্কা দেখা করতে গেল। লোকের চোখ এড়াবার জন্যে সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তার সঙ্গে শুধু শুধু দেখা করতে নয়, গেল তার মেয়ে এলিজাবিয়েতাকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

সম্ভবত বারচারেক মেয়েটার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। তার বেশি নয়। শেষবার দেখা হওয়ার সময় তাদের কথাবার্তা হয়েছিল এই ধরনের :

—'আমাকে বিয়ে করবেন, এলিজাবিয়েতা?'

—'পাগল!'

—'আমি আপনার ভার নেব, ভালবাসব। আমাদের কাজকর্মের লোক আছে। আপনি জানলার ধারে বসে বসে বই পড়বেন।'

—'তুমি একটা গাধা!'

মিত্‌কা চটে গেল, আর কিছু বলল না। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেল। সকালে বাপকে অবাক করে দিয়ে ঘোষণা করল :

—'আমার বিয়ের যোগাড়যন্তর কর, বাবা।

—'ঘাড়ে ভূত চেপেছে রে!' বাপ উত্তর দিল।

—'সত্যি, বাবা। ঠাট্টা করছি না।'

—'তোর তর সইছে না, তাই না? কে তোর মাথা খেয়েছে, মার্থা পাগলী?'

—'সার্জি প্লাতোনোভিচের বাড়ি ঘটক পাঠাও।'

মিরন গ্রিগরিয়েভিচ ঘোড়ার সাজ সারছিল। সেলাই'এর যন্ত্রপাতি সাবধানে নামিয়ে রেখে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

—'আজ ত বেশ খোসমেজাজে আছিস দেখছি।'

মিত্‌কা কিন্তু গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বাপ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল :

—'ওরে হাঁদারাম! সার্জি প্লাতোনোভিচের পুঁজি আছে লাখখানেক। সে একটা ব্যবসায়ী। আর তুই? ভাগ এখান থেকে, নইলে এই ফিতে দিয়ে তোকে চাবকে লাল করে দেব।'

—'আমাদের আছে বারোজোড়া বলদ, আর এই এত জমি! তাছাড়া সে ত 'চাষা', আর আমরা হলাম কসাক।'

—'ভাগ এখান থেকে!' মিরন বাধা দিয়ে বলে উঠল।

একমাত্র ঠাকুরদাকেই মিত্‌কা সমর্থক শ্রোতা পেল। নাতির পক্ষে ওকালতি করে ছেলেকে বুড়ো মতে আনতে চেষ্টা করল। বলল :

—'ও, মিরন! তোর অমত কিসের? ছেলেটার মাথায় যখন ঢুকেছে...'

—'বাবা, তুমিও ছেলেমানুষ হলে, সত্যিই ছেলেমানুষ তুমি! মিত্‌কাটা একটা গর্দভ, কিন্তু তুমি...'

—'মুখ সমলে কথা বলিস!' গ্রীসাকা মেঝেয় লাঠি ঠুকল। 'আমরা তাদের সমান নই? কসাকের ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব, এটা তার পক্ষে সম্মান বলে মনে করা উচিত। আশেপাশের সবাই আমাদের জানে শোনে। আমরা ক্ষেতের মুনিষ খাটি না, মুনিষ খাটাই। তাকে গিয়ে বল, মিরন। তার কারখানাটা যেন যৌতুক হিসেবে দেয়।'

আবার জ্বলে উঠল মিরন। আঙ্গিনার বাইরে চলে গেল। সুতরাং, মিত্‌কা সন্ধ্যে পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর নিজেই মোখোভের কাছে যাওয়া সাব্যস্ত করল। সে জানে তার বাপের একগুঁয়েমি শেকড়-গাড়া এল্‌ম-গাছের মতই অটল, অনড়: নোয়ানো যায় কিন্তু কক্ষনো ভাঙা যায় না। চেষ্টা করে লাভ নেই।

শিষ্‌ দিতে দিতে সে প্রায় মোখোভের সদর দরজা পর্যন্ত চলে এল, তারপর ভয় ভয় করতে লাগল। মুহূর্তের জন্যে সে ইতস্তত করল, অবশেষে আঙ্গিনার ভেতর

দিয়ে সোজা এগিয়ে গেল পাশের দরজার দিকে। সিঁড়িতে পা দিয়ে ঝিকে জিজ্ঞেস করল :

—'কর্তা বাড়ি আছেন?'

—'চা খাচ্ছেন! বসুন!'

সে বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে শুরু করল। সিগারেটের শেষটুকু মেঝের ওপর মাড়িয়ে নেভাল। ওয়েস্ট-কোট থেকে রুটির গুঁড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে বেরিয়ে এল মোখোভ। মিত্‌কাকে দেখতে পেয়েই ভুরু কোঁচকাল। কিন্তু ডাকল, 'ভেতরে এসো।'

মোখোভের ঠান্ডা খাসকামরায় ঢুকল মিত্‌কা। বেশ বুঝতে পারল, যে সাহস তাকে এতক্ষণ অবধি চাঙ্গা করে রেখেছিল তার আয়ু ছিল চৌকাঠ পর্যন্তই। মোখোভ টেবিলের কছে এগিয়ে গেল, তারপর গোড়ালিতে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, 'ব্যাপার কি?' পেছন দিকে আঙুলগুলো টেবিলের ওপরটা আঁচড়াতে লাগল।

—'আমি জানতে এসেছি...' মোখোভের দৃষ্টির কনকনে পাঁকে মিত্‌কা তলিয়ে গেল, ভয়ে শিউরে উঠল।

'এলিজাবিয়েতাকে সম্ভবত আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন?' হতাশা, ক্রোধ, ভয় সব কিছু মিশে তার মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠল।

মোখোভের বাঁ-ভুরুটা কেঁপে উঠল, ওপরের ঠোঁট মাড়ি ছেড়ে কুঁচকে এল পেছন দিকে। সে গলাটা বাড়িয়ে দিল, গোটা শরীর সামনের দিকে এগিয়ে আনল।

—'কি বললে? কি—ই—ই—ই? বদমাশ! নিকাল হিয়াঁসে!' তোকে বেঁধে নিয়ে যাব আতামানের কাছে। শুয়োরকা বাচ্চা!'

মোখোভের চিৎকারের আওয়াজ শুনেই মিত্‌কা সাহস সঞ্চয় করল।

—'এটাকে অপমান বলে মনে করবেন না। আমি যে অন্যায় করেছি, তা শুধরে নিতে চাই।'

রক্তজমাট চোখদুটো পাকিয়ে মোখোভ মিত্‌কার পায়ে একটা ছাইদান ছুঁড়ে মারল। সেটা ঠিকরে উঠে হাঁটুতে গিয়ে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে সে ব্যথা সহ্য করল। তারপর দরজাটা খুলে ফেলে, লজ্জায়, ব্যথায় দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল ·

—'যথা অভিরুচি, সার্জি প্লাতোনোভিচ, যথা অভিরুচি, কিন্তু হলপ করে বলছি.. কে ওকে বিয়ে করবে এখন? ভেবেছিলাম, ওর কলঙ্ক আমিই ঢেকে দেব। কিন্তু এখন...এঁটো হাড় কুকুরেও ছোঁবে না।'

দুমড়ানো রুমালটা ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে মোখোভ মিত্‌কার পেছন পেছন ছুটল, সদর দরজার রাস্তাটা সে আটকে দিলে। মিত্‌কা আঙ্গিনার ভেতর গিয়ে পড়ল। এবারে কোচোয়ান ইয়েমেলিয়ানকে মনিবের চোখের শুধু একটু ইসারা করতে হল; আর কাঠের গেটের ভারী হুড়কোটা টেনে খুলতে না খুলতেই গোলাঘরের কোণ থেকে চারটে বাঁধন-ছাড়া কুকুর ছুটে এল। সামনের কুকুরটা লাফিয়ে উঠে তার কাঁধ কামড়ে জামার ভেতরে দাঁত বসিয়ে দিল। চারটে কুকুরই কামড়ে ধরে টানাটানি করতে লাগল। যাতে পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে সেই চেষ্টায় মিত্‌কা হাত দিয়ে তাদের ধাক্কা মরতে লগল। ইয়েমেলিয়ানকে সে দেখতে পেল। তার পাইপ থেকে ফুলকি উড়ছে; রান্নাঘরের ভেতরে সে অদৃশ্য হয়ে গেল, দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে এল।

সিঁড়ির ওপরে ড্রেন-পাইপের সঙ্গে হেলান দিয়ে সার্জি প্লাতোনভিচ্ দাঁড়িয়ে রইল।

সাদা লোমশ হাতদুটো মুঠি পাকানো। মিত্‌কা টলতে টলতে দরজা খুলে ফেলল। তার রক্ত-ঝরা পায়ের সঙ্গে কামড়ে থাকা গর্জনরত, উষ্ণগন্ধী কুকুরগুলোকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। একটাকে গলা টিপে দম আটকে মেরে ফেলল। পথ চলতি কসাকেরা বহুকষ্টে আর কটাকে মেরে তাড়াল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

নাতালিয়াকে মেলেখফদের কাছে ক্ষেতখামারের ব্যাপারে খুবই কাজের বলে মনে হল। নাতালিয়ার বাপ পয়সাওয়ালা লোক হলেও, ক্ষেতের কাজে মুনিষজন মাইনে দিয়ে খাটালেও, ছেলেমেয়েদের কাজকর্ম শিখিয়েছিল। খাটিয়ে মেয়ে নাতালিয়া, শ্বশুর, শাশুড়ীর মন জয় করে নিল। ইলিনিচ্‌না মনে মনে বড় বৌ দারিয়াকে অপছন্দ করে। প্রথম থেকেই সে নাতালিয়াকে আপন করে নিল।

—'ঘুমোও, ঘুমোও বৌমা! এত ভোরে উঠতে গেলে কেন?' বুড়ী হয়ত সস্নেহে বলে। 'ঘুমোও গে যাও, তোমাকে ছাড়াই চালিয়ে নেব অখন।'

এমনকি যে পান্তালিমন ঘরের কাজকর্ম সম্পর্কে এত কড়া, সে-ও বউকে বলে :

—'শুনেছ গো! নাতালিয়াকে তুলো না। এমনিই ও হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটবে। আজও গ্রীস্‌কার সঙ্গে মাঠে যাবে। কিন্তু তাড়া দাও দারিয়াকে। পাজী কুঁড়ে মাগী। কেবল মুখে রঙ্‌ ঘসবে, ভুরুতে কালি লেপবে। কুত্তী কোথাকার!'

গ্রিগর নতুন বিয়েকরা-অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে উঠতে পারল না। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই শংকা আর বিরক্তির সঙ্গে অনুভব করল, আকসিনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কটা সে পুরোপুরি কাটাতে পারে নি, সে-টা শেকড় গেড়ে বসেছে। ভেবেছিল সে ভুলতে পারবে, কিন্তু ভোলা সম্ভব হল না। স্মৃতির স্পর্শে ক্ষতমুখে রক্ত ঝরতে লাগল। বিয়ের আগেও পিয়োত্রা জিজ্ঞেস করেছিল :

—'আকসিনিয়ার কি হবে রে, গ্রীস্‌কা?'

—'কেন? কি আবার হবে?'

—'ফেলে দেওয়া সত্যিই দুঃখের, তাই না?'

—'আমি ফেলে দিলে, আর কেউ তাকে তুলে নেবে।' গ্রিগর হেসেছিল!

ব্যাপারটা কিন্তু সে ধরনের হল না। যৌবনের উত্তপ্ত কামনায় যখন সে বৌকে সবলে আলিঙ্গন করে, নাতালিয়ার দিক থেকে পায় শুধু উত্তাপহীনতা, আর এক লজ্জাকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ। নাতালিয়া দৈহিক পুলকে আঁতকে ওঠে; মায়ের দিক থেকে সে পেয়েছে তার নিজস্ব, ধীরমন্থর নিরুত্তেজ রক্তধারা। আর তাই আকসিনিয়ার কামনাঘন উন্মাদনার কথা মনে পড়লেই গ্রিগর দীর্ঘশ্বাস ফেলে :

—'তোমার বাবা বোধহয় তোমাকে বরফ দিয়ে গড়েছিল, নাতালিয়া!'

একদিন আকসিনিয়ার সঙ্গে দেখা হতেই সে হেসে বলে উঠল :

—'তারপর, গ্রীসকা! নতুন বৌ নিয়ে কাটছে কেমন?'

—'এই একরকম আর কি!'. কাটান দেওয়ার মত উত্তর দিয়ে গ্রিগর এড়িয়ে গেল। যত তাড়াতাড়ি করে আকসিনিয়ার কামনাঘন দৃষ্টির সীমানা থেকে পালিয়ে বাঁচল।

॥ দুই ॥

স্তেপান স্পষ্টতই বৌ-এর সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি মিটিয়ে ফেলল। সরাইখানায় যাতায়াত কমিয়ে দিল। একদিন সন্ধ্যেবেলায় মাড়াই উঠোনে ফসল ঝাড়তে ঝাড়তে, ঝগড়া শুরু হবার পর এই প্রথম, প্রস্তাব করে বসল :

—'আকসিনিয়া, এসো একটা গান গাই।'

ধুলোমাখা গমের গাদায় হেলান দিয়ে তারা মাটিতে বসে পড়ল। একটা ফৌজী-গান ধরল স্তেপান। চড়াগলায়, গম্ভীর সুরে যোগ দিল আকসিনিয়া। গ্রিগর শুনতে পেল, আস্তাখফরা গান গাইছে; ফসল ঝাড়াই করতে করতেই দেখতে পেল আকসিনিয়াকে (দু বাড়ির মাড়াই উঠোন লাগালাগি), আগের মতই আত্মদৃপ্ত, আর আপাতদৃষ্টিতে সুখী।

স্তেপান মেলেখফদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল না। মাড়াই-উঠোনে কাজ করে চলল। মাঝে মাঝে আকসিনিয়ার সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করা করতে লাগল। তার প্রত্যুত্তরে আকসিনিয়া হয়ত মৃদু হাসল, কালো চোখদুটো ঝিলিক মেরে উঠল। তার সবুজ ঘাঘরাটা গ্রিগরের চোখের সামনে বৃষ্টির ধারার মত ঢেউ তুলতে শুরু করল। এক অদ্ভুত শক্তি তার ঘাড়টাকে দুমড়ে দিতে লাগল, মাথাটাকে স্তেপানের উঠোনের দিকে কেবলি ঘুরিয়ে দিতে লাগল। নাতালিয়া পান্তালিমনকে বেড়া সারাবার কাজে সাহায্য করছিল। গ্রিগরের প্রতিটি অনিচ্ছুক দৃষ্টিপাতে সে যে বাধা দিচ্ছিল, তা গ্রিগরের খেয়ালই রইল না। উঠোনে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে পিয়োত্রা ঘোড়া দিয়ে মাড়াই করছিল। প্রায় অদৃশ্য এক চাপা হাসিতে সে মুখ-ভঙ্গি করছিল, তা গ্রিগরের নজরেই পড়ল না।

কাছের ও দূরের মাড়াই-উঠোন থেকে মাড়াই-এর শব্দ ভেসে আসছে : গাড়োয়ানের চিৎকার, চাবুকের আওয়াজ, ঝাড়াই-কলের ঘড়ঘড়ানি। ফসলে ফুলে ফেঁপে উঠেছে গ্রামখানা। সেপ্টেম্বরের উষ্ণতায় মাড়াই করছে ফসল, সেই উষ্ণতা রাস্তা পেরিয়ে ফণা-বিহীন সাপের মত ছড়িয়ে পড়ছে ডনের বুকে। প্রতিটি প্রাঙ্গনে, প্রতি ঘরে ঘরে, পৃথক পৃথকভাবে, সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রত্যেকে প্রাণবন্ত তিক্তমধুর জীবন কাটিয়ে চলেছে। বুড়ো গ্রীসাকা দাঁতের ব্যথায় ভুগছে, লজ্জায় মুসড়ে গিয়ে দাড়ি ছিঁড়ছে মোখোভ, দাঁতে দাঁত ঘসছে। গ্রিগরের প্রতি তীব্র ঘৃণা বুকে পুষছে স্তেপান, ঘুমের ঘোরে লোহার মত আঙুল দিয়ে খসখসে বিছানার চাদর ছিঁড়ছে। ঘরের ভেতরে ছুটে গিয়ে মেঝের ওপরে আছড়ে পড়ছে নাতালিয়া। হারানো সুখের জন্যে গ্রিগর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। অতীতের বিষণ্ণ অনুভূতি, অবিরত ফিরে আসা বেদনাবোধ তাকে পীড়িত করছে। স্বামীকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে স্বামীর প্রতি তার মৃত্যুহীন ঘৃণাটুকু আকসিনিয়া চোখের জলের বন্যায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। কারখানা থেকে দাভিদকে বরখাস্ত করা হয়েছে। রাতের পর রাত সে বয়লার ঘরে ভালেতের পাশে এসে বসেছে, আর ভালেতের অশুভ চোখের দৃষ্টি জ্বলে উঠছে; সে হয়ত বলছে :

—'তুমি একটা বোকা, দাভিদ। ওদের মুণ্ডু কাটা পড়তে দেরি নেই আর। একটা বিপ্লবে ওদের কিছুই হয় না। আর একটা উনিশ শ পাঁচ ওদের উপহার দিতে হবে। সেদিন আমরা কড়ায় গণ্ডায় শোধ দেব। সুদে আসলে।' ফাটা আঙুল তুলে সে হয়ত ভয় দেখাচ্ছে, একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁধের ওপরে ঝুলেপড়া কোটটা ঠিক করে নিচ্ছে।

গ্রামের বুকের ওপর দিয়ে দিনগুলো গড়িয়ে চলেছে, দিনের পর রাত্রি নামছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটছে, মাস এগিয়ে আসছে; বাতাস গর্জন করে ফিরছে। আর শরতের স্বচ্ছ সবুজাভ-নীল মেখে কাঁচের মত ঝকঝকে হয়ে শান্তগতিতে ডন বয়ে চলেছে সমুদ্রে।

॥ তিন ॥

অক্টোবরের শেষদিকে এক রবিবারে ফিয়োদোত্ বোদোস্কোভ কাজের জন্যে জেলা শহরে গিয়েছিল। সঙ্গে নিয়েছিল চার-জোড়া মোটা-মোটা বুনোহাঁস। সেগুলো বাজারে বেচে বৌ-এর জন্যে কিছু ছাপা-কাপড় কিনেছিল। বাড়িমুখো ফিরবে, এমন সময় একজন ভিন দেশী এল তার কাছে। লোকটা এ অঞ্চলের যে নয় তা দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

—'নমস্কার!' লোকটা কালোটুপির ডগায় আঙুল ছুঁইয়ে ফিয়োদোত্‌কে নমস্কার করল।

—'নমস্কার!' সপ্রশ্নদৃষ্টিতে ফিয়োদোত্ উত্তর দিল।

—'আপনি আসছেন কোত্থেকে?'

—'এদিকের এক গ্রাম থেকে।'

—'কোন গ্রাম?'

—'তাতার্স্কি।'

ভিন-দেশী লোকটা পকেট থেকে রুপোর একটা সিগারেট কেস বার করল। ফিয়োদোত্‌কে একটা সিগারেট দিল।

—'আপনাদের গ্রামটা খুব বড়, না?'

—'বেশ বড়ই। প্রায় শ'তিনেক ঘর হবে।'

—'কোন কামার আছে গ্রামে?'

—'হাঁ, আছে।' ফিয়োদোত্ ঘোরার মুখের কাঁটার সঙ্গে লাগামটা লটকে দিল। তারপর অবিশ্বাসমাখা দৃষ্টিতে লোকটার কালোটুপি আর বড়সড় সাদামুখের দাগগুলোর দিকে তাকাল। বলল:

—'এত সব জেনে আপনার লাভ?'

—'আপনাদের গ্রামেই আমি থাকবার জন্যে যাচ্ছি। এখুনি আতামানের কাছে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় আমাকে নিয়ে যাবেন? সঙ্গে আমার স্ত্রী আছে, আর গোটাকয়েক বাক্স।'

—'তা পারি।'

তার বৌকে আর বাক্সগুলো তুলে নিয়ে তারা রওনা হল। ফিয়োদোতের যাত্রী নিঃশব্দে পেছনে বসে রইল। ফিয়োদোত প্রথমে তার কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিল, তারপর প্রশ্ন করল :

—'মশায়ের কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

—'রোস্তভ থেকে।'

—'ওখানেই জন্ম?'

—'হ্যাঁ।'

তার যাত্রীকে ভাল করে দেখবার জন্যে ফিয়োদোত্ ঘুরে বসল। লোকটা আর দশজনের মতই লম্বা কিন্তু রোগা; কাছাকাছি বসানো চোখদুটো বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল করছে: কথা বলতে গিয়ে প্রায় সময়ই হাসছে, ওপরের ঠোঁটটা, নীচেকার ঠোঁটের ওপরে ঝুলে পড়ছে। হাতে বোনা শাল মুড়ি দিয়ে তার বৌ ঝিমুচ্ছে।

—'আমাদের গ্রামে থাকতে এলেন কিসের জন্যে?'

—'আমি তালাচাবির কাজ জানি। ভাবছি, একটা কারখানা খুলব। কাঠের কাজও করতে জানি।'

ফিয়োদোত্ সন্দেহের দৃষ্টিতে লোকটার গোলগাল হাতের দিকে তাকাল। তার চোখে চোখ পড়তেই আরও বলল :

—'আমি সিংগার সেলাই কলের এজেন্টও।'

—'মশায়ের নাম' ফিয়োদোত্ প্রশ্ন করল।

-'স্তকমান।'

—'মশাই তাহলে রুশ নন?'

'হ্যাঁ, আমি রুশই: কিন্তু আমার ঠাকুরদা ছিলেন জার্মান।'

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিয়োদোত্ জানতে পারল, অসিপ্ দাভিদোভিচ্ স্তকমান আগে কাজ করত এক কারখানায়, তারপর কুবানের কোন এক জায়গায়, তারও পরে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ওয়ার্কশপে। কিছুক্ষণ পরে আলাপ-আলোচনায় ভাটা পড়ল। রাস্তার ধারের একটা ঝরণা থেকে ফিয়োদোত্ ঘোড়াকে জল খাওয়াল; পথের ক্লান্তি আর ভরা পেটে ঘুম পাওয়ায়, সে ঝিমুতে শুরু করল; গাড়ির সঙ্গে লাগামটা বেঁধে রেখে আরাম করে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তাকে ঘুমুতে দিল না। স্তকমান জিজ্ঞেস করল ·

—'আপনাদের ওদিককার লোকজনের কাটছে কেমন?

-'তত খারাপ নয়, যথেষ্ট খাবার-দাবার আছে ঘরে।'

—'বিশেষ করে কসাকরা? তারা খুশী?

—'কেউ খুশী কেউ খুশী নয়; সবাইকেই ত আর খুশী করা যায় না।'

—'ঠিক ঠিক।' সায় দিল স্তকমান, তারপর প্রশ্ন করে চলল।

—'তাহলে বলছেন, ভালই কাটছে আপনাদের?'

—'ভালই ত।'

—'বছর বছর ফৌজে বেগার দিতে যাওয়াটাই বিশ্রী! তাই না?'

—'ফৌজের বেগার ত? ও আমাদের সহ্য হয়ে গেছে।'

—'তা ঠিক, তবু অফিসারগুলো ভারী পাজী, না?'

—'তা আর বলতে! শুয়োরের বাচ্চা সব।' ফিয়োদোত্ জমে উঠল, শঙ্কিত

চোখে মেয়েটার দিকে তাকাল। কর্মকর্তারা সবই পাজীর ধাড়ী...আমি যখন গিয়েছিলাম, বলদ বেচে একটা ঘোড়া কিনেছিলাম, ওরা সেটাও বাতিল করে দিয়েছিল।'

—'বাতিল করে দিয়েছিল?' ছদ্ম-বিস্ময়ে শুকমান বলে উঠল।

—'পুরোপুরি বাতিল! ওরা বলেছিল, ঘোড়ার পা নাকি ভাল ছিল না। আমিও তর্ক করেছিলাম, কিন্তু না, ঘোড়াটা 'পাশ' হল না। কি লজ্জার কথা!'

জোর আলাপ-আলোচনা চলল। ফিয়োদোত্ লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামল। গ্রামের জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রাণখুলে বলতে লাগল। অ-ন্যায্যভাবে মাঠ ভাগাভাগি করার জন্যে গ্রামের আতামানকে গালাগাল দিল। পোল্যাণ্ডের ব্যাপারের প্রশংসা করল। সেখানে ঘাটি গেড়ে রয়েছে তার নিজের রেজিমেণ্ট। শুকমান সিগারেট টানতে টানতে কেবলি হাসতে লাগল, ভুরু কোঁচকানোয় তার সাদা-কপালের দাগগুলো গোপন কোন এক চিন্তার আবেগে যেন মৃদু মৃদু কাঁপতে লাগল।

সন্ধ্যের দিকে তারা গ্রামে পেঁছুল। ফিয়োদোতের পরামর্শমত শুকমান বিধবা লুকিয়েশ্কার বাড়ি গিয়ে দুখানা ঘর ভাড়া করল। গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় পড়শীরা ফিয়োদোতকে জিজ্ঞেস করল :

—'কাকে সঙ্গে আনলে?'

—'এক এজেণ্ট।'

—'কোন ধরনের 'এঞ্জেল'?'

—'তুমি একটা হাঁদারাম, বুঝলে! বললাম, এজেণ্ট। মেসিন বেচে। দেখতে শুনতে যারা ভাল, তাদের ওমনি দিযে দেয়, কিন্তু মারিয়া খুড়ি, তোমাব মত হাদা-লোকের কাছে ও দাম নেবে।'

পরের দিন তালা-চাবির মিস্ত্রি শুকমান গ্রামের আতামানের সঙ্গে দেখা করল। ফিয়োদোত্ মানিত্স্কোভের আতামানের পদে এই তৃতীয় বছর চলছে। নবাগতের কালোরঙের ছাড়পত্রটি বারবার সে উল্টে-পাল্টে দেখল। তারপর কেরানীর হাতে দিল, সে-ও উল্টে-পাল্টে দেখল, দুজনে চোখোচোখি করল। পরে ভারিক্কীচালে হাত দুলিয়ে বলল :

—'তুমি থাকতে পার এখানে।'

নবাগত নমস্কার করে ঘর ছেড়ে এল। সপ্তাহখানেক সে লুকিয়েশ্কার ঘরের বাইরেই এল না। কুড়ুলের আওয়াজ শুনে বোঝা গেল, বাইরের দিকের রান্নাঘরটা সে কারখানার মত করে বানিয়ে নিচ্ছে। তার সম্পর্কে মেয়েদের কৌতূহলও মরে গেল। শুধু বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা বেড়ার ফাঁক দিয়ে সারাদিন ধরে উঁকি মারতে লাগল, কণ্ঠাহীন জান্তব ঔৎসুক্য নিয়ে ভিন-দেশীকে দেখতে লাগল।

॥ চার ॥

'মেরীমাতার উপাসনা'র দিন তিনেক আগে গ্রিগর আর তার বৌ স্তেপেতে চলল লাঙল দিতে। অসুখ করেছিল পান্তালিমনের। তাদের রওনা করে দিতে এসে, উঠোনে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যথায় ককাতে লাগল। নাতালিয়ার গায়ে জ্যাকেটটা জড়িয়ে দিতে দিতে ইলিনিচনা ফিসফিস করে বলল :

—'বেশি দেরি করো না, মা। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

দুনিয়া কাপড়চোপড় ধুতে ডনের ধারে চলেছিল। ভিজে কাপড়ের বোঝায় তার শরু কোমরটা নুয়ে পড়েছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় নাতালিয়াকে বলে গেল : 'জঙ্গলের ধারে অনেক টক পালং আছে, বৌদি। কিছু বাড়িতে তুলে এনো।'

তিন-জোড়া বলদে উল্টে থাকা লাঙলখানা আঙিনার বাইরে টেনে নিয়ে চলল। মাছ ধরতে গিয়ে গ্রিগরের ঠাণ্ডা লেগেছিল। রুমালটা গলায় বেঁধে ঠিক করে নিল, তারপর কাশতে কাশতে রাস্তার ধার দিয়ে এগুতে লাগল। নাতালিয়া পাশে পাশে চলল, খাবারের থলেটা তার পিঠে ঝুলছে।

স্তেপ ঢাকা পড়েছে এক স্বচ্ছ স্তব্ধতায়। পতিত জমির পেছনে, ঢেউ-তোলা পাহাড়ের ওপাশের মাটিতে লাঙলের দাগ পড়ছে, চাষীরা শিস্ দিচ্ছে। কিন্তু এধারের বড় রাস্তা বরাবর কেবলি নীলাভ-ধূসর নীচু নীচু 'ওয়ার্ম-উড্'-ঝোপ, ধারে ধারে গজানো শ্যামা ঘাস, আর মাথার ওপরে কাঁচের মত অতি-স্বচ্ছ, হিমেল আকাশে স্বাভাবিক রঙের মাকড়সার জালের উড়ন্ত সুতোর আঁকিবুকি।

ওদের মাঠের পথে বিদায় দিয়ে পিয়োত্র আর দারিয়া কারখানায় যাবার জন্যে তৈরি হল। পিয়োত্র গোলার গম সরাল, দারিয়া বস্তাবন্দী করে গাড়িতে তুলে নিল। ঘোড়া যুতে দিল পান্তালিমন।

কারখানায় পেঁাছে দেখল আঙিনায় গাড়ির ভিড়। ওজনের কাঁটার চারপাশে বহুলোকের জনতা। দারিয়ার হাতে লাগামটা দিয়ে পিয়োত্র গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল। ওজনদার ভালেতকে জিজ্ঞেস করল .

—'আমার পালা কতজনের পর?'

—'সাঁইত্রিশজনের পর।'

পিয়োত্র বস্তা আনতে গেল। ফিরে আসতেই পেছনে কার গালাগাল শুনতে পেল। কর্কশ, মোটাগলায় আওয়াজ উঠল :

—'এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলে, আর এখন এগিয়ে আসার তাড়া। এখান থেকে ভাগ শালা 'হোখোল,' নইলে দেব এক ঘা।'

পিয়োত্র বুঝতে পারল, গলাটা 'ঘোড়ার খুর' ইয়াকোবের। শুনবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওজনঘর থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল, আর একটা ঘুসির শব্দ। ঘুসিটা লেগেছে যুতসই। একজন বয়স্ক, দাড়িওয়ালা ইউক্রেনীয় ঘুরপাক খেয়ে, দরজা দিয়ে বাইরে এসে পড়ল। তার টুপিটা মাথার পেছন দিকে চেপ্টে গিয়েছে। গালে হাত দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল :

—'এর মানেটা কি?'

—'টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব, খান্‌কির বাচ্চা।'

—'এদিকে আয়তো মিকিফোর!' ইউক্রেনের লোকটি চেঁচিয়ে উঠল।

'ঘোড়ার খুরে' ইয়াকোব গোঁয়ারগোবিন্দ, তাগড়াই চেহারার গোলন্দাজ। ঘোড়ার লাথিতে খুরের দাগ গালে কেটে বসে আছে, তাতেই ওই ডাক নাম; আস্তিন গোটাতে গোটাতে সে ওজনঘর থেকে ছুটে এল। লাল-সার্ট গায়ে, এক লম্বামত ইউক্রেনীয় পেছন থেকে একটা কড়া ঘুসি চালাল। ইয়াকোব কিন্তু পায়ের ওপরেই দাঁড়িয়ে রইল। চেঁচিয়ে উঠল :

—'ভাই সব! ওরা কসাকদের ওপর হামলা করছে!'

চারপাশ থেকে কসাক আর ইউক্রেনীয়রা—কারখানার ভেতরে তারা সংখ্যায় অনেক ছিল—ছুটে আসতে লাগল। কারখানার সদরদরজার পাশে মারপিট শুরু হয়ে গেল। জড়াজড়ি করা দেহের চাপে দরজাটা মচমচ করে উঠল। বস্তা ফেলে দিয়ে পিয়োত্রা ধীরপদে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল। গাড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে পিয়োত্রাকে দেখতে পেল দারিয়া। দুপাশের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে ভিড়ের মাঝ বরাবর সে এগিয়ে চলল; ধাক্কায় ধাক্কায় পাঁচিলের গায়ে গিয়ে ঠেকল, মাটিতে পড়ে গিয়ে পায়ের নীচে থেঁতো হতে লাগল। তাই দেখে আর্তনাদ করে উঠল দারিয়া।

মেশিনঘরের কোণ থেকে মিত্‌কা কোরশুনভ একটা লোহার ডাণ্ডা ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে এল। যে ইউক্রেনীয়টি ইয়াকোবকে পেছন থেকে ঘুসি মেরেছিল, ধাক্কাধাক্কিতে ভিড়ের ভেতর থেকে সে ছটকে বেরিয়ে এল, জামার একটা ছেঁড়া হাতা পাখির ভাঙা ডানার মত তার পিঠের ওপর লটপট করতে লাগল। তারপর সামনে ঝুঁকে পড়ে, মাটিতে হাতের ভর রেখে সবচেয়ে কাছের গাড়িখানার দিকে ছুটে গেল, সেখান থেকে একটা ডাণ্ডা টেনে নিল। শামিলরা তিনভাই দৌড়ে এল গ্রাম থেকে। নুলো আলেক্‌সি পায়ে লাগাম বেঁধে গেটের সামনে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। নুলো হাতটা বুকের সঙ্গে লেপ্টে সে একটা লাফ মারল, তাতেই গাড়ির জোয়াল পেরিয়ে গেল। তার ভাই মার্তিনের পা-জামা মোজার ভেতর থেকে খুলে বেরিয়ে এল। ঝুঁকে পড়ে পা-জামা গুঁজতে যাবে এমন সময় কারখানার ছাদ ফাটিয়ে এক আর্তনাদ উঠল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মার্তিন দাদাদের পেছন পেছন ছুটল।

হাঁপাতে হাঁপাতে, হাতদুটো মোচড়াতে মোচড়াতে দারিয়া গাড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ফ্যাকাসে মুখে, ঠোঁট চিবুতে চিবুতে সার্জে মোখোভ গুটিগুটি পাশ দিয়ে চলে গেল, ওয়েস্ট-কোটের নীচে তার ভুঁড়িটা গোল বলের মত নাচতে লাগল। দারিয়া দেখতে পেল, ছেঁড়া সার্ট গায়ে সেই ইউক্রেনীয়টি ডাণ্ডার ঘা কসিয়ে দিল মিত্‌কাকে; কিন্তু পরক্ষণেই নুলো আলেক্‌সির লোহার মত হাতে মুঠোর ঘুসিতে মাটিতে পড়ে গেল। দেখতে পেল, হাতে আর হাঁটুতে ভর দিয়ে মিত্‌কা কোরশুনভ মোখোভের পা হড়কিয়ে দিল। এতে সে মোটেই অবাক হল না। মোখোভ হাতদুটো ছড়িয়ে কাঁকড়ার মত হাঁচোড়পাঁচড় করে ওজনঘরের চালার নীচে ঢুকে পড়ল, সেখানে ভীড়ের পায়ে থেঁতো হতে লাগল। দারিয়া পাগলের মত হেসে উঠল, হাসির চোটে রংকরা ভুরুর বাঁকারেখা কুঁচকে গেল। কিন্তু পিয়োত্রাকে দেখতে পেয়েই থেমে গেল হঠাৎ। গুঁতোগুঁতি করা হৈ হৈ জনতার ভেতর থেকে পিয়োত্রা বেরিয়ে আসতে পেরেছে, একটা গাড়ির নীচে শুয়ে রক্ত থু থু করে ফেলছে। একটা চিৎকার দিয়ে দারিয়া তার দিকে ছুটল। গ্রাম থেকে কসাকরা লাঠি-সোটা নিয়ে ছুটে আসছে।

একজনের হাতে একটা শাবল। ওজন-ঘরের দরজার কাছে রক্ত-গঙ্গার মাঝখানে এক অল্পবয়সী ইউক্রেনীয় মাথা ফেটে পড়ে আছে। রক্তমাখা চুলগুলো মুখের ওপর এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে, এখুনি বেচারার ভব-লীলা সাঙ্গ হবে।

ভেড়ার পালের মত ইউক্রেনীয়দের আস্তে আস্তে বয়লার-ঘরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। গুরুতর পরিণতি ঘটিয়ে তবে দাঙ্গা থামবে, এই সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু এক বুড়ো ইউক্রেনীয়ের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। বয়লার-ঘরে লাফিয়ে পড়ে চুল্লি থেকে একখানা জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিয়ে এল, তারপর কারখানার গুদাম-ঘরের দিকে ছুটে গেল; সেখানে কারখানার শস্য মজুদ আছে, হাজার পুডেরও বেশি ময়দা আছে।

খড়ে-ছাওয়া চালের দিকে জ্বলন্ত কাঠটা তুলে ধরে সে বন-মানুষের মত হুংকার দিয়ে উঠল :

—'আগুন ধরিয়ে দেব!'

কসাকরা শিউরে উঠল, থমকে দাঁড়াল সবাই। উদ্দাম পুবল হাওয়া বইছে, গোল-ঘরের ছাদ থেকে ধোঁয়া উড়ে আসছে ইউক্রেনীয় জনতার দিকে। শুকনো চালায় একটি-মাত্র ফুলকি, ব্যস, সারাটা গ্রাম জ্বলে উঠবে।

কসাকদের মধ্য থেকে ক্রোধের সংক্ষিপ্ত চাপাগর্জন শোনা গেল। তাদের কেউ কেউ কারখানার দিকে পিছু হটতে লাগল। আর সেই ইউক্রেনীয়টি মাথার ওপরে জ্বলন্ত কাঠটা ঘুরিয়ে আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে চিৎকার করতে লাগল :

—'পুড়িয়ে দেব, সবকিছু পুড়িয়ে দেব! বেরিয়ে যাও আঙিনা থেকে।'

সব গোলমালের মূল যে 'ঘোড়ার খুর' ইয়াকোব, সে-ই প্রথম আঙিনা ছেড়ে চলে এল। আর সব কসাকরা তার পেছন পেছন হুড়পাড় করতে করতে বেরিয়ে গেল। দ্রুত বস্তাগুলো তুলে নিয়ে ইউক্রেনীয়রা ঘোড়া যুতে ফেলল; গাড়ির ওপর খাড়া হয়ে, মাথার ওপরে চাবুক ঘুরিয়ে পাগলের মত ঘোড়া পেটাতে পেটাতে তারা আঙিনা ছেড়ে গ্রামের বাইরে চলে গেল।

ভিড়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চোখ আর গাল কুঁচকে নুলো আলেক্সি চিৎকার করে উঠল :

—'ঘোড়ায় চাপ, কসাকরা!'

—'পাকড়াও ওদের!' সে চিৎকারে সবাই যোগ দিল।

মিত্‌কা কোরশুনভ আঙিনা ছেড়ে ছুটে বেরুতে যাচ্ছিল, অন্যান্য কসাকরাও কথামত তোড়জোড় করছিল, কিন্তু এমন সময় কালো টুপি মাথায় এক অ-চেনা লোক লম্বা লম্বা পা ফেলে ভিড়ের কাছে এগিয়ে এল; হাত তুলে সে চেঁচিয়ে উঠল :

—'থামুন, থামুন!'

—'কে বট হে তুমি?' ইয়াকোব জিজ্ঞেস করল।

—'কোত্থেকে উদয় হলে হে?' অন্য একজন প্রশ্ন করল।

—'থামুন, থামুন গ্রামের লোক সব!'

—''গ্রামের লোক' বলে ডাকবার কে হে তুমি?'

—''চাষা'রে, 'চাষা'! একটা ঘা কসিয়ে দে ত ইয়াকোব!'

—'ঠিক বলেছিস! দে চোখদুটো কানা করে।'

লোকটা উৎকণ্ঠিতভাবে হাসল, কিন্তু ভয়ের চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না। টুপিটা

খুলে নিল, এক অদ্ভুত সরলতার ভঙ্গিতে ভুরু দুটো মুছল। অবশেষে তার হাসি দিয়েই সবাইকে নিরস্ত্র করল।

—'ব্যাপার কি?' টুপি উঁচিয়ে ওজন-ঘরের দরজার কাছেকার রক্ত দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—'হোখোল'দের ঠেঙাচ্ছিলাম।' শান্তগলায় নুলো আলেক্‌সি জবাব দিল।

—'কিন্তু কেন?'.

—'তারা আগেই কাজ সেরে নিতে চায়।' ইয়াকোব বুঝিয়ে বলল।

—'এক ব্যাটা তো মরিয়া হয়ে আগুনই ধরিয়ে দিচ্ছিল।' আফোংকা ওঝিয়েরোভ হেসে বলল, 'ভীষণ বদরাগী ওই 'হোখোল'রা।'

ওঝিয়েরোভের দিকে টুপিটা তুলে লোকটা জিজ্ঞেস করল: 'বলি, আপনি কি?'

ওঝিয়েরোভ ঘৃণাভবে থুথু ফেলল, ছেটানো থুথুর দিকে নজর রেখে উত্তর দিল:

—'আমি ত কসাক...আপনি?...নিশ্চয়ই জিপ্‌সি নন?'

—'আপনি আর আমি দুজনেই রুশ।'

—'মিথ্যে কথা!' আফোংকা জোর দিয়ে বলে উঠল।

—'রুশদের থেকেই কসাকদের জন্ম। জানেন ত?'

—'আমি বলছি, কসাকদের জন্ম কসাক থেকে।'

লোকটা বুঝিয়ে বলতে লাগল, 'বহুকাল আগে জমিদারদের অত্যাচারে প্রজারা পালিয়ে আসত, বসবাস করত এই ডনের ধারে। তাদেরই নাম হয় কসাক।'

—'নিজের চরখায় তেল দাও গে, বাপু!' রাগ চেপে আলেক্‌সি উপদেশ দিল।

—'শালা আমাদের 'চাষা' বানাতে চায়, লোকটা কে হে?'

—'ওই ত সেই ভিন-দেশী রে, ট্যারা লুকিয়েশ্‌কার বাড়িতে থাকে।' কে একজন বলল।

কিন্তু ইউক্রেনীয়দের পেছন পেছন ধাওয়া করার সময় উৎরে গেল।' দাঙ্গা নিয়ে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতে করতে সবাই বাড়ি ফিরল।

॥ পাঁচ ॥

সেই রাত্রে গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে স্তেপের মধ্যে কুটকুটে সুতির কোটটা গায়ে জড়াতে জড়াতে গ্রিগর বিরূপকণ্ঠে নাতালিয়াকে বলল:

—'কেমন যেন অচেনা মনে হয় তোমাকে! তুমি আকাশের ওই চাঁদের মত। কাউকে গরম করতে পার না, শীতল করার ক্ষমতাও নেই তোমার। তোমাকে আমি ভালবাসি না, নাতাস্কা, রাগ করো না। এ নিয়ে বেশি কিছু বলতেও চাইনে, কিন্তু ব্যাপারটা এই দাঁড়িয়ে গেছে; এ রকমভাবে আর চলা যায় না। তোমার জন্যে দুঃখ হয়: এতদিন বিয়ে হয়েছে, এখনো মনে কোন সাড়া জাগে না। আমার মন একেবারে ফাঁকা। আজকের রাতের এই স্তেপের মত।'

শূন্যে তারায়-ভরা দুষ্প্রবেশ্য প্রান্তর, মাথার ওপরে ভাসন্ত মেঘের ছায়াঘন স্বচ্ছ ওড়না—ওই দিকে তাকিয়ে রইল নাতালিয়া, চুপ করে রইল সে। নীলাভ-কৃষ্ণ বনভূমির

কোথায় যেন দিগ্‌ভ্রান্ত সারসেরা এ ওকে ডাকছে। ছোট ছোট রুপোর ঘণ্টার আওয়াজের মত তাদের গলার স্বর ভেসে আসছে। বাঁচার ইচ্ছে নিয়েও ঘাসগুলো মৃত্যুগন্ধ ছড়াচ্ছে। পাহাড়ের চুড়োয় নিভে আসা তাঁবুর আগুনের রক্তিমাভা জ্বলজ্বল করছে।

ভোরের আগেই গ্রিগরের ঘুম ভাঙল। কোটের ওপর প্রায় তিন ইঞ্চি পুরু হয়ে বরফ পড়েছে। যেখানে সে ঘুমিয়ে ছিল, তার কাছ দিয়ে চলে গিয়েছে খরগোশের পায়েচলার একটানা দাগ।

॥ ছয় ॥

মিল্লেরোভোর পথে একা একা চলতে গিয়ে কোন কসাক যদি হোখোলদের সামনে পড়ে যায় (ইউক্রেনীয় গ্রামগুলো শুরু হয়েছে ইয়াব্‌লোংস্কা থেকে মিল্লেরোভো পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ মাইল ধরে), তাহলে তাকে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়, নইলে উত্তমমধ্যম প্রাপ্তিযোগ। বহুকাল থেকেই এই হয়ে আসছে। জেলা শহরে যেতে হলে কসাকদের তাই দল বেঁধে চলা অভ্যাস। তাতে তারা আর স্তেপের ভেতরে মারপিট করতে ভয় পায় না; বচন ঝাড়ে :

—'এ্যাই, হোখোল! রাস্তা ছেড়ে দাঁড়া! ব্যাটা শুয়োর, কসাকদের দেশে আছিস, আর আমাদেরই পথ চলতে দিবি নে!'

ডনের ধারে পারামানভের কেন্দ্রীয় গোলায় যেসব ইউক্রেনীয় তাদের ফসল আনে, এ ধরনের বচন তাদের কানে মোটেই মধু ঢালে না। তাই বিনা কারণেই দাঙ্গা বাধে। অপরাধ, তারা হোখোল; আর হোখোল বলেই কসাকরা তাদের মারপিট করবে।

শত শত বছর আগে কসাকদের দেশে জাতিবিদ্বেষের এই বীজ অতি যত্নে পোঁতা হয়েছিল। সেই বীজে ফল ফলেছে ভাল। এই জাতিবিদ্বেষের লড়াইতে কসাকদের নীলরক্ত আর মস্কো, ইউক্রেনের বিদেশীদের লালরক্ত প্রচুর ঝরেছে ডন প্রদেশের মাটিতে।

কারখানায় দাঙ্গার প্রায় দু সপ্তাহ পরে জেলা থেকে এক পুলিশ আর গোয়েন্দা অফিসার গ্রামে এসে হাজির হল। প্রথমেই স্তকমানের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল। তরুণ গোয়েন্দা অফিসার এক সম্ভ্রান্ত কসাকবংশের ছেলে। সে জিজ্ঞাসা করল :

—'এখানে আসার আগে কোথায় ছিলে?'

—'রোস্তোভে।'

—'১৯০৭ সালে জেল হয়েছিল কেন?'

—'গণ্ডগোলের জন্যে।'

—'হুঁম্‌! কোথায় কাজ করতে তখন?'

—'রেলওয়ে কারখানায়।'

—'কি কাজ?'

—'তালাচাবি সারার কাজ।'

—'তুমি ইহুদি নাকি? না, ইহুদি ধর্ম নিয়েছ?'

—'না। আমার মনে হয়...'

—'তোমার কি মনে হয়, তাতে আমার আগ্রহ নেই। তুমি দ্বীপান্তরে গিয়েছিলে?'

—'হ্যাঁ। গিয়েছিলাম।'

গোয়েন্দাটি মাথা তুলল, তারপর ঠোঁট চিবুল :

—'আমার কথা মত এখুনি এ জেলা থেকে কেটে পড়।' এই বলে নীচুগলায় যোগ করল : 'আর আমিও দেখব, যাতে এ জেলা তুমি ছাড়।'

—'কেন ?'

—'মারপিটের দিন কসাকদের তুমি কি বলেছিলে ?' তার প্রশ্নের জবাবে পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

—'তাহলে...'

—'ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো।'

স্তকমান মোখোভের বাড়ির বারান্দায় বেরিয়ে এল (ওপরের কর্তারা চিরকালই মোখোভের বাড়িতে এসে আড্ডা গাড়েন), বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে উঠলেও, সে হেসে দরজার দিকে একবার ফিরে তাকাল।

নবম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

শীত এল ধীরমন্থর গতিতে। কয়েকদিন পরেই বরফ গলতে শুরু করল। আবার মাঠে গরু-বাছুর চরতে পাঠানো হল। সপ্তাহখানেক ধরে ফুরফুরে দক্ষিণে হাওয়া বইল, মাটি গরম হয়ে উঠল; স্তেপের বুকে এখানে ওখানে গজিয়ে ওঠা সবুজ ঘাস মাথা তুলল। বরফ গলতে লাগল সেই 'মাইকেল দিবস' পর্যন্ত, তারপর আবার শুরু হল বরফ ঝড়, ডনের ধারে বেড়া-ঘেরা বাগানগুলো খরগোশের পায়ের ছাপে দাগদাগড়া হয়ে উঠল। রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে গেল।

বরফ-পড়া শুরু হবার পরই মাঠ ভাগাভাগি করা আর কাঠ-কাটার জন্যে গ্রামে এক বৈঠক ডাকা হল। বৈঠক শুরু হবার অনেক আগে থেকেই ভেড়ার চামড়া আর লম্বা কোট মুড়ি দিয়ে কসাকরা পঞ্চায়েতের বাড়ির দরজায় জমা হল। ঠাণ্ডার চোটে ঢুকতে হল ঘরের ভেতরে। গ্রামের বুড়ো বুড়ো মাতব্বররা বসল আতামান আর কেরানীর পাশে, টেবিলের পেছনে। অল্পবয়সী কসাকরা গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে গ্রেটকোটের কলার তুলে দিয়ে গুঞ্জন করতে লাগল। পাতার পর পাতা ঠাসবুনুনি অক্ষরে লিখেই চলল কেরানী, তার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রইল আতামান। ঠাণ্ডা ঘরের ভেতরে চাপা গুঞ্জন উঠতে লাগল :

—'এ বছরের ঘাস...'

—'ঠিক বলেছ, ঠিক! মাঠের ঘাস এবার সত্যিই ভাল। কিন্তু স্তেপের ঘাস ত একেবারে শুকনো খড়।'

—'কাঠ-কাটার কি হবে ?'

—'চুপ, চুপ!'

বৈঠক শুরু হল। দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আতামান পরিবারের নাম আর তাদের কাঠের ভাগ পড়ে শোনাতে লাগল।

—'বেস্পতিবারে কাঠ-কাটার দিন ঠিক করা উচিত হবে না কিন্তু।' ইভান তোমিলিন চিৎকার করে আতামানকে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

—'কেন উচিত হবে না?'

—'বেস্পতিবারে অর্ধেক গ্রামই মাঠে ঘাস কাটতে যাবে।'

—'সে কাজ রোববার পর্যন্ত বন্ধ রাখা যায়।'

—'ভাল হয়, যদি দিনটা...' বৈঠকে বিদ্রুপের কোলাহল জাগল।

বুড়ো মাত্ভেই কাশুলিন নড়বড়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে পালিশকরা এ্যাশ-কাঠের ছড়িটা তোমিলিনের দিকে বাড়িয়ে ধরল :

—'ঘাস পরে কাটলেই চলবে! তুমি একটা হাঁদারাম, ভায়া! তাই এইসব কথা! তুমি...'

—'আর যাই হক, আপনি আর বুদ্ধির জাক করবেন না। আপনি...' নুলো আলেক্সি ফোঁড়ন দিল।

ছ বছর ধরে একটুকরো জমি নিয়ে বুড়ো কাশুলিনের সঙ্গে ঝগড়া চলছে। প্রতি বছর শরতেই আলেক্সি জমিতে তার দাবি জানায়, কিন্তু প্রতিবারই লাঙল দিয়ে যায় কাশুলিন।

—'তুমি থাম, হাঁদারাম!'

—'দূরে আছেন তাই ভাগ্যি ভাল, নইলে বাপের নাম ভুলিয়ে দিতাম।' আলেক্সি গর্জন করে উঠল।

টেবিলের ওপরে দুম করে একটা ঘুসি মারল আতামান।

—'চুপ না করলে এখুনি কিন্তু পুলিশ ডেকে পাঠাব।' সবাই চুপ করলে তারপর বলল, 'বেস্পতিবার সকালে কাঠ-কাটার দিন ঠিক হল।'

'বেড়ে সময় ঠিক হল!' 'ভগবান করুন, তাই যেন ঠিক থাকে।' চারধার থেকে বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য উঠতে লাগল।

—'আর একটা কথা : জেলার আতামানের কাছ থেকে এক নির্দেশ পেয়েছি।' আতামান গলা চড়াল। 'সামনের শনিবার জেলার অফিসে গ্রামের জোয়ানদের নাম লেখাতে যেতে হবে। দুপুরের পরেই সেখানে হাজির হতে হবে।'

পান্তালিমন প্রোকোফিয়েভিচ্ দাঁড়িয়েছিল দরজার সবচেয়ে কাছের জানলার ধারে। তার পাশে, জানলার চৌকাঠের ওপর বসে বসে মিরন গ্রিগরিয়েভিচ্ চোখ কোঁচকাচ্ছিল আর চোরা হাসি হাসছিল। কাছাকাছি ছেলেছোকরারা ভিড় জমিয়ে, চোখ টিপে হাসাহাসি করছিল। তাদের মাঝখানে আভ্দেইত্চ্ সেনিলিন দাঁড়িয়ে, আতামান রেজিমেন্টের লোমের টুপিটা পালিশকরা টেকোমাথার পেছন দিকে সরানো; তার চিরতরুণ মুখখানা শীতের লাল আপেলের মত সর্বক্ষণই লাল টুকটুকে।

সেনিলিন কাজ নিয়েছিল আতামানের শরীররক্ষী দলে। ফিরে এসেছিল 'হামবড়া' এই নতুন নাম নিয়ে। গ্রামের মধ্যে সে-ই প্রথম আতামান রেজিমেন্টে ভর্তি হয়েছিল। রেজিমেন্টে থাকার সময় তার জীবনে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল; আর যেদিন সে প্রথম গ্রামে ফিরে এসেছিল, সেদিন থেকেই তার পিটার্সবুর্গের অসাধারণ রোমাঞ্চকর ব্যাপার স্যাপারের চমক দেওয়া গল্প বলা শুরু করেছিল। শ্রোতারা তার গল্প হাঁ করে শুনত, প্রথম প্রথম বিশ্বাস করত, কিন্তু পরে বুঝতে পারল তার মত এত বড়

মিথ্যেবাদী এ গ্রামে আর কখনো জন্মায় নি। তাই তার সামনাসামনিই তারা হাসাহাসি শুরু করল। কিন্তু তাতে সে একটুও দমল না, মিথ্যে কথা বলাও থামালো না। বয়স বেড়েছে বলে এখন শুধু তার মিথ্যে প্রমাণ করে দিলে চটে ওঠে, ঘুসি পাকায়। কিন্তু শ্রোতারা যদি কিছু না বলে শুধুই হাসে, তাহলে গল্প বলায় ক্রমশই মেতে ওঠে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, গোড়ালিতে ভর দিয়ে দুলছিল সেনিলিন। ভিড়-করা কসাকদের চারধারে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গমগমে, হেঁড়েগলায় বলল :

—'কাজের কথা যদি বলো, আজকালকার কসাকরা আগের মত মোটেই নয়। মাথায় বেঁটে, কোন কম্মেরই নয়! কিন্তু...' অবজ্ঞাভরে সে একটু হাসল। 'একবার দেখেছিলাম মরামানুষের কিছু হাড়! হ্যাঁ, সেকালের কসাকরা কসাক ছিল বটে!'

—'কোথাকার মাটি খুঁড়ে হাড় পেয়েছিলে, আভ্দেইত্চ্? পাশের লোকের গা টিপে ভালো মানুষের মত মুখ করে আনিকুশ্কা জিজ্ঞেস করল।

—'আর মিথ্যের তুবড়ি ছোটাস নে, আভ্দেইত্চ্, সামনে মেরী-মাতার পরব।' পান্তালিমন নাক কোঁচকাল। সেনিলিনের 'হামবড়া' স্বভাবটা ভাল লাগে না তার।

—'মিথ্যে বলা আমার স্বভাব নয়, দাদা।' আভ্দেইত্চ্ রাগতস্বরে উত্তর দিল; তারপর অবাক হয়ে তাকাল আনিকুশ্কার দিকে। সে কাঁপছিল ঠকঠক করে, যেন গায়ে জ্বর উঠেছে।

—'হাড়গুলো দেখেছিলাম যখন শালার জন্যে ঘর তুলি। ভিত খুঁড়তে খুঁড়তে বেরিয়ে পড়ল একটা কবর। হাতদুটো এই ইয়া লম্বা...' নিজের হাতদুটো সে দুই-দিকে ছড়িয়ে দিল। 'মাথাটা যেন মস্ত একটা তামার হাঁড়ি।'

—'তার চেয়ে ছোঁড়াদের বরং তুই পিটার্সবুর্গের চোর ধরার গল্পটা বল।'

জানলার চৌ-কাঠ ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মিরন বাতলাল।

—'ও আর বলার কি আছে?' হঠাৎ বিনয়ে গলে গিয়ে আভ্দেইত্চ্ জবাব দিল। একটা চিৎকার উঠল :

—'বল না, বল না, আভ্দেইত্চ্!'

—'তাহলে শোন। ব্যাপারটা হয়েছিল এই।' আভ্দেইত্চ্ গলা খাঁকার দিল। পা-জামার পকেট থেকে তামাকের থলে টেনে বার করল। হাতের চেটোয় এক খিমচে তামাক নিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে চারপাশের শ্রোতাদের দেখে নিল :

—'জেল থেকে পালাল একটা চোর। তাকে সবখানে খোঁজাখুঁজি করা হল। ভাবছো, ধরতে পারল? পাত্তাই পেল না তার। সব কর্তারা হার মানলেন।

—'তারপর একদিন রাত্রে আমাকে তলব দিলেন রক্ষী দলের বড়কর্তা। কর্তা বললেন, 'ও ঘরে যাও। সম্রাট-বাহাদুর আছেন ও ঘরে। তিনি তোমার সঙ্গে নিজে কথা বলতে চান।' আমি তো থ, তবু ঢুকলাম ঘরে, এটেনসান করে দাঁড়ালাম। তিনি কাঁধ চাপড়ে বললেন, 'শোন হে!' বললেন, 'আমার রাজ্যের সবচেয়ে বড় চোরটা পালিয়েছে, ইভান আভ্দেইত্চ্। তাকে খুঁজে বার করো, নইলে ওমুখ আর কখনো দেখিও না।' আমি বললাম, 'বহুত আচ্ছা!' জারের আস্তাবলের সবচেয়ে সেরা তিনটে ঘোড়া নিয়ে ছুটলাম আমি। সারাদিন, সারারাত ঘোড়া ছুটিয়ে চললাম, তিনদিনের দিন মস্কোর কাছে এসে চোরের দেখা পেলাম। তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এলাম পিটার্সবুর্গে। পৌঁছুলাম মাঝরাতে, সারা গা কাদায় মাখামাখি। গেলাম সোজা সম্রাট-বাহাদুরের কাছে। কত আমীর ওমরাহরা পথ আটকাতে এল, আমি

চলে গেলাম গট গট করে। দরজায় মারলাম ধাক্কা : 'ভেতরে আসতে পারি, সম্রাট-বাহাদুর।' 'কে?', 'আমি, ইভান আভ্‌দেইত্‌চ্‌ সোনিলিন।' ঘরের ভেতর থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। শুনলাম সম্রাট নিজে চেঁচাচ্ছেন, 'মারিয়া ফিয়োদোরভ্‌না, মারিয়া ফিয়োদোরভ্‌না! শিগ্‌গীর ওঠ, শিগ্‌গীর, সামোভারে জল চাপাও, ইভান আভ্‌দেইত্‌চ্‌ এসে পেঁাছেচে...'

ভিড়ের পেছন দিকের কসাকদের মধ্যে হাসির হররা উঠল। একটা হারিয়ে যাওয়া পশু সম্পর্কে নোটিশ পড়ছিল কেরানী. লাইনের মাঝখানেই থমকে দাঁড়াল। হাসিতে ফেটে-পড়া জনতার দিকে রাজহাঁসের মত গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে রইল আতামান।

আভ্‌দেইত্‌চের মুখখানা কালো হয়ে গেল; তার চোখদুটো অনির্দিষ্টভাবে সামনের লোকগুলোর মুখের ওপর দিয়ে ঘুরতে লাগল। বলে উঠল :

—'আর একটু দাঁড়াও!'

—'হাঃ হাঃ হাঃ!'

—'ওঃ, হাসিয়ে পেট ফাটাবে দেখছি!'

—'সামোভারে জল চাপাও! আভ্‌দেইত্‌চ্‌ এসে পেঁাছেচে! হাঃ হাঃ হাঃ!'

জমায়েৎ ভাঙতে শুরু করল। কাছারি ঘরের বাইরে পায়ে মাড়ান বরফের ওপর দাঁড়িয়ে স্তেপান আর হাওয়াই-কলের মালিক, ঢেঙামত একজন কসাক শরীর গরম করার জন্যে মাটিতে পা ঠুকতে লাগল।

॥ দুই ॥

বৈঠক থেকে ফিরে পান্তালিমন তখন তখনই শোবার ঘরে এসে ঢুকল। কয়েকদিন ধরেই ইলিনিচ্‌না ভুগছিল, তার ফুলো ফুলো মুখে ক্লান্তি আর বেদনার ছাপ পড়েছে। পুরু পালকের বিছানায় সে আধবসা হয়ে শুয়েছিল। পান্তালিমনের পায়ের শব্দ কানে যেতেই ঘাড় ফেরাল। চোখ পড়ল তার দাড়ির ওপর, দাড়িটা নিঃশ্বাসে ভিজে উঠেছে। ইলিনিচ্‌নার নাকের পাশদুটো ফুলে উঠল। বুড়োর গা থেকে শুধু তুষার আর কাঁচা চামড়ার গন্ধ নাকে এল। 'আজ মেজাজ দেখছি ভাল।' মনে মনে বুড়ী ভাবল, খুশী হয়ে কুরুশকাঁটা নামিয়ে রাখল। জিজ্ঞেস করল :

—'কাঠ-কাটার কি ঠিক হল?'

—'বেস্পতিবারে শুরু করা হবে, ঠিক হয়েছে।' পান্তালিমন দাড়িতে টোকা মারল; আবার বলল, 'বেস্পতিবার সকালে।' বিছানার পাশে একটা সিন্ধুকের ওপর বসে তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছো? ভাল মনে হচ্ছে কি?'

—'একই রকম। গাঁটে গাঁটে সুচফোটানো ব্যথা।'

—'কত বারণ করেছি, জলে পা দিও না।' পান্তালিমন ফেটে পড়ল। 'শন ভেজাবার জন্যে আরও ত লোক রয়েছে...আর, কেমন আছে নাতালিয়া?' বিছানার পর ঝুঁকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল।

উত্তর দিতে গিয়ে ইলিনিচ্‌নার গলায় উদ্বেগের আভাস ফুটে উঠল :

—'এখন কি করব, বুঝে উঠতে পারছি না। দিন দুয়েক আগেও কান্নাকাটি. করছিল। উঠোনের বাইরে পা দিয়েই চোখে পড়ল, কে যেন গোলার দরজা হাট করে রেখেছে। ভেতরে ঢুকে দেখি, জনারের জালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে; কিন্তু ও বললে, মাথা ধরেছে। ওর কাছ থেকে কথা বার করতে পারি না।'

—'হয়ত অসুখ করেছে?'

—'আমার তা মনে হয় না। হয়ত কেউ ওর'পর 'নজর' দিয়েছে, নয়ত গ্রীস্‌কাই...'

—'গ্রীস্‌কাটা ত আবার তার সঙ্গে...কিছু শোনটোন নি তুমি? শুনেছ নাকি?'

—'বলছ কি গো?' শঙ্কায় আর্তনাদ করে উঠল ইলিনিচ্‌না। স্তেপানের খবর কি? সে ত গাধা নয়। না, তেমন কিছু শুনিনি ত?'

বউ'এর কাছে কিছুক্ষণ বসে রইল পান্তালিমন, তারপর বাইরে চলে এল। গ্রিগর তার ঘরে বসে উখো দিয়ে ব'ড়শি ধার দিচ্ছিল, আর নাতালিয়া শুয়োরের চর্বি মাখিয়ে একটা একটা করে আলাদা কাপড়ে অতি সাবধানে জড়িয়ে রাখছিল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে পান্তালিমনকে পাশ দিয়ে যেতে দেখেই গ্রিগর নাতালিয়ার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। শরতের কিশলয়ের মত তার হলদে গালদুটো লাল হয়ে উঠল। গত কয়েক-মাসেই নাতালিয়া বেশ রোগা হয়ে পড়েছে; তার চোখে ফুটে উঠেছে নতুন এক অতৃপ্তির দৃষ্টি। বুড়ো দরজার কাছে একবার থামল, বেঞ্চের ওপর বসে থাকা নাতালিয়ার দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বলল, 'ছোঁড়াটা মেরে ফেলছে মেয়েটাকে' হঠাৎ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বুড়ো চিৎকার করে উঠল

—'ও সব রাখ, চুলোয় যাক সব!'

অবাক হয়ে গ্রিগর বাপের মুখের দিকে তাকাল।

—'দু দিকেই যে ধার দিতে হবে, বাবা।'

—'বলছি, রেখে দে ওসব। কাঠ-কাটতে যেতে হবে। তৈরি হয়ে নে। এখনো শ্লেজ ঠিক করা হল না, আর উনি ব'ড়শি ধারাচ্ছেন।'

অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে কথাগুলো বলেই দরজার দিকে পা বাড়াল। বোঝা গেল, আরও কিছু বলতে চায় সে। কিন্তু বাইরে চলে গেল। গ্রিগর শুনতে পেল, বুড়ো তার বাকি রাগ ঝাড়ছে পিয়োত্রার ওপর।

॥ তিন ॥

বৃহস্পতিবার ভোর হবার প্রায় ঘণ্টাদুয়েক আগেই ইলিনিচ্‌না উঠে পড়ল। দারিয়াকে ডেকে তুলল, 'উঠে পড়! উনুন ধরানোর সময় হয়ে গেছে!'

সেমিজ পরেই দারিয়া উনুনের কাছে দৌড়ে গেল, চকমকি ঠুকে আগুন ধরাল। সিগরেট ধরাতে ধরাতে পিয়োত্রা বৌ'কে তাড়া দিল :

—'হাত চালিয়ে কাজ কর।'

—'ওঁরা গিয়ে নাতাস্কাকে তুলতে পারেন না! আমি কি চার হাত গজাব?' দারিয়া ফুঁসে উঠল।

—'তুমি নিজে গিয়েই তুলে দাও না।' পিয়োত্রা পরামর্শ দিল। কিন্তু তার আর

দরকার হল না। আগেই উঠে পড়েছে নাতালিয়া। জ্যাকেটটা গায়ে দিতে দিতেই উনুনের জন্যে কাঠ আনতে বাইরে চলে গেল।

রান্নাঘরের মধ্যে টাটকা কভাস, ঘোড়ার সাজ আর মানুষের শরীরের উষ্ণ গন্ধ। পশমের বুট পায়ে এলোমেলো পা ফেলে দারিয়া ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরতে লাগল। ছোট ছোট স্তনদুটো গোলাপী রঙের সেমিজের নীচে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। বিবাহিত-জীবন তাকে মাধুর্যহীন কিংবা শুকনো কঠিন করে তুলতে পারে নি। দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী দারিয়া উইলো ডালের মতই পেলব, আজও কিশোরীর মত প্রাণময়ী।

খাবার তৈরি হবার আগেই ভোর হয়ে গেল। ঘন পায়েসে ফুঁ দিয়ে দিয়ে পান্তালিমন হাত চালিয়ে খেয়ে চলল। গ্রিগর ধীরেসুস্থে খেতে লাগল। কালো মেঘ নেমেছে তার মুখে। পিয়োত্রা দুনিয়ার পেছনে লেগে মজা করতে লাগল। বেচারী দাঁতের ব্যথায় ভুগছে, সারামুখে পট্টিবাঁধা।

রাস্তায় শ্লেজ-চালকদের আওয়াজ শোনা গেল। ধূসর ভোরেই—বলদটানা শ্লেজ-গুলো ডনের দিকে চলেছে। গ্রিগর আর পিযোত্রা শ্লেজ জুড়তে চলে গেল। বেরুবার আগে গ্রিগর বউ'এর উপহার দেওয়া নরম একটা স্কার্ফ গলায় জড়িয়ে নিল। কর্কশ-কণ্ঠে কা কা করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে একটা কাক উড়ে গেল। কাকটার উড়ে যাওয়া লক্ষ্য করল পিয়োত্রা, তারপর বলে উঠল :

—'দক্ষিণে উড়ে যাচ্ছে, গরম দেশে।'

একটুকরো গোলাপী মেঘের আড়াল থেকে ছোট্ট একফালি ম্লান চাঁদ তরুণীর স্মিতহাসির মত জেগে রয়েছে। রান্নাঘরের চিমনিগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে, এগিয়ে চলেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে ওই চাঁদের ফালির দিকে। মেলেখফদের বাড়ির উল্টো-দিকের নদীর জল পুরোপুরি জমে যায় নি। নদীর ধারে ধারে বরফ জমাট বেঁধে উঠেছে, স্তূপীকৃত তুষারে সবুজ হয়ে উঠেছে। মাঝনদীর পেছনে, কালো চুড়োর দিকটায় সাদা বরফের ভেতর থেকে মারাত্মকভাবে হাঁ করে আছে বরফের জমাটকালো গহ্বরগুলো।

বলদদুটো হাঁকিয়ে আগে আগে পান্তালিমন চলে গেল। ছেলেরা যাবে পেছনে। নদীর পারঘাটার কাছে, ঢালুর মুখে পিয়োত্রা আর গ্রিগরের আনিকুস্কার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বলদগুলোর পাশে পাশে সে হাঁটছে, তার বোকাসোকা রোগা বৌটার হাতে লাগাম। পিয়োত্রা ডেকে বলল :

—'কি গো, পড়শী! বৌকেও সঙ্গে নিচ্ছ নাকি?'

আনিকুস্কা হাসল, দুইভাইয়ের সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল। উত্তর দিল :

—'হ্যাঁ গো, শরীরটা গরম রাখতে হবে ত?'

- 'শরীর মোটেই গরম হবে না, বড্ড রোগা তোমার বৌ।'

—'ঠিক বলেছ, এত ওট্ খাওয়াচ্ছি, কিন্তু একটুও মোটা হয় না।'

তিনজনই এগিয়ে চলল। বনের গায়ে গায়ে জমাট শিশিরে পাড় ঝুলছে, সারা বন সাদা ধবধব করছে। মাথার ওপরকার গাছের ডালে চাবুক মারতে মারতে আনিকুস্কা আগে আগে চলল। সূচের মত ডগাসরু ঝুলন্ত বরফ তার বৌ'এর মাথায় বৃষ্টির ধারার মত ঝরে পড়তে লাগল।

—'ইয়ার্কি হচ্ছে, না?' বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে বৌ চেঁচিয়ে উঠল। পিয়োত্রা উপদেশ দিল :

—'ওকে ফেলে দাও বরফের মধ্যে।'

বাঁক ফিরতেই দেখা হল স্তেপান আস্তাখফের সঙ্গে, যোয়াল যোতা একজোড়া বলদ তাড়িয়ে গ্রামের দিকে চলেছে। লোমের টুপির নীচে তার কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো একগোছা সাদা আঙুরের মত ঝুলছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে আনিকুস্‌কা বলে উঠল :

—'কি গো, স্তেপান! পথ হারিয়ে ফেলেছ?'

—'পথ হারিয়েছি, না তোমার মাথা! মোড় ফিরতে একটা গুঁড়িতে স্লেজ আটকে গিয়ে দড়ি ছিঁড়ে দু টুকরো হয়ে গেল। তাই ফিরে যেতে হচ্ছে।' স্তেপান খিস্তি করে উঠল। পিয়োত্রার পাশ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ তার দুচোখে কালো মেঘ ঘনিয়ে উঠল।

—'স্লেজ পেছনে রেখে গেলে?' ঘুরে দাঁড়িয়ে আনিকুস্‌কা প্রশ্ন করল।

স্তেপান হাত দোলাল, ছটাং করে চাবুকের আওয়াজ করল। কঠিন দৃষ্টিতে একবার গ্রিগরের দিকে তাকিয়ে গেল। একটু এগুতেই দেখা গেল রাস্তার মাঝখানে স্লেজখানা পড়ে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে আকসিনিয়া। হাত দিয়ে ভেড়ার চামড়ার পোষাকের প্রান্ত ধরে রাস্তা বরাবর তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে।

—'রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াও নইলে গায়ের ওপর দিয়েই গাড়ি চালিয়ে দেব। তুমি ত আর আমার বৌ নও।' আনিকুস্‌কা ঘোড়ার মত নাকের আওয়াজ করল। আকসিনিয়া একটু হেসে পাশে সরে ওল্টানো স্লেজের ওপর বসল।

—'তুলে নিতে পারতাম গো। কিন্তু সঙ্গে নিজের গিন্নী আছেন যে।' গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে আনিকুস্‌কা বলে গেল।

কাছাকাছি আসতেই পিয়োত্রা চট্ করে একবার পেছনে গ্রিগরের দিকে তাকাল। গ্রিগর কিছুটা পেছনে পেড়েছে। অর্থহীন হাসি তার মুখে, সমস্ত অঙ্গভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে উদ্বেগ আর আগ্রহ। পিয়োত্রা জিজ্ঞেস করল :

—'এ কি? স্লেজ ভেঙে গেছে?'

—'হ্যাঁ।' আকসিনিয়া জবাব দিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, পিয়োত্রার কাছ থেকে সরে গিয়ে গ্রিগরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। গ্রিগর কাছে আসতেই বলল, 'তোমার সঙ্গে গোটা কয়েক কথা বলতে চাই, গ্রিগর।'

পিয়োত্রাকে বলদ দুটোর দিকে একটু নজর রাখতে বলে গ্রিগর আকসিনিয়ার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। অর্থময় হাসি হেসে পিয়োত্রা গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল।

দুজনে নিঃশব্দে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল। আকসিনিয়া সন্তর্পনে একবার চারপাশ দেখে নিল, তারপর টলটলে কালো চোখ দুটো গ্রিগরের মুখের দিকে ফেরাল। লজ্জা আর আনন্দে গালদুটো আগুনরাঙা হয়ে উঠল, ঠোঁট শুকিয়ে গেল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল।

রাস্তার বাঁকে ওকগাছের বাদামি রঙের গুঁড়িগুলোর আড়ালে পিয়োত্রা আর আনিকুস্‌কা অদৃশ্য হয়ে গেল।

—'শোন গ্রীস্‌কা! তোমার যা খুশি তা-ই করতে পার, কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার বাঁচার মত কোন শক্তি নেই।' আকসিনিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, তারপর উত্তরের অপেক্ষায় ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রইল।

গ্রিগর কোন উত্তর দিল না। নিস্তব্ধতা আষ্টেপৃষ্টে বনকে বেঁধেছে। রিন্‌রিন্ করা শূন্যতা যেন তার কানে এসে বাজতে লাগল। স্লেজ চলে চলে পালিশ করা সমতল রাস্তা, নির্বাক তন্দ্রাচ্ছন্ন বনভূমি... ধারে কাছের একটা দাঁড়কাকের হঠাৎ চিৎকারে

ক্ষণিক জড়তা থেকে জেগে উঠল গ্রিগর। মাথাটা উঁচু করল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, পাখিটা নিঃশব্দে ডানা নাড়তে নাড়তে চলে গেল। সে আপন মনেই বলে উঠল :

—'গরম পড়বে! ওটা উড়ে চলেছে গরম দেশে! গরম দেশে উড়ে চলেছে।' চমকে উঠে কর্কশকণ্ঠে সে হেসে ফেলল.. 'তবে, তাই হক'... গ্রিগর নেশাজড়ানো দৃষ্টি ফেরালো আকর্সিনিয়ার দিকে। হঠাৎ হেঁচকাটানে তাকে বুকের কাছে টেনে নিল।

॥ চার ॥

শীতকালের প্রতি সন্ধ্যায় লুকিয়েশকার বাড়িতে স্তকমানের ঘরে গ্রামের ছোট একটা দল আড্ডা জমাতে শুরু করল। সেই দলে আসতে লাগল ক্রিস্তোনিয়া, কারখানার ভালেত, সদাহাস্যময় দাভিদ (তিনমাস সে বেকার), ইঞ্জিন-চালক ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ কোত্লিয়ারোভ, মাঝে মাঝে মুচি ফিল্কা। আর সব সময়ে আসতে লাগল মিশা কোশেভয়। তরুণ কসাক, এখনো তার পল্টনের বরাদ্দ বেগার দেওয়া শেষ হয় নি।

প্রথম প্রথম সবাই তাস খেলত। তারপর মাঝে মাঝে স্তকমান নেক্রাসোভের কবিতার বই বার করত। সবাই চেঁচিয়ে পড়ত. ভালও লাগত। তারপর পড়া হত নিকিতিন। প্রায় বড়দিনের কাছাকাছি একদিন স্তকমান পাতামোড়া, বাঁধাই-খোলা. আঙুলের দাগে ভর্তি একখানা বই দিয়ে পড়তে বলল। কোশেভয় গির্জার স্কুলে পড়েছে, সে তেলতেলে পাতাগুলো অবজ্ঞাভরে দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে পড়তে গিয়ে বিরক্তিতে বলে উঠল :

—'এ দিয়ে পায়েস রাঁধা যায়. যা তেলতেলে!'

ক্রিস্তোনিয়া হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসিতে ঝলমল করে উঠল দাভিদ। ঠাট্টা-মস্করায় ভাটা না পড়া পর্যন্ত স্তকমান অপেক্ষা করে রইল। পরে বলল :

—'পড়ে যাও মিশা। ভারী মজার পড়তে। কসাকদের ব্যাপার নিয়ে লেখা।'

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কোশেভয় অতিকষ্টে বানান করে করে পড়তে লাগল :

—' 'ডন-কসাকদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'।' তারপর আগ্রহভরে চারপাশে তাকাল।

—'পড়ে যাও।' ইঞ্জিন-চালক কোত্লিয়ারোভ বলে উঠল।

তারা তিন সপ্তাহ ধরে কষ্ট করে বইখানা পড়তে লাগল। পড়তে লাগল অতীতের মুক্তজীবনের কথা, পুগাচেভের কাহিনী, স্তেংকা রাঝিন্, ভাসিলি বুলোভিনের কাহিনী। অবশেষে এল আধুনিক যুগে। অজ্ঞাত লেখক কসাকদের শোচনীয় অবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন, বুদ্ধিমত্তা আর শক্তিমত্তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষ ও বিধি-ব্যবস্থার কটাক্ষ করেছেন, জার-সরকার আর কসাক প্রথাকে—যে কসাক প্রথা রাজন্যবর্গের ভাড়াটে দেহরক্ষীর সৃষ্টি করেছে—সোজাসুজি আক্রমণ করেছেন। শ্রোতারা উত্তেজিত হয়ে উঠল। নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু করে দিল। স্তকমান দরজার কাছে বসে পাইপ টানতে লাগল, আর মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

—'ঠিক, ঠিক লিখেছে! একেবারে খাঁটি কথা!' ক্রিস্তোনিয়া হয়ত ফেটে পড়ল।

ইঞ্জিন-চালক কোত্লিয়ারোভ হাড়ে হাড়ে গোঁড়া কসাক। প্রাণপণে সে কসাকদের

সমর্থন করতে লাগল। তার ঠিকরে বেরিয়ে আসা ভাঁটার মত চোখদুটো জ্বলে উঠতে লাগল।

—'তুমিও নিজে 'চাষা', ক্রিস্তান! কসাক রক্ত ত ছিটেফোঁটা। তোমার মা ঘর করত ভোরোনেঝের এক 'চাষার' সঙ্গে।'

—'তুমি একটা গাধা, একটা পাঁঠা!' ক্রিস্তোনিয়া জোরের সঙ্গে বলে উঠল।

—'চুপ করে থাক, 'চাষা'!

—''চাষারা' তোমার মত মানুষ নয় বুঝি?'

—''চাষা'রা হচ্ছে মাদুর দিয়ে জড়ানো কাঠকুটো।'

'—'পিটার্সবুর্গে যখন চাকরী করতাম, তখন অনেক কিছুই দেখেছি, ভায়া।', ক্রিস্তোনিয়া বলতে শুরু করল। 'একবার হল কি, আমরা জারের প্রাসাদ পাহারা দিচ্ছি, ঘরের ভেতরেও পাহারা দিতে হবে, বাইরে পাঁচিলের চারপাশেও পাহারা দিতে হবে। আমরা ঘোড়ায় চাপলাম, দুজন এদিকে দুজন ওদিকে। যখন দেখা হয়, জিজ্ঞেস করি, 'সব ঠিক আছে? কোথাও আক্রমণ হচ্ছে না তো?' তারপর আবার ঘোড়া চালাই। হুকুম ছিল, আমরা কথা বলতে পারব না, থামাও বারণ। চেহারার জন্যেই কর্তারা বেছে নিয়েছিলেন আমাদের; পাহারা দেবার সময় এলেই দরজার কাছে আমাদের জোড়া জোড়া পরখ করে নেওয়া হত, মুখের আদল যাতে একরকমের হয়, চেহারাও একরকম হয়। এই জন্যেই নাপিত ডেকে একবার আমার দাড়ি রঙ করতে হল। সেবার আমার ডিউটি পড়ল বাদামীরঙের দাড়িওয়ালা এক কসাকের সঙ্গে। সারা রেজিমেণ্ট খুঁজেও তার জুড়ি পাওয়া গেল না। তাই ট্রুপ-কমাণ্ডার আমাকে নাপিতের কাছে পাঠালেন দাড়ি রঙাবার জন্যে। পরে আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে আমার বুকটা প্রায় ভেঙে গেল। মনে আগুন জ্বলে উঠল, দাউ দাউ আগুন।'

—'কিন্তু ক্রিস্তোনিয়া, এসবের সঙ্গে আমাদের প্রশ্নের সম্পর্ক কি? আমাদের বলতে চাইছ কি?' কোত্‌লিয়ারভ বাধা দিয়ে বলে উঠল।

—'বলতে চাইছি, সাধারণ মানুষের সম্পর্কে। বলছিলাম না, একবার বাইরে পাহারা দিতে দেওয়া হল। আমরা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরছি, আমি আর আমার এক দোস্ত। এমন সময় কোথা থেকে দৌড়ে এল একদল ছাত্র। আমাদের দেখতে পেয়েই ওরা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল: 'হেই'! তারপর আবার বলল; 'হেই'! কাউকে ডাকবার আগেই আমাদের ওরা ঘেরাও করে ফেলল। 'ঘোড়ায় চড়ে করছ কি, কসাকদাদুরা?' ওরা জিজ্ঞেস করল। আমি বললাম, 'আমরা পাহারা দিচ্ছি।' হাত দিয়ে তলোয়ারখানা চেপে ধরলাম। একজন বলে উঠল, 'আমাকে বিশ্বাস কর, দাদু। আমার বাড়ি কামিয়েন্‌স্কা জেলায়, এখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়ি।' আমরা ফিরছি, এমন সময় ছেলেটা গছিয়ে দিল একখানা দশ রুবলের নোট। 'আমার মৃত বাপের নাম করে একটু মদ খেও।' তারপর পকেট থেকে বার করল একখানা ছবি, বলল, 'এই হচ্ছে আমার বাবার ছবি। এটা রেখে দাও চিহ্ন হিসেবে।' নিলাম আমরা, ফেরতইবা দিই কি করে! ওরা চলে গেল। এমন সময় একদল সেপাই নিয়ে, প্রাসাদের পেছন দরজা দিয়ে এক অফিসার হাজির হল; এসেই চিৎকার করে উঠল, 'কে লোকটা?' আমিও বললাম, ছাত্ররা এসেছিল, বার্তাচিৎ করে গেল, হুকুমমাফিক তলোয়ারের চোটও মারতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের ছেড়ে দিতেই, আমরাও ঘোড়া ফিরিয়েছি। পাহারার পালা সাঙ্গ হলে, কর্পোরালকে ছবি দেখিয়ে বললাম, আমরা দশ রুবল রোজগার করেছি, বুড়ো লোকটার নাম করে একটু মদ টানতে চাই। সন্ধেবেলায় কর্পোরাল কয়েক বোতল

ভদ্‌কা আনিয়ে দিল, দিন কয়েক ফুর্তিতেই কাটল। পরে জানলাম, ছেলেটা যে ছবিটা আমাদের গছিয়েছে, সেটা জার্মানীর বিদ্রোহীদের পাণ্ডার ছবি। ওটা আমি বিছানার ওপরেই ঝুলিয়ে রেখেছিলাম : লোকটার মুখে দাড়ি, দেখতে শুনতেও বেশ, ব্যবসা-দারের মত চেহারা। ট্রুপ-কমাণ্ডার একদিন দেখতে পেয়েই জিজ্ঞেস করে বসল, 'এ ছবি কোত্থেকে পেলে?' তাকে বললাম ব্যাপারটা। লোকটা গজরাতে লাগল, 'জানো লোকটাকে? ওইত ওদের মোড়ল কার্ল...দুত্তোর, ভুলে গেছি পুরো নামটা। কি যেন নামটা...'

—'কার্ল মার্ক্স' মৃদু হেসে স্তকমান বাতলে দিল।

—'ঠিক ঠিক। কার্ল মার্ক্স।' উৎফুল্ল হয়ে ক্রিস্তোনিয়া বলে উঠল। 'আমরা কিন্তু দশ রুবলই মদ টেনেছিলাম। দেড়ে কার্লের নামেই টেনেছিলাম, কিন্তু টেনেছিলাম টানার মত করেই।'

—'নাম করে মদ খাবার মতই লোক উনি।' সিগারেট-হোল্ডারটা নাড়তে নাড়তে স্তকমান হাসল।

—'কেন? কি করেছে লোকটা?' কোত্‌লিয়ারোভ জিজ্ঞেস করল।

—'আর একসময় বলব অখন। আজ রাত হয়ে গেছে।' সিগারেট-হোল্ডারটা আঙুলের ফাঁকে আটকে স্তকমান আরেক হাতের চাপড় মেরে সিগারেটের শেষটুকু ফেলে দিল।

অনেক দিনের বাছাই আর পরখ করার পর দশজন কসাকের একটা ছোট দল নিয়মিত মিলতে শুরু করল। স্তকমান হল সেই দলের মধ্যমণি। তার মতলব অনুসারে সে সোজা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। কাঠের পোকার মত সে তাদের সহজ বিশ্বাস আর সংস্কারে ঘুণ ধরিয়ে দিতে লাগল। বর্তমান ব্যবস্থার ওপর তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে লাগল। তাদের অবিশ্বাসের লৌহবর্মে প্রথম প্রথম বাধা পেতে লাগল, কিন্তু পিছপা হবার লোক সে নয়।

॥ পাঁচ ॥

ডনের বাঁ-পাড়ের বালিয়াড়ির ঢালুতে ভিয়েশেন্‌স্কার কেন্দ্র, ডনের উজানে সবচেয়ে পুরনো জেলা-কেন্দ্র এটি; প্রথম পিতরের রাজত্বকালে চিগোনোক নামে যে শহরটা ধ্বংস হয়েছিল, সেটাকেই সরিয়ে এনে নতুন নাম দেওয়া হয়েছে ভিয়েশেন্‌স্কা। আগের দিনে এটা ছিল ভোরোনেঝ্‌ থেকে আঝভ্‌ সাগর বরাবর বিশাল জলপথের একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র।

ভিয়েশেন্‌স্কার উল্টোদিকে ডন বেঁকেছে তাতার ধনুকের মত, হঠাৎ মোড় নিয়েছে ডানদিকে, ছোট্ট বাঝ্‌কা গ্রামের পাশ দিয়ে আবার সোজা হয়েছে ভারিক্কীচালে, পশ্চিম পাড়ের খড়ি-রং পাহাড়ের পায়ের ওপর দিয়ে, ডান ধারের গায়ে গায়ে লাগান গ্রামগুলোর পাশ দিয়ে, বাঁ-ধারের কচিৎ-কখনো-চোখে-পড়া বসতিগুলোর কাছ ঘেঁসে সবুজাভ-নীল জলের স্রোত টেনে নিয়ে চলেছে সাগরে—নীল আঝভ্‌ সাগরের দিকে।

হলদে বালিয়াড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ভিয়েশেনস্কা। নিরাভরণ, নিরাবরণ গ্রাম

একটা। বাগান নেই, বাগিচা নেই। বারোয়ারিতলার মাঝখানে একটা পুরনো গির্জা, বয়সের ধূসর ছাপ লেগেছে গায়ে। আর বারোয়ারিতলা থেকে ছটা রাস্তা নদীর সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় বেরিয়ে এসেছে। বাঝ্‌কা গ্রামের কাছে, ডন বেঁকেছে যেখানে, সেখানে একটা হ্রদ; ভাটার সময়কার ডনের মত প্রশস্ত, জামার হাতার মত ঢুকে গিয়েছে উইলো বনের মধ্যে। ভিয়েশেন্‌স্কা গ্রামের শেষ প্রান্ত এসে মিলেছে এই হ্রদের সঙ্গে। আর সোনালী ফণি-মনসায় ঢাকা একটা ছোটমত বারোয়ারিতলায় দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতীয় গির্জা, সবুজ গম্বুজ, সবুজ ছাদ; দাঁড়িয়ে আছে উইলোর সবুজ ছায়ায়।

গ্রামের ওধারে, উত্তর দিকে জাফরানী রঙের বালির ধূধূ বিস্তার, শীর্ণ অপুষ্ট পাইনের আবাদ, আর লোহার মরচের মত জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে গাছের সার। বালির সমুদ্রে এখানে ওখানে দুর্লভ মরুদ্যানের মত কয়েকটা গ্রাম, ঘাসে ঢাকা মাঠ, ধূসর উইলো ঝোপ।

ডিসেম্বরের এক রবিবারে সারা জেলার গ্রাম থেকে পনরশ' কসাক তরুণের এক বিরাট জনতা জমায়েত হল পুরনো গির্জার বাইরে বারোয়ারিতলায়। উপাসনা শেষ হলে, তাগড়াই চেহারার এক পদস্থ সার্জেণ্ট—এক বয়স্ক কসাক—ফৌজী চাকরির তকমা-মেডেল এঁটে নির্দেশ দিতেই, তরুণেরা দুজন দুজন করে দুটি লম্বা অসমান লাইন বেঁধে দাঁড়াল। নিয়মমাফিক পোশাক চড়িয়ে, নতুন অফিসারের উর্দি গায়ে, রেকাবে টুং টাং আওয়াজ তুলে, জেলার আতামান কর্মচারীদের আগে আগে গির্জার ঘেরা গণ্ডির ভেতরে এসে ঢুকল।

দু একপা পেছনে হটে, গোড়ালি ঠুকে পদস্থ সার্জেণ্ট হুকুম দিল :

—'ডাইনে, কুইক মার্চ!'

খোলা গেটের ভেতর দিয়ে লাইন দুটো এগিয়ে চলে গেল। পায়ের শব্দে গির্জার গম্বুজ অবধি কেঁপে উঠল।

পাদ্রীসাহেব শপথ-নামা পড়ে গেলেন। তার কোন কথাই গ্রিগর কান দিয়ে শুনল না। মিত্‌কা কোরশুনভ তার পাশে দাঁড়িয়ে, নতুন বুটের কামড়ানিতে মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। গ্রিগরের শূন্যে তোলা হাতখানা অসাড় হয়ে উঠল, মনের মধ্যে এলো-মেলো চিন্তার স্রোত বইতে লাগল। বহু লোকের ঠোঁটের ছোঁয়ায় ভেজা রুপোর ঠাণ্ডা ক্রুশটার নীচে দিয়ে যাওয়ার সময় চুমু খেতে খেতে তার মনে পড়ে গেল আকসিনিয়ার কথা, বৌএর কথা। চোখের সামনে ঝলক দিয়ে উঠল সেই বন, বাদামী রঙের গাছের গুঁড়ি, শ্বেত রেখাঙ্কিত শাখাপ্রশাখা আর রুমালের নীচে আকসিনিয়ার কালোচোখের সিক্ত দীপ্তি।

অনুষ্ঠান শেষ হতেই আবার তাদের কুচকাওয়াজ করে নিয়ে যাওয়া হল বাইরে বারোয়ারিতলায়, লাইন করে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। নাকটা ঝেড়ে নিয়ে, অলক্ষ্যে কোটের আস্তরে আঙুল ঘসতে ঘসতে সার্জেণ্ট বক্তৃতা দিতে শুরু করল :

—'তোমরা আর শিশু নও, তোমরা এখন কসাক। তোমরা শপথ নিয়েছ, আর নিশ্চয়ই বুঝে থাকবে কি তার অর্থ, কি কাজের শপথ তোমরা নিলে। তোমরা এখন কসাক, এখন থেকে তার সম্মান রক্ষা করে চলবে; বাপ মা ইত্যাদিকে মান্য করবে। যখন ছোট ছিলে, তখন খেলাধুলো করে বেড়িয়েছ, হয়ত রাস্তায় রাস্তায় কানামাছি খেলেছ; এখন কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে ভবিষ্যৎ ফৌজী-কাজের কথাটা। এক বছরের মধ্যেই তোমাদের ডাক পড়বে পল্টনে...' এতদূর বলে সার্জেণ্ট আবার তার নাক ঝাড়ল, হাত ঘসল, হাত থেকে দস্তানা খুলে নিতে নিতে অবশেষে শেষ

করল, 'তোমাদের বাপ কিংবা মাকে এখন ভাবতে হবে সাজসরঞ্জাম জোগাড় করার কথা। তাঁদের জোগাড় করতে হবে পল্টনের ঘোড়া...আর সাধারণভাবে...' আচ্ছা, এখন তোমরা বাড়ি যাও। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন!'

॥ ছয় ॥

গ্রিগর আর মিত্‌কা গ্রামের বাদবাকি ছেলেদের খুঁজে নিয়ে তাতার্স্ক গ্রামের দিকে রওনা হল। যখন গ্রামে এসে পেঁছুল তখন সন্ধে নেমেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে, গ্রিগর জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখে নিল। ঝোলানো কুপি থেকে ফ্যাকাশে হলদে আলো ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে, পিয়োত্রা জানলার দিকে পেছন ফিরে কুপির সেই আলোয় দাঁড়িয়ে আছে। দরজার পাশ থেকে ঝাঁটা নিয়ে বুটের বরফ ঝেড়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতরই গ্রিগর রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। বলল :

—'আমি এসেছি।'

—'খুব তাড়াতাড়ি ফিরেছিস ত। জমে গেছিস নিশ্চয়।' পিয়োত্রা ব্যগ্র হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

হাঁটুতে কনুই রেখে, হাতের মধ্যে মাথাগুঁজে পান্তালিমন বসে আছে। ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করা এক চরকা নিয়ে দারিয়া সুতো কাটছে। গ্রিগরের দিকে পেছন দিয়ে টেবিলের পাশে নাতালিয়া দাঁড়িয়ে আছে, ঘরে ঢুকলে একবারও ঘুরে দাঁড়াল না। রান্নাঘরের চারধারে একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে গ্রিগর পিয়োত্রার মুখের ওপর চোখের দৃষ্টি রাখল। দাদার উত্তেজিত, আশঙ্কিত মুখখানা দেখে বুঝতে পারল, কিছু একটা ঘটেছে।

—'শপথ নেওয়া হয়েছে?' পিয়োত্রা জিজ্ঞেস করল?

—'হ্যাঁ।'

অনেকটা সময় গ্রিগর আস্তে আস্তে বাইরের পোশাক খুলতে লাগল। মনে মনে নানাভাবে অনুমান করতে লাগল, এই নিরুত্তাপ, নীরব অভ্যর্থনার কারণটা কি। ইলিনিচ্‌না শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তার মুখে উদ্বেগের ছাপ।

—'নিশ্চয়ই নাতালিয়াকে নিয়ে!' গ্রিগর মনে মনে ভাবল, তারপর বাপের পাশে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল।

—'ওকে কিছু খেতে দাও।' গ্রিগরের দিকে চোখের ইঙ্গিত করে মা দারিয়াকে হুকুম করল। দারিয়া চরকার গানের মাঝখানেই থেমে গেল, উঠে এগিয়ে এল উনুনের কাছে। রান্নাঘরে জমাটবাঁধা স্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে।

ঝোলের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে গ্রিগর নাতালিয়ার দিকে তাকাল। তার মুখ দেখতে পেল না। নাতালিয়া তার দিকে আড় হয়ে বসে আছে, বুনুনি-কাঁটার ওপর মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে। সেই স্তব্ধতায় কথা বলবার জন্যে প্রথম উত্তেজিত হয়ে উঠল পান্তালিমন। জোর করে একটু কেশে নিয়ে বলল :

—'নাতালিয়া বলছে, ও নাকি বাপের বাড়ি ফিরে যাবে।'

রুটি দিয়ে থালাটা চেঁছেমুছে নিল গ্রিগর, কোন উত্তর দিল না।

—'ব্যাপারটা কি?' বাপ জিজ্ঞেস করল; নীচের ঠোঁটটা থরথর করে কেঁপে উঠল। রাগে ফেটে পড়ার আগেকার লক্ষণ এটা।

—'আমি কিচ্ছু জানিনে।' উঠে ক্রশ করতে করতে গ্রিগর উত্তর দিল।

—'কিন্তু আমি জানি।' বাপ গলা চড়াল।

—'চেঁচিও না, চেঁচিও না!' ইলিনিচ্না বাধা দিয়ে বলে উঠল।

—'হ্যাঁ, সত্যিই ত চেঁচামেচির কি আছে।' জানলার ধার থেকে পিয়োত্রা ঘরের মাঝখানে সরে এল। 'সবকিছুই নির্ভর করে ভালবাসার ওপর। মন চায়, থাক এক-সঙ্গে, মন না চায়, তাহলে...'

—'ওকে কোন দোষই দিই নে আমি। ও যদি বেবুশ্যে, ছেনাল মাগীও হয়, তাহলেও দোষ দিই না; কিন্তু ওই শুয়োরটা—', আঙুল তুলে পান্তালিমন গ্রিগরকে দেখিয়ে দিল। সে তখন উনুনের ধারে গা তাতাচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করল :

—'কার কি ক্ষতি করেছি আমি?'

—'তুই জানিস নে? তুই জানিস নে, শয়তান?'

—'না, আমি জানি নে।'

আসন ছেড়ে পান্তালিমন লাফ দিয়ে উঠল। বেঞ্চিটা উল্টে গেল। সোজা সে এগিয়ে গেল গ্রিগরের দিকে। নাতালিয়ার হাত থেকে মোজাটা পড়ে গেল, মেঝের ওপর কাঁটাগুলো গড়গড় করে গড়িয়ে গেল। আর সেই শব্দে উনুনের পাড় থেকে লাফিয়ে নামল একটা বেড়াল, উলের গোলাটা নিয়ে খেলতে শুরু করে দিল।

—'আমার কথা হচ্ছে এই—,' আস্তে আস্তে ভেবে ভেবে পান্তালিমন বলে চলল। 'নাতালিয়ার সঙ্গে ঘর করতে যদি মন না চায় ত, দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে, যেখানে তোর দুচোখ যায়। এই আমার পষ্ট কথা। দূর হয়ে যা যেখানে তোর দুচোখ যায়।' শান্ত গলায় আবার সে কথাটার পুনরাবৃত্তি করল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বেঞ্চিটা তুলে নিল।

—'আমার কথাও শুনে রাখ, বাবা, রাগের মাথায় একথা বলছি নে আমি...' গ্রিগরের গলার স্বর কলসীর আওয়াজের মত ফাঁপা শোনাল। 'নিজে পছন্দ করে বিয়ে করি নি আমি, তোমরা জোর করে বিয়ে দিয়েছ। নাতালিয়ার ওপর আমার কোনই টান নেই। খুশি হয়, ও চলে যাক বাপের বাড়ি।'

—'তুই নিজে দূর হ এখান থেকে।'

—'যাবই ত!'

—'যা, চুলোয় যা তুই।'

—'যাচ্ছি, যাচ্ছি, তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই।' বিছানার ওপরে পড়ে থাকা পশমী কোটটা নেবার জন্যে গ্রিগর হাত বাড়াল। নাকের পাশদুটো ফুলে উঠল। বাপের মতই একই রকম রাগে কাঁপতে লাগল সে। তাদের দুজনের শিরায় শিরায় একই রকম মেশাল দেওয়া তুর্কী আর কসাক রক্ত বইছে। এই মুহূর্তে তাদের দুজনের কি আশ্চর্য সাদৃশ্য।

—'কোথায় চললি রে?' গ্রিগরের হাত চেপে ধরে ইলিনিচ্না আর্তনাদ করে উঠল। গায়ের জোরে মাকে সরিয়ে দিয়ে গ্রিগর পশমী কোটটা ছিনিয়ে নিল।

—'যেতে দাও, ও শুয়োরটাকে! যেতে দাও!' দরজাটা হাট করে খুলে দিয়ে বুড়ো বাজের মত গর্জে উঠল, 'যা, চলে যা, দূর হ!'

গ্রিগর দৌড়ে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির ওপর দাঁড়াল। শেষ যে শব্দটা শুনতে পেল—তা নাতালিয়ার কান্নার শব্দ।

তুষারাচ্ছন্ন রাত্রি গ্রামখানাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। কালি মাখানো আকাশ থেকে সূচের মত ধারালো তুষার ঝরছে, ডনের মধ্যে বরফের চাঁই ফাটছে—তার আওয়াজ উঠছে পিস্তল ছোঁড়ার মত। হাঁপাতে হাঁপাতে গেট পেরিয়ে বেরিয়ে গেল গ্রিগর। গ্রামের শেষপ্রান্তে গ্রামের কুকুরগুলো সমস্বরে ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে। তুষারাচ্ছন্ন কুয়াসার মধ্যে থেকে আলোকবিন্দুর হলুদ দীপ্তি চোখে পড়ছে।

গ্রিগর লক্ষ্যহীনভাবে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল। আস্তাখফদের জানলাগুলো অন্ধকারের মধ্যে হীরের টুকরোর মত ঝকমক করে উঠল।

—'গ্রীস্‌কা!' গেটের কাছ থেকে নাতালিয়ার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এল।

—'মর গে যা, কুত্তী!' দাঁত কড়মড় করতে করতে গ্রিগর পা বাড়াল।

—'গ্রীস্‌কা, ফিরে এসো!'

রাস্তার মোড়ে প্রথম গলির দিকে ফিরল সে। শেষবারের মত নাতালিয়ার দূরাগত তিক্ত কান্না শুনতে পেল :

—'গ্রীস্‌কা, ওগো...'

তাড়াতাড়ি বারোয়ারিতলা পেরিয়ে দুই রাস্তার মোড়ে থামল গ্রিগর। ভাবতে লাগল, কার বাড়িতে রাত কাটাবে। মিশা কশেভয়ের বাড়িতেই ঠিক করল। পাহাড়ের পাশে নির্জন খড়োঘরে মিশা তার মা আর বোনের সঙ্গে থাকে। গ্রিগর তাদের উঠোনে এসে দাঁড়াল, তারপর ছোট জানলাটায় ঘা মারল :

—'কে, কে?'

—'মিশা আছ ঘরে?'

—'কে ডাকছে মিশাকে?'

—'আমি, গ্রিগর মেলেখফ।'

একটু পরেই কাঁচাঘুম ভেঙে, দরজা খুলে বেরিয়ে এল মিশা।

—'আরে, গ্রিগর যে?'

—'হ্যাঁ, আমি।'

—'এত রাতে কি চাই?'

—'চল, ভেতরে গিয়ে বলছি।'

বারান্দায় এসে মিশার কনুই চেপে ধরে গ্রিগর ফিসফিস করে বলে উঠল :

—'তোর বাড়িতে রাত্রে থাকব। বাড়ি থেকে চলে এসেছি। একটু জায়গা দিতে পারবি নে তুই? যেমন তেমন একটু জায়গা হলেই চলবে।'

—'চল, ঠিক করে নেওয়া যাবে একটা জায়গা। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলত?'

—'পরে বলব।'

তারা বেঞ্চের ওপর গ্রিগরের বিছানা পেতে দিল। মিশার মায়ের নাক ডাকার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আপাদমস্তক ভেড়ার চামড়া মুড়ি দিয়ে গ্রিগর শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল : এখন কি হচ্ছে বাড়িতে? নাতালিয়া কি সত্যিই বাপের বাড়ি চলে যাবে? সে যাই হক, নতুন মোড় ঘুরেছে জীবনের। কোথায় যাবে সে? উত্তরটা তখন তখনই পেয়ে গেল। কালই খবর পাঠাবে আকসিনিয়াকে, তাকে নিয়ে চলে যাবে কুবানে, চলে যাবে গ্রাম ছেড়ে, দূরে...দূরে...বহুদূরে।

অজানা ভবিষ্যতের চিন্তায় বারবার তার ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। একেবারে

ঘুমিয়ে পড়বার আগে সে প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করল, তাকে যা পীড়িত করছে, সেটা কি? তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সচ্ছন্দগতিতে বয়ে চলল তার চিন্তাধারা, ভাটির স্রোতে নৌকোর মত; তারপর আবার হয়ত হঠাৎ কিসের সঙ্গে ধাক্কা লাগল, যেন নৌকোটা আটকে গেল বালির চরায়। দুস্তর বাধার সঙ্গে বারংবার সে লড়তে লাগল। তার পথের প্রতিবন্ধক হয়ে আছে যা, সেটা কি?

॥ সাত ॥

ভোরের ঘুমভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রিগরের মনে পড়ে গেল ফৌজী-কাজের কথা। তাই ত! তাহলে, আকসিনিয়ার সঙ্গে পালায় কি করে? বসন্তকালে শিক্ষা-শিবির, শরতে পল্টনে নাম লেখানোর ব্যাপার।

সকালের খাওয়া সেরে মিশাকে সে বারান্দায় ডেকে আনল। জিজ্ঞেস করল:

—'মিশা, ভাই, একটু আস্তখফদের বাড়িতে যাবি? গিয়ে, আকসিনিয়াকে বলবি, সন্ধ্যের পর যেন হাওয়া-কলের কাছে আসে।'

—'কিন্তু স্তেপান রয়েছে যে?' মিশা আমতা আমতা করে বলল।

—'বলিস একটা কিছু, বলিস কাজ আছে।'

—'বেশ, যাব আমি।'

—'ওকে বলিস, আসে যেন ঠিক ঠিক।'

সন্ধ্যের সময় গ্রিগর এসে বসল হাওয়া-কলের কাছে। একটা সিগারেট ধরাল। হাওয়া-কলের পেছনে, শুকনো জনারের ডাঁটাগুলোর ওপরে বাতাস হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। স্থির পাখনায় বাঁধা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো পতপত করে উড়ছে। মনে হচ্ছে যেন ওটা কোন একটা বিরাট উড়ন্ত পাখির ডানার শব্দ, কলের চারপাশে ডানা ঝাপটে মরছে, উড়ে যেতে পারছে না। শব্দটা ভারী অস্বস্তিকর আর বিরক্তিজনক মনে হল। ম্লান হয়ে আসা সোনালী রঙ ছড়ানো রক্তআভায় সূর্য পশ্চিমে অস্ত গিয়েছে। তাজা পুবেল হাওয়া বইছে। উইলো-গাছগুলোর মধ্যে আটকে পড়া চাঁদ ঢাকা পড়েছে অন্ধকারে। হাওয়া-কলের মাথার ওপরকার আকাশ মৃত্যুর মত কালো, এখানে ওখানে নীল ছোপ। সারাদিনের কাজ সাঙ্গ হল, গ্রাম থেকে তারই সর্বশেষ কোলাহল ভেসে আসছে।

গ্রিগর পর পর তিনটে সিগারেট শেষ করল। পায়ে মাড়ানো বরফের মধ্যে শেষ টুকরোটা গুঁজে দিল। উদ্বেগে, বিরক্তিতে চারপাশে তাকাতে লাগল। কোথাও কারো চিহ্নমাত্র চোখে পড়ল না। গ্রিগর উঠে দাঁড়াল, শরীরের আড় ভেঙে নিল। মিশাদের জানলার মিটমিটে আলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওই দিকেই এগুতে লাগল সে। মিশাদের উঠোনে পা দিতে যাবে এমন সময় ধাক্কা লাগল আকসিনিয়ার সঙ্গে। স্পষ্টই বোঝা গেল, আকসিনিয়া ছুটে আসছিল, তখনো দম ফেলতে পারছে না; শীতের হাওয়া, নয়ত সম্ভবত স্তেপের তাজা ঘাসের গন্ধ তার মুখে। গ্রিগর বলল:

—'আমি বসে থেকে থেকে হয়রাণ, ভাবলাম তুমি আর এলে না।'

—'স্তেপানকে এড়িয়ে তবে ত আসব।'

—'তোমার জন্যে শীতে জমে গেছি, সর্বনাশী!'

—'আমার গা গরম, গরম করে দিচ্ছি তোমাকে।' পশমের পাড় দেওয়া কোটটা খুলে ফেলল আকসিনিয়া, নিজেকে জড়িয়ে নিল গ্রিগরের সঙ্গে, ওকের গায়ে যেমন করে জড়িয়ে থাকে 'হপ'-লতা। জিজ্ঞেস করল :

—'ডেকে পাঠিয়েছ কেন?'

—'দাঁড়াও, আমার হাতটা ধর। আশেপাশে লোকজন থাকতে পারে।'

—'বাড়ির সঙ্গে ঝগড়া কর নি তো?'

—'আমি বাড়ি ছেড়ে এসেছি। কাল রাতে মিশাদের বাড়িতে ছিলাম। আমি এখন চালচুলোহীন পথের কুকুর।'

রাস্তা ছেড়ে এল তারা। স্তূপীকৃত বরফ এপাশে ওপাশে সরিয়ে দিয়ে একটা ডালের বেড়ায় গ্রিগর হেলান দিয়ে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল :

—'নাতালিয়া বাপের বাড়ি চলে গেছে কি না জানো?'

—'জানি না.. মনে হয় যাবে।'

আকসিনিয়ার কনকনে ঠাণ্ডা হাতটা কোটের হাতার মধ্যে ঢুকিয়ে নিল গ্রিগর। নরম আঙুলগুলোয় চাপ দিয়ে বলে উঠল :

'এখন আমাদের কি হবে?'

—'[illegible] জানি নে, গো। তুমি যা ভাল বোঝ, তাই হবে।'

'[illegible] ছেড়ে আসতে পারবে?'

—হাসতে হাসতে। যদি বলো, আজ রাতেই।'

—'কোথাও আমরা কাজ জোগাড় করে নেব, থাকব দুজনে।'

—'তোমাকে পেলে, আমি গোহালে থাকতেও রাজী, গ্রীস্কা। সবকিছু করতে রাজী।'

দুজনে জড়াজড়ি দাঁড়িয়ে এ ওর গা গরম করে দিতে লাগল। নড়তে ইচ্ছে করল না গ্রিগরের; হাওয়ার দিকে মাথা উঁচু করে সে দাঁড়িয়ে রইল, নাকের পাশদুটো কাঁপতে লাগল, চোখের পাতা মুদে এল। গ্রিগরের বগলে মুখ গুঁজেছে আকসিনিয়া, বুকভরে সেই পরিচিত মনমাতানো ঘামের গন্ধের নিঃশ্বাস নিচ্ছে। গ্রিগরের অলক্ষ্যে তার নির্লজ্জ লালসাতুর ঠোঁটে একটুকরো আনন্দের হাসি কাঁপছে।

—'কাল গিয়ে দেখা করব মোখোভের সঙ্গে। হয়ত কোন কাজকর্ম দিতে পারবে।' আকসিনিয়ার ভেজা কনুইয়ের ওপরটা আঁকড়ে ধরে গ্রিগর বলে উঠল। আকসিনিয়া কোন কথা বলল না, মাথাও তুলল না। হঠাৎ থমকে যাওয়া হাওয়ার মত তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ভয় পাওয়া জানোয়ারের মত বিস্ফারিত দুই চোখে উদ্বেগ আর ভয় ফুটে উঠল। সে অন্তঃসত্ত্বা, একথা মনে পড়তেই ভাবল, 'ওকে কথাটা বলব কি, না?' ঠিক করল, 'বলেই ফেলি!' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ে শিউরে উঠে এই ভয়ঙ্কর চিন্তাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। তার নারীত্বের সহজ সংস্কারবশেই সে উপলব্ধি করল, ওকথা বলার সময় এটা নয়। বুঝতে পারল, তাহলে গ্রিগরকে হয়ত চিরদিনের মতই হারাবে। আর, সে এখনো জানে না যে-সন্তান তার হৃদপিণ্ডের নীচে ধুকপুক করছে, সেটা কার, স্তেপানের না গ্রিগরের। থমকে গেল সে, গ্রিগরকে কিছুই বলল না।

তাকে কোটের ভেতর জড়াতে জড়াতে গ্রিগর জিজ্ঞেস করল :

—'কাঁপছ কেন তুমি? শীত করছে?'

—'আমার একটু... এখন যাই, গ্রীস্‌কা। স্তেপান ফিরে আসবে, দেখবে আমি বাড়ি নেই।'

—'কোথায় গেছে সে?'

—'আনিখির বাড়িতে তাস খেলতে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি।'

ছাড়াছাড়ি হল দুজনের। আকসিনিয়ার ঠোঁটের মনমাতানো গন্ধ রইল গ্রিগরের ঠোঁটে। গন্ধটা হয়ত শীতের হাওয়ার, নয়ত সম্ভবত স্তেপের বৃষ্টি-ধোয়া ঘাসের গন্ধ—বা ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

একটা ছোট রাস্তায় মোড় নিল আকসিনিয়া, মাথা নীচু করে প্রায় দৌড়ুতে শুরু করল। এক কুয়োর পাশে গরুবাছুরে শরতের কাদা মাড়িয়ে রেখেছে, সেইখানে জমাট কাদার তালে পা হড়কে বিশ্রীভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। পেটের ভেতর একটা তীব্র যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠতেই সে বাগানের বেড়াটা চেপে ধরল। যন্ত্রণা কমল, কিন্তু তার পেটের একপাশে প্রাণবন্ত কি যেন একটা নড়ে উঠল, ওলটপালট খেয়ে, রাগতভাবে বারবার জোরালো আঘাত হানতে লাগল।

॥ আট ॥

পরদিন সকালে গ্রিগর গেল মোখোভের সঙ্গে দেখা করতে। সার্জি প্লাতোনাভিচ্‌ দোকান থেকে সবেমাত্র ফিরেছে. খাবার ঘরে বসে কড়া লালরঙের চায়ে চুমুক দিচ্ছে। বসবার ঘরে টুপিটা রেখে গ্রিগর ভেতরে ঢুকে পড়ল। বলল :

—'আপনার সঙ্গে গোটাকয়েক কথা বলতে চাই সার্জি প্লাতোনাভিচ্‌।'

'—তুমি মেলেখফদের বাড়ির ছেলে, তাই না? কি চাই?'

—'আমি জিজ্ঞেস করতে এলাম. কাজটাজের জন্যে আমাকে নিতে পারেন কি না।'

গ্রিগর কথা বলতেই দরজাটা ক্যাঁচ করে উঠল, এক তরুণ অফিসার ঘরে ঢুকল। গায়ে সবুজ উর্দি, ট্রুপ-কমান্ডারের তকমা আঁটা। গ্রিগর চিনল, সেই লিস্তনিৎস্কি, গত গ্রীষ্মে যাকে মিত্‌কা কোরশুনভ হারিয়ে দিয়েছিল। সার্জি প্লাতোনাভিচ্‌ অফিসারের দিকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিল, তারপর গ্রিগরের দিকে ঘুরে বসল। জিজ্ঞেস করল :

—'তোমার বাবার কি এতই অবস্থা খারাপ হয়েছে যে, ছেলেকে বাইরে কাজ করতে পাঠাল?'

—'আমি এখন বাবার সঙ্গে নেই।'

—'পৃথক হয়ে গেছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'সত্যি, তোমাকে খুশী হয়েই নিতে পারতাম, তোমাদের পরিবারকে খুবই পরিশ্রমী বলে জানি। কিন্তু আমার হাতে তোমাকে দেবার মত কোন কাজই নেই।'

—'ব্যাপার কি?' টেবিলের কাছে চেয়ারটা টেনে আনতে আনতে লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

—'ছোকরা একটা কাজ খুঁজছে।'

—'ঘোড়ার তদারক করতে পার? গাড়ি চালাতে পার?' চা নাড়তে নাড়তে অফিসারটি প্রশ্ন করল।

—'পারি। আমাদের ছ'ছটা ঘোড়ার তদারক আমাকেই করতে হত।'

—'আমার একজন কোচোয়ানের দরকার। কত মাইনে চাও?'

—'বেশি আমি চাইনে।'

—'তাহলে, কালই তুমি আমাদের জমিদারিতে বাবার কাছে চলে যাও। আমাদের বাড়ি চেনো তো? ইয়েগোদ্‌নোয়ে, মাইল আন্টেক হবে এখান থেকে।'

—'হ্যাঁ, জানি।'

গ্রিগর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। দরজার হাতলটা ঘোরাতে ঘোরাতে একটু ইতস্তত করল, তারপর বলে ফেলল :

—'আপনাকে একটা কথা গোপনে বলতে চাই, হুজুর।'

গ্রিগরের পেছন পেছন লিস্তনিৎস্কি এল আলো-আঁধারি বারান্দায়। বারান্দার দিকে দরজার ঘসা কাঁচের ভেতর দিয়ে গোলাপী আলোর ম্লান-আভা ফুটে বেরুচ্ছে। অফিসার জিজ্ঞেস করল :

—'বলো, কথাটা কি?'

—'আমি একলা নই, হুজুর...' লজ্জায় লাল হয়ে উঠল গ্রিগর। 'আমার সঙ্গে একজন মেয়েছেলে আছে...ওকেও কোন কাজটাজ দিতে পারবেন?'

—'তোমার বৌ?' একটু হেসে, ভুরু টান করে লিস্তনিৎস্কি প্রশ্ন করল।

—'আর একজনের বৌ।'

—'ও, তাহলে এই ব্যাপার? আচ্ছা বেশ, ওকে চাকরবাকরদের রান্নার কাজে লাগিয়ে দেব। কিন্তু ওর স্বামী কোথায় থাকে?'

—'এই গ্রামেই।'

—'তাহলে আরেকজনের বৌ চুরি করেছ তুমি?'

—'সে নিজের ইচ্ছেয় এসেছে।'

—'এ যে নভেলের গল্প! বেশ, কাল কিন্তু আসতো ভুলো না। এখন যাও।'

॥ নয় ॥

পরদিন সকালে আটটার কাছাকাছি গ্রিগর ইয়েগোদ্‌নোয়ে এসে পৌঁছুল। বিরাট বাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে প্রশস্ত উপত্যকায়, চারপাশ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। আঙিনার মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো বাইরের মহল : টালির ছাদ দেওয়া একটা দিক, রঙ-বেরঙের টালি দিয়ে হরফ করা ১৯১০ সাল লেখা; চাকরবাকরদের মহল, গোসলখানা, আস্তাবল, হাঁসমুরগীর আস্তানা, গোয়াল, লম্বা একটা গোলা, গাড়ির খাটাল। আমি বাড়িটা পুরনো, লতাপাতায় ঢাকা। বাড়ির পেছন দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নিষ্পত্র পপলার গাছ, আর মাঠের মধ্যে উইলোর সার; বাদামী রঙের মগডাল থেকে কাকের খালিবাসা ঝুলছে।

উঠোনে ঢুকতেই গ্রিগরকে স্বাগত জানাল একদল ক্রিমিয়া-দেশীয় বোরঝোই কুকুর।

সবপ্রথম এগিয়ে এল একটা খোঁড়া কুত্তী, নাকে শংকে মাথা নীচু করে পেছন পেছন চলল। চাকরবাকরদের মহলে মুখে দাগ এক যুবতী ঝির সঙ্গে রাঁধুনি ঝগড়া করছে। দরজার চৌ-কাঠের কাছে তামাকের ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে এক কুঁনো বুড়ো বসে আছে। ঝিটি গ্রিগরকে কর্তার মহলে নিয়ে এল। বসবার ঘরে কুকুর আর কাঁচা-চামড়ার গন্ধ। টেবিলের ওপর পড়ে আছে একটা দোনলা বন্দুকের বাক্স আর ঝালর দেওয়া শিকারের থলে।

—'ছোটকর্তা ডাকছেন তোমাকে।' পাশের একটা দরজা দিয়ে ঝি গ্রিগরকে ডাকল।

উৎকণ্ঠিতভাবে একবার কাদামাখা বুটের দিকে তাকিয়ে গ্রিগর ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল। জানলার পাশে বিছানায় শুয়ে আছে লিস্তনিৎস্কি। একটা সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে সাদা সার্টের বোতামগুলো লাগিয়ে বলল:

—'ঠিক সময়েই এসেছ তুমি। একটু দাঁড়াও, বাবা এক্ষুনি এসে পড়বেন।'

গ্রিগর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। মিনিট দুয়েক পরেই বাইরের ঘরে পায়ের শব্দ শোনা গেল, দরজার ওপাশ থেকেই এক বাজখাঁই গলা প্রশ্ন করল:

—'এখনো ঘুমুচ্ছ নাকি, ইউজেনে?'

—'ভেতরে আসুন।' লিস্তনিৎস্কি উত্তর দিল।

কালো ককেশীয় কোর্তা পরে এক বৃদ্ধ ঘরে ঢুকল। আড়-চোখে গ্রিগর তাকে দেখে নিল। সুন্দর বাঁকা নাক, আর তামাকের ধোঁয়ায় মলিন সাদা গালপাট্টার বাঁকা রেখা দেখে সে সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে গেল। বুড়ো লিস্তনিৎস্কি মাথায় লম্বা, চওড়া কাঁধ, কিন্তু খুব রোগা। কোর্তার নীচে উটের লোমের লংকোট ঝুলছে গায়ে। চোখ-দুটো নাকের কাছাকাছি বসানো। ইউজেনে বলে উঠল:

—'বাবা, যে কোচোয়ানের কথা বলেছিলাম, এই সেই।'

—'কার ছেলে?'

—'পান্তালিমন মেলেখফের।'

—'প্রোকোফেকে চিনতাম আমি, আমার সঙ্গেই পল্টনে ছিল। পান্তালিমনকেও মনে আছে। একটু খোঁড়া, না?'

—'হ্যাঁ, হুজুর।' গ্রিগর উত্তর দিল। মনে পড়তে লাগল, বাপের মুখে শোনা রুশ-তুর্কী লড়াইএর নায়ক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল লিস্তনিৎস্কির কাহিনী। বুড়ো জিজ্ঞেস করল:

—'তুমি কাজ খুঁজছ কেন?'

—'আমি আর বাবার সঙ্গে থাকি না, হুজুর।'

—'বেগার খাটলে তুমি আর কসাক কি হে? বাড়ি ছাড়ার সময় সম্পত্তির কিছু অংশ দেয়নি বাবা?'

—'না, হুজুর।'

—'হুঁম্, সে সব অন্য ব্যাপার! তোমার বৌএর জন্যেও ত কাজ চাও?'

ছোট লিস্তনিৎস্কির বিছানাটা ভীষণভাবে ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। গ্রিগর সেদিকে চোখ ফেরাতেই দেখল, সে চোখ টিপছে। উত্তর দিল:

—'হ্যাঁ, হুজুর।'

'হুজুর', 'হুজুর' বাদ দাও। ওসব আমি পছন্দ করি না। তোমার মাইনে মাসে আট রুবল। দুজনের জন্যেই। তোমার বৌ চাকরবাকর আর ঠিকে মুনিষজনের জন্যে রান্না করবে। কেমন, হবে তো?'

—'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

—'কাল সকালে চলে এস। আগের কোচোয়ানের ঘরটায় থাকবে তুমি। এখন সটান চলে যাও। কাল আটটায় এখানে হাজির হওয়া চাই।'

বাইরে চলে এল গ্রিগর। গোলাঘরের ওদিকটায় বরফ-ঢাকা একটুকরো জমিতে বোরখোইগুলো রোদ পোয়াচ্ছে। সেই বুড়ী কুত্তী তেমনি শোকাচ্ছন্নের মত মাথা নিচু করে কিছুদূর পেছন পেছন গিয়ে ফিরে গেল আবার।

॥ দশ ॥

সেইদিনই সকালে আর্কাসিনিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না সারল। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আঁচ নামাল। বাসনপত্র মাজল। তারপর জানলা দিয়ে উঠোনের দিকে তাকাল। মেলেখফদের উঠোনের সীমানার দিকে, বেড়ার কাছাকাছি একগাদা কাঠের পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্তেপান। চালার বাঁ-দিকটা ভেঙে পড়ছে, সারাবার জন্যে খুঁটি বাছছে সে।

দুই গালে লালচে ছোপ, আর দুই চোখে যৌবনের দীপ্তি নিয়ে ঘুম ভেঙেছে আর্কাসিনিয়ার। স্তেপানের চোখে পড়েছে এ পরিবর্তন। তাই সকালের জলপানের সময় সে জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না :

—'বলি, ব্যাপারটা কি?'

—'কি ব্যাপার?' তার কথারই প্রতিধ্বনি তুলল আর্কাসিনিয়া।

—'গাল যে টুকটুক করছে, মাখন মাখিয়েছ নাকি গালে?'

—'উনুনের আঁচ লেগেছে।' তারপর ঘুরে চুপিচুপি জানলা দিয়ে তাকাল, মিশা কশেভয়ের বোন আসছে কিনা।

কিন্তু একেবারে বেলা শেষ না করে মেয়েটি এল না। প্রতীক্ষায় পীড়িত আর্কাসিনিয়া দৌড়ে এল, জিজ্ঞেস করল :

—'আমাকে ডাকছ, মাশুত্‌কা?'

—'একটু বাইরে এসো।' মেয়েটি উত্তর দিল।

উনুনের ওপরে বসান একটা আয়নার টুকরোর সামনে দাঁড়িয়ে স্তেপান চুল আঁচড়াচ্ছিল। বিচলিতভাবে আর্কাসিনিয়া তার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল :

—'তুমি বেরুচ্ছ নাকি?'

স্তেপান তখন তখনই উত্তর দিল না। চিরুনিটা পা-জামার পকেটে রাখল, এক-তাড়া তাস তুলে নিল, উনুনের ধারে পাইপটা পড়ে ছিল, সেটা উঠিয়ে নিয়ে তারপর বলল :

—'কিছুক্ষণের জন্যে আনিকুস্‌কার বাড়ি চললাম।'

—'কখনই বা তুমি বাড়িতে থাক? তাস খেলেই রাত কাটাও। বাজি রেখে তাস খেলবে না ত?'

—'থাক, থাক, ঢের হয়েছে আর্কাসিনিয়া। বাইরে তোমার অপেক্ষায় লোক দাঁড়িয়ে আছে।'

আর্কাসিনিয়া বাইরে এল। একটু হেসে, মাশুত্‌কা চোখ টিপে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। বলল :

—'গ্রীস্কা ফিরে এসেছে।'

—'তাই নাকি?'

—'তোমাকে বলতে বলেছে, সন্ধে হলেই আমাদের বাড়ি চলে এসো।'

মেয়েটার হাত চেপে ধরে আকসিনিয়া বাইরের দরজার দিকে টেনে নিয়ে এল।

—'আস্তে, আস্তে, ভাই! আর কিছু বলতে বলেছে?'

—'বলেছে, জিনিসপত্তর বেঁধেছেঁদে সঙ্গে নিয়ে আসতে।'

আকসিনিয়ার দেহে আগুন জ্বলে উঠল, থরথর করে কাঁপতে লাগল, টগবগে ঘোড়ার মত একবার এ পায়ে, পর মুহূর্তে অন্য পায়ে ভর রেখে, রান্নাঘরের দরজার দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাতে লাগল।

—'হায় ভগবান! আমি কি করে... এত তাড়াতাড়ি? আচ্ছা, আচ্ছা... দাঁড়াও। যত তাড়াতাড়ি পারি যাব... কিন্তু দেখা করবে কোথায়?'

—'তুমি আমাদের বাড়িতে আসবে।'

—'না, না।'

—'বেশ, ওকে বলবো, বাইরে যেন তোমার জন্যে অপেক্ষা করে।'

আকসিনিয়া যখন ঘরে ঢুকল, স্তেপান গায়ে কোট চাপাচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে ফাঁকে সে জিজ্ঞেস করল :

—'কি জন্যে এসেছিল ও?'

—'ও, হ্যাঁ, এসেছিল জিজ্ঞেস করতে .. ওর জন্যে একটা ঘাঘরা কাটিয়ে নিতে।'

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে স্তেপান দরজার দিকে এগুলো; চলতে চলতেই বলে উঠল :

—'আমার জন্যে বসে থেকো না।'

আকসিনিয়া বরফাচ্ছন্ন জানলার কাছে ছুটে গেল, হাঁটু গেড়ে বেঞ্চের সামনে বসে পড়ল। গেট অবধি রাস্তায় বরফের ওপর স্তেপানের পা ফেলার আওয়াজ কানে ভেসে আসতে লাগল। বাতাসের ঝাপটায় সিগারেটের আগুনের একটা ফুলকি জানলার দিকে উড়ে এল। জানলার কাঁচে গলা-বরফের একটা চক্রের ভেতর দিয়ে আকসিনিয়া স্তেপানের পশমের টুপি আর মুখের পাশটা এক ঝলক দেখতে পেল।

আকসিনিয়া পাগলের মত বিরাট সিন্দুকের ভেতর থেকে টেনে টেনে বার করতে লাগল তার জ্যাকেট, ঘাঘরা, রুমালগুলো—তার বিয়ের যৌতুক, বড় একখানা শালের ওপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। শেষবারের মত রান্নাঘর থেকে ঘুরে এল। তারপর আলো নিভিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটল। রান্নাঘরের শেকল তুলে দিল। মেলেখফদের বাড়ি থেকে কে যেন বেরিয়ে এল গরু-বাছুর দেখতে। যতক্ষণ না তার পায়ের শব্দ মিলিয়ে এল, আকসিনিয়া দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ছুটল ডনের দিকে। রুমাল থেকে চুলের গোছা খসে গিয়ে গালের ওপর নাচতে লাগল। হাতের মধ্যে পুঁটুলিটা চেপে ধরে পাশের গলি ধরে চলতে লাগল কশেভয়েদের বাড়ির দিকে। তার শক্তিতে যেন ভাটা পড়ল, মনে হল, পা দুটো যেন ঢালাই-লোহা। গ্রিগর তার অপেক্ষায় গেটের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তার হাত থেকে পুঁটুলিটা নিয়ে স্তেপের মধ্যে দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

বাড়ির পেছনে এসেই আকসিনিয়া গতি কমিয়ে দিল। গ্রিগরের জামার হাতা চেপে ধরে বলে উঠল, 'একটু থাম।'

—'থামব কেন? আজ চাঁদ উঠতে দেরী আছে, তাই আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

—'দাঁড়াও, গ্রীস্‌কা।' ব্যথায় নুয়ে থমকে দাঁড়াল আকসিনিয়া।

—'হল কি তোমার?' গ্রিগর পেছন দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

—'কি যেন...পেটের ভেতরে। খুব ভারী বোঝাটা টেনে আনতে হয়েছে।' শুকনো ঠোঁটদুটো চেটে নিয়ে আকসিনিয়া পেট চেপে ধরল। মাথা নীচু করে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল একটু। তারপর, রুমালের ভেতরে চুলগুলো গুঁজে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

—'তুমি ত জিজ্ঞেস করলে না, কোথায় নিয়ে যাচ্ছি। ওই পাহাড়ের চুড়োয় নিয়ে গিয়ে ঠেলে ফেলেও ত দিতে পারি।' অন্ধকারে হাসল গ্রিগর।

—'এখন আমার কাছে সবই সমান। ফিরবার আর পথ নেই।' নিরানন্দ হাসিতে আকসিনিয়ার গলার স্বর কেঁপে উঠল।

॥ এগারো ॥

চিরাচরিত নিয়মে স্তেপান সেদিনও ফিরল মাঝরাতে। প্রথমেই ঢুকল আস্তাবলে, কিছু ছড়ানো খড় ছুঁড়ে দিল চাড়িতে, ঘোড়ার দড়িটা খুলে দিল, তারপর ঘরের ভেতরে ঢুকল। শেকলটা খুলতে খুলতে স্তেপান মনে মনে ভাবল, 'আকসিনিয়া বোধহয় সন্ধ্যের সময় বাইরে বেরিয়েছে।' রান্নাঘরে ঢুকেই ভাল করে দরজাটা বন্ধ করে দিল, তারপর দেশলাইএর কাঠি জ্বালল। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় তার জেতার পালা গিয়েছে, তাই সে অত শান্ত, অমন তন্দ্রাচ্ছন্ন। আলো জ্বালল স্তেপান। রান্নাঘরের এলোমেলো অবস্থা দেখে কারণ না বুঝতে পেরে, হাঁ হয়ে গেল। একটু অবাক হয়ে শোবার ঘরে এসে ঢুকল। সিন্দুকটার কালো গহ্বর হাঁ করে আছে। মেঝের ওপর পড়ে আছে একটা পুরনো জ্যাকেট, তাড়াতাড়িতে আকসিনিয়া সেটা নিতে ভুলেছে। ভেড়ার চামড়ার জামাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্তেপান আলো আনতে রান্নাঘরে ছুটল। শোবার ঘরের চারধারে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, অবশেষে ব্যাপারটা বুঝতে পারল। আলো ফেলে দিয়ে দেয়াল থেকে ছিনিয়ে নিল তলোয়ারখানা। এমন করে মুঠোটা চেপে ধরল যে, তার আঙুলের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠল। আকসিনিয়ার নীল-হলদে জ্যাকেটটা তলোয়ারের ডগায় তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল, তারপর জ্যাকেটটা মাটিতে পড়তে না পড়তেই আলতো ছোঁয়ায় দু টুকরো করে কেটে ফেলল।

নেকড়ের মত উন্মাদনায়, ক্রোধে ফ্যাকাসে হয়ে, ভয়ঙ্কর মূর্তিতে সে বারংবার পুরনো জ্যাকেটের টুকরোগুলো কড়িকাঠের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল। উড়ন্ত টুকরোগুলো কাটবার সময় ধারাল ইস্পাত শিষ্‌ দিয়ে উঠতে লাগল।

তারপর, মুঠোর বাঁধনটা ছিঁড়ে তলোয়ারখানা ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্তেপান রান্নাঘরে চলে এল। অবশেষে টেবিলের পাশে বসে পড়ল। মাথা নীচু করে, কম্পিত আঙুলে আ-ধোয়া টেবিলের ওপরটায় কেবলি ঘা মারতে লাগল।

॥ বারো ॥

ফ্যাসাদ যখন আসে, একা আসে না কখনো।

গ্রিগর যেদিন বাড়ি ছাড়ল, সেদিন সকালেই গেত্‌কার অসাবধানতায় মিরন কোরশ্‌নভের পাল-দেবার ষাঁড়টা সবচেয়ে সেরা মাদীঘোড়ার গলাটা গ্‌তিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে, কাঁপতে কাঁপতে, গেত্‌কা পাগলের মত ছ্‌টে এসে রান্নাঘরে ঢুকল :

—'সব্বোনাশ হয়েছে, কত্তা। ষাঁড়টা... শালা ষাঁড়টা!'

—'কি রে, হয়েছে কি ষাঁড়টার?' মিরন ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল।

—'খতম করে দিয়েছে ঘোড়াটাকে। ফুঁড়ে ফেলেছে।'

অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থাতেই মিরন উঠোনে ছ্‌টে এল। কুয়োর পাশে মিত্‌কা পাঁচ বছরের লাল ষাঁড়টাকে একটা ডাণ্ডা দিয়ে পিটছে। ষাঁড়টা মাথা নীচু করে, গলকম্বল বরফের ওপর দিয়ে ঘসড়ে বেড়াচ্ছে, খ্‌র দিয়ে বরফ তোলপাড় করে তুলছে, র্‌পোর মত বরফের গ্‌ড়ো লেজের চারপাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। ডাণ্ডার ঘায়ে সে কাব্‌ হবে না। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে লাফালাফি করছে যেন আক্রমণ করতে চায়। মিত্‌কা মারছে তার নাকে, পাঁজরের পাশে, আর খিস্তি করছে। একটা ম্‌নিষ যে তার বেল্ট ধরে পেছনে টানছে সে খেয়ালও নেই তার।

মিরন কুয়োর কাছে দৌড়ে গেল। ঘোড়াটা বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, মাথা ঝ্‌ঁকে পড়েছে নীচের দিকে। সারা দেহে দ্রুতকম্পন বয়ে যাচ্ছে। তার চওড়া পাশটা ঘামে ভিজে উঠেছে, ব্‌ক থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। গোলাপীরঙের ক্ষতস্থানটি একটা হাতের ম্‌ঠোর মত গভীর হয়েছে, গলার নলিটা বেরিয়ে পড়েছে। মিরন সামনের চুল ধরে ঘোড়ার মাথাটা উঁচু করল। প্রভুর ম্‌খের ওপর সে চকচকে চোখের স্থিরদৃষ্টি মেলে ধরল, যেন নিঃশব্দে প্রশ্ন করল, 'এরপর কি?' আর তার উত্তরেই যেন মিরন চিৎকার করে উঠল :

—'ওরে ছোট, কাউকে বল 'ওকে'র ছাল তুলে আনতে। শিগ্‌গীর!'

গেত্‌কা ছ্‌টল ওকের ছাল তুলে আনতে। মিত্‌কা এল বাপের কাছে। তার একচোখ তখনো ষাঁড়টার দিকে। ষাঁড়টা উঠোনের ওপর ঘ্‌রপাক খাচ্ছে হ্‌ঙ্কার ছাড়ছে।

—'চুল ধরে থাক।' বাপ ছেলেকে বলল। 'কেউ ছ্‌টে গিয়ে স্‌তো নিয়ে আয়। শিগ্‌গীর।'

যাতে ব্যথা না লাগে সেইজন্যে ঘোড়ার ওপরের কসটা দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। তারপর ক্ষতস্থানটা ধ্‌য়ে দেওয়া হল। আড়ষ্ট আঙ্‌লে মিরন স্‌চে কাঁচাচামড়ার স্‌তো পরিয়ে নিল, ধারগ্‌লো ম্‌ড়ে দিয়ে চমৎকার সেলাই করে গেল। ঘরে ফিরবার জন্যে পা বাড়াতেই রান্নাঘর থেকে ছ্‌টে এল তার বৌ, ম্‌খে ভয়ের চিহ্ন আঁকা। স্বামীকে ডেকে নিল একপাশে।

—'নাতালিয়া চলে এসেছে গো! হায়রে, আমার কপাল!'

—'কি ব্যাপার বলত?' ফ্যাকাসে হয়ে মিরন জিজ্ঞেস করল।

—'ব্যাপার গ্রিগরকে নিয়ে। গ্রিগর বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।' উড়বার আগে দাঁড়কাকের মত লুকিনিচ্না হাতদুখানা শূন্যে তুলল, ঘাঘরার হাতের চাপড় মারল, তারপর ফোঁপাতে শুরু করল :

–'গ্রামের সবার সামনে কালি মাখিয়ে গেল। এমন আঘাত দিলে, ভগবান! ও, হো...'

মিরন দেখতে পেল, রান্নাঘরের মাঝখানে নাতালিয়া দাঁড়িয়ে আছে; চোখে জল টলমল করছে, গালদুটো লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছে।

–'এখানে কি করছিস?' ঘরে ঢুকেই বাপ তর্জন করে উঠল। 'মেরেছে নাকি তোকে? মানিয়ে চলতে পারিস নে?'

'ও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।' নাতালিয়া আর্তনাদ করে উঠল। টলতে টলতে বাপের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। 'বাবা, বাবা, আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছে... আমাকে থাকতে দাও, বাবা... সেই মেয়েলোকটার সঙ্গে চলে গেছে গ্রিগর... আমাকে ছেড়ে গেছে। আমাকে ধুলোয় গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে।' বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুনয়বিনয় করতে করতে নাতালিয়া ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

—'অপেক্ষা কর, অপেক্ষা করে দেখ...'

—'ওখানে আর থাকতে পারছিনে আমি। আমাকে ফিরিয়ে নাও।' হাঁটুতে ভর দিয়ে সিন্দুক অবধি সে এগিয়ে গেল, তারপর মাথা গুঁজল তার হাতের মধ্যে। এ সময় চোখের জল ত কালবোশেখীর ধারার মত। নাতালিয়ার মাথাটা ঘাঘরার সঙ্গে চেপে ধরে মা ফিসফিস করে কত কথা বলে সান্ত্বনা দিতে লাগল। মিরন কিন্তু ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে এসে সিঁড়ির ওপর দাঁড়াল। চিৎকার করে উঠল :

—'শ্লেজে ডবল-ঘোড়া জোড়।'

মুরগীর পেছনে পেছনে একটা মোরগ ডাঁটের মাথায় সিঁড়ির ওপর ঘুরঘুর করছিল। চিৎকার শুনে ভয় পেয়ে লাফিয়ে নামল, তারপর উত্তেজিত হয়ে চটেমটে ক'কক'ক করতে করতে ডানা ঝাপটে গোলা-ঘরের দিকে ছুটল।

সিঁড়ির নক্সাকাটা রেলিংটা একেবারে ভেঙে না পড়া পর্যন্ত মিরন লাথি ছুঁড়তে লাগল। একজোড়া ঘোড়া যুততে যুততে গেত্কা তাড়াতাড়ি যখন আস্তাবল থেকে বেরিয়ে এল, তখন মিরন রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে ঢুকল।

গেত্কাকে নিয়ে নাতালিয়ার জিনিষপত্তর আনতে মেলেখফদের বাড়ির দিকে গাড়ি হাঁকাল মিত্কা। গেত্কার অন্যমনস্কতায় একটা শুয়োরের বাচ্চা রাস্তায় চাপা পড়তে পড়তে ছিটকে বেরিয়ে গেল। 'এবার কত্তা নিশ্চয়ই ঘোড়ার কথা ভুলে যাবেন।' লাগামে ঢিল দিয়ে মনে মনে ভাবতে ভাবতে গেত্কা উল্লসিত হয়ে উঠল। 'কিন্তু বুড়ো যা ত্যাঁদোড়, কিছুতেই ভুলবে না।' গেত্কা তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার পিঠে চাবুকের একটা ঘা কসিয়ে দিল।

দশম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

ইউজেনে লিস্তনিৎস্কি আতামানের দেহরক্ষীবাহিনীর ট্রুপ-কমান্ডারের কমিশন পেয়েছিল। অফিসারদের এক হার্ডল্‌-রেসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে বাঁ-হাতটা ভেঙ্গে ফেলেছিল। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সে ছুটি নিল। বাপের কাছে এল ছ সপ্তাহের জন্যে।

বুড়ো জেনারেল ইয়াগোদ্‌নয়ে একাই থাকে। উনিশ শতকের অষ্টম দশকে ওয়ারশ'র শহরতলিতে গাড়ি চালিয়ে যাবার সময় সে তার স্ত্রীকে হারিয়েছিল। কসাক জেনারেলকে খতম করার জন্যে তাক করেছিল বিপ্লবীরা, কিন্তু গুলিটা ফসকে গেল, শেষ করল তার স্ত্রী আর কোচোয়ানকে। লিস্তনিৎস্কি আর তার দু বছরের শিশু ইউজেনে বেঁচে গেল। এই ঘটনার কিছু পরেই জেনারেল অবসর নিয়েছিল, চলে এসেছিল ইয়াগোদনয়ে। সেখানে তার নিঃসঙ্গ, রুক্ষ জীবন কাটতে লাগল।

বয়স হওয়া মাত্রই ছেলে ইউজেনেকে ক্যাডেট্‌-কোরে পাঠাল, নিজে চাষবাসে মন দিল। রাজকীয় আস্তাবল থেকে ঘোড়া কিনে ইংলন্ড আর বিখ্যাত প্রোভাল্‌স্কির আস্তাবলের সেরা সেরা মাদীঘোড়ার সঙ্গে মিশিয়ে নতুন জাতের ঘোড়া তৈরি করতে লাগল। খাস আর পত্তনি নেওয়া জমিতে গরু ভেড়া পুষল। ফসল ফলিয়ে (মুনিষ দিয়ে), শরত আর শীতে বোরঝোই কুকুর নিয়ে শিকার করে, আর মাঝে মাঝে ঘরে খিল দিয়ে পুরো সপ্তাহ ধরে মদ গিলে দিন কাটাতে লাগল। তার পেটের গোলমাল আছে, সেজন্যে ডাক্তার তাকে কোন কিছু গিলে খেতে একদম বারণ করে দিয়েছিল। সমস্ত খাবারই চিবিয়ে শুধু সারাংশটুকু গিলতে হয়। খাস চাকর বেনিয়ামিন একটা রুপোর রেকাব ধরে রাখে, আর সে আধ-চিবানো খাবারগুলো তাতে থু থু করে ফেলে।

মাথা-মোটা, তাগড়াই-চেহারা, কমবয়সী এক চাষীর ছেলে বেনিয়ামিন। ঘন কালো চুলের গোছা মাথায়। ছ বছর ধরে লিস্তনিৎস্কির কাছে কাজ করছে। প্রথম প্রথম যখন জেনারেলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, বুড়ো মুখ থেকে চিবানো খাবার উগরে দিত, তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা অসহ্য মনে হত তার। কিন্তু কিছুদিন পরে ব্যাপারটা ধাতস্থ হয়ে গেল। কয়েকমাস পরে কর্তাকে টার্কির মাংস চিবোতে দেখে একদিন মনে মনে ভাবল, 'বাব্বাঃ, খাবারদাবার কি নষ্টই না করেন! উনি নিজে ত কিছুই খান না, আর এদিকে খিদেয় আমার পেটের নাড়িভুঁড়ি তালগোল পাকায়। ওঁর শেষ হলে আমি নিজেই খেয়ে নেব।' তারপর থেকে, কর্তার খাওয়া শেষ হলেই, সে রুপোর রেকাবটা পাশের ঘরে নিয়ে যেতে শুরু করল, বাদবাকি যা থাকত গিলে নিত। হয়ত এইজন্যেই সে মুটিয়ে যেতে লাগল, গালের নীচে থাক পড়ল।

বাড়ির আর সব লোকজন হচ্ছে ঝি, মুখে বসন্তের দাগওয়ালা রাঁধুনী লুকেরিয়া, বুড়ো সহিস সাশ্‌কা আর রাখাল তিখোন। প্রথমদিন থেকেই লুকেরিয়া আকসিনিয়াকে

কর্তার রান্নায় হাত দিতে দিল না। আকসিনিয়া সপ্তাহে তিনবার করে তাদের ঘরদোর পরিষ্কার করতে লাগল। গ্রিগর সাশ্‌কার সঙ্গে বিরাট আস্তাবলের মধ্যে বেশির ভাগ সময় কাটাতে লাগল। বুড়োর মাথাভর্তি পাকাচুল, কিন্তু তবু সবাই তাকে সাশ্‌কা বলেই ডাকে। যে বুড়ো লিস্তনিৎস্কির কাছে সে কুড়ি বছরেরও বেশি কাজ করছে, সম্ভবত সেও তার পদবিটা ভুলে গিয়েছে। বয়সকালে সাশ্‌কা ছিল কোচোয়ান; বুড়ো হয়ে, জোর কমে দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে গেলে, তাকে সহিস করা হয়েছে। বোকা-সোকা, সারা গায়ে সবুজাভ-ধূসর লোম, বয়সকালে লাঠির ঘায়ে নাকটা থ্যাবড়া হয়ে গিয়েছিল; মুখে সব সময়েই লেগে আছে শিশুসুলভ হাসি, তাকিয়ে থাকে মিটমিটে সরল চোখে। ভাঙা নাক আর ঝুলে পড়া নীচের কাটা ঠোঁটটা মুখের সাধু-সাধু-গোছের সৌম্য-শ্রীটুকু নষ্ট করে দিয়েছে। নেশা চড়লেই সে উঠোনে পায়চারি করে বেড়ায়, যেন সে-ই বাড়ির কর্তা। মাটিতে পা ঠুকে, লিস্তনিৎস্কির শোবার ঘরের নীচে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকে :

—'মিকোলেই লেক্সিয়েভিচ্‌! অ মিকোলেই লেক্সিয়েভিচ্‌!'

ঘরে থাকলে, লিস্তনিৎস্কি জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়, বাজখাঁই গলায় ধমক দেয় :

—'মাতাল হয়েছিস? ব্যাটা হারামজাদা!'

সাশ্‌কা পা-জামা টেনে তোলে, চোখটিপে হাসে; হাসিটা ঠিক মুখখানা জুড়ে নাচতে থাকে :

—'মিকোলেই লেক্সিয়েভিচ্‌, হুজুর, আমি ত চিনি আপনাকে!' তার শীর্ণ কুৎসিৎ আঙুলটা নাচিয়ে ভয় দেখায়।

—'যা ঘুমো গিয়ে!' মনিব হাসে শান্ত করার জন্যে।

—'সাশ্‌কাকে ঠকানো আপনার কম্মো নয়!' সাশ্‌কা হয়ত হাসে, বেড়া অবধি এগিয়ে যায়। 'মিকোলেই লেক্সিয়েভিচ্‌, আপনি ঠিক আমারই মত। আমি আর আপনি—যেন জলের মাছ। আপনি আর আমি—আমরা বিরাট বড়লোক, কি বলেন, এ্যাঁ!' এই বলে দুই হাত ছড়িয়ে দেখায় সে কত বড় বড়লোক। 'এই ডন-অঞ্চলের সবাই চেনে আমাদের। আমরা...' হঠাৎ সাশ্‌কার গলায় ব্যথার সুর ফুটে ওঠে, কেমন একটা গোপনতার আভাস। 'আপনি আর আমি—হুজুর, সবার কাছেই ভাল। কেবল দুজনের নাকদুটো থ্যাবড়া, এই যা।'

—'বলি, ব্যাপার কি?' হাসির দমকে রাঙা হয়ে মনিব জিজ্ঞেস করে।

—'ব্যাপার হচ্ছে, ভদ্‌কা!' পা ঠুকে, চোখ টিপে, ঠোঁটদুটো চেটে নিয়ে সাশ্‌কা উত্তর দেয়। 'খাবেন না, মিকোলেই লেক্সিয়েভিচ্‌—তাহলে সর্বনাশ হয় যাবে আপনার। সবকিছু উড়িয়ে দেব আমরা।'

—'যা, মদ গেল গে!' বুড়ো লিস্তনিৎস্কি একটা কুড়ি-কোপেক ছুঁড়ে দেয়। লুফে নেয় সাশ্‌কা। টুপির নীচে লুকিয়ে রেখে চেঁচিয়ে ওঠে :

—'আচ্ছা, আসি তাহলে, জেনারেল।'

—'ঘোড়াগুলোকে জল খাইয়েছিস ত?' একটু হেসে কর্তা জিজ্ঞেস করে।

—'হারামজাদা শয়তান, শুয়ারকা বাচ্চা!' সাশ্‌কা হয়ত আগুন হয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। রাগের চোটে কাঁপতে থাকে, যেন কম্প দিয়ে জ্বর উঠেছে। জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'সাশ্‌কা ভুলবে ঘোড়াকে জল খাওয়াতে? এ্যাঁ? মরতে মরতেও আমি হামাগুড়ি দিয়ে ঘোড়ার জলের বালতি খুঁজব। আর উনি ভাবেন...'

এই অনুচিত তিরস্কারে গালাগাল দিয়ে, হাতের মুঠো নাচিয়ে, রাগে গরগর

করতে করতে বুড়ো চলে যায়। তার কাছে সব কিছুই স্বাভাবিক ব্যাপার, এমন কি তার মদ খাওয়া আর কর্তার সঙ্গে এই মাখামাখিটাও। সহিস হিসাবে তার জায়গা নিতে পারে এমন কেউ নেই। আস্তাবলের খালি ঘরটায় সারা শীত আর গ্রীষ্ম ঘুমিয়ে কাটায়। সহিসের কাজ করে, নাল পরায়। বসন্তকালে ঘোড়ার জন্যে ঘাস কাটে। স্তেপেতে, উপত্যকায় গাছগাছড়ার শেকড় তোলে। শুকনো গাছগাছড়া আস্তাবলের দেয়ালে উঁচুতে টাঙিয়ে রাখে, ঘোড়ার নানারকম অসুখবিসুখে লাগে।

সাশ্‌কা যেখানটায় ঘুমোয়, শীত আর গ্রীষ্মে সেখানে গাছগাছড়ার একটা সুগন্ধ আমেজ মাকড়সার জালের মত ঝুলতে থাকে। ঠেসে ঠেসে কাঠের মত শক্ত করা খড়, তার ওপর ঘোড়ার বস্তা, আর ঘোড়ার ঘামের গন্ধমাখা কোটের ঢাকনা, তার কাঠের চৌকিতে এই হচ্ছে তোষক আর গদি। কোট আর ভেড়ার চামড়ার জামাটাই হচ্ছে বুড়োর একমাত্র সম্পত্তি।

মাথা-মোটা, জোয়ান কসাক তিখোন। থাকে লুকেরিয়াকে নিয়ে। অহেতুক ঈর্ষা করে সাশ্‌কাকে। বাঁধা নিয়মে মাসে একবার করে বুড়োর তেলচিটে সার্টের বোতাম ধরে একপাশে টেনে আনে। বলে :

—'দেখ, বুড়ো, আমার মেয়েছেলের পানে নজর দেবে না কিন্তু।'

—'সেটা নির্ভর করে অবশ্য...' সাশ্‌কা অর্থময়ভাবে চোখ মটকায়।

—'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত এই বয়সে.. আর তুমি নিজে একজন বদ্যি-মানুষ; ঘোড়ার তদারক করো... শাস্তরটাস্তর পড়েছ!'

—'বসন্তের দাগ বড্ড খাপসুরত লাগে আমার! লুকেরিয়ার আশা ছাড় হে, তোমার কাছ থেকে ওকে কেড়ে নিচ্ছি। মেয়েটা যেন কিসমিস দেওয়া পিঠে '

—'আমার চোখে যেন না পড়ে, খুন করে ফেলবো।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পকেট থেকে গোটাকত তামার পয়সা বার করে তিখোন বলে।

ইয়াগোদ্‌নয়ের জীবন এক ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসে। মানুষের চলাচলের সমস্ত পথ থেকে দূরে এক উপত্যকায় এই জমিদারি। শরতের পর থেকে পাশের গ্রামগুলোর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচে যায়। শীতের রাত্রে জঙ্গলের আস্তানা থেকে নেকড়ের পাল বেরিয়ে আসে; বিকট চিৎকারে ঘোড়াগুলোকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। কর্তার দো-নলা বন্দুকের আওয়াজ করে ভয় দেখানোর জন্যে মাঠের মধ্যে ছুটে যায় তিখোন। গুলির আওয়াজ শুনবার জন্যে লুকেরিয়া কান পেতে রুদ্ধশ্বাসে বসে থাকে। আর এই সময়, তার কল্পনায় টেকো তিখোন রূপান্তরিত হয়ে যায় এক সুশ্রী, দুর্দান্ত সাহসী তরুণে। তারপর যখন চাকরদের মহলের দরজা বন্ধ করার শব্দ ওঠে, তিখোন ফিরে আসে, তখন সে বুড়ো তিখোনের শীতে-জমা দেহকে তপ্ত আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে।

গ্রীষ্মকালে মুনিষজনের কোলাহলে সন্ধ্যেরাত পর্যন্ত ইয়াগোদ্‌নয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে। মনিব একশ একর জুড়ে নানারকম বীজ বোনে। মাঝে মাঝে বাড়ি আসে ইউজেনে। বাগানে বাগানে, মাঠে মাঠে ক্লান্ত মনে ঘুরে বেড়ায়। নয়ত, সারা সকাল বড়শি নিয়ে হ্রদের ধারে বসে থাকে। ইউজেনে মাথায় মাঝামাঝি, চওড়া বুক। ডান-দিকে পাট করে চুল আঁচড়ায় কসাক কায়দায়। তার অফিসারের ধড়াচুড়ো সব সময়েই ফিটফাট।

॥ দুই ॥

চাকরির প্রথম দশদিন গ্রিগর প্রায় সময়ই ছোট কর্তার সঙ্গে সঙ্গে রইল। একদিন বেনিয়ামিন চাকরদের ঘরে হাসতে হাসতে ঢুকে বলল :

—'গ্রিগর, তোমাকে ডাকছেন ছোটকর্তা।'

ইউজেনের ঘর অবধি গেল গ্রিগর। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। ছোটকর্তা একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। গ্রিগর চেয়ারের ধারিতে বসল। ইউজেনে জিজ্ঞেস করল :

—'আমাদের ঘোড়াগুলো কেমন মনে হয়?'

—'ঘোড়া তো ভাল জাতেরই। পাটকেল রঙেরটাই ভাল জাতের।'

—'খুব করে দৌড়-ঝাঁপ করিও, কিন্তু সাবধান, কদমে তুলো না।'

—'সে কথা, সাশ্‌কা ঠাকুর্দাই বলে দিয়েছে।'

চোখ কুচকে ছোটকর্তা বলল :

—'মে মাসে তোমাকে 'ক্যাম্পে' যেতে হবে তাই না?'

—'আজ্ঞে।'

—'আমি আতামানকে বলে দেব। তোমার যাবার দরকার হবে না।'

—'আপনার দয়া কর্তা।'

মুহূর্তের নিস্তব্ধতা। উর্দির কলারের বোতাম খুলে ইউজেনে তার নারী-জনোচিত বুকখানা চুলকাল। জিজ্ঞেস করল :

—'আকসিনিয়াকে তার স্বামী তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে, সে ভয় করো না?'

—'ওকে ত্যাগ করেছে। আর ফিরিয়ে নেবে না।'

—'কি করে জানলে?'

—'সেদিন গ্রাম থেকে একজন এসেছিল, সে বলল, স্তেপান তাকে বলেছে।'

—'খাসা দেখতে আকসিনিয়া।' গ্রিগরের মাথার ওপর দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে লিস্তনিৎস্কি হাসিমুখে মন্তব্য করল।

—'মন্দ নয়।' গ্রিগর সায় দিল। তার মুখে আষাঢ়ের মেঘ ঘনিয়ে উঠল।

॥ তিন ॥

ছুটির শেষের কটাদিন ইউজেনে গ্রিগরের ঘরেই কাটাতে লাগল। ছোট্ট ঘরখানাকে আকসিনিয়া তকতকে ঝকঝকে করে রাখে, মেয়েলি টুকিটাকি দিয়ে সাজায় গোছায়। গ্রিগর যখন বাইরে ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ইউজেনে সেই সময়টাই বেছে নেয়। সে প্রথমেই ঢোকে রান্নাঘরে, লুকেরিয়ার সঙ্গে দুএকমিনিট হাসি ঠাট্টা করে, তারপর কোণের দিকের ঘরটায় ঢুকে পড়ে। একদিন সে একটা টুল টেনে নিয়ে বসল, তারপর

হাসিহাসি মুখে আর্কাসিনিয়ার দিকে নির্লজ্জের মত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার উপস্থিতিতে আর্কাসিনিয়া বিব্রত বোধ করতে লাগল। বুনুনির কাঁটাগুলো আঙুলের ফাঁকে কাঁপাতে লাগল। ইউজেনে জিজ্ঞেস করল :

—'তারপর, কেমন চলছে, আর্কাসিনিয়া?' মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অবশেষে ঘরটাই নীল-ধোঁয়ায় ভরে উঠল।

—'আজ্ঞে, ভালই আছি।' আর্কাসিনিয়া চোখ তুলে তাকাল। ইউজেনের স্বচ্ছ দৃষ্টি নিঃশব্দে তার কামনা জানাচ্ছে—চোখে চোখ পড়তেই সে রাঙা হয়ে উঠল। আর চোখে চোখে না তাকিয়ে আর্কাসিনিয়া ঘরের বাইরে যাবার ছুতো খুঁজতে লাগল, ইউজেনের প্রশ্নের এলোমেলো উত্তর দিতে লাগল। অবশেষে বলল :

—'আমি এখন যাই, হাঁসগুলোকে খাওয়াতে হবে।'

—'আর একটু বসো। হাঁসকে পরে খাওয়ালেও চলবে।' ইউজেনে হাসল। তার অতীত জীবন সম্পর্কে সমানে জিজ্ঞাসাবাদ করে চলল। আর তার স্ফটিকের মত স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি অশ্লীলভাবে নিবেদন জানাতে লাগল।

গ্রিগর ঘরে ঢুকতেই ইউজেনে তাকে একটা সিগারেট দিল, তারপর একটু পরেই বাইরে চলে গেল। গ্রিগর আর্কাসিনিয়ার দিকে ফিরে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল :

—'ও কেন এসেছিল?'

—'আমি তা কি করে জানব।' ইউজেনের দৃষ্টি মনে পড়তেই আর্কাসিনিয়া জোর করে একটু হাসল। 'ও ঢুকেই বসল এখানে, দেখ, গ্রীস্কা ঠিক এইরকম করে' (ইউজেনে কেমন করে বসেছিল, তা দেখিয়ে দিল), 'বসল তো বসেই রইল, আর ওঠার নাম নেই, আমার জান যায় আর কি।'

—'তুমিও নিশ্চয়ই ওকে বেশ রসের যোগান দিলে?' গ্রিগর রাগে চোখ কোঁচকাল। 'সাবধান, নইলে ওকে একদিন লাথি খেয়ে সিঁড়ির ওপর থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হবে।'

ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে গ্রিগরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আর্কাসিনিয়া। এটা ঠাট্টা, না তার মনের কথা, তা ঠিক ঠিক ধরে উঠতে পারল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

'লেন্ট'-পরবের চতুর্থ সপ্তাহেই শীত কমতে শুরু করল। ডনের ধার বরাবর গলা-জলের ঝালর নামল। ওপর থেকে গলা-বরফে ধূসর রঙ ধরল, স্পঞ্জের মত ভেসে উঠতে লাগল। সন্ধ্যেবেলায় একদিন পাহাড়ের দিক থেকে গর্জনের শব্দ ভেসে এল। আদিকালের প্রবাদ অনুসারে তুষার-ঝড়ের ইঙ্গিত এটা, কিন্তু আসলে এটা বরফ-গলারই পূর্বাভাস। সকালের বাতাসে চূর্ণতুষার মেশানো, কিন্তু দুপুরের মধ্যেই জায়গায় জায়গায় মাটি একেবারে বরফমুক্ত; আর নাকে আসে বসন্তের আঘ্রাণ, চেরি-গাছের বরফ-গলা বাকল আর পচা খড়ের গন্ধ।

ক্ষেতে লাঙল দেবার জন্যে ধীরে সুস্থে তৈরি হতে লাগল মিরন গ্রিগরিয়েভিচ্। ঘরে বসে বসে লাঙলের ফলা শানিয়ে বরফগলার প্রতীক্ষায় রইল। 'লেন্টের' চতুর্থ সপ্তাহে বুড়ো গ্রীসাকা উপোস করেছিল। গির্জা থেকে ফিরল ঠাণ্ডায় নীল হয়ে, ফিরেই ছেলের বৌ লুকিনিকনার কাছে অনুযোগ করল :

—'পুরুত ঠাকুর না খাইয়ে একেবারে মেরে ফেলেছে। লোকটা কিচ্ছু কাজের নয়। ডিমের গাড়ির গাড়োয়ানের মত ধীরজ।'

—'জন্মোৎসবের সময় উপোস করলেই ভাল করতেন, তখন একটু গরমও ছিল।'। ছেলের বৌ উত্তর দিল। বুড়ো বলল :

—'নাতালিয়াকে ডাক দেখি। আমাকে একজোড়া গরম মোজা বুনে দিক।'

নাতালিয়া তখনো এই বিশ্বাস নিয়েই দিন কাটাচ্ছে যে, গ্রিগর তার কাছে ফিরে আসবে। তার দেহ-মন অপেক্ষা করছে গ্রিগরের জন্যে, যুক্তিতর্কের সতর্ক গুঞ্জন শুনতে চায় না সে। এই অনুচিত, অভাবিত কলঙ্কে পীড়িত হয়ে ক্লান্ত প্রত্যাশায় বিছানায় এপাশ ওপাশ করে তার রাত কাটে। আগেরটার সঙ্গে এসে জুটেছে নতুন আর এক জ্বালা। গুলিবেঁধা পাখি যেমন করে বনের মধ্যে ছটফট করে, নিজের ঘরে তেমনি করে নাতালিয়া তারই চরম পরিণতির জন্যে রুদ্ধ আতঙ্কে প্রতীক্ষা করছে। বাপের বাড়ি ফিরে আসার প্রথম থেকেই দাদা মিত্‌কা কেমন যেন বেয়াড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে শুরু করেছে। একদিন ত বারান্দায় তাকে পেয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল :

—'এখনো তুই গ্রীস্‌কার জন্যে হাঁ করে বসে আছিস?'

—'তা দিয়ে তোমার দরকার কি?'

—'তোর দুঃখু যাতে দূর হয়, সেই চেষ্টাই করতে চাই আমি।'

দাদার চোখের দিকে তাকিয়ে নাতালিয়া যা দেখতে পেল তাতে আতঙ্কে শিউরে উঠল। মিত্‌কার বেড়ালের মত সবুজ চোখদুটো ঝকমক করছে। বারান্দার আবছা আলোয় তেলতেলে কোটর দুটো ঝিলিক মেরে মেরে উঠছে। নাতালিয়া দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল। ঠাকুর্দার ঘরে ছুটে গিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুকের ধুকপুকি শুনতে লাগল। দুদিন পরেই আবার তাকে উঠোনে পাকড়াও করল মিত্‌কা। গরুর জন্যে তাজা ঘাস টানছিল সে, তার খাড়াখাড়া চুল আর পশমের টুপি থেকে ঘাসের ডাঁটা ঝুলছে।

—'নিজেকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই, নাতালিয়া...'

—'বাবাকে বলে দেব কিন্তু।' নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই যেন হাতদুটো উঁচু করে নাতালিয়া চেঁচিয়ে উঠল।

—'তুই একটা হাঁদা! চেঁচাচ্ছিস কিসের জন্যে?'

—'যাও যাও, তুমি চলে যাও, দাদা! এখুনি গিয়ে বাবাকে বলে দেব! আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে আছ! আশ্চর্য, বসুমতী হাঁ করে এখনো তোমাকে গিলে খাচ্ছে না? আর আমার কাছে এসো না, দাদা।' নাতালিয়া অনুনয়বিনয় করতে লাগল।

—'এখন নয়, কিন্তু রাতে আমি আসব। মাইরি বলছি, রাতে আসবই।' মিত্‌কা উত্তর দিল।

নাতালিয়া কাঁপতে কাঁপতে উঠোন ছেড়ে পালিয়ে এল। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় বিছানা পাতল সিন্দুকের ওপরে, ঘুমোবার সময় ছোট বোনটাকে সঙ্গে নিল। তার

জবলন্ত চোখদুটো অন্ধকার ফুঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল, ক্ষীণতম শব্দের জন্যেও কানদুটো খাড়া হয়ে রইল। চিৎকারে বাড়ি ফাটিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই সে সারারাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করল। কিন্তু পাশের ঘরে ঘুমন্ত গ্রীসাকার নাক-ডাকানি আর মাঝে মাঝে ছোট বোনের অস্ফুট ধ্বনিতেই শুধু সে-রাতের স্তব্ধতা ভাঙতে লাগল।

বিয়ের ব্যাপারের অপমানটা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি মিত্‌কা। মন-মরা আর বদ-মেজাজী হয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। রোজ সন্ধ্যেবেলায় বেরিয়ে যায়, ক্বচিৎ কখনো ভোরের আগে বাড়ি ফিরে আসে। গ্রামে যাদের নাম খারাপ সেই সব বৌ-ঝিদের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে; বাজি রেখে তাস খেলতে যায় স্তেপান আস্তাখফের বাড়িতে। বাপ তার স্বভাবচরিত্র লক্ষ্য করে কিন্তু মুখে কিছুই বলে না।

॥ দুই ॥

ইস্টারের ঠিক আগে মোখোভের দোকানের কাছাকাছি পান্তালিমনের সঙ্গে নাতালিয়ার দেখা হয়ে গেল। পান্তালিমন তাকে ডাকল :

—'একটু দাড়াও ত!'

নাতালিয়া দাঁড়াল। শ্বশুরের মুখখানা দেখে তার বুকের মধ্যে আঁকুপাঁকু করে উঠল, গ্রিগরের কথা মনে পড়ে গেল।

—'মাঝে মাঝে দেখা করতে আস না কেন?' বুড়ো ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল। চোখের দিকে তাকাল না, যেন সে নিজেই কোন অপরাধ করে ফেলেছে। 'শাশুড়ী তোমাকে দেখবার জন্যে পাগল... তুমি আসবে নিশ্চয়ই, একদিন?'

নাতালিয়া অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠল। 'ধন্যবাদ...' সে উত্তর দিল, তারপর একটু ইতস্তত করে যোগ করে দিল (বলতে চেয়েছিল 'বাবা'), 'পান্তালিমন প্রোকো-ফিয়েভিচ্। বাড়িতে ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম।'

—'আমাদের গ্রীস্‌কো... উঃ!' মনের খেদে বুড়ো মাথা ঝাঁকাল। 'চালাকি খাটাল হারামজাদা। কেমন মিলেজুলে থাকতে পারতাম।'

—'ও কথা থাক, বাবা।' নাতালিয়া চড়াগলায় বলে উঠল : 'তা যে হবার নয়।'

নাতালিয়ার দুচোখ জলে ভরে এল দেখে থতমত খেয়ে পান্তালিমন হাত নাড়তে শুরু করে দিল। কান্নার অদম্য ইচ্ছা রোধ করার জন্যে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল নাতালিয়া।

—'আচ্ছা, এখন আসি, মা!' পান্তালিমন বলে উঠল, 'ও শুয়োরের বাচ্চার জন্যে দুঃখ করো না। ও তোমার পায়ের নখের যুগ্যিও না। হয়ত ফিরে আসবে। ভাবছি একবার দেখা করে আসি, কিন্তু মুস্কিল।'

বুকের ওপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে নাতালিয়া এগিয়ে গেল। একবার এ পায়ে আরবার অন্য পায়ে ভর দিয়ে নাচের ভঙ্গিতে পান্তালিমন দাঁড়িয়ে রইল, যেন এখুনি জোরসে ছুট মারবে। মোড় নেবার সময় নাতালিয়া একবার পেছন ফিরে তাকাল, বুড়ো তখন লাঠির ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে বারোয়ারিতলা দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে।

॥ তিন ॥

বসন্ত যত এগিয়ে আসতে লাগল, তত কম বসতে লাগল স্তকমানের কারখানাঘরের বৈঠক। গ্রামের লোকজন কোমর বাঁধছে ক্ষেতের কাজের জন্যে। কেবল আসে ইঞ্জিনচালক ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ আর কারখানার ভালেত, সঙ্গে আনে দাভিদ্‌কে। খৃষ্টের মৃত্যুতিথির আগের দিন বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যের দিকে তারা জমায়েত হল স্তকমানের কারখানা ঘরে। একটা বেঞ্চিতে বসে বসে আধুলি কেটে তৈরি করা একটা রুপোর আংটি ঘসছিল স্তকমান। অস্তগামী সূর্যের চওড়া একটা ফালি জানলা দিয়ে ভেতরে এসে পড়েছে। ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ একটা সাঁড়াশি তুলে নিয়ে হাতের ওপর ওল্টাতে ওল্টাতে বলে উঠল:

—'সেদিন একটা পিস্টন চাইতে গিয়েছিলাম কর্তার কাছে। বললাম, এটা এখানে সারানো যাবে না। মিল্লেরভোয় নিয়ে যেতে হবে। এই এতবড় একটা চিড় ধরেছে।' ইভান তার কড়ে আঙুলে দৈর্ঘ্যটা মেপে দেখাল।

—'মিল্লেরভোতে একটা কারখানা আছে, না?' উখো দিয়ে আংটিটা ঘসতে ঘসতে রুপোর মিহি গুঁড়ো ছিটিয়ে স্তকমান জিজ্ঞেস করল।

—'ইস্পাতের কারখানা। গত সন ওখানে আমাকে কয়েকদিন থাকতে হয়েছিল।' ইভান উত্তর দিল।

—'অনেক মজুর আছে?'

—'শ পাঁচেক প্রায়।'

—'তারা কেমন হে?' স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই স্তকমানের মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে এল।

—'অবস্থা সচ্ছল। তোমার সর্বহারাদের মত নয়, ওরা সব ষাঁড়ের গোবর।'

—'সেটি আবার কি বস্তু?' ভালেত জিজ্ঞেস করল।

—'কারণ, তাদের অবস্থা খুবই সচ্ছল। সকলেরই একখানা করে ছোট বাড়ি, বৌ আর সব সুখ সুবিধে। তার ওপর তাদের অর্ধেকই আবার ব্যাপ্টিস্ট। তাদের মনিব নিজেই প্রচার করেন। এ ওর নাক চাটে, আর এত পুরু ময়লা ওদের, তোমার উখো দিয়ে ঘসলেও উঠবে না। সে যাক, আমি গেলাম সার্জি প্লাতোনাভিচের কাছে।' ইভান তার গল্প বলে চলল। 'ওর কাছে কারা যেন ছিল, তাই আমাকে বাইরে বসতে বলল। আমি বসে রইলাম; দরজা দিয়ে ওদের কথাবার্তা কানে আসতে লাগল। মোখোভ বলছিল, শিগ্‌গিরই জার্মানদের সঙ্গে লড়াই বাধবে। সে নাকি কোন কেতাবে পড়েছে। কে একজন বলল, জার্মানী আর রাশিয়ার মধ্যে লড়াই বাধতেই পারে না, কারণ, জার্মানীর দরকার আমাদের শস্য। তারপর আরও একজনের গলা শুনতে পেলাম। টের পেলাম, বুড়ো লিস্তনিৎস্কির ছেলে সেই অফিসারটা। সে বলছিল, 'লড়াই বাধবেই, তবে জার্মানী আর ফ্রান্সের মধ্যে, আঙুর ক্ষেত নিয়ে। আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।' তোমার কি মনে হয়, অসিপ্ দাভিদোভিচ্?' স্তকমানের দিকে ঘুরে ইভান প্রশ্ন করল।

—'আমি তো আর হাত গ্ণতে জানি না।' হাতের আংটির দিকে তাকিয়ে স্তকমান উত্তর দিল।

—'একবার ওরা শ্রু করে দিলেই, আমাদের ছ্টতে হবে। চাও আর না চাও, চুলের ম্ঠি ধরে নিয়ে যাবে।' ভালেত বলে উঠল।

—'ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকমের।' ইভানের হাত থেকে ধীরে স্স্থে সাঁড়াশিটা তুলে নিয়ে স্তকমান বলল। জিনিসটা আগাগোড়া পরিষ্কার করে ব্ঝিয়ে দেবার জন্যে তারপর সে বলতে শ্রু করল। ভালেত বেঞ্চির ওপর আয়েস করে বসল; দাভিদের ঠোঁটদ্টো ইংরিজি 'O' অক্ষরের মত হয়ে রইল, দাঁতগ্লো বেরিয়ে পড়ল। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগ্লোর বাজার আর উপনিবেশ দখলের লড়াই-এর কাহিনী বলে গেল স্তকমান। তার শেষ হতেই ইভান আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করল :

—'সত্যি, কিন্তু এতে আমাদের কি?'

—'অন্যদের মাতলামি দেখে তোমাদের মাথায়ও কামড়ানি শ্রু হবে।' স্তকমান হাসল।

—'ছেলে মান্ষের মত বকো না।' বিদ্বেষমাখা গলায় ভালেত বলে উঠল 'জানো না কথায় বলে, প্রভু নাড়ে শেকল, কিন্তু কুকুর নাড়ে মাথা।'

—'লিস্তনিৎস্কি মোখোভের ওখানে এসেছিল কেন?' ইভান প্রসঙ্গ পাল্টাল।

—'স্টেশনে যাবার পথে এসেছিল। হ্যাঁ, ভালো কথা, আর একটা খবর আছে। যখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি তখন দেখতে পেলাম . বল ত কাকে? গ্রিগর মেলেখভকে। হাতে চাব্ক নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

—'লিস্তনিৎস্কির কোচোয়ান হয়েছে।' দাভিদ উত্তর দিল।

রাত বাড়ছে। সকলের প্রস্থান পর্বের স্চনা করল ইভান। অতিথিদের সঙ্গে গেট অবধি এগিয়ে গেল স্তকমান। তারপর কারখানা ঘরে তালা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল।

॥ চার ॥

ইউজেনেকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গ্রিগর ফিরতি পথে রওনা হল ইস্টারের আগের রবিবারে। চোখে পড়ল, গরম পড়ে বরফ গলেছে; দ্' চার দিনের মধ্যে রাস্তাটা ভেঙেছে।

স্টেশন থেকে প্রায় মাইল কুড়ি দ্রে এক ইউক্রেনীয় গ্রামের কাছে নদী পের্তে গিয়ে ঘোড়া ছাড়া আর সব কিছ্ই খোয়াল গ্রিগর। গ্রামে এসে পৌঁছ্ল সন্ধ্যের দিকে। আগের রাত্রে নদীর বরফে চিড় ধরেছিল, জলের টানে বরফ ভেসে গিয়েছে, নদীর জল দ্কূল ছাপিয়ে উঠেছে, কাদাগোলা বাদামী জলস্রোত ফেনায়িত হয়ে উঠছে। রাস্তার ধারের যে সরাইখানায় গ্রিগর ঘোড়াকে দানা-পানি খাওয়াতে থেমেছিল সেটা স্রোতের অপর দিকে। রাত্রে নদীর জল সহজেই বেড়ে উঠতে পারে, তাই গ্রিগর নদী পার হওয়াই সাব্যস্ত করল।

যাবার সময় বরফের ওপর যেখান দিয়ে সে গিয়েছিল, সেই জায়গায় এসে দাঁড়াল গ্রিগর। দেখতে পেল জলের স্রোতে নদীর পাড় ভেসে গিয়েছে। বেড়ার একটা

টুকরো আর গাড়ির একটা চাকার আধখানা নদীর মাঝখানে ঘুরপাক খাচ্ছে। একেবারে ধারে বালির ওপরে শ্লেজ চালিয়ে নেবার সদ্য সদ্য দাগ পড়েছে। ঘোড়া থামিয়ে, ভাল করে দাগগুলো দেখে নেবার জন্যে গ্রিগর লাফিয়ে নামল। দাগগুলো জলের ধারে এসে বাঁ-দিকে একটু ঘুরে নদীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। অপর পারের দূরত্ব চোখে আন্দাজ করে নিল : খুব বেশি হলে একশ হাত হবে। ঘোড়ার কাছে গিয়ে দেখল ঘোড়ার সাজ ঠিক আছে কি না। এমন সময় কাছের একটা বাড়ি থেকে এক ইউক্রেনীয় এসে দাঁড়াল। আবর্তিত জলস্রোতের দিকে হাতের লাগামটা বাড়িয়ে গ্রিগর জিজ্ঞেস করল :

—'এখানে পার হবার ভাল জায়গা আছে?'

—'আজ সকালেই ত লোকে পার হয়েছে।'

—'জল খুব বেশি?'

—'না। শ্লেজটা ভিজতে পারে।'

লাগামটা টেনে ধরে, চাবুক উঁচিয়ে গ্রিগর মুখের সংক্ষিপ্ত আওয়াজ করে ঘোড়াগুলোকে এগুনোর তাড়া দিল। নাক দিয়ে জল ছিটিয়ে নাকের আওয়াজ করে অনিচ্ছাসত্ত্বে তারা এগুলো। চটাস্ করে চাবুক হাঁকড়ালো গ্রিগর, কোচোয়ানের আসনে উঠে দাঁড়াল।

বাঁ-দিকের বাঁদামী ঘোড়াটা মাথা বাঁকাল, তারপরেই দড়িতে টান দিল। নীচে পায়ের দিকে তাকাল গ্রিগর; শ্লেজের মাথার ওপর দিয়ে জল পাক খেয়ে ফিরছে। প্রথম প্রথম ঘোড়াদুটো হাঁটু জল ঠেলে চলছিল, কিন্তু হঠাৎ জলের স্রোত তাদের বুক পর্যন্ত ঠেলে উঠল। ফেরাবার চেষ্টা করল গ্রিগর, কিন্তু লাগামের টানে তারা সাড়া দিল না, সাঁতরাতে শুরু করল। শ্লেজের পেছনটা জলের তোড়ে হঠাৎ ঘুরে গেল, ঘোড়াদুটোর মাথা স্রোতের উজানে ঠেলে দিল। তাদের পিঠের ওপর দিয়ে ঢেউ তুলে স্রোত বইতে লাগল, শ্লেজটা দুলতে দুলতে ভীষণভাবে পেছন দিকে টান দিতে লাগল।

—'হেই! হেই! ডাইনে, ডাইনে!' পাড় ধরে দৌড়ুতে দৌড়ুতে, তেকোনা টুপিটা দুলিয়ে সেই ইউক্রেনীয় বুড়ো চিৎকার করতে লাগল।

রাগে গরগর করতে করতে একটানা চেঁচিয়ে গ্রিগর ঘোড়াদুটোকে তাড়া দিতে লাগল। টেনে নিয়ে যাওয়া শ্লেজের পেছনে ঘুরপাক খাওয়া জলে ফেনা জেগে উঠল। রাতারাতি একটা সাঁকো জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল, সামনের দিকে এগিয়ে থাকা তারই অবশিষ্ট কাঠ-খুঁটির সঙ্গে শ্লেজের তলাটা বাড়ি খেতেই অবলীলাক্রমে শ্লেজটা উল্টে গেল। একটা আর্তনাদ করে গ্রিগর ডিগবাজি খেয়ে জলের মধ্যে গিয়ে পড়ল, কিন্তু হাতের মুঠো থেকে লাগাম ফস্কাতে দিল না। শ্লেজের পাশে গড়াতে গড়াতে দুলতে দুলতে, অল্প অল্প টান লেগে, ভেড়ার চামড়ার কোনা ধরে পা আটকে ঝুলতে লাগল। একটা দড়ি ধরতে পেরেই সে লাগামটা ছেড়ে দিল, হাত দিয়ে দড়ি টেনে টেনে সে এগুতে লাগল আড়-কাঠের দিকে। আড়-কাঠের লোহা বাঁধানো মাথাটা ধরতে যাবে এমন সময়, স্রোতের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে একটা ঘোড়া পেছনের পায়ের চাঁট মেরে বসল, চাঁটটা লাগল তার হাঁটুতে। গ্রিগরের দম আটকে এল, হাত দুটো শূন্যে তুলে পাশের দড়ি চেপে ধরল। সারা দেহ ঠাণ্ডায় কনকন করে উঠল, কোন রকমে ঘোড়াটার মাথার কাছে গিয়ে পৌঁছুতেই, ঘোড়াটা রক্তজমা চোখের মৃত্যুভয়ভীত, উন্মত্ত দৃষ্টিতে গ্রিগরের বিস্ফারিত চোখের তারার দিকে তাকাল।

বারবার সে চামড়ার পেছল লাগাম ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু আঙুল থেকে ফসকে

যেতে লাগল। অবশেষে কোনরকমে লাগামটা আঁকড়ে ধরল। হঠাৎ পায়ের নীচে মাটি ঠেকে গেল। জলের কিনারা পর্যন্ত ঠেলে ঠেলে এসে, ঘোড়ার বুকে ধাক্কা লেগে, পা হড়কে ফেনাজমা বালির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

তার গায়ের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে, ঘোড়াদুটো ভীষণ জোরে স্লেজখানা টেনে নিয়ে জল থেকে উঠে এল, তারপর ধুঁকতে ধুঁকতে, কাঁপতে কাঁপতে, ধোঁয়া উড়িয়ে কয়েক পা গিয়ে থেমে গেল। গ্রিগরের যন্ত্রণার কোন চেতনাই রইল না, সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল; ঠাণ্ডায় তাকে একেবারে আঁকড়ে ধরল, অসহ্য গরম ময়দার লেই যেমন করে ধরে। ঘোড়াদুটোর চেয়েও সে বেশি কাঁপতে লাগল, মনে হল পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে রুগ্নশিশুর মতই দুর্বল লাগছে। গ্রিগর বুদ্ধি খাটিয়ে স্লেজটা উল্টে দাঁড় করিয়ে দিল, তারপর ঘোড়াদুটোর গা গরম করার জন্যে জোর কদমে ঘোড়া ছোটাল। গ্রামের রাস্তায় এমন তীরবেগে ছুটে এল যে কোনো শত্রুকে আক্রমণ করতে যাচ্ছে; গতি একটুও না কমিয়ে প্রথম খোলা গেটের দিকে ঘুরল।

কপালজোরে গ্রিগর এক অতিথিপরায়ণ ইউক্রেনীয়কে পেয়ে গেল; লোকটা তার ছেলেকে পাঠাল ঘোড়াদুটোর তদারক করতে, নিজে গ্রিগরকে কাপড় ছাড়তে সাহায্য করল। বৌকে এমন স্বরে উনুন জ্বালতে হুকুম করল যাতে কোনো ওজর তোলার অবকাশ রইল না। জামাকাপড় না শুকোনো পর্যন্ত গ্রিগর বাড়ির কর্তার পা-জামা পরে উনুনের ওপরে টান টান হয়ে শুয়ে রইল। বাঁধাকপির ঝোল দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে লম্বা একটা ঘুম দিল।

॥ পাঁচ ॥

ভোর হবার অনেক আগেই আবার গ্রিগর রওনা হল। এখনো পুরো পঁচাশি মাইল যেতে হবে, প্রতিটি মিনিট তার কাছে মূল্যবান। বানে ভাসা বসন্তের স্তেপের পথচিহ্নহীন গোলক-ধাঁধাঁ তার সামনে; প্রতিটি নালা, প্রতিটি খাদের মধ্যে দিয়ে বরফ-জলের স্রোত গর্জন করে ছুটছে।

রুক্ষ, ধু ধু রাস্তায় চলতে চলতে ঘোড়াদুটো ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ভোরবেলাকার গুঁড়ো-বরফে-শক্ত রাস্তা ধরে ধরে চলার পথের মাইল তিনেক দূরের এক গ্রামে এসে পৌঁছল, সেখানে চৌ-রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঘোড়াগুলো ঘেমে নেয়ে উঠল, গা থেকে ধোঁয়া উঠতে লাগল; পেছনে মাটির ওপর স্লেজটানার চকচকে দুটো রেখা আঁকা হয়ে পড়ে রইল। স্লেজখানা ফেলে রেখে, একটা ঘোড়ার খালি পিঠে চেপে, অন্যটার লাগাম ধরে আবার সে রওনা হল। ইস্টারের রবিবারের সকালে পৌঁছুল ইয়াগোদ্‌নয়ে।

গ্রিগরের পথচলার কাহিনী বুড়ো লিস্তনিৎস্কি মন দিয়ে শুনল, তারপর ঘোড়া-দুটোকে দেখতে বেরুল। ঘোড়াদুটোর গর্তে-ঢোকা পেটের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকাতে তাকাতে সাশ্‌কা তাদের উঠোনের এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কর্তা জিজ্ঞেস করল :

—'কেমন আছে? খুব বেশি রকম হাঁকানো হয়ে যায় নি ত?'

—'না। গলাসির ঘসা লেগে পার্টিকলেটার বুকে ঘা হয়েছে, কিন্তু ও কিছু না।'

—'যাও, বিশ্রাম কর গিয়ে।' লিস্তনিৎস্কি হাত দিয়ে গ্রিগরকে ইঙ্গিত করল। গ্রিগর তার ঘরে চলে গেল। কিন্তু একটি রাতেরই বিশ্রাম জুটল শুধু। পরদিন সকালেই বেনিয়ামিন এসে ডাকল :

—'গ্রিগর, কর্তা তোমাকে ডাকছেন। এক্ষুনি।'

চটি পায়ে হলঘরে পায়চারি করছিল জেনারেল। গ্রিগর দু দুবার গলা খাঁকার দেবার পর তবে সে চোখ তুলে তাকাল।

—'ও, হ্যাঁ! মন্দাটা আর আমার ঘোড়াটায় জিন চাপাও গিয়ে। লুকেরিয়াকে বলো, কুকুরগুলোকে যেন কিছু খেতে না দেয়। ওরা শিকারে যাবে।'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে পেছন ফিরছিল গ্রিগর। মনিবের চিৎকার শুনে থামতে হল :

—'শুনছ? তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।'

জিনচাপানো ঘোড়াদুটোকে রেলিংএর কাছে নিয়ে এসে গ্রিগর কুকুরগুলোকে শিস্ দিয়ে ডাকল। নীল কাপড়ের জার্কিন আর কাজকরা চামড়ার বেল্ট এঁটে বেরিয়ে এল লিস্তনিৎস্কি। সোনার ঘের-দেওয়া একটা নিকেলের ফ্লাস্ক তার পিঠের সঙ্গে ঝোলানো, হাত থেকে ঝুলে পড়া চাবুকটা পেছন দিকে সাপের মত লিকলিক করছে।

কর্তার ওঠার জন্যে লাগাম ধরে থাকতে থাকতে গ্রিগর অবাক হয়ে দেখল, লিস্তনিৎস্কি কেমন অবলীলাক্রমে গোলগাল দেহটা জিনের ওপর তুলে দিল। দস্তানা-পরা হাতে লাগামটা জড়ো করে নিতে নিতে জেনারেল সংক্ষিপ্ত হুকুম করল, 'আমার ঠিক পেছনে পেছনে এসো।'

ঘোড়ার পিঠে চাপল গ্রিগর। ঘোড়াটার পেছনের পায়ে নাল লাগানো হয় নি, বরফের একটা টুকরোয় পা পড়তেই পা পিছলে, পেছনে ভর দিয়ে বসে পড়ল। খাটো ঘাড়টা বেঁকিয়ে, সওয়ারের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ঘোড়াটা হাঁটুতে কামড় দেবার চেষ্টা করতে লাগল, সেইজন্যে শক্ত হাতে লাগাম টেনে ধরতে হল। ইয়াগোদ্‌নয় থেকে যখন পাহাড়ের চুড়োয় এসে পেঁছুল, লিস্তনিৎস্কি ঘোড়াটাকে দুলকিতে ছুটিয়ে দিল। কুকুরের পাল চলল গ্রিগরের পেছনে পেছনে; একটা কালো বুড়ী কুত্তী ঘোড়ার লেজের সঙ্গে প্রায় তার নাকটা ঠেকিয়ে ছুটতে লাগল। ঘোড়াটা পেছন দিকে সরে এসে চাট মারবার চেষ্টা করল, কিন্তু কুত্তীটা গ্রিগরের দিকে ঠাক্‌মাবুড়ীর মত উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে গেল।

আধঘণ্টার মধ্যেই তারা গন্তব্যস্থল ওল্‌শান্‌স্কি গিরিপথে এসে পেঁছুল। গিরিপথের ধারে ধারে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে লিস্তনিৎস্কি চলতে লাগল। অসংখ্য গাড্ডা-গর্ত এড়িয়ে গ্রিগর উপত্যকার মধ্যে নেমে পড়ল। মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাকাতে লাগল, এখানে ওখানে ছড়ানো ইস্পাত-নীল, পাতাবিহীন এ্যাল্‌ডার ঝোপের ভেতর দিয়ে রেকাবের ওপর দাঁড়ানো লিস্তনিৎস্কির স্পষ্ট-রেখায়িত দেহটা চোখে পড়তে লাগল। তার পেছনে পেছনে ঢেউতোলা ঢিবির ধার বরাবর কুকুরগুলো দঙ্গল বেঁধে ছুটছে। দস্তানা খুলে নিয়ে সিগারেট খাবার জন্যে গ্রিগর পকেট হাতড়াতে লাগল।

ঢিবির অপর পার থেকে হঠাৎ পিস্তলের গুলির মত একটা চিৎকার উঠল; ওই ওই ওইটার পেছনে!'

গ্রিগর মাথা তুলল, দেখল, চাবুক উঁচিয়ে লিস্তনিৎস্কি কদমে ছুটছে।

—'ওইটার পেছনে!'

গিরিপথের নীচের ঝোপঝাড়, নলখাগড়ার বন পেরিয়ে, মাটির সঙ্গে লেপ্টে সর্ সর্ করে একটা পাঁশুটে রঙের বুড়ো নেকড়ে প্রাণপণে ছুটছে। নদীর জলটা লাফিয়ে পার হয়ে নেকড়েটা থমকে দাঁড়াল, তারপর দ্রুত ঘাড় ফিরিয়েই কুকুরগুলোকে দেখতে পেল। গিরিপথের শেষের দিকের জঙ্গলের পথ আটকে দিয়ে তারা ছুটে আসছে ঘোড়ার খুরের আকারে।

লম্বা লম্বা পা ফেলে লাফাতে লাফাতে নেকড়েটা জঙ্গলের দিকে ছুটল। বুড়ী কুত্তীটা সোজা তার দিকে ছুটে এল, তার পেছনে আর একটা কুকুর। নেকড়েটা মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল। গিরিপথ পার হয়ে এসে আর তাকে দেখতে পেল না গ্রিগর। পরে যখন একটা ঢিবির মাথায় উঠে ভাল করে চারধার দেখতে পেল, নেকড়েটা ততক্ষণে স্তেপের মধ্যে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে, কাছাকাছি একটা গিরি-পথের দিকে তার লক্ষ্য। দেখতে পেল, পেছনে পেছনে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে কুকুরগুলো ছুটছে, চাবুকের গোড়া দিয়ে খোঁচা দিতে দিতে বুড়ো লিস্তনিৎস্কিও একটু পাশ ঘেঁসে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। নেকড়েটা গিরি-পথে পেঁৗছুতে পেঁৗছুতেই কুকুরগুলো ধরে ধরে আর কি, একটা ত প্রায় শিকারের ঘাড়ের ওপরই গিয়ে পড়ল।

সামনে কি ঘটছে তা দেখবার বৃথা চেষ্টায় গ্রিগর ঘোড়াটাকে ধাপে ছুটিয়ে দিল। দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল, বাতাসের শিসে কানে তালা ধরে গেল। হঠাৎ যেন তাকে শিকারের উত্তেজনায় পেয়ে বসল। ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর নুয়ে পড়ে সে ছুটতে লাগল বাতাসের মত। যখন গিরি-পথে গিয়ে পেঁৗছুল, নেকড়ে কি কুকুর কিছুই চোখে পড়ল না। দুএক মিনিট পরেই লিস্তনিৎস্কি ধরে ফেলল তাকে। হঠাৎ লাগাম টেনে ধরে সে চিৎকার করে উঠল :

—'কোনদিকে গেল?'

—'মনে হচ্ছে, পাহাড়ের ফাঁকের মধ্যে।'

—'বাঁ-দিক থেকে তুমি ওদের ধরে ফেল। যাও ছোটো!'

ঘোড়ার পেটে গোড়ালির ঠক্কর দিয়ে বুড়ো ডাইনে ছুটে গেল। গ্রিগর একটা নাবালের মধ্যে নেমে পড়ল, চাবুক মেরে, চিৎকার করে ঘোড়াটাকে পুরো এক মাইল ছুটিয়ে নিয়ে এল। ঘোড়ার খুরে ভিজে আঠাল মাটি ছটকে তার মুখে এসে লাগল। লম্বা গিরি-পথটা ডানদিকে বেঁকে তিনভাগ হয়ে গিয়েছে। প্রথম বাঁকটা পেরিয়েই গ্রিগর দেখতে পেল, কুকুরের কালো সারি নেকড়েটাকে স্তেপের মধ্যে দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ওক্ আর এ্যাল্ডার গাছের ঘন জঙ্গলে ঢাকা গিরি-পথের একেবারে ভেতর থেকে তাড়া খেয়ে বেরিয়ে জানোয়ারটা এখন শুকনো ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি উপত্যকার দিকে ছুটছে।

রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে, জামার হাতায় চোখের জল মুছে গ্রিগর তাদের লক্ষ্য করতে লাগল। মুহূর্তের জন্যে বাঁ-দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পারল তাদের গ্রামের কাছাকাছি স্তেপের মধ্যে এসে পড়েছে। কাছেই সেই অসমান চারকোণা জমিটা, গত শরতে সে আর নাতালিয়া যাতে লাঙল দিয়েছিল। ইচ্ছে করেই সে ঘোড়াটাকে সেই জমির মধ্যে নিয়ে গেল, চষা-মাটির তালে ঘোড়ার পা হড়কে হোঁচট খাওয়ার স্বল্প মুহূর্তগুলোর ফাঁকে মন থেকে শিকারের উৎসাহটুকু একেবারে উবে গেল। ঘেমে নেয়ে-ওঠা ঘোড়াটাকে ধীরে সুস্থে তাড়া দিতে লাগল; লিস্তনিৎস্কি দেখতে পাচ্ছে কিনা তাই ঘাড় ফিরিয়ে লক্ষ্য করতে করতে ঘোড়াটাকে হাল্কা দুলকিতে ছেড়ে দিল।

কিছুদূরে চাষীদের খালি অস্থায়ী কুঁড়েগুলো চোখে পড়ল তার; তারও কিছুটা দূরে তিনজোড়া বলদে ভেলভেটের মত মাটিতে লাঙল টানছে।

'নিশ্চয়ই গ্রামের কেউ? ও জমিটা কার? ওই ত আনিকুশ্‌কো, তাই না?' লাঙলের পেছন পেছন যে লোকটা চলছে তাকে চিনতে পেরে গ্রিগর চোখ কোঁচকাল।

দেখতে পেল, লাঙল ফেলে রেখে দুজন কসাক গিরিপথের সেই নেকড়েটার দিকে ছুটে গেল। কোণা উঁচু, লালফিতে বাঁধা টুপি মাথায়, চোয়ালের নীচে চোয়াল-পটি লটকানো একজন কসাক একটা লোহার ডাণ্ডা ঘোরাতে লাগল। হঠাৎ নেকড়েটা চষা-জমির গভীর দাগের মধ্যে বসে পড়ল। সকলের আগের কুকুরটা সোজা তার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে সামনে পা দুটো মুড়ে পড়ে গেল; পেছনে পেছনে সেই বুড়ী কুত্তীটা থামাবার চেষ্টা করল, এবড়োখেবড়ো চষা-জমিতে তার পেছন দিকটা ঘসড়াতে লাগল; কিন্তু ঠিক সময়ে থামাতে না পেরে নেকড়েটার গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ধরা-পড়া জন্তুটা ভীষণভাবে মাথা নাড়ল, বুড়ী কুত্তীটা ছটকে পড়ে গেল। ততক্ষণে কুকুরের পাল ছেঁকে ধরল নেকড়েটাকে, সবাই মিলে চষা-জমির ওপর দিয়ে কয়েকহাত টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল। মনিবের চেয়ে মিনিট কয়েক আগেই গ্রিগর ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। শিকারের ছুরিতে হাত দিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল।

—'গলায়! গলায় বসিয়ে দাও!' লোহার ডাণ্ডা-হাতে কসাকটার চিৎকার শুনে গ্রিগরের মনে হল স্বরটা চেনা চেনা। লোকটা ভীষণ হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে, গ্রিগরের পাশে বসে পড়ে, শিকারের পেটের নীচে আটকে যাওয়া কুকুরটাকে টেনে বার করল, দড়ি দিয়ে নেকড়ের সামনের পা দুটো বেঁধে ফেলল। ঝাঁকড়া ঝাকড়া লোমের মধ্যে হাত চালিয়ে গ্রিগর নলিটা টেনে ধরে ছুরি চালিয়ে দিল।

—'কুকুরগুলো! কুকুরগুলোকে তাড়াও!' জিন থেকে লাফিয়ে নামতে নামতে বুড়ো লিস্তনিৎস্কি চেঁচিয়ে উঠল।

অতিকষ্টে কুকুরগুলোকে তাড়াল গ্রিগর। তারপর তার মনিবের দিকে তাকাল। তার একটু দূরেই স্তেপান আস্তাখফ দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে হাতের চেটোর ওপর লোহার ডাণ্ডাটা ঘোরাচ্ছে। স্তেপানের দিকে ঘুরে লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল :

—'তোমার বাড়ি কোথায় হে?'

—'তাতার্স্ক।' মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করে স্তেপান উত্তর দিল, তারপর গ্রিগরের দিকে এক-পা এগিয়ে এল। লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল :

—'নাম কি?'

—'আস্তাখফ।'

—'কখন বাড়ি ফিরবে, বাছা?'

—'আজ রাত্রে।'

—'চামড়াটা নিয়ে এসো।' লিস্তনিৎস্কি পা দিয়ে নেকড়েটা দেখিয়ে দিল। 'যা দাম লাগে দেব।' রুমাল দিয়ে লাল টকটকে মুখের ঘাম মুছে সে পেছন ফিরল, পিঠ থেকে ফ্লাস্কটা খসিয়ে নিল।

গ্রিগর তার ঘোড়ার কাছে চলে এল। রেকাবে পা দিতে দিতে একবার পেছন ফিরে তাকাল। বিশাল, ভারী হাত দুখানা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে, থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে, স্তেপান তার দিকেই আসছে। সোজা ঘোড়ার কাছে এসে, ঘোড়ার গায়ে লেপ্টে দাঁড়িয়ে রেকাবটা চেপে ধরল। বলল :

—'বেশ ভালই ত দেখাচ্ছে, গ্রিগর!'

—'ভালোই!'

—'এ সম্পর্কে ভাবছ কি? এ্যাঁ?'

—'আমি আবার কোন সম্পর্কে ভাবতে যাব?'

—'আর একজনের বৌকে নিয়ে পালালে... তাকে দিয়ে খেয়াল মিটিয়ে নিচ্ছ?'

—'রেকাব ছেড়ে দাও।'

—'ভয় নেই! তোমাকে মারব না।'

—'আমি ভয় পাই নি। ও কথা থাক।' রাঙা হয়ে গ্রিগর গলা চড়াল।

—'আজ তোমার সঙ্গে মারপিট করব না; আমি তা চাই না...কিন্তু আমার কথা মনে রেখো, গ্রীস্‌কা; আজ হক আর কাল হক, আমি তোমাকে খুন করব।'

—'অন্ধ বলেন, 'চোখ চেয়ে সব দেখব'!'

—'কথাগুলো ভালো করে মনে রেখো। তুমি আমাকে কালি মাখিয়েছ। জীবনটাকে খাসি বানিয়ে ছেড়েছ, যেন আমি একটা শুয়োরের ছানা। ওপর থেকে তুমি সবই দেখছ...' স্তেপান হাতদুটো শূন্যে তুলে ধরল। 'ক্ষেতে লাঙল দিচ্ছি, কিন্তু কেন তা ভগবানই জানেন। আমার কি নিজের জন্যে দরকার আছে? একটু হাতপা নাড়লে তাতেই আমার শীতকালটা কেটে যাবে। শুধু এর নিরানন্দই আমাকে পেয়ে বসেছে। তুমি আমাকে ভয়ঙ্কর কলঙ্ক দিয়েছ, গ্রিগর।'

—'আমাকে অনুযোগ করো না। আমি বুঝব না। যার পেট ভরা সে কখনো খিদের জ্বালা বোঝে না।'

—'সে কথা সত্যি।' গ্রিগরের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্তেপান সায় দিল। হঠাৎ সে হেসে ফেলল—ছেলেমানুষের মত হাসি—হাসিতে চোখের কোণে কোণে খাঁজ খাঁজ দাগ পড়ল।

—'শুধু একটা কথা ভেবে বড় দুঃখ হে, বড় দুঃখ হয়... মনে আছে, আর বছর শ্রোভেতিদে আমরা কেমন ঘুঁসি লড়েছিলাম?'

—'না, আমার মনে নেই।'

—'কেন, সেই যে যাদের বিয়ে হয় নি তারা লড়ল, যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের সঙ্গে, মনে নেই? আর কেমন তাড়া করেছিলাম তোমাকে? তখন তুমি রোগা ছিলে, আমার কাছে খাগড়ার ডাঁটার মত। সেবার ছেড়ে দিয়েছিলাম তোমাকে, কিন্তু ছুটে পালাবার সময় যদি ঘুঁসি হাঁকড়াতাম তাহলে দু ফাঁক হয়ে যেতে। তুমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে পালালে, একেবারে লম্ফ দিয়ে; আমি যদি পাঁজড়ায় ঘুঁসি মারতাম তাহলে আজ আর ইহধামে থাকতে হত না।'

—'সে কথা ভেবে মন খারাপ করো না, আমরা এখনো হয়ত মুখোমুখি হতে পারি।'

হাত দিয়ে কপালটা ঘসল স্তেপান, কিছু যেন মনে করতে চাইলে। বাঁ-হাতে রেকাবটা তখনো চেপে ধরে ঘোড়ার পাশে পাশে হেঁটে চলল। গ্রিগর তার প্রতিটি ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগল। স্তেপানের ঝুলেপড়া শনের মত গোঁফ আর দাড়ি না কামানো খোঁচা খোঁচা চওড়া চোয়ালটা চোখে পড়ল। ঘামগড়ানো সাদা সাদা দাগওয়ালা নোংরা মুখটা বিষণ্ণ, অদ্ভুত রকমের অপরিচিত। সে তাকাতেই গ্রিগরের মনে হল, সে যেন পাহাড়ের চুড়ো থেকে ঝিরঝিরে কুয়াসার ওড়নায় ঢাকা দূর স্তেপের দিকে তাকিয়ে আছে। এক ধূসর বিষণ্ণতা আর শূন্যতা স্তেপানের সর্বাঙ্গে ছাই মাখিয়ে

দিয়েছে। একটি কথাও না বলে সে পেছনে দাঁড়িয়ে গেল। গ্রিগর ঘোড়াটাকে দুলকিতে চালিয়ে দিল।

—'একটু দাঁড়াও। আর সে কেমন আছে... আকসিনিয়া?'

চাবুকের ঘা দিয়ে বুট থেকে একটা কাদার তাল সরিয়ে গ্রিগর উত্তর দিল :

—'হ্যাঁ, সে ভালই আছে।'

ঘোড়াটাকে দাঁড় করিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল। পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে স্তেপান দাঁত দিয়ে একটা গাছের ডাল চিবুচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে গ্রিগরের মনে অপরিমেয় করুণা জেগে উঠল, কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে উঠল ঈর্ষা। জিনের ওপর ঘুরে বসে, সে চেঁচিয়ে বলল।

—'তোমার জন্যে তার একটুও মন কেমন করে না, ভাবনার কোন কারণ নেই!'

—'তাই নাকি?'

ঘোড়ার দুই কানের মাঝখানে গ্রিগর সপাং করে চাবুকের বাড়ি মারল, কোন উত্তর না দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

॥ ছয় ॥

ইস্টার রবিবারের আগের দিন রাত্রে ঘনকালো মেঘের স্তূপে আকাশ ঢেকে গেল। বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। মিশকালো অন্ধকার তাতার্স্ক গ্রামখানাকে ঘিরে রইল। সন্ধ্যের দিকে ডনের বরফ কড়কড় করে সমানে ফাটতে শুরু করেছিল, বরফের চাপে চুরমার হয়ে প্রথম ভাসমান চাঁইটা জলের ভেতর থেকে ভেসে উঠল। হঠাৎ মাইল তিনেক নিয়ে বরফ ভেঙে গেল, ভাটিপথে সরতে শুরু করল। গির্জায় তালে তালে উপাসনার ঘণ্টা বাজছে, তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে বরফের ভাসন্ত চাঁইগুলো একটা আর একটার সঙ্গে, নদীর দুই পাড়ে, ধাক্কা খেতে লাগল। প্রথম বাঁকের মুখে যেখানে ডন বাঁ-দিকে মোড় ঘুরেছে, জমাট বরফের বাঁধ পড়ে গেল। বরফের চাঁই-গুলোর গর্জন আর ঘর্ষণের আওয়াজ গ্রামে এসে পেঁছুতে লাগল। ছেলেছোকরারা গির্জার আঙিনায় জড়ো হয়েছে। খোলা দরজা দিয়ে উপাসনার চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, জানলা দিয়ে আলো উপচে পড়ছে। আর বাইরে অন্ধকারে ছেলেরা মেয়েদের চুমু খাচ্ছে, কাতুকুতু দিচ্ছে, কানে কানে ফিসফিস করে অশ্লীল গল্প বলছে।

ডনের বুক থেকে একটা চলন্ত ফিসফিস, মর্মরশব্দ আর খচমচ আওয়াজ ভেসে আসছে, মনে হচ্ছে যেন এক সুগঠিত দেহ, বিচিত্র-বসনা, পপলারের মত দীর্ঘাঙ্গী নারী তার বিশাল অদৃশ্য ঘাঘরার মর্মর ধ্বনি তুলে হেঁটে চলেছে।

মাঝরাত্রে মিত্কা কোরশুনভ রহস্যময় অন্ধকারে জিন-ছাড়া এক ঘোড়ার খুরের খট্‌খট্ আওয়াজ তুলে গির্জার কাছে এসে থামল। লাগামটা কেশরের সঙ্গে বেঁধে, পিঠে হাতের চাপড় মেরে ঘোড়াটাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। মুহূর্তের জন্যে কান পেতে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনল; তারপর বেল্টটা এঁটে নিয়ে গির্জার ভেতরে ঢুকে পড়ল। বারান্দায় উঠেই সে টুপিটা খুলে নিল, ভক্তিভরে মাথা নীচু করল, তারপর দুহাতে মেয়েদের সরিয়ে বেদির দিকে এগুতে লাগল। বাঁ-দিকে কসাকরা গাদাগাদি করে

দাঁড়িয়ে আছে, ডানদিকে মেয়েদের ভিড়। মিত্‌কা প্রথম সারিতেই বাপকে পেয়ে গেল, তার কনুই ধরে কানে কানে বলল :

—'একটু বাইরে এসো বাবা!'

বহুবিচিত্র গন্ধের পুরু যবনিকা ভেদ করে গির্জার বাইরের দিকে এগুতে এগুতে মিশ্‌কার নাকের পাশদুটো কেঁপে উঠল। পোড়া মোমের গন্ধ, মেয়েদের ঘামে ভেজা গায়ের ঝাঁঝানো গন্ধ, শুধু বড়দিন আর ইস্টারের জন্যে বার করা গির্জার পোশাক-আশাকের ভয়াবহ গন্ধ, ভেজা চামড়া, ন্যাপথলিন, আরও অনেক অজানা বিচিত্র গন্ধে তার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল।

বারান্দায় এসে বাপের কানের কাছে মুখ নিয়ে মিত্‌কা বলল :

—'নাতালিয়া মারা যাচ্ছে, বাবা।'

॥ সাত ॥

ইস্টার শুক্রবারে কোরশুনভের পড়শী পেলাগিয়া মেইদান্নিকভের বাড়িতে মেয়েরা জড়ো হয়েছিল গল্পগুজব করতে। পেলাগিয়ার স্বামী গাব্রিলা লোঝ্‌ থেকে লিখেছে, ইস্টারে সে ছুটি নিতে চেষ্টা করবে। পেলাগিয়া দেয়াল চুনকাম করেছে, ইস্টারের আগের সোমবারে আগেভাগেই ঘরদোর পরিস্কার করে রেখেছে; মঙ্গলবার থেকে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে, কখনো ছুটে যাচ্ছে গেটের কাছে, দাঁড়াচ্ছে বেড়ার পাশে। এলো চুল, রোগা শরীর, গর্ভবতীর চিহ্ন ফুটেছে মুখে। চোখে হাত আড়াল দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। হয়ত সে আসছে? সে গর্ভবতী, কিন্তু তা আইনসঙ্গত-ভাবেই। আগের বছর গাব্রিলা ফিরেছিল রেজিমেণ্ট থেকে, বৌএর জন্যে এনেছিল রঙীন পোলিশ ছিট্‌-কাপড়। বৌএর সঙ্গে চারচারটে রাত কাটিয়েছিল; পাঁচদিনের দিন মদ খেয়ে চুর হয়ে পোল আর জার্মানদের গালাগাল দিয়েছিল, জলভরা চোখে বসে বসে, পোলান্ড সম্পর্কে এক কসাকগান গাইতে শুরু করেছিল; তার বন্ধুবান্ধব, আর ভাইরা তার পাশেই বসে ছিল, খাবার আগে গান গেয়েছিল, ভদ্‌কা টেনেছিল। খাবার পর পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গিয়েছিল। আর সেইদিন থেকেই পেলাগিয়া তার ঘাঘরার ঘের লক্ষ করতে শুরু করেছিল।

পেলাগিয়া নাতালিয়াকে বোঝাচ্ছিল, কেমন করে সে গর্ভবতী হয়েছে। বলছিল : গাব্রিলা আসার, একদিন কি দুদিন আগে একটা স্বপন দেখলাম। আমি যেন মাঠের ভেতর দিয়ে হাঁটছি; দেখলাম আমার সামনে বুড়ী গাইটা, গত আগস্টে বেচে দিয়েছিলাম যেটা। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, বাঁট থেকে টপটপ করে দুধ ঝরছে। ভাবলাম, আমার দুধ-দোওয়া এমন বিশ্রী রকমের হল কেন? পরদিন এল বুড়ী দ্রোঝ্‌দিখা, স্বপনের কথা খুলে বললাম তাকে। সে মোমবাতি ভেঙে একটা তাল পাকিয়ে গোবরের গাদায় পুঁতে রাখতে বলল। কি একটা অলক্ষণ নাকি দেখা দিয়েছে। আমি তো তাই করতে ছুটলাম, কিন্তু মোমবাতি খুঁজে পেলাম না। জানতাম আমার একটা মোমবাতি ছিল, কিন্তু সেটা হয়ত ছেলেপুলেরা নিয়ে গিয়েছে, নয়ত আরশুলায় খেয়ে ফেলেছে। তারপরেই এল গাব্রিলা, আর তার সঙ্গেই এই দুর্ভোগ। এর আগে তিন

বছর নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে এলাম, আজ দেখ আমার অবস্থা।' আঙুল দিয়ে পেটে খোঁচা মারল সে।

স্বামীর অপেক্ষায় ছটফট করছে পেলাগিয়া, একা একা হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই গল্পগুজব করে শুক্রবারের সন্ধ্যেটা কাটিয়ে দেবার জন্যে পড়শীদের ডেকে পাঠিয়েছে। নাতালিয়া এসেছে একটা অসমাপ্ত মোজা নিয়ে, বসন্ত এলেও ঠাকুর্দার ঠাণ্ডার ভয় কমে নি। অস্বাভাবিক সজীব হয়ে উঠেছে সে, স্বামীর জন্যে উৎকণ্ঠাটুকু সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অন্যের হাসিঠাট্টায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে। পেলাগিয়া বসেছে উনুনের ওপর, নীল শিরতোলা খালি পা-দুটো দোলাচ্ছে, ঝগড়ুটে যুবতী ফ্রোশিয়ার সঙ্গে মসকরা করছে।

—'সোয়ামিটাকে পিটলি কি করে, ফ্রোশিয়া?' পেলাগিয়া জিজ্ঞেস করল।

—'জানো না, কি করে? পিঠে, মাথায়, যেখানে যেখানে হাত চালাতে পারি।'

—'তা বলছি না, বলছি পিটলি কেন?'

—'পিটতে হলো।' অনিচ্ছাভরে ফ্রোশিয়া উত্তর দিল।

—'বলি, সোয়ামিকে যদি অন্য কোন মাগীর সঙ্গে দেখিস, তাহলে কি মুখ বুজে থাকবি?' রোগামত এক স্ত্রীলোক ভেবেচিন্তে প্রশ্ন করল।

—'ব্যাপারটা বল না, ফ্রোশিয়া।'

—'বলবার কিছুই নেই...'

—'ভয়ের কি, এখানে আমরা সবাই ত সই-সয়লা।'

হাতের চেটোয় একটা সূর্যমুখীর বিচির খোসা থু থু করে ফেলে ফ্রোশিয়া হাসল।

—'অনেকদিন থেকেই আমার নজর ছিল ওর গতিবিধির ওপর। একজন এসে খবর দিল, ডনের ওপারের এক খানকি মাগীকে নিয়ে কারখানা ঘরে ঢুকেছে। বেরিয়ে গিয়ে ওদের দেখা পেলাম এক...'

একজন মাঝখানে বাধা দিয়ে নাতালিয়ার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করে বসল : 'তোর সোয়ামির কোন খবর পেলি, নাতালিয়া?'

—'ইয়াগোদনযে আছে।' নাতালিয়া ফিসফিস করে জবাব দিল।

—'ওর সঙ্গেই ঘর করবি ভাবছিস, না কি?'

—'ও হয়ত ভাবতে পারে, কিন্তু গ্রিগর থাকবে না।' বাড়ির কর্ত্রী ফোঁড়ন দিল। নাতালিয়া অনুভব করল, উষ্ণ রক্ত ঠেলে উঠছে তার মুখে। সে মোজার ওপরে ঝুঁকে পড়ল, চোখের পাতার নীচে থেকে মেয়েদের দিকে তাকাল। তাদের কাছ থেকে লজ্জার রক্তচিহ্ন লুকোতে পারবে না জেনেই, ইচ্ছে করেই সে হাঁটুর ওপর থেকে পশমের গুলিটা গড়িয়ে দিল, কিন্তু এমন অনাড়ির মত গড়িয়ে দিল যে, সেটা কারো নজর এড়াল না। তারপর ঠাণ্ডা মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে হাতড়াতে লাগল।

—'গ্রিগরের মুখে থুথু দিস, বুঝলি! ও তোর ঘাড়ের যোয়াল হয়ে থাকবে।' একজন প্রকাশ্যেই দরদ দেখিয়ে উপদেশ দিল।

নাতালিয়ার লোক-দেখানো সজীবতা বাতাসের মুখে আগুনের ফুলকির মতই নিভে গেল। মেয়েদের গল্পের মোড় ঘুরল হালফিল কেচ্ছাকাহিনী, চুটকি-চাট্‌কা আর গুলতানিতে। নাতালিয়া নিঃশব্দে বুনে চলল। আড্ডা না ভাঙা পর্যন্ত জোর করে বসে রইল। তারপর মনে মনে এক অনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত স্থির করতে করতে বাড়ি ফিরে এল। তার এই অনিশ্চিত অবস্থার লজ্জা তাকে আরও এক

খাপ এগিয়ে নিয়ে গেল (কারণ, তখনো সে বিশ্বাস করতে চায় না যে, গ্রিগর তাকে একেবারেই ছেড়ে গিয়েছে; সে তাকে ক্ষমা করতে, তাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে)। গ্রিগর জন্মের মতই চলে গিয়ছে, না তার মনের পরিবর্তন হবে, এই কথা জানবার জন্যে গোপনে তাকে চিঠি পাঠাবার সিদ্ধান্ত করল। বাড়ি ফিরেই নাতালিয়া দেখল, ঠাকুর্দা তার ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে বসে চামড়া দিয়ে বাঁধানো একখানা পুরনো তেলচিটে বাইবেল পড়ছে। বাবা রান্নাঘরে বসে জাল সারছে। মেয়েদের বিছানায় পাঠিয়ে উনুনের ওপরেই মা ঘুমিয়ে পড়েছে। জ্যাকেটটা খুলে নিয়ে নাতালিয়া এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াল। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল ঠাকুর্দার ঘরে, আইকনের নীচে জড়ো করা ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর জিজ্ঞেস করল :

—'তোমার কাছে কাগজ আছে, দাদু?'

—'কি কাগজ রে?' কপালের রেখাগুলো কুঁচকে গ্রীসাকা প্রশ্ন করল।

—'এই লিখবার কাগজ।'

এক স্তবমালা হাতড়ে বুড়ো দুমড়ানো কাগজের একটা টুকরো বার করল, কাগজখানায় ধুনোর তীব্র গন্ধ।

—'পেন্সিল আছে?'

—'তোর বাপকে জিজ্ঞেস কর। এখন যা লক্ষ্মীটি, বিরক্ত করিস নে।'

নাতালিয়া বাবার কাছ থেকে একটা পেন্সিলের টুকরো যোগাড় করে নিল। তার বহুচিন্তিত কথাগুলো কষ্ট করে গাঁথতে গাঁথতে, মনের মধ্যে কুরে কুরে খাওয়া এক অসাড় বেদনা জাগিয়ে তুলে, টেবিলের ধারে এসে বসল।

'গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ্,

'আমি কেমন করিয়া বাঁচিয়া থাকিব, আমার জীবন শেষ হইয়া গেল কিনা, একথা তুমি আমাকে জানাইয়া দিবে কি? তুমি ঘর ছাড়িয়া গেলে, কিন্তু আমাকে একটি কথাও বলিয়া গেলে না। আমি ত তোমার নিকট কোন অপরাধ করি নাই। আমি অপেক্ষা করিয়াছিলাম, তুমি আমার হাতের বাঁধন খুলিয়া দিবে, জানাইয়া দিবে যে, তুমি চিরকালের জন্যই চলিয়া গেলে। কিন্তু তুমি সেই যে গেলে, তাহার পর একেবারেই চুপ করিয়া রহিলে।

'আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি ঝোঁকের মাথায় চলিয়া গিয়াছ, তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলাম, আমি কিন্তু তোমাকে হারাইতে চাহি না। দুইজন অপেক্ষা একজনের জীবন নষ্ট হওয়াই ভাল। দয়া করিয়া অবশেষে একখানা পত্র দিও। তখন বুঝিতে পারিব আমি কি করিব, কিন্তু এখন আমি পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছি।

'খৃষ্টের দোহাই. গ্রীস্‌কা, রাগ করিও না।

'নাতালিয়া।

পরদিন সকালে গেত্‌কাকে ভদ্‌কার লোভ দেখিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ইয়াগোদনয়ে যেতে রাজী করাল। মদের আশায় উন্মনা হয়ে গেত্‌কা উঠোনে ঘোড়াটা বার করে আনল, মিরনকে জিজ্ঞেস না করেই ইয়াগোদনয়ে ছুটল।

গেত্‌কা. ফিরে এল বিকেলের দিকে। চিনির ঠোঙার একটুকরো নীলকাগজ সঙ্গে নিয়ে এল। পকেট থেকে সেটা বার করতে করতে নাতালিয়ার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। বলল :

—'স্বাস্থ্য একেবারে যাচ্ছেতাই। এমন ঝাঁকুনি খেয়েছিলাম যে, পেটের নাড়িভুঁড়ি গুলোনোর জোগাড়।'

চিঠি পড়েই নাতালিয়ার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কাগজের ওপর লেখা অক্ষর চারটে তার বুকের মধ্যে তাঁতের ধারালো দাঁতের মত কেটে কেটে বসল।

'একা একাই থাকিবে। —গ্রিগর মেলেখফ'

নিজের শক্তিকে যেন বিশ্বাস করতে না পেরে নাতালিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মা রাতের জন্যে উনুন ধরাচ্ছিল; ইস্টার রবিবারের সকালের আগেই সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখছিল, যাতে সময়মত দইএর পিঠে তৈরি করে নিতে পারে। মা মেয়েকে ডাকল :

—'নাতালিয়া, আয় একটু হাত লাগা।'

—'মাথা ধরেছে, মা। একটুক্ষণ শুয়ে থাকি।'

দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে মা মন্তব্য করল, 'ভাল সময়েই অসুখ বাধালি।'

নাতালিয়া শুকনো জিভ দিয়ে ঠাণ্ডা ঠোঁটদুটো চাটল, কোন উত্তর দিল না।

॥ আট ॥

গরম পশমীশালে মাথা ঢেকে নাতালিয়া সন্ধ্যে পর্যন্ত শুয়ে রইল, জড়সড় দেহটা মৃদুকম্পনে নড়ে নড়ে উঠতে লাগল। মিরন আর গ্রীসাকা যখন গির্জায় যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে তখন সে উঠে রান্নাঘরে চলে গেল। টেনে আঁচড়ান চুলের গোড়ায় গোড়ায় ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, আর অসুস্থ তেলতেলে এক আবরণে তার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা।

পা-জামার বোতামের লম্বা ঘরগুলো আঁটতে আঁটতে মিরন মেয়ের দিকে তাকাল।

—'হঠাৎ তুই অসুখে পড়লি। আমাদের সঙ্গে গির্জায় চল!'

—'তোমরা যাও। আমি পরে যাচ্ছি।' নাতালিয়া উত্তর দিল।

ওরা চলে গেল। রান্নাঘরে রইল নাতালিয়া আর লুকিনিচ্না। নাতালিয়া সিন্দুক থেকে বিছানা অবধি উদাসীনের মত পায়চারী করতে লাগল। যন্ত্রণাকর কি যেন ভাবতে ভাবতে, ফিসফিস করতে কবতে, সিন্দুকের ভেতরকার স্তূপীকৃত জামা-কাপড়ের দিকে দৃষ্টিহীন চোখে তাকাতে লাগল। মা ভাবল, কোন কাপড়জামা পরবে তাই বুঝি ঠিক করে উঠতে পারছে না। জননীসুলভ মমতায় তাই সে বলল :

—'আমার নীল ঘাঘরাটা তুই পর, লক্ষ্মীটি। তোকে খুব সুন্দর মানাবে, বার করে দেব?'

—'না, আমি এইটে পরছি।' নাতালিয়া সন্তর্পণে সবুজ ঘাঘরাটা টেনে বার করল। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, গ্রিগর যেদিন ভাবীবরের বেশে তাকে দেখতে এসেছিল, আলতো চুমু খেয়ে যেদিন তাকে লজ্জা পাইয়ে দিয়েছিল, সেদিন সে এইটেই পরেছিল। কান্নার তোড়ে থরথর করে ফেঁপে উঠে টেনে-তোলা সিন্দুকেব ডালার ওপর নাতালিয়া উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

—'কি হল রে নাতালিয়া?'

চিৎকার করে উঠবার দুর্দমনীয় আকাঙ্খা দমন করল সে। নিজেকে সামলে নিয়ে প্রাণহীন কর্কশ হাসি হেসে উঠল।

—'শরীর আজ মোটেই ভাল নেই মা।'

—'ওরে নাতালিয়া, আমি বুঝতে পেরেছি...'

—'কি বুঝতে পেরেছ মা?' সবুজ ঘাঘরাটা আঙুলে দুমড়ে অপ্রত্যাশিত বিরক্তিভরে সে চেঁচিয়ে উঠল।

—'তোর মন মেজাজ একেবারেই ভাল নেই। সোয়ামি দরকার তোর।'

—'থাক থাক, ঢের হয়েছে! একটা তো ছিল!'

নাতালিয়া নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল, তারপর তাড়াতাড়ি ফিরে এল রান্নাঘরে। জামাকাপড় পরেই সে এল। কিশোরীর মত তন্বী, মুখে নীলাভ পাণ্ডুরতা, গালে শোকের রক্তচ্ছটা। মা বলল :

—'তুই চলে যা, আমার এখনো হয় নি।'

জামার হাতায় একটা রুমাল গুঁজে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল নাতালিয়া। বাতাসে ভেসে এল ভাসন্ত বরফের গুরু গুরু শব্দ, নাকে এল বরফ-গলার ভ্যাপসা গন্ধ। বাঁ-হাতে ঘাঘরাটা তুলে ধরে, নীল মুক্তোর মত জলের গর্তগুলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে গির্জায় এসে পেঁছিল। পরবের দিনের কথা ভাবতে ভাবতে, সবকিছু আবছা আবছা টুকরো-টাকরা মনে করতে করতে, রাস্তাতেই সে আগেকার সেই অপেক্ষাকৃত মানসিক স্থৈর্য ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার ভাবনা সটান ফিরে গেল বুকের আড়ালে লুকানো চিনির-ঠোঙার নীল কাগজের টুকরোয়: ফিরে গেল গ্রিগর আর সেই পরিতৃপ্ত নারীর কাছে, যে নারী তার উদ্দেশ্যে বিগলিত হাসি হাসছে, হয়ত তাকে করুণাও করছে।

গির্জায় ঢুকতে যেতেই জনকয়েক ছোকরা তার পথ আটকাল। তাদের ঘুরে এগিয়ে গেল সে; শুনতে পেল, তারা ফিসফিস করে আলোচনা করছে।

—'কে মেয়েটা? দেখতে পেলি?'

—'ওইত, নাতালিয়া কোরশুনভ।'

—'লোকে বলে মেয়েটা খচ্চরী বনে গয়েছে। সেইজন্যেই ত ওর স্বামী ফেলে পালিয়েছে।'

—'ও কথা ঠিক নয় রে। শ্বশুরের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করত, খোঁড়া পান্তালিমনের সঙ্গে।'

—'ও, তাই বল! সেইজন্যে গ্রিগর ঘর ছেড়ে পালিয়েছে?'

উঁচুনীচু পাথরে হোঁচট খেতে খেতে নাতালিয়া গির্জার বারান্দায় এসে পেঁছুল। পেছন থেকে কুৎসিৎ গুঞ্জন ভেসে আসছে। বারান্দার ওপর অনেকগুলো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ঘুরে আরেকটা গেটের দিকে এগুতে দেখে মেয়েরা খিলখিল করে হেসে উঠল। মাতালের মত টলতে টলতে নাতালিয়া বাড়ির দিকে ছুটল। দম নিল গেটের সামনে এসে, তারপর ঘাঘরার কোণায় হোঁচট খেতে খেতে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে রক্ত বেরিয়ে এল। আবছা অন্ধকারে চালা ঘরের খোলা দরজাটা হাঁ করে আছে। এক পাশবিক সিদ্ধান্তে শেষ শক্তিটুকু সংহত করে নাতালিয়া দরজার দিকে ছুটে গেল, তাড়াতাড়ি চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। শুকনো খটখটে চালাঘরের ভেতরটা হিমশীতল, ঘোড়ার সাজের কাঁচা চামড়া আর গাদা-করা খড়ের গন্ধ। কিছু না ভেবে, কোন চিন্তা না করে, গভীর এক আর্তিতে—যে আর্তি দাগ কেটেছে তার কলঙ্কমলিন অন্তরাত্মায়—সে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গেল কোণ লক্ষ্য করে। সেখান থেকে হাতল ধরে একখানা কাস্তে তুলে নিল, কাস্তের ফলাটা খুলে

ফেলল (তার ভাবভঙ্গি সুনিশ্চিত ও যথাযথ), তারপর মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে, ভূতের মত পেয়ে-বসা উৎফুল্ল সংকল্পে, ফলাটা গলায় বসিয়ে দিল। অগ্নিদাহের মত, ভয়াবহ যন্ত্রণাবোধ করবার আগেই সে যেন মাথায় বাড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। অনুভব করল, তার মনোগত ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী হয় নি, আর গভীর বেদনায় এইটুকু বুঝতে পেরে সে হাতে পায়ে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল; অবশেষে দুই-হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি (বুকের ওপর রক্ত ঝরতে দেখে ভয় পেয়ে গেল সে) কম্পিত আঙুলে জ্যাকেটের বোতামগুলো ছিঁড়ে ফেলল, তারপর অবাধ্য, কঠিন স্তনকে একপাশে সরিয়ে নিল, অন্য হাতে কাস্তের ফলাটা মেঝের ওপর ঠিক করে ধরল। হাঁটুতে ভর দিয়ে মেটে দেয়ালের কাছে এগিয়ে গিয়ে কাস্তের ফলার ভোঁতাদিকটা দেয়ালের গায়ে বিঁধিয়ে দিল, তারপর হাতদুটো মাথার ওপর তুলে বুকে জোরে জোরে চাপ দিতে লাগল কেবলি সামনের দিকে, কেবলি সামনে .. স্পষ্ট শুনতে পেল, স্পষ্ট অনুভব করল, নরম মাংসের বাধা পড়্ পড়্ করে ফুঁড়ে মাংস কেটে চলেছে। ভয়াবহ যন্ত্রণার একটা ঢেউ বুক থেকে গলা পর্যন্ত উঠে এল, রিন্‌রিন্‌-করা হাজারটা সূচ বিঁধল কানে

রান্নাঘরের দরজায় ক্যাঁচ করে শব্দ উঠল। ধাপগুলোয় পা ঘসে ঘসে লুকিনিচ্না নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। একটানা ঠুকোঠুকি করে ভাসন্ত বরফের পাহাড়ের মত চাঁই-গুলো ডনের ভাটিপথে ভেসে চলেছে। আনন্দোচ্ছল, দুকুল-ছাপানো, মুক্তধারা বরফের ভাঙা শেকল বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে দূরে—বহুদূরে আঝভ্ সমুদ্রের দিকে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

ছ মাসের মুখে, যখন আর গ্রিগরের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তখনই আকসিনিয়া তার গর্ভের কথা স্বীকার করল। এতকাল সে চুপচাপ ছিল কারণ তার ভয় ছিল, হয়ত গ্রিগর বিশ্বাসই করবে না তার সন্তানই সে পেটে ধরেছে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা উত্তেজিতভাবে কথাটা গ্রিগরকে জানাল, আর সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠিত হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, তার মুখে কোন ভাববৈলক্ষণ্য ধরা পড়ে কি না। গ্রিগর কিন্তু ঘুরে জানলার ধারে চলে গেল, বিরক্তিভরে একটু কাশল। তারপর প্রশ্ন করল :

—'আগে বলো নি কেন আমায়?'

—'বলতে ভয় করছিল, গ্রিগর। ভেবেছিলাম হয়ত তাড়িয়ে দেবে আমাকে।'

বিছানার পেছন দিকটায় আঙুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে গ্রিগর জিজ্ঞেস করল :

—'শিগ্গীরই হবে নাকি?'

—'মনে হচ্ছে, আগস্টের প্রথম দিকে।'

—'স্তেপানের নাকি?'

—'না না, এ তোমার।'

—'তা তো বলবেই।'

—'তুমিই ভেবে দেখ না, সেই যে কাঠ-কাটার দিন থেকে এ পর্যন্ত...'

—'—মিছে কথা বলো না, আকসিনিয়া। স্তেপানেরও যদি হয়, এখন তুমি যাবে কোথায়?'

রাগে আকসিনিয়া কেঁদে ফেলল; বেঞ্চিতে বসে পড়ে উত্তেজিতভাবে একটানা ফিসফিস করে বলে চলল :

—'এতকাল ওর সঙ্গে ছিলাম, এপর্যন্ত কিছুই তো হয় নি। তুমিই ভেবে দেখ! আমার রোগভোগও নেই শরীরে... নিশ্চয়ই তোমার থেকে হয়েছে... আর তুমি...'

এ নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্যই করল না গ্রিগর। আকসিনিয়ার সম্পর্কে এক উদ্বিগ্ন নিস্পৃহতার তন্তুজাল, আর হাল্কা কৌতুকমাখা করুণার ভাব তার মনে বাসা বাঁধল। নিজেকে গুটিয়ে নিল আকসিনিয়া। কোনরকম দয়া সে চায় না। গ্রীষ্মের পর থেকেই নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে তার জৌলুষ, কিন্তু গর্ভের ফলে অতিসামান্যই ক্ষতি হয়েছে তার তন্বীদেহরেখার, তার দেহসৌষ্ঠব প্রকৃত অবস্থা গোপন করে রেখেছে। অনায়াসেই সে রান্নাবান্নার কাজ চালিয়ে নিতে লাগল, কারণ, বিশেষ করে সেই বছরে ক্ষেতের কাজে খুব কম মুনিষ খাটান হচ্ছে।

॥ দুই ॥

বসন্তকালের শিক্ষা-শিবিরের দায় থেকে গ্রিগরের মুক্তির ব্যবস্থা করে দিল ইউজেনে; গ্রিগর ফসল কাটার কাজে লেগে গেল, মাঝে মাঝে বুড়ো লিস্তনিৎস্কিকে গাড়ি হাঁকিয়ে জেলা শহরে নিয়ে যেতে লাগল, আর বাদবাকি সময় তার সঙ্গে তিতির শিকার করে কাটাতে লাগল। সহজসাধ্য আয়েসের জীবন গ্রিগরকে নষ্ট করে ফেলতে লাগল। সে আলসে, মোটা হয়ে পড়ল, বয়সের চেয়ে বুড়ো দেখায় তাকে। শুধু ভবিষ্যতের ফৌজী-বেগারের চিন্তাতেই তার যা কিছু উদ্বেগ। ঘোড়া নেই, সাজসরঞ্জামও নেই, বাবার কাছ থেকে কিছু পাবার আশাও তার নেই। তার আর আকসিনিয়ার প্রাপ্য মাইনেটা জমাতে লাগল, কিছুই খরচ করল না, এমন কি তামাকও কিনল না। আশা রইল, বাবার কাছে না চেয়েও তাই দিয়ে ঘোড়া কিনতে পারবে। বুড়ো লিস্তনিৎস্কিও তাকে সাহায্য করবে কথা দিয়েছে। বাবা যে তাকে সাহায্য করবে না, তার এই ধারণা অতিসত্বর পাকাপাকি হয়ে গেল। জুন মাসের শেষ দিকে পিয়োত্রা দেখা করতে এল ভাইএর সঙ্গে; কথায় কথায় জানাল, বাবা আগের মতই তার ওপর চটে আছে, ঘোড়া দিয়ে কিছুতেই সাহায্য করবে না বলে দিয়েছে। বলেছে, 'স্থানীয় কর্তাদের কাছ থেকে ঘোড়া আনুক সে।'

—'তাঁর ভাবনার কারণ নেই, আমার নিজের ঘোড়া নিয়েই আমি যাব।' গ্রিগর বলে উঠল। 'আমার নিজের' কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিল।

—'পাবি কোথায় শুনি?' পিয়োত্রা জিজ্ঞেস করল।

—'ভিক্ষে করব, নেচে যোগাড় করব, তাতেও যদি না হয়, চুরি করব।'

—'বাহাদুর ছেলে!'

—'আমার মাইনে দিয়েই একটা ঘোড়া কিনব।' গ্রিগর আরও গম্ভীর হয়ে বলল।

সিঁড়ির ওপর বসে, গোঁফের ডগা চিবুতে চিবুতে পিয়োত্রা গ্রিগরের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হলে, যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে ভাইকে বলল :

—'তোর কিন্তু ফিরে আসা উচিৎ। দেয়ালে মাথাঠুকে মরার কোন মানে হয় না।'

—'ফিরে যাবার ইচ্ছে আমার নেই।'

—'ওর সঙ্গেই থাকার কথা ভাবছিস নাকি?'

—'কার সঙ্গে?'

—'ওই ত, ও।'

—'আপাতত আছি, কিন্তু কি হয়েছে তাতে?'

—'না, এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

দাদাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে গ্রিগর জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না : 'বাড়ির সব কেমন আছে?'

সিঁড়ির রেলিং থেকে ঘোড়াটা খুলে নিতে নিতে পিয়োত্রা হাসল।

—'খরগোশের যেমন অনেক গর্ত, তোরও ত তেমনি অনেক বাড়ি! সবই ভাল। মা তোকে ভীষণ দেখতে চায়। খড় পেয়ে গেছি, গাড়ি তিনেক হবে।'

পিয়োত্রা যে মাদী ঘোড়ার পিঠে চড়তে যাচ্ছিল সেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে গ্রিগর জিজ্ঞেস করল :

—'এবার বাচ্চা দেবে না?'

—'না, হে, ওটা বাঁজা। কিন্তু ক্রিস্তোনিয়ার কাছ থেকে যেটা কিনেছিলাম, সেটার বাচ্চা হয়েছে। মন্দা, ভারী সুন্দর। পাগুলো বড় বড়, শক্ত গোড়ালি, শক্ত দাবনা। জব্বর ঘোড়া হবে।'

গ্রিগর দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল : 'গ্রামের জন্যে বড্ড মন কেমন করে। মন কেমন করে ডনের জন্যে। এখানে স্রোত চোখে পড়ে না কোথাও। কাঠ-খোট্টা জায়গা এটা।'

—'আয় না, দেখেশুনে যা আবার।' ঘোড়ার মাংসল পিঠে লাফিয়ে উঠতে উঠতে পিয়োত্রা উত্তর দিল।

—'যাব একদিন।'

—'আচ্ছা, চলি।'

—'ভালোয় ভালোয় চলে যাও।'

উঠোন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল পিয়োত্রা, হঠাৎ কি মনে পড়ায় চেঁচিয়ে গ্রিগরকে ডাকল। গ্রিগর তখনো সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে।

—'ভুলেই গিয়েছিলাম... নাতালিয়া... একটা কাণ্ড করেছে।'

বাতাস ঘুরপাক খাচ্ছে গোলাবাড়ির চারপাশে, শেষের কথাগুলো গ্রিগরের কান থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। চকচকে ধুলোর আস্তরণে পিয়োত্রা আর তার ঘোড়াটা ঢাকা পড়ে গেল। কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গ্রিগর আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল।

॥ তিন ॥

শুকনো খটখটে গ্রীষ্ম। বৃষ্টি পড়ে ক্বচিৎ কখনো। তাড়াতাড়ি ফসল পেকে উঠল। রাই গোলাজাত করতে না করতে যব পেকে উঠল, হলুদ রং ধরলো। চারজন মুনিষ আর গ্রিগর বেরুল ফসল কাটতে।

সেদিন আকসিনিয়া সকাল সকাল কাজ সারল। গ্রিগরকে বলল তাকে সঙ্গে নিতে। হাজার বারণ করা সত্ত্বেও আকসিনিয়া তাড়াতাড়ি মাথায় রুমাল বেঁধে বাইরে ছুটে এলো। যে গাড়িতে মুনিষরা মাঠে চলেছে, সেই গাড়িতে চড়ে বসল।

তীব্র আকাঙক্ষা আর উৎফুল্ল অধৈর্যে আকসিনিয়া আগেভাগেই যে ঘটনা অনুমান করেছিল, যার জন্যে শঙ্কিত হয়ে গ্রিগর অপেক্ষা করছিল, সেই ঘটনাই ঘটে গেল ফসল কাটতে কাটতে। কয়েকটা লক্ষণ বুঝতে পেরেই নিড়নিটা ফেলে দিয়ে আকসিনিয়া ফসলের গাদার নীচে শুয়ে পড়ল। অতিদ্রুত তার প্রসববেদনা উঠল। কালসিটে-মারা নীল জিভটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে চিৎ হয়ে শুয়ে রইল সে। মাড়াইকলের সঙ্গে সঙ্গে মুনিষরা তার পাশ দিয়ে এক চক্কর ঘুরে গেল; একজন যেতে যেতে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, এই? অমন বিশ্রীভাবে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছ। উঠে পড়, নইলে গলে জল হয়ে যাবে'

গ্রিগর মাড়াইকলে তার জায়গায় একজনকে লাগিয়ে সোজা তার কাছে চলে এল। জিজ্ঞেস করল :

—'কি? হল কি?'

আকসিনিয়ার ঠোঁটদুটো কুঁচকে কুঁচকে উঠছে, বারণ মানছে না। কর্কশকণ্ঠে সে বলে উঠল :

—'আমার ব্যথা উঠেছে...'

—'তখনই আসতে বারণ করেছিলাম, খচ্‌ড়ি মাগী। কি করি এখন?'

—'রাগ করো না, রাগ করো না, গ্রীস্‌কা... আঃ... আঃ... গ্রীস্‌কা গাড়িতে ঘোড়া যোতো। বাড়ি যাবো... এখানে কি করে হবে?... এইসব ব্যাটাছেলেদের সামনে।' তীব্র যন্ত্রণার লৌহ-বেষ্টনীতে আকসিনিয়া আর্তনাদ করে উঠল।

গ্রিগর ঘোড়া আনতে ছুটল। একটু দূরে একটা গর্তের ভেতরে ঘোড়াটা চরছিল। ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে আসতেই আকসিনিয়া চার হাতপায়ে ভর দিয়ে উঠে পড়ল, ধুলোমাখা যবের গাদার মধ্যে মাথা গুঁজে দিল; যন্ত্রণার চোটে যবের খোঁচাখোঁচা রোঁয়াগুলো চিবিয়েছিল, তাই থু থু করে ফেলতে লাগল। গ্রিগর আসতেই বিস্ফারিত দুই চোখের শূন্যদৃষ্টি তুলে ধরল। তার ভয়াবহ, বুক কাঁপানো আর্তনাদ যাতে মুনিষদের কানে না যায়, তারই জন্যে দুমড়ানো রুমালটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রইল।

তাকে পাঁজাকোলা করে গাড়িতে তুলে নিল গ্রিগর, তারপর বাড়ির দিকে জোরসে ঘোড়া ছোটাল।

—'আঃ, অত জোরে না...আঃ, মলাম আমি, তুমি...ঝাঁকাচ্ছো...আমি...' গাড়ির পাটাতনে মাথাটা ধাক্কা খেতেই আকসিনিয়া আর্ত চিৎকার করে উঠল।

গ্রিগর নিঃশব্দে চাবুক হাঁকড়াতে লাগল, একবারও তার দিকে পেছনে না তাকিয়ে মাথার চারপাশে লাগামটা ঘোরাতে লাগল। হাত দিয়ে গালদুটো চেপে ধরে আকসিনিয়া গাড়ির ভেতরে ছিটকে ছিটকে উঠতে লাগল, তার আতঙ্কিত, বিস্ফারিত চোখদুটো কাঁটার মত ঘুরতে লাগল। ঝাঁকুনির চোটে এবড়োখেবড়ো রাস্তায় গাড়ির এধার থেকে ওধারে গড়াতে লাগল। ঘোড়াটাকে কদমেই ছুটিয়ে রাখল গ্রিগর। মুহূর্তের জন্যে আকসিনিয়ার প্রাণান্তকর আর্তনাদ বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ির চাকা ঘড় ঘড় শব্দ করে চলল, আকসিনিয়ার মাথাটা গাড়ির পাটাতনে দমাস দমাস করে আছাড় খেতে লাগল। প্রথমদিকে তার স্তব্ধতা গ্রিগরের মনে কোন ভাবান্তর জাগালো না, কিন্তু পরে, কি ভেবে পেছনে তাকাল। ভয়াবহ, কুঞ্চিত মুখে আকসিনিয়া শুয়ে আছে, গালদুটো সবলে গাড়ির গায়ে চেপে ধরছে, চোয়ালদুটো ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে। ভুরু থেকে গলগল করে ঘাম ঝরছে গর্তে ঢোকা চোখের মধ্যে। গ্রিগর ঘুরে ঘাড়টা উঁচু করে ধরল, দুমড়ান টুপিটা ঘাড়ের নীচে গুঁজে দিল। আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে আকসিনিয়া জোর গলায় বলে উঠল :

—'আমি মরে যাব, গ্রীস্‌কা। আর সবকিছু শেষ হয়ে যাবে সেই সঙ্গে!'

গ্রিগর থরথর করে কেঁপে উঠল, মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত একটা হিম-স্রোত বয়ে গেল। হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে উঠে সে উৎসাহ আর সান্ত্বনার ভাষা খুঁজতে লাগল, কিন্তু ভাষা খুঁজে পেল না। কম্পিত ঠোঁট থেকে বেরিয়ে এল :

—'দূর বোকা, মিছে কথা।' গ্রিগর মাথা ঝাঁকাল। আকসিনিয়ার ওপর ঝুঁকে পড়ে তার পায়ে বে-খাপ্পাভাবে চাপ দিল।

—'আকসিনিয়া, লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার!'

মুহূর্তের জন্যে আকসিনিয়ার ব্যথা কমে গেল। কিন্তু তারপরেই ফিরে এল দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে। পেটের নীচে কিসে যেন ছিঁড়ে ফেলছে, কি যেন বেঁকে বেঁকে উঠছে, তারই যন্ত্রণায় আকসিনিয়া অবর্ণনীয়, ভয়াবহ এক আর্তনাদে গ্রিগরের কানে তালা লাগিয়ে দিল। গ্রিগর ঘোড়াটাকে পাগলের মত চাবুক কসিয়ে দিল।

—'উঃ ... আঃ ...' আকসিনিযা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করেই চলল।

তারপর চাকার ঘড়ঘড়ানি ছাপিযে গ্রিগর তখনি আকসিনিয়ার ক্ষীণ আর্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল :

—'গ্রীস্‌কা!'

ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে ঘাড় ফেরাল গ্রিগর। হাত দুখানা ছড়িয়ে রক্তের গঙ্গায় আকসিনিয়া শুয়ে আছে, তার ঘাঘরার নীচে, দুই উরুর মাঝখানে সাদা আর গোলাপী জীবন্ত কি একটা নড়াচড়া করছে। পাগলের মত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল গ্রিগর, পেছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। আকসিনিয়ার টেনে টেনে দম নেওয়া, হাঁ-করা মুখের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা কথা শুনতে পেল; শোনার চাইতে কথাগুলো যেন অনুমানই করে নিল :

—'দাঁত দিয়ে নাড়িটা কেটে ফেল ... সুতো দিয়ে বেঁধে দাও ... সার্টের সুতো দিয়ে...'

গ্রিগর কম্পিত আঙুলে সুতির সার্টের হাতা থেকে একগোছা সুতো ছিঁড়ে নিল; তারপর চোখ কুঁচকে, যতক্ষণ না চোখদুটো টনটন করে ওঠে, দাঁত দিয়ে নাড়ি কাটল। রক্তাক্ত অংশটুকু অতি সন্তর্পণে সুতো দিয়ে বাঁধল।

॥ চার ॥

এক প্রশস্ত উপত্যকায় ইয়াগোদনয়ের জমিদার বাড়ি। দিক পরিবর্তন করে করে উত্তর কিংবা দক্ষিণ থেকে বাতাস বয়, গ্রীষ্ম এগিয়ে আসে উপত্যকায়, শরত তার ঝরা-পাতার মর্মরধ্বনি তোলে, শীত হানা দেয় তুষার-ঝড় আর বরফের সৈন্যবাহিনী নিয়ে; কিন্তু এক প্রাণহীন, আচ্ছন্নতায় ডুবে থাকে ইয়াগোদনয়ে। উঁচু পাঁচিল বহির্জগৎ থেকে জমিদার বাড়িটাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, তার ওপর দিয়ে এমনি করেই দিনগুলো উঁকি মেরে যায়।

গোলাবাড়ির উঠোনটা লাল-চোখো কালো হাঁসের কলরবে সর্বক্ষণই মুখর। বৃষ্টির ধারার মত চীনে মোরগের পাল ছটফটিয়ে বেড়ায়। আস্তাবলের ছাদ থেকে কর্কশকণ্ঠে বিচিত্রবর্ণের ময়ূর ডাকে। বুড়ো জেনারেল সব রকমের পাখি পোষে, এমন কি একটা খোঁড়া সারসও আছে। নভেম্বর মাসে দক্ষিণে উড়ে-চলা বুনো সারসের ডাক শুনে সেটা বুক ফাটানো আর্ত চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু তার উড়বার সাধ্য নেই; একটা ডানা অকেজো হয়ে একপাশে ঝুলে থাকে। সারসটা গলা লম্বা করে, মাটি ছেড়ে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করে; জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে দেখতে বুড়ো হো হো করে হেসে ওঠে। তার সেই অট্টহাসি তামাকের ধোঁয়ার মেঘের মত খালি ঘরের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে মরে।

গ্রিগর যতদিন ইয়াগোদনয়ে আছে, তার মধ্যে মাত্র দুটো ঘটনা এই একঘেয়ে, তন্দ্রাচ্ছন্ন জীবনে চাঞ্চল্য এনেছে : আকসিনিয়ার সন্তান হওয়া আর রাজহাঁসটা হারিয়ে যাওয়া। নবজাত শিশু-কন্যাটির আবির্ভাবে সব বাসিন্দাই অতিদ্রুত ধাতস্থ হয়ে গিয়েছে। মাঠের মধ্যে রাজহাঁসটার পালক পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল, তার ফলে সবাই ধরে নিয়েছে খেঁকশেয়ালেই রাজহাঁসটাকে খেয়েছে। ডিসেম্বর মাসের একদিন গ্রিগরের ডাক এল ভিয়েসেনস্কার জেলা-দপ্তর থেকে। সেখানে তাকে ঘোড়া কিনবার জন্য দেওয়া হল একশ রুবল, বলে দেওয়া হল বড়দিনের দুদিন পর ফৌজে নাম-লেখানোর জন্যে মানকোভো গ্রামে হাজির হতে হবে।

বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই ইয়াগোদনয়ে ফিরল গ্রিগর। বড়দিন তো এসে পড়ল বলে, কিন্তু কিছুই তৈরি নেই তার। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যা পেয়েছে তার সঙ্গে নিজের জমান টাকা দিয়ে একটা ঘোড়া কিনতে হল একশ চল্লিশ রুবলে। সাশ্‌কাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রিগর কিনল সবাইকে দেখানোর মত বেশ ভাল একটা লালচে-বাদামি, বছর-ছয়েকের ঘোড়া। ঘোড়াটার যা খুঁত তা চোখে পড়ার মত নয়। আঙুল দিয়ে দাড়ি আঁচড়াতে আঁচড়াতে বুড়ো সাশ্‌কা বলল :

—'এর চেয়ে আর সস্তায় পেতে না হে! কর্তাদের চোখে ধরা পড়বে না খুঁত! ওঁরা তেমন হুঁসিয়ার নন!'

ঘোড়াটার চাল বুঝবার জন্যে খালি পিঠে চড়েই গ্রিগর ইয়াগোদনয়ে ফিরে এল।

বড়দিনের এক সপ্তাহ আগে পান্তালিমন অপ্রত্যাশিতভাবে হাজির হল ইয়াগোদনয়ে। আঙ্গিনার ভেতরে না ঢুকে, গেটের কাছেই ঘোড়া ও স্লেজ বেঁধে রাখল, দাড়ি থেকে

বরফের টুকরো ঝাড়তে ঝাড়তে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঢুকল চাকরদের মহলে। জানলা দিয়ে বাপকে আসতে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে গ্রিগর বলে উঠল :

—'আরে, আমি ... বাবা যে!'

কি জন্যে যেন আর্কাসিনিয়া ছুটে গেল দোলনার কাছে, বাচ্চাটাকে ঢেকে দিল। ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ছড়িয়ে ঘরে ঢুকল পান্তালিমন। তে-কোণা টুপিটা খুলে নিয়ে আইকনকে ক্রশ করল, তারপর ধীরে ধীরে ঘরের চারধারে চোখ বুলাতে লাগল।

—'ভাল আছিস তো!' ছেলেকে সম্বোধন করল পান্তালিমন।

—'তুমি ভাল আছ, বাবা!' বেঞ্চ থেকে উঠে ঘরের মাঝখানে পা বাড়াতে বাড়াতে উত্তর দিল গ্রিগর।

পান্তালিমন বরফের মত ঠাণ্ডা হাতটা বাড়িয়ে দিল, ভেড়ার চামড়াটা গায়ে জড়িয়ে বেঞ্চের ধারিতে বসল। আর্কাসিনিয়ার দিকে তাকাবে না সে। জিজ্ঞেস করল :

—'ফৌজের জন্যে তৈরি হচ্ছিস?'

—'নিশ্চয়ই।'

চুপ করে রইল পান্তালিমন; গ্রিগরের দিকে স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

—'তোমার জামাকাপড় ছাড়, বাবা, সামোভারটা জ্বালাই।'

—'কিচ্ছু দরকার নেই।' কোট থেকে একটা কাদার দাগ নখ দিয়ে খুঁটে তুলল বুড়ো, তারপর আবার বলল : 'তোর জিনিসপত্তর নিয়ে এসেছি—দুটো কোট, একটা জিন, আর পা-জামা। স্লেজের ভেতরে আছে।'

বাইরে চলে গেল গ্রিগর, স্লেজ থেকে জিনিসপত্তর বোঝাই বোরা নিয়ে এল দুটো। ফিরে আসতেই বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ল পান্তালিমন। ছেলেকে জিজ্ঞেস করল :

—'কবে যাচ্ছিস?'

—'বড়দিনের পরের দিন। এক্ষুনি উঠছ, বাবা?'

—'তাড়াতাড়ি ফিরতে চাই আমি।'

গ্রিগরের কাছ থেকে বিদায় নিল পান্তালিমন। আর্কাসিনিয়ার দিকে তখনো না তাকিয়ে দরজার দিকে এগিযে গেল। দরজার খিলটা তুলেই চোখ ফেরালো দোলনার দিকে, বলল :

—'তোর মা আশীর্বাদ জানিয়েছে। পায়ের ব্যথায় এখন বিছানায় পড়ে।' একটু-ক্ষণ চুপ করে থেকে জোর দিয়ে বলে উঠল : 'মানকোভোয় তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব আমি। আসব যখন, তৈরি থাকিস।'

হাতেবোনা গরম দস্তানায় হাত ঢুকিয়ে বেরিযে গেল সে। এমনভাবে হেনস্থ করায় ফ্যাকাসে হয়ে রইল আর্কাসিনিয়া, কিছু বলল না। মেঝের পাটাতনের একখানা কাঠ কিচ্‌কিচ্‌ আওযাজ করে, সেই কাঠখানাকে এড়িয়ে, বাপের পেছন পেছন চলল গ্রিগর। পাশ দিয়ে যাবার সময় আড়চোখে একবার আর্কাসিনিয়ার দিকে তাকাল।

॥ পাঁচ ॥

বড়দিনের দিন গ্রিগর তার মনিবকে নিয়ে গেল ভিয়েশেনস্কায়। লিস্তনিৎস্কি উপাসনায় যোগ দিল, সকালের খাবার খেল তার সম্পর্কিত ভাই, এক স্থানীয় জমিদারের বাড়িতে, তারপর ফেরবার জন্যে শ্লেজ জুড়তে হুকুম করল গ্রিগরকে। তখনও ঝোলের বাটিটা শেষ হয়নি গ্রিগরের তবু তৎক্ষণাৎ সে উঠে পড়ল। আস্তাবলে গিয়ে ছাই-রঙা দুলকি ঘোড়াটা হালকা শ্লেজে জুড়ে নিল।

গা শিরশির করা গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ বাতাসে উড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে ফোয়ারার মত; আঙ্গিনার ওপর চাপাগর্জন করে ঘুরপাক খেয়ে গেল রুপোলি ফেণা; বেড়ার পেছনে, গাছের ওপরে ঝুলছে নরম, ঢেউতোলা জমাট বরফ-কণা। বাতাসে আছড়ে ফেলল সেই জমাট বরফ-কণা; মাটিতে পড়ে ছড়িয়ে যেতেই সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত হয়ে উঠল নানা রঙের অপূর্ব বৈচিত্র্য। ছাদের ওপরে, ধোঁয়ার চোঙার কাছে বসে দাঁড়কাকগুলো নিরুত্তেজ কণ্ঠে কলরব করছিল। পায়ের শব্দ পেতেই তারা উড়ে গেল, পায়রা-রঙা হালকা বরফের মত বাড়ির চারধারে চক্কোর দিয়ে তারপর চলে গেল পূবে গির্জার দিকে, ভোরের বেগুনে আকাশে স্পষ্ট হয়ে উঠল তাদের দেহরেখা।

সিঁড়ির ওপরে এসে দাঁড়িয়েছিল যে ঝিটি তাকে চেঁচিয়ে গ্রিগর বলল, 'কর্তাকে বলো, আমরা তৈরি।'

লিস্তনিৎস্কি বেরিয়ে এসে শ্লেজের ভেতরে ঢুকল। ফার-কোটের কলারে তার জুলপিদুটো ঢাকা। গ্রিগর তার পাদুটো ঢেকে নিয়ে জরাজীর্ণ নেকড়ের চামড়াটায় বোতাম লাগিয়ে দিল।

দু ঘণ্টায় ইয়াগোদ্নয়ে পেঁাছে গেল তারা। শ্লেজ থামানোর জন্যে মাঝে মাঝে গ্রিগরের পিঠে টোকা দেওয়া এবং পাকিয়ে নিয়ে সিগারেট ধরান ছাড়া লিস্তনিৎস্কি গ্রিগরের সঙ্গে কোন কথাবার্তাই বলল না। কেবল পাহাড় থেকে বাড়ির দিকে নামবার মুখে জিজ্ঞেস করল :

—'ভোরেই যাবে?'

বসা অবস্থাতেই একটু পাশ ফিরল গ্রিগর, অতিকষ্টে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া ঠোঁট-দুটো ফাঁক করল। জিবটা টনটন করছে, ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে দাঁতের পেছনে গিয়ে ঠেকেছে। কোন রকমে উত্তর দিল :

—'হ্যাঁ।'

—'সব টাকা পেয়েছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার বৌএর জন্যে ভেবো না; ভালই থাকবে সে। সত্যিকারের সেপাই হওয়া চাই; তোমার ঠাকুর্দা ছিল সাচ্চা কসাক, ঠাকুর্দা আর বাপের মান যাতে থাকে এমনভাবে চলবে, ফিরবে। ১৮৮৩ সালে সম্রাটের পরিদর্শনের সময় কসরতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল তোমার বাবা, তাই না?'

—'হ্যাঁ, আমার বাবা।'

—'বেশ, বেশ!' বলেই বুড়ো শেষ করল। তার গলার স্বর কঠোর শোনাল, যেন গ্রিগরকে সে সতর্ক করে দিল। তারপর আর একবার ফার-কোটে মুখ ঢাকল।

আঙিনায় পেঁাছে সাশ্‌কার হাতে ঘোড়াটা গছিয়ে দিল গ্রিগর, এগুলো চাকরদের মহলের দিকে।

—'তোমার বাবা এসেছে।' পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল সাশ্‌কো।

গ্রিগর দেখতে পেল পান্তালিমনকে, টেবিলের সামনে বসে জেলি খাচ্ছে। বাপের ফুটিফাটা মুখের দিকে তাকাতেই সিদ্ধান্ত করে নিল, মাতাল হয়েছে বাবা। পান্তালিমন চেঁচিয়ে উঠল :

—'তাহলে ফিরে এলে, সিপাইজি!'

—'একদম জমে গিয়েছি,' দুই হাত চাপড়াতে চাপড়াতে উত্তর দিল গ্রিগর। আর্কাসিনিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'মাথার ঢাকাটা খোলো ত, ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গিয়েছে আঙুলগুলো, পারছি নে।'

এবারে তার বাপ অনেক নরম সরম। যেন সে-ই বাড়ির কর্তা, এমন চট্‌পট্‌ আর্কাসিনিয়াকে বলল :

—'আরও খানকয়েক রুটি কাট তো।

খাওয়া শেষ হতেই টেবিল ছেড়ে উঠল সে, আঙিনায় দাঁড়িয়ে তামাক টানবার জন্যে দরজার দিকে এগুলো। দোলনার পাশ দিয়ে যাবার সময় একবার কি দুবার দোলা দিয়ে দিল, এমন ভাণ করল, যেন ব্যাপারটা আকস্মিক, জিজ্ঞেস করল :

—'ছেলে?'

—'মেয়ে।' গ্রিগরের হয়ে উত্তর দিল আর্কাসিনিয়া; বুড়োর মুখে অ-খুশির ভাব ফুটে উঠতেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল :

—'এত মোটাসোটা! ঠিক গ্রীস্‌কার মত!'

কাঁথা-কাপড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসা লাল ছোট্ট মাথাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল পান্তালিমন, তারপর বলে উঠল :

—'আমাদেরই তো রক্ত...! আরে, তুই...!'

তার গলার স্বরে গর্বের ছোঁয়া যে নেই, তা নয়। গ্রিগর জিজ্ঞেস করল :

—'কিসে এলে, বাবা?'

—'ঘুড়ীটা আর পিয়োত্রার ঘোড়াটা নিয়ে।'

—'একটা আনলেই পারতে, আমারটা চড়েই মানকোভায় যেতে পারতাম।'

—'ওটা খালিই চলুক বেশ ভাল ঘোড়া ওটাও।'

একই চিন্তায় বিব্রত দুজনে, তাই এটা ওটা নিয়ে কথা চলতে লাগল দুজনের। আর্কাসিনিয়া তাদের কথার মধ্যে এল না কিন্তু বসে রইল বিছানার ওপর। মেয়েটা হবার পর থেকে চোখে পড়বার মত মোটাসোটা হয়েছে সে, আর পেয়েছে এক নতুন বিশ্বাস-দৃঢ় সুখী সুখী ভাব।

বিছানায় শুতে রাত হয়ে গেল অনেক। গ্রিগরকে আঁকড়ে ধরে শুতেই চোখের জলে সার্ট ভিজিয়ে দিল আর্কাসিনিয়া।

—'তোমার জন্যে কেঁদে কেঁদেই মরে যাব আমি। তোমাকে ছেড়ে থাকব কেমন করে? রাত কাটাব কেমন করে... খুকি জেগে থাকবে... ভাবো তো, গ্রীস্‌কা! চার বছর!'

—'লোকে বলে, আগেকার দিনে ফৌজে থাকতে হত পঁচিশ বছর।'

—'আগেকার দিন দিয়ে দরকার কি আমার? আমি ত বলি, চুলোয় যাক ফৌজ।'

—'আমি ছুটি নিয়ে বাড়ি আসব।'

—'ছুটি নিয়ে!' আর্তনাদ করে উঠল আকসিনিয়া, নাক ঝাড়ল সায়ায়। 'অনেক কিছুই ওলট্‌পালট্‌ হয়ে যাবে ততদিনে।'

—'অত প্যান প্যান করো না! তুমি যেন ভাদুরে বৃষ্টি, জল ঝরছে তো ঝরছেই।'

—'তোমার যদি আমার মত অবস্থা হত।' আকসিনিয়া পাল্টা জবাব দিল।

॥ ছয় ॥

ভোরের কিছু আগে ঘুমিয়ে পড়ল গ্রিগর। আকসিনিয়া উঠে বাচ্চাটাকে খাওয়াল, তারপর আবার শুয়ে পড়ল। কনুইয়ে ভর দিয়ে নিস্পলকচোখে তাকিয়ে রইল গ্রিগরের মুখের দিকে, তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দেখল। তাকে নিয়ে কুবান চলে যাবার জন্য গ্রিগরকে পীড়াপীড়ি করেছিল, মনে পড়ল সেই রাতের কথা : সেদিনকার মতই জানলার বাইরে উঠোনে চাঁদের আলোর বান ডেকেছে। এমন করে শুয়ে ছিল দুজনে সেদিন, গ্রিগর ছিল আজকের একই গ্রিগরই, তবু ঠিক এক নয়। তাদের দুজনের পেছনেই পড়ে আছে বিগত দিনের মাড়িয়ে আসা সুদীর্ঘ পথ।

গ্রিগর পাশ ফিরল, ওল্‌শান্‌স্কি গ্রামের নাম করে কি যেন বলল বিড়বিড় করে, তারপর আবার চুপ করে গেল। ঘুমোবার চেষ্টা করল আকসিনিয়া, কিন্তু ভাবনাচিন্তায় ঘুম উড়ে গেল বাতাসের মুখে আলগা খড়ের মত। সকাল পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে সে বিড়্‌বিড়্‌ করে বলা গ্রিগরের কথাগুলো ভাবতে লাগল, মানে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করল সে। জানলার ভেতর দিয়ে দিনের সামান্যতম আলো উঁকি মারতেই জেগে উঠল পান্তালিমন, হাঁক দিল :

—'গ্রিগর, উঠে পড়!'

খেয়ে দেয়ে পোঁটলা পুঁট্‌লি বাঁধতে বাঁধতেই পুরোপুরি সকাল হয়ে গেল। ঘোড়া যুততে গেল পান্তালিমন, আর আকসিনিয়ার কামনাতপ্ত চুম্বন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গ্রিগর চলে গেল সাশ্‌কা আর চারক-বাকরদের কাছ থেকে বিদায় নিতে।

গরম কাপড়ে ঢেকেঢুকে মেয়েটিকে বাইরে নিয়ে এল আকসিনিয়া শেষ বিদায় দিতে। মেয়ের ছোট্ট ঠাণ্ডা কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে ঘোড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াল গ্রিগর। ঘোড়ার গায়ে হাত দিতেই বাপ ডাকল :

—'শ্লেজে আয়।'

—'না, আমার ঘোড়া চড়েই যাব।'

গ্রিগর ধীরে সুস্থে ভেবে চিন্তে জিন কসল, ঘোড়ায় চাপল, হাতে লাগামটা গুটিয়ে নিল। আর একবার আকসিনিয়া বলল :

—'দাঁড়াও, গ্রীস্‌কা... আমার কিছু বলবার আছে...' তারপর ভুরু কুঁচকে মনে করবার চেষ্টা করল, কথাটা কি।

—'ঠিক আছে, চলি।... মেয়েটাকে দেখো... চলি এবার; বাবা এর মধ্যেই কতদূর এগিয়ে গেছে দেখো।'

—'একটু দাঁড়াও গো!' বাঁ হাত দিয়ে বরফের মত ঠাণ্ডা লোহার রেকাব চেপে ধরল আকসিনিয়া, ডান হাতে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আছে মেয়েটাকে; পলকহীন দুই চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, জল মুছবার হাত খালি নেই তার।

সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়াল বেনিয়ামিন, ডেকে বলল :

—'গ্রিগর, কত্তা ডাকছেন তোমাকে।'

গালাগাল দিয়ে উঠল গ্রিগর, চাবুকটা দোলাল, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল আঙিনা ছেড়ে। জড়ো করা বরফে হোঁচট খেতে খেতে পেছনে পেছনে ছুটল আকসিনিয়া।

বাপকে ধরে ফেলল পাহাড়ের চুড়োয় এসে। একবার পেছন ফিরে তাকাল। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আকসিনিয়া, লাল-শালের প্রান্ত বাতাসে পতপত করে উড়ছে।

বাপের শ্লেজের পাশাপাশি গ্রিগর ঘোড়াটাকে নিয়ে এল। কয়েক মুহূর্ত পর ঘোড়ার দিকে পেছন ফিরে বুড়ো জিজ্ঞেস করল :

—'তাহলে বৌমার সঙ্গে ঘর করার কথা আর ভাবছিস নে?'

—'আবার সেই পুরনো কাসুন্দি? আগেই তো বলে দিয়েছি তোমাকে...'

—'ঘর করার কথা ভাবছিস নে তাহলে..'

—'না, ভাবছিনে!'

—'আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল বৌমা, শুনিস নি তুই?'

—'হ্যাঁ, শুনেছি। গ্রামের একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল।'

—'ধম্মে সইবে?'

—'ওসব আর কেন, বাবা, মোটকথা ..চলতি গাড়ি থেকে যা গড়িয়ে পড়ে, তার আশা ছেড়ে দিতে হয়।'

—'অমন শয়তানি বাক্যি শোনাবি না আমাকে। তোকে যা বলছি, তোর ভালোর জন্যেই।' জ্বলে উঠল পান্তালিমন।

—'দেখছই তো, একটা বাচ্চা হয়েছে আমার। এ নিয়ে বলাবলির আর কি আছে? এখন আর একজনকে তো আর ঘাড়ে চাপাতে পার না..'

—'অন্য কারুর বাচ্চাকে তো আবার খাওয়াচ্ছিস না, খেয়াল করে দেখিস।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল গ্রিগর; তার এক গোপন ক্ষতে হাত দিয়েছে বাপ। আকসিনিয়ার কাছে গোপন করলেও, মেয়েটি জন্মের পর থেকেই পীড়াদায়ক এ সন্দেহটি মনে মনে পোষণ করে আসছে গ্রিগর। রাত্রে আকসিনিয়া ঘুমুলে একাধিকবার সে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দোলনার সামনে, গোলগাল, লালচে মুখখানায় নিজের মুখের আদল খুঁজেছে, তারপর বিছানায় এসে শুয়েছে, অনিশ্চিত রয়ে গিয়েছে আগের মতই। স্তেপানেরও ছিল গাঢ় লাল গায়ের রং, প্রায় কালো মতই। কেমন করে সে জানবে, কার রক্ত বইছে বাচ্চার শিরায় শিরায়? এক এক সময় মনে হয়েছে বাচ্চাটা তারই মত দেখতে, অন্যসময় মনে হয়েছে স্তেপানের মত, তাতে ব্যথা পেয়েছে মনে। স্তেপে থেকে গাড়ি করে আকসিনিয়াকে নিয়ে আসার সময়কার মুহূর্তগুলো মনে করলে বিরূপতা জাগে, সম্ভবত সেই বিরূপতা ছাড়া বাচ্চাটা সম্পর্কে অন্য কোন অনুভূতিই গ্রিগরের নেই। আকসিনিয়া অন্যত্র কাজে আটকে পড়লে মাত্র একটি দিন তাকে ভিজে কাঁথাটা পাল্টে দিতে হয়েছিল। পাল্টাবার সময় এক তীব্র, তীক্ষ্ন উত্তেজনা অনুভব করেছিল সে। পরে চুপি চুপি দোলনার ওপর ঝুঁকে পড়ে, বাচ্চাটার পায়ের বুড়ো আঙুলটা দাঁতের ফাঁকে চেপে ধরেছিল।

সেই ক্ষতে নির্মমভাবে আঘাত করেছে তার বাপ। জিনের কাঠামোর ওপর হাত রেখে অসাড়ভাবে সে উত্তর দিল :

—'যারই হক, বাচ্চাটাকে আমি ফেলব না।'

ঘাড় না ফিরিয়েই ঘোড়ার দিকে চাবুকটা দোলাল পান্তালিমন।

—'ছিরি-ছাঁদ নষ্ট করে ফেলেছে নাতালিয়া। পক্ষাঘাতের মত একপাশে ঘাড় কাত করে হাঁটে। মনে হয়, বড় একটা শিরা কেটে ফেলেছে।' বলেই চুপ করে গেল পান্তালিমন।

ঘোড়ার কেশর থেকে মন দিয়ে চোরকাঁটা খুঁটে তুলতে তুলতে গ্রিগর জিজ্ঞেস করল :

—'কেমন আছে এখন?'

—'কোনরকমে সেরে উঠেছে। সাতমাস বিছানায় পড়ে ছিল। 'ট্রিনিটি' রবিবারে তো যায় যায় অবস্থা। ফাদার পানক্রাতি তো অন্তর্জলিই করিয়ে গেলেন। তারপর সে ভাল হয়ে গেল, উঠল, হেঁটেহুঁটে বেড়াল। কাস্তেটা বুকেই বসিয়েছিল, হাত কেঁপে যাওয়ায় ফসকে গিয়েছিল।'

—'পাহাড়ে উঠছি, জোরে চালাও।' বলেই গ্রিগর চাবুক হাঁকাল, ঘোড়ার খুরের ঘায়ে শ্লেজের ওপর বরফবৃষ্টি করে, এগিয়ে চলে গেল বাপকে ছাড়িয়ে। রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল দুলকিতে।

পেছন পেছন আসতে আসতে পান্তালিমন চেঁচিয়ে বলল, 'নাতালিয়াকে নিয়ে আসছি বাড়িতে। বাপের বাড়িতে আর থাকতে চাইছে না। সেদিন দেখা হয়েছিল, আমি বলেছি আসতে।'

গ্রিগর কোন উত্তর দিল না। কেউ কোন কথা না বলে প্রায় প্রথম গ্রাম পর্যন্ত ঘোড়া চালিয়ে এল তারা, তার বাপও ও বিষয় নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করল না।

॥ সাত ॥

সেইদিনই প'য়তাল্লিশ মাইল চলে এল তারা। পরের দিন সন্ধ্যের মুখে মানকোভোয় পৌঁছে গেল, রাত কাটাল ভিয়েশেনস্কার রংরুটদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যারাকে।

পরদিন সকালে ভিয়েশেনস্কার রংরুটদের ডাক্তারি পরীক্ষা তদারক করল জেলার আতামান। তাদের গ্রামের অন্যান্যদের সঙ্গে লাইন বেঁধে দাঁড়াল গ্রিগর। ঝলমলে করে সাজানো নতুন জিন চাপানো এক উঁচু লালচে-বাদামি ঘোড়ায় চড়ে সকালবেলায় যাচ্ছিল মিত্‌কা কোরশুনভ, গ্রিগর তখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, কিন্তু একটা কথাও না বলে চলে গিয়েছিল মিত্‌কা।

স্থানীয় বে-সরকারী দপ্তরের ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে একে একে জামাকাপড় খুলল সবাই। সামরিক কেরাণীরা চারপাশে ঘুরতে লাগল হন্তদন্ত হয়ে, প্রাদেশিক আতামানের এ্যাডজুট্যাণ্ট ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। ভেতরের দিকের একটা ঘর থেকে কানে এল ডাক্তারের নির্দেশ আর টুকরোটাকরা মন্তব্য।

একজন কেরাণী বেরিয়ে গ্রিগর আর একজনকে পরীক্ষার ঘরে ঢুকতে বলল তৎক্ষণাৎ। ভেতরে ঢুকল গ্রিগর, ঠাণ্ডায় ফুটি ফাটা হয়েছে তার পিঠের চামড়া।

তামাটে গায়ের রং হয়েছে ওকের মত। নিজের লোমশ পাদুখানার দিকে তাকাতেই বিব্রত বোধ করল গ্রিগর। ডাক্তারি পরীক্ষার অসম্মানজনক পদ্ধতিতে বিরক্ত হয়ে উঠল। সাদা ওভারঅল-পরা এক পাকা চুল ডাক্তার স্টেথেস্কোপ ঠুকে ঠুকে দেখল। এক অল্পবয়সী ডাক্তার চোখের পাতা উল্টে দেখল, জিভ দেখল। তৃতীয়জন শিঙের-ফ্রেমের চশমা চোখে, হাত কচলাতে কচলাতে তার পেছনে পেছনে তড়বড় করে ঘুরতে লাগল।

—'এবার ওজন!' একজন অফিসার চেঁচিয়ে উঠল। ঠাণ্ডা পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়াল গ্রিগর।

—'তের ... সাড়ে তিন।'

—'বলে কি? তেমন তো লম্বাও নয়।' গ্রিগরের হাত ধরে ঘুরিয়ে দিয়ে পাকা-চুল ডাক্তার বলল টেনে টেনে।

—'তাজ্জব ব্যাপার!' অল্পবয়সী ডাক্তারটা কাশল।

টেবিলের কাছে বসে ছিল যে অফিসারটি অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করল:

—'কত হল?'

—'দুমণ, সাড়ে বার সের।' পাকাচুল ডাক্তারটি উত্তর দিল।

—'ওকে রক্ষীদলে নিলে কেমন হয়।' টেবিলের পাশের জনকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল জেলা সামরিক কমিসারি।

—'মুখখানা ডাকাতের মত ... অত্যন্ত হিংস্র দেখতে ...'

—'এ্যাই,, পেছন ফের। তোর পিঠে ওটা কি?' কর্নেলের তক্‌মা আঁটা একজন অফিসার চেঁচিয়ে উঠল। কর্নেলের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে পাশ ফিরে শরীরের থরথরানি কোনরকমে চেপে গ্রিগর উত্তর দিল:

—'শীতে জমে গিয়েছিলাম বসন্তকালে। তারই দাগ।'

পরীক্ষার শেষদিকে টেবিলের সামনেকার অফিসাররা ঠিক করল গ্রিগরকে নেওয়া হবে সাধারণ বাহিনীতেই।

—'বার নং রেজিমেণ্ট, মেলেখফ। শুনছ?' তাকে বলে দেওয়া হল। দরজার দিকে এগুতেই চাপা স্বর কানে এল:

—'তা অসম্ভব। ভাবুন তো একবার: অমন একখানা মুখ দেখবেন সম্রাট, আর তারপর কি? শুধু ওর চোখদুটোই ...'

—'ওটা বর্ণ-সংকর। নিশ্চয়ই পুব দেশের।'

—'ওর গাও পরিস্কার নয়। ওই দাগগুলো ...'

চলতে চলতে কোটের বোতাম লাগাল গ্রিগর, দৌড়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। বারোয়ারিতলায় জড়ো করা হচ্ছে ঘোড়াগুলোকে। উষ্ণ বাতাসের নিঃশ্বাসে বরফ গলার আভাস; জায়গায় জায়গায় রাস্তাটা ফাঁকা, ধোঁয়া উঠছে। কক্ কক্ করতে করতে মুরগীগুলো রাস্তায় ডানা ঝাপটে বেড়াচ্ছে। এক ডোবায় জল ছিটোচ্ছে একপাল হাঁস।

॥ আট ॥

ঘোড়াগুলো পরীক্ষার কাজ শুরু হল পরদিন। গির্জার দেয়ালের সামনে বারোয়ারিতলায় লাইন বেঁধে দাঁড় করানো হল ঘোড়াগুলোকে। ঘোড়ার ডাক্তার আর তার সহকারী এগিয়ে গেল লাইনের সামনে দিয়ে। ভিয়েশেনস্কার আতামান ওজনযন্ত্রের কাছ থেকে ছুটে গেল বারোয়ারিতলার মাঝখানে বসান টেবিলটার কাছে, পরীক্ষার ফলাফল লেখা হচ্ছে সেখানে। এক তরুণ ক্যাপটেনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সামরিক কমিসারি চলে গেল পাশ দিয়ে।

গ্রিগরের পালা আসতেই ঘোড়াটাকে নিয়ে এল ওজনের কাছে। ঘোড়াটার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মেপে মেপে দেখল ডাক্তার আর তার সহকারী, তারপর ওজন নিল। পাটাতন থেকে নামবার আগেই সুকৌশলে উঁচু করে ধরল ওপরের ঠোঁটটা, গলার ভেতরটা দেখল, বুকের পেশী টিপল, মাকড়সার পায়ের মত সরু সরু আঙুলে সারা শরীরে বুলিয়ে নিয়ে তারপর নজর দিল পায়ের দিকে। হাঁটু টিপে দেখল, পায়ের শিরায় ঠুকল, খুরের কাছের চুলের গোছার ওপরটা আঙুলে চিপ্‌টে ধরল। পরীক্ষা শেষ করে সাদা ওভারঅল লট্‌পট্ করতে করতে কার্বলিকের গন্ধ ছড়িয়ে ডাক্তার এগিয়ে গেল।

গ্রিগরের ঘোড়াটা বাতিল করা হল। সাশ্‌কা যা আশা করেছিল তা যুক্তিহীন, সে যে গোপন খুঁতের কথা বলেছিল, ডাক্তারের পাকা চোখে তা ধরা পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ গ্রিগর উত্তেজিত ভাবে বাপের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসল; তারপর আধঘণ্টার মধ্যেই পিয়োত্রার ঘোড়াটা এনে হাজির করল ওজনের সামনে। প্রায় পরীক্ষা না করেই ডাক্তারও ঘোড়াটা মঞ্জুর করে দিল।

খানিকদূর ঘোড়াটাকে নিয়ে এল গ্রিগর, একটা শুকনো জায়গা খুঁজে নিয়ে জিনের কাপড় বিছিয়ে দিল মাটিতে, বাপ ঘোড়া ধরে রইল। হালকা ধুসর রঙের পোষাক গায়ে, মাথায় রুপোলি অস্ত্রাখান টুপি, একজন জেনারেল হেঁটে গেল পাশ দিয়ে, তার পেছনে পেছনে একদল অফিসার।

গ্রিগরের পেছনে একটা গুঁতো দিয়ে ফিসফিস করে পান্তালিমন বলল:

—'উনি হচ্ছেন প্রদেশের আতামান।'

অফিসার ও কর্মচারীদের অপরিচিত চেহারার দিকে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গ্রিগর। একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল এ্যাডজুট্যান্ট. গ্রিগরের মনোযোগী চোখে চোখ পড়তেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। কোন কিছুতে উত্তেজিত হয়ে, হলদে দাঁতে ওপরের ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে এক বয়স্ক ক্যাপ্টেন প্রায় দৌড়ে চলে গেল পাশ দিয়ে।

কাপড়ের ওপর জিনটা নামিয়ে রাখল গ্রিগর, জিনটা ফিতে দিয়ে সাজানো, সামনে পেছনে থলে ঝুলানো; দুটো ফৌজী কোট, দুজোড়া পা-জামা, একটা গেঞ্জি, দু'জোড়া বুট, পোয়াতিনেক বিস্কুট, একটিন মাংস, ওট্, আর অন্যান্য খাবার দাবার ফৌজী পরিমানমত গুছিয়ে গাছিয়ে রাখল। জিনের খোলা থলের ভেতরে রয়েছে চারটে ঘোড়ার নাল, তেলমাখানো ন্যাকড়ায় জড়ানো পেরেক, আর গোটা কয়েক সুচ, সুতো, গামছায় মোড়া ফৌজী-ঘরকন্নার পুঁটুলি।

জিনিসপত্তরের ওপর শেষবারের মত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে, দড়ি থেকে কাদার দাগ জামার হাতা দিয়ে ঘসে তুলবার জন্যে বসে পড়ল গ্রিগর। বারোয়ারি তলার থেকে ফৌজী তদারকী দল, বিছানো জিনের কাপড়ের পেছনে লাইন বেঁধে দাঁড়ানো কসাকদের সম্মুখ দিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে লাগল। অফিসাররা আর আতামান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল জিনিসপত্তর, ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল গ্রেট-কোটের কোণা, থলি হাতড়াতে লাগল, ঘরকন্নার থলের জিনিসপত্তর বার করে ফেলল, হাতে তুলে ওজন দেখতে লাগল বিস্কুটের থলের।

তদারকী দল যত এগিয়ে আসতে লাগল ততই ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যেতে লাগল কথাবার্তা। গ্রিগর উঠে দাঁড়াল, পেছন থেকে বাপ কেশে উঠল। বাতাসের ঝাপটায় বারোয়ারিতলায় ছড়িয়ে গেল ঘোড়ার চোনা আর গলা বরফের গন্ধ। সূর্যের মুখখানা অপ্রসন্ন, যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মদ গিলেছে।

গ্রিগরের পাশের লোকটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল অফিসাররা, তারপর একে একে এল তার কাছে।

—'পদবী কি, নাম কি?'

—'মেলেখফ, গ্রিগর।'

কোণা ধরে গ্রেট-কোটটা তুলে নিল কমিসারি ভেতরের কাপড় শুঁকে দেখল, তাড়াতাড়ি গুনে দেখল বোতামগুলো; আর একজন অফিসার দুই আঙুলে ঘসে দেখল পা-জামার কাপড়টা, তৃতীয় একজন ঝুঁকে পড়ে হাতড়াতে লাগল থলেগুলো। বুড়ো আর মাঝের আঙুল দিয়ে ঘোড়ার নাল জড়ানো ন্যাকড়াটায় খুব সতর্ক হয়ে খোঁচা দিল কমিসারি যেন গরম বলে ভয় পাচ্ছে, চাপা গলায় নালগুলো গুনে ফেলল।

—'নাল তেইশটা কেন? এর মানে কি?' চটেমটে ন্যাকড়ার কোণা ধরে টান মারল সে।

—'মোটেই না, হুজুর। চব্বিশটা।'

—'আমি কি তাহলে কানা?'

গ্রিগর তাড়াতাড়ি ন্যাকড়ার একটা ভাঁজ খুলতেই বেরিয়ে গেল চব্বিশতম নালটা। ভাঁজ খুলবার সময় অফিসারের সাদা হাতের সঙ্গে তার হাতটা লেগে গেল। যেন আঘাত পেয়েছে এমনভাবে হাতটা সরিয়ে নিল ঝটকা মেরে, ভুরু কুঁচকে গ্রেট-কোটের কোণায় হাত ঘসল তারপর দস্তানাটা টেনে দিল।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করল গ্রিগর, একটু শয়তানি হাসি হাসল। চোখাচোখি হতেই জ্বলে উঠল অফিসার, গলা চড়িয়ে বলল :

—'এসব কি? এইসব? দড়িগুলো ঠিক নেই কেন? লাগামের কাঁটা ঠিক নেই কেন? ব্যাপার কি? তুমি কসাক, না 'চাষা'? বাপ কোথায়?'

ঘোড়ার লাগামে টান দিয়ে, খোঁড়া পাটা হেঁচড়ে, একপা এগিয়ে এল পান্তালিমন।

—'কসাক নিয়মকানুন কিছুই জানো না তুমি?' তার ওপরেই যত ঝাল ঝাড়তে লাগল কমিসার।

প্রাদেশিক আতামান আসতেই কমিসার চুপ করল। জিনের গদিতে পা ঢুকিয়ে দিল আতামান, তারপর পরের জনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যে রেজিমেণ্টে গ্রিগরকে ভর্তি করা হবে, তার অফিসার ভদ্রভাবে জিনিসপত্তর, মায় ঘরকন্নার থলের জিনিস-পত্তরও টেনে বার করল, অবশেষে সবই মঞ্জুর করে দিল।

একদিন পর ঘোড়া, কসাক আর রসদ-বোঝাই অনেকগুলো লালরঙের কামরাওয়ালা

একখানা ট্রেন ছাড়ল ভোরোনেঝের দিকে। তারই এক কামরায় গ্রিগর দাঁড়িয়ে। খোলা দরজার সামনে দিয়ে সরে সরে যেতে লাগল এক অপরিচিত দৃশ্যপট; দূরে এক হালকা নীলরঙের বনের রেখা ঘুরপাক খেয়ে ফিরতে লাগল। পেছনে ঘোড়াগুলো খড় চিবুচ্ছে, পায়ের নীচে সচল মেঝের অনুভূতিতে একবার এ-পা, আর একবার অন্য-পা ফেলছে। কামরার মধ্যে ওয়ার্মউড, ঘোড়ার ঘাম আর বসন্তের বরফ-গলার গন্ধ; দিগন্তে ওৎ পেতে আছে নীল, ভাবমগ্ন দূরে বনরেখা, মৃদু উজ্জ্বল, সন্ধ্যাতারার মতই দুরধিগম্য।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

১৯১৪ সালের মার্চ মাসে এক প্রফুল্ল বসন্ত দিনে নাতালিয়া শ্বশুর-বাড়ি ফিরে এল। গাছের ছোট ছোট পায়রারঙা ডাল দিয়ে পান্তালিমন তখন ভাঙা বেড়া মেরামত করছিল। ছাদ থেকে ঝোলা রুপোলি বরফ ফোঁটায় ফোঁটায় গলে পড়ছে, আগেকার জল পড়ার দাগ কার্নিশের গায়ে আঁচড়ের মত দেখাচ্ছে। বরফ-গলা পাহাড়কে উষ্ণ সূর্যালোক আলিঙ্গন করছে, মাটি ফেঁপে উঠছে; ডনের ধারের পাহাড় থেকে জলের ভেতরে সরু হয়ে এগিয়ে যাওয়া অংশের খড়ি-রঙা মাথায় নতুন গজান ঘাসে সবুজ মালাকিটের রঙ ধরেছে।

ক্ষতবিক্ষত বাঁকা ঘাড়টা নীচু করে শ্বশুরের পেছন থেকে সামনে এসে দাঁড়াল নাতালিয়া। বলল :

—'ভালো আছেন, বাবা!'

—নাতিউস্‌কা! এস, মা, এস!' পান্তালিমন হাঁকডাক শুরু করে দিল। হাত থেকে ডালগুলো পড়ে গেল। 'এতদিন কেন দেখতে আসনি? এস এস তোমার শাশুড়ী খুবই খুশী হবে দেখে।'

—'বাবা, আমি এলাম...' অনিশ্চিতভাবে হাতটা বাড়িয়ে দিল সে, তারপর পেছন ফিরল। বলল, 'তাড়িয়ে না দিলে, আমি চিরকাল থাকব আপনাদের কাছে।'

—'কি বললে মা, কি বললে?' তুমি কি আমাদের পর?

এই দেখ না, গ্রিগর তার চিঠিতে তোমার কথা লিখেছে। লিখেছে, তোমার খবর নিতে।'

রান্নাঘরে ঢুকল দুজনে। নাতালিয়াকে জড়িয়ে ধরতেই কেঁদে ফেলল ইলিনিচ্‌না। রুমালের কোণায় নাক মুছে ফিসফিস করে বলল :

—'একটা খোকা হক। তাতেই বাঁধতে পারবে তাকে। বসো, মা। পিঠে দেব, খাবে?'

উত্তেজিতমুখে হাসতে হাসতে দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকল দুনিয়া, নাতালিয়ার হাঁটু জড়িয়ে ধরল। 'তুমি একটা বে-হায়া! আমাদের একেবারে ভুলে গিয়েছ!' সে ধমকাতে লাগল নাতালিয়াকে।

—'তুমি একেবারে এলে তো?' নাতালিয়ার হাতদুটো ঘসতে ঘসতে দুনিয়া জিজ্ঞেস করল।

—'কি করে বলব...'

—'কেন, কোথায় আর থাকবে? আমাদের সঙ্গেই থেকে যাবে।' পিঠের একটা ডিস্ টেবিলের ওপর এগিয়ে দিতে দিতে ইলিনিচ্না বলল।

অনেক ইতস্তত করার পর নাতালিয়া শ্বশুর-বাড়ি এল, প্রথমে তার বাপ আসতে দিতে চায় নি। কথা তুলতে গেলেই চটেমটে গালমন্দ করেছিল, এ থেকে ক্ষান্ত করার জন্যে অনুরোধ উপরোধও করেছিল। কিন্তু বাপমায়ের মুখের দিকে তাকানোই তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছিল, তার মনে হত নিজের পরিবারের সে একজন বাইরের লোক। গ্রিগরকে ফৌজে পেঁছে দিয়ে আসার পর, পান্তালিমনও অনবরত ফিরে আসবার জন্য তার মন ভেজাচ্ছিল, কারণ, পান্তালিমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল তাকে নিয়ে আসবে, গ্রিগরের সঙ্গে বনিবনা করিয়ে দেবে।

মার্চ মাসের সেইদিন থেকে শ্বশুর-বাড়িতেই রইল নাতালিয়া। ভাইএর মত হৃদ্য ব্যবহার করল পিয়োত্রা। দারিয়ার বিরক্তি বাইরে খুবই কম প্রকাশ পেল, মাঝে মাঝে তার যে বিরূপদৃষ্টি, তা অনেক বেশি পুষিয়ে গেল দুনিয়ার টানে আর বুড়োবুড়ীর স্নেহে।

নাতালিয়া আসার পরদিনই পান্তালিমন দুনিয়াকে দিয়ে গ্রিগরকে চিঠি লেখাল:

'শ্রীমন গ্রিগর পান্তালয়েভিচ্ নিরাপদ্দীর্ঘজীবেষু! অত্র পত্রে আমার ও তোমার মাতা ভাসিলিজা ইলিনিচ্নার অন্তরের আশীর্বাদ জানিবা। তোমার ভ্রাতা পিয়োত্রা পান্তালয়েভিচ্ ও তাহার স্ত্রী দারিয়া মাত্ভিয়েভ্না তোমার শারীরিক কুশল কামনা করিতেছে। তোমার ভগিনী দুনিয়া এবং বাটিস্থ সকলেই তোমাকে আন্তরিক ভালবাসা জানাইতেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখে লেখা তোমার চিঠি আমরা পাইয়াছি এবং তাহার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তুমি লিখিয়াছিলে ঘোড়াটা লাথি ছোঁড়ে, তাহার পায়ে চর্বি মালিশ করিবে, কেমন করিয়া মালিশ করিতে হয় তাহা তুমি জান। পথঘাট পিছল না হওয়া পর্যন্ত তাহার খুরে নাল পরাইবা না। তোমার স্ত্রী নাতালিয়া মিরোনোভ্না আমাদের কাছেই আছে এবং ভাল আছে। তোমার মাতা কিছু শুকানো চেরী, এক জোড়া গরম মোজা এবং আরও কিছু জিনিসপত্র পাঠাইতেছেন। আমরা সকলে সুস্থ দেহে, কুশলে আছি, কিন্তু দারিয়ার খোকাটি মারা গিয়াছে। কয়েকদিন আগে আমি ও পিয়োত্রা চালা-ঘরটি ছাওয়ার কাজ শেষ করিয়াছি। পিয়োত্রা ঘোড়াটাকে যত্ন করিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়াছে। গরুটির বাছুর হইয়াছে, মনে হয় মাদী ঘোড়াটার বাচ্চা হইবে, জেলার সরকারী আস্তাবল হইতে ঘোড়া আনিয়া তাহার নিকট রাখিয়াছিলাম। তোমার কার্যের জন্য, এবং তোমার প্রতি উপরওয়ালা খুশী জানিয়া, খুবই আনন্দিত হইলাম। সাধ্যমত কার্য করিবা। মহামান্য জারকে সেবা করা কখনো বৃথা হয় না। নাতালিয়া আমাদের সহিত থাকিবে, তুমি ইহা ভাবিয়া দেখিবা। একটি বিপত্তি ঘটিয়াছে, ইস্টারের পূর্বে এক জানোয়ারে তিনটি ভেড়া মারিয়া ফেলিয়াছে। নিজের প্রতি যত্ন লইবা, ঈশ্বর তোমাকে কুশলে রাখুন। তোমার স্ত্রীকে ভুলিবা না, ইহাই আমার আদেশ।'

॥ দুই ॥

রুশ-অস্ট্রিয় সীমান্ত থেকে মাইল তিনেক দূরে রাদ্‌জিভিল্লোভো নামে ছোট একটা জায়গায় থানা গেড়েছিল গ্রিগরদের রেজিমেণ্ট। বাড়িতে কমই চিঠি লেখে গ্রিগর। বাড়িতে নাতালিয়ার থাকার সংবাদ পেয়ে চিঠির জবাবে সতর্কভাষায় এক চিঠি লিখল, তার হয়ে নাতালিয়াকে শুভেচ্ছা জানাবার কথাও বাপকে লিখল। তার গোটা চিঠিটাই ধরা ছোঁয়ার বাইরে, অর্থও দুর্বোধ্য। পিয়োত্রা অথবা দুনিয়াকে দিয়ে বেশ কয়েকবার পড়াতে হল পান্তালিমনকে, লাইনগুলোর মধ্যে কি অর্থ গোপন আছে তাও ভাবতে হল। ইস্টারের ঠিক আগে সে চিঠিতে গ্রিগরকে পস্টাপস্টি লিখল, ফৌজ থেকে ফিরে এলে সে নাতালিয়ার সঙ্গে ঘর করবে, না, আগের মতই আকসিনিয়াকে নিয়ে থাকবে।

উত্তর দিতে দেরি করল গ্রিগর। তার চিঠি এল একেবারে 'ট্রিনিটি' রবিবারের পর, সংক্ষিপ্ত চিঠি। প্রতিটি শব্দের শেষে ঢোক গিলতে গিলতে তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়ে গেল দুনিয়া, আর, অজস্র শুভকামনা ও প্রশ্নের মধ্যে থেকে অতিকষ্টে অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করতে লাগল পান্তালিমন। চিঠির শেষের দিকে নাতালিয়ার প্রশ্ন উল্লেখ করেছে গ্রিগর :

> 'আপনি লিখিয়াছেন, নাতালিয়ার সহিত আমি আর ঘর করিব কিনা। কিন্তু, বাবা, আমার কথা, যে বন্ধন ছিন্ন হয়, তাহা জোড়া লাগে না। আপনি নিজে জানেন, আমার একটি সন্তান আছে, এ ক্ষেত্রে কেমন করিয়া নাতালিয়ার সহিত বনাইয়া চলিব। আমি কোন কথাই দিতে পারি না, এ সম্পর্কে কোন কথা বলা আমার পক্ষে বেদনা-দায়ক। সীমান্তের পারে চোরাই চালানের জন্য সেদিন এক ইহুদী ধরা পড়িয়াছে। তাহার সহিত আমাদের দেখা হইয়াছিল। সে বলিয়াছে, শীঘ্রই অস্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ শুরু করা হইবে, কোন জায়গা নিজে দখল করিবেন, তাহা তাহাদের জার দেখিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধ লাগিলে হয়ত আমি জীবিত থাকিব না, পূর্ব হইতেই তাই কোন কিছু স্থির করা সম্ভব নহে।'

শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করে, স্বামী ফিরে আসার দীর্ঘ প্রতীক্ষায় দিন কাটাতে লাগল নাতালিয়া। গ্রিগরকে সে কখনো চিঠি দেয় না, কিন্তু চিঠির জন্যে অমন বেদনা আর আশা নিয়ে তার মত আর কেউ সে পরিবারে অপেক্ষা করে থাকে না।

॥ তিন ॥

গ্রামের জীবনধারা বয়ে চলল অলংঘ্য নিয়মে; কাজের দিনে সবার অলক্ষ্যে আনন্দহীন কাজে সময় কেটে যায়। রবিবার সকালে গোটা গ্রাম দল বেঁধে সপরিবারে গির্জায় জমায়েত হয়: কসাকরা পরে ঢিলে জামা, ছুটির দিনের পা-জামা; মেয়েরা লম্বা ঝুল, ধুলোয় লুটানো বিচিত্রবর্ণের ঘাঘরা, ফোলানো-হাতা, খাটো জ্যাকেট। বারোয়ারিতলায় খালি গাড়িগুলো আকাশের দিকে মুখ উঁচিয়ে পড়ে থাকে, ঘোড়াগুলো চিঁহি চিঁহি করে। জ্বালানিঘরের পাশে লম্বা সারি করে সাজিয়ে বুলগেরিয় উদ্বাস্তুরা ফল কেনা-বেচা করে; পেছনে ছেড়ে দেওয়া উটগুলো বারোয়ারিতলার বাজারটা যেন নবাবীভঙ্গিতে জরীপ করে। উটগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ছেলেপুলের দঙ্গল ছুটোছুটি করে। যেদিকে তাকাও মানুষের ভিড়, পুরুষদের মাথায় লাল-ফিতে দেওয়া টুপি, আর মেয়েদের মাথায় জমকালো রুমাল।

সন্ধ্যের সময় পায়ের শব্দে, গান আর একর্ডিঅনের আওয়াজে রাস্তাগুলো আর্তনাদ করতে থাকে; শুধু গভীর রাত্রে শেষ কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যায় গ্রামের শেষপ্রান্তে।

রবিবারের সন্ধ্যেবেলা নাতালিয়া কখনো পাড়া পড়শীর বাড়িতে যায় না, খুশীমনে বসে বসে দুনিয়ার গল্প শোনে। অলক্ষ্যে বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে দুনিয়া, সুন্দরীই হয়ে উঠছে তার দিক থেকে। আগে-পাকা আপেলের মতই পেকে উঠছে সে। এ বছর তার চেয়ে বয়সে বড় মেয়ে বন্ধুরা ভুলেই গিয়েছে যে, তারা তার আগে কৈশোর ছাড়িয়েছে, তাকে তারা দলে টেনে নিয়েছে। তার বয়স এখন পনর, দেহে এখনো কিশোরীর ছাপ আঁকা। কৈশোর আর উদ্ভিন্ন যৌবনের এক বেদনাময়, সরল মিশ্রণ দুনিয়া; ছোট ছোট স্তনদুটি পুষ্ট হয়ে উঠেছে, জ্যাকেট ঠেলে উঠছে, স্পষ্ট চোখে পড়ে। তার আয়তচোখের কোটর থেকে এখনো জ্বলজ্বল করে লজ্জা আর দুষ্টুমি-ভরা কালো চোখদুটি। সন্ধ্যের পর ঘুরে ফিরে এসে, একমাত্র নাতালিয়ার কাছেই সে তার নির্দোষ গোপন কথাগুলো বলে যায়:

—'বৌদি, একটা কথা বলব তোমাকে।'

—'বেশ, বল।'

—'কাল গোলাবাড়ির পাশে, কাঠের গুঁড়ির ওপর সারা সন্ধ্যে মিশা কশেভয় আমার সঙ্গে বসেছিল।'

—'ওকি, লাল হয়ে উঠছ কেন?'

—'কই, না তো!'

—'আয়নায় দেখ; মুখ আগুন-রাঙা হয়ে উঠেছে।'

হাতের তামাটে চেটোয় তার গরম গালদুটো ঘসে দুনিয়া, ছলাকলাহীন প্রাণবন্ত-হাসি খিলখিল করে বেজে ওঠে।

—'ও বলেছিল, আমি নাকি ছোট্ট অপরাজিতা ফুলের মত।'

—'বেশ, তারপর!' নিজের অতীত আর পায়ে দলা সুখের কথা ভুলে, অপরের সুখে সুখী হয়ে উৎসাহ দেয় নাতালিয়া।

—'আমি বললাম, 'মিছে বলো না, মিশা।' ও দিব্যি গেলে বলল...'

মাথা নেড়ে হেসে ওঠে নাতালিয়া, সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে সে হাসি। কালো চুলের খোঁপা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে ঘাড়ে, পিঠে।

—'আর কি কি বলল?'

—'নিজের কাছে রাখার জন্যে আমার রুমালটা চাইল।'

—'তুমি দিলে না?'

—'না। বললাম, দেব না। বললাম, 'তোমার প্রেমিকার কাছ থেকে নাও গে। ইয়েরোফিয়েভ্‌নার ছেলের বৌয়ের সঙ্গে ওকে দেখা গিয়েছে, ভারি পাজি মেয়েছেলে, লোক দেখলেই ফস্টিনষ্টি করে।'

—'তুমি ওর কাছ থেকে দূরেই থেকো।'

—'তাই তো থাকব।' দুনিয়া তার গল্প বলে যায়। 'তারপর, আমরা তিনজন, আমি আর আরও দুটি মেয়ে, যখন বাড়ি আসছিলাম, মাতাল বুড়ো মিখি আমাদের পেছন নিল।' চেঁচিয়ে বলল, 'চুমু খাও গো, দিদিমনিরা।' আর নুরা একটা গাছের ডাল ছুঁড়ে মুখে মেরে দিল, আমরা দৌড়ে পালিয়ে এলাম।'

॥ চার ॥

খরা হল গ্রীষ্মে। গ্রামের কাছে ডনের জল শুকিয়ে গেল। যেখানে দ্রুত খরস্রোত বয়ে যেত, সেখানে পারাপারের জায়গা হয়ে গেল, পিঠ না ভিজিয়েই পার হয়ে যায় গরুবাছুর। পাহাড়ের গা থেকে গাঢ় উষ্ণ বাষ্প নেমে আসে গ্রামের মাথায়, পোড়া ঘাসের কড়া গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। আগুন লাগান হয়েছে স্তেপের বড় বড় ঘাসে; ডনের দিকের ঢালুতে ঝুলতে থাকে গা-বমি বমি করা এক ধোঁয়ার পর্দা। ডনের ওপরে রাত্রে মেঘ জমে ওঠে, কানে আসে অশুভ গুরু গুরু গর্জন; বিদ্যুতে আকাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলেও শুকনো মাটির তৃষ্ণা মেটাতে বৃষ্টি কিন্তু নামে না।

গির্জার চুড়োয় বসে রাতের পর রাত একটা পেঁচা ডাকে। সেই আতঙ্ক মেশানো ডাক ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের বুকে; গির্জার চুড়ো থেকে পেঁচাটা উড়ে গিয়ে বসে কারখানায়, ঘাস গজান কবরের বাদামি ঢিবিগুলোর ওপরে বসে বসে গোঙায়।

গির্জার চুড়োয় পেঁচার ডাক শুনে বুড়োরা ভবিষ্যৎবাণী করে, 'ফ্যাসাদ আসছে সামনে।'

—'যুদ্ধ আসছে। তুর্কীযুদ্ধের আগেও এমন করে পেঁচা ডাকত।'

—'গির্জা থেকে কবরখানায় পেঁচা উড়ে গেলে ভাল কিছু আশা করো না, হে।'

বাজারে বুড়োদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পান্তালিমন গম্ভীরভাবে বলে :

—'আমাদের গ্রিগর লিখেছে, অস্ট্রিয়ার জার সীমান্তে এসেছে, তার সব ফৌজ এক জায়গায় জড় করে। মস্কো, পেত্রোগ্রাদের দিকে এগুতে হুকুম দিয়েছে।'

অতীতের যুদ্ধের কথা মনে আছে বুড়োদের, সকলেই সকলের আশঙ্কা অনুমান করে নিতে পারে। একজন আপত্তি জানায় :

—'কিন্তু কোন যুদ্ধই হবে না। ফসলের দিকে তাকিয়ে দেখ।'

—'ফসলের সঙ্গে এর সম্পর্কটা কি। মনে হয়, ছাত্ররাই যত গোলমাল করছে।
—'যাই হক না কেন, আমরা শুনব সকলের পরে। কিন্তু যুদ্ধটা লাগবে কার সঙ্গে?'
—'সাগরপারের তুর্কীদের সঙ্গে। দেখে নিও, জলে ওদের আটকে রাখা যাবে না।'
শেষটায় কথাবার্তা হাসিঠাট্টায় গিয়ে দাঁড়ায়। বুড়োরা যে যার কাজে যায়।

মার্তিন শামিল থাকে কবরখানার কাছে। দু রাত ধরে কবরখানার পাশে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করছিল পেঁচাটাকে। কিন্তু সেই অদৃশ্য, রহস্যময় পাখিটা নিঃশব্দে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল, গিয়ে বসল কবরখানার অপর প্রান্তে একটা ক্রুশের ওপর। সেখান থেকে ভীতিপ্রদ ডাক ছড়িয়ে পড়তে লাগল ঘুমন্ত গ্রামের ওপর। অস্বাভাবিকের মত গালাগাল দিয়ে উঠল শামিল, গুলি ছুঁড়ে দিল একটুকরো ভাসা মেঘের পেটে, তারপর বাড়ি ফিরে এল। তার বৌ রুগ্ন, ভীরু প্রকৃতির, বাচ্চা বিয়োয় খরগোশের মত। ফিরে আসতেই—সে ভর্ৎসনার অভ্যর্থনা জানাল :

—'তুমি একটা গাধা, আস্ত গাধা! তোমার কি ক্ষেতি করছে পাখিটা, শুনি? ভগবান যদি শাস্তি দেন তোমাকে। এই আমি শেষ বিইয়ে উঠলাম, আর ধরো, যদি তোমার থেকে আবার বাচ্চা পেটে আসে?'

—'চোপ্‌রাও, মাগী!' মার্তিন ধমক দিল। 'বাচ্চা তোর পেটে আবার ঠিকই আসবে, কিচ্ছু ভাবতে হবে না! বলি, পাখিটার মতলব কি? গায়ের রক্ত হিম করে দিচ্ছে। শয়তানটা সর্বনাশ ডেকে আনবে! যুদ্ধ বাধলে, ওরা তো আমায় তলব পাঠাবে, তাকিয়ে একবার দেখ তোর শুয়োরের পালের দিকে।' ছেলেমেয়েরা যেখানে ঘুমোচ্ছিল, সেইদিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল সে।

॥ পাঁচ ॥

ঘাসের মাঠে পাহারা বসান হল নজর রাখার জন্যে। ডনের পেছনকার ঘাস স্তেপের ঘাসের চেয়ে খারাপ, সরু সরু, গন্ধহীন। মাটি একই, অথচ ঘাস রস পায় পৃথক পৃথক। স্তেপের মাটি চমৎকার কালো, এমন কড়া আর শক্ত যে, গরুবাছুর হেঁটে গেলে খুরের দাগ বসে না। এই মাটিতে গজায় ঘোড়ার পেট পর্যন্ত উঁচু কড়া-গন্ধ ঘাস। কিন্তু ডনের ধারের মাটি ভেজা, পচা, এমন বাজে কেঠো ঘাস গজায় যে, গরুবাছুরও সব সময় ফিরে তাকায় না।

ঘাসকাটা যখন পুরোদমে চলছে, তখন এমন একটা ব্যাপার ঘটল যাতে সারা গ্রাম চমকে উঠল। দারোগাকে নিয়ে একদিন জেলার কমিসার এসে হাজির হল, সঙ্গে একজন অফিসার, তার গায়ে যে উর্দি তা গ্রামে কেউ কোনদিন দেখে নি। তারা মোড়লকে ডেকে পাঠাল, সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করল, তারপর সোজা চলে গেল ট্যারা-লুকিয়েস্‌কার বাড়িতে। দারাগো তাকে প্রশ্ন করল :

—'স্তক্‌মান বাড়িতে আছে?'
—'আছে, হুজুর।'
—'কি কাজ করে সে?'
—'তালাচাবি সারায়।'

—'তার সম্পর্কে সন্দেহজনক কোন কিছু নজরে পড়েছে তোমার?'

—'কিছুই না।'

—'ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে কেউ?' মোড়লকে পেছন দিকে টান দিয়ে প্রশ্ন করল দারোগা।

—'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে তাস খেলে।'

—'কারা খেলে?'

—'বিশেষ করে কারখানার মজুররা।'

—'ঠিক কারা কারা?'

—'ইঞ্জিনীয়ার, ওজনদার, দাভিদ, আর মাঝে মাঝে দুচারজন কসাক।'

দারোগা থামল, অফিসারের জন্যে অপেক্ষা করল, পিছিয়ে পড়েছিল সে। জামার বোতামটা আঙুলে পাকাতে পাকাতে কি যেন বলল তাকে, তারপর মোড়লকে ইশারা করল। বৃদ্ধ নিঃশ্বাসে ছুটে এল মোড়ল।

'দুজন সিপাই নিয়ে যাদের যাদের নাম বললে সবকটাকে গ্রেপ্তার কর। তাদের নিয়ে আসবে কাছারিতে, দুএক মিনিটের মধ্যেই আমরা হাজির হব। বুঝতে পারলে?'

নিজেকে একটু সামলে নিল মোড়ল, তারপর ছুটল হুকুম তামিল করতে।

বোতামখোলা ভেস্ট গায়ে স্তক্‌মান বসে ছিল, দরজার দিকে পেছন ফিরে উখো ঘসছিল। অফিসারদের ঢুকতে দেখে একবার চারপাশে তাকাল সে, ঠোঁট কামড়ে ধরল। দারোগা হুকুম করল :

—'উঠে দাঁড়াও; তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।'

—'কেন, কিসের জন্যে?'

—'দুটো ঘর নিয়ে থাক তুমি?'

—'হ্যাঁ।'

—'আমরা খানাতল্লাস করব।'

টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল অফিসারটি. প্রথম যে বইটি হাতের কাছে পেল ভুরু কুঁচকে তুলে নিল সেটি। বলল :

—'ওই বাক্সের চাবি দাও।'

—'আগমনের কারণটা জানতে পারি?'

—'পরে কথা হবে সে সম্পর্কে।'

অন্যঘর থেকে উঁকি মেরেই পেছিয়ে গেল স্তক্‌মানের বৌ। দারোগার সহকারী তার পেছন পেছন ঘরে ঢুকল।

হলদে মলাটের একখানা বই তুলে ধরে শান্ত গলায় অফিসারটি জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি?'

—'একখানা বই।' কাঁধটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্তক্‌মান উত্তর দিল।

—'রসিকতা মুলতুবি রাখ অন্য সময়ের জন্যে। ঠিক ঠিক জবাব দাও প্রশ্নের।'

স্তক্‌মান উনুনের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল, ঠোঁটে তার বাঁকা হাসি। অফিসারটির কাঁধের ওপর দিয়ে বইটা দেখে নিল কমিসার, তারপর স্তক্‌মানের দিকে ফিরল :

—'এই সব বুঝি পড়া হয়?'

—'এ বিষয়ে একটু আগ্রহ আছে আমার।' শুকনো গলায় উত্তর দিল সে।

—'বটে!'

বইএর কয়েক পাতায় চোখ বুলাল অফিসারটি, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল টেবিলের

ওপর। দ্বিতীয় একখানায় চোখবুলিয়ে রেখে দিল একপাশে, তৃতীয়খানার মলাটের লেখা পড়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল স্তক্‌মানের দিকে।

—'এই ধরনের বই অর কোথায় রেখেছ?'

একটা চোখ কোঁচকাল স্তকমান, যেন তাক করছে অফিসারের দিকে, জবাব দিল:

—'যা কিছু আছে সবই ত দেখতে পাচ্ছেন।'

—'মিথ্যে কথা,' তার দিকে বইটা উ'চিয়ে অফিসারটি বলে উঠল।

—'আমি চাই..'

—'ঘর তল্লাস করো।'

তলোয়ারখানা আঁকড়ে ধরে বাক্সটার কাছে এগিয়ে গেল কমিসার, সেখানে মুখে বসন্তের দাগ এক কসাক সেপাই এ হেন পরিস্থিতিতে স্বভাবতই সন্ত্রস্ত হয়ে কাপড়-চোপড় ওলটপালট শুরু করে দিল। যা যা বার করা সম্ভব সবই সে বার করে ফেলল। কারখানায়ও তল্লাস করা হল। উৎসাহী কমিসার আঙুলের গি'ট দিয়ে দেয়াল ঠুকে ঠুকেও দেখল।

খানাতল্লাস শেষ হলে স্তকমানকে নিয়ে আসা হল কাছারিতে। পুরনো কোটের ওপর একটা হাত ভাঁজ করে, কোট থেকে কাদা ঝেড়ে ফেলছে এমনভাবে অপর হাত দোলাতে দোলাতে, সেপাইদের আগে আগে রাস্তার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলল। আর সবাই চলল রাস্তার পাশ দিয়ে দেয়াল ঘে'সে ঘে'সে।

সবার শেষে জিজ্ঞাসাবাদ কর হল স্তক্‌মানকে। ইভান আলেক্সিয়েভিচের হাতে তখনো তেল মাখা, দাভিদ হাসছে অপরাধীর মত, ভালেতের জ্যাকেটটা কাঁধের ওপর, আর মিশা কশেভয়,—সেপাই পাহারায় সবাইকে একসঙ্গে আটকে রাখা হল পাশের ছোট ঘরটায়।

পোর্টফোলিও ওলটপালট করতে করতে দারোগা প্রশ্ন করল স্তকমানকে:

—'কারখানার খুনের ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদের সময়, তুমি যে রুশ সোস্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির সভ্য তা কেন গোপন করেছিলে?'

দারোগার মাথার ওপরে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল স্তকমান।

—'অনেক কিছুই প্রমাণ পেয়েছি। উপযুক্ত পুরস্কারই পাবে তুমি।'

বন্দীর নীরবতায় চটে গিয়ে চে'চিয়ে উঠল দারোগা।

—'দয়া করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করুন।' নিস্পৃহ কণ্ঠে স্তকমান বলল। সামনে একটা টুল দেখতে পেয়ে বসবার অনুমতি চাইল। দারোগা উত্তর দিল না, শান্তভাবে স্তকমানকে বসতে দেখে ড্যাবড্যাবে চোখে তাকিয়ে রইল। জিজ্ঞেস করল:

—'কবে এসেছ এখানে?'

—'গত বছর।'

—'পার্টির নির্দেশে?'

—'কারও নির্দেশেই নয়।'

—'কতদিন তুমি পার্টির সভ্য হয়েছ?'

—'কি সব বলছেন আপনি?'

—'উত্তর দাও, কতদিন তুমি রুশ সোস্যাল ডেমোক্রাটিক লেবার পার্টির সভ্য হয়েছ?'

—'আমার মনে হয় যে...'

—'তোমার কি মনে হয়, তার ধার আমি ধারি না। জবাব দাও প্রশ্নের। অস্বীকার

করে লাভ হবে না, বরং বিপদ হবে।' পোর্টফোলিও থেকে একখানা দলিল বার করে টেবিলের ওপর তর্জনী দিয়ে চেপে ধরল দারোগা। 'রোস্তোভ থেকে আমি এই রিপোর্ট পেয়েছি, যা বললাম, তুমি যে পার্টির সভ্য তার পাকা খবর রয়েছে।'

দলিলটার দিকে দ্রুত চোখ ফেরাল স্তকমান, মুহূর্তের জন্য স্থির দৃষ্টিতে দেখল সেটা, তারপর হাঁটু ঠুকতে ঠুকতে অবিচলভাবে জবাব দিল :

—'১৯০৭ সাল থেকে।'

—'বটে! তুমি অস্বীকার কর যে, তোমার পার্টি তোমাকে এখানে পাঠায় নি?'

—'হ্যাঁ, করি।'

—'তা যদি হয়, কেন এসেছ এখানে?'

—'এখানে তালাচাবির মিস্ত্রির চাহিদা আছে।'

—'ঠিক এই অঞ্চলটাই পছন্দ করলে কেন?'

—'একই কারণে।'

—'এখানে যতদিন আছ তার মধ্যে কোন সময় তোমার পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কিংবা এখন যোগাযোগ আছে?'

—'না।'

—'তারা জানে যে তুমি এখানে আছ?'

—'মনে হয় জানে।'

মুক্তোবসানো একটা ছুরি দিয়ে দারোগা পেন্সিলটা সরু করে নিল, তারপর দুই ঠোঁট জড়ো করল :

—'পার্টির অন্য কোন সভ্যের সঙ্গে তোমার চিঠিপত্র চলে?'

—'না।'

—'তা হলে সার্চ করে যে চিঠিটা পেয়েছি, সেটা কি?'

—'ওটা এক বন্ধুর চিঠি, কোন বিপ্লবী দলের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

—'রোস্তোভ থেকে তুমি কোন নির্দেশ পেয়েছ?'

—'না।'

—'কারখানার মজুররা তোমার ঘরে জমায়েত হয় কেন?'

কাঁধদুটো ঝাঁকালো স্তকমান, বোকার মত প্রশ্নে যেন অবাক হয়েছে সে।

—'শীতের দিনে সন্ধ্যের পর তারা আসত সময় কাটানোর জন্যে। আমরা তাস খেলতাম ..'

—'আর বে-আইনী বই পড়তে?'

—'—না। ওদের সকলেই নিরক্ষর।

—'তা হলেও, কারখানার ইঞ্জিনীয়ার ও আর আর সবাই একথা অস্বীকার করে নি।'

—'এ সত্যি নয়।'

—'মনে হচ্ছে, তোমার সাধারণ বুদ্ধিটুকুও নেই একথা বুঝবার যে...' এতে হেসে ফেলল স্তকমান, আর দারোগা তার মন্তব্য শেষ করল : 'মোটেই পাকাবুদ্ধির লোক নও তুমি। এক নাগাড়ে অস্বীকার করে যাচ্ছ, নিজেরই ক্ষতি হচ্ছে। কসাকদের নৈতিক বল নষ্ট করা আর সরকারের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যে তোমার পার্টি যে তোমাকে পাঠিয়েছে, এত জলের মত পরিষ্কার। আমি তো বুঝে উঠতে পারছি না, কেন যে তুমি না জানার ভাণ করছ। এতে তোমার অপরাধ লঘু হবে না...।'

—'এ সবই আপনার অনুমান। সিগারেট খেতে পারি? ধন্যবাদ। সবই পুরোপুরি অনুমান, কোন ভিত্তি নেই।'

—'যে মজুররা তোমার ঘরে আসত, এই বই তাদের পড়ে শোনাতে?' একখানা বইএর ওপর হাত রাখল দারোগা, নামটা ঢেকে গেল। হাতের ওপর দিয়ে শুধু 'প্লেখানোভ' নামটা চোখে পড়ল।

—'আমরা কবিতা পড়তাম।' আঙুলের ফাঁকে হাতের সিগারেট হোল্ডার চেপে ধরে একটু টান দিয়ে স্তকমান উত্তর দিল।

পরদিন সকালে স্তকমানকে নিয়ে ডাক-গাড়িটা রওনা হল। স্তকমান পেছনের সিটে বসে ঝিমুতে লাগল, কোটের কলারে দাড়িটা ঢাকা পড়ে গেল। দুপাশে দুজন করে সেপাই খোলা তলোয়ার হাতে চেপে বসে রইল। তাদের একজন, যার মুখে বসন্তের দাগ, যে খানাতল্লাস করেছিল—সে গিঁটপড়া অপরিচ্ছন্ন আঙুলে দিয়ে স্তকমানের কনুইটা মুঠো করে ধরে রইল। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকে আড়ে আড়ে দেখতে লাগল। ঘড় ঘড় করতে করতে গাড়িখানা রাস্তা দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটল। মেলেখফদের আঙিনার ধারে বেড়ায় হেলান দিয়ে একটি স্ত্রীলোক শালে ঢেকে ওই গাড়িরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। দুচোখভরা জলে তার ফ্যাকাসে মুখখানা ভিজে উঠেছে।

গাড়িখানা পাশ দিয়ে চলে গেল, আর সেই স্ত্রীলোকটি বুকের ওপর হাতদুটো চেপে ধরে তার, পেছনে পেছনে ছুটল।

—'ওসিপ্! ওসিপ্ দাভিদোভিচ্! কি নিষ্ঠুর ওরা...'

স্তকমান হাত নাড়াতে গেল, কিন্তু বসন্তের দাগওয়ালা সেপাইটা লাফিয়ে উঠে তার হাতটা চেপে ধরল। হেঁড়ে, বুনো গলায় চেঁচিয়ে উঠল :

—'বসে থাক, নইলে দু টুকরো করে ফেলব।'

তার সহজ সরল জীবনে এই প্রথম একটা মানুষকে সে দেখতে পেয়েছে যে স্বয়ং জারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও সাহস করে।

॥ ছয় ॥

তাতার্স্ক গ্রাম থেকে ছোট্ট শহর রাদ্‌জিভিল্লোভো পর্যন্ত সুদীর্ঘ পথটি ধরাছোঁয়ার অতীত এক ধূসর কুয়াসায় ঢাকা পড়ে রইল কোথায়, কতদূর পেছনে। মাঝে মাঝে রাস্তাটা মনে করবার চেষ্টা করে গ্রিগর, কিন্তু শুধু আবছা আবছা মনে পড়ে স্টেশনগুলো, কামরার অসমতল মেঝের নীচে চাকা ঘুরছে সশব্দে, ঘোড়া আর খড়ের গন্ধ, কামরার নীচে দিয়ে পিছিয়ে চলছে রেল-লাইনের সুদীর্ঘ-রেখা, খোলা দরজা দিয়ে ঢোকা পুঞ্জীভূত ধোঁয়া, আর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা এক শান্ত্রীর দাড়িওয়ালা একখানা মুখ—ভোরোনেঝ্ না কিয়েভ, কোন স্টেশনে মনে নেই তা।

ট্রেন থেকে যেখানে তারা নামল সেখানে অফিসার আর গ্রেট্-কোট গায়ে দাড়ি-গোঁফকামানো লোকের ভিড়। যে ভাষায় তারা কথা বলছিল তা গ্রিগর বুঝতে পারে নি। ঘোড়াগুলো নামাতে অনেকটা সময় লাগল; কিন্তু সে কাজ সমাধা হলে সহকারী কমান্ডার তিনশ, কি তারও বেশি কসাকদের নিয়ে হাজির করল পশু হাসপাতালে॥

তখন চলল ঘোড়া পরীক্ষা করার নিয়মকানুনের লম্বা পালা। তারপর দল ভাগ করার ব্যাপার। প্রথম দল ভাগ করা হল হালকা-বাদামি ঘোড়াগুলো দিয়ে, দ্বিতীয় দল হল লালচে-বাদামি আর লাল ঘোড়া দিয়ে, তৃতীয় দল কালচে-বাদামি দিয়ে। গ্রিগর পড়ল চতুর্থ দলে—বাদামি আর সোনা-রঙের ঘোড়া দিয়ে হল যে দলটা। পঞ্চম দল হল পুরোপুরি বাদামি ঘোড়া দিয়ে, ষষ্ঠ দল কালো দিয়ে।

পাথরে-বাঁধানো বড় রাস্তার ওপর দিয়ে তাদের চলার পথ। বাঁধানো রাস্তায় কোন-দিন চলে নি ডনের ঘোড়াগুলো, প্রথম প্রথম পেছনে কান বেঁকিয়ে নাকের শব্দ করতে করতে তারা চলতে লাগল আলতো পা ফেলে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তারা অভ্যস্ত হয়ে গেল রাস্তার অপরিচিত এই অদ্ভুত স্পর্শে। পোলাণ্ডের এই অপরিচিত অঞ্চলে ফাঁকা ফাঁকা গাছপালার এলোমেলো সারি। মেঘে ঢাকা উষ্ণ দিন, গাঢ় মেঘের পর্দার আড়ালে সূর্য সরে সরে যাচ্ছে।

রাদ্‌জিভিল্লোভো স্টেশন থেকে মাইল তিনেক দূরে। আধঘণ্টার মধ্যে তারা পৌঁছে গেল। ঘোড়ার ঘাড়ে টোকা দিতে দিতে গ্রিগর দেখতে লাগল নতুন তৈরি দোতলা বাড়িটা, কাঠের বেড়া, খামারবাড়ির অপরিচিত ছাঁদ। ফলের বাগানের পাশ দিয়ে যাবার সময় কানে এল শূন্য গাছগুলোর ফিসফিসানি,—সেই একই ভাষা, যেমনটি শুনেছে সুদূর ডনের দেশে।

জীবনের ক্লান্তিকর অসাড় দিকটা দেখা দিল কসাকদের কাছে। মাঠের কাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে প্রথমটায় খুবই তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়তে লাগল, অবসরটুকু কাটাতে লাগল গল্পগুজব করে। বাড়িটার টালিছাওয়া বিরাট অংশটায় গ্রিগরের দলটা রইল, ঘুমুবার জায়গা হল জানলার নীচে ঘাসের মাদুরে। একেবারে কোণের জানলার নীচে গ্রিগরের বিছানা। জানলার ফাঁকে-সাঁটা কাগজে রাত্রে হাওয়ায় আওয়াজ ওঠে বহুদূর থেকে বাজানো রাখালের শিঙের মত, আর সেই আওয়াজ শুনতে শুনতে প্রায় এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ার জন্যে, আকাঙ্ক্ষা জাগে আস্তাবলে চলে যেতে, ঘোড়ার পিঠে জিন চাপাতে, তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে—ঘোড়া ছুটতে থাকবে যতদিন না আবার সে বাড়ি গিয়ে পৌঁছায়।

ভোর পাঁচটায় ঘুমভাঙানো বিউগিল বাজে। দিনের প্রথম কাজ ঘোড়াগুলো পরিষ্কার করা, দলাইমলাই করা। ঘোড়াগুলো যখন দানাপানি খায় তখন আধঘণ্টা-টেকের জন্যে আজেবাজে গল্পের সুযোগ জুটে যায়।

—'এ এক ছ্যাঁচড়া জীবন রে, ভাই!'

—'আমার মন লাগছে না একটুও।'

—'আর সার্জেণ্ট-মেজরটা! শালা কি খচ্চর! ঘোড়ার খুর পর্যন্ত ধুইয়ে ছাড়ে!'

—'এখন বাড়িতে আস্কে পিঠে ভাজছে... আজ শ্রোভ্‌' মঙ্গলবার।

—'বৌ ঠিক বলছে, 'মাইকেল এখন কি করছে; তাই ভাবছি'

ঘোড়াগুলোকে দৌড়ঝাঁপ করানোর সময় অফিসাররা আঙিনার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানে, মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপও করে। ভালো ভালো গ্রেট্‌কোট আর আঁটসাঁট উর্দিপরা, তেলচুকচুকে কার্তিকের মত অফিসারদের দিকে চোখ পড়লে গ্রিগরের মনে হয়, ওদের আর তার মধ্যে এক অনতিক্রম্য প্রাচীরের ব্যবধান। ওদের এই পৃথক, সুনিয়ন্ত্রিত, কসাকদের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবন কাটে নিরুদ্বেগে—কাদার হাঙ্গামা নেই, মাছি-উকুনের হাঙ্গামা নেই, সার্জেণ্ট মেজরের চড়থাপ্পড়ের ভয় নেই।

রাদ্‌জিভিল্লোভোয় তাদের পৌঁছুনোর তৃতীয় দিনে এমন একটা ঘটনা ঘটল যা

গ্রিগরের, বিশেষ করে তরুণ কসাকদের মনে বেদনাদায়ক ছাপ রেখে গেল। তাদের শেখান হচ্ছিল ঘোড়ার কসরৎ, হঠাৎ প্রোখোভ ঝিকোভের ঘোড়াটা চলার সময় সার্জেণ্ট-মেজরের ঘোড়াটাকে লাথি মেরে বসল। লাথিটা জোরে লাগেনি, শুধু বাঁ-পায়ের চামড়া একটু কেটে গেল। কিন্তু সার্জেণ্ট-মেজর চাবুকের ঘা কসিয়ে দিল প্রোখোভের মুখে, সোজা তার গায়ের ওপর ঘোড়া চালিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল :

—'যাচ্ছ কোথায়, দেখতে পাও না, শালা শুয়োরের বাচ্চা? দেখাচ্ছি তোমাকে... তিনদিন তুমি কাটাবে আমার সঙ্গে!'

দৃশ্যটি চোখে পড়েছিল কোম্পানি-কমাণ্ডারেরও, কিন্তু তলোয়ারের বাঁটে হাত বুলিয়ে, আলসেমির হাই তুলতে তুলতে সে পেছন ফিরে চলে গেল। প্রোখোভের ঠোঁটদুটো কাঁপতে লাগল, ফুলে ওঠা গাল থেকে রক্তের দাগ মুছে ফেলল। পাশ দিয়ে যেতে যেতে অফিসারদের দিকে তাকাল গ্রিগর, কিন্তু তারা তখন গল্প করছিল নিরুদ্বিগ্নে, যেন তেমন বিশেষ কিছুই ঘটে নি।

॥ সাত ॥

ক্লান্তিকর একঘেয়ে জীবনযাত্রার পদ্ধতি তরুণ কসাকদের প্রাণটাকে পিষে ফেলল। সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটানা পায়ের ওপর খাড়া থাকতে হয়, ঘোড়াগুলোকে দৌড়-ঝাঁপ করাতে হয়, সন্ধ্যের সময় দলাইমলাই করে খাওয়াতে হয়। রাত দশটার সময়, নাম-ডাকার পর, পাহারা খাড়া করিয়ে দিয়ে তাদের হাজির হতে হয়, আর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লাইনগুলোয় চোখ বুলিয়ে সার্জেণ্ট-মেজর সুর করে যিশুর ভজন গাইতে থাকে।

সকালবেলায় আবার শুরু হয় সেই একই রুটিন। একটা দিনের মতই আর একটা দিন।

গোটা বাহিনীতে মাত্র দুটি মেয়েছেলে, খানসামার বুড়ী স্ত্রী, আর তার রান্নাঘরের সুন্দর-পানা যুবতী, ঝি ফ্রানিয়া। ফ্রানিয়াকে প্রায়ই দেখা যায় রান্নাঘরে, সেখানে ভুরুহীন, বুড়ো বাবুর্চির এক্তিয়ার। উঠোন দিয়ে দৌড়ে গেলে তার দেহের প্রতিটি ভঙ্গি লক্ষ্য করে সৈনিকেরা। কসাকদের তিনশজোড়া চোখ থেকে ঝরে পড়া কামনার স্রোতে সে যেন স্নান করে ওঠে। রান্নাঘর আর বাড়ির মধ্যে দৌড়ে দৌড়ে আসতে যেতে তাতানোর জন্যে সে পাছা দোলায়, প্রতিটি দলের দিকে তাকিয়েই সে হাসে, অবশ্য হাসে বিশেষ করে অফিসারদের দিকে তাকিয়েই। তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে সকলে মারামারি করলেও, কিন্তু গুজব, কোম্পানি-কমাণ্ডারই শুধু তাকে জয় করতে পেরেছে।

বসন্তের প্রথম দিকে একদিন বড় আস্তাবলে গ্রিগরের সারাদিন ডিউটি ছিল। বেশির-ভাগ সময়ই সে এক কোণে বসেছিল, সেখানে এক মাদী ঘোড়ার উপস্থিতিতে অফিসারদের ঘোড়াগুলো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। কোম্পানি-কমাণ্ডারের ঘোড়ার খাঁচাটা সবে পেরিয়ে এসেছে, এমন সময় আস্তাবলের শেষ প্রান্তে অন্ধকার কোণ থেকে ধাক্কাধাক্কি আর চাপা-কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল। এই অস্বাভাবিক আওয়াজে একটু অবাক হয়ে সে তাড়াতাড়ি খাঁচাগুলো পেরিয়ে গেল। কে একজন আস্তাবলের

দরজাটা ঘড়াৎ করে বন্ধ করে দিতেই হঠাৎ তার চোখে সব অন্ধকার হয়ে গেল, শুনতে পেল একজন চাপা গলায় চেঁচাচ্ছে :

—'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি, সব।'

দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল গ্রিগর, চেঁচিয়ে উঠল :

—'কে কথা বলছে?'

পরমুহূর্তে তারই কোম্পানির এক সার্জেণ্টের সঙ্গে তার ঠুকোঠুকি হয়ে গেল, লোকটা দরজা হাতড়াচ্ছে।

—'ও, তুমি, মেলেখফ?' গ্রিগরের কাঁধে হাত রেখে সে ফিসফিস করে বলল।

—'দাঁড়াও, হচ্ছে কি এসব?' গ্রিগর ধমক দিল।

সার্জেণ্টটি অপরাধীর মত খিকখিক করে হাসতে হাসতে গ্রিগরের জামার হাতা চেপে ধরল। গ্রিগর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল। মুহূর্তের জন্যে আলোয় চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল। আস্তাবলের কোণ থেকে আরও গোলমাল শুনতে পেয়ে হাত দিয়ে আলো আড়াল করে ঘুরে দাঁড়াল সে। দেখতে পেল পা-জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে ঝারকোভ আসছে।

—'কি হচ্ছে..তোমরা করছ কি ওখানে?'

—'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।' ঝারকোভ ফিসফিস করে বলল, তার নাকের নিঃশ্বাস গ্রিগরের গালে এসে লাগল। 'ফ্রানিয়াকে টেনে নিয়ে গিয়েছে ওখানে...ন্যাংটা করে ফেলেছে।' এক ঘুঁসিতে গ্রিগর তাকে দেয়ালের গায়ে ছিটকে ফেলতেই তার খিকখিক হাসি আচমকা বন্ধ হযে গেল। কোণের দিকে দৌড়ে গিয়ে গ্রিগর দেখল, প্রথম দলের কসাকরা মাঝখানটিতে পোঁছুবার জন্যে হুড়োহুড়ি করছে। তাদের ঠেলে গ্রিগর নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। দেখতে পেল, মেঝের ওপর ফ্রানিয়া নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে, ঘোড়াঢাকা চট দিয়ে তার মাথাটা ঢাকা, কাপড়চোপড় ছেঁড়া, বুকের ওপর টেনে তোলা, সাদা উরু দুটো নির্লজ্জের মত বীভৎসভাবে ফাঁক করা। তার ওপর থেকে সবেমাত্র একজন কসাক উঠল, পা-জামাটা মুঠো করে ধরে, সঙ্গীদের দিকে না তাকিয়ে, বোকার মত হাসি-হাসি মুখে পরের জনের রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসে, সার্জেণ্ট-মেজরকে ডাকতে ডাকতে গ্রিগর দরজার দিকে ছুটল। অন্য কসাকরা পেছন পেছন ছুটে এসে দরজার কাছে তাকে ধরে ফেলল, মুখে হাত চাপা দিয়ে পেছনে ঠেলে দিল। একজনকে ঘুঁসিতে কাত করে দিল গ্রিগর, আর একজনের পেটে লাথি চালাল, কিন্তু আর সকলে মিলে তার মাথায় গলিয়ে দিল একটা চটের থলে, হাতদুটো পিছু-মোড়া করে বেঁধে ফেলল; তারপর তাকে ছুঁড়ে দিল একটা খাঁচার মধ্যে। থলের ন্যক্কারজনক গন্ধে দম আটকে এল তার, চিৎকার করতে চেষ্টা করল, পাগল হয়ে কাঠের দেয়ালে লাথি মারতে লাগল। কোণ থেকে ফিসফিস শব্দ, আর কসাকদের আসা-যাওয়ায় দরজা খোলা-বন্ধের ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ কানে আসতে লাগল। মিনিটকুড়ি পরে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হল। তখন দরজার সামনে সার্জেণ্ট-মেজর আর দুজন কসাক দাঁড়িয়ে।

—'মুখ বন্ধ করে থাকবে তুমি!' তার দিকে না তাকিয়ে চোখ পিটপিট করে সার্জেণ্ট-মেজর বলল।

কসাক দুজন ভেতরে চলে গেল। ফ্রানিয়ার নিস্পন্দ দেহটা তুলে নিয়ে খাঁচা বেয়ে উঠে দেয়ালের একখানা কাঠের ফাঁক দিয়ে ছুঁড়ে দিল। দেয়ালটা বাগানের দিকে। প্রত্যেকটা খাঁচার মাথায় একটা করে জানলা। ফ্রানিয়া কি করে তাই দেখবার জন্যে

কয়েকজন কসাক খাঁচার দেয়াল বেয়ে উঠল, আর সকলে ছুটল আস্তাবলের বাইরে। এক পাশবিক কৌতূহল পেয়ে বসল গ্রিগরকে, দেয়াল বেয়ে একটা জানলার কাছে এসে নীচের দিকে তাকাল সে। ঠিক এমনি ভাবেই জোড়াছয়েক চোখ জানলার নীচে পড়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি চিৎ হয়ে পড়ে আছে, পাদুটো কাঁচির ফলার মত জুড়ে যাচ্ছে, আবার খুলছে, আঙুল দিয়ে পাশের বরফ খিমচে খিমচে ধরছে।

অনেকক্ষণ সে ওখানে পড়ে রইল, তারপর অবশেষে হাতে পায়ে ভর দিয়ে উঠবার চেষ্টা করল। গ্রিগর স্পষ্ট দেখতে পেল, তার হাতদুটো থর থর করে কাঁপছে, ভর রাখতে পারছে না। টলমল করতে করতে পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াল সে; আলুথালু বেশে, প্রেতের মত, গভীর বিদ্বেষে ওপরের জানলাগুলোয় বহুক্ষণ ধরে আস্তে আস্তে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

তারপর সে চলতে শুরু করল; এক হাতে উড-বাইন ঝোপ আঁকড়ে ধরে, অপর হাতে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে, থেমে থেমে এগুতে লাগল।

একটা লাফ দিয়ে নামল গ্রিগর, গলাটা ঘসে নিল, মনে হল দম আটকে আসছে। দরজার কাছে কে একজন—পরে তার মনেও নেই কে সে—স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলল :

—'একটা কথা ফাঁস করেছ কি.. যিশুর দিব্যি, কোতল করে ছাড়ব।'

কুচকাওয়াজের মাঠে ট্রুপ-কমাণ্ডারের নজরে পড়ল, গ্রিগরের গ্রেট-কোটের একটা বোতাম ছেঁড়া। জিজ্ঞেস করল :

—'কার সঙ্গে লড়ছিলে? বলি, এর নাম কি?'

গ্রিগর নীচের দিকে তাকাল, ছেঁড়া বোতামের জায়গায় ছোট্ট একটা ফুটো : ঘটনার স্মৃতি তাকে এমনই অভিভূত করে ফেলল যে বহুদিন পর এই প্রথম তার কান্না পেয়ে গেল।

যুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

জ্বলাই মাসের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দ্বরে স্তেপের ব্বকে বিছিয়ে রয়েছে একটা গ্বমট, আবছায়া পর্দা। পাকা গমের স্রোত থেকে ধোঁয়ার মত হলদে ধ্বলোর গ্বঁড়ো উড়ছে। কাটাই-কলের লোহার অংশগ্বলো এত গরম যে, হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না। নীলচে-হলদে গনগনে আকাশের দিকে তাকানো কষ্টকর। গম যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে শ্বর্ব হয়েছে জাফরানি রঙের আগাছার ঘের।

গোটা তাতার্স্ক গ্রামই নেমে পড়েছে স্তেপেতে। রোদের তাপে আর কড়া ধ্বলোয় ঘোড়াগ্বলোর দম আটকে আসছে, কাটাই-কল টানতে টানতে চঞ্চল হয়ে উঠছে। নদীর দিক থেকে হাওয়া এসে স্তেপের ব্বক থেকে ধ্বলোর মেঘ উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। স্বর্য ঢাকা পড়েছে রিন-রিন-করা এক বাষ্পের পর্দায়।

কাটাই-কল থেকে গম ছাড়াচ্ছে পিয়োত্রা। সেই সকাল থেকে এ পর্যন্ত আধ-বলতি জল খেয়ে ফেলেছে। গরম, বিস্বাদ জল খাবার মিনিটখানেকের মধ্যেই আবার গলা শ্বকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে। সার্ট ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে, ম্বখ বেয়ে ঘাম ঝরছে, কানের মধ্যে একটানা ভোঁ ভোঁ করছে। র্বমালে ম্বখ ঢেকে, জামার বোতাম খ্বলে দিয়ে গমের আঁটি বাঁধছে দারিয়া। ঠেলে বেরিয়ে আসা তার দ্বই স্তনের মাঝখানে ফোঁটা ফোঁটা ধ্বসর রঙের ঘাম গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে। নাতালিয়া ঘোড়াদ্বটোকে চালাচ্ছে। রোদে প্বড়ে গালের রঙ হয়েছে বীটের রঙের মত; ঝাঁ ঝাঁ রোদে চোখে জল ভরে উঠছে। গমের আঁটির ওপর দিয়ে আসছে যাচ্ছে পান্তালিমন, ঘামে-ভেজা জামাটা গায়ে জ্বালা ধরাচ্ছে। দাড়ির ছোঁয়ায় মনে হচ্ছে, গরম তেল ব্বকে গড়িয়ে নামছে।

দারিয়া আর সহ্য করতে পারল্য না। চেঁচিয়ে ডাকল :

—'পিয়োত্রা, এসো আবার থামি।'

—'আর একটু ক্ষণ; এই সারটা শেষ করে ফেলি।' উত্তর দিল সে।

—'ঠাণ্ডা না পড়া পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাক। আমি আর পারছি না।'

ঘোড়া থামাল নাতালিয়া। তার ব্বক এমন ফুলে ফুলে উঠছে যেন মনে হচ্ছে, কাটাই-কলটা সে-ই টানছে। কাটা-ফসলের ওপরে সন্তর্পণে পা ফেলে, আড়াআড়ি মাঠ পেরিয়ে ঘোড়ার কাছে এল দারিয়া।

—'বিল থেকে আমরা খ্বব দ্বরে নই, পিয়োত্রা।'

—'দ্বর না! শ্বধ্ব মাইল দ্বয়েকের মত!'

—'স্নান করে নিলে বেশ হয়।'

—'ওখানে হেঁটে গিয়ে ফিরে আসতেই তো...।' নাতালিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

—'হাঁটতে যাব কোন দুঃখে? ঘোড়া খুলে নিয়ে চেপে যাব।'

একটা আঁটি বেঁধে নিয়ে পিয়োত্রা অস্বস্তিভরে বাপের দিকে তাকাল, তারপর হাত দুলিয়ে বলল :

—'তাই হক, ঘোড়াগুলো খুলে ফেল।'

বাঁধন খুলে নিয়ে মাদীটার পিঠে কায়দা করে লাফিয়ে উঠল দারিয়া। হাসতে হাসতে নাতালিয়া তার ঘোড়াটা কাটাই-কলের কাছে টেনে নিয়ে গেল, চালকের আসন থেকে পিঠে উঠতে চেষ্টা করল। পিয়োত্রা সাহায্য করতে এগিয়ে এল, পা ধরে তুলে দিল ঘোড়ার পিঠে। তিনজন চলল ঘোড়ায় চেপে। দারিয়া ঘোড়ার পিঠে বসেছে কসাক-কায়দায়, নগ্ন হাঁটুর ওপরে গুটিয়ে নিয়েছে ঘাঘরা, মাথার পেছনে রুমাল কসে বাঁধা।

হালট পেরিয়ে আসতেই পিয়োত্রা বাঁয়ে তাকাল, দেখতে পেল, গ্রামের দিকে বড়-রাস্তা ধরে অতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে একটা ধুলোর মেঘ।

—'কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে!' চোখদুটো কুঞ্চিত করে পিয়োত্রা নাতালিয়াকে বলল।

—'আর কি জোরে! দেখ দেখ কি ধুলো!' বিস্মিত ভাবে নাতালিয়া উত্তর দিল।

—'কে রে বাবা! ও দারিয়া!' বৌকে ডাক দিল পিয়োত্রা। 'ঘোড়া থামাও একটু, দেখি না কে যাচ্ছে।'

মাঠের একটা নাবালে ঢাকা পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ধুলোর মেঘ, আবার দেখা গেল অপর পারে। ধুলোর আড়ালে আরোহীর মূর্তি চোখে পড়ল এতক্ষণে। খড়ের টুপির কোণায় নোংরা হাতটা ঠেকিয়ে, ঘোড়ার পিঠে বসে তাকিয়েছিল পিয়োত্রা, ভুরু কুঁচকে হাতটা নামিয়ে নিল, উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠল মুখে।

এবার স্পষ্ট দেখা গেল ঘোড়সোয়ারকে। ভীষণ বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে, বাঁ-হাত দিয়ে টুপিটা ধরে রেখেছে, ডান হাতে পত্পত্ করে উড়ছে একটা ধুলোমাখা লাল-ঝাণ্ডা। হালটের এত কাছ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল যে, ঘোড়ার শ্বাস ফেলার দ্রুত শব্দও কানে এল তার। পাশ দিয়ে যাবার সময় লোকটা চেঁচিয়ে উঠল :

—'কোমর বাঁধ, তৈয়ার হও!'

ঘোড়ার মুখ থেকে হলদে রঙের পিচ্ছিল ফেনার একটা টুকরো উড়ে এসে খুরের চাপে তৈরি মাটির একটা গর্তের মধ্যে পড়ল। পিয়োত্রার দৃষ্টি ঘোড়সোয়ারকে অনুসরণ করে চলল। অপসৃয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ইস্পাতের ফলার মত চকচকে, ঘামে-ভেজা ঘোড়ার পেছনদিকটা যেন তার মনে আঁকা হয়ে গেল।

অবশেষে কি দুর্ভাগ্যের দিন এল, তার স্বরূপ তখনো বুঝে উঠতে না পেরে পিয়োত্রা ধুলোয় ছটকে পড়া ফেনার টুকরোর দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ ফেরাল তরঙ্গায়িত স্তেপের দিকে। হলদে ঘাসের ওপর দিয়ে, চারপাশ থেকে কসাকরা গ্রামের দিকে ছুটছে। স্তেপের ওপারে, বহুদূরের ডাঙাজমির কাছটায় ধুলোর ছোট ছোট মেঘ চোখে পড়ছে, বোঝা যাচ্ছে, ওগুলো ঘোড়সোয়ার। হালট ধরে তারা ভিড় করে চলেছে, রাস্তা বরাবর ধুলোর দীর্ঘরেখা উড়ছে।

—'এসব আবার কি!' ভয়ার্তচোখে পিয়োত্রার দিকে তাকিয়ে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল নাতালিয়া। ফাঁদে পড়া খরগোশের মত চোখের দৃষ্টি পিয়োত্রাকে চমকিয়ে দিল। পিয়োত্রা ঘোড়া ছুটিয়ে কাটাই-কলের কাছে ফিরে গেল, ঘোড়াটা থামাবার আগেই লাফ

দিয়ে নামল, কাজের সময় খুলে রাখা পা-জামাটা গলিয়ে নিল' তারপর আরও একটা ধুলোর মেঘ তুলে ছুটে বেরিয়ে গেল স্তেপের মধ্যে, সেখানে ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে আরও অনেকগুলো ধুলোর মেঘ।

॥ দুই ॥

বারোয়ারিতলায় চোখে পড়ল, বড়সড় একটা ভিড় জমেছে। অনেকেই ইতিমধ্যে ফৌজী উর্দি আর সাজসজ্জা গায়ে চড়িয়েছে। আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে আতামান রেজিমেণ্টের নীল ফৌজী টুপিগুলো।

গ্রামের সরাইখানা বন্ধ। ফৌজী কমিসারের মুখে বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন ছাপ। পরবের দিনের জামাকাপড় পরে মেয়েরা রাস্তা বরাবর বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মুখেই একটিমাত্র কথা: 'ডাক পড়েছে!' নেশাধরা উত্তেজিত মুখগুলো। ঘোড়াদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে সর্বজনীন উদ্বেগ, ক্রুদ্ধ হয়ে তারা পা ছুঁড়ছে, গুঁতোগুঁতি করছে, নাক দিয়ে আওয়াজ করছে। বারোয়ারিতলায় খালি বোতল আর সস্তা-দামী মিঠাইয়ের কাগজের ছড়াছড়ি। বাতাসে দুলছে ধুলোর একটা হালকা মেঘ।

জিন-চাপানো ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে টানতে টানতে এগিয়ে গেল পিয়োত্রা। গির্জার বেড়ার কাছে আতামান রেজিমেণ্টের এক স্বাস্থ্যবান কসাক নীল পা-জামার বোতাম আঁটছে, মুখে একগাল হাসি, আর তার সামনে হৃষ্টপুষ্টা, বেঁটেখাটো একটি স্ত্রীলোক—তার স্ত্রী কিংবা প্রেমিকা—দাপাদাপি আর ঘ্যান ঘ্যান করছে। তার কাছেই লাল-দাড়িওয়ালা এক সার্জেণ্ট-মেজর এক গোলন্দাজের সঙ্গে তর্ক করছে:

—'কিছুই হবে না, ঘাবড়ানোর কিচ্ছু নেই।' সে আশ্বাস দিল। 'ডাক পড়েছে দিন কয়েকের জন্যে, তারপর আবার ঘরে ফিরে আসব।'

—'কিন্তু যদি লড়াই বেধে গিয়ে থাকে?'

—'ধুর্! কার এমন হিম্মৎ আছে, আমাদের সামনে দাঁড়াবে?

পাশে একটা দলের মধ্যে এক সুশ্রী বয়স্ক কসাক রাগে গরগর করছে।

—'এর সঙ্গে সম্পর্ক কি আমাদের! লড়াই করুক ওরাই, এখনো ফসল ওঠে নি ঘরে।'

—'কি লজ্জার কথা! দাঁড়িয়ে আছি এখানে, আর এমন দিনে গোটাবছরের ফসল ঘরে তুলে ফেলতে পারতাম।'

—'আঁটিগুলোর মধ্যে গরুবাছুর ঢুকে পড়বে।'

—'এই সবে শুরু করেছিলাম ফসল কাটা!'

—'আতামানসাহেব কিন্তু বলেছিলেন, কিছু ঘটলে, তবেই ডাক পড়বে আমাদের!'

—'আর বারোটা মাস কাটাতে পারলেই রিজার্ভের তৃতীয় দল থেকে বেরিয়ে যেতে পারতাম।' এক বয়স্ক কসাক বলল দুঃখের সঙ্গে।

—'ভেবো না, দাদা, মানুষ খতমের পালা শুরু হলেই বুড়োদেরও ডাক পড়বে।' একজন আশ্বস্ত করল তাকে।

তিনজন কসাক ধরাধরি করে, চুর-মাতাল, রক্তমাখা চতুর্থ এক কসাককে কাচারি-

আস্ত্র এনে হাজির করল। পেছনদিকে ধাক্কা দিল সে, সার্টটা টেনে খুলে ফেলল, তারপর চোখ পাকিয়ে চে'চিয়ে উঠল :

—'দেখিয়ে দেব ওদের 'চাষাদের'! রক্ত খাব ওদের! তখন টের পাবে ডন কসাকদের।'

তাকে ঘিরে দাঁড়ানো লোকগুলো সায় দিয়ে হেসে উঠল :

—'ঠিক বলেছ! দেখিয়ে দিও ওদের!'

—'ওকে বে'ধেছে কেন?'

—''চাষা'র খোঁজে বেরিয়েছিল ও।'

—'ওদের অমন হওয়াই উচিত, বুঝলে; আরও বেশ কিছু দিয়ে দেব ওদের।'

—'১৯০৫ সনে ওদের ঠাণ্ডা করার সময় আমাকেও হাত লাগাতে হয়েছিল। সে এক দেখবার মত জিনিস!'

—'লড়াই বাধছে। আমাদের আবার পাঠাবে ওদের ঠাণ্ডা করতে'

মোখোভের দোকানের বাইরে গিসগিস করছে লোকের ভিড়। মাঝখানে দাঁড়িয়ে সার্জ প্লাতোনোভিচের সঙ্গে মাতালের মত তর্ক করছে ইভান তোমিলিন। 'এসব কি আবার?' মোখোভ বোঝাবার চেষ্টা করছে, 'একেই বলে জুলুম! ওরে, যা তো, আতামানকে ডেকে আন দৌড়ে।'

ঘাসে-ভেজা হাতদুটো পা-জামায় মুছে নিয়ে তোমিলিন ভুরু-কোচকানো ব্যাপারীর গায়ে চেপে এল, দাঁত খি'চিয়ে বলল :

'সুদে সুদে আমাদের শুষে নিয়েছিস, শালা শুয়োর। এখন বুঝি টের পেয়েছিস হাওয়া বইছে কোন দিকে। মুখ থে'তলে দেব, শালা, সাপের বাচ্চা।'

আতামান তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে চারধারে ঘিরে দাঁড়ানো কসাকদের কানে মিষ্টি কথার মধুবর্ষণ করছে : 'লড়াই? কে বললে? লড়াইফড়াই হবে না। কমিসার বলেছেন, ডাক পড়েছে শুধু জরুরি অবস্থার জন্য তৈরি থাকার উদ্দেশ্যে। ভয় পাবার কিছু নেই।'

—'বেশ, বেশ! ঘরে ফিরেই আবার মাঠে নামব।' একসঙ্গে বলে উঠল সবাই।

উত্তেজিত মানুষের ভিড়ে বারোয়ারিতলা সরগরম হয়ে রইল অনেক রাত পর্যন্ত।

॥ তিন ॥

তাতার্স্ক ও আশেপাশের গ্রামের রিজার্ভের প্রথম দলের কসাকরা বাড়ি ছাড়ার পরের রাতটা কাটালো ছোট একটা গ্রামে। তাতার্স্ক গ্রামের ভাটির লোকেরা উজানের লোকদের থেকে পৃথক দলে রইল, তাই পিয়োত্র মেলেখভ, আনিকুস্‌কা, ক্রিস্তোনিয়া, স্তেপান আস্তাখফ, ইভান, তোমিলিন ও আর আর সকলের আস্তানা হল এক বাড়িতে। রান্নাঘর আর সামনের ঘরটায় ঘোড়ার চট্‌ বিছিয়ে শুয়েছে ঘুমুবার জন্যে, রাতের মত শেষ তামাক টেনে নিচ্ছে। বাড়ির মালিক লম্বামত, এক থুত্থুরে বুড়ো—লোকটা তুর্কী-যুদ্ধে গিয়েছিল—এসে বসল গল্প করতে।

—'তা হলে লড়াইতে চললেন সেপাইরা?'

—'হ্যাঁ, ঠাকুর্দা, চললাম লড়াইতে।'

—'এটা তুর্কী-লড়াইএর মত হবে বলে তো আমার মনে হয় না। আজকাল হাতিয়ার পাল্টে গেছে!'

—'সেই একই রকম হবে এবারেও। একই রকম ভয়ঙ্কর। আগেও তুর্কীদের মারতে হয়েছিল ওদের যেমন, আমাদেরও তেমনি মারতে হবে।' খেঁকিয়ে উঠল তোমিলিন, কার ওপর যে চটল, তা কে জানে।

—'একটা কথা জিজ্ঞেস করছি বাছারা। জিজ্ঞেস করছি খুব ভেবে চিন্তেই, আর মনে রাখবে যে কথা বলছি।' বুড়ো বলল, 'একটা জিনিস মনে রাখবে! এই কাটাকাটির মধ্যে থেকে যদি চামড়া বাঁচিয়ে জ্যান্ত ফিরতে চাও, তাহলে মানবতার আইন মেনে চলবে।'

—'কোন আইন?' অনিশ্চিতভাবে হেসে প্রশ্ন করল স্তেপান আস্তখফ। যেদিন থেকে যুদ্ধের কথা শুনেছে, সেদিন থেকে আবার হাসতে শুরু করেছে সে। যুদ্ধ ডাক দিয়েছে তাকে, সর্বজনীন উদ্বেগ আর বেদনা নরম করে দিয়েছে তার নিজের বেদনাকে।

—'তা এই : অন্যের জিনিস নেবে না। এ হল এক। কোন মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার করবে না। এ হল দুই। আর তারপর শিখে নিতে হবে, কয়েকটা বিশেষ মন্তর।'

উঠে বসল কসাকরা, কথা বলতে শুরু করল সবাই একসঙ্গে।

—'যদি নিজের কোন জিনিস না হারাই—অন্যের জিনিস নেওয়ার কথা ওঠে না তাহলে!'

—'আর, মেয়েমানুষ ছোঁব না কেন? কেমন করে সে লোভ সামলাব?'

তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল বুড়ো, উত্তর দিল :

—'মেয়েছেলেকে ছোঁবে না। কখ্খনো না! লোভ যদি সামলাতে না পার, তাহলে হয় গর্দান উড়বে, নয়ত চোট পাবে।' তার জন্যে পরে পস্তাতে হবে, তখন কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে। মন্তরগুলো বলছি তোমাদের। যমকে শিয়রে নিয়ে আমি তুর্কী-লড়াইতে ঘুরেছি, কিন্তু জ্যান্ত ফিরেছি শুধু এই মন্তরগুলোর দৌলতে।

অন্য ঘরটায় চলে গেল সে। আইকনের তলা হাতড়ে একটা ঝুরঝুরে, রং-চটা কাগজের টুকরো নিয়ে এল।

—'ওঠো সব, লিখে নাও এগুলো।' বুড়ো হুকুম করল। 'ভোরের আগেই কাল তোমরা রওনা হবে, তাই না।'

টেবিলের ওপর কাগজটা মেলে দিয়ে সরে দাঁড়াল সে। প্রথমে উঠল আনিকুশ্‌কা। কেঁপে কেঁপে ওঠা আলোর ছায়া তার মসৃণ, মেয়েলি মুখের ওপর নাচতে লাগল। স্তেপান ছাড়া, সবাই বসে বসে মন্তরগুলো লিখে নিতে লাগল। লেখা শেষ হলে কাগজটা পাকিয়ে বুকের কাছের ক্রুশটার সুতোর সঙ্গে বেঁধে রাখল আনিকুশ্‌কা। স্তেপান ঠাট্টা করে বলল :

—'উকুনের বেশ ভাল বাসা তৈরি করে রাখলে হে।'

—'বিশ্বাস না করলে চুপ করে থাক, ছোকরা!' কড়া গলায় ধমক দিল বুড়ো। 'অন্যের কাছে পাপের ভাগী হয়ে থেকো না, বিশ্বাসকে ঠাট্টা করো না।'

স্তেপান একটু হাসল, কিন্তু চুপ করে গেল।

কসাকরা যে মন্তর লিখে নিল, তা সংখ্যায় তিনটি, যার যেটা খুশি বেছে নিতে পারে। আক্রমণ করার সময়কার মন্তরটা এই :

ঘরে এসে হাজির করল। পেছনদিকে ধাক্কা দিল সে, সার্টটা টেনে খুলে ফেলল, তারপর চোখ পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

—'দেখিয়ে দেব ওদের 'চাষাদের'! রক্ত খাব ওদের! তখন টের পাবে ডন কসাকদের।'

তাকে ঘিরে দাঁড়ানো লোকগুলো সায় দিয়ে হেসে উঠল :

—'ঠিক বলেছ! দেখিয়ে দিও ওদের!'

—'ওকে বেঁধেছে কেন?'

—' 'চাষা'র খোঁজে বেরিয়েছিল ও।'

—'ওদের অমন হওয়াই উচিত, বুঝলে; আরও বেশ কিছু দিয়ে দেব ওদের।'

—'১৯০৫ সনে ওদের ঠাণ্ডা করার সময় আমাকেও হাত লাগাতে হয়েছিল। সে এক দেখবার মত জিনিস!'

—'লড়াই বাধছে। আমাদের আবার পাঠাবে ওদের ঠাণ্ডা করতে'

মোখোভের দোকানের বাইরে গিসগিস করছে লোকের ভিড়। মাঝখানে দাঁড়িয়ে সার্জি প্লাতোনোভিচের সঙ্গে মাতালের মত তর্ক করছে ইভান তোমিলিন। 'এসব কি আবার?' মোখোভ বোঝাবার চেষ্টা করছে, 'একেই বলে জুলুম! ওরে, যা তো, আতামানকে ডেকে আন দৌড়ে।'

ঘাসে-ভেজা হাতদুটো পা-জামায় মুছে নিয়ে তোমিলিন ভুরু-কোচকানো ব্যাপারীর গায়ে চেপে এল, দাঁত খিঁচিয়ে বলল :

'সুদে সুদে আমাদের শুষে নিয়েছিস, শালা শুয়োর। এখন বুঝি টের পেয়েছিস হাওয়া বইছে কোন দিকে। মুখ থেঁতলে দেব, শালা, সাপের বাচ্চা।'

আতামান তখন ব্যস্তসমস্ত হয়ে চারধারে ঘিরে দাঁড়ানো কসাকদের কানে মিষ্টি কথার মধুবর্ষণ করছে : 'লড়াই? কে বললে? লড়াইফড়াই হবে না। কমিসার বলেছেন, ডাক পড়েছে শুধু জরুরি অবস্থার জন্য তৈরি থাকার উদ্দেশ্যে। ভয় পাবার কিছু নেই।'

—'বেশ, বেশ! ঘরে ফিরেই আবার মাঠে নামব।' একসঙ্গে বলে উঠল সবাই।

উত্তেজিত মানুষের ভিড়ে বারোয়ারিতলা সরগরম হয়ে রইল অনেক রাত পর্যন্ত।

॥ তিন ॥

তাতার্স্ক ও আশেপাশের গ্রামের রিজার্ভের প্রথম দলের কসাকরা বাড়ি ছাড়ার পরের রাতটা কাটালো ছোট একটা গ্রামে। তাতার্স্ক গ্রামের ভাটির লোকেরা উজানের লোকদের থেকে পৃথক দলে রইল, তাই পিয়োত্রা মেলেখভ, আনিকুস্‌কা, ক্রিস্তোনিয়া, স্তেপান আস্তাখফ, ইভান, তোমিলিন ও আর আর সকলের আস্তানা হল এক বাড়িতে। রান্নাঘর আর সামনের ঘরটায় ঘোড়ার চট্ বিছিয়ে শুয়েছে ঘুমুবার জন্যে, রাতের মত শেষ তামাক টেনে নিচ্ছে। বাড়ির মালিক লম্বামত, এক থুথুরে বুড়ো,—লোকটা তুর্কী-যুদ্ধে গিয়েছিল—এসে বসল গল্প করতে।

—'তা হলে লড়াইতে চললেন সেপাইরা?'

—'হ্যাঁ, ঠাকুর্দা, চললাম লড়াইতে।'

—'এটা তুর্কী-লড়াইএর মত হবে বলে তো আমার মনে হয় না। আজকাল হাতিয়ার পাল্টে গেছে!'

—'সেই একই রকম হবে এবারেও। একই রকম ভয়ঙ্কর। আগেও তুর্কীদের মারতে হয়েছিল ওদের যেমন, আমাদেরও তেমনি মারতে হবে।' খেঁকিয়ে উঠল তোমিলিন, কার ওপর যে চটল, তা কে জানে।

—'একটা কথা জিজ্ঞেস করছি বাছারা। জিজ্ঞেস করছি খুব ভেবে চিন্তেই, আর মনে রাখবে যে কথা বলছি।' বুড়ো বলল, 'একটা জিনিস মনে রাখবে! এই কাটাকাটির মধ্যে থেকে যদি চামড়া বাঁচিয়ে জ্যান্ত ফিরতে চাও, তাহলে মানবতার আইন মেনে চলবে।'

—'কোন আইন?' অনিশ্চিতভাবে হেসে প্রশ্ন করল স্তেপান আস্তখফ। যেদিন থেকে যুদ্ধের কথা শুনেছে, সেদিন থেকে আবার হাসতে শুরু করেছে সে। যুদ্ধ ডাক দিয়েছে তাকে, সর্বজনীন উদ্বেগ আর বেদনা নরম করে দিয়েছে তার নিজের বেদনাকে।

—'তা এই : অন্যের জিনিস নেবে না। এ হল এক। কোন মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার করবে না। এ হল দুই। আর তারপর শিখে নিতে হবে, কয়েকটা বিশেষ মন্তর।'

উঠে বসল কসাকরা, কথা বলতে শুরু করল সবাই একসঙ্গে।

—'যদি নিজের কোন জিনিস না হারাই—অন্যের জিনিস নেওয়ার কথা ওঠে না তাহলে!'

—'আর, মেয়েমানুষ ছোঁব না কেন? কেমন করে সে লোভ সামলাব?'

তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল বুড়ো, উত্তর দিল :

—'মেয়েছেলেকে ছোঁবে না। কখ্‌খনো না! লোভ যদি সামলাতে না পার, তাহলে হয় গর্দান উড়বে, নয়ত চোট পাবে।' তার জন্যে পরে পস্তাতে হবে, তখন কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে। মন্তরগুলো বলছি তোমাদের। যমকে শিয়রে নিয়ে আমি তুর্কী-লড়াইতে ঘুরেছি, কিন্তু জ্যান্ত ফিরেছি শুধু এই মন্তরগুলোর দৌলতে।

অন্য ঘরটায় চলে গেল সে। আইকনের তলা হাতড়ে একটা ঝুরঝুরে, রং-চটা কাগজের টুকরো নিয়ে এল।

—'ওঠো সব, লিখে নাও এগুলো।' বুড়ো হুকুম করল। 'ভোরের আগেই কাল তোমরা রওনা হবে, তাই না।'

টেবিলের ওপর কাগজটা মেলে দিয়ে সরে দাঁড়াল সে। প্রথমে উঠল আনিকুশ্‌কা কেঁপে কেঁপে ওঠা আলোর ছায়া তার মসৃণ, মেয়েলি মুখের ওপর নাচতে লাগল। স্তেপান ছাড়া, সবাই বসে বসে মন্তরগুলো লিখে নিতে লাগল। লেখা শেষ হলে, কাগজটা পাকিয়ে বুকের কাছের ক্রুশটার সুতোর সঙ্গে বেঁধে রাখল আনিকুশ্‌কা। স্তেপান ঠাট্টা করে বলল :

—'উকুনের বেশ ভাল বাসা তৈরি করে রাখলে হে।'

—'বিশ্বাস না করলে চুপ করে থাক, ছোকরা!' কড়া গলায় ধমক দিল বুড়ো। 'অন্যের কাছে পাপের ভাগী হয়ে থেকো না, বিশ্বাসকে ঠাট্টা করো না।'

স্তেপান একটু হাসল, কিন্তু চুপ করে গেল।

কসাকরা যে মন্তর লিখে নিল, তা সংখ্যায় তিনটি, যার যেটা খুশি বেছে নিতে পারে। আক্রমণ করার সময়কার মন্তরটা এই :

'দিন-দুনিয়ার মালিক, ভগবানের পবিত্র জননী ও প্রভু যিশুখৃষ্ট। প্রভুর জয় হউক। ভগবানের দাসানুদাস এবং তাহার সহকর্মী যাহারা সঙ্গে আছে, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে; তাহাদিগকে মেঘের দ্বারা আবৃত কর, তোমার স্বর্গীয় শিলাবৃষ্টির দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা কর; হে পবিত্র দুর্মিত্রি সোস্‌লুত্‌স্কি, ভগবানের দাসানুদাস এবং আমার বন্ধুদিগকে চতুঃপার্শ্ব হইতে রক্ষা কর; কোন দুর্বৃত্ত যেন আমাদিগকে তীরবিদ্ধ না করে, কোন বর্শা যেন আমাদিগকে ভেদ না করে, কুঠার যেন আমাদিগকে ছিন্ন না করে, তরবারি যেন আমাদিগকে খণ্ড বা বিদ্ধ না করে, ছুরিকা যেন আমাদিগকে খণ্ড বা বিদ্ধ না করে; বৃদ্ধ বা যুবক, তাম্রবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ, কোন নাস্তিক, কোন ঐন্দ্রজালিক অথবা কোন যাদুকর যেন সক্ষম না হয়। সমুদ্রের মধ্যে বুইয়ান দ্বীপে একটি লৌহস্তম্ভ আছে; সেই স্তম্ভের লৌহদণ্ডে আছে এক লৌহ-মানব, সে ইস্পাত, সীসা তামা এবং সকল প্রকার অস্ত্রশস্ত্র মন্ত্রপূত করে। হে লৌহ, ভগবানের দাসানুদাস আমি, আমার ঘোড়া ও সঙ্গীগণের নিকট হইতে মাতা ধরিত্রীর গর্ভে প্রবেশ কর। তীরের কাষ্ঠ, অরণ্যে প্রবেশ কর, তীরের পালক, মাতা পক্ষিণীর নিকট গমন কর, তীরের আঠা, মৎস্যের নিকট গমন কর। তরবারি, গুলি, কামানের গোলা, বর্শা ও ছুরির হাত হইতে স্বর্ণ-বর্ম দ্বারা ভগবানের দাসানুদাস আমাকে রক্ষা কর। বর্ম হইতেও কঠিন হইয়া উঠুক আমার দেহ। শুভমস্তু।'

কসাকরা যে মন্তরগুলো লিখে নিল, তার সব কটিই একই ধরনের; তারপর মায়ের আশীর্বাদী ছোট ছোট আইকনের সুতো, আর ডনের মাটির ছোট ছোট পুঁটুলির সঙ্গে বেঁধে জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখল। কিন্তু মৃত্যু দেখা দিয়েছিল সকলের কাছেই, যারা মন্তর লিখে নিয়েছিল তাদের কাছেও। গ্যালিসিয়ার প্রান্তরে, পূর্ব প্রাশিয়ায়, কার্পেথিয়ার পর্বতে, রুমানিয়ায়—যেখানে যেখানে যুদ্ধের লেলিহশিখা বিস্তৃত হয়েছিল, যেখানকার মাটিতে কসাক-ঘোড়ার খুরের ছাপ পড়েছিল, সেখানে সেখানেই পচে গলে ধুলোয় মিশিয়েছিল তাদের মৃতদেহ।

॥ চার ॥

দিনচারেক পর রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট কসাকদের নিয়ে লাল-কামরাওয়ালা ফৌজী-ট্রেন ছাড়ল রুশ-অস্ট্রিয়া সীমান্তের দিকে।

—'যুদ্ধ ... !'

কামরাগুলো সরগরম হয়ে উঠল গল্পে, গানে। স্টেশনে স্টেশনে কৌতূহলমাখা ঔদার্যের চোখে সবাই তাকাতে লাগল কসাকদের দিকে। জনতা হাত দিয়ে পরখ করতে লাগল কসাকদের পা-জামার পট্টি।

—'যুদ্ধ ... !'

স্টেশনে স্টেশনে মেয়েরা রুমাল ওড়াতে লাগল, হাসতে লাগল, সিগারেট আর মেঠাই ছুঁড়ে দিতে লাগল। ভোরোনেঝ্‌ পৌঁছুবার ঠিক আগে, একবার শুধু এক বুড়ো রেল-মজুর মাথা গলিয়েছিল কামরার মধ্যে, সেই কামরায় পিয়োত্রা আর উনত্রিশজন কসাক ছিল গাদাগাদি করে, জিজ্ঞেস করেছিল :

—'তোমরা যাচ্ছ?'
—'হ্যাঁ। উঠে পড়, চল আমাদের সঙ্গে, দাদু।' একজন কসাক উত্তর দিয়েছিল।
—'ওহে বাপধন... বলির পাঁঠা সব!' ধমকের ভঙ্গিতে মাথা নেড়েছিল বুড়ো মজুরটি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

সৈন্যচালনায় যোগ দেবার জন্যে ডিভিসনের কর্তৃপক্ষ ১৯১৪ সালের জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে গ্রিগর মেলেখফের রেজিমেণ্টকে ভোলনিয়ার রোভ্‌নো শহরে বদলি করে দিল। দিন পনের পর, সৈন্যচালনায় ক্লান্ত হয়ে গ্রিগর ও অন্যান্য কসাকরা শুয়েছিল তাঁবুতে, এমন সময় কোম্পানি কমাণ্ডার লেফটানাণ্ট পোলকোভ্‌নিকোভ্‌ রেজিমেণ্টের দপ্তর থেকে ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এল।

—'মনে হচ্ছে, আর একটা হামলা!' প্রোখোর ঝিকোভ অনুমান করে বলল, তারপর অপেক্ষা করল, কেউ সায় দেয় কিনা।

ট্রুপ-সার্জেণ্ট পা-জামার ছেঁড়া সেলাই করছিল। টুপির ভেতরের কাপড়ে সূচটা গুঁজে রেখে মন্তব্য করল:

—'আমারও তাই মনে হয়; ওরা একমুহূর্তও বিশ্রাম করতে দেবে না।'

এক মিনিট কি দু মিনিট পরেই বিউগিলার সাবধানের সংকেত বাজিয়ে দিল। কসাকরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তারা ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে ফেলল। তাঁবুর খুঁটি উপড়ে তুলছিল গ্রিগর, সার্জেণ্ট তাকে বিড়বিড় করে বলল:

—'এবার সত্যিই লড়াই, বুঝলে হে।'

—'মিছে কথা বলছ!' গ্রিগরের কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ পেল।

—'মাইরি, দিব্যি! সার্জেণ্ট-মেজর আমাকে বলেছে।'

কোম্পানি গড়া হল রাস্তার ওপরে; সকলের আগে আগে কমাণ্ডার। দাঁড়ানো সারির মাথার ওপর দিয়ে তার নির্দেশ ছুটে গেল 'লম্বা করে, সার বেঁধে!'

গ্রাম ছেড়ে বড রাস্তায় যাবার সময় কদমে ছোটা ঘোড়ার খুরের শব্দ খটাখট বেজে উঠল। এক ও পাঁচ নম্বর কোম্পানি স্টেশনের দিকে ছুটল, পাশের গ্রাম থেকে তা স্বচ্ছন্দে চোখে পড়তে পারে।

॥ দুই ॥

একদিন পর অস্ট্রিয়ার সীমান্ত থেকে মাইল বিশেক দূরে এক স্টেশনে নামল রেজিমেণ্ট। এক সারি বার্চ-গাছের পেছনে ভোরের আভাস দেখা দিয়েছে। সকালটা সুন্দর হবে বলেই মনে হয়। ভ'স্ ভ'স্ করতে করতে লাইনের ওপর দিয়ে গড়গড়িয়ে চলে গেল এঞ্জিন। ভোরের শিশিরে চকচক করে উঠল লাইনগুলো। লাগাম ধরে কসাকরা কামরা থেকে ঘোড়াগুলো নামাল, লেভেল-ক্রসিং পার করিয়ে নিল, তারপর পিঠে চাপল। তারা এগুতে লাগলো লাইন বেঁধে। ভেঙে ভেঙে যাওয়া, নীলচে-বাদামি অন্ধকারে তাদের কণ্ঠস্বর ভৌতিক স্বরের মত শোনাতে লাগলো। অন্ধকার ভেদ করে অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে লাগলো কসাকদের মুখ আর ঘোড়াগুলোর দেহরেখা।

—'কোন্ কোম্পানি যায়?' হাঁক উঠল একটা!

—'কে তুমি? পথ হারিয়েছ নাকি?' একজন কসাক উত্তর দিল।

—'দেখিয়ে দিচ্ছি, কে আমি! অফিসারের সঙ্গে এইভাবে কথা বলা, স্পর্ধা ত কম নয়।'

—'মাপ করবেন, হুজুর, দেখতে পাই নি'

—'এগিয়ে যাও! এগিয়ে যাও!'

একটু আগে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে চতুর্থ কোম্পানি আটকা পড়ে গেল প্রথম কোম্পানির দরুন, আগেই ট্রেন থেকে নেমেছিল তারা। ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে থাকতে চাপা গলায় শান্তভাবে গান ধরল কসাকরা। নীলচে-ধূসর আকাশের পটভূমিকায় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠলো সামনে দাঁড়ানো ঘোড়সোয়ারদের দেহরেখা, যেন চীনে-কালি দিয়ে আঁকা। বর্শাগুলো দুলতে লাগলো সূর্যমুখী ফুলের ডাঁটার মত। মাঝে মাঝে টুংটাং শব্দ উঠতে লাগলো রেকাবের, মচমচ করতে লাগলো ঘোড়ার জিন।

গ্রিগরের পাশেই ছিল প্রোখোর ঝিকোভ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে ঝিকোভ বলল :

—'তোমার ভয় করছে না, মেলেখফ? করছে না?'

—'ভয় পাবার কি আছে?'

—'আজই হয়ত লড়াইয়ে নামতে হতে পারে।'

—'বেশ ত, তাতেই বা কি?'

—'আমার কিন্তু ভয় করছে।' আঙুল দিয়ে লাগামটা নাড়তে নাড়তে স্বীকার করল প্রোখোর। 'কাল সারারাত একবারের জন্যেও চোখের দু পাতা এক করি নি।'

আর একবার এগুতে শুরু করল কোম্পানি; মেপে মেপে পা ফেলে চলতে লাগলো ঘোড়াগুলো, বর্শাগুলো তালে তালে দুলতে লাগলো। লাগাম ছেড়ে দিয়ে ঝিমুতে শুরু করল গ্রিগর। তার মনে হল, স্প্রিংয়ের মত সামনে পা ফেলে ফেলে ঘোড়াটা জিনের ওপরে তাকে দোলাচ্ছে না, সে নিজে নিজেই দুলছে, এক উষ্ণ, অন্ধকার রাস্তা ধরে অনায়াসে, দুর্দমনীয় আনন্দে যেন চলছে। তার পাশেই বকর বকর

করছে প্রোখোর; কিন্তু তার গলার স্বর জিনের মচ্‌মচানি আর খুরের খটখট শব্দে মিশে গেল, তার চিন্তাশূন্য ঝিমুনির কোন ব্যাঘাত ঘটাল না।

ছোট একটা রাস্তায় মোড় ফিরল কোম্পানি। নিস্তব্ধতা যেন কানে এসে বেঁধে। রাস্তার পাশেই নুয়ে পড়েছে পাকা ওট্‌, শিষ থেকে ধোঁয়া উঠছে শিশিরের। নুয়ে পড়া শিষ খাবার চেষ্টায় ঘোড়াগুলো সওয়ারের হাত থেকে টান মেরে লাগাম খসিয়ে ফেলল। দিনের উজ্জ্বল আলোর স্পর্শ লাগল গ্রিগরের বোঁজা চোখের পাতার ফাঁকে। মাথা তুলল গ্রিগর, কানে এলো প্রোখোফের একঘেয়ে কণ্ঠস্বর। ঠিক যেন গরুর গাড়ির চাকার ক্যাঁচর ক্যাঁচর।

ওট্‌-ক্ষেতের ওপার থেকে গম্ভীর এক গুরু গুরু গর্জন ঢেউ তুলে এলো, তাতেই হঠাৎ চট্‌কা ভেঙে গেল তার।

—'কামান দাগছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ঝিকোভ, বাছুরের মত চোখদুটো জলে ভরে উঠল। মাথা উঁচু করল গ্রিগর। তার সামনে ট্রুপ-সার্জেণ্টের ধূসর গ্রেট্‌-কোটটা ঘোড়ার পিঠের ওঠা-নামার তালে উঠছে নামছে; দুই পাশে প্রসারিত আ-কাটা ফসলের ক্ষেত; টেলিগ্রাফের খুঁটির ওপরের আকাশে একটা ভরতপাখি। সজাগ হয়ে উঠল গোটা কোম্পানি। গোলার শব্দ যেন তড়িৎস্পর্শ দিয়ে গেল। হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠে কোম্পানিটাকে জোর কদমে ছুটিয়ে দিল পোলকোভ্‌নিকোভ্‌। দু রাস্তার মোড়ের পেছনে একটা খালি সরাইখানা, সেখানে উদ্বাস্তুদের গাড়িগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল সবাই। একদল কেতাদুরস্ত চেহারার ড্রাগুন চলে গেল পাশ দিয়ে। লালচে-বাদামি একটা বনেদী ঘোড়ার পিঠে চলেছে তাদের ক্যাপটেন, কসাকদের দিকে তাকাল বিদ্রূপমাখা চোখে, তারপর খোঁচা মারল ঘোড়ার পেটে। মুখে বসন্তের দাগ, বিশাল চেহারার এক গোলন্দাজ কাঠের তক্তার একটা বোঝা নিয়ে চলেছে—সম্ভবত ওই সরাইখানার বেড়ার তক্তাগুলো খুলে নিয়েছে, তার পাশ দিয়ে এসে দেখতে পেল সামনে এক কাদা-ডোবার মধ্যে আটকে পড়েছে গোটাকয়েক হাউইজার-কামান। ঘোড়সোয়াররা ঘোড়াগুলোকে চাবুক মারছে, আর গোলন্দাজরা চাকা নিয়ে টানাটানি করছে।

আর একটু এগিয়ে তারা একদল পদাতিক রেজিমেণ্টকে ধরে ফেলল। তারা জোর পায়ে মার্চ করছে, ওভারকোটগুলো পেছন দিকে সরানো। তাদের পালিশ করা হেল-মেটগুলোয় সূর্যের আলো ঝলসে উঠছে, বেয়নেট থেকে ঠিকরে পড়ছে। শেষ কোম্পানির একজন কর্পোরাল গ্রিগরের দিকে একতাল কাদা ছুঁড়ে দিল :

—'এই যে, ধরো! অস্ট্রিয়ানদের গায়ে ছুঁড়ে মেরো!'

—'ইয়ার্কি মেরো না, ফড়িংবাবু!' কাদার দলাটাকে শূন্যেই চাবুকের ঘায়ে টুকরো করে দিয়ে গ্রিগর উত্তর দিল।

এখন থেকে তাদের পথে একটানা পড়তে লাগল শুঁয়োপোকার মত এগুনো পদাতিক রেজিমেণ্ট, কামানের সারি, রসদ আর রেড-ক্রসের গাড়িগুলো। বাতাসে আশু যুদ্ধের ভয়াল নিঃশ্বাস।

একটু পরে চতুর্থ কোম্পানি যখন একটা গ্রামে ঢুকছে তখন দেখা পেয়ে গেল তাদের কমাণ্ডার কর্নেল কালেদিনের, সঙ্গে তার পরের কমাণ্ডার। পাশ দিয়ে চলতে চলতে গ্রিগর শুনতে পেল, পরেরজন কালেজিনকে উত্তেজিতভাবে বলছে :

—'এ গ্রামটা ম্যাপে দেখানো হয় নি, ভ্যাসিলি মাক্সিমোভিচ্‌! বিশ্রী অবস্থায় পড়তে হতে পারে আমাদের।'

কর্নেলের উত্তরটা গ্রিগরের কানে এলো না।

অনবরত কদম পাল্টাতে হচ্ছিল রেজিমেণ্টকে, ঘোড়াগুলো ঘামতে শুরু করল। দূরে খাড়া ঢালুর গায়ে একটা ছোটখাট গ্রামের ঘরবাড়ি দেখা গেল। গ্রামের অপর দিকে একটা বন, নীল আকাশ ভেদ করে উঠেছে গাছের মাথা। রাইফেলের গুলির শব্দের সঙ্গে মিশে কামানের আওয়াজ ভেসে এল বনের পেছন থেকে। ঘোড়াগুলো কান খাড়া করল। ফাটন্ত গোলার ধোঁয়া জমে উঠল অনেক দূরের আকাশে; কোম্পানির ডান দিক থেকে রাইফেলের গুলি আসতে লাগল।

কাঠ হয়ে প্রত্যেকটি শব্দ শুনতে লাগল গ্রিগর; তার স্নায়ুগুলো শক্তকঠিন কতগুলো অনুভূতির পিণ্ড হয়ে উঠল। জিনের ওপরে উসখুস করতে লাগল প্রোখোর ঝিকোভ, অনর্গল বকবক কবতে লাগল.

—'গুলির শব্দ শুনে মনে হচ্ছে, ছেলেপুলেরা যেন লোহার রেলিঙের গাযে লাঠি ঠুকছে, তাই না গ্রিগর? ' ঝিকোভ মন্তব্য করল।

—'থাম, বাক্যবাগীশ!'

কোম্পানি ঢুকল গ্রামের ভেতরে। আঙিনাগুলো ভরে উঠল রুশসৈন্যে। বাসিন্দারা পালাবার জন্যে জিনিসপত্তর বাঁধাছাঁদা করছে, তাদের মুখে চোখে ভয় আর বিমূঢ়তার ছাপ আঁকা। চলতে চলতে গ্রিগরের নজরে পড়ল, একটা চালায় আগুন লাগাচ্ছে সৈন্যরা, কিন্তু তার মালিক—লম্বামত, পাকা-চুল এক শ্বেত-রুশ—আকস্মিক বিপদে কেমন যেন ধন্দ হয়ে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না। গ্রিগর দেখল, তার পরিবারের সকলে মিলে লাল-ওযাড় দেওয়া বালিশ আর ভাঙা টেবিল চেয়ারে বোঝাই করছে গাড়ি, আর লোকটা নিজে সযত্নে বযে আনছে একটা চাকার ভাঙা বেড়, কারও কাজে লাগবে না ওটা, হয়ত কতবছর পড়েছিল উঠোনের ধারে। মেয়েদের বোকামি দেখে অবাক হযে গেল গ্রিগর, গাড়ি বোঝাই করছে রঙ্‌চঙা হাঁড়ি আর আইকনে, দামী দামী কাজের জিনিসপত্তর ফেলে যাচ্ছে বাড়িতেই। নীচের রাস্তায় একটা পালকের তোষক থেকে পালক উড়ছে ছোটখাট তুষার-ঝড়ের মত।

॥ তিন ॥

দুপুরবেলা অস্ট্রিয়ার সীমান্ত পার হল কোম্পানি। উপড়ে ফেলা সীমান্ত-ঘাটির ওপর দিয়ে ঘোড়াগুলো লাফিয়ে পার হযে এল। ডান দিক থেকে রাইফেল ছোঁড়ার শব্দ কানে এল। দূরে একটা বাড়ির ইঁটের দেয়াল চোখে পড়ল। খাড়া হয়ে নামছে সূর্যের রশ্মি। এক কটু-স্বাদ ধুলোর মেঘ ছড়াচ্ছে সব কিছুর ওপর। টহলদার দলকে পৃথক হয়ে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিল কমাণ্ডার। ট্রুপ-অফিসার সেমিওনোভের অধীনে চতুর্থ কোম্পানি থেকে চতুর্থ দল বেরিয়ে গেল। বিভিন্ন কোম্পানিতে বিভক্ত রেজিমেণ্ট পেছনে পড়ে রইল ধূসর ধুলোর আড়ালে। গাড়ির চাকার দাগে ক্ষত-বিক্ষত গ্রামের রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে জনবিশেক কসাক চলে গেল বাড়িটার পাশ দিয়ে।

টহলদার দলটাকে মাইল কয়েক নিয়ে এল অফিসার, তারপর ম্যাপটা দেখে নেবার

জন্যে থামল। কসাকরা তামাক টানার জন্যে জড়ো হল এক জায়গায়। কোমরটা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে গ্রিগর ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল, কিন্তু সার্জেণ্ট চেঁচিয়ে উঠল :

—'কি, করছ কি? ঘোড়ায় উঠে বসো।'

একটা সিগারেট ধরাল অফিসার, সামনের অঞ্চলটা ধীরস্থিরভাবে দূরবীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। ডান দিকে মাথা তুলেছে ক্ষতবিক্ষত বনের সীমারেখা। ঠিক মাইলখানেক দূরে একটা ছোট গ্রাম, তার পেছনে এক খরস্রোতা ছোট নদী, আর তার কাঁচের মত স্বচ্ছ জল। দূরবীনের মধ্যে দিয়ে স্থির-চোখে তাকিয়ে রইল অফিসার, গ্রামের রাস্তাগুলোর ভয়াবহ নৈঃশব্দ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বুঝে নিতে লাগল, কিন্তু কবরখানার মতই গ্রামটা জনমানবহীন; নদীর নীল জলধারা শুধু প্রতিদ্বন্দ্ব জানিয়ে হাতছানি দিতে লাগল :

—'ওটা নিশ্চয়ই কোরোলেভ্‌কা!'

সার্জেণ্ট অফিসারের কাছাকাছি ঘোড়াটাকে নিয়ে এল, কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তার মুখের ভাবেই অর্থ স্পষ্ট হয়ে উঠল, যেন বলতে চাইল :

—'আমার চেয়ে বাপু তুমিই ত ভাল বোঝ! আমি মাথা ঘামাই ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে!'

—'ওখানেই চল যাই।' দূরবীন নামিয়ে রেখে অনিশ্চিতভাবেই বলল অফিসার। এমনভাবে ভুরু কোঁচকাতে লাগল যেন দাঁতে ব্যথা হয়েছে।

—'ওদের খপ্পরে পড়ে যাব না ত হুজুর?'

—'খুব সাবধানে যাব।'

ভয়ে ভয়ে ঘোড়া চালিয়ে তারা এল গ্রামের জনহীন রাস্তায়। প্রতিটি জানলাকে মনে হল এক একটা চোরাগোপ্তা ঘাটি, মদের ভাঁটির প্রতিটি খোলা দরজা জাগাতে লাগল এক বন্য নিঃসঙ্গতার অনুভূতি, এক অস্বস্তিকর কাঁপুনি নামতে লাগল শিরদাঁড়া বেয়ে। বেড়া আর গর্তগুলো যেন চুম্বকের মত সব কটি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। একদল ডাকাতের মত—শীতের নীলরাত্রিতে লোকালয়ে হানা দেওয়া নেকড়ের মত—তারা চলতে লাগল। কিন্তু—রাস্তাগুলো জনমানবশূন্য। নৈঃশব্দ্য যেন চেতনালোপ করা গর্জন করে উঠল। একটা বাড়ির খোলা জানলা দিয়ে ভেসে এল দেয়ালঘড়ির ঘণ্টাবাজার অতি স্বচ্ছন্দ আওয়াজ। পিস্তলের গুলির মত বিঁধতে লাগল আওয়াজগুলো। গ্রিগর দেখল, অফিসার কেঁপে উঠল, দমকে দমকে মুঠো করতে লাগল তার রিভলবার।

একটি প্রাণীও নেই গ্রামে। নদী পার হতে শুরু করল টহলদার দল; জল ঠেকল ঘোড়ার পেটে। নিজেদের ইচ্ছেতেই জলের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগল ঘোড়াগুলো, চলতে চলতে জল খেল, আর সওয়াররা লাগাম টেনে তাড়া দিতে লাগল। তৃষ্ণার্তের মত ঘোলাজলের দিকে তাকিয়ে রইল গ্রিগর। এত কাছে, অথচ ধরা ছোঁয়ার বাইরে; এক দুর্নিবার আকর্ষণে তাকে টানতে লাগল কাছে। যদি সম্ভব হত, তাহলে সে জিনের ওপর থেকেই লাফিয়ে পড়ত, জামাকাপড় না ছেড়েই শুয়ে পড়ত ঘুমপাড়ানো কলধ্বনির নীচে, শীতলতা জড়িয়ে দিত বুক, পিঠ।

গ্রামের পেছনের এক টিলার ওপর থেকে তারা দেখতে পেল দূরে একটি শহর : বাড়ির চতুষ্কোণ সারি, ইটের ইমারত, বাগান, গির্জার চুড়ো। টিলার মাথায় উঠে চোখে দূরবীন লাগাল অফিসার।

—'ওইখানে আছে ওরা।' চেঁচিয়ে উঠল সে, বাঁ হাতের আঙুলগুলো অস্বস্তিভরে নাচাতে লাগল।

রোদে-পোড়া চুড়ো পর্যন্ত ঘোড়া নিয়ে গেল সার্জেণ্ট, তারপর আকিয়ে দেখল: তার পেছন পেছন লাইন বেঁধে এল কসাকরা। দেখতে পেল, লোক গিসগিস করছে রাস্তায় রাস্তায়, ছোট রাস্তাগুলোয় বাঁধ পড়েছে গাড়ির, ঝড়ের বেগে ছুটছে ঘোড়সোয়াররা। চোখ কুঁচকে, হাতের আড়াল দিয়ে দেখতে দেখতে উর্দির অপরিচিত রঙটাও বুঝতে পারল গ্রিগর। শহরের সামনে দিয়ে একটানা সদ্য-খোঁড়া, বাদামি রঙের ট্রেঞ্চের সারি, সেখানে আসছে যাচ্ছে অনেক লোক।

তাড়াতাড়ি কসাকদের টিলার ওপর থেকে নীচে নিয়ে এল সার্জেণ্ট। অফিসার নোট-বইএর পাতায় পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখল, তারপর গ্রিগরকে ইঙ্গিত করল :

—'মেলেখভ!'

—'হুজুর!'

ঘোড়া থেকে নেমে, অফিসারের কাছে এল গ্রিগর। একটানা ঘোড়ায় বসে থাকার পর পা দুটোকে মনে হল যেন পাথর। অফিসার তার হাতে এক টুকরো ভাঁজকরা কাগজ দিল।

—'তোমার ঘোড়াটাই সবচেয়ে সেরা। রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারের হাতে এটা পেঁছে দেবে। ধাপে ছুটিয়ে!' নির্দেশ দিল সে।

গ্রিগর বুক-পকেটে কাগজটা রেখে ঘোড়ার কাছে চলে এল। চলতে চলতে থুতনির পট্টিটা থুতনির নীচে ঠেলে দিল। সে ঘোড়ায় না চাপা পর্যন্ত তাকিয়ে রইল অফিসার, তারপর চোখ ফেরাল ঘড়ির দিকে।

॥ চার ॥

গ্রিগর যখন রিপোর্ট নিয়ে পেঁছুল, রেজিমেণ্ট তখন প্রায় কোরোলেভ্কা গ্রামে পেঁছেচে। রিপোর্ট পড়ে এ্যাডজুট্যাণ্টকে নির্দেশ দিল কর্নেল, সে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল প্রথম কোম্পানির কাছে।

কোরোলেভ্কার ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল চতুর্থ কোম্পানি, ঘোড়ার খুরের আকার সোজা করে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি ছুটল যেন মনে হল তারা পেছনের গ্রামাঞ্চলে দূরবিস্তৃত কুচকাওয়াজের মাঠে ছুটছে। ডাঁশ তাড়ানোর জন্যে ঘোড়াগুলো মাথা ঝাঁকাতে লাগল, লাগামের কাঁটায় একটানা টুংটাং আওয়াজ উঠতে লাগল। গ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রথম কোম্পানির ঘোড়া ছোটানোর কোলাহল দ্বিপ্রহরে নিস্তব্ধতায় ভীষণভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

আগে আগে টগবগে ঘোড়ায় চড়ে লেফটানাণ্ট পোলকোভনিকোভ। একহাতে লাগামটা জড়ো করে, অপর হাতটা রাখল তলোয়ারের বাঁধনে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে নির্দেশের প্রতীক্ষা করতে লাগল গ্রিগর।

খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিল অফিসার; ফলাটা নীল শিখার মত ঝকমক করে উঠল।

—'কোম্পানি!' ডান-দিকে ঘুরল তলোয়ার, তারপর বাঁ-দিকে, তারপর, অবশেষে এসে নামল তার সামনে, ঘোড়ার কানের ঠিক ওপরে স্থির হয়ে রইল শূন্যে। 'সার

বাঁধো, এগোও!' নির্দেশটা মনে মনে যাচাই করে নিল গ্রিগর। 'বর্শা তাক্ করো। আক্রমণ কর...ছোটাও!' তীক্ষ্নস্বরে কাটা কাটা নির্দেশ দিল অফিসার, নিজের ঘোড়ার লাগামে টান দিল।

হাজার খুরের নীচে পিষে আর্তনাদ করে উঠল মাটি। সামনের সারিতে ছিল গ্রিগর, বর্শাটা তাক্ ধরতে না ধরতেই, অন্য ঘোড়াগুলোর চলার স্রোতের ঝাপটায় দিশাহারা হয়ে ঝড়ের বেগে ছুটল। মাঠের ধূসর পটভূমিকায় কম্যাণ্ডিং অফিসার তার চোখের সামনে ঢেউএর মত উঠতে নামতে লাগল। কালো ফলকের মত চষাজমি দুর্নিবার বেগে সামনে এগিয়ে আসতে লাগল। কেঁপে কেঁপে ওঠা তীক্ষ্ন, তীব্র, হুঙ্কার তুলল প্রথম কোম্পানি, চতুর্থ কোম্পানি তার ধুয়ো ধরে নিল। কানে বাজছে গোলার গর্জন, তারই মধ্যেই গ্রিগর শুনতে পেল বহুদূরের কামানের আওয়াজ। প্রথম গোলাটা চলে গেল মাথার অনেক ওপর দিয়ে, আয়নার মত স্বচ্ছ আকাশ চিরতে চিরতে। বর্শার গরম বাঁটটা গ্রিগর গায়ের এত জোরে চেপে ধরল যে ব্যাথায় টনটন করে উঠল, হাতের চেটো ঘেমে উঠল। উড়ন্ত গোলার শিষ শুনে ঘোড়ার ঘামে ভেজা ঘাড়ের ওপর মাথা নোয়াতে হল তাকে, ঘামের দুর্গন্ধ ঢুকল নাকে। যেন দূরবীনের ঝাপসা কাচের মধ্য দিয়ে দেখতে পেল ট্রেঞ্চের বাদামি ঢিবিগুলো, ধূসর উর্দি গায়ে লোক ছুটছে শহরের দিকে। একটানা বৃষ্টির মত একটা মেসিনগানের গুলি কসাকদের দিকে শিষ দিয়ে ছুটে আসতে লাগল। তাদের সামনে, ঘোড়ার পায়ের নীচে পশমের মত ধুলোর কুণ্ডলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিতে লাগল।

আক্রমণের পূর্বক্ষণে যা তার শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ দ্রুততর করে তুলেছিল, তা-ই এবার তার রক্তকে জমিয়ে পাথর করে দিল; কানের ভেতরকার বোঁ বোঁ শব্দ আর বাঁ-পায়ের আঙুলের বেদনাটুকু ছাড়া আর কিছুই তার মনে রইল না। আতঙ্কে পঙ্গু হয়ে সমস্ত চিন্তাভাবনা জমাট বেঁধে ভারী হয়ে উঠল মাথায়।

ঘোড়া থেকে সর্বপ্রথম পড়ে গেল ঝাণ্ডা-ধারী। তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল প্রোখর। গ্রিগর ফিরে তাকাল, এক লহমার জন্যেই যা চোখে পড়ল, তা কাচের ওপর হীরের দাগের মত কেটে বসে গেল স্মৃতিতে। মাটিতে পড়ে যাওয়া অফিসারের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পার হতে গিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল ঘোড়াটা, তারপরই হোঁচট খেল। জিন থেকে ছিটকে পড়ল প্রোখর, পড়ল উপুড় হয়ে, আর পিষে চেপটে গেল পেছনের ঘোড়াগুলোর খুরের নীচে। কোন চিৎকার শুনতে পেল না গ্রিগর, কিন্তু বিকৃত ঠোঁট, আর কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসা বাছুরের মত চোখ—প্রোখরের মুখের এই চেহারা থেকেই গ্রিগর অনুমান করে নিল, সে নিশ্চয়ই অমানুষিক চিৎকার করছে। আরও অনেকে পড়ল, ঘোড়া ও কসাক উভয়েই। বাতাসের ঝাপটায় চোখে জল এসে গিয়েছিল, ঝাপসা পর্দার ভেতর দিয়ে গ্রিগর সামনে তাকিয়ে দেখল, দলে দলে অস্ট্রিয়ানরা পালাচ্ছে ট্রেঞ্চ থেকে।

সুশৃঙ্খলভাবে যে কোম্পানিটা গ্রাম থেকে ছুটে এসেছিল, এবার সেটা ছড়িয়ে পড়ল, ভাগ হয়ে গেল টুকরো টুকরো হয়ে। যারা সামনে ছিল, ট্রেঞ্চে গিয়ে পৌঁছুল। গ্রিগর তাদের সবার আগে আগে।

লম্বামত, সাদা-ভুরু এক অস্ট্রিয়ান—বেঁটে টুপিটা কপাল পর্যন্ত টানা—প্রায় নল ঠেকিয়ে গুলি করল গ্রিগরকে। বুলেটের তাপে ঝলসে গেল গালটা। বর্শা দিয়ে আঘাত করল গ্রিগর, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণপন শক্তিতে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল, আঘাতটা

এত জোর হল যে বর্শাটা সোজা ঢুকে প্রায় অর্ধেক পেছন দিকে বেরিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেটা বার করে নিতে পারল না, একটা থরথরানি আর মোচড়ানি অনুভব করল হাতে, দেখতে পেল, অস্ট্রিয়ান সৈন্যটি এমনভাবে পেছনে বেঁকে গিয়েছে যে শুধু তার থুথনিটা চোখে পড়ছে, বাঁকা বাঁকা নখ দিয়ে সে বর্শার ডাণ্ডাটা আঁচড়াচ্ছে, খিমচে খিমচে ধরছে। মুঠো খুলে বর্শাটা ফেলে দিল সে, অসাড় আঙুল দিয়ে তলোয়ারের বাঁটটা চেপে ধরল।

অস্ট্রিয়ানরা পালাতে লাগল শহরের রাস্তা ধরে। জড়াজড়ি-করা ধূসর উর্দিগুলোর ওপরে লাফিয়ে উঠতে লাগল কসাক ঘোড়াগুলো।

গ্রিগর তলোয়ারের চ্যাপ্টা দিক দিয়ে ঘোড়াটাকে ঘা মারল; ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে, তাকে নিয়ে ছুটল সে রাস্তা ধরে। একটা বাগানের লোহার রেলিংয়ের ধার দিয়ে টলতে টলতে ছুটছে এক অস্ট্রিয়ান, রাইফেল নেই, হাতে আঁকড়ে ধরা টুপিটা। গ্রিগর মাথার পেছন দিকটা দেখতে পেল, দেখতে পেল ঘাড়ের নীচের ঘামে ভেজা জামার কলারটা। তাকে ধরে ফেলল সে, তারপর উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে তলোয়ারটা মাথার ওপরে ঘোরাল। রেলিংয়ের ধার ঘেঁসে বাঁ-দিক দিয়ে ছুটছে অস্ট্রিয়ান সৈন্যটি, তাকে দু টুকরো করে ফেলা গ্রিগরের পক্ষে অসুবিধাজনক। কিন্তু জিনের ওপরে ঝুঁকে পড়ে, তলোয়ারখানা কাত করে ধরে কপাল লক্ষ করে আঘাত করল সে। একটা চিৎকারও না করে হাত দিয়ে কপালটা চেপে ধরল অস্ট্রিয়ানটি, তারপর ঘুরে পড়ে গেল রেলিংয়ের দিকে পিঠ দিয়ে। রাশ না টেনেই তার ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলে গেল গ্রিগর, ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফিরে এল কদমে চালিয়ে। অস্ট্রিয়ানটির আতঙ্ক-বিকৃত মুখখানায় ইতিমধ্যেই ঢালাই-লোহার রং ধরেছে। লম্বা হয়ে হাত দুটো ঠেকেছে পা-জামার সেলাইএর কাছে, ছাইয়ের মত ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। কপাল থেকে পিছলে গিয়েছে তলোয়ারের কোপ, লাল কম্বলের মত মাংস গালের ওপর ঝুলছে। উর্দির গায়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তার আতঙ্ক-বিহ্বল চোখে চোখ পড়ল গ্রিগরের। আস্তে আস্তে হাঁটু দুটো ভেঙে এল তার; ঘড় ঘড় আওয়াজ উঠল গলার ভেতর থেকে। চোখ দুটো কুঁচকে গ্রিগর তলোয়ারের কোপ মারল। এক কোপে দু টুকরো হয়ে গেল খুলিটা। হাত দুটো শূন্যে তুলে লোকটা মাটিতে পড়ে গেল, রাস্তার পাথরে মাথাটা প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ল। সেই শব্দে চমকে উঠল গ্রিগরের ঘোড়া, নাকের আওয়াজ করে, ছুটে তাকে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে এল।

মাঝে মাঝে গুলির আওয়াজ উঠতে লাগল রাস্তায়। এক মৃত কসাকের দেহ নিয়ে গ্রিগরের পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা ফেনা-ওঠা ঘোড়া। একটা পা খুলে গিয়েছে রেকাব থেকে, ক্ষত বিক্ষত, থেঁতলানো দেহটা পাথরের ওপর দিয়ে টানতে টানতে ঘোড়াটা ছুটছে। শুধু পা-জামার লাল-পটি আর মাথার ওপর দিয়ে জড়ানো, পুঁটলি-করা, ছেঁড়া, সবুজ সার্টটাই চোখে পড়ল গ্রিগরের।

গ্রিগরের মাথাটা সীসের মত ভারী মনে হলো। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে প্রাণপণে মাথা ঝাঁকাল সে। একজন আহতকে ওভারকোটের ওপর শুইয়ে, একদল অস্ট্রিয়ান বন্দীকে সামনে তাড়াতে তাড়াতে তৃতীয় কোম্পানির জনকয়েক কসাক পাশ দিয়ে চলে গেল। গাদাগাদি করে চলতে লাগল বন্দীরা, লোহার নাল-দেওয়া বুটের বিষণ্ণ আওয়াজ উঠতে লাগল পাথরে ঘা লেগে। গ্রিগর দেখল তাদের মুখগুলো হিমশীতল মাটির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। ঘোড়ার রাশ ফেলে দিয়ে সে হেঁটে চলে এল কুপিয়ে

কাটা লোকটার কাছে। যেখানে পড়ে গিয়েছিল, সেখানেই লোকটা শুয়ে আছে ঢালাই-লোহার তৈরি রেলিংয়ের পাশে, নোংরা হাতের চেটো দুটো বাড়িয়ে আছে, যেন ভিক্ষে চাইছে। গ্রিগর তার মুখের দিকে তাকাল। ঝুলে পড়া গোঁফ, আর যন্ত্রণা-বিকৃত ছাপ আঁকা মুখখানা সত্ত্বেও, তাকে মনে হল কেমন যেন ছোটখাট, একেবারে শিশুর মত।

—'হেই, তুমি!' রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে এক অপরিচিত কসাক অফিসার চিৎকার করে উঠল।

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল গ্রিগর, হোঁচট খেতে খেতে ঘোড়ার দিকে এগুল। বোঝার মত ভারী পা দুটো টলমল করতে লাগল, যেন সে পিঠে করে বইছে এক অসহনীয় ভার। অনিচ্ছা আর বিমূঢ়তা তার মনটাকে পিষতে লাগল। খাঁজকাটা রেকাবটা হাতে তুলে নিল সে, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত পা-ই গলাতে পারল না তার ভেতরে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

ভিয়েশেনস্কা সহ ডনের উজানের জেলাগুলোর কসাকদের একাদশ, দ্বাদশ কসাক-রেজিমেণ্ট ও আতামান রক্ষী-বাহিনীতে যোগ দেওয়াই প্রথা। কিন্তু কোন কারণে ১৯১৪ সালের ভর্তির সময় কিছু অংশকে জুড়ে দেওয়া হল তৃতীয় ডনকসাক রেজিমেণ্টের সঙ্গে। সেটা তৈরি হল মুখ্যাত উস্‌ত্‌মেদ্‌ভেদিয়েত্‌ঝ জেলার কসাকদের নিয়ে। যারা তাতে যোগ দিল, তাদের মধ্যে মিত্‌কা কোরশুনভ একজন।

তৃতীয় অশ্বারোহী ডিভিসনের একটা অংশের সঙ্গে তৃতীয় ডনকসাক রেজিমেণ্টকে রাখা হল ভিল্‌নোয়। জুন মাসে একদিন বিভিন্ন কোম্পানিগুলো শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গাড়তে। গুমট দিনটা, হাল্কা মেঘেরা আকাশে ঘুরছে ঝাঁক বেঁধে, সূর্য আড়াল করে দিচ্ছে। দলের সামনে রেজিমেণ্টের ব্যাণ্ড বাজছে, হালকা টুপি মাথায় কুচকাওয়াজের উর্দি গায়ে, পেছনে পেছনে অফিসাররা দল বেঁধে চলেছে, মাথার ওপরে সিগারেটের ধোঁয়ার মেঘ উড়ছে।

রাস্তার দুই পাশে চাষীরা মেয়েদের নিয়ে খড় কাটছিল, কাজ থামিয়ে পাশ দিয়ে চলে যাওয়া কসাকদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। গরমে ঘেমে নেয়ে উঠল ঘোড়াগুলো, দু পায়ের মাঝখানে হলদে মত ফেনা দেখা দিল; ফুরফুরে দক্ষিণে হাওয়াতেও ঠাণ্ডা হল না, ভ্যাপসা গরম তাতে বরং আরও বেড়ে উঠল।

গন্তব্যস্থলে পেঁছে, রেজিমেণ্ট ভেঙে, কোম্পানিগুলোকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সে অঞ্চলের জমিদারদের এলাকায় এলাকায়। দিনের বেলা কসাকরা ঘাস আর খড় কাটল

জমিদারদের জন্যে, রাত্রে নির্দিষ্ট মাঠে পা-ছাঁদা ঘোড়াগুলোকে চরতে দিল, তাঁবুর আগুনের ধোঁয়ার সামনে বসে বসে তাস পিটতে লাগল, গল্পগুজব করতে লাগল। ষষ্ঠ কোম্পানি রইল এক পোল জমিদারের বিশাল এলাকায়। অফিসাররা রইল জমিদার বাড়িতে, সেখানে তারা তাস পিটতে লাগল, মদ গিলতে লাগল, খানসামার মেয়েটার দিকে নজর দিতে লাগল; জমিদার বাড়ি থেকে মাইল কয়েক দূরে তাঁবু ফেলে রইল কসাকরা।

প্রতিদিন সকালে দ্রোঝ্‌কি চেপে খানসামা আসে তাদের তাঁবুতে। গোলগাল, ভদ্রগোছের লোকটা, দ্রোঝ্‌কি থেকে নেমে চকচকে, চুড়োওয়ালা সাদা টুপি নেড়ে নিত্য-নিয়মিত কসাকদের অভ্যর্থনা জানায়।

—'আসুন, আসুন, আমাদের সঙ্গে খড় কাটুন কর্তা; তাতে একটু চর্বি ঝরবে।' কসাকরা তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে। খানসামা নিস্পৃহের মত হাসে, রুমাল দিয়ে টাক মোছে, তারপর সার্জেণ্টকে গিয়ে দেখায় কোনখান থেকে দ্বিতীয় দফা ঘাস কাটতে হবে।

॥ দুই ॥

জুলাই মাসের গুমোট সন্ধ্যেয় তাঁবুর আগুনের চারপাশে বসে কসাকরা গান ধরে :

'কত দূর দেশে চলে গেল সেই কসাক-বীর,
মাঠ, প্রান্তর পার হয়ে গেল ঘোড়ায় চড়ে,
জন্মের মত পিছে ফেলে গেল স্বদেশ, গ্রাম।'

পঞ্চমে ধরা একটি মিহি গলা বেজে ওঠে, খাদে নামে, গভীর দুঃখের রেশ ছড়ায় :

'আর তো ফিরে আসবে না, সে আসবে না।'

তারপর আরও একটু চড়ায় ওঠে পঞ্চমে ধরা গলা :

'ব্যর্থ আশায় কসাক-বীরের যুবতী-বধূ
সন্ধ্যাসকালে চেয়ে রবে দূর ঈশান-কোণে,
বৃথাই ভাববে, আসে বুঝি তার পরাণ-সখা
সেথা হতে, যেথা গেলে আর ফিরে আসে না কেউ।'

সে গান ঘুরতে থাকে আরও কয়েকটি গলায়; গান দ্রুততর হয়ে ওঠে, ঘরে গাঁজানো তাড়ির মত মাথার ভেতরে ঝিম্‌ ধরে :

'পাহাড়ের পর পাহাড়, পেছনে জমেছে বরফ,
বরফের মাঠে চিড় ধরে, আর ঝড়ের দাপট,
ফুঁসে ফুঁসে যেথা নুয়ে নুয়ে পড়ে পাইন, ফার,
বরফের নীচে সেথায় ঘুমায় কসাক-হাড়।'

কসাকজীবনের সহজ কাহিনী যখন এ ওকে শোনাতে থাকে, তখনও চাপাগলায় বাজতে থাকে পঞ্চমে ধরা গান, যেন বরফ-গলা মাটির পৃথিবী ছেড়ে অনেক উঁচু আকাশে উড়ে উড়ে চলে এক ভরত-পাখি :

'মরণের কালে অনুনয় করে বলেছে বীর
মাটি জড়ো করে গড়ে যেন তার মৃত্যু-স্মারক,
দেশ থেকে আনা বাদাম-গাছের একটি চারা
পুঁতে দেয়, যার ডালে ডালে ফোটা ফুলের আগুন।'

অপর এক তাঁবুর আগুনের সামনে বসে কথকঠাকুর গল্প বলে চলে। অখণ্ড মনযোগে গল্প শোনে কসাকরা। কেবল মাঝে মাঝে, গল্পের নায়ক যখন মস্কোবাসী আর নাস্তিকদের ষড়যন্ত্রজাল ভেদ করে, নিজেকে এক সঙ্গীন পরিস্থিতি থেকে বাঁচায়, তখন হয়ত পায়ের বুটে চাপড় দিতে গেলে কারও হাত আগুনের আলোয় সাদা ঝলক মেরে ওঠে। উৎফুল্ল কণ্ঠে আনন্দধ্বনি করে ওঠে কেউ হয়ত। তারপর আবার চলতে থাকে কথকঠাকুরের বাধাবন্ধহীন বাক্যের প্রবাহ।

॥ তিন ॥

রেজিমেণ্ট গ্রামাঞ্চলে আসার সপ্তাহখানেক পর কোম্পানির কমাণ্ডার কামার আর সার্জেণ্ট-মেজরকে ডেকে পাঠান।

—'ঘোড়াগুলো সব কি অবস্থায় আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

—'ভালই, হুজুর, খুবই ভাল বলতে গেলে।' সার্জেণ্ট-মেজর উত্তর দিল।

কালো গোঁফ-জোড়া চুমড়াতে চুমড়াতে ক্যাপ্টেন বলল :

—'রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার হুকুম জারি করেছেন, রেকাব টেকাব সব রঙ করতে হবে। রাজকীয় পরিদর্শন হবে রেজিমেণ্টের। সব কিছু ঘসে মেজে চকচক করতে হবে, জিন-টিন, হাতিয়ার সব কিছু। কবে তৈরি হতে পারবে?'

সার্জেণ্ট-মেজর তাকাল কামারের দিকে, কামার তাকাল সার্জেণ্ট-মেজরের দিকে। তারপর দুজনেই তাকাল ক্যাপ্টেনের দিকে। সার্জেণ্ট-মেজর বলল :

—'রবিবারের মধ্যে হলে কেমন হয়, হুজুর?' সসম্ভ্রমে হাত দিল গোঁফে।

সেইদিনই পরিদর্শনের তোড়জোড় শুরু হল। ঘোড়াগুলো দলাইমলাই করল কসাকরা, লাগাম পরিষ্কার করল, ঝামা ঘসে ঘসে ঝকঝকে করে তুলল লাগামের কাঁটা আর অন্যান্য ধাতব অংশগুলো। সপ্তাহের শেষের দিকে গোটা রেজিমেণ্টটাই ঝকমক করতে লাগল টাকশালের নতুন টাকার মত। কসাকদের মুখ থেকে ঘোড়ার খুর পর্যন্ত সবকিছুই ঝলমল করতে লাগল। শনিবারের দিন রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার দেখে শুনে গেলেন, রেজিমেণ্টের খাপসুরত চেহারা দেখে ধন্যবাদ জানালেন অফিসার আর কসাকদের।

॥ চার ॥

জ্বলাই মাসের গাঢ়-নীল দিনগ্বলো দেখতে না দেখতে গড়িয়ে গেল। ঘোড়াগ্বলো বহাল তবিয়তে রইল; অস্বস্তি বোধ করতে লাগল শ্বধ্ব কসাকরা নিজেরাই, তাদের মন প্রশ্নে প্রশ্নে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। রাজকীয় পরিদর্শন সম্পর্কে ঘ্বর্ণাক্ষরেও কিছ্ব জানা গেল না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটতে লাগল অন্তহীন বাক্যবিন্যাসে আর বিরাম-হীন প্রস্তুতিতে। তারপর বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত নির্দেশ এল, রেজিমেণ্টকে ভিলনোয় ফিরে যেতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যেয় তারা শহরে ফিরে এল। তখনই দ্বিতীয় নির্দেশ জারি করা হল কোম্পানিগ্বলোকে। কসাকদের বাক্স-প্যাটরা জড়ো করে ব্যারাকে জমা রাখতে হবে, আরও সম্ভাব্য অপসারণের জন্যে তোড়জোড় করতে হবে।

—'এ সব আবার কি, হ্বজ্বর?' ট্রুপ-অফিসারদের ছেঁকে ধরল কসাকরা, সত্যাসত্য জানতে চাইল। কাঁধ ঝাঁকাল অফিসাররা, তারা নিজেরাই যদি জানতে পারত, তাহলে খ্ববই খ্বশী হত।

কিন্তু পয়লা আগস্ট রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারের আর্দালি চুপি চুপি এক দোস্তকে জানিয়ে দিল :

—'লড়াই বেধেছে, ব্বঝলে হে!'

—'গ্বল দিচ্ছ!'

—'মাইরি, দিব্যি! একটা কথাও ফাঁস করো না কাউকে!'

পরদিন সকালে ব্যারাকের বাইরে কোম্পানি মাফিক গোটা রেজিমেণ্টটা দাঁড়িয়ে গেল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কমাণ্ডারের অপেক্ষা করতে লাগল। ব্যারাক-বাড়ির কোণ ঘ্বরে, ঘোড়ায় চড়ে রেজিমেণ্টের সামনে এসে দাঁড়াল কমাণ্ডার। পাশ করিয়ে ঘোড়াটাকে দাঁড় করাল। নাক ঝাড়বার জন্যে র্বমাল বার করল এ্যাডজ্বট্যাণ্ট, কিন্তু তার সময় মিলল না। সেই শব্দহীন অতল স্তব্ধতায় কণ্ঠস্বর ছ্বঁড়ে মারল কর্নেল :

—'কসাক সব!'

—'এইবার, এইবার!' সবাই ভাবল মনে মনে। এক অধৈর্য উত্তেজনা আচ্ছন্ন করল সবাইকে। এক খ্বর থেকে আর এক খ্বরের ওপর ভর রাখছিল মিত্কা কোরশ্বনভের ঘোড়াটা, তিড়বিড়িয়ে উঠে—দমাস করে গোড়ালির ঘা মারল তার পেটে।

—'জার্মানী আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে...।'

ফিসফিস শব্দ উঠল লাইনের একধার থেকে আর একধার পর্যন্ত, যেন ন্বয়ে পড়া পাকা ওট ক্ষেতের ওপর দিয়ে এক দমকা হাওয়া বয়ে গেল। একটা ঘোড়া ডেকে উঠল, ডাকটা কানে এসে বিঁধল কসাকদের। গোলগোল চোখে, হাঁ-করা ম্বখে তারা তাকাল প্রথম কোম্পানির দিকে, যেখান থেকে ডেকে উঠতে সাহস পেয়েছে জানোয়ারটা।

আরও অনেক কিছ্ব বলল কর্নেল। জাতীয় গর্বের মনোভাব স্বষ্টির চেষ্টায় বেশ ভেবে ভেবে কথাগ্বলো বলল। কিন্তু হাজারটা কসাকের মনশ্চক্ষে যা ভেসে উঠল,

তা তাদের পায়ের নীচে গুটিয়ে লুটিয়ে পড়া সিল্কের তৈরি বিদেশী ঝাণ্ডা নয়; তা হচ্ছে তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা—কঠিন, কিন্তু নিজস্ব; তাই উড়তে লাগল পত্‌পত করে, ডাকতে লাগল তাদের: তাদের স্ত্রী, সন্তান, প্রেমিকা, আ-কাটা ফসল; অনাথ গ্রামগুলো।...

—'আর দু ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেনে চাপতে হবে আমাদের...।' একমাত্র এই চিন্তাই জুড়ে রইল সকলের মন।

গান গাইতে গাইতে রেজিমেণ্ট চলল স্টেশনের দিকে। কসাকদের গলা ব্যাণ্ডের আওয়াজ ডুবিয়ে দিল, এলোমেলোভাবে চুপ করে গেল ব্যাণ্ড। অফিসার-গিন্নীরা চলল দ্রোঝ্‌কি চেপে, রঙ-বেরঙের ভিড় জমে গেল রাস্তা বরাবর, ঘোড়ার খুরে খুরে ধুলোর এক মেঘ উড়ল। নিজের আর অপরের দুঃখের মুখে তুড়ি মেরে দলের সেরা গাইয়ে এক কসাক—খিস্তির গান ধরল, বাঁ-কাঁধটা এমনভাবে নাচাতে লাগল যে, নীল-পট্টিটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল। নতুন নালপরানো ঘোড়ার খুরের তালে তালে, একটা কথার সঙ্গে ইচ্ছে করে আর একটা কথা জড়িয়ে গান গাইতে গাইতে, গোটা কোম্পানি চলল স্টেশনের লালরঙা কামরাগুলো পর্যন্ত। কসাকদের বিদায় দিতে ভিড় করে এসেছে যে মেয়েরা তাদের দিকে লক্ষ্য করে। নিস্পৃহভাবে চোখ মারল একজন কসাক।

সতর্ক করে দিয়ে রেল-লাইনের ওপর ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। ইঞ্জিনের চাকা ঘুরল।

সারি সারি সৈন্য...আর সৈন্য...সংখ্যাহীন, অগণিত সৈন্য।

দেশের শিরাউপশিরার মধ্যে দিয়ে, রেল-লাইন ধরে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত রাশিয়া পশ্চিম সীমান্তের মুখে তাড়িয়ে নিয়ে চলল তার ধূসর কোটে মোড়া রক্তের প্রবাহ।

॥ পাঁচ ॥

সীমান্তের ধারে একটা ছোট শহরে রেজিমেণ্ট ভেঙে দিয়ে কোম্পানিগুলোকে পৃথক করে দেওয়া হল। ডিভিসনের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, ষষ্ঠ কোম্পানিকে তৃতীয়-বাহিনীর পদাতিক দলের অধীনে রাখার ব্যবস্থা হল, এবং একটানা মার্চ করে তারা এসে পৌঁছুল পেলিকালিয়ায়।

৯ই আগস্ট—সার্জেণ্ট-মেজর আর প্রথম দলের মিখিন নামে এক কসাককে ডেকে পাঠাল কোম্পানির কমাণ্ডার। মিখিন ফিরে এল বেলা গড়িয়ে গেলে, মিত্‌কা কোরশুনভ তখন জল খাইয়ে ঘোড়াগুলোকে ফিরিয়ে আনছে।

ঘরের ভেতর ঢুকল মিখিন। ঘাড়ে গর্দানে এক, তামাটে চেহারার কসাক মিখিন। টেবিলের ধারে বসে নিভুনিভু তেলের প্রদীপের আলোয় একটা ছেঁড়া লাগাম সারছিল শ্‌চেগোল্‌কভ্‌। হাত দুটো পেছনে করে উনুনের ধারে দাঁড়িয়ে ইভানকফের সঙ্গে কথা বলছিল ক্রুচ্‌কোভ্‌। মিখিল ঘোষণা করল:

—'কাল ভোরে আমাদের যেতে হবে লিউবোভের এক ঘাঁটিতে।'

—'কে কে যাবে?' সেই ম্হূর্তেই ঘরে ঢুকে পড়েছিল মিত্কা, কলসিটা দরজার কাছে নামিয়ে রেখে সে প্রশ্ন করে উঠল।

—'শ্চেগোল্কোভ্, ক্রুচ্কোভ্, র্ভাচেভ্, প্রোপোভ্, আর ইভানকোভ্।'

—'আর আমি?' মিত্কা প্রশ্ন করল।

—'তোমাকে এখানে থাকতে হবে, মিত্রি।'

—'তাহলে, গোল্লায় যাও তোমরা সব!'

ভোরবেলায় রওনা হল দলটা। একটানা বহ্ক্ষণ চলার পর একটা টিলার ওপর থেকে দেখতে পেল বিশাল লিউবোভ্ গ্রামখানা, এক নদীর উপত্যকায় প্রসারিত হয়ে আছে। নজর রাখার ঘাঁটি হিসাবে গ্রামের সবচেয়ে শেষের বাড়িখানা বেছে নিল মিশ্কিন, কারণ বাড়িখানা সীমান্তের সবচেয়ে কাছে। বাড়ির কর্তা এক দাড়িগোঁফ-চাঁছা, পা-বাঁকা পোল, মাথায় চটের টুপি। কসাকদের একটা চালা দেখিয়ে দিল, সেখানে তারা ঘোড়াগ্লো রাখতে পারে। চালার পেছনে সব্জ ঘাসের এক মাঠ। ঢাল্ জমি গড়িয়ে গিয়ে মিলেছে পাশের এক বনের গায়ে, একফালি সাদা ফসলের ক্ষেত ভাগ করে চলে গিয়েছে একটা রাস্তা, তার পেছনে ঘাসের জমি। চালার পেছনকার গর্ত থেকে পালা করে এক একজন দ্রবীন চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নজর রাখতে লাগল। আর সবাই ঠাণ্ডা চালার নীচে ঘ্মিয়ে নিতে লাগল, সেখানে বহ্কাল জমিয়ে রাখা ফসল, তুষের ধ্লো আর ইঁদ্রের গন্ধ, গ্ঁড়োমাটির মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ।

সারা বিকেল পাহারায় ছিল শ্চেগোল্কোভ, সন্ধ্যের সময় তাকে ইভানকোভ ছেড়ে দিল। দ্রবীন ঠিক করে নিয়ে, উত্তর-পশ্চিমে বনের দিকে তাকাল। স্পষ্ট চোখে পড়ল, বরফের মত সাদা সাদা ফসলের ক্ষেত বাতাসে দ্লছে; ফার বনের মাথায় নেমেছে স্র্যের আলোর রক্তবন্যা। দেখতে পেল, গ্রামের পেছনে নদীর জলে গ্রামের ছেলেরা নাইছে, সাদা সাদা দেহ ঝকঝক করছে। এক নারীকণ্ঠের মিহি ডাক কানে এল: "স্তাসিয়া, স্তাসিয়া। এখানে আয়!' একটা সিগারেট ধরাল শ্চেগোল্-কোভ্, চালায় ফিরে যেতে যেতে বলল:

—'কি রকম রক্তসন্ধ্যা রে। ঝড় উঠবে দেখছি।'

॥ ছয় ॥

সেই রাত্রে ঘোড়াগ্লো জিন না-চাপানোই রইল। সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হল গ্রামে; সাড়াশব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল।

পরের দিনটা কাটল শ্য়ে বসে। বিকেলের দিকে একটা রিপোর্ট দিয়ে পোপোভ্কে পাঠিয়ে দেওয়া হল কোম্পানিতে।

সন্ধ্যা। রাত্রি। গ্রামের মাথার ওপর হলদে চাঁদের ফালি ভেসে উঠল। মাঝে মাঝে বাগানের গাছ থেকে পাকা আপেল খসে পড়ছে, তারই ম্দ্ শব্দ।

মাঝরাত্রির কাছাকাছি ইভানকোভ ছিল পাহারায়, গ্রামের রাস্তায় ঘোড়ার খ্রের শব্দ শ্নতে পেল। দেখবার জন্যে হামাগ্ড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল গর্ত থেকে, কিন্তু চাঁদ ঢাকা পড়ে গেল মেঘে, দ্র্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে দ্ষ্টি চালিয়েও কিছ্ দেখতে পেল না। ফিরে গিয়ে ক্রুচ্কোভ্কে জাগাল, দরজার কাছেই সে শ্য়ে ছিল।

—'কোঝ্‌মো! ঘোড়সোয়ার আসছে! উঠে পড়!'

—'কোত্থেকে আসছে?'

—'গ্রামের ভেতরে ঢুকে পড়েছে।'

বাইরে এল দুজনে। প্রায় দু শ হাত দূরে রাস্তার ওপর থেকে স্পষ্ট ঘোড়ার খুরের আওয়াজ কানে এল।

—'চল বাগানের ভেতর যাই। সেখান থেকে ভাল করে শুনি।' ক্রুচ্‌কোভ বাতলাল।

বাড়ির পাশ দিয়ে দৌড়ে সামনের ছোট বাগানটায় এল তারা, বেড়ার গা ঘেঁসে শুয়ে পড়ল। আরও কাছে এসে পড়ল রেকাবের টুংটাং আর জিনের মচ্‌মচ্‌ শব্দ। এতক্ষণে দেখতে পেল ঘোড়সোয়ারদের আবছা দেহরেখা, চারজন করে পাশাপাশি চলেছে।

—'কে যায়?' চেঁচিয়ে উঠল ক্রুচ্‌কোভ্‌।

—'মতলব কি তোমার?' সামনের সারি থেকে একজন উত্তরদিল রুশভাষায়।

—'যায় কে? গুলি চালালাম কিন্তু!' হড়াৎ করে রাইফেলের ছিটকিনি টেনে দিল ক্রুচ্‌কোভ্‌।

ঘোড়ার রাশ টেনে থামাল একজন ঘোড়সোয়ার, বাগানের বেড়ার দিকে ফিরল। বলল :

—'আমরা সীমান্তরক্ষী। তোমরা কি ঘাটি-দার?'

—'হ্যাঁ।'

—'কোন রেজিমেণ্টের?'

—'তৃতীয় কসাক...।'

—'কার সঙ্গে কথা বলছ, ত্রিশিন?' অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা গলা শোনা গেল। বেড়ার কাছের ঘোড়সোয়ার উত্তর দিল :

—'এখানে একটা কসাক ঘাটি বসান হয়েছে, হুজুর।'

দ্বিতীয় একজন ঘোড়সোয়ার বেড়ার কাছে এল।

—'ভাল তো সব, কসাকরা! অনেক দিন আছ নাকি এখানে?' দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিজ্ঞেস করল সে।

মুহূর্তের আলোতেই ক্রুচ্‌কোভ দেখে বুঝল, লোকটা সীমান্তরক্ষী-বাহিনীর অফিসার। উত্তর দিল :

—'কাল থেকে আছি।'

—'আমাদের পাহারা আমরা সরিয়ে নিচ্ছি;' অফিসারটি বলল, 'খুব ভাল করে খেয়াল রাখবে, তোমরাই এখন সীমান্তের সবচেয়ে কাছের ঘাটি। শত্রু হয়ত কাল এগুতে পারে।' মুখ ফিরিয়ে সে লোকজনদের এগিয়ে চলার হুকুম দিল।

সেই মুহূর্তে বাতাসের নির্মম ঝাপটায় চাঁদের মুখের আবরণ ছিঁড়ে গেল। আর, গ্রামের সর্বাঙ্গে, বাগানে বাগানে, বাড়িটার খাড়া ছাদে, চড়াই ভেঙে ওঠা সীমান্তরক্ষী-বাহিনীর ওপর ছড়িয়ে পড়ল মড়ার মত ফ্যাকাশে হলদে আলোর বন্যা।

॥ সাত ॥

পরদিন এক রিপোর্ট দিয়ে রুভাচেভ্‌কে পাঠান হল কোম্পানিতে। রাত্রে ঘোড়াগুলো জিন চাপানোই রইল। এখন থেকে শত্রুর সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যে তারাই রইল শুধু, এই কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠল কসাকরা। যতদিন তারা জানত তাদের আগে আগে আছে সীমান্তরক্ষীরা, ততদিন সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার. নিঃসঙ্গতার কোন অনুভূতি তাদের মনে জাগেনি। কিন্তু সীমান্ত আজ উন্মুক্ত, এই খবরটাই তাদের ওপর বিশেষ ক্রিয়া করল।

পোলচাষীটার সঙ্গে আলাপ করল মিখিন, কিছু পয়সা পেয়ে তাদের ঘোড়ার জন্যে ঘাস কাটতে দিতে রাজী হল। তার ঘাসের জমিটা চালা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। ইভানকোভ্‌ আর শ্চেগোল্‌কোভ্‌কে ঘাস কাটতে লাগাল মিখিন। শ্চেগোল্‌কোভ্‌ কাটতে লাগল, আর ইভানকোভ্‌ ভিজে ভারী ঘাসগুলো নেড়েচেড়ে একসঙ্গে আটি বাঁধতে লাগল।

কাজ করতে করতেই দূরবীন দিয়ে মিখিন নজর রাখছিল সীমান্তমুখী রাস্তাটার ওপর। দেখতে পেল, দক্ষিণ-পশ্চিম দিয়ে ছুটে আসছে। বাদামি-রঙের খরগোশের মত পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ছুটছে ছেলেটা; বেশ খানিকটা দূর থেকেই সে চিৎকার করে উঠল, কোটের লম্বা হাতাটা দোলাতে লাগল। মিখিনের কাছ পর্যন্ত ছুটে এল সে হাঁপাতে হাঁপাতে, চোখ গোল গোল করে বলল :

—'জার্মানরা! জার্মানরা আসছে!'

হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল সে। দূরবীন চোখে তুলে মিখিন দেখল, দূরে একদল অশ্বারোহী। দূরবীন না সরিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠল :

—'ক্রুচ্‌কোভ! দৌড়ে যাও, ওদের ডাক! একটা জার্মান টহলদার-দল আসছে।'

মাঠের দিকে ছুটল ক্রুচ্‌কোভ। মিখিন এবার স্পষ্ট দেখতে পেল, ধূসর ঘাস-জমির ওধারে একদল ঘোড়সোয়ার ছুটছে। ঘোড়াগুলোর বাদামি-রঙ আর উর্দির গাঢ় নীল ছোপও ধরা পড়ল তার চোখে। তারা সংখ্যায় জন কুড়ি হবে, গা ঘেঁসাঘেসি করে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। তারা আসছে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে, আর সে কিনা ভাবছিল ওরা আসবে উত্তর-পশ্চিম থেকে। রাস্তাটা পেরিয়ে গেল তারা, যেখানে গ্রামটা রয়েছে সেই উপত্যকায় তারা চলল টিলা বরাবর।

এরই মধ্যে মাঠ পেরিয়ে ছুটে গিয়ে ক্রুচ্‌কোভ পেঁছিল যেখানে ইভানকোভ আর শ্চেগোল্‌কোভ্‌ ঘাস কাটছিল। দাঁড়িয়েই বলল, 'ফেলে রাখ ওসব!'

—'বলি, ব্যাপার কি?' মাটিতে কাস্তের ডগাটা বিঁধিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল শ্চেগোল্‌কোভ্‌।

—'জার্মানরা আসছে!'

ঘাসের বাণ্ডিলটা মাটিতে ফেলে দিল ইভান্‌কোভ্‌। বেঁকে প্রায় মাটির সঙ্গে নুয়ে বাড়ির দিকে ছুটল পোল চাষীটা, তার পেছনে পেছনে কসাকরা। জিনের ওপর লাফিয়ে উঠল ছোট দলটা, তারপর ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামের বাইরে টিলাটায়

গিয়ে উঠল। তারা যখন চুড়োয় গিয়ে পেঁছিল, জার্মান দলটা তখন তাদের আর পোলিকালিয়া শহরের ঠিক মাঝখানটিতে। তারা চলছিল কদমে, লেজছাঁটা, বাঘফটকা ঘোড়ায় চড়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এক অফিসার।

—'তাড়া কর ওদের। ওদের নিয়ে গিয়ে ফেলব আমাদের দ্বিতীয় ঘাঁটিতে।' মিখিন নির্দেশ দিল।

তারা জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। স্পষ্ট চোখে পড়ল জার্মান ড্রাগুনদের নীল উর্দি। তারাও দেখতে পেল কসাকরা পেছনে আসছে, তাই দ্বিতীয় রুশ-ঘাঁটির দিকে চলল ঘোড়া ছুটিয়ে। ঘাঁটিটা লিউবোভ্ গ্রাম থেকে প্রায় মাইলদুয়েক দূরে এক খামার-বাড়িতে। দুই দলের মধ্যেকার ব্যবধান স্পষ্টতই কমে আসতে লাগল।

—'গুলি চালাও এবার!' জিন থেকে লাফিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল মিখিন।

হাতের উপর লাগাম রেখে দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ল কসাকরা। গুলির শব্দে লাফিয়ে উঠে চাঁট ছুঁড়ল ইভান্কোভের ঘোড়া, মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ল সে। পড়তে পড়তেই সে দেখতে পেল, একটা জার্মান প্রথমে একদিকে কাত হয়ে পড়ল, হাত দুটো ছুঁড়ে তারপর হঠাৎ গড়িয়ে পড়ল জিনের ওপর থেকে। অন্যরা থামল না, গলায় ঝোলানো বন্দুকও খুলে নিল না, ঘোড়া ছুটিয়ে চলল ছড়িয়ে লাইন বেঁধে। সর্বপ্রথম ঘোড়ায় চাপল মিখিন। কসাকরা চাবুক কষতে লাগল। বাঁ-দিকে ঘুরল জার্মানরা, তাদের পেছনে তাড়া করে কসাকরা মাটিতে পড়ে থাকা ড্রাগুনের কাছ দিয়ে চলে গেল। সামনে প্রসারিত ঢেউ তোলা প্রান্তর, এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে চলে গিয়েছে ছোট ছোট অগভীর নালা। জার্মানরা যখনই নালার ওপারে পেঁছুতে লাগল, তখন প্রতিবারই কসাকরা গুলি চালাতে লাগল। আর একটু এগিয়ে, আর একজন জার্মান মাটিতে পড়ে গেল।

—'এখনি খামারবাড়ি থেকে এসে পড়বে আমাদের লোকেরা। ওইটে আমাদের দ্বিতীয় ঘাঁটি।' তামাকের ছোপলাগা আঙুল দিয়ে রাইফেলের বাক্সে টোটা ঠাসতে ঠাসতে বিড়বিড় করে মিখিন বলল। খামারবাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকাল কসাকরা, কিন্তু সেটা জনশূন্য। পরে তারা জানতে পেরেছিল, প্রায় আধমাইল দূরে টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে দেখে আগের রাত্রেই ঘাঁটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে।

জিনের ওপর থেকেই জার্মানদের দিকে তাক করে আর একবার গুলি ছুঁড়ল মিখিন। একজন একটু পিছিয়ে পড়েছিল, মাথা ঝাঁকিয়ে সে ঘোড়ার পেটে রেকাব ঠুকল।

—'ওদের তাড়িয়ে নিয়ে তৃতীয় ঘাঁটিতে ফেলব।' পেছনে আর সকলের দিকে ঘুরে চিৎকার করে উঠল মিখিন। কেবল তখনই দেখতে পেল ইভান্কোভ, মিখিনের নাকটা ছিঁড়ে গেছে, ফুটোর কাছ থেকে একটুকরো চামড়া ঝুলছে।

—'ফিরে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করে না কেন, ব্যাটারা?' কাঁধের ওপর বন্দুকটা ঠিক করতে করতে উদ্গ্রীব হয়ে সে প্রশ্ন করল।

একটা নালার মধ্যে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল জার্মানরা। নালার অপর পারে চষা জমি। এপারে কাঁটাঘাস আর মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়। ঘোড়ার রাশ টানল মিখিন, টুপিটা খুলে নিয়ে, হাতের পেছন দিয়ে ঘাম মুছল। নালার অপর পারে জার্মানদের উঠতে দেখা গেল না। মিখিন আর সকলের দিকে তাকাল, থুথু ফেলে বলল:

—'তুমি এগিয়ে যাও ইভান্কোভ্, দেখ ত ওরা গেল কোথায়?'

তৃষ্ণার্ত ঠোঁটদুটো চেটে নিয়ে এগিয়ে গেল ইভান্‌কোভ্‌।

—'একটান তামাক যদি পেতাম!' চাবুক নাড়িয়ে ডাঁশ তাড়াতে তাড়াতে ক্রুচ্‌কোভ বিড়বিড় করে উঠল।

ঘোড়া চালিয়ে নালাটার কাছে এল ইভান্‌কোভ্‌। রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে নালার নীচেটার এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল বর্শার চকচকে ফলাগুলো; তারপরই বেরিয়ে এল জার্মানরা, তাদের ঘোড়াগুলো ঘুরল, ঢালু বেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এল আক্রমণ করতে। ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নেবার মুহূর্তেই, অফিসারের দাড়িগোঁফচাঁছা গম্ভীর মুখখানা আর জিনের ওপর বসে থাকা পাথরের মূর্তির মত চেহারাটা ইভান্‌কোভের স্মৃতিতে আঁকা হয়ে গেল। পিঠে যেন মৃত্যুর তীক্ষ্ণ হিম স্পর্শ লাগল; নিঃশব্দে ঘোড়া ছুটিয়ে সে বন্ধুদের কাছে চলল।

স্নিখিন তামাকের থলেটাও বন্ধ করবার সময় পেল না। ইভান্‌কোভের পেছনে জার্মানরা আসছে, সর্বপ্রথম তাদের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল ক্রুচ্‌কোভ। ইভান্‌কোভকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জন্যে চারধার থেকে ঘিরে এল ড্রাগুনরা, অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে তাকে প্রায় ধরে ফেলল। ঘোড়ার পিঠে চাবুক আছড়াতে লাগল ইভান্‌কোভ্‌, মুখে থরথরানি জেগে উঠল, চোখদুটো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে লাগল। জিনের ওপরে ঝুঁকে পড়ে দলের মাথায় চলে এল স্নিখিন।

ইভান্‌কোভকে একটিমাত্র চিন্তাই পেয়ে বসল। 'শুধু ফিরতে হবে বন্ধুদের কাছে।' নিজেকে বাঁচাবার কোন কথাই মনে জাগল না তার। বিশাল শরীরটা গুটিয়ে মাথা গুঁজে দিল ঘোড়ার কেশরে।

লম্বাচওড়া, লালমুখো এক জার্মান ধরে ফেলল তাকে, বর্শার আঘাত করল তার পিঠে। বর্শার ফলা ইভান্‌কোভের চামড়ার বেল্ট ফুটো করে গায়ের প্রায় ইঞ্চিখানেক মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল।

—'পেছন ফের, ভাই সব!' তলোয়ার খুলে নিয়ে বিকারগ্রস্তের মত সে চিৎকার করে উঠল। পাশ থেকে আসা একটা আঘাত ঠেকিয়ে দিল সে, বাঁ-দিক থেকে ছুটে আসা এক জার্মানকে কেটে ফেলল এক কোপে। কিন্তু তাকে ঘিরে ফেলেছে জার্মানরা। একটা জার্মান ঘোড়া তার ঘোড়াটার পাশে ধাক্কা মারল, তাকে প্রায় উল্টে ফেলে দিল। ইভান্‌কোভের চেখে পড়ল শত্রুর একখানা ভয়ঙ্কর মুখ, একেবারে মুখোমুখি।

স্নিখিন সবচেয়ে আগে এসে পড়ল। তাকে হটিয়ে দিল ওরা। জিনের ওপর বসে তলোয়ারখানা ইলেক্‌ট্রিক পাখার মত ঘোরাতে লাগল, দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল, বিকৃত, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল মুখখানা। একটা তলোয়ারের ডগার ঘা লাগল ইভান্‌কোভের ঘাড়ে। বাঁদিকে লাফিয়ে উঠল এক ড্রাগুন, তার চোখে ঝলসে উঠল ইস্পাতের ফলার ভয়াবহ উজ্জ্বলতা। তলোয়ার দিয়ে আটকাল সে; ইস্পাতের আঘাত পড়ল ইস্পাতের গায়ে। পেছন থেকে এক বর্শা এসে বিঁধল তার কাঁধের পট্টিতে, পট্টি ছিঁড়ে ঢুকতে লাগল বর্শাটা। ঘোড়ার মাথার সামনে দেখা দিল এক বয়স্ক জার্মানের ঘর্মাক্ত, উত্তেজিত মুখ, তলোয়ার দিয়ে সে বুকে ঘা মারবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু পারল না। তখন তলোয়ার ফেলে দিয়ে, জিনের ধার থেকে বন্দুকটা হেঁচকা টানে তুলে নিল, মুহূর্তের জন্যেও ইভান্‌কোভের মুখ থেকে তার মিটমিটে চোখের দৃষ্টি সরিয়ে নিল না। কিন্তু বন্দুকটাও বাগিয়ে ধরতে পারল না, কারণ ঘোড়ার ওপর দিয়ে ক্রুচ্‌কোভ্‌ বিঁধিয়ে দিল তাকে, বর্শাটা সে ছিনিয়ে নিয়েছিল এক ড্রাগুনের মুঠো থেকে। বুক থেকে বর্শাটা তুলে ফেলে পেছন দিয়ে পড়ে গেল সে। ভয়ে বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠল

—'মিয়েন মুট্টের!'

ক্রুচ্‌কোভ্‌কে জ্যান্ত ধরার জন্যে ঘিরে ফেলল আটজন ড্রাগুন। কিন্তু ঘোড়ার চাঁট ছুটিয়ে এমনভাবে বাধা দিতে লাগল, যে আঘাত করে তাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করতে হল। অপরের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বর্শাটা নিয়ে ইভান্‌কোভ্‌ কুচকাওয়াজের মাঠের মত ভেল্কি দেখাতে লাগল। হটে গিয়ে, এবার জার্মানরা এগিয়ে এল খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে। ছোট্ট একখণ্ড কাদা কাদা চষা-জমির ওপর তারা জড়াজড়ি করতে লাগল, ফুঁসে ফুঁসে এদিক ওদিক দুলতে লাগল, যেন ঝড়ের ঝাপটায় টালমাটাল হয়ে উঠল।

ভয়ে তালকানা হয়ে কসাক আর জার্মানরা যা কিছু সামনে পড়তে লাগল তার ওপরই আঘাত হানতে লাগল : পিঠে, হাতে, ঘোড়ার গায়ে, হাতিয়ারে। মৃত্যুর ভয়ে পাগল হয়ে ঘোড়াগুলো ধাক্কাধাক্কি করতে লাগল, এ ওকে আঘাত করতে লাগল। কিছুটা আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়ে ইভান্‌কোভ্‌ লম্বা মুখ, রেশমের মত চুল, এক জার্মানের মাথায় ঘা মারবার জন্যে বারকয়েক চেষ্টা করল, লোকটা তার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে, কিন্তু হেলমেটে লেগে তার তলোয়ারের কোপটা পিছলে গেল।

চক্র থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল ম্রিখিন, তারপর ছুটল একা একা, দরদর করে রক্ত পড়ছে তার। পেছনে তাড়া করল জার্মান অফিসারটি। কাঁধ থেকে রাইফেল খুলে নিয়ে গুলি করল ম্রিখিন, লোকটাকে মেরে ফেলল একেবারে মুখোমুখি নিশানায়। এতক্ষণে গতি ফিরল লড়াই-এর। কমাণ্ডারকে হারিয়ে জার্মানরা—প্রত্যেকেই আহত, ঘা লেগেছে এলোমেলো—পিছন ফিরল। তাদের আর তাড়া করল না কসাকরা, পেছন থেকে গুলিও চালাল না। তারা সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে চলল পেলিকোলিয়ায় তাদের কোম্পানিতে। আর জার্মানরা এক আহত সঙ্গীকে তুলে নিয়ে সীমান্তের দিকে পালাল।

প্রায় আধমাইলটাক এসে জিনের ওপরে টলতে লাগল ইভান্‌কোভ :

—'আমি...আমি পড়ে যাব...' ঘোড়াটা থামিয়ে ফেলল। কিন্তু তার লাগামে টান দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ম্রিখিন :

—'চলে এসো!'

মুখ থেকে রক্ত মুছে ফেলল ক্রুচ্‌কোভ্‌, বুকে হাত দিয়ে দেখল। জামার ওপর ভিজে ভিজে লাল দাগ ফুটে উঠেছে। যে খামারবাড়িতে দ্বিতীয় ঘাঁটি ছিল, সেখানে এসে কোন রাস্তায় যাবে, তাই নিয়ে মতভেদ হল।

—'ডানধারে চলো!' সবুজ অলভার বনের কাদাজমির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ম্রিখিন বলল।

—'না, বাঁয়ে।' ক্রুচ্‌কোভ জোর দিয়ে বলল।

ভাগ হয়ে গেল তারা। ক্রুচ্‌কোভ্‌ আর শ্চেগোল্‌কোভের পর ম্রিখিন আর ইভান্‌কোভ্‌ পৌঁছুল রেজিমেন্টের মূল ঘাঁটিতে। দেখল, তাদের কোম্পানির কসাকরা তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। লাগাম ফেলে দিয়ে জিন থেকে লাফিয়ে পড়ল ইভান্‌কোভ্‌, তারপর টলতে টলতে মাটিতে পড়ে গেল, তার লোহার মত শক্ত মুঠো থেকে তলোয়ারের বাঁটটা অতিকষ্টে ছাড়িয়ে নিতে হল।

একঘণ্টার মধ্যে প্রায় গোটা কোম্পানিটাই ঘোড়া ছুটিয়ে এল যেখানে জার্মান অফিসারটা পড়ে আছে। কসাকরা তার বুট ছাড়িয়ে নিল, জামাকাপড়, অস্ত্রশস্ত্র খুলে নিল; ঘিরে দাঁড়িয়ে মৃতের ভুরুকোঁচকানো, ফ্যাকাসে কচি মুখখানা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। অফিসারের হাতঘড়িটা একজন হাতিয়ে নিল, সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে

খোঁচে দিল সার্জেন্ট-মেজরকে। একটা পকেট বইএর মধ্যে তারা পেল গোটাকয়েক টাকা, একখানা চিঠি, একগোছা রেশমী চুল আর গর্বমাখানো, হাসি হাসি মুখ, একটি মেয়ের ফটো।

॥ আট ॥

পরে এই ঘটনাটাই হয়ে দাঁড়াল এক বীরত্বের ব্যাপার। ক্রুচ্‌কোভ্‌ কোম্পানি কমাণ্ডারের পেটোয়া, ঘটনাটা বর্ণনা করে সে সেণ্ট জর্জ ক্রশ পেল। তার সঙ্গীরা পেছনে পড়ে গেল। বীর পুঙ্গবকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ডিভিসনের দপ্তরে, সেখানে সে শুয়ে বসে দিন কাটাল প্রায় যুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত। আরও অনেক ক্রশ পেয়ে গেল সে, কারণ প্রভাবশালী মহিলা আর অফিসাররা তাকে দেখতে আসতে লাগলেন পিটার্সবুর্গ আর মস্কো থেকে। মহিলারা চোখ কপালে তুলে 'সাবাস' 'সাবাস' করলেন, মহিলারা ডনের কসাককে দামি সিগারেট আর চকোলেট গেলালেন।

প্রথম দিকে সে মনে মনে সবাইকে বাপান্ত করতে লাগল, পরে অফিসারের উর্দিপরা দপ্তরের ধামাধরাদের প্রভাবপুষ্ট ছত্রছায়ায় দিব্যি লাভজনক ব্যবসা ফেঁদে বসল। তার বীরত্বের গল্প বলতে লাগল রঙ চড়িয়ে, মিথ্যে বলতে একটুও তার বিবেকে বাধল না, আর মহিলারা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগলেন, প্রশংসার চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন কসাক বীরের বসন্তের দাগওয়ালা, ডাকাতের মত মুখখানা।

সদর দপ্তর পরিদর্শনে এলেন জার, তাঁকে দেখাতে ক্রুচ্‌কোভকে আনা হল। ঢুলঢুলু চোখের দৃষ্টি বুলালেন ক্রুচ্‌কোভের গায়ে, যেন সে একটা ঘোড়া। চোখের ভারী পাতাদুটো মিটমিট করে চাপড় মারলেন পিঠে।

—'বেড়ে কসাক বাচ্চা!' মন্তব্য করলেন তিনি, তারপর পার্শ্বরক্ষীর দিকে ফিরে একটু 'হজমি-পানি' চাইলেন।

খবরের কাগজ আর পত্রিকায় হরদম ছাপা হতে লাগল ক্রুচ্‌কোভের উস্কুখুস্কু মাথার ছবি। ক্রুচ্‌কোভ মার্কা সিগারেটও বেরুল বাজারে। নিঝ্‌নি-নোভ্‌গোরোদের ব্যবসায়ীরা তাকে সোনার কাজকরা একটা বন্দুক উপহার পাঠাল।

কিন্তু ব্যাপারটা কি ঘটেছিল? মানুষে মানুষে সংঘর্ষ হয়েছিল মৃত্যুর প্রান্তরে; মৃত্যুর আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে লড়াই করেছিল তারা, অন্ধের মত এ ওকে আঘাত করেছিল, আহত করেছিল এ ওর ঘোড়াকে; তারপর তারা পিছু হটেছিল, তাদের একজন গুলিতে পড়ে গেলে পালিয়েছিল ভয়ে। ভয়ঙ্কর ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গিয়েছিল।

আর এরই নাম হল বীরত্বের ব্যাপার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

প্রথম লড়াইএর পর এক বিষণ্ণ মানসিক বেদনায় গ্রিগর মেলেখফ ভেতরে ভেতরে গুমরে মরতে লাগল। সে স্পষ্টই শুকিয়ে গেল, ওজন কমল, আর হামেশাই—আক্রমণের সময়, কিংবা বিশ্রামের সময়, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, অথবা জেগে জেগে—সে দেখতে লাগল সেই অস্ট্রিয়ানের অশরীরী মূর্তি, যাকে সে রেলিঙের ধারে খুন করেছিল। ঘুমের ঘোরে সে বারবার ফিরে যায় সেই প্রথম দিনকার লড়াইতে, এমনকি বর্শা মুঠো করে ধরা ডান হাতটার থরথরানি পর্যন্ত অনুভব করতে পারে। জেগে উঠে স্বপ্নকে জোর করে তাড়ায়, অতিকষ্টে চোখ কুঞ্চিত করে হাতের আড়াল দেয়।

পাকা ফসলের ক্ষেত মাড়িয়ে চলে গেল অশ্বারোহী বাহিনীরা, মাঠে মাঠে ঘোড়ার খুরের ছাপ পড়ে রইল, গোটা গ্যালিসিয়ার বুকের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল। রাস্তায় রাস্তায় ভারী, ফৌজীবুটগুলো আছড়ে ফিরল, দাগ কাটল পাথর বাঁধানো রাজপথে, আগস্টের জলকাদা তোলপাড় করে তুলল। কামানের গোলায় গোলায় ধরিত্রীর বিষণ্ণ মুখখানি ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল, লোহা আর ইস্পাতের টুকরো রক্তের লালসায় মানুষের দেহ খুবলে খুবলে নিল। রাত্রে গাঢ় লালশিখায় দিগন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল : গাছপালা গ্রাম শহর গ্রীষ্মের বিদ্যুৎশিখার মত জ্বলতে লাগল। আগস্টে যখন ফল পাকে, ফসল কেটে তোলার উপযুক্ত হয়—তখন বাতাসে-ঝাঁকানো আকাশ হয়ে উঠল হাসি-খোয়ানো ধূসর, ক্বচিৎ দেখা পাওয়া সুন্দর দিনগুলো গুমোট, ভ্যাপসা গরম।

আগস্টও শেষ হয় হয়। বাগানে বাগানে গাছের পাতায় চকচকে হলদে রং ধরল, ডালে ডালে এক শোকাচ্ছন্ন রক্তাভার বান ডাকল। দূর থেকে মনে হয়, গাছের গায়ে ক্ষত, রক্ত পড়ছে গলগল করে।

অন্যান্য সঙ্গীদেরও যে পরিবর্তন ঘটল, গ্রিগর তা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করতে লাগল। গালের ওপরে ঘোড়ার নালের চিহ্ন নিয়ে প্রোখর ঝিকোভ্ হাঁসপাতাল থেকে ফিরে এল, তার ঠোঁটের কোণে বেদনা আর বিস্ময় লুকানো। বাছুরের মত চোখদুটো আগের চেয়েও বেশি মিটমিট করে। ইয়েগোর ঝারকোভ্ শাপান্ত বাপান্ত করার সুযোগ পেলে ছাড়ে না, সে আরও বেশি খিস্তিবাজ হয়ে উঠল, দুনিয়ার সবকিছুর খেউড় গায়। ইয়েমেলিয়ান গ্রোসেভ গম্ভীর প্রকৃতির করিতকর্মা লোক, গ্রিগরের একই গ্রামের; সে যেন পুড়ে খাক হতে লাগল। মুখখানা হল কালিমাড়া, হাসে কেমন বোকার মত করুণভাবে। প্রতিটি মুখের পরিবর্তনই চোখে পড়ার মত। যুদ্ধ যে লোহার বীজ বুনেছে তাই যেন প্রত্যেকে অন্তরে অন্তরে লালন-পালন করতে লাগল। আর কাটাঘাসের শিষের মত রস শুকিয়ে নেতিয়ে পড়তে লাগল তরুণ কসাকরা।

॥ দুই ॥

তিনদিনের বিশ্রামের জন্যে রেজিমেণ্টকে সরিয়ে আনা হল সামনের সারি থেকে। ঘাটতি পূরণ করা হল ডন থেকে আনা ফৌজ দিয়ে। গ্রিগরের কোম্পানির কসাকরা কাছের এক বিলে স্নান করতে যাবার তোড়জোড় করছিল, এমন সময় মাইল দুয়েক দূরের স্টেশন থেকে গ্রামে এসে হাজির হল ঘোড়সোয়ারদের একটা বড়সড় দল। কসাকরা বিলের বাঁধের কাছে পেঁছুতে পেঁছুতেই ঘোড়সোয়াররা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামতে শুরু করল। প্রোখর ঝিকোভ জামা খুলছিল, মুখ তুলে তাকিয়ে, চেঁচিয়ে উঠল :

—'ওরা কসাক, ডন কসাক!'

গ্রিগর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, চতুর্থ কোম্পানি যেখানে আছে, সেই জমিদারবাড়ির দিকের রাস্তা ধরে দলটা এগুচ্ছে সাপের মত এঁকেবেঁকে। মন্তব্য করল :

—'আমার মনে হচ্ছে, দল ভারী করা হচ্ছে।'

—'আরে দেখ, দেখ; নির্ঘাৎ ও আমাদের স্তেপান আস্তাখফ? ওই যে সামনের দিকের তিনের সারিতে।' ঘ্যাসঘেসে গলায় হেসে গ্রোমেভ চেঁচিয়ে উঠল।

—'আনিকুশকাও যে।'

—'গ্রিগর! তোমার দাদা। দেখতে পাচ্ছ?'

চোক কুঁচকে তাকাল গ্রিগর, পিয়োত্রার ঘোড়াটা চিনবার চেষ্টা করল। দাদার মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মনে মনে ভাবল, 'নিশ্চয়ই নতুন একটা কিনেছে!' তাদের শেষ দেখা হওয়ার পর অদ্ভুত পাল্টে গেছে মুখখানা।

টুপিটা খুলে নিয়ে, কলের মত দোলাতে দোলাতে গ্রিগর দেখা করতে এগিয়ে গেল। নুয়ে পড়া বনতুলসী আর চোর-কাঁটার ঝোপ এড়িয়ে তার পেছনে পেছনে অর্ধনগ্ন কসাকরা ছুটল।

মোটাসোটা, ভারিক্কী ঠোঁটে লেগে থাকা কেঠোভঙ্গি, বয়স্ক এক ক্যাপ্টেনের তদারকে বাগানটা ঘুরে, গোটা দল জমিদারের আঙিনায় ঢুকল। দাদার দিকে তাকিয়ে, আনন্দে উত্তেজনায় গ্রিগর ভাবল, 'একজন মধ্যস্থ পাওয়া গেল!' চেঁচিয়ে উঠল :

—'দাদা, ও দাদা!'

—'একসঙ্গে থাকব রে আমরা। তুই আছিস কেমন, গ্রিগর?'

—'খুব ভাল।'

—'তাহলে, বেঁচে আছিস দেখছি?'

—'এই কোনরকমে।'

—'বাড়ির সকলের শুভেচ্ছা জানিস।

—'আছে কেমন সবাই?'

—'ভাল।'

ঘোড়ার পাছায় হাত রেখে, জিনের ওপর একেবারে গোটা শরীরটাই ঘুরিয়ে নিয়ে পিয়োত্রা হাসতে হাসতে গ্রিগরের সর্বদেহে চোখ বুলাতে লাগল। তারপর আবার

চলতে লাগল, পেছন থেকে এগিয়ে আসা চেনা অচেনা কসাকদের সারিতে ঢাকা পড়ে গেল।

শুধু সার্ট গায়ে, এক পায়ে লাফাতে লাফাতে, বিল থেকে ছুটে এল ঝারকোভ্। ছুটতে ছুটতেই আর একটা পা পা-জামায় গলাবার চেষ্টা করল।

—'আরে এই যে ঝারকোভ!' সারিগুলোয় একটা চিৎকার উঠল।

—'এই যে ঘোটক মহাশয়! পায়ে ছাঁদন দিতে হল নাকি তাহলে?'

—'মা কেমন আছে?'

—'বেশ ভালই আছেন। আশীর্বাদ জানিয়েছেন, কিন্তু জিনিসপত্তর দেন নি কিছু। দিনকাল যা হয়েছে, খুবই কষ্টকর।'

ইয়েগোর অতি গম্ভীর মুখে উত্তরটা শুনল; তারপর ঘাসের ওপর ন্যাংটো পাছায় বসে পড়ল, থর থর করে কাঁপা পা-টা পা-জামার ভেতরে গলাবার জন্যে বৃথাই টানাটানি করতে লাগল।

॥ তিন ॥

দলটা আঙিনায় লাইন বেঁধে দাঁড়াল। অন্য কসাকরা স্নান করতে ফিরে গেল, নবাগতেরা তাদের সঙ্গে শিগগীরই যোগ দিল। দাদার পাশে বসে পড়ল গ্রিগর। বাঁধের গুঁড়ো গুঁড়ো, ভ্যাপসা মাটিতে ভয়াবহ, কাঁচা গন্ধ। বসে বসে সার্টের ভাঁজ আর সেলাইএর খাঁজ থেকে রক্তহীন, নির্জীব উকুনগুলো টিপে টিপে মারতে লাগল। তারপর একসময় বলল :

—'মনের দিক থেকে আমি একেবারে মরে গেছি, দাদা। মৃত্যুই শুধু হয় নি আমার, আর সবই হয়ে গেছে। আমি যেন জাঁতাকলে আটকে ছিলাম। ওরা আমাকে পিষেছে তারপর দূর করে দিয়েছে থুথু দিয়ে।' তার কণ্ঠস্বর অভিযোগ করে চড়ায় উঠল, আর কপালের ওপরকার ভাঁজ গুলো (কেবল তখনই উদ্বেগ অনুভব করে পিয়োত্রা তাকিয়ে দেখল) কালো হয়ে রেখায় রেখায় ফুটে উঠল।

—'কেন, কি হয়েছে?' সার্টটা খুলতে খুলতে পিয়োত্রা জিজ্ঞেস করল। চোখে পড়ল তার সাদা আদুড় গা, ঘাড়ের চারধারে রোদে পোড়া স্পষ্ট দাগ।

—'ব্যাপারটা এই রকম,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল গ্রিগর, তিক্ততায় কঠিন হয়ে উঠল গলার স্বর। 'ওরা লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে আমাদের, কিন্তু ওরা নেই এর মধ্যে। মানুষ নেকড়ের চেয়েও অধম হয়ে উঠেছে। শয়তান ঘুরছে চারপাশে। মনে মনে ভাবি, যদি কাউকে আমি কামড়াই, পাগল সে হয়ে যাবে।'

—'তোকে কি...মারতে হয়েছে কাউকে?'

—'হ্যাঁ।' প্রায় চিৎকার করে উঠল গ্রিগর। সার্টটা মুঠো করে ধরে পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল পায়ের নীচে। আঙুল দিয়ে গলাটা আঁকড়ে ধরে বসে রইল, যেন গলায় কথা আটকে, দম বন্ধ হয়ে এল। তাকিয়ে রইল পাশের দিকে চেয়ে।

—'বল আমাকে!' ভাইএর চোখের দিকে না তাকিয়ে জোর দিয়ে বলল পিয়োত্রা।

—'আমার বিবেক কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে। একজনের বুকে আমি বর্শা ঢুকিয়ে

দিয়েছিলাম...তখন রক্ত গরম ছিল...না করে উপায় ছিল না..., কিন্তু অন্যজনকে কেন কুপিয়ে মারলাম?'

—'বেশ ত?'

—'বেশ ত নয় এটা! একটা লোককে কুপিয়ে মেরেছি, আর তারই জন্যে মনে মনে পুড়ে খাক হচ্ছি আমি। আমার স্বপ্নে হানা দেয় সে, শালা শুয়োরের বাচ্চা। দোষটা কি আমার?'

—'এখনো তুই অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিস নি; গোলমাল ঘটেছে সেখানেই।'

—'তোমরা কি আমাদের কোম্পানিতেই থাকবে?' হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল গ্রিগর।

—'না, আমাদের নেওয়া হয়েছে সাতাশ নং রেজিমেণ্টের জন্যে।'

—'যাক গে, চলো নাইগে।'

তাড়াতাড়ি পা-জামাটা খুলে ফেলল গ্রিগর, গিয়ে দাঁড়াল বাঁধের একেবারে ধারে। পিয়োত্রা ভাবল, শেষ দেখা হয়েছিল যখন তাদের, তখনকার চেয়ে স্পষ্টই বুড়িয়ে এসেছে গ্রিগর। হাতদুটো শূন্যে তুলে সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল; বিশাল একটা সবুজ ঢেউ তাকে ঢেকে ফেলল, তারপর দূরে মিলিয়ে গেল দুলতে দুলতে। চমৎকার জল কেটে, আস্তে আস্তে কাঁধদুটো নাড়াতে নাড়াতে, গ্রিগর সাঁতরে চলল মাঝ বরাবর, সেখানে ঝাঁপাঝাঁপি করছে একদল কসাক।

সেই মন্তরটা সেলাইকরা, গলায় ঝোলানো ক্রশটা, খুলতে দেরি হল, পিয়োত্রার কাপড়জামার নীচে গুঁজে রাখল সুতোটা। ভীতুর মত সতর্ক হয়ে জলে নামল; বুকে আর পিঠে জল দিল, তারপর অস্ফুট আর্তনাদ করে সামনে এগুলো, গ্রিগরকে ধরবার জন্যে সাঁতরাতে লাগল। অপর পাড়ের দিকে সাঁতরে চলল দুজনে। জলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে স্নিগ্ধ হয়ে গেল দেহমন। পাড়ে গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল গ্রিগর, কথা বলতে লাগল সংযত হয়ে, আগের সেই উত্তাপ আর রইল না।

—'উকুনে খেয়ে ফেলেছে একেবারে!' গ্রিগর বলল। 'এখন যদি বাড়ি যেতে পারতাম, একেবারে উড়তাম, ঠিক ডানায় ভর দিয়ে। শুধু একটু উঁকি মেরে আসতাম! আছে কেমন সব?'

—'নাতালিয়া আমাদের সঙ্গেই থাকছে।'

—'বাবা আর মা কেমন আছেন?'

—'ভালই। কিন্তু নাতালিয়া দিন গুনছে তোর জন্যে। ও এখনো ধরে আছে, তুই ফিরে যাবি ওর কাছে।'

নাকের আওয়াজ করল গ্রিগর, কুলকুচা করে নিঃশব্দে জল ছড়াতে লাগল। পিয়োত্রা ঘাড় ফেরাল, ভাইএর দিকে তাকাবার চেষ্টা করল।

—'তোর চিঠিতে ওকেও লিখতে পারিস দুএক লাইন। তোর মুখ চেয়েই বেঁচে আছে ও।'

—'কি বলছ, এখনও ছেঁড়া সুতোয় গিঁট লাগাতে চায় ও?'

—'কথায় আছে, 'আশা ছোটে অনন্তকাল...'। সত্যিই ভালো মেয়ে ও। কড়াও খুব। কাউকে ফস্টিনস্টি করতে দেয় না।'

—'স্বামী খুঁজে নেওয়া উচিত ছিল ওর।'

—'অদ্ভুত কথা তোর?'

—'অদ্ভুত কিছুই নয়। এইটে হওয়াই উচিৎ ছিল।'

—'যাক গে, এ তোর ব্যাপার। আমি মাথা গলাব না।'

—'আর, দ্যুনিয়া আছে কেমন?'

—'সে এখন প্যুরোদস্তুর মহিলা রে! এ বছরে এমন বেড়ে উঠেছে মাথায় যে তুই চিনতেই পারবি না ওকে।'

—'চিনতে পারব না?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল গ্রিগর।

—'সত্যি বলছি, মাইরি! এর পরেই বিয়ে হয়ে যাবে ওর, আর ততদিনে মরে ভূত হয়ে যাব আমরা, চুলোয় যাক সব!'

বালির ওপর পাশাপাশি শ্যুয়ে রোদ পোয়াতে লাগল দ্যুজনে। বালির মধ্যে একটা গ্যুবরে পোকা গ্যুঁজে দিয়ে গ্রিগর জিজ্ঞেস করল :

—'আকসিনিয়ার কোন খবর রাখ?'

—'লড়াই বাধার ঠিক আগেটায় তাকে দেখেছিলাম গ্রামে।'

—'গ্রামে কি করছিল?'

—'স্বামীর কাছ থেকে তার কিছ্যু জিনিসপত্তর নিতে এসেছিল।'

—'ওর সঙ্গে কথা বলেছিলে?'

—'দিনের বেলাটা ছিল শ্যুধ্যু। বেশ ভালই দেখাচ্ছিল, ফুর্তি ফুর্তি ভাব। মনে হয় জমিদারবাড়িতে বেশ ফুর্তিতে তার দিন কাটছে।'

—'আর স্তেপানের খবর কি?'

—'টুকটাক জিনিষপত্তর ঠিকমতই দিয়েছিল। বেশ ভদ্র ব্যবহারই করেছিল। তুই কিন্তু চোখকান খ্যুলে চলবি! আমার কানে এসেছে, মদের নেশার ঝোঁকেও নাকি দিব্যি করেছে, প্রথম লড়াইতেই তোর পেছন থেকে গ্যুলি চালিয়ে দেবে। তোকে ও ক্ষমা করবে না।'

—'আমি জানি তা।'

—'আমি একটা নতুন ঘোড়া কিনেছি। কথাবার্তার মোড় ঘোরাল পিয়োত্রা।

—'বলদ জোড়া বেচে দিয়েছ?'

—'একশ' আশিতে। ঘোড়াটার দাম নিয়েছে একশ' পঞ্চাশ। খ্যুব খারাপ হয়নি।'

—'ফসল হয়েছে কেমন?'

—'ভাল। মাঠে নামবার আগেই ডাক এল আমাদের।'

কথা হতে লাগল ঘরসংসার নিয়ে, অন্যুভূতির তীব্রতা কমে গেল, পিয়োত্রার ম্যুখ থেকে বাড়ির কথাগ্যুলো গ্রিগর গিলতে লাগল। কিছ্যুক্ষণের জন্যে সে ফিরে গেল আবার সেখানে, সেই সহজ সরল দ্যুরন্ত বালকজীবনে।

একদল কসাকের সঙ্গে দঙ্গল বেঁধে তারা ফিরে এল আঙিনায়। বাগানের বেড়ার কাছে তাদের ধরে ফেলল স্তেপান আস্তাখফ। চলতে চলতেই চুল আঁচড়ে, পাট করে টুপির সঙ্গে ঠিক করে নিল। গ্রিগরের পাশাপাশি এসে বলল :

—'এই যে দোস্ত।'

—'এই যে!' গ্রিগর থামল, তার দিকে ফিরে দাঁড়াল। ঈষৎ অপ্রস্তুত আর অপরাধীর ছাপ ফুটে উঠল তার ম্যুখে।

—'আমাকে ভুলে যাও নি ত, ভুলেছ নাকি? '

—'প্রায় ভুলে গেছি।'

—'আমি কিন্তু মনে রেখেছি তোমাকে!' স্তেপান হাসল, না থেমে চলে গেল পাশ দিয়ে।

স্যুর্যাস্তের পর ডিভিসনের দপ্তর থেকে টেলিফোনে খবর এল, গ্রিগরের রেজিমেণ্টকে

ফ্রন্টে ফিরতে হবে। পনের মিনিটের মধ্যে জড় করা হল কোম্পানিগুলো, গান গাইতে গাইতে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল শত্রুর ঘোড়সোয়ারের আক্রমণে ভাঙা সারির ফাঁক ভরাতে।

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় ছোটভাইএর হাতে একটুকরো ভাঁজকরা কাগজ গুঁজে দিল পিয়োত্রা। গ্রিগর জিজ্ঞেস করল :

—'এটা আবার কি?'

—'তোর জন্যে একটা মন্তর লিখে নিয়েছি। ধর...।'

—'কোন কাজে দেবে কি?

—'হাসিস নে গ্রিগর!'

—'হাসছি না ত আমি।'

—'তাহলে, চলি এবার, ভাই। সবার আগে আগে ছুটে যাস নে গোঁয়ারের মত। গোঁয়ারের ওপর মরণের টানটা বেশি। নিজের দিকে নজর দিস।' চেঁচিয়ে বলল পিয়োত্রা।

—'আর মন্তরটার কি করব?'

পিয়োত্রা তার হাত নাড়ল।

কোনরকম সতর্কতা না মেনেই কোম্পানিগুলো ঘোড়া ছুটিয়ে এল কিছুক্ষণ। তারপর সার্জেণ্ট নির্দেশ দিল যথাসম্ভব নিঃশব্দে চলতে, সব সিগারেট নিভিয়ে ফেলতে। দূরবীনের মাথার ওপরে উড়তে লাগল গোলাপি ধোঁয়ার লেজ লাগানো হাউই।

॥ চার ॥

আগস্ট মাসের মধ্যেই একের পর এক শহর ঝড়ের বেগে দখল করে ফেলল দ্বাদশ অশ্বারোহী ডিভিসন; মাসের শেষ দিকে তারা ছড়িয়ে রইল কামেংকা-স্ট্রুমিলোভো শহরের চারপাশে। টহলদার দল খবর আনল বেশ বড়সড় শত্রুর অশ্বারোহী দল আসছে শহরের দিকে। রাস্তা বরাবর বনের মধ্যে, যেখানে যেখানে শত্রুর অগ্রবর্তী দলের সঙ্গে কসাক ঘাঁটিদারদের দেখা হল, সেখানেই ছোট ছোট লড়াই হল।

দাদার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত সব সময়েই গ্রিগর মেলেখফ তার বেদনাদায়ক চিন্তার ইতি করে দিতে চেয়েছে, ফিরে পেতে চেয়েছে তার সেই আগেকার মানসিক স্থৈর্য। কিন্তু তা পারে নি। সংরক্ষিত দ্বিতীয় দল থেকে শেষ দফার মধ্যে থেকে আলেক্সি উরিউপিন নামে কাঝান জেলার এক কসাককে ভর্তি করা হয়েছিল গ্রিগরদের দলে। উরিউপিন লোকটা লম্বা, গোল কাঁধ, নীচের চোয়ালে কেমন মারমুখি-ভাব, কালমিকদের মত নেতানো জুলপি। তার ফুর্তিমাখা ভয়লেশহীন চোখ দুটো যেন সবসময়েই হাসছে। তার মাথায় টাক। ট্যারাবেঁকা খুলির চারধারে শুধু গোটা-কয়েক লাল চুল। সে আসার প্রথম দিনেই তার ডাক নাম হয়ে গেল 'ঝুঁটিওয়ালা'।

ব্রোডার চারধারে লড়াইএর পর দিন কয়েকের বিশ্রাম পেল রেজিমেণ্ট। একই ঘরে রইল গ্রিগর আর উরিউপিন। ঘোড়াগুলোকে খাইয়ে দাইয়ে একদিন সন্ধ্যেবেলায় ছাতাপড়া জরাজীর্ণ বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে তারা তামাক টানছিল। ঘোড়সোয়াররা পাশাপাশি চারজন করে রাস্তায় ঘুরছে; আঙিনায় মৃতদেহ ছড়ানো, কারণ শহরতলিতে

লড়াই হয়েছিল বড়রকম। শহরটা একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপ, বিচিত্রবর্ণ গোধূলিতে এক অরুচিকর শূন্যতা।

হঠাৎ উরিউপিন মন্তব্য করল :

—'বুঝলে, মেলেখফ, তুমি খোস এড়াচ্ছ কিংবা ওই ধরনেরই কিছু।'

—'খোস এড়ান বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ?' গ্রিগর জিজ্ঞেস করল, তার মুখ কালো হয়ে উঠল।

—'কেমন নেতিয়ে পড়েছ, যেন অসুখ বিসুখ করেছে।' উরিউপিন বুঝিয়ে দিল।

—'ভালই আছি আমি।' অপরের দিকে না তাকিয়ে থুথু ফেলল গ্রিগর।

—'মিছে কথা বলছ! আমার চোখ আছে, দেখতে পাই।'

—'বেশ ত, কি দেখতে পাও।'

—'তুমি ভয় পাচ্ছ! কাকে ভয় কর, মরণকে?

—'তুমি একটা হাঁদারাম!' নখের ডগায় দৃষ্টি রেখে অবজ্ঞাভরে গ্রিগর বলল।

—'আচ্ছা, বল না, তুমি কি কাউকে মেরেছ?'

—'হ্যাঁ, তাতে কি?'

—'তা কি দাগ কেটে আছে তোমার মনে?'

—'দাগ কেটে থাকবে মনে?' গ্রিগর হেসে ফেলল।

খাপ থেকে তলোয়ার খুলে নিল উরিউপিন। জিজ্ঞেস করল :

—'তুমি কি চাও, তোমার মুণ্ডুটা আমি ধড় থেকে খসিয়ে ফেলি?'

—'কিসের জন্যে?'

—'একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলেই মানুষ খুন করতে পারি আমি। আমার কোন দয়ামায়া নেই।' চোখদুটো হাসতে লাগল উরিউপিনের, কিন্তু তার গলার স্বর আর মুখের লোলুপ কম্পন দেখে গ্রিগর বুঝতে পারল, যা বলল, তা সে করতে পারে। উরিউপিন বলল :

—'তোমার মনটা বড় নরম। এই কোপটা জান? দেখ তাকিয়ে!' ঝোপের ধারের একটা বড় বার্চ গাছ বেছে নিল সে, সোজা সেটার কাছে চলে গেল দূরত্ব ঠাহর করতে করতে। চওড়া কব্জিওয়ালা, শিরাওঠা, লম্বা, হাতদুখানা ঝুলে রইল নিস্পন্দ হয়ে।

—'তাকিয়ে দেখ!'

আস্তে আস্তে সে তলোয়ারখানা তুলল, তারপরেই প্রচণ্ড শক্তিতে কোপ ঝাড়ল বাঁকাভাবে। একেবারে দুটুকরো হয়ে মাটির হাত তিনেক উঁচু থেকে বার্চগাছটা কাত হয়ে আটকে রইল বাড়ির দেয়ালে।

—'দেখতে পেলে ত? কোপটা শিখিয়ে দেব তোমাকে। একটা ঘোড়াকে এক কোপে এই করম দুটুকরো করতে পারবে।'

নতুন কোপের কায়দাটা রপ্ত করতে গ্রিগরের বেশ সময় লাগল।

—'তোমার গায়ে জোর আছে, কিন্তু তলোয়ার চালাও গাধার মত। এই রকম করে!' উরিউপিন দেখিয়ে দিল।

—'মানুষের ওপর যখন কোপ হাঁকড়াবে, বেশ সাহস করে হাঁকড়াবে! মানুষ ঠিক মাখনের মত নরম! কখনো ভাববে না, কেন কি জন্যে। তুমি কসাক, তোমার কাজই হচ্ছে প্রশ্ন না করে মানুষ কাটা। লড়াইএর ময়দানে শত্রুকে মারা ত পুণ্যের কাজ। একটা করে মানুষ খুন করবে, আর ভগবান একটা করে পাপ মুছে দেবেন, সাপ

মারলে যেমন তিনি মুছে দেন। প্রয়োজন না হলে কখনো জানোয়ার মারবে না, কিন্তু মানুষকে ধ্বংস করবে! মানুষ হচ্ছে নাস্তিক, অপবিত্র; দুনিয়াকে বিষিয়ে তোলে; তার জীবনটাই হচ্ছে বিছুটির মত।'

গ্রিগর যখন আপত্তি তুলল, সে শুধু ভুরু কোঁচকাল, তারপর ডুব মারল এক দুর্ভেদ্য স্তব্ধতায়।

॥ পাঁচ ॥

অবাক হয়ে গ্রিগর লক্ষ্য করল, সব ঘোড়াগুলো উরিউপিনকে দেখলে ভয় পায়। সে যখনই কাছে যায়, ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ায়, যেন মানুষ নয়, একটা জানোয়ার আসছে তাদের কাছে। একবার কোম্পানিকে আক্রমণ চালাতে হল জংলা বিল এলাকায়। তাদের পায়ে হেঁটে যেতে হল, ঘোড়াগুলোকে সরিয়ে দিতে হল দুই টিলার মাঝখানে। যাদের ওপর ঘোড়াগুলোর ভার পড়ল, উরিউপিন তাদের মধ্যে একজন, কিন্তু মুখের ওপর জবাব দিয়ে দিল, সে পারবে না। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল ট্রুপ-সার্জেণ্ট :

—'ঘোড়াগুলোকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ না কিসের জন্যে, উরিউপিন?'

—'ওরা আমাকে ভয় পায়। সত্যি বলছি, ভয় পায়!' উত্তর দিল সে।

ঘোড়ার ব্যাপারে মাথা ঘামায় না সে। নিজের ঘোড়াটার ওপর সে অবশ্য যথেষ্ট সদয় কিন্তু গ্রিগর লক্ষ্য করল, যখনই সে কাছে যায়, একটা কাঁপুনি খেলে যায় জানোয়ারটার পিঠের ওপর দিয়ে, চঞ্চল হয়ে ছটফট করে।

—'আচ্ছা, বল ত, ঘোড়াগুলো তোমাকে ডরায় কেন?' একদিন জিজ্ঞেস করল গ্রিগর।

—'জানিনে।' কাঁধদুটো ঝাঁকুনি দিয়ে উত্তর দিল সে। 'আমিও যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করি ওদের সঙ্গে।'

—'মাতালকে ওরা বুঝতে পারে: কিন্তু তুমিত বাপু নেশাটেশা করনা।'

—'আমার মনটা কঠিন, ওরা তা বুঝতে পারে মনে হয়।'

—'নেকড়ের মত হিংস্র মন তোমার, অথবা একটা পাথর হয়ত, মনই নয় ওটা।'

—'হয়ত তাই!' মেনে নিয়ে সায় দিল উরিউপিন।

॥ ছয় ॥

টহল দিতে পাঠান হল দলটাকে। আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় অস্ট্রিয়ান-ফৌজ থেকে পালান এক চেক-সেপাই রুশ ফৌজীকর্তাদের শত্রুর ফৌজের রদবদল আর প্রস্তাবিত পাল্টা আক্রমনের খবর দিয়েছিল। ফলে, যে রাস্তায় শত্রুর রেজিমেণ্ট যাবে সেই রাস্তা বরাবর একটানা নজর রাখা দরকার হয়ে পড়ল।

এক বনের ধারে সার্জেণ্ট আর চারজন কসাককে রেখে ট্রুপ-অফিসার সামনের

টিলার ওপারে এক শহরের দিকে চলে গেল। সার্জেণ্টের সঙ্গে রইল গ্রিগর, উরিউপিন, মিশা কোশেভয় আর একজন কসাক। মাটিতে পড়ে থাকা একটা দেবদারু গাছের পাশে শুয়ে তারা তামাক টানতে লাগল, আর সার্জেণ্ট গোটা অঞ্চলটা দূরবীন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। আধঘণ্টাটেক শুয়ে শুয়ে তারা গালগল্প, ফষ্টিনষ্টি করল। ডানধারের কোন এক জায়গা থেকে একটানা কামানের গর্জন কানে আসছে। কয়েক হাত দূরে, দানাঝরা, আ-কাটা রাইএর শিষ বাতাসে দুলছে। গ্রিগর গুঁড়ি মেরে রাই-ক্ষেতে ঢুকে পড়ল, দানাভরা একটি শিষ বেছে নিয়ে দানা বার করে নিল, তারপর চিবুতে শুরু করল।

দূরের ঘন গাছপালার মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল একদল ঘোড়সোয়ার, ঘোড়া থামিয়ে খোলা মাঠটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, তারপর আবার কসাকদের দিকে এগুতে শুরু করল।

—'অস্ট্রিয়ান, নির্ঘাৎ' সার্জেণ্ট বলে উঠল চাপা গলায়। 'কাছে আসতে দাও ওদের, তারপর সেলাম ঠুকব। বন্দুক বাগিয়েছ ত ছোকরারা।'

ঘোড়সোয়াররা আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এল। ছজন হাঙ্গেরীয় হাসার, সাদা সুতোর ঝালর দেওয়া, ঝলমলে জামা। একটা কালো ঘোড়ার ওপরে দলপতি, হাতে বন্দুক ধরে নিঃশব্দে হাসছে।

—'চালাও গুলি!' সার্জেণ্ট নির্দেশ দিল। গাছে গাছে প্রতিধ্বনি তুলে গুলির ঝাঁক ছুটে গেল। আগে পিছে সার বেঁধে তারা ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। একজন শূন্যে গুলি ছুঁড়ল। সর্বপ্রথম লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল উরিউপিন। বন্দুকটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরে, রাই-ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে ছুটল। একটা ঘোড়া মাটিতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছে, আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক হাঙ্গেরীয়। পড়ে গিয়ে হাঁটুতে লেগেছে, হাত বুলাচ্ছে তাতে। কিছু একটা উরিউপিনকে বলে সে চেঁচিয়ে উঠল, পলায়নপর সঙ্গীদের দিকে তাকাতে তাকাতে আত্মসমর্পনের নমুনা হিসাবে হাতদুটো মাথার ওপরে তুলে ধরল।

ব্যাপারটা ঘটল এত দ্রুত, যে ব্যাপারটা কি তা বুঝে উঠবার আগেই উরিউপিন বন্দীকে নিয়ে ফিরে এল।

—'ফেলে দাও ওটা!' বন্দীর তলোয়ারখানায় আচমকা একটা টান দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল উরিউপিন।

বন্দী ভীতভাবে হাসল, তারপর বেল্টটা হাতড়াতে লাগল। তলোয়ারখানা হাত-ছাড়া করে দিতে পারলেই খুশী হয় সে। কিন্তু তার হাত কাঁপতে লাগল, কিছুতেই খুলে উঠতে পারল না বেল্টের বাঁধন। হুঁসিয়ার হয়ে গ্রিগর তাকে সাহায্য করল। একটু হেসে মাথা ঝুঁকিয়ে ধন্যবাদ জানাল সে। বয়স অল্প, মুখখানা গোলগাল, ওপরের ঠোঁটে সবে তামাটে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। তলোয়ারটা তুলে দিয়ে সে খুশী হয়ে উঠল, পকেট হাতড়ে একটা চামড়ার থলে টেনে বার করল। কসাকদের তামাক উপহার দিতে চেয়ে কি যেন বিড়বিড় করে বলল।

—'খাতির দেখাচ্ছে আমাদের!' সার্জেণ্ট হাসল, সিগারেটের কাগজ খুঁজতে লাগল। বন্দীর তামাকে সিগারেট পাকিয়ে টানতে লাগল কসাকরা। কড়া কালো তামাকে নেশা জমে উঠল চট্ করে।

—'ওকে নিয়ে যেতে হবে কোম্পানিতে। কে যাবে, ছোকরারা?' সবার দিকে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করল সার্জেণ্ট।

—'আমি যাব।' উরিউপিন তাড়াতাড়ি উত্তর দিল।

—'বেশ, চলে যাও তাহলে।'

স্পষ্টতই বন্দী বুঝতে পারল কি ঘটতে যাচ্ছে, কারণ, ঠোঁট বেঁকিয়ে সে একটু হাসল, পকেট দুটো উল্টে দিল, কিছু ভাঙা চকোলেট নিয়ে সাধতে লাগল কসাকদের।

• —'রুশিন্...ইচ্...রুশিন্...নেইন্ অশ্‌ট্রিশ্‌চে...'। বোকার মত অঙ্গভঙ্গি করে সে চকোলেট বাড়িয়ে তোতলাতে লাগল।

—'অস্ত্রটস্ত্র আছে নাকি কিছু?' সার্জেণ্ট জিজ্ঞেস করল।

'অমন গ্যাট্ ম্যাট্ করো না,, তোমার কথা কিছুই বুঝিনা আমরা। রিভলবার আছে? ফট্ ফট্?' কাল্পনিক রিভলবারের ট্রিগার টেনে বোঝাল সার্জেণ্ট। বন্দী প্রচণ্ড জোরে মাথা ঝাঁকাল।

ইচ্ছে করেই নিজেকে খানাতাল্লাশ করতে দিল সে, তার ফুলো ফুলো গালদুটো কাঁপতে লাগল। রক্ত ঝরছে কাটা হাঁটু থেকে, একটানা বক বক করতে করতে রুমাল দিয়ে হাঁটুটা বাঁধল। ঘোড়ার কাছে তার টুপি, ফেলে এসেছে, সেটা, তার চাদর, আর নোটবইটা আনবার জন্যে অনুমতি চাইল। নোটবইএর মধ্যে আছে তার পরিবারের ফটো। সে কি চায় তা বেশ মন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল সার্জেণ্ট, কিন্তু অবশেষে ব্যর্থ হয়ে হাত নেড়ে বলে উঠল :

—'নিয়ে যাও ওকে!'

ঘোড়াটা এনে পিঠে চাপল উরিউপিন। পিঠের ওপর আড়াআড়ি বন্দুকটা ঠিক করে নিয়ে বন্দীকে ইশারা করল। উরিউপিনের হাসিতে উৎসাহিত হয়ে, বন্দীও হাসল তারপর চলতে লাগল ঘোড়ার পাশে পাশে। আত্মীয়তার ভঙ্গিতে উরিউপিনের হাঁটুতে চাপড় মারল কিন্তু হেঁচকা দিয়ে তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে উরিউপিন লাগামে টান মারল।

অপরাধীর মত সে ঘোড়ার কাছ থেকে সরে গেল, তারপর কসাকদের দিকে কেবলি পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে গোমড়ামুখে এগিয়ে চলল। মাথার উপরে উঁচু হয়ে স্পষ্ট উড়তে লাগল তার কাপাসের মত সাদা চুল। জামার বোতাম খোলা, গোছা গোছা চুল, আর সাহসী বীরের মত চেহারা— এই চেহারাই আঁকা হয়ে রইল গ্রিগরের স্মৃতিতে।

—'ঘোড়াটার জিন খুলে ফেল, মেলেখফ!' সিগারেটের শেষ টুকরোটা দুঃখের সঙ্গে থুথু করে ফেলে দিয়ে, সার্জেণ্ট হুকুম করল। মাটিতে পড়ে থাকা ঘোড়াটার কাছে গেল গ্রিগর, জিনটা খুলে ফেলল, তারপর কেন, তা সে নিজেই জানে না, পাশে পড়ে থাকা টুপিটা তুলে নিল। টুপির ধারটা শুঁকল, নাকে এল ঘাম আর কমদামি সাবানের গন্ধ। ঘোড়ার সাজসরঞ্জামগুলো গাছের কাছে টেনে আনল সে। কসাকরা উবু হয়ে বসে জিনের থলিটা হাতড়াতে লাগল, অচেনা ধাঁচে তৈরি জিনটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

—'বেড়ে ছিল তামাকটা; আরও কিছু চেয়ে নিলে হত।' তামাকের কথা ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সার্জেণ্ট, জল এসে পড়েছিল মুখে, ঢোক গিলল।

মোটেই বেশিক্ষণ হয় নি তখনো, দেবদারুর গাছের ফাঁকে দেখা দিল একটা ঘোড়ার মাথা। উরিউপিন এগিয়ে এল।

—'আরে, অস্ট্রিয়ানটা কোথায়? ছেড়ে দাওনি ত তাকে?' সার্জেণ্ট প্রশ্ন করল।

—'সে পালাবার চেষ্টা করেছিল।' দাঁত খিঁচিয়ে উঠল উরিউপিন।

—'আর তুমি পালাতে দিলে?'

—'বনের মধ্যে ফাঁকায় গিয়ে পেঁছুলাম আমরা, আর সে...তাই কেটে ফেলেছি তাকে।'

—'মিথ্যেবাদী তুমি।' চিৎকার করে উঠল গ্রিগর। 'ওকে শুধু শুধু মেরেছ তুমি।'

—'চেঁচাচ্ছ কেন অত? তা দিয়ে তোমার দরকার কি?' গ্রিগরের মুখের দিকে হিম কঠিন, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল উরিউপিন।

—'কি বললে?' ধীরে ধীরে গ্রিগরের গলা চড়ল, উরিউপিনের সঙ্গে লড়বার জন্যে তৈরি হয়েই হাতদুটো এক পাক দুলিয়ে নিল।

—'যেখানে দরকার নেই, নাক গলাতে এসো না সেখানে। বুঝতে পারলে?' কঠোর কণ্ঠে উরিউপিন উত্তর দিল। হ্যাঁচকা দিয়ে রাইফেলটা টেনে নিয়ে কাঁধের ওপর তুলল গ্রিগর। ট্রিগার ধরতে গিয়ে আঙুলটা থরথর করে কেঁপে উঠল, মুখ রাগে বিকৃত হয়ে উঠল।

—'আরে, এই, এই!' তার দিকে দৌড়ে আসতে আসতে মারমুখী হয়ে সার্জেণ্ট চিৎকার করে উঠল। ধাক্কা মারার আগেই ছুটে গেল গুলিটা, একটা গাছের ডাল ভেঙে শিষ দিয়ে চলে গেল মহাশূন্যে। গ্রিগরের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিল সার্জেণ্ট। একটুও না সরে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল উরিউপিন, পাদুটো ফাঁক করে, বাঁহাতটা বেল্টের উপর রেখে।

—'আবার গুলি কর!' টিপ্পনি কাটল সে।

—'খুন করব তোমাকে।' গ্রিগর তার দিকে ছুটে গেল।

—'আরে, হচ্ছে কি এসব? কোর্ট-মার্শাল হয়ে গুলি খেতে চাও নাকি? হাত নামাও, হাত নামাও।' সার্জেণ্ট নির্দেশ দিল।

গ্রিগরকে ধাক্কা দিয়ে দুজনের মাঝখানে এসে হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

—'মিথ্যে কথা বলছ; খুন তুমি আমাকে করবে না।' উরিউপিন হাসল।

সন্ধ্যের সময় আবার যখন তারা ফিরে চলল, গ্রিগরই প্রথম দেখতে পেল মৃতদেহটা, রাস্তার ওপর পড়ে আছে। সকলের আগে আগে গিয়ে ঘোড়ার রাশ টানল সে, নীচের দিকে তাকাল। ভেলভেটের মত শ্যাওলার ওপর হাতদুটো ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, শরতের পাতার মত হাতের চেটো দুখানা খুলে রয়েছে চিৎ হয়ে। প্রচণ্ড একটা কোপে কাঁধ থেকে তার কোমর পর্যন্ত দুফাঁক হয়ে গিয়েছে।

মৃতদেহের পাশ দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে কসাকরা নিঃশব্দে কোম্পানির সদর ঘাঁটিতে এসে পৌঁছুল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। বাতাসে পুব দিক থেকে কালো পালকের মত একখানা মেঘ উড়িয়ে আনছে। কাছের এক বিল থেকে জলের শেওলা, আর পচা কাদার ভ্যাপসা গন্ধ ভেসে এল। একটা কাদাখোঁচা তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। ঘোড়ার জিন-রেকাবের টুংটাং আওয়াজ, কখনো বা রেকাবের সঙ্গে তলোয়ারের ঠোকাঠুকিতে, কিংবা ঘোড়ার খুরের নীচে দেবদারু চারা গুঁড়িয়ে যাওয়ার মচমচ শব্দে স্তব্ধতা ভেঙে যেতে লাগল। উরিউপিন একটানা সিগারেট টেনে চলল, শক্ত করে সিগারেট আঁকড়ে-ধরা, কালো, নখওয়ালা মোটা মোটা আঙুলগুলো আগুনের ফুলকিতে আলো হয়ে উঠতে লাগল।

বনের মাথায় মেঘ ভাসতে লাগল। মাটিতে নেমে আসা, অপসৃয়মান, অব্যক্ত শোকে আচ্ছন্ন, সন্ধ্যার আলো-আঁধারি তাতে আরও স্পষ্ট, আর ঘন হয়ে উঠল।

॥ সাত ॥

পরের দিন সকালেই আক্রমণ শুরু হল পরবর্তী শহরের ওপর। দুপাশে ঘোড়-সোয়ারদের রেখে সকালবেলায়ই বন থেকে পদাতিক দলের এগিয়ে যাবার কথা। কে যেন কোথায় ভুল করে বসল; সময়মত পদাতিক রেজিমেণ্ট এসে পৌঁছুল না; ২১১নং রেজিমেণ্টকে নির্দেশ দেওয়া হল বাঁ-পাশে পেরিয়ে যেতে; আর একটা রেজিমেণ্টের আক্রমণের মুখে এগিয়ে যাবার সময় ২১১নং রেজিমেণ্ট নিজেদেরই কামানের পাল্লায় পড়ে ঘায়েল হয়ে গেল। নিরর্থক ডামাডোলের মধ্যে পরিকল্পনা ওলটপালট হয়ে গেল, ভয় হল, আক্রমণ বিপর্যয়ে পরিণত না হলেও, অন্তত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। যখন পদাতিকবাহিনী এই রকম টালমাটালে পড়ল তখনই নির্দেশ এল ১১নং অশ্বারোহী ডিভিসনের এগিয়ে যাবার। যে জংলা আর বিল জমিতে তাদের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল, তা মোটেই বিস্তৃত হয়ে সমুখ আক্রমণের পক্ষে উপযুক্ত নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে কসাকদের এগুতে হল দল বেঁধে। বনের মধ্যে ১২নং রেজিমেণ্টের ৪নং ও ৫নং কোম্পানিদের রাখা হয়েছিল বাড়তি হিসাবে, সর্বাত্মক অগ্রসরের কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের কানে লড়াইএর গর্জন আর কানফাটানো আওয়াজ এসে পৌঁছুল।

বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড় করানো হয়েছিল কোম্পানি দুটিকে। দেবদারুর মোটা মোটা গুঁড়িতে তাদের চাপাচাপি হতে লাগল, যুদ্ধের গতি অনুসরণ করায় বাধা ঘটতে লাগল। প্রথম কয়েক মিনিটের চিৎকারের পর প্রগাঢ় স্তব্ধতা নেমে এল। মাঝে মাঝে কানে আসতে লাগল উল্লাস-ধ্বনি; ডান ধারে আক্রমণকারীদের ওপর গর্জন করে ফিরতে লাগল অস্ট্রিয়ান কামানগুলো; গর্জনের মাঝে মাঝে মেসিন-গানের শব্দ।

গ্রিগর দলটার চারধারে তাকাল। ঘাবড়ে গিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছে কসাকরা; ঘোড়াগুলো অস্থির হয়ে উঠেছে যেন ডাঁশে কামড়াচ্ছে। জিনের বাঁকা কাঠের সঙ্গে উরিউপিন টুপিটা ঝুলিয়ে রেখেছে, টাকের ঘাম মুছছে; গ্রিগরের পাশেই মিশা কশেভয় প্রাণপণে বাড়িতে তৈরি তামাকের ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। চারপাশের সবকিছুই স্পষ্ট আর অতিমাত্রায় বাস্তব, ঠিক যেমনটি দেখায় সারারাত্রির একটানা পাহারার পর।

তিন ঘণ্টার জন্যে ধরে রাখা হল কোম্পানিদের। সবারই মজুত তামাক ফুরিয়ে গেল, কি হয় কি হয় ভেবে অস্থির হয়ে উঠল সবাই, তখন ঠিক দুপুরের আগে নির্দেশ নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হল এক অফিসার। ৪নং কোম্পানির কমাণ্ডার একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল তার লোকজনকে। গ্রিগরের মনে হল, অগ্রসর হওয়ার চাইতে যেন তারা পশ্চাদপসরণই করছে। তার নিজের কোম্পানি এগিয়ে চলল, বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে, ক্রমশই কাছে আসতে লাগল লড়াইএর সোরগোল। একসার কামান দাগা হচ্ছিল—তাদের খুব পেছন থেকে নয়, মাথার ওপর দিয়ে গর্জন করে। গোলা ছুটে যেতে লাগল। বনের সরু রাস্তায় কোম্পানির সার ভেঙে গেল, তারা ফাঁকায় এল এলোমেলো হয়ে। আধ মাইলটাক দূরে— হাঙ্গেরীয় ঘোড়সোয়াররা তখন এক রুশ কামানের ঘাঁটির লোকজনদের ওপর তলোয়ার চালাতে শুরু করেছে।

—'কোম্পানি, লাইন বাঁধো!' কমান্ডার চিৎকার করে উঠল।

তখনো নির্দেশমত পুরোপুরি সার বাঁধতে পারে নি কসাকরা, এমন সময় এল আরও নির্দেশ :

—'কোম্পানি, তলোয়ার খোল; আক্রমণ কর, এগোও!'

ইস্পাতের ফলার এক নীলবৃষ্টি। দ্রুত দুলকি থেকে কসাকরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিল কদমে।

কামানের ঘাঁটির একেবারে ডানদিকে কামানের ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিল ছয়জন হাঙ্গেরীয় ঘোড়সোয়ার। উত্তেজিত কামানের ঘোড়ার লাগামের কাঁটা ধরে টানছিল একজন, অপরজন তাদের তলোয়ারের চেপ্টা দিক দিয়ে পেটাচ্ছিল; গাড়ির চাকার পাখিতে কাঁধ ঠেকিয়ে আর সকলে ঠেলছিল। লেজছাঁটা চকোলেট রঙের ঘোড়ার পিঠে এক অফিসার তদারক করছিল। কসাকদের দেখতে পেয়েই নির্দেশ দিল সে, তারা লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠল।

গ্রিগর তাদের দিকে ছুটে যেতেই মুহূর্তের জন্যে রেকাব থেকে পা-টা ফসকে গেল। জিনের ওপর নিজেকে বে-কায়দা ভেবে ভেতর থেকে এক ভয়ের তাগিদে নুয়ে পড়ল সে, পায়ের ডগা দিয়ে বাগাতে চেষ্টা করল দোদুল্যমান রেকাবটা। পা আটকাতে পারল যখন, তখন মাথা তুলে তাকাল, সামনে দেখতে পেল সেই দুটি কামানের ঘোড়া। রক্তমাখা, ঘিলু-ছেটানো জামা গায়ে সকলের আগের ঘোড়ার সওয়ারটা পড়ে আছে ঘোড়াটার ঘাড়ের ওপরে, একেবারে গলা জড়িয়ে ধ'রে। গ্রিগরের ঘোড়া এক মৃত গোলন্দাজের দেহ মাড়িয়ে গেল, গুঁড়িয়ে যাওয়ার আওয়াজ উঠল বিশ্রী ধরনের। ওল্টানো গোলার খোলের পাশে পড়ে আছে আরও দুজন। কামানের গাড়ির ওপরে মুখ থুবড়ে আছে চতুর্থ জন, ঠিক তার সামনেই গ্রিগরের দলের একজন কসাক। প্রায় মুখোমুখি গুলি করল হাঙ্গেরীয় অফিসারটি, হাত দিয়ে বাতাস আঁকড়ে ধরতে ধরতে মাটিতে পড়ে গেল কসাকটি। লাগামে টান দিল গ্রিগর, ঠিক মত তলোয়ার চালাবার জন্যে অফিসারের ডান দিকে গিয়ে পড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু অফিসারটি তার কৌশলটুকু ধরে ফেলল, তার দিকে গুলি ছুঁড়ল হাতের নীচে দিয়ে। রিভলবারের সব গুলি শেষ করে, তারপর তলোয়ারখানা টেনে নিল। বেশ পাকা হাতে আটকে দিল তিন তিনটে প্রচন্ড কোপ। রেকাবের ওপর দাঁড়িয়ে চতুর্থবার ধেয়ে এল গ্রিগর। প্রায় গায়ে গায়ে এবার ছুটতে লাগল তাদের দুজনের ঘোড়া। গ্রিগরের চোখে পড়ল হাঙ্গেরীয় অফিসারের ছাই রঙ, নিখুঁত কামানো গাল আর কলারে সেলাই-করা রেজিমেণ্টের নম্বরটা। ভুল ঝোঁক দেখিয়ে অফিসারের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করে দিল গ্রিগর, তারপর তলোয়ারের কোপের দিক পাল্‌টে, দুই কাঁধের মাঝখানে ডগাটা বিঁধিয়ে দিল। দ্বিতীয় কোপ হাঁকড়াল ঘাড় লক্ষ করে, ঠিক শির-দাঁড়ার ওপরটায়। অফিসারের হাত থেকে তলোয়ার আর লাগামটা পড়ে গেল। একেবারে সোজা হয়ে গেল সে, তারপর কাত হয়ে পড়ল জিনের ওপরে। ভয়ঙ্কর স্বস্তি অনুভব করে তার মাথায় কোপ হাঁকল গ্রিগর, দেখল, কানের ওপরকার হাড় গুঁড়িয়ে তলোয়ারখানা বসে গেল।

পেছন থেকে এক ভয়াবহ আঘাতে গ্রিগরের সমস্ত চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল। মুখে এসে লাগল রক্তের যন্ত্রণাকর নোনা স্বাদ, বুঝতে পারল সে পড়ে যাচ্ছে; একপাশ থেকে ফসলকাটা এবড়োখেবড়ো মাটি ঘুরপাক খেয়ে উড়ে আসতে লাগল তার দিকে। প্রচন্ড জোরে মাটিতে তার দেহ আছড়ে পড়ায় মুহূর্তের জন্যে জ্ঞান ফিরে এল। চোখ মেলল সে; দুই চোখে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। কানের পাশ দিয়ে চলে গেল ঘোড়ার

খুরের শব্দ আর টানা টানা ভারী নিঃশ্বাস। শেষবারের মত চোখ খুলল সে, দেখতে পেল ঘোড়াগুলোর বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, আর রেকাবে আটকানো কার যেন পা। 'সব শেষ!' মনের মধ্যে সাপের মত এ'কে বে'কে ঘুরতে লাগল স্বস্তিদায়ক চিন্তাটা। একটা গর্জন, তারপর এক মসিকৃষ্ণ শূন্যতা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

আগস্টের মাঝামাঝি ইউজেনে লিস্তনিৎস্কি রক্ষী-বাহিনী থেকে একটা নিয়মিত কসাক রেজিমেণ্টে বদলির দরখাস্ত করবার সিদ্ধান্ত করল। দরখাস্ত পেশ করল সরকারী-ভাবে, যেমনটি চেয়েছিল সেই ধরনেরই পদ পেয়ে গেল তিন সপ্তাহের মধ্যে। পিটার্সবুর্গ ছাড়ার আগে এই সংবাদ জানিয়ে, আর আশীর্বাদ চেয়ে বাপকে চিঠি লিখল।

ওয়ারশ' যাবার ট্রেন পিটার্সবুর্গ ছাড়ল বিকেল আটটায়। একটা দ্রোঝ্কি নিয়ে স্টেশনে ছুটিয়ে এল লিস্তনিৎস্কি। পেছনে পড়ে রইল পায়রা-নীল, মিটমিটে, আলা-জড়ানো পিটার্সবুর্গ। স্টেশনে সৈন্যদের সোরগোল। ইউজেনে কামরায় গিয়ে বসল, তলোয়ার বাঁধার বেল্ট আব কোটটা খুলে রাখল, আসনের ওপর বিছিয়ে নিল কসাক লেপটা। জানলার ধারে বসেছে এক পাদ্রী, মুনিঋষির মত শীর্ণ মুখখানা। তার ঠিক উল্টো দিকে বসেছে তামাটে চেহারার একটি মেয়ে। শনের মত দাড়ি থেকে গুঁড়ো ঝাড়তে ঝাড়তে পাদ্রীসাহেব মেয়েটিকে কয়েকটা দই-বড়া এগিয়ে দিল। ঢুলতে ঢুলতেই ইউজেনে শুনতে পেল যেন বহুদূর থেকে পাদ্রীর গলার স্বর ভেসে আসছে :

—'জানই ত কি সামান্য আয়ে আমার সংসার চলে। তাই যাচ্ছি, ফৌজে পুরুত হয়ে। ভগবানে বিশ্বাস ছাড়া কখনো লড়তে পারে না রুশরা। আর জানো, সেই বিশ্বাস বাড়ছে বছরের পর বছর। অবিশ্যি, এমন কিছু কিছু আছে যাদের বিশ্বাস কমছে. কিন্তু তারা হচ্ছে লেখাপড়া জানা দলের। চাষীরা ঠিক ধরে আছে ভগবানকে।'

পাদ্রীর নীচু গলার স্বর ইউজেনের চৈতন্যে আর বেশি দূরে পে'ছিুতে পারল না। দু রাত্রির অনিদ্রার পর, তৃপ্তিদায়ক তন্দ্রা নেমে এল চোখে। যখন ঘুম ভাঙল, তখন ট্রেন পিটার্সবুর্গ ছেড়ে প্রায় মাইল বিশেকেরও বেশি চলে এসেছে। তালে তালে চাকার আওয়াজ উঠছে. কামরাটা দুলছে, ঝাঁকুনি দিচ্ছে, পাশের কামরায় কে একজন গান গাইছে। কামরার আলোর লালচে, বাঁকা ছায়া পড়েছে।

॥ দুই ॥

লিস্তনিৎস্কি যে রেজিমেণ্টে বদলি হল সেটা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, নতুন করে গড়ে তোলা আর ঘাটতি পূরণের জন্যে সেটাকে ফ্রণ্ট থেকে সরিয়ে আনা হয়েছিল। রেজিমেণ্টের সদর দপ্তর করা হয়েছিল বেরেঝ্‌নিয়াগি নামে একটা বড় গ্রামে। এক নাম-না-জানা স্টেশনে ইউজেনে ট্রেন থকে নেমে পড়ল। সেই একই স্টেশনে নেমেছিল একটা ফৌজী হাসপাতাল। ইউজেনে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারকে হাসপাতালের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানল, দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্ট থেকে এটাকে সেই অঞ্চলেই পাঠান হচ্ছে, যেখানে তার নিজের রেজিমেণ্ট কাজ করছে। ওপরের কর্তাদের সম্পর্কে ডাক্তার যা তা বলল, যা মুখে এল তাই বলে ডিভিসনের পদস্থ অফিসারদের শাপশাপান্ত করল; দাড়ি ওপড়াতে ওপড়াতে, প্যাঁশনে লাগানো চোখ দুটো লাল করে, পথের মাঝখানে পরিচয় পাওয়া লোকটার কানে তার সমস্ত ক্ষোভ আর আক্রোশ ঢালতে লাগল। ইউজেনে বাধা দিয়ে বলল :

—'আমাকে বেরেঝ্‌নিয়াগি পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারেন?'

—'পারি, গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসুন।' সে রাজি হয়ে গেল। আত্মীয়তার ভঙ্গিতে ইউজেনের কোটের বোতামটা মোচড়াতে মোচড়াতে সে বলে চলল তার অভিযোগ।

হাসপাতাল বেরেঝ্‌নিয়াগি পর্যন্ত পৌঁছুতে পৌঁছুতেই সন্ধ্যে হয়ে এল। কাটা-ফসলের হলুদ-রঙা গোড়ায় বাতাসে সর্‌সর্‌ আওয়াজ উঠল। পশ্চিমে মেঘ জমতে লাগল। মেঘের ওপরের দিকটা গাঢ় বেগুনি-কাল, কিন্তু নীচের দিকটা হালকা ধোঁয়াটে-লাল। এক নিরাবয়ব মেঘের স্তূপ নদীর বাঁধের গায়ে লেগে থাকা জমাট-বরফের চাঙড়ের মত একপাশে সরে রইল। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে নেমে এল অস্তসূর্যের গাঢ়, কমলারঙের কিরণ-বন্যা, আলোর পাখার মত ঝলকে ঝলকে ছড়িয়ে গেল, ফাঁকের নীচে সপ্তবর্ণের বিচিত্র এক মায়াজাল বুনে দিল ।

রাস্তার পাশে খাদের মধ্যে একটা মরা ঘোড়া পড়ে আছে। অস্বাভাবিকভাবে ওপর-পানে তোলা একটা পায়ের খুরে নালটা চকচক করে উঠল। লিস্তনিৎস্কি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল তাকিয়ে তাকিয়ে ঘোড়া দেখতে লাগল। তার সঙ্গে যে আর্দালিটা যাচ্ছিল সে বুঝিয়ে বলল :

—'গণ্ডেপিণ্ডে গিলেছে...ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিল...ওইখানেই পড়ে আছে। মাটি চাপা দেওয়ার জন্যে কেউ মাথাও ঘামায়নি। এই হচ্ছে খাঁটি রুশের চরিত্র। জার্মানরা একেবারে উল্টো।'

—'তুমি কি করে জানলে?' ইউজেনে জিজ্ঞেস করল, এক যুক্তিহীন ক্রোধে তাকে পেয়ে বসল। হামবড়াভাব আর অবজ্ঞার ছাপ-মাখানো আর্দালির নিরুদ্বেগ মুখখানা সেই মুহূর্তে তার মনে ঘৃণা জাগিয়ে তুলল। লোকটা প্রৌঢ়, নিরানন্দ, ফসলকাটা শরতের মাঠের মত; ফ্রণ্টে আসার পথে ইউজেনে যে হাজার হাজার চাষী সেপাইকে দেখেছে, তাদের থেকে কোন দিকেই পৃথক নয় সে। দেখে মনে হয়, ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে সবাই, কুঁজো হয়ে পড়েছে, ধূসর চোখে ফুটে উঠেছে ভোঁতা দৃষ্টি। দেখলে

ভীষণভাবে মনে পড়ে বহুদিন হাতে হাতে ঘোরা, বহুকাল আগের তৈরি তামার পয়সার কথা।

—'যুদ্ধের আগে আমি তিনবছর জার্মানীতে ছিলাম।' আর্দালি ধীরে সুস্থে উত্তর দিল। তার মুখে সেই একই রকম হামবড়া ভাব, গলার স্বরে অবজ্ঞার সুর।

—'চোপরাও!' কঠোর কণ্ঠে লিস্তনিৎস্কি ধমক দিল, তারপর পেছন ফিরল।

তারা চলতে শুরু করল। পশ্চিমে মিলিয়ে গেল বর্ণসমারোহ, মেঘে মেঘে শুষে নিল। তাদের পেছনে মরা ঘোড়ার পা-টা পথের পাশে খাড়া করা হাতকাটা ক্রুশের মত উঁচু হয়ে রইল। ইউজেনে ওইদিকে পেছনে তাকাতেই হঠাৎ ঘোড়ার ওপর আলোর রাশি ঝরে পড়ল, লালচে-বাদামি লোমওয়ালা পা-টা এক অপূর্ব পাতাবিহীন ডালের মত অপ্রত্যাশিতভাবে মুঞ্জরিত হয়ে উঠল।

॥ তিন ॥

বেরেঝ্নিয়াগিতে ঢুকবার মুখে হাসপাতালটা আহত-সৈন্য বোঝাই একসার গাড়ির পেছন দিয়ে চলল। প্রথম গাড়ির মালিক এক বয়স্ক শ্বেত রুশ ঘোড়ার আগে আগে চলেছে, হাতে শনের তৈরি ঘোড়ার লাগামটা জড়িয়ে নিয়েছে। গাড়ির মধ্যে মাথায় পট্টি-বাঁধা এক কসাক শুয়ে আছে। সে শুয়ে আছে কনুইয়ে ভর দিয়ে, কিন্তু চোখ দুটো ক্লান্তিতে বোঁজা, মুখে গমের দানা চিবুচ্ছে, খোসাগুলো থুথু করে ফেলছে। তার পাশে লম্বা হয়ে আছে এক সেপাই; তার পাছার ওপরে ছেঁড়া পা-জামাটা বীভৎসভাবে কুঁকড়ে আছে, শক্ত হয়ে আছে রক্ত জমাট বেঁধে। মাথা না তুলেই সে পাগলের মত শাপশাপান্ত করছে। লোকটার গলার স্বর শুনতে শুনতে লিস্তনিৎস্কি আতঙ্কিত হয়ে উঠল, কারণ সেটা শুনতে ঠিক ভগবদ্বিশ্বাসীর আবেগতপ্ত মন্ত্রোচ্চারণের মত।

পঞ্চম গাড়িতে আরাম করে বসে আছে তিনজন কসাক। লিস্তনিৎস্কি পাশ দিয়ে যাবার সময় শুধু নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখল, অফিসারকে দেখে তাদের কর্কশমুখে সম্ভ্রমের কোন চিহ্নই ফুটে উঠল না।

এক পাদ্রীর বাড়িতে লিস্তনিৎস্কির নতুন রেজিমেণ্টের সদর দপ্তর। জায়গাটা নিরিবিলি, কর্মব্যস্ত নয়, ফ্রণ্ট থেকে অনেক দূরে রাখা সকল সদর দপ্তরের মতই। কেরানিরা টেবিলের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে, টেলিফোন ধরে এক বয়স্ক ক্যাপ্টেন হাসছে। জানলার চারপাশে মাছির ঝাঁক ভনভন করে ফিরছে, অনেক দূরের টেলিফোনের ঘণ্টাগুলো মশার মত গুনগুন করছে। এক আর্দালি ইউজেনকে কমাণ্ডারের খাস-কামরায় পৌঁছে দিল। দরজার চৌকাঠেই দেখা হয়ে গেল এক লম্বামত কর্নেলের সঙ্গে, সে তাকে নিস্পৃহভাবে স্বাগত জানাল, ঘরের মধ্যে ঢুকতে বলল। দরজা বন্ধ করে কর্নেল এক অবর্ণনীয় ক্লান্তির ভঙ্গিতে হাতটা চুলের ওপর বুলিয়ে নিল, তারপর এক ঘেয়ে, নরম স্বরে বলল :

—'গতকাল ব্রিগেড থেকে জানিয়েছে, আপনি রওনা হয়েছেন, বসুন।'

ইউজেনের আগের কাজ সম্পর্কে সে প্রশ্ন করল, প্রশ্ন করল রাজধানীর সর্বশেষ

খবর সম্পর্কে, পথের সম্পর্কেও খোঁজ খবর নিল, কিন্তু এই স্বল্পকালীন কথোপকথনের সময় একবারও লিস্তনিৎস্কির মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল না।

—'ফ্রণ্টে নিশ্চয়ই কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে ওঁকে; এমন ভয়ানক ক্লান্ত দেখাচ্ছে।' লিস্তনিৎস্কি বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই ভাবল। কিন্তু তার ধারণাটা যেন ইচ্ছে করেই নস্যাৎ করার জন্যে কর্নেল মন্তব্য করল :

—'দেখুন, লেফটানাণ্ট, সহকর্মী বন্ধু অফিসারদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে নেবেন আপনি। মাফ করবেন আমাকে, পরপর তিন রাত্তির বিছানার সঙ্গে সম্পর্ক নেই আমার। এই মরা গর্তে তাস খেলা আর মাতাল হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই।'

সেলাম করে দরজার দিকে এগুল লিস্তনিৎস্কি, অবজ্ঞাটুকু হাসির আড়ালে ঢেকে নিল। নিজের কমাণ্ডারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সম্পর্কে বিরূপ চিন্তা করতে করতে বেরিয়ে এল সে, কর্নেলের যে ক্লান্ত চেহারা তার শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তুলেছিল মনে মনে তাকেই বিদ্রূপ করতে লাগল।

॥ চার ॥

ইউজেনের ডিভিসনের ওপর ভার পড়ল জোর করে স্টির্ নদী পার হয়ে শত্রুকে পেছন থেকে আক্রমণ করার। নদী পার হওয়ার ব্যাপারটা সমাধা হল চমৎকারভাবে। তাদের বাঁ-পাশের শত্রু সৈন্যের বেশ কিছু সমাবেশ বিধ্বস্ত করে দিল ডিভিসনটি, পৌঁছে গেল তাদের পেছনে। ঘোড়-সোয়ারের সাহায্যে অস্ট্রিয়ানরা প্রতিআক্রমণের উদ্যোগ করল, কিন্তু কসাক কামানগুলো তাদের সার্পনেল গোলায় উড়িয়ে নিয়ে গেল। ম্যাগিয়ার স্কোয়াড্রনগুলো এলোমেলোভাবে পশ্চাদপসরণ করল, দু পাশের মেসিন-গানের মুখে সাবাড় হয়ে গেল কসাক ঘোড়সোয়াররা।

প্রতিআক্রমণের মুখে লিস্তনিৎস্কি এগিয়ে গেল তার রেজিমেণ্ট নিয়ে। তার অধীনের দলটিতে মারা গেল একজন কসাক, আহত হল চারজন। তাদের একজন এক বাঁকা-নাক, তরুণ কসাক, পিষে গেল মরা ঘোড়ার নীচে। সে শুয়ে শুয়ে গোঙাতে লাগল, পাশ দিয়ে ঘোড়ার পিঠে ছুটে যাওয়া কসাকদের অনুনয় করতে লাগল :

—'ও দাদারা, ফেলে যেও না আমাকে। আমাকে ঘোড়ার নীচে থেকে তোল, ও দাদারা...।'

তার নম্র, বেদনার্ত কণ্ঠস্বর মৃদু মৃদু কানে বাজতে লাগল, কিন্তু দয়ার কোন চিহ্নই দেখা দিল না অন্য কসাকদের মনে: অথবা, দেখা যদি দিয়েই থাকে, এক বৃহত্তর ইচ্ছা তাদের নিরন্তর ছুটিয়ে নিয়ে চলল, নিষেধ করল ঘোড়া থেকে নামতে। ঘোড়াগুলোকে দম ফেলবার অবকাশ দিয়ে কদমে ছুটিয়ে চলল দলটা। আধমাইলটেক দূরে ছত্রভঙ্গ ম্যাগিয়ার স্কোয়াড্রনগুলো পুরোদমে ছুটছে; তাদের মধ্যে এখানে ওখানে চোখে পড়ছে শত্রুর পদাতিকের ধুসর-নীল উর্দি। একটা পাহাড়ের চুড়ো বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে উঠছে অস্ট্রিয়ান সরবরাহের গাড়িগুলো, সার্পনেলের দুধের মত সাদা ধোঁয়া যেন বিদায়ের ভঙ্গিতে হাত নাড়তে নাড়তে ভেসে আছে মাথার ওপর। একসার কামান সরবরাহের গাড়িগুলোর ওপর বাঁ-দিক থেকে গোলা দাগছে, চাপা বজ্রগর্জন গড়িয়ে পড়ছে মাঠের ওপরে, বনের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি উঠছে।

॥ পাঁচ ॥

রাত্রের মত রেজিমেণ্টটা একটা ছোট গ্রামে থামল। বারোজন অফিসার গাদাগাদি করে রইল একখানি ঘরে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে, পেটে খিদে নিয়েই তারা ঘুমাবার জন্যে শুয়ে পড়ল। খাবারের গাড়ি যখন এল, তখন মাঝরাত্রি। সুপের হাণ্ডাটা নিয়ে এল কর্নেট চুকোভ্; কয়েক মিনিটের মধ্যেই পেটুকের মত গিলতে শুরু করল অফিসাররা, কেউ একটা কথাও বলল না, যেন লড়াইতে নষ্ট হওয়া দুটো দিন পুষিয়ে নিতে চায় তারা। অনেক রাত্রে খাওয়ায় ঘুম চলে গেল, গল্পগুজব করতে লাগল, শুয়ে শুয়ে তামাক টানতে লাগল।

প্রথম লেফটানাণ্ট কালমিকোভ দেখতে ছোটখাট গোলগাল এক অফিসার, নামের মতই তার মুখেও মঙ্গোলীয় রক্তের চিহ্ন আঁকা; ভীষণভাবে অঙ্গভঙ্গি করে সে বলে উঠল :

—'এ লড়াই আমার জন্যে নয়। চার শতাব্দী পরে জন্ম নিয়েছি আমি। এ লড়াইএর শেষ দেখা আমার হবে না, বুঝলে।'

—'আরে, রেখে দাও তোমার হাত-গোনা।'

—'হাত-গোনা নয় এ। এ আমার পূর্বনির্দিষ্ট পরিণাম। আমি বংশগত বিশেষত্ব মানি, আমি এখানে অবান্তর। আজ যখন গোলার মুখে পড়েছিলাম, উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিলাম। শত্রুকে না দেখে স্থির থাকতে পারি না আমি। যে ভয়াবহ অনুভূতি জাগে তা আতঙ্কেরই সমর্থক। ওরা গোলা দাগবে কযেক মাইল দূর থেকে আর তুমি স্তেপের ওপরে তাড়া খাওয়া তিতিরের মত ছুটবে ঘোড়ার পিঠে। যারা আগেব দিনে লড়াই করেছে, সেই আদিম পদ্ধতিতে, তাদের ওপর হিংসে হয আমার।' লিস্তনিৎস্কির দিকে ফিরে বলে চলল সে : 'সম্মানজনক লড়াইতে প্রতিপক্ষের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়া, তলোয়ারের কোপে তাকে দু টুকরো করে ফেলা—এই ধরনের লড়াই মাথায় ঢোকে আমার। কিন্তু এ যে কি তা শয়তানই জানে।'

—'ভবিষ্যতের লড়াইতে ঘোড়-সোয়ারের কোন কাজই থাকবে না করার মত।' তুলে দিতে হবে ঘোড়-সোয়ার।' একজন অফিসার মন্তব্য করল।

—'কিন্তু মানুষকে সরিয়ে তুমি তো যন্ত্রকে বসাতে পারবে না। একটু বেশি এগিয়ে ভাবছ তুমি।'

—'মানুষের কথা বলছি না আমি, বলছি ঘোড়ার কথা। তার জায়গায় আসবে মোটর সাইকেল আর মোটর গাড়ি।'

—'মোটর-স্কোয়াড্রনের কথাটা কল্পনা করতে পারি আমি!'

—'সব বাজে কথা।' উত্তেজিতভাবে বাধা দিয়ে কালমিকোভ বলে উঠল। 'এক অবান্তর কল্পনা! দুতিন শতাব্দী পরে লড়াইএর চেহারাটা কেমন হবে তা জানি না, কিন্তু আজ তো ঘোড়-সোয়াররা...'।

—'গোটা ফ্রণ্ট জুড়ে যখন ট্রেঞ্চ কাটা, তখন কি করবে তুমি ঘোড়-সোয়ার দিয়ে? বুঝিয়ে দাও আমাকে!'

—'তারা ট্রেঞ্চ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে, পেরিয়ে যাবে তার ওপর দিয়ে, শত্রুর একেবারে পেছনে গিয়ে হানা দেবে, তা-ই হবে ঘোড়-সোয়ারের কাজ।'

—'বাজে কথা!'

—'আরে, চুপ করত, একটু ঘুমুনো যাক।' কে একজন ধমকে উঠল।

তর্কবিতর্ক থিতিয়ে গেল, তার বদলে কানে আসতে লাগল নাকডাকার শব্দ। চিৎ হয়ে শুয়ে রইল লিস্তনিৎস্কি, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ছাতাপড়া খড়ের উগ্র গন্ধ নাকে আসতে লাগল, খড়ের ওপরেই চাদর বিছিয়েছে সে। কালমিকোভ শুয়ে রইল তার পাশে।

—'তোমার আলাপ করা উচিৎ ভলান্টিয়ার বান্‌চাকের সঙ্গে।' ফিসফিস করে লিস্তনিৎস্কিকে বলল। তোমার দলেই আছে। ভারি মজার লোকটা!'

—'কেমন?' কালমিকোভের দিকে পেছন ফিরতে ফিরতে জিজ্ঞেস করল লিস্তনিৎস্কি।

—'লোকটা কসাক, কিন্তু রুশ বনে গেছে। এক সাধারণ মজুর ছিল মস্কোয়, কিন্তু যন্ত্রপাতির প্রশ্ন সম্পর্কেই যত কৌতূহল তার। তাছাড়া, প্রথম শ্রেণীর মেসিন-গানারও বটে।'

—'এখন ঘুমুনো যাক।' লিস্তনিৎস্কি উত্তর দিল।

॥ ছয় ॥

কালমিকোভের মুখ থেকে শোনা ভলান্টিয়ার বানচাকের প্রসঙ্গ একেবারেই ভুলে গিয়েছিল ইউজেনে. কিন্তু দৈবক্রমে তার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে গেল। রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার তাকে নির্দেশ দিল সকালে টহল দিয়ে আসতে, যদি সম্ভব হয়, বাঁ-পাশে যে পদাতিক রেজিমেণ্ট এগিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আধা-আলোয় উঠোনে হোঁচট খেতে খেতে, ঘুমন্ত কসাকদের গায়ের ওপর পড়তে পড়তে ইউজেনে খুঁজে বার করল ট্রুপ সার্জেণ্টকে, তাকে জাগিয়ে বলল:

'টহল দেবার জন্যে পাঁচজনকে চাই আমার সঙ্গে। আমার ঘোড়াটাও বার করে রাখ। তাড়াতাড়ি!'

কসাকরা তৈরি হয়ে নেবার জন্যে অপেক্ষা করছে, এমন সময় হৃষ্টপুষ্ট এক কসাক এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। বলল:

—'হুজুর! আমার পালা নয়, তাই সার্জেণ্ট যেতে দেবে না আপনার সঙ্গে। আপনি কি সঙ্গে যাবার অনুমতি দেবেন?'

—'ওপরে উঠবার ইচ্ছে নাকি, না, কিছু করেছ টরেছ?' অন্ধকারে লোকটার মুখ চিনবার চেষ্টা করে জিজ্ঞেস করল ইউজেনে।

—'কিছুই করি নি আমি।'

—'বেশ, যেতে পার তুমি।' ইউজেনে সম্মতি দিল। যাবার জন্যে ফিরতেই পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল:

—'ওহে! সার্জেণ্টকে বলো...'

—'আমার নাম বানচাক।' বাধা দিয়ে বলে উঠল কসাকটি।

—'ভলান্টিয়ার?'

—'হ্যাঁ।'

ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠে সম্বোধনের ভঙ্গিটা সংশোধন করে নিল ইউজেনে, 'বেশ, বানচাক, সার্জেন্টকে তুমি বলো যে...আচ্ছা, থাক, আমি নিজেই বলব।'

লোকজনকে গ্রামের বাইরে নিয়ে এল ইউজেনে। বেশ খানিকটা দূর ঘোড়া ছুটিয়ে আসার পর ডাকল :

—'ভলান্টিয়ার বানচাক!'

—'স্যার্!'

—'আমার পাশে তোমার ঘোড়াটাকে নিয়ে এস তো।'

বানচাক তার সাদাসিধে ঘোড়াটা নিয়ে এল ইউজেনের দামী জাতের ঘোড়ার পাশে।

—'তোমার বাড়ি কোন জেলায়?' পাশ থেকে লোকটার মুখের চেহারা লক্ষ করতে করতে ইউজেনে জিজ্ঞেস করল।

—'নোভো-চের্কাস্ক।'

—'ভলান্টিয়ার হয়ে আসার পেছনে তাগিদটা কি ছিল, জিজ্ঞেস করতে পারি?'

—'নিশ্চয়ই পারেন!' মুখে সূক্ষ্ম হাসির রেখা টেনে উত্তর দিল বানচাক। তার সবুজমত চোখের পলক না পড়া দৃষ্টি রূঢ় এবং স্থির। 'যুদ্ধের কায়দাকানুন সম্পর্কে আগ্রহ আছে আমার। আমি তা আয়ত্ত করতে চাই।'

—'এর জন্যে তো ফৌজী-ইস্কুলই তৈরি আছে।'

—'আমি এ হাতে কলমে আগে শিখতে চাই। তত্ত্ব টত্ব পরে পরে শেখা যাবে।'

—'লড়াই বাধার আগে তুমি কি করতে?'

—'মজুর ছিলাম।'

—'কোথায় কাজ করতে?'

—'পিটার্সবুর্গে, রোস্তোভে, তুলার গোলাবারুদের কারখানায়। মেসিন-গানের বিভাগে বদলি হবার দরখাস্ত করার কথা ভাবছি।'

—'মেসিনগান সম্পর্কে কিছু জান।'

—'আমি বের্টিয়ের ম্যাডসেন, ম্যাক্সিম্, হচ্কিস্, ভাইকার্স, লুইস্, আর আরও অনেক রকমের মেসিনগান চালাতে পারি।'

—'আরে, আরে! রেজিমেন্টের কমান্ডারের সঙ্গে এ সম্পর্কে আমি কথা বলব।'

—'তা যদি বলেন!'

লিস্তনিৎস্কি আবার তাকাল বানচাকের হৃষ্টপুষ্ট শক্ত সমর্থ চেহারার দিকে। মনে পড়িয়ে দিল ডনের ধারের কর্ক-এল্ম গাছকে। উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই লোকটার চেহারায়, একটা রেখা বৈশিষ্ট্যও নয়; সব কিছুই সাধারণ, অনুজ্জ্বল, সাদামাটা। শুধু শক্ত করে চাপা চোয়াল, আর তার দিকে তাকানো চোখদুটো তাকে চারপাশের সাধারণ কসাকদের থেকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। সে হাসে, কিন্তু কচিৎ কখনো, ঠোঁটদুটো বেঁকে যায় ধনুকের মত; কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি কখনো নরম হয় না, একইরকম থাকে চোখের অনিশ্চিত উজ্জ্বলতা। সে শান্ত, অবিচলিত, হুবহু কর্ক-এল্ম গাছের মত—সেই গাছ যা কঠোর লোহার মত শক্ত জাতের, যা ডনের দাক্ষিণ্যবিহীন আলগা-ধূসর মাটিতে জন্মায়।

তারা নিঃশব্দে কিছুক্ষণ এগিয়ে চলল। লোহাবাঁধানো জিনের ধনুকের ওপর

বানচাক তার হাতের চওড়া চেটো দুখানা রাখল। একটা সিগারেট বেছে নিজ লিস্তুনিৎস্কি, বানচাকের দেশলাই থেকে ধরিয়ে নিতে গিয়ে ঘোড়ার ঘামের উগ্র গন্ধ পেল তার হাতে। হাতের পেছন দিকটা ঘন বাদামি লোমে ঢাকা ঘোড়ার চামড়ার মত। ওই হাতখানায় ঠোকর দেবার এক অনিচ্ছাকৃত বাসনায় পেয়ে বসল ইউজেনেকে।'

বনের মধ্যে রাস্তার বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে আছে একসারি বার্চগাছ। তাদের পেছনে বেঁটে-বেঁটে পাইন গাছের আনন্দহীন হলুদ বন্তার, বনেরই প্রসারিত সীমান্তে এখানে ওখানে ছড়ানো ছোট ছোট গাছপালা, অস্ট্রিয়ানদের যানবাহনে ছিন্নভিন্ন ঝোপ-ঝাড়—দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে ওঠে চোখদুটো। ডানদিকে বহুদূরে গর্জন করছিল কামান, কিন্তু বার্চগাছগুলোর পাশে এক অবর্ণনীয় স্তব্ধতা। মাটিতে শিশির শুষে নিচ্ছে; ঘাস গোলাপী হয়ে উঠছে, বান ডেকেছে শরতের রঙের, যা রঙের মৃত্যুরই স্পষ্ট ঘোষণা করছে। বার্চগুলোর পাশে ঘোড়া থামাল লিস্তুনিৎস্কি, বনের পেছনের টিলাটা দূরবীন বার করে দেখতে লাগল। মধু-রঙা তলোয়ারের বাঁটের ওপর একটা মৌমাছি এসে বসল।

—'একেবারে বোকা।' শান্ত গলায় স্নেহভরে বলে উঠল বানচাক।

—'কি বললে?' ইউজেনে ফিরল তার দিকে।

চোখ দিয়ে মৌমাছিটা দেখিয়ে দিল বানচাক, আর ইউজেনে হাসল।

—'বেশ তেতোই হবে ওর মধু, কি মনে হয় তোমার?'

কিন্তু উত্তর যে দিল সে বানচাক নয়। দূরের বার্চগাছের ঝোপ থেকে ম্যাগপাইএর তীক্ষ্ম চিৎকার স্তব্ধতা টুকরো টুকরো করে দিল, আর—এক ঝাঁক বুলেট ছুটে গেল বার্চগুলোর মধ্যে দিয়ে, লিস্তুনিৎস্কির ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর একখানা ডাল ভেঙে পড়ল।

ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, চাবুক মেরে, মুখের তাড়া দিয়ে, ঝড়ের বেগে তারা গ্রামের দিকে ফিরে চলল। নিরবচ্ছিন্নভাবে বেজে চলল অস্ট্রিয়ান মেসিনগান, ঘুরতে লাগল বুলেটের পেটি।

॥ সাত ॥

প্রথমবার মুখোমুখি দেখা হওয়ার পর লিস্তুনিৎস্কি একাধিকবার কথা বলেছে ভলান্টিয়ার বানচাকের সঙ্গে। এক অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি ঝকমক করে ওঠে লোকটার দুইচোখে, তাই দেখে প্রতিবারই বিস্মিত হয়েছে সে; অমন সাদাসিধে মুখখানা আড়াল করে রেখেছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরের এক গোপনতা, তার পেছনে কি আছে তা আবিষ্কার করতে চেয়েছে। বানচাক সব সময়েই কথা বলে একটু হেসে, হাসিটা লেপ্টে থাকে চাপা ঠোঁটের সঙ্গে ইউজেনের ধারণা হয় যে, এক আঁকাবাঁকা পথ খুঁজে নেবার জন্যে সে একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রয়োগ করছে। যেমনটি সে চেয়েছিল, বদলি হয়ে গেল এক মেসিন-গান বিভাগে। কয়েকদিন পর, ফ্রন্টের পেছনে বিশ্রাম করছিল রেজিমেণ্টটি, একটা আগুনে পোড়া বাড়ির দেয়ালের পাশ দিয়ে বানচাক হেঁটে যাচ্ছিল, লিস্তুনিৎস্কি তখন তাকে ধরে ফেলল। চেঁচিয়ে ডাকল :

—'এই যে। ভলান্টিয়ার বানচাক।'

বানচাক ঘাড় ফেরাল, সেলাম করল লিস্তনিৎস্কিকে।

—'যাচ্ছ কোথায়?' লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

—'বড় কর্তার কাছে।'

—'তা হলে একই জায়গায় যাচ্ছি দুজনে।'

কিছুক্ষণ দুজনে নিঃশব্দে হেঁটে চলল ছারখার হয়ে যাওয়া গ্রামের রাস্তা ধরে।

—'লড়াইএর কায়দাকানুন শিখছ তা হলে?' পাশে বানচাকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল লিস্তনিৎস্কি, একটু পিছিয়ে পড়েছিল বানচাক।

—'হ্যাঁ, শিখছি।'

—'লড়াইএর পর কি করবে ঠিক করেছ?'

—'কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে কেউ কেউ...কিন্তু আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব।' বানচাক উত্তর দিল।

—'কথাটার ব্যাখ্যা কি করব?'

—'প্রবাদটা তো জানেন: 'যারা ঝড় আনবে, তাদের ঝাপটা খেতেই হবে?' এও সেই রকম।'

'ধাঁধা বাদ দিলে কি দাঁড়ায়?'

—'এমনিতেই তো এর অর্থ বেশ স্পষ্ট। মাফ করবেন, এখান থেকে বাঁয়ে যাব আমি।'

টুপির চুড়োয় আঙুল ছোঁয়াল সে, তারপর নেমে গেল রাস্তা ছেড়ে। কাঁধদুটো ঝাঁকুনি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল লিস্তনিৎস্কি।

—'লোকটা কি সবসময়েই মৌলিক হবার চেষ্টা করে, না কি, ছিট্ আছে মাথায়।' কোম্পানি কমাণ্ডারের মেটে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সে একটু বিরক্ত হয়েই ভাবল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

সংরক্ষিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলকে ডাকা হল এক সঙ্গে। ডনের জেলাও গ্রামশূন্য হয়ে গেল যেন সবাই একই সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছে ফসল কাটতে।

কিন্তু সীমান্তের ধারে ধারে সে বছর এক তিক্ত ফসল কাটা হল; মৃত্যু এসে ঝুঁটি ধরে নিয়ে গেল ফসল কাটিয়েদের; আর একাধিক কসাক-বৌ প্রবাসী স্বামীর জন্যে ইনিয়ে বিনিয়ে এলোচুলে কাদল, 'ওগো কার জন্যে আমাকে ফেলে গেলে, গো?' সোনার মুখগুলো লুকিয়ে রইল চতুর্দিকে, কসাকদের লাল রক্ত ঝরে ঝরে নিঃশেষ হল; কাচের মত চোখ, চিরনিদ্রায় নিদ্রিত—কামানের শোক-গর্জনের নীচে পচে গেল তারা পচে গলে ধুলোয় মিশিয়ে যেতে লাগল অস্ট্রিয়ায়, পোল্যাণ্ডে, প্রুসিয়ায় .পুবালি হাওয়া তাই বৌ আর মায়ের কান্না তাদের কানে পেঁৗছে দিতে পারল না।

সেপ্টেম্বর মাসের এক মিষ্টি দিনে তাতাস্কি গ্রামের ওপর দুধের মত সাদা,

অতি সূক্ষ্ম, পেঁজা তুলোর মত একটা মাকড়সার জাল ঝুলছে। রক্তশূন্য সূর্য হাসছে বিপাণ্ডুকের মত। নীল আকাশ অচপল কুমারীর মত স্বচ্ছ আর গর্বোদ্ধত॥ ডনের ওধারে ফ্যাকাশে হলুদ বনভূমি বেদনায় অবসন্ন, এ্যাসগাছ নিস্তেজ ভাবে ঝকমক করছে, ওক গাছের বিচিত্রাকৃতি পাতা ঝরছে। কেবল ফার গাছে গাছেই সবুজের উল্লাস, সে-ই শুধু চোখ জুড়িয়ে দেয়।

সেইদিনই পান্তালিমন প্রোকোফিয়েভিচ্ যুদ্ধরত সৈন্যবিভাগ থেকে একখানা চিঠি পেল। পোস্টাপিস থেকে চিঠিখানা আনল দুনিয়া। দুনিয়ার হাতে চিঠি তুলে দিতে দিতে পোস্টমাস্টার মাথা নোয়াল, টাক নেড়ে, হাত দুটো অনুনয়ের ভঙ্গিতে ছড়িয়ে বলল :

—'চিঠিখানা খুলে ফেলেছি, তার জন্যে ক্ষমা করো আমাকে। বাবাকে বলো যে আমি খুলেছি। লড়াই কেমন চলছে জানবার জন্যে এমন ইচ্ছে হয়েছিল।... আমাকে ক্ষমা করো, আর যা বললাম, পান্তালিমনকে ব'লো।' মনে হল, সব যেন তার গুলিয়ে গেল, দুর্বোধ্য কি যেন বিড়বিড় করতে করতে দুনিয়াকে নিয়ে সে আফিসের বাইরে চলে এল। এক অজানা শঙ্কায় উত্তেজিত হয়ে দুনিয়া বাড়ি ফিরে এল। চিঠির জন্যে বুকের মধ্যে অনেকক্ষণ হাতড়াল। চিঠিটা বার করে রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল :

—'পোস্টমাস্টার বললেন, চিঠিখানা তিনি পড়েছেন, তুমি যেন রাগ না কর।'

—'চুলোয় যাক পোস্টমাস্টার। গ্রিগরের চিঠি?' হাঁপানি রোগীর মত দুনিয়ার মুখে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে পান্তালিমন জিজ্ঞেস করল 'গ্রিগরের? না,পিয়োত্রার?'

—'না, বাবা...আমি হাতের লেখা চিনিনে।'

—'পড় না!' বেঞ্চের ওপর টলমল করতে করতে ইলিনিচনা চেঁচিয়ে উঠল। আজকাল বাতে খুব কষ্ট পাচ্ছে। উঠোন থেকে নাতালিয়া দৌড়ে এল, একপাশে ঘাড় কাত করে, কনুই দুটো বুকের সঙ্গে চেপে ধরে উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। এক টুকরো হাসি কাঁপতে লাগল ঠোঁটে। তার একাগ্র অনুরাগ আর বিশ্বস্ততার পুরস্কার হিসাবে সে দিনরাত কামনা করে আসছে গ্রিগরের কাছ থেকে কোন খবর কিংবা তার সম্পর্কে সামান্যতম উল্লেখ। ইলিনিচনা ফিস্‌ফিস্ করে বলল :

—'দারিয়া কোথায়?'

—'আঃ, চুপ কর!' পান্তালিমন চেঁচিয়ে উঠল, দুনিয়াকে বলল, 'পড়!'

—'আমি জানাইতেছি যে,' দানিয়া শুরু করল ; বেঞ্চের ওপর বসেছিল সে, সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল, তারপর আর্ত চিৎকার করে উঠল :

—'বাবাগো! মাগো! ওমা...গ্রীস্‌কা! ওহো...হো...গ্রীস্‌কা...মারা গেছে।'

অর্ধমৃত জিরোজিয়ামের পাতায় জড়িয়ে গিয়ে একটা বোলতা ভোঁ ভোঁ করতে করতে জানালায় আছড়ে পড়ল। উঠোনে একটা মুরগী খুশিতে কক্‌কক্ করে উঠল। খোলা দরজা দিয়ে ভেসে এল শিশুর হাসির ঝঙ্কার।

একটা কাঁপুনি খেলে গেল নাতালিয়ার মুখে। হাসির টুকরো তখনো তার দুঠোঁটে থরথর করছে। দুনিয়া মৃগী-রোগীর মত মেঝেয় গড়াগড়ি দিতে লাগল। পান্তালিমন উঠে দাঁড়াল, ঘাড়টা পক্ষাঘাতের মত দুমড়ে বেঁকে গেল, উন্মাদের বিহ্বল দৃষ্টিতে সে দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

চিঠিখানা এই :

'আমি জানাইতেছি যে, বার নম্বর ডন কসাক রেজিমেন্টের কসাক আপনার পুত্র

গ্রিগরি মেলেখফ গত ২৯শে আগস্ট তারিখে কামেন্‌কা-স্ত্রমিলোভো শহরের নিকট নিহত হইয়াছে। আপনার পুত্র বীরের মতই মৃত্যুবরণ করিয়াছে; আপনার অবর্ণনীয় শোকে ইহাই আপনার সান্ত্বনা হউক। তাহার জিনিসপত্র তাহার ভ্রাতা পিয়োত্র মেলেখফের হাতে দেওয়া হইবে। ঘোড়াটি রেজিমেণ্টে রাখা হইবে। ইতি

লেঃ পেল্‌কোভ্‌নিকোভ্‌
চার নম্বর কোম্পানির কমাণ্ডার
৩১শে আগস্ট, ১৯১৪ সাল।

॥ দুই ॥

চিঠিখানা আসার পর থেকেই পান্তালিমন যেন হঠাৎ কুঁজো হয়ে গেল। দিন দিন বুড়িয়ে যেতে লাগল। স্মৃতিভ্রংশে পেয়ে বসল তাকে, স্পষ্ট চিন্তা করার শক্তি কমে গেল। পিঠ নুইয়ে সে হাঁটতে লাগল, মুখে নেমে এল লোহার রং; চোখের জ্বরাতুর, তৈলাক্ত দৃষ্টিতে শুধু তার মনের অশান্তিটুকু ধরা পড়তে লাগল। শুকিয়ে যেতে শুরু করল সে, ঝকমকে ধূসর চুলে তাড়াতাড়ি জট ধরল, দাড়ির বোঝা এলোমেলো পাকানো সুতোর মত হয়ে গেল। আর সে অসম্ভব রকমের পেটুক হয়ে উঠল, রাক্ষসের মত কাঁড়ি কাঁড়ি গিলতে লাগল।

আইকনের নীচে বইগুলোর মধ্যে চিঠিখানা সে লুকিয়ে রেখেছিল। দিনের মধ্যে বারকয়েক বারান্দায় গিয়ে দুনিয়াকে ইসারা করে ডাকে। দুনিয়া এলে, চিঠিখানা বার করে তাকে পড়ে শোনাতে বলে। বৌ রান্নাঘরে কাজ করে, ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে তাকায়। চতুরের মত চোখ টিপে বলে, ‘পড়, আস্তে আস্তে, নিজের মত করে পড়।’ কান্না গিলে দুনিয়া প্রথম লাইনটা পড়ে, আর তারপর, গোড়ালির ওপর উবু হয়ে বসে, বাদামি রঙের হাতখানা উঁচু করে :

—‘ঠিক আছে। বাকিটুকু আমি জানি। চিঠিখানা নিয়ে যা, যেখানে ছিল, সেখানে রেখে দে। তাড়াতাড়ি কর, নইলে, তোর মা আবার ’ এই বলে বিশ্রী রকমের চোখ টেপে, সারা মুখ গাছের পোড়া বাকলের মত কুঁচকে কুঁচকে ওঠে।

॥ তিন ॥

শ্রাদ্ধের নয় দিন পর মেলেখফদের বাড়িতে শ্রাদ্ধ-ভোজনে নিমন্ত্রণ করা হল পাদ্রী ভিস্‌সারিওন ও আত্মীয়স্বজনকে। তড়বড় করে রাক্ষসের মত খেয়ে চলল পান্তালিমন, ময়দার সেমাই সুতোর মত দাড়িতে ঝুলতে লাগল। গত কয়েকদিন ধরে স্বামীকে গভীর উদ্বেগে ইলিনিচ্‌না লক্ষ্য করে আসছিল, সে কেঁদে ফেলল। ফিসফিস করে বলল :

—‘তোমার কি হয়েছে গো?’

—'এ্যাঁ?' থালা থেকে চকচকে চোখদুটো তুলে বুড়ো অস্থির দৃষ্টিতে তাকাল। হাতদুটো দুলিয়ে, চোখে রুমাল চাপা দিয়ে, পিছন ফিরে চলে গেল ইলিনিচ্না।

—'এমনভাবে আপনি খাচ্ছেন, বাবা, যেন তিন দিন উপোস করে আছেন।' ক্রুদ্ধকণ্ঠে দারিয়া বলে উঠল, তার চোখদুটো ঝকঝক করে উঠল।

—'আমি খাচ্ছি...? বেশ, খাব না।' পান্তালিমন অপ্রতিভ হয়ে উত্তর দিল। টেবিলের চারধারে চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে, ভুরু কুঁচকে গুম হয়ে বসে রইল, প্রশ্ন করলে জবাবও দিল না।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে তাকে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করল পাদ্রী ভিস্‌সারিওন। বলল :

—'অনর্থক তুমি নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ, প্রোকোফিচ্। এত দুঃখ করে লাভ কি? গ্রিগরের প্রাণদান তো পুণ্যের কাজ; ভগবানের ওপর রাগ করো না। জার আর পিতৃভূমির জন্যে তোমার ছেলে মাথায় পরেছে কাঁটার মুকুট।...আর তুমি...এ হচ্ছে পাপ, ভগবান ক্ষমা করবেন না তোমাকে।'

—'ঠিক সেই কথাই ত, বাবা! সেই ত আমার যন্ত্রণা। 'বীরের মত মৃত্যু বরণ করিয়াছে।' এই কথাই ত লিখেছে তার কমাণ্ডার।'

পাদ্রীর হাতে চুমু খেয়ে, উঠে গিয়ে দরজার খিল হাতড়াতে লাগল সে; আর চিঠি আসার পর এই প্রথম সে কেঁদে ফেলল, তার শরীরটা ভীষণভাবে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

সেইদিন থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ফিরে পেল পান্তালিমন, এই প্রচণ্ড আঘাত থেকে অনেকটা সামলে উঠল।

॥ চার ॥

প্রত্যেকেই নিজের নিজের মত তার ক্ষত লেহন করতে লাগল। নাতালিয়া যখন শুনতে পেয়েছিল, দুনিয়া চিৎকার করে উঠল, গ্রিগর মারা গেছে, তখন সে উঠোনে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। 'আমি আত্মহত্যা করব। আমার সবকিছুর এখানেই শেষ,' তার এই ভাবনা মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। দারিয়ার বাহুবন্ধনে সে আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়েছিল; তার চেতনা ফিরে এসে কি ঘটেছে তা ভয়ঙ্করভাবে যখন মনে পড়িয়ে দেবে তখনকার সেই মুহূর্তটি সহনক্ষম হবে, পিছিয়ে যাবে জেনে তারপর সে সানন্দে জ্ঞান হারিয়েছিল। দিশার ঘোরে একটা সপ্তাহ কেটে গেল। যখন বাস্তবে ফিরে এল, এক অন্ধ নিষ্ক্রিয়তার কামড়ে একেবারে পালটে গেল, আরও শান্ত হয়ে গেল সে।

এক অদৃশ্য মৃতদেহ মেলেখফদের বাড়িতে হানা দিয়ে ফিরতে লাগল, আর জীবিতেরা তারই ক্ষয়িত গন্ধে নিঃশ্বাস নিতে লাগল।

॥ পাঁচ ॥

গ্রিগরের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার বার দিন পরে পিয়োত্রার দুখানা চিঠি এল একই ডাকে। পোস্টাপিসেই দুনিয়া চিঠি দুখানা পড়ল, তারপর ঝড়ের মুখে গমের ডাঁটার মত ছুটল, দুলেতে দুলতে এসে বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে থামল। গ্রামের মধ্যে বেশ সাড়া জাগিয়ে দিল সে, বাড়িতে বয়ে আনল এক অবর্ণনীয় উত্তেজনা।

—'বেঁচে আছে! আমাদের গ্রীশ্‌কা বেঁচে আছে।' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বেশ খানিকটা দূর থেকেই সে চিৎকার করে উঠল। 'পিয়োত্রা লিখেছে। চোট লেগেছিল গ্রীশ্‌কার, কিন্তু মরে নি। বেঁচে আছে, বেঁচে আছে।'

সেপ্টেম্বরের দোসরা তারিখের চিঠিতে পিয়োত্রা লিখছে :

> 'অগ্রপত্রে প্রণাম জানিবেন। আমি জানাইতেছি যে, গ্রিগর প্রায় মৃত্যুর মুখে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু ভগবানের অশেষ মহিমা, সে বাঁচিয়া আছে এবং সুস্থ আছে। কামেন্‌কা-স্ত্রুমিলোভো শহরের নিকটে গ্রিগরের রেজিমেণ্ট যুদ্ধ করিতেছিল, আক্রমণের সময় তাহার দলের কসাকরা দেখিতে পায়, এক হাঙ্গেরীয় ঘোড়-সোয়ার গ্রিগরকে আঘাত করে এবং গ্রিগর ঘোড়া হইতে পড়িয়া যায়; তাহার পর আর কেহই কিছু দেখিতে পায় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহাদের নিকট হইতে আর কিছুই জানিতে পারি নাই। কিন্তু পরে আমি মিশা কশেভয়ের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, রাত্রি পর্যন্ত গ্রিগর ওইভাবেই পড়িয়াছিল, রাত্রে তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে এবং হাতে পায়ে ভর দিয়া আগাইতে থাকে; সে আগাইতে থাকে তারা দেখিয়া দেখিয়া। পথে এক আহত অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া টানিতে টানিতে প্রায় চার মাইল রাস্তা চলিয়া আসে। ইহার জন্য গ্রিগরকে সেণ্ট জর্জ ক্রশ দেওয়া হইয়াছে এবং কর্পোরালের পদে উন্নীত করা হইয়াছে। তাহার আঘাত খুব গুরুতর নয়। মিশা বলিযাছে, শীঘ্রই সে ফ্রণ্টে ফিরিয়া আসিবে। এই পত্রের ত্রুটি মার্জনা করিবেন, জিনের উপরে বসিয়া এই পত্র লিখিতেছি।'

দ্বিতীয় চিঠিতে বাগানের গাছ থেকে কিছু শুকনো চেরী পাঠানোর জন্যে অনুরোধ জানিয়েছে পিয়োত্রা; লিখেছে, তাকে যেন ভুলে না যায়, সবাই যেন আরও চিঠি দেয়। একই চিঠিতে গ্রিগরের সম্পর্কেও অনুযোগ করেছে, কারণ সে জানতে পেরেছে ঘোড়াটাকে ঠিকমত যত্ন করছে না গ্রিগর। ঘোড়াটা আসলে পিয়োত্রার, এইজন্যে তার লজ্জার সীমা নেই। এ সম্পর্কে গ্রিগরকে চিঠি লিখতে বাপকে অনুরোধ করেছে। আরও জানিয়েছে, সে গ্রিগরকে লিখে দিয়েছে, যদি ঘোড়াটার যত্ন না নেয়, তাহলে নাকে এমন থাবড়া কসাবে যে রক্ত বার করিয়ে ছাড়বে, সেণ্ট জর্জ ক্রশ পেলেও ছাড়বে না।

দেখবার মতন এক করুণদৃশ্য হয়ে উঠল বুড়ো পান্তালিমন। আনন্দে সে তিড়বিড় করতে লাগল। দুখানা চিঠিই মুঠোয় নিয়ে গ্রামের ভেতরে ছুটল, যারা পড়তে জানে, তাদের সবাইকে থামাল, জোর করে চিঠি দুখানা পড়াতে লাগল। ফিরে পাওয়া আনন্দের ঝোঁকে গোটা গ্রামের মধ্যে তাল ঠুকে বেড়াতে লাগল।

—'বলি, কি ভাব আমাদের গ্রীশ্‌কাকে?' পিয়োত্রা যেখানটায় গ্রিগরের বীর-পনার কথা লিখেছে, পাঠক সেখানে এসে পৌঁছতেই হাত তুলল সে, গর্বের সঙ্গে বলে উঠল, 'এ গাঁয়ে গ্রিগরই প্রথম ক্রশ পেল।' ঈর্ষার সঙ্গে চিঠিখানা হাত থেকে নিয়ে টুপির কাপড়ের ভাঁজে গুঁজে রাখল, তারপর চলল আর একজন পাঠক পাকড়াও করতে।

তাকে জানলার ভেতর দিয়ে দেখতে পেয়ে সার্জি মোখোভ পর্যন্ত টুপি খুলে বেরিয়ে এল। আমন্ত্রণ জানাল :

—'একটু ভেতরে এসো না, প্রোকোফিয়েভিচ!'

ভেতরে এলে, ফুলো ফুলো সাদা হাতের মধ্যে বুড়োর হাতটা চেপে ধরে, চাপ দিল মোখোভ, বলল :

—'তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাকে। অমন ছেলের জন্যে গর্ব হওয়া উচিত তোমার। এখুনি খবরের কাগজে পড়ছিলাম তোমার ছেলের বীরত্বের কথা।

—'কাগজে লিখেছে নাকি।' দমকে দমকে কুঁচকে উঠতে লাগল পান্তালিমনের মুখখানা।

—'হ্যাঁ, এই ত এক্ষুনি পড়লাম।'

তাক থেকে এক প্যাকেট সেরা তুর্কী তামাক পাড়ল মোখোভ, মাপ টাপের হাঙ্গামা না করেই অনেকখানি দামি চকোলেট ঢালল একটা ঠোঙায়। তামাক আর চকোলেট পান্তালিমনের হাতে দিয়ে বলল :

—'গ্রিগর পান্তালিয়েভিচ্‌কে যখন জিনিসপত্তর পাঠাবে, তখন আমার অভিনন্দন আর এইগুলো পাঠিয়ে দিও।'

—'আরে বাস্‌ রে! কি খাতির গ্রিগরের! গোটা গাঁয়ের মুখে তার নাম। তাই দেখার জন্যে বেঁচে আছি...' দোকানের সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বুড়ো বলতে লাগল। সশব্দে নাকটা ঝাড়ল, জামার হাতা দিয়ে গালের ওপরকার চোখের জল মুছে ফেলল, ভাবতে লাগল :

—'বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। একটুতেই চোখে জল এসে পড়ে। হায় রে, পান্তালিমন প্রোকোফিয়েভিচ্‌ কি হয়ে গিয়েছ তুমি? এক সময় তুমি ছিলে পাথরের চাঙড়ের মত শক্ত কঠিন, পালকের মত কত অনায়াসে আড়াইমণি বোঝা পিঠে তুলে নিতে, কিন্তু আজ...গ্রীশ্‌কার ব্যাপারটা একটু কায়দায় ফেলেছে তোমাকে।'

চকোলেটের থলিটা বুকের সঙ্গে চেপে রাস্তা দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে, গ্রিগরকে ঘিরে আবার তার চিন্তাটা বিলের মধ্যে জল-পিঁপির মত ডানা ঝটপট করে উঠল, আর মনের মধ্যে পিয়োত্রার চিঠির কথাগুলো ঘুরপাক খেতে লাগল। গ্রিগরের শ্বশুর কোরশুনভ আসছিল রাস্তা দিয়ে, পান্তালিমনকে ডাকল :

—'এই যে পান্তালিমন, দাঁড়াও একটু!'

লড়াই শুরু হবার দিন থেকে এ পর্যন্ত দেখা হয় নি দুজনের। গ্রিগর বাড়ি ছাড়ার পর থেকে দুজনের মধ্যে একটা নিরুত্তাপ মন কষাকষির সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। গ্রিগরের কাছে নিজেকে ছোট করায় আর বাপকে সেই একই অসম্মান সহ্য করতে বাধ্য করায় নাতালিয়ার ওপর খুবই বিরক্ত ছিল মিরন।

সোজা পান্তালিমনের কাছে এগিয়ে গিয়ে ওক্‌-রঙা হাতটা বাড়িয়ে দিল সে :

—'আছ কেমন?'

—'আছি ভগবানের দয়ায়...।'

—'কেনাকাটা করছিলে?'

মাথা নাড়ল পান্তালিমন।

—'উপহার দিয়েছে আমাদের বীরকে। কাগজে তার বীরত্বের কথা পড়ে কিছু চকোলেট আর তামাক পাঠাচ্ছেন সার্জি প্লাতোনাভিচ্। আরে জান,, জল এসে পড়েছিল তার চোখে।' বুড়ো গর্বের সঙ্গে বলল। মিরনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, তার কথাগুলো কি ছাপ ফেলল।

মিরনের চোখের পাতার নীচে, কালো ছায়া ঘনিয়ে উঠল, মৃদু হাসির এক হাস্যকর কুঞ্চন দেখা দিল মুখে।

—'তাই নাকি!' চাপা কর্কশ গলায় সে বলে উঠল, তারপর পেছন ফিরল রাস্তা পেরুবার জন্যে। রাগে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ঠোঙাটা ফাঁক করে পান্তালিমন ছুটল তার পেছনে।

—'এই যে, একটু চেখে দেখ না চকোলেট, একেবারে মধুর মত মিষ্টি।' বিদ্বেষ ভরে বলে উঠল সে। 'চেখেই দেখ না, ছেলের নামে অনুরোধ করছি চেখে দেখতে। জীবনটা এমন কিছু মধুর নয় তোমার, তাই একটু নিলে পারতে। তোমার ছেলেও হয়ত একদিন এ সম্মান পেতে পারে, কিন্তু তখন তুমি হয়ত এ জিনিস নাও পেতে পার।'

—'আমার জীবন ঘাঁটতে হবে না...সেটা কেমন তা আমিই সবচেয়ে ভাল জানি।'

—'একটু দেখই না চেখে, আমার অনুরোধটা রাখ।' মিরনের সামনে দৌড়ে এসে অতিশয় বিনয়ের ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল পান্তালিমন।

—'চকোলেট খাওয়া আমাদের অভ্যাস নেই।' তার বাড়ান হাতখানা সরিয়ে দিল মিরন। 'অপরের করুণার দান আমরা মুখে তুলি না। তোমার ছেলের জন্যে ভিক্ষে চাইতে যাওয়া একটুও শোভন নয়। দরকার পড়লে আমার কাছে আসতে পারতে। আমাদের নাতালিয়া তোমার অন্ন খায়। তোমার অভাবে আমরা কিছু সাহায্য করতে পারতাম।'

—'অত বানানো মিথ্যে কথা বলতে হবে না। আমার পরিবারের কেউ কখনো ভিক্ষে মাগে নি। তোমার খুব গর্ব, খুব বেশি মাত্রায় গর্ব। তুমি বড়লোক, তোমার মেয়ে এসেছে আমার ঘরে, হয়ত এইজন্যে।'

—'দাঁড়াও!' কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে মিরন বলে উঠল। 'আমাদের ঝগড়ার কোন হেতু নেই। তোমাকে থামিয়েছি ঝগড়া করার জন্যেও না। তোমার সঙ্গে কাজের কথা নিয়ে আলোচনা করতে চাই আমি।'

—'আলোচনার মত কাজের কথা নেই আমাদের।

—'হ্যাঁ, আছে। এসো।'

পান্তালিমনের জামার হাতা ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল একটা ছোট রাস্তায়। গ্রাম ছাড়িয়ে তারা স্তেপেতে এসে পড়ল।

—'বেশ, কি তোমার কাজের কথা?' অমায়িক স্বরে জিজ্ঞেস করল পান্তালিমন। আড়চোখে কোরশুনভের মুখের দিকে তাকাল। ওভারকোটের ধারিটা উল্টে দিয়ে মিরন একটা খালের পাড়ে বসে পড়ল, পকেট থেকে টেনে বার করল তামাকের থলিটা।

—'শোন, প্রোকোফিচ্, আমার পেছনে কেন যে তুমি লড়ুয়ে মোরগের মত তেড়ে এলে, তা খোদাই জানে। দেখতে গেলে, দিনকাল খুব ভাল নয়, তাই না? আমি

জানতে চাই,' কঠিন কর্কশ হয়ে উঠল তার গলার স্বর, 'জানতে চাই, আর কতকাল তোমার ছেলে নাতালিয়াকে হাসির বস্তু করে রাখবে। বলো আমাকে সেই কথা!'

—'তাকেই তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত. আমাকে নয়।'

—'তাকে জিজ্ঞেস করার কিছুই নেই আমার। তুমি বাড়ির কর্তা, জিজ্ঞেস করছি তোমাকে।'

তখনো পান্তালিমনের হাতে চকোলেট; সেটা চিপতে চিপতে আঙুলের ফাঁক দিয়ে চটচটে আঠা বেরিয়ে এল। খালের পাড়ের বাদামি মাটিতে হাতটা ঘসল। তুর্কী-তামাকের মোড়কটা খুলে, এক খিমচে তামাক তুলে নিয়ে, নিঃশব্দে সিগারেট পাকাতে শুরু করল। তারপর মোড়কটা এগিয়ে দিল মিরনকে। বিনা দ্বিধায় মিরন তা নিল, গ্রিগরের জন্যে দেওয়া তামাক দিয়ে একটা সিগারেট পাকাল। মাথার ওপরে একখানা মেঘ ঝকঝকে সাদা বুক বাড়িয়ে দিল, একটা মিহি মাকড়ার জাল বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে মেঘের দিকে উঠে গেল।

দিন শেষ হয়ে এল। এক অবর্ণনীয় মধুরতায়, গভীর প্রশান্তিতে সেপ্টেম্বরের শুদ্ধতা ঘনিয়ে এল। আকাশ গ্রীষ্মের উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে, ঝাপসা রং ধরেছে ঘুঘুর মত। খালের পাড়ের আপেল গাছগুলোয়—কে জানে, কেমন করে ওরা এসেছে ওখানে—গাঢ়, লাল, পাতায় পাতায় নাচন লাগল। পাহাড়ের ঢেউতোলা মাথায় হারিয়ে গিয়েছে রাস্তাটা; পান্নার মত সবুজ, তন্দ্রাতুর, অনিশ্চিত দিগন্ত পেরিয়ে অদৃশ্য মহাশূন্যে পৌঁছে দেবার জন্যে বৃথাই ইসারা জানাচ্ছে। ঘর আর প্রাত্যহিকের চক্রে বাঁধা পড়ে মানুষ গায়ের ঘাম ঝরাতে ঝরাতে কাতরে মরছে, তাদের শক্তিটুকু শেষ করে দিচ্ছে মাড়াই-উঠোনে: আর রাস্তাটা—ওই জনহীন, সদ্যপ্রত্যাশী দূরবিস্তর,, মহাশূন্যে বয়ে চলেছে দিগন্ত পেরিয়ে। উদ্দেশ্যহীন পারিপাট্যে ধুলোর রাশ ঝেঁটিয়ে তুলে বাতাস ওখানে তাল ঠুকে বেড়ায়।

—'বড় নরম তামাকটা, একেবারে ঘাসের মত।' মুখ থেকে ধোঁয়ার মেঘ ছেড়ে মিরন বলল।

—'নরম বটে, কিন্তু মিঠে।' আধাআধি মেনে নিল পান্তালিমন।

—'একটা জবাব দাও, পান্তালিমন।' সিগারেট নিভিয়ে শান্ত গলায় কোরশুনভ জিজ্ঞেস করল।

—'এ সম্পর্কে গ্রিগর কিচ্ছু লেখে না চিঠিতে। এখন ত ও চোট খেয়ে পড়ে আছে। বলতে পারি না, পরে কি হবে। হয়ত মারাই যাবে লড়াইতে, আর, তারপর, কি?'

—'কিন্তু এমনভাবে চলেই বা কি করে?' অন্যমনস্কের মত মিরন করুণভাবে চোখ মিটমিট করল। 'কি হয়ে রইল মেয়েটা, কুমারীও নয়, সধবাও নয়, বিধবাও নয়, আর এটা কি লজ্জার। যদি জানতাম, এই দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত, তাহলে ঘটককে চৌকাঠও মাড়াতে দিতাম না। উঃ, পান্তালিমন...পান্তালিমন.. সকলেই নিজের নিজের সন্তানের জন্যে দুঃখ পায়। জলের চেয়ে যে রক্ত ঘন।'

—'আমি কি করতে পারি তার?' চাপা আক্রোশে জবাব দিল পান্তালিমন। 'বলো আমাকে! তুমি কি ভাব, ছেলে ঘর ছেড়ে গেছে, তার জন্যে আমি খুশী? এতে কি কোন লাভ আছে আমার?'

—'লিখে দাও তাকে।' নির্দেশের ভঙ্গিতে মিরন বলল। তার কথার সঙ্গে তাল রেখে হাত থেকে খালের মধ্যে ধুলো ঝরে পড়তে লাগল। 'শেষবারের মত সে পস্টাপস্টি বলে দিক।'

—'ওদিকে একটা বাচ্চাও হয়েছে তার...'

—'আর এদিকেও বাচ্চা হবে তার!' রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে চিৎকার করে উঠল কোরশ্যুনভ। 'এইরকম ব্যবহার মানুষ মানুষের সঙ্গে করতে পারে? এ্যাঁ? একবার সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, খুঁত হয়ে রইল জন্মের মত? পায়ে মাড়িয়ে পিষে তাকে শেষ করে দিতে চাও? এ্যাঁ? তার মনটা, তার মনটা...।' একহাতে নিজের বুকটা খামচে ধরে অন্যহাতে পান্তালিমনের কোটের ঝুলটা টানতে টানতে হিস হিস করে মিরন বলল। 'ওর মনটা নেকড়ের মন।'

ফোঁসফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে, পেছন ফিরল পান্তালিমন।

—'মেয়েটার স্বামীঅন্ত প্রাণ, স্বামী ছাড়া ওর নিজের আর কোন অস্তিত্বই নেই। ওকি তোমাদের বাড়ির বাঁদী?' জানতে চাইল মিরন।

—'তোমার বাড়ি থেকে আমার বাড়িতেই ভাল আছে ও! মুখ সামলে তুমি কথা বলবে!' পান্তালিমন চেঁচিয়ে উঠল; পাড় থেকে উঠে দাঁড়াল।

বিদায়সম্ভাষণ না জানিয়েই দুজনে দুদিকে চলে গেল।

॥ ছয় ॥

স্বাভাবিক খাত থেকে বিচ্যুত হলে জীবনস্রোত ছড়িয়ে পড়ে অসংখ্য ধারায়। তখন বুঝে ওঠা কঠিন হয়, কোন আঁকাবাঁকা চোরা খাতে সে বইবে। আজ যেখানে হাঁটুজল, বালির চরার পাশ দিয়ে বয়ে চলা ক্ষীণ ধারা, এত অগভীর যে জলের নীচের বালিও চোখে পড়ে, কাল সেখানে আবার কানায় কানায় ভরা বেগবান স্রোতের প্রবাহ।

হঠাৎ নাতালিয়া সিদ্ধান্ত করে বসল, ইয়াগোদনয়ে সে আকসিনিয়ার কাছে যাবে, তাকে বলবে, তার গ্রিগরকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ জানাবে। কেন জানি, নাতালিয়ার মনে হল, সবকিছুই আকসিনিয়ার ওপর নির্ভর করছে, সে যদি আকসিনিয়াকে অনুরোধ করে, তাহলে গ্রিগর তার কাছে ফিরে আসবে, তার সঙ্গেই আবার ফিরে আসবে তার আগেকার সুখ। একবার সে ভেবেও দেখল না এটা সম্ভব কিনা, কিংবা এই অদ্ভুত প্রস্তাব শুনে আকসিনিয়াই বা কি বলতে পারে। অবচেতন ইচ্ছার তাড়নায় সে এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ করার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

মাসের শেষ দিকে গ্রিগরের একখানি চিঠি এল। বাপ মাকে প্রণাম জানানোর পর, সে কুশল জিজ্ঞাসা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছে নাতালিয়াকে। কুশল জিজ্ঞাসার পেছনে গ্রিগরের যে কারণই থাক, নাতালিয়ার এই প্রেরণাই প্রয়োজন ছিল। পরের রবিবারেই সে ইয়াগোদনয়ে যাবার জন্যে তৈরি হল।

একটা আরশির ভাঙা টুকরোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের মুখচোখ দেখছিল নাতালিয়া, দেখতে পেয়ে দুনিয়া জিজ্ঞেস করল :

—'যাচ্ছ কোথায়, বৌদি?'

—'আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে।' মিথ্যে কথা বলল নাতালিয়া। এক চরম অসম্মান, এক প্রচণ্ড মানসিক পরীক্ষার দিকে এগিয়ে চলেছে ভেবে এই প্রথম লাল হয়ে উঠল সে।

—'একবারও অন্তত সন্ধ্যের পর বেড়াতে যেতে পারিস আমার সঙ্গে।' দারিয়া প্রস্তাব করল। 'আজ সন্ধ্যেয় চল না, যাবি?'

—'বলতে পারছি নে, তবে ইচ্ছে নেই।'

—'ওরে পোড়ারমুখি! সোয়ামীরা দূরে গেলেই তো শুধু আমাদের পালা আসে!' চোখ টিপল দারিয়া। ঝুঁকে পড়ে নতুন হাল্কা-নীল ঘাঘরাটার সেলাই পরখ করতে লাগল। হালে নাতালিয়া সম্পর্কে দারিয়ার ব্যবহার পালটে গিয়েছে; এক সহজ বন্ধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে। এই তরুণী সম্পর্কে দারিয়া যে বিরূপতা অনুভব করত, তা আর নেই, প্রতিটি ব্যাপারে আলাদা হলেও, দুজনে আছে বেশ বন্ধুর মতই। পিয়োত্রা চলে যাবার পর বেশ খানিকটা পালটেও গিয়েছে দারিয়া। তার চোখেমুখে, চলনেবলনে ফুটে উঠেছে অস্থিরতা। প্রতি রবিবারে আরও মন দিয়ে সাজগোজ করে, সন্ধ্যের অনেক পরে বাড়ি ফিরে এসে নাতালিয়ার কাছে অভিযোগ জানাতে বসে :

—'কি বিছ্ছিরী, মাইরি বলছি। যতসই সব মদ্দগুলোকে নিয়ে গিয়েছে, আছে শুধু গ্রামের কয়েকটা খোকা আর বুড়ো হাবড়া।

—'বেশ ত, তাতে তোমার কি যায় আসে?'

—'কেন, এমন কেউ নেই যে সন্ধ্যের পর একটু ফষ্টিনষ্টি করি।' তারপর খোলাখুলি নাতালিয়াকে জিজ্ঞেস করে। 'কি করে তুই সহ্য করিস রে, ভাই; এতদিন মদ্দ ছাড়া আছিস?

—'লজ্জা হওয়া উচিত তোমার! বিবেক বলে কোন বস্তু নেই তোমার?' লাল হয়ে ওঠে নাতালিয়া।

—'একটুও ইচ্ছে হয় না তোর?'

—'তোমার যে হয় তাত বোঝাই যায়।'

হেসে ওঠে দারিয়া, বাঁকা ভুরু দুটো কেঁপে কেঁপে ওঠে।

—'লুকোতে যাব কেন রে? এখুনি চিৎপটাং করে দিতে পারি যে-কোন বুড়ো হাবড়াকে! ভাব তো, পিয়োত্রা গেছে আজ দুমাস হল।'

—'তোমার নিজেরই দুঃখ বাড়াচ্ছ, দারিয়া।'

—'থাম থাম, সতীসাবিত্রী ঠান্‌দি! তোদের মত চাপা মেয়েদের জানা আছে! শুধু মুখে কবুল করবি না তোরা।'

—'কবুল করার কিছুই নেই আমার।'

বাঁকাচোখে এক হাস্যকর দৃষ্টি হানল দারিয়া, ঠোঁটদুটো কামড়ে ধরল।

—'সেদিন আতামানের ছেলেটা, তিমোখী মানিত্‌সেভ এসে বসেছিল পাশে। বেশ বুঝতে পারছিলাম, ভয় পাচ্ছে শুরু করতে। তারপর নিঃশব্দে তার হাতটা গলিয়ে দিল আমার হাতের মধ্যে, হাতটা থরথর করে কাঁপছিল। আমি শুধু চুপ করে বসে রইলাম, কিছুই বললাম না, কিন্তু রাগ চড়তে লাগল। যদি গোঁফের রেখাও দেখা দিত তার—কিন্তু একেবার নাক টিপলে দুধ গলে! ষোল বছর বয়েস—একদিনও যদি বেশি হয়। কোন কথা না বলে চুপ করে বসে রইলাম, আর খাবলাতে খাবলাতে ফিসফিস করে বলতে লাগল : এসো না, এসো না আমাদের চালার নীচে। তখন আমি দিলাম একখানা ঝেড়ে!' উজ্জ্বল হয়ে সে হেসে উঠল। 'লাফিয়ে উঠলাম আমি। আরে তুই অমুক, তুই অমুক। তুই কি ভেবেছিস ওমন করে পটাতে পারবি আমাকে? বিছানায় মোতা ছেড়েছিস কবে?' আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে দিলাম তাকে।'

নাতালিয়া বাইরে চলে গিয়েছিল। বাইরে বারান্দায় তাকে পাকড়াও করল দারিয়া। জিজ্ঞেস করল :

—'আজ রাতেও দরজা খুলে দিবি ত?'

—'ভাবছি, আজ রাতটা মা বাবার কাছেই থেকে আসব।'

চিন্তিতভাবে চিরুনিটা দিয়ে নাক চুলকোতে চুলকোতে মাথা নাড়ল দারিয়া :

—'ও, আচ্ছা ঠিক আছে। দুনিয়াকে ঠিক বলতে চাই না আমি, কিন্তু এখন দেখছি, বলতেই হবে।'

মা বাপের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে এই কথা ইলিনিচ্‌নাকে জানিয়ে নাতালিয়া রাস্তায় নামল। বাজার থেকে ফিরে গাড়িগুলো বারোয়ারিতলার দিকে চলেছে, গির্জা থেকে গ্রামের লোকজন ফিরছে। একটা গলিপথ ধরল নাতালিয়া, তাড়াতাড়ি পাহাড়ে উঠতে লাগল। একেবারে চুড়োয় উঠে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল সে। গ্রামের বুকে রোদ্দুরের বান ডেকেছে, চুনকাম করা ছোট ছোট ঘরগুলো সাদা ধবধবে, রোদ্দুর ঝলসে উঠছে কারখানার খাড়া ছাদে, পাত লোহা গলিত ধাতুর মত জ্বলজ্বল করছে।

॥ সাত ॥

লোক হারিয়েছে ইয়াগোদনয়েও, ছিঁড়েখুঁড়ে নিয়ে গিয়েছে লড়াইতে। বেনিয়ামিন ও তিখোন চলে গিয়েছে। জায়গাটা তখনো তন্দ্রাতুর, আগের চেয়ে অনেক বেশি নিরানন্দ আর জনসংশ্রবহীন। বেনিয়ামিনের জায়গায় এখন জেনারেলের কাজকর্ম করে আকসিনিয়া, বিপুলনিতম্বা লুকেরিয়া ওদিকে রান্নাঘরের ভার নিয়েছে, হাঁসমুরগী-গুলোকেও সে-ই খাওয়ায়। নতুন মানুষ শুধু একজন, নিকিতিচ্‌ নামে এক বুড়ো কসাক, তাকে নেওয়া হয়েছে কোচোয়ানের কাজের জন্যে।

এ বছর বুড়ো লিস্তনিৎস্কি কম চাষ করিয়েছে, খামারের কাজের জন্যে তিনচারটে ঘোড়া রেখে প্রায় কুড়িটা ঘোড়া ফৌজের ঘাটতি পূরণের জন্যে যোগান দিয়েছে। সে সময় কাটায় তিতির মেরে আর কুকুর নিয়ে শিকার করে।

গ্রিগরের কাছ থেকে মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত চিঠি পায় আকসিনিয়া, গ্রিগর জানায়, এখনো পর্যন্ত বহাল তবিয়তেই আছে। সে শরীর ও মনের জোর ফিরে পেয়েছে, নইলে তার দুর্বলতার কথা আকসিনিয়াকে লিখতে চাইত না, কারণ ভুলেও সে কখনো অভিযোগ করে নি যে লড়াই করাটা তার কাছে কঠিন আর আনন্দহীন মনে হয়েছে। তার চিঠিগুলো উত্তাপহীন, যেন চিঠিগুলো লিখেছে, লিখতে হবে শুধু এই কথাই ভেবে। কেবল একটি চিঠিতে সে লিখেছিল : 'এক নাগাড়ে ফ্রন্টে আছি, ঘেন্না ধরে গিয়েছে লড়াইতে, মরণকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি।' প্রত্যেক চিঠিতে সে মেয়ের কথা জানতে চায়, তার সম্পর্কে লিখতে বলে আকসিনিয়াকে। আকসিনিয়া তার বিচ্ছেদ বেশ সাহসের সঙ্গেই সহ্য করেছে বলে মনে হয়। গ্রিগরের প্রতি তার সবটুকু প্রেম সে ঢেলে দিয়েছে মেয়েটার ওপর, বিশেষ করে যখন থেকে সে নিশ্চিত বুঝতে পেরেছে মেয়েটা তারই। অকাট্য প্রমাণ দিয়েছে প্রাণশক্তি : মেয়েটার গাঢ় লাল চুলের জায়গায় কাল কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল উঠেছে; কালো ছোপ ধরেছে চোখে,

চোখ হয়েছে তের্‌চা মত। প্রতিদিন সে আরও বেশিরকম বাপের মত হয়ে উঠছে, তার হাসিটুকুও গ্রিগরের হাসি। আকসিনিয়া এখন নিঃসন্দেহে মেয়ের মধ্যে গ্রিগরকে দেখতে পায়, মেয়ের জন্যে তার টান আরও গভীর হয়ে ওঠে।

একটা একটা করে দিন কাটে, আর প্রতিটি দিনের শেষে আকসিনিয়ার বুকে বাসা বাঁধে এক জ্বালাকর তিক্ততা। মনের মানুষের জীবন সম্পর্কে উৎকণ্ঠা তার মনকে ধারাল সূঁচের মত বেঁধায়; দিনে রাতে কখনো তাকে রেহাই দেয় না। দিনের বেলায় কাজের সময় চাপা থাকে, বাঁধ ভেঙে যায় রাত্রে, এক অব্যক্ত কান্নায় এপাশ ওপাশ করে, চোখের জল ঝরে, ফোঁপানির শব্দে পাছে মেয়েটা জেগে ওঠে সেই ভয়ে হাত কামড়ে ধরে, শারীরিক বেদনা দিয়ে মানসিক বেদনাকে প্রতিহত করতে চায়। কাঁথায় মুখ গুঁজে সে কাঁদে, শিশুর মত সরলতায় ভাবে : 'তার বাচ্চার মধ্যে দিয়েই গ্রীশ্‌কা বুঝবে তার জন্যে কেমন কেঁদে মরি।'

এমন রাত কাটলে, সকালে যখন ওঠে, মনে হয় কে যেন নির্দয়ভাবে তাকে মেরেছে। সারা গায়ে ব্যথা, স্নায়ুগুলোর মধ্যে একটানা ছোট ছোট রুপোলি হাতুড়ির ঘা পড়তে থাকে, ফোলা ঠোঁটের কোণায় দুঃখ মুখ লুকিয়ে থাকে তার মন কেমন করা রাতগুলো বুড়িয়ে দিল আকসিনিয়াকে।

॥ আট ॥

নাতালিয়ার দেখা করার দিন রবিবার মনিবকে সকালের খাবার দিয়ে আকসিনিয়া যখন সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়াল, দেখতে পেল গেটের দিকে একটা মেয়েলোক আসছে। সাদা রুমালের নীচের চোখদুটো অদ্ভুত পরিচিত মনে হলো। গেট খুলে আঙিনায় ঢুকল মেয়েলোকটি। নাতালিয়াকে চিনতে পেরে ফ্যাকাশে হয়ে গেল আকসিনিয়া। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল তার দিকে। নাতালিয়ার জুতোয় পুরু হয়ে ধুলো জমেছে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে, কাজ করার ফলে ক্ষতবিক্ষত বড় বড় হাত দুখানা প্রাণহীনের মত দুপাশে ঝুলতে লাগল, বাঁকা ঘাড়টা সোজা করার চেষ্টা করতে করতে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।

—'তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। ' শুকনো জিবটা ঠোঁটে বুলিয়ে নাতালিয়া বলল।

বাড়ির জানলাগুলোয় দ্রুত দৃষ্টি বুলিয়ে আকসিনিয়া তাকে নিঃশব্দে নিয়ে এল ঘরের মধ্যে। দরজাটা বন্ধ করে দিল, অ্যাপ্রনের নীচে হাতদুখানা ঢেকে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনল, চুপি চুপি, প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল :

—'কি জন্যে এসেছ?'

—'একটু জল খাব,' ঘরের চারপাশে তাকাতে তাকাতে নাতালিয়া বলল।

দাঁড়িয়ে রইল আকসিনিয়া। অতিকষ্টে স্বর চড়িয়ে নাতালিয়া বলতে শুরু করল :

—'আমার স্বামীকে তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছ...ফিরিয়ে দাও আমার গ্রিগরকে। আমার জীবনটা তছনছ করে দিয়েছ তুমি। দেখতেই পাচ্ছ আমি কেমন...।'

—'তোমার স্বামী?' দাঁতে দাঁত ঘসল আকসিনিয়া, পাথরের ওপরে ঠিকরে পড়া

বৃষ্টির ফোঁটার মত কথাগুলো তোড়ের মুখে বেরিয়ে এল। 'তোমার স্বামী? তুমি বলার কে? কেন এসেছ এখানে? বড় দেরি করে ভাবতে শুরু করেছ তুমি। বড়ই দেরি করে!'

তিক্ত হাসি হেসে, গোটা শরীর দুলিয়ে আকসিনিয়া সোজা নাতালিয়ার দিকে এগিয়ে গেল। শত্রুর মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপ করে উঠল সে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে গ্রিগরের বিয়ে-করা কিন্তু ফেলে আসা বৌ—অপমানিত, বেদনায় নিষ্পিষ্ট। সে এসে দাঁড়িয়েছিল আকসিনিয়া আর গ্রিগরের মাঝখানে, আলাদা করে দিয়েছিল দুজনকে, গুরুভার পাষাণের মত, এক রক্তাক্ত বেদনার সৃষ্টি করেছিল আকসিনিয়ার বুকে। সে যখন তাকে কাছে পাবার জন্যে গুমরে গুমরে মরছিল, অপরজন, ওই নাতালিয়া তখন গ্রিগরকে বুকের মধ্যে বেঁধেছিল আর নিঃসন্দেহে তাকে ব্যর্থ পরিত্যক্ত প্রেমিকা মনে করে মনে মনে হেসেছিল।

—'ওকে ছেড়ে দিই, এই কথা বলতে এসেছ তুমি?' হাঁপাতে লাগল আকসিনিয়া। 'ঘাসবনের সাপিনী! প্রথমে তুমিই গ্রিগরকে কেড়ে নিয়েছিলে আমার কাছ থেকে! তুমি জানতে গ্রিগর আমার সঙ্গে থাকে। কেন বিয়ে করেছিলে তাকে? আমি আমার জিনিসই শুধু ফিরিয়ে নিয়েছি। সে আমার। তার বাচ্চা হয়েছে আমার পেটে, কিন্তু তুমি...'

তোলপাড় করা ঘৃণায় নাতালিয়ার চোখে চোখ রেখে তাকাল সে, পাগলের মত হাতদুটো দুলিয়ে কথার টগবগে স্রোত বইয়ে দিল।

—'গ্রীশ্‌কা আমার, কাউকে আমি দিতে পারব না গ্রীশ্‌কাকে। সে আমার, আমার! বুঝতে পারছ...? আমার! বেরিয়ে যাও এখান থেকে, লজ্জা-সরম-খোয়ানো কুত্তী, তুমি তার বৌ নও। তুমি চাইছ একটা বাচ্চার বাপকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে? আর, আগে আস নি কেন তুমি? বল, আগে আস নি কেন তুমি?'

কাত হয়ে বেঞ্চের দিকে এগিয়ে গিয়ে নাতালিয়া বসে পড়ল, মাথা নীচু করে দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

—'স্বামী ছেড়ে এসেছ তুমি। চেঁচিয়ো না অমন করে।' জবাব দিল সে।

—'গ্রিগর ছাড়া আমার কোন স্বামী নেই। কেউ নেই, গোটা দুনিয়ায় কোথাও নেই।' মনের মধ্যে যে ক্রোধ জমে উঠেছে তার প্রকাশের পথ না পেয়ে আকসিনিয়া স্থির দৃষ্টিতে নাতালিয়ার কালো চুলের গোছার দিকে তাকিয়ে রইল, গোছাটা খসে পড়েছে রুমালের নীচে থেকে।

—'তার কোন প্রয়োজন আছে তোমাকে দিয়ে।' জিজ্ঞেস করল সে। 'নিজের বাঁকা ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখ! তুমি কি ভাব সে হেদিয়ে মরছে তোমার জন্যে? যখন তুমি ভাল ছিলে তখনই ও তোমাকে ছেড়ে এসেছে,, এখন তোমার যা চেহারা তাতে তার মন ফেরার কোন সম্ভাবনা আছে? গ্রিগরকে আমি ছেড়ে দেব না! যা বলার তা আমি বলে দিলাম। বেরিয়ে যাও!'

নিজের নীড় বাঁচাতে ভয়ঙ্করী হয়ে উঠল আকসিনিয়া। সে বেশ বুঝতে পারল, একটু বাঁকানো ঘাড় সত্ত্বেও, আগের মতই সুন্দরী আছে নাতালিয়া। গাল আর ঠোঁট তাজা, সময়ের স্পর্শও লাগে নি, এদিকে তার নিজের চোখের পাশে খাঁজ পড়তে শুরু করেছে, পড়তে শুরু করেছে ওই নাতালিয়ার জন্যে।

—'তুমি কি ভাব, চাইলেই আমি ফিরে পাব তাকে, এমন আশা আমি করি?' নাতালিয়া বেদনায় টলমল করা চোখদুটো তুলল।

—'তাহলে এসেছ কেন?' আকসিনিয়া জিজ্ঞেস করল।

—'মন যে মানে না, তাই।'

কথার শব্দে আকসিনিয়ার মেয়েটা বিছানায় নড়ে চড়ে তারস্বরে কেঁদে উঠল। মেয়েটাকে তুলে নিয়ে জানলার দিকে মুখ করে আকসিনিয়া বসল। নাতালিয়ার দেহের প্রতিটি অঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল, সে তাকিয়ে রইল শিশুর মুখের দিকে। একটা শুকনো হিক্কা তার টুঁটিটা টিপে ধরল। শিশুর মুখে গ্রিগরের দুটো চোখ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

কাঁদতে কাঁদতে, টলতে টলতে নাতালিয়া বারান্দায় চলে এল। কখন বেরিয়ে গেল তা আকসিনিয়া দেখতেও পেল না। দুএক মিনিট পর সাশ্‌কা ঘরে ঢুকল।

—'কে ওই মেয়েছেলেটা?' অর্ধ অনুমান করেই জিজ্ঞেস করল সে।

—'গ্রামের লোক।'

তাতার্স্ক গ্রামে ফিরে যাবার পথে মাইল দুয়েক হেঁটে এল নাতালিযা, তারপর এক কাঁটাগাছের নীচে শুযে পড়ল। বাসনার পীড়নে নিস্পিষ্ট হয়ে শুয়ে রইল সে, কিছুই ভাবল না। শিশুর মুখে গ্রিগরের কালো বিষণ্ণ চোখ দুটো শুধু একভাবে তার চোখের সামনে ভেসে রইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

লড়াই হবার পর সেদিনকার রাতটা গ্রিগরের স্মৃতিতে চিরদিনের জন্য ছাপ রেখে গেল, সেটা এত স্পষ্ট—প্রায় অন্ধ যন্ত্রণার মত। তার জ্ঞান ফিরে এল ভোরের কিছু আগে। কাটাফসলের খোঁচা খোঁচা গোড়ার মধ্যে তার হাত দুটো নড়ে উঠল, মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় সে আর্তনাদ করে উঠল। অতিকষ্টে গ্রিগর হাতটা উঁচু করল, ভুরু পর্যন্ত এগিয়ে আনল, রক্তে জমাট বাঁধা চুল হাত দিয়ে অনুভব করল। আঙুল দিয়ে সে চামড়ার ক্ষতটা ছুঁয়ে দেখল। তারপর, দাঁতে দাঁত ঘসে, শুয়ে রইল চিৎ হয়ে। মাথার ওপরে একটা গাছের তুষার-জমা পাতার শোকার্ত মর্মর ধ্বনি কাচের মত টুংটাং করে বেজে উঠল। গাঢ় নীল আকাশের পটভূমিকায় ডালগুলোর কালো রেখা স্পষ্ট হয়ে আছে, তাদের ফাঁক দিয়ে তারাগুলো মিটমিট করছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গ্রিগর, তারাগুলোকে মনে হল অদ্ভুত সব নীল-হলদে ফল, গাছের ডালে ডালে ঝুলছে।

কি ঘটেছে বুঝতে পেরে, ধীরে ধীরে এগিযে আসা এক দুর্ভেদ্য আতঙ্ক সম্পর্কে সচেতন হয়ে, গ্রিগর দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে, হাতে পায়ে ভর দিয়ে এগুতে লাগল। যন্ত্রণা রসিকতা জুড়ে দিল তার সঙ্গে, উপুড় করে আছড়ে ফেলে দিতে লাগল। মনে হল, অনন্তকাল ধরে হাতেপায়ে ভর দিয়ে চলেছে। জোর করে পেছন ফিরে তাকাল সে; প্রায় হাত পঞ্চাশেক পেছনে দাঁড়িয়ে আছে গাছের কালো মূর্তি। একবার

এক মড়ার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল, মড়ার গর্তে ঢোকা শক্ত পেটের ওপর কনুইটা রাখল। রক্তক্ষয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে, শিশুর মত সে কাঁদতে লাগল, যাতে জ্ঞান না হারায় তার জন্যে শিশিরে ভেজা ঘাস চিবুতে শুরু করল। একটা গোলা রাখার ওল্টানো বাক্সের কাছে এসে পায়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে টলতে লাগল। তারপর হাঁটতে শুরু করল। শক্তি ফিরে আসতে লাগল; দৃঢ় পদক্ষেপে সে এগুল, এমন কি সপ্তর্ষির দিকে লক্ষ রেখে পুব মুখো এগিয়ে যেতেও পারল।

বনের ধারে এসে হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে দাঁড়িয়ে পড়তে হল তাকে :

—'থাম, নইলে গুলি চালাব!'

রিভলবারের শব্দ এল কানে, সেই শব্দ লক্ষ্য করে তাকাল গ্রিগর। একটা পাইন গাছে হেলান দিয়ে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে।

—'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে। নিজের গলার স্বরই তার কানে অন্যের গলার স্বরের মত শোনাল।

—'রুশ নাকি? ঈশ্বরের দিব্যি, এসো এখানে।' পাইন গাছে হেলান দেওয়া লোকটা মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল। তার কাছে এগিয়ে গেল গ্রিগর।

—'একটু ঝুঁকে পড়!' লোকটি হুকুম করল।

—'ঝুঁকতে পারছি না।

—'কেন পারছ না?'

—'পড়ে যাব, একবার পড়ে গেলে আর উঠতে পারব না। মাথায় চোট লেগেছে আমার।

—'তুমি কোন রেজিমেণ্টের?'

—'১২নং ডন কসাক।'

—'আমাকে একটু সাহায্য কর, কসাক।'

—'আমি পড়ে যাব, হুজুর।' তকমা দেখে অফিসার বলে চিনতে পেরে, উত্তর দিল গ্রিগর।

—'অন্তত হাতটা ত বাড়িয়ে দাও।'

একটু নীচু হয়ে গ্রিগর অফিসারকে উঠতে সাহায্য করল, তারপর দুজনে চলতে শুরু করল। কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপে অফিসারটি ভীষণভাবে ভর দিতে লাগল গ্রিগরের হাতের ওপর। একটা নাবাল জমি থেকে উঠতেই সে গ্রিগরের জামার হাতটা চেপে ধরে বলে উঠল :

—'আমাকে ছেড়ে দাও, কসাক। চোট লেগেছে আমার...ঠিক পেটের মাঝখানে।'

জ্ঞান হারাল সে; কিন্তু গ্রিগর তাকে টেনে নিয়ে চলল। বারবার মাটিতে পড়ল, আবার উঠল আবার পড়ল, আবার উঠল। দুদুবার বোঝাটা ফেলে দিল সে. একা একা এগিয়ে গেল; কিন্তু প্রতিবারই আবার ফিরে এল, তুলে নিল টেনে। যেন ঘুমের ঘোরে হোঁচট খেতে খেতে এগুতে লাগল।

এগারোটার সময় এক টহলদার দল তাদের দেখতে পেল, তাদের পাঠিয়ে দিল হাসপাতালে।

॥ দুই ॥

তারপরদিনই চুপিচুপি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়ল গ্রিগর। রাস্তায় পৌঁছেই মাথার ব্যাণ্ডেজ টেনে খুলে ফেলল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজটা হাতে দোলাতে দোলাতে রাস্তা ধরে চলতে শুরু করল।

—'আরে, তুমি কোত্থেকে এলে?' রেজিমেণ্টের সদর দপ্তরে পৌঁছুতেই কোম্পানি-কমাণ্ডার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল। সে উত্তর দিল :

—'কাজে যোগ দিতে এলাম, হুজুর।'

গ্রিগরের রেজিমেণ্ট কামেন্‌কা-স্ত্রুমিলোভয় দুদিনের জন্যে থেমেছিল, এখন আবার তোড়জোড় করছে এগিয়ে যাবার। যে বাড়িতে গ্রিগরের দলের কসাকরা ছিল, সেটা খুঁজে বার করল সে, তার ঘোড়াটা কেমন আছে দেখতে গেল। জিনের থলির ভেতরে গামছা আর কিছু জামাকাপড় ছিল, সেগুলো পাওয়া গেল না।

—'আমার চোখের সামনে চুরি হয়ে গেল।' অপরাধীর মত স্বীকার করল মিশা কোশেভয়। 'পদাতিকরা এখানে ছিল। চুরি করেছে তারাই।'

—'মরুক গে, নিয়েছে বেশ করেছে! আমি শুধু ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে চাই মাথায়।'

তারা দাঁড়িয়ে ছিল যেখানে, সেই চালার নীচে উরিউপিন এসে হাজির হল। এমনভাবে সে হাতখানা বাড়িয়ে দিল, মনে হল, কোনদিন যেন তার কোন ঝগড়াঝাঁটি হয়নি গ্রিগরের সঙ্গে। চেঁচিয়ে উঠল :

—'এই যে মেলেখফ! তাহলে এখনো বেঁচে আছ দেখছি!'

—'এই কোনরকম।'

—'মাথা দিয়ে যে রক্ত গড়াচ্ছে। দেখি একবার।'

জোর করে গ্রিগরের মাথাটা নীচু করে দেখে, ঘড়াৎ করে নাকের আওয়াজ করল :

—'চুল কেটে ফেলতে দিলে কেন ওদের? ডাক্তাররা বারটা বাজিয়ে দিত তোমার। দাঁড়াও তোমাকে সারিয়ে দিচ্ছি।'

গ্রিগরের সম্মতির অপেক্ষা না করেই গুলির বাক্স থেকে একটা গুলি বার করে নিল, গুলিটা ভেঙে হাতের ওপর কলো বারুদটুকু ঢালল।

—'একটা মাকড়সার জাল জোগাড় করত, মিশা।'

তলোয়ারের ডগা দিয়ে একটা মাকড়সার জাল ছিঁড়ে নিয়ে, উরিউপিনের হাতে দিল কশেভয়। সেই তলোয়ার দিয়েই একটু মাটি তুলে নিল, মাটির সঙ্গে মাকড়সার জাল আর বারুদ মিশিয়ে দাঁত দিয়ে চিবুল। তারপর কাদাকাদা পুলটিসটা ঘায়ের মুখে লাগিয়ে দিয়ে হাসল।

—'তিন দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে তুমি।' বলে উঠল, 'কিন্তু তোমার দেখা-শোনা করছি আমি, অথচ তুমিই আমাকে খুন করে ফেলতে।'

—'তোমার দেখাশোনার জন্যে ধন্যবাদ; কিন্তু তোমাকে যদি খুন করতাম, তাহলে আমার বিবেকের ঘাড় থেকে অন্তত একটা পাপের বোঝা নেমে যেত। ঘা-টা কেমন দেখলে?'

—'প্রায় আধইঞ্চি কেটে গর্ত হয়েছে। ভুলতে হচ্ছে না সহজে। অফিসাররা তলোয়ারে শান দেয় না, কাটা দাগ থেকে যাবে সারা জীবনের মত।'

চালার নীচে থেকে বেরিয়ে এল তারা। চোখের সাদা অংশ উল্টে গ্রিগরের চিঁহিঁ করে ঘোড়াটা ডেকে উঠল।

—'তোমার জন্যে ও খুব মনমরা হয়ে ছিল, গ্রিগর।' ঘোড়াটার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল কশেভয়। 'খেত টেত না, সারাক্ষণ শুধুই চিঁহিঁ চিঁহিঁ করে ডাকত।

—'হামাগুড়ি দিয়ে এগুনোর সময় কত ডেকেছি ওকে।' ভারি গলায় গ্রিগর বলল। 'ঠিক জানতাম, ও ছেড়ে যাবে না আমাকে। এও জানতাম, অচেনা কেউ ওকে সহজে ধরতে পারবে না।'

—'কথাটা ঠিকই। জোর করে আনতে হয়েছিল। দড়ির ফাঁস পরিয়ে তবে এনেছিলাম।'

—'লক্ষ্মী ঘোড়াটা। আমার দাদা পিয়োত্রার।' চোখের জল লুকোবার জন্যে গ্রিগর পেছন ফিরল।

ঘরের ভেতর ঢুকল তারা। সামনের ঘরে একটা স্প্রিংয়ের গদির ওপরে ইয়েগোর ঝার্কোভ্ শুয়েছিল। অতি ব্যস্ততায় বাড়ির মালিক ঘর ছেড়ে গিয়েছে, এক অবর্ণনীয় বিশৃঙ্খলা তার নীরব সাক্ষ্য দিচ্ছে। ভাঙা বাসনের টুকরো, ছেঁড়া কাগজ, বই, জিনিস-পত্তরের অবশিষ্ট, ছেলেপুলের খেলনা পুরনো জুতো, ছড়ানো ময়দা, সবকিছু এলোমেলো গাদাগাদি হয়ে আছে মেঝের ওপরে।

ইয়েমেলিয়ান গ্রোশেভ্ আর প্রোখোর ঝিকভ্ ঘরের মাঝখানে একটু জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে ছিল, তারা খাচ্ছিল সেইখানে বসে। গ্রিগরকে দেখে ঝিকভের বাছুরের মত চোখদুটো ঠিকরে যেন বেরিয়ে এলো। সে চেঁচিয়ে উঠল :

—'গ্রীস্কা! তুমি এলে কোত্থেকে?'

—'একেবারে যমালয় থেকে। অমন করে তাকিও না!'

—'দৌড়ে যাও, একটু সুপ্ যোগাড় করে আন ওর জন্যে।' চেঁচিয়ে উরিউপিন বলল।

প্রোখোর উঠে দরজার দিকে এগুলো, চলতে চলতেই চিবুতে লাগল। ক্লান্তভাবে নিজের জায়গায় বসে পড়ল গ্রিগর। অপরাধীর মত হেসে বলল, 'কখন যে শেষ খেয়েছি মনে পড়ে না।'

এক বাটি সুপ আর গমের লপ্সি নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এল প্রোখোর। জিজ্ঞেস করল :

—'কিসে তোমার লপ্সি ঢালব?'

কি ঢালা হবে বুঝতে না পেরেই গ্রোশেভ্ শোবার ঘরের একটা বাসন টেনে নিল, বলল, 'এই যে একটা হাতল-দেওয়া পাত্তর আছে।'

—'গন্ধ বেরুচ্ছে তোমার পাত্তরে।' ভুরু কোঁচকাল প্রোখোর।

—'কুছ্ পরোয়া নেই, ঢাল এতেই, পরে সবাই ভাগাভাগি করে নেব।'

বাসনের ওপরে থলেটা উপুড় করে দিল ঝিকোভ, থকথকে ঘন লপ্সি পড়ল তাল পাকিয়ে, হলদে মত চর্বি ওপরে ভেসে উঠে ছড়িয়ে গেল। গল্প করতে করতে খেতে লাগল তারা। পা-জামার রং-ওঠা পট্টির ওপর থেকে এক ফোঁটা চর্বি চেটে নিল উরিউপিন, মুখভর্তি লপ্সি নিয়েই বকবক করতে লাগল :

—'আজ সকালে তোমার এখানে থাকা উচিত ছিল হে, মেলেখফ। খোদ ডিভিসন

কমাণ্ডারের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছি আমরা। আমাদের দেখলেন শুনলেন, হাঙ্গেরীয় ঘোড়সোয়ারদের খতম করে কামানের সারটা বাঁচিয়েছি বলে, খুব ধন্যবাদ জানালেন, বললেন, 'কসাকরা, মনে রেখো, জার আর পিতৃভূমি তোমাদের কখনো ভুলবে না।'

তার কথার মাঝখানেই একটা গুলির শব্দ হল বাইরে, একটা মেসিনগান চলতে শুরু করল। চামচ ফেলে রেখে বাইরে ছুটে এল কসাকরা। মাথার ওপর একটা উড়োজাহাজ পাক খাচ্ছে অনেক নীচে দিয়ে। তার শক্তিশালী ইঞ্জিনের ভয়াবহ গর্জন উঠছে।

—'শুয়ে পড়, শুয়ে পড় বেড়ার গা ঘেঁসে। এক্ষুনি বোমা ফেলতে শুরু করবে। আমাদের পাশেই আছে একসার কামান।' উরিউপিন চীৎকার করে উঠল। 'একজন কেউ গিয়ে জাগিয়ে দাও ইয়েগোরকে, নরম গদিতে ঘুমুতে ঘুমুতেই অক্কা পাবে ও!'

মাটির সঙ্গে নুয়ে পড়ে রাস্তা দিয়ে ছুটল সেপাইরা। পাশের আঙ্গিনা থেকে কানে এল একটা ঘোড়ার চিঁহিঁ ডাক আর এক সংক্ষিপ্ত নির্দেশ। বেড়ার ওপর দিয়ে তাকাল গ্রিগর; গোলন্দাজরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে চালার নীচে একটা কামান ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। উজ্জ্বল নীল আকাশে সূঁচের মত চোখে বেঁধে, গ্রিগর চোখ কুঁচকে ছোঁ-মেরে ফেরা, গর্জন করা গরুড় পাখিটার দিকে তাকাল। সেই মুহূর্তে কি যেন হঠাৎ খসে পড়ল, ঝকমক করে উঠল রোদ্দুরে।

উরিউপিন সিঁড়ি দিয়ে নেমে ছুট দিল, গ্রিগর তার পেছনে পেছনে, দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল বেড়ার নীচে। পাক খেতেই ঝকঝক করে উঠল উড়ো জাহাজের একটা ডানা। রাস্তা থেকে এলোমেলো গুলির শব্দ কানে এল। সবে রাইফেলের গুলির বাক্সে গ্রিগর গুলি ঢুকিয়েছে, এমন সময় একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বেড়া থেকে প্রায় দুহাত দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল। একতাল মাটি এসে লাগল মাথায়, চোখ ধুলোয় ভরে উঠল, একেবারে পিষে দিল ভারে।

উরিউপিন তাকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল। এক তীব্র যন্ত্রণায় চোখ মেলা সম্ভব হল না। অনেক কষ্টে ডান চোখটা খুলল, দেখল অর্ধেকটা বাড়িই উড়ে গিয়েছে; ভয়ংকর এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে ইঁটকাঠ, গোলাপি রংয়ের ধুলোর একটা মেঘ জমেছে তার ওপরে।

সে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই সিঁড়ির নীচে থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল ইয়েগোর ঝারকোভ। তার গোটা মুখখানা জুড়ে একটা কান্না; গর্ত থেকে ছিড়ে বেরিয়ে আসা দুই চোখ থেকে রক্তমাখা চোখের জল ঝরছে। কাঁধের মধ্যে মাথা গুঁজে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলল সে, মৃত্যুপাণ্ডুর ঠোঁটদুটো না খুলেই চিৎকার করতে লাগল :

—'আ-ই-ই-ই-ই, আ-ই-ই-ই. আ. ই..ই .'

উরু থেকে একখানা পা ছিঁড়ে গিয়েছে, আটকে আছে শুধু চামড়ার ফালির সঙ্গে; সেই পাখানা পেছনে পেছনে ঘসড়াতে লাগল। হাতে ভর দিয়ে গুঁড়ি মেরে সে আস্তে আস্তে এগুতে লাগল, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল এক চাপা, প্রায় শিশুজনোচিত চিৎকার। চিৎকার থামল, কাত হয়ে সে পড়ে গেল, ভাঙাচোরা শক্ত ইঁট আর ঘোড়ার নাদছড়ানো মাটির মধ্যে মুখটা একেবারে গুঁজে দিল। তার কাছে এগিয়ে যাবার চেষ্টাও করল না কেউ।

—'টেনে তোল ওকে!' বাঁ-চোখ থেকে হাতটা না সরিয়েই গ্রিগর চেঁচিয়ে উঠল।

পদাতিক বাহিনীর লোকেরা ছুটে এল আঙ্গিনায়; টেলিফোন অপারেটরদের নিয়ে দুচাকার একটা গাড়ি এসে থামল গেটের কাছে। দুজন স্ত্রীলোক, আর লম্বা, কালো

কোট গায়ে একজন ব্ড়ো মত লোক এগিয়ে এল। ঝারকোভকে ঘিরে অতি দ্রুত ছোট একটা ভিড় জমে উঠল। ভিড়ের মধ্যে গলিয়ে গ্রিগর দেখতে পেল, তখনো নিঃশ্বাস পড়ছে ঝারকোভের, তখনো মৃদু আর্তনাদ করছে আর থরথর করে কাঁপছে। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমে উঠেছে মৃত্যুর ছোঁয়া লাগা হলদে ভুরুর ওপর।

—'তোল ওকে! তোমরা মানুষ না, পশু...?'

—'তুমি হাল্লা জুড়ছ কেন?' লম্বা মত এক পদাতিক খেঁকিয়ে উঠল। 'তোল ওকে, তোল ওকে! কিন্তু তুলে নিয়ে যাব কোথায়? দেখছই তো শেষ হয়ে আসছে।'

—'এখনো জ্ঞান আছে ওর।'

পেছন থেকে গ্রিগরের কাঁধে হাত দিল উরিউপিন।

—'নাড়াচাড়া করো না ওকে।' ফিসফিস করে বলল। 'ওদিক দিয়ে ঘুরে এসে একবার দেখ!'

গ্রিগরের জামার হাতা ধরে টেনে আনল সে, ধাক্কা দিয়ে ভিড় সরিয়ে দিল। একবার শুধু তাকিয়ে দেখল গ্রিগর, তারপর ঘাড় গুঁজে পেছন দিয়ে চলে এল গেটের কাছে। ঝারকোভের পেটের নীচে গোলাপি আর নীল নাড়িভুঁড়ি ঝুলছে, ধোঁয়া উঠছে তা থেকে। জট পাকানো নাড়িভুঁড়ির শেষটুকু বালি আর ঘোড়ার নাদের ওপর বেরিয়ে পড়ে আছে, সেটা নড়ছে, ফুলে ফুলে উঠছে। মৃত্যুপথযাত্রীর হাতখানা পাশে পড়ে আছে যেন মাটি আঁচড়ে তুলছে। কে একজন বলল ·

—'মুখটা ঢাকা দিয়ে দাও।'

হঠাৎ হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে পড়ল ঝারকোভ, মাথাটা পেছন দিকে ঠেলতে লাগল, যতক্ষণ না দুই কাঁধের মাঝখানে গিয়ে মাথাটা ধাক্কা খেল, কর্কশকণ্ঠে এক অমানুষিক চিৎকার করে উঠল :

—'আমাকে মেরে ফেল, দাদারা...! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি তোমরা..? আঃ... আ..., আমাকে মেরে ফেল, দাদারা!'

॥ তিন ॥

স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে চলল গাড়ি, চাকার আওয়াজে তন্দ্রার ঢুলুনি আসে। হলদে আলোর রেখা ঠিকরে পড়ছে লণ্ঠন থেকে। বুট খুলে, পাদুটোকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে পড়তে খুবই আরাম লাগে, খুবই আরাম লাগে যখন নিজের আর কোনই দায়িত্ববোধ থাকে না, যখন জানা যায় জীবনের আর কোন আশঙ্কাই নেই, মৃত্যু অনেক দূরে সরে গিয়েছে। বিশেষ করে মধুর লাগে চাকার বিচিত্র শব্দ শুনতে, কারণ চাকার প্রতিটি আবর্তন, ইঞ্জিনের প্রতিটি গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রন্ট ক্রমশই পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। খালি পায়ের আঙুলগুলো নাচাতে নাচাতে, শুয়ে শুয়ে গ্রিগর শুনতে লাগল। নতুন পরিস্কার জামা কাপড়ে তার সারা দেহ উল্লসিত হয়ে উঠেছে। মনে হল, যেন নির্মল পরিচ্ছন্ন নতুন জীবনে ঢুকতে চলেছে।

তার শান্ত নির্জন আনন্দে বাধা পড়তে লাগল শুধু বাঁ-চোখের যন্ত্রণায়। যন্ত্রণাটা মাঝে মাঝে কমে যায়, তারপর হঠাৎ ফিরে আসে, আগুনের মত জ্বালা করে চোখে,

ব্যাণ্ডেজের নীচে চোখের জল ঝরায়। লড়াইএর হাসপাতালে এক কমবয়সী ইহুদী ডাক্তার তার চোখ পরীক্ষা করে তাকে বলেছিল :

—'ফিরে যেতে হবে তোমাকে। তোমার চোখের অবস্থা মোটেই ভাল নয়।'

—'নষ্ট হয়ে যাবে নাকি, ডাক্তারবাবু?'

—'ও কথা ভাবছ কেন তুমি?' গ্রিগরের গলার স্বরে সুস্পষ্ট আতঙ্কের আভাস পেয়ে হেসেছিল ডাক্তার। 'চিকিৎসা করাতে হবে তোমাকে, হয়ত অপারেশন করাও দরকার হতে পারে। তোমাকে পাঠিয়ে দেব পিটার্সবুর্গ কিংবা মস্কোতে। ভয় পেও না, ভাল হয়ে যাবে চোখ।' গ্রিগরের পিঠে চাপড় মেরেছিল সে, তারপর আস্তে টেনে এনেছিল বাইরে বারান্দায। পেছন ফিরতে ফিরতেই অপারেশনের জন্যে প্রস্তুত হয়ে জামার হাতাটা গুটিয়ে নিয়েছিল।

অনেক ঘোরাঘুরির পর গ্রিগর ঠাই পেল এক হাসপাতাল গাড়িতে। দিনের পর দিন শুয়ে কাটাল সে, শান্তিটুকু উপভোগ করল। সবটুকু শক্তি প্রয়োগ করে ঝরঝরে পুরনো ইঞ্জিনটা বিশাল গাড়িখানা টেনে নিয়ে চলল। মস্কোর কাছাকাছি এসে পড়ল, পেশছুল রাত্রিবেলায়। যারা হাঁটতে পারে তাদের জড়ো করা হল প্ল্যাটফর্মে। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে যে ডাক্তার এসেছিল সে গ্রিগবের নাম ধরে ডাকল, গন্তব্যস্থলের নির্দেশ দিয়ে তাকে এক নার্সের হাতে সপে দিল।

জামাকাপড় লটরপটর করতে করতে নার্সটি তাকে পথ দেখিয়ে স্টেশনের বাইরে নিয়ে এল। অনিশ্চিতভাবে তার পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল গ্রিগর। একটা দ্রোঝ্কি ভাড়া করে চেপে বসল দুজনে। বিরাট শহরের গর্জন, ট্রামের ঢনঢন ঘণ্টার আওয়াজ, বিজলিবাতির নীল আভা সব মিলে একেবারে চেপে ধরল তাকে। দ্রোঝ্কির পেছনটায় হেলান দিয়ে জনবহুল রাস্তাগুলোর দিকে জিজ্ঞাসু-চোখে তাকিয়ে রইল, নিজের পাশে এক নারীর উত্তেজিত দেহের অনুভূতি তার কাছে অদ্ভুত মনে হল। মস্কোয় শরৎ এসে পড়েছে, স্পষ্ট চোখে পড়ে। বড়রাস্তার দুই পাশে গাছের পাতাগুলো রাস্তায আলোয় হলদে দেখাচ্ছে, রাতের নিঃশ্বাসে কনকনে শীতের আভাস, রাস্তাগুলো ঝকঝকে, মাথার ওপরে শরতের তারাগুলো স্বচ্ছ, হিমশীতল। শহরের কেন্দ্র থেকে তারা মোড় ঘুরল একটা জনবিরল, ছোট রাস্তায়। রাস্তার পাথরে ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ উঠল, লম্বা নীল কোট গায়ে কোচোয়ানটা আসনে বসে দুলতে লাগল, মাঝে মাঝে ঘোড়ার লাগামের প্রান্ত ধবে টান মারতে লাগল। অনেক দূরে রেলের ইঞ্জিনের বাঁশি বেজে উঠল। গ্রিগর মনে মনে ভাবল, 'হয়ত ডনের দিকে একটা ট্রেন ছাড়ল।

একটা তিনতলা বাড়ির সামনে এসে তারা থামল। লাফিয়ে নামল গ্রিগর।

তার গায়ের ওপরে ঝুঁকে পড়ে সিস্টার বলল, 'তোমার হাতটা বাড়িযে দাও।'

হাতের মধ্যে তাব ছোট্ট হাতটা টেনে নিয়ে, গ্রিগর তাকে নামতে সাহায্য করল।

—'ঘামের বোঁটকা গন্ধ তোমার গায়ে।' নিঃশব্দে হাসল নার্সটি।

—'ওখানে যদি দিনকয়েক কাটাতে হত, সিস্টার, তাহলে তোমার গা দিয়ে অন্য কিছুর গন্ধ ছাড়ত।' চাপা রাগে গ্রিগর উত্তর দিল।

একজন বেয়ারা দরজা খুলে দিল। সোনালি কাজকরা রেলিং দেওয়া সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় এল তারা। পাশের একটা ছোট ঘরে ঢুকে গোল একটা টেবিলের ধারে বসল গ্রিগর, আর সাদা ওভার-অল পরা একজন স্ত্রীলোকের কানে কানে নার্সটি ফিসফিস করে কি যেন বলল। কয়েক মিনিট পরে একজন আর্দালি গ্রিগরকে নিয়ে এল স্নানের ঘরে। তার জামাকাপড়ও সাদা। সে নির্দেশ দিল :

—'জামাকাপড় খুলে ফেল!'

—'কি জন্যে?'

—'স্নান করতে হবে তোমাকে।'

জামাকাপড় খুলতে খুলতে গ্রিগর স্নানঘরের চারধারে তাকাতে লাগল, আর আর্দালিটা স্নানের টব জলে বোঝাই করে দিল, জলের তাপ দেখল, তারপর জলে নামতে বলল। ভাল করে রগড়াতে সাহায্য করল সে, তারপর তোয়ালে, সুতির কাপড়জামা, জুতো আর একটা বেল্ট দেওয়া ছাইরঙা ওভার-অল এনে দিল।

—'আমার জামাকাপড় কি হল?' অবাক হয়ে গ্রিগর জিজ্ঞেস করল।

—'এখানে থাকতে এইসব পরতে হবে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার সময় তোমার কাপড়চোপড় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

একটা দেয়ালে ঝোলানো আয়নার পাশ দিয়ে যেতে যেতে নিজেকে চিনতেই পারল না গ্রিগর। লম্বা, লালচে মুখ, গালের ওপর গাঢ় লাল ছোপ আর বেড়ে ওঠা গোঁফদাড়ি, পরনে ড্রেসিংগাউন, টুপির নীচে চাপা পড়া চুল—আগেকার গ্রিগর মেলেখফের সঙ্গে খুব কমই তার সাদৃশ্য। 'বয়স কমে গিয়েছে দেখছি,' গ্রিগর নিজের মনেই হাসল।

একটা ঘরে নিয়ে এল আর্দালি; কয়েক মিনিট পরে দরজা খুলল বিশাল বপু, কুৎসিৎ দর্শনা এক নার্স।

—'এবার তোমার চোখ দেখা হবে, মেলেখফ।' নীচু গলায় সে বলল, বাইরে আসার জন্যে সরে দাঁড়াল এক পাশে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে, যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে, আচমকা আঘাতে সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত করার উদ্দেশ্যে ফৌজী-নেতৃত্ব দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টে বড় রকমের একটা আক্রমণের সিদ্ধান্ত করল। পরিকল্পনা অনুযায়ী নেতৃবর্গ প্রচুর মালমসলা জড়ো করল, গোটা অঞ্চল জুড়ে প্রচুর অশ্বারোহী বাহিনী কেন্দ্রীভূত করা হল। তার মধ্যে ছিল ইউজেনে লিস্তনিৎস্কির রেজিমেণ্ট। আক্রমণ শুরু হবার কথা ছিল ১০ই আগস্ট, কিন্তু এক ঝড়বৃষ্টির জন্যে পিছিয়ে দেওয়া হল পরের দিন সকালের মত।

প্রায় মাইলদুয়েক এলাকা জুড়ে, ডানধারের পদাতিক বাহিনী শত্রুর কামানকে বিভ্রান্ত করার জন্যে লোক-দেখানো আক্রমণ শুরু করল। এক অশ্বারোহী ডিভিসনের কয়েকটি অংশকেও পাঠানো হল ভুল বুঝানো পথে।

যতদূর দৃষ্টি চলে, লিস্তনিৎস্কির রেজিমেণ্টের সামনে শত্রুর কোনরকম চিহ্নই চোখে পড়ল না। ইউজেনের চোখে পড়ল, মাইলখানেক দূরে ফেলে যাওয়া শত্রুর ট্রেঞ্চের সারি, তার পেছনে রাই ক্ষেত—হাওয়ায় তাড়ানো, ভোরের নীলচে কুয়াসায় ঢেউ তুলে উঠছে। শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই আক্রমণকারীদের নাস্তানাবুদ করার জন্যে রেখে গিয়েছে শুধু মেসিনগানের ঘাঁটি।

সূর্য উঠছে মেঘের আড়াল থেকে। মাখনের মত হলদে কুয়াসার বান ডেকেছে উপত্যকায়। নির্দেশ এল আক্রমণ শুরু করার, রেজিমেন্টগুলো এগিয়ে গেল। হাজার হাজার ঘোড়ার খুরে এক গুরু গুরু গর্জন উঠল, মনে হল, যেন সে গর্জন উঠল মাটির ভেতর থেকে। এক মাইল চলে এল তারা, আক্রমণকারী বাহিনীর লম্বা সার ফসলের ক্ষেতের কাছে এগিয়ে এল। রাই কোমর ছাড়িয়ে উঠেছে, লতানো গাছ আর ঘাসের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে ঘোড়সোয়ারদের এগিয়ে চলা অত্যন্ত কঠিন করে তুলল। তাদের সামনে মাথা তুলতে লাগল একটানা রাইএর লাল লাল শিষ, আর তারাই গোড়া ছিঁড়ে, ঘোড়ার খুরে থেঁতো হয়ে পেছনে পড়ে রইল। লিস্তনিৎস্কি তাকাল তার কোম্পানি কমাণ্ডারের দিকে; ক্যাপ্টেনের মুখে চূড়ান্ত হতাশার ছাপ।

ভীষণ কষ্ট করে চার মাইল পথ আসায় ঘোড়াগুলোর সব শক্তি ফুরিয়ে গেল; কেউ কেউ বসে পড়ল সওয়ার পিঠেই, সবচেয়ে তাগড়াই ঘোড়াও সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে চলতে গিয়েও হোঁচট খেতে লাগল। এখান থেকে শুরু হল অস্ট্রিয়ান মেশিন-গানের খেলা, বৃষ্টির মত ছুটে আসতে লাগল বুলেট। প্রচণ্ড প্রাণঘাতী গুলির তোড়ে সামনের সারি মাটিতে কচুকাটা হয়ে পড়ে গেল। সব প্রথমে থমকে দাঁড়িয়ে গেল একটা তাতার রেজিমেণ্ট, তারা পেছনে ফিরল; একটা কসাক রেজিমেণ্টও ভেঙে গেল। মেসিনগানের চাবুকের মুখে শুরু হয়ে গেল আতঙ্কবিহ্বল পলায়ন। এই-ভাবেই বিস্তৃত এলাকাজুড়ে অসাধারণ আক্রমণের পরিণতি হল চূড়ান্ত পরাজয়ে। কোন কোন রেজিমেণ্টের প্রায় আধাআধি মানুষ ঘোড়া খোয়া গেল। শুধু লিস্তনিৎস্কির রেজিমেণ্টেই হতাহত হল চারশ কসাক আর ষোলজন অফিসার।

পিঠে চড়া অবস্থাতেই মারা গেল ইউজেনের ঘোড়া, মাথায় আর পায়ে তারও চোট লাগল। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে এক সার্জেণ্ট-মেজর তাকে টেনে তুলল, জিনের ধনুকের ওপর তাকে ছুঁড়ে দিয়ে, নিয়ে চলে গেল ঘোড়া ছুটিয়ে।

কর্নেল গোলোভাচেভ্ নামে ডিভিসনের সর্বাধিনায়ক আক্রমণের কয়েকটা ফটো নিয়েছিল, পরে সে অফিসারদের দেখাতে লাগল সেগুলো। এক আহত সুবল্টার্ন ঘুসি মারল তার মুখে, তারপর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কসাকরা দৌড়ে ছুটে এল, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল গোলোভাচেভ্কে, তার দেহ নিয়ে লোফালুফি, অবশেষে রাস্তার ধারে এক গর্তের কাদার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। এই রকম শোচনীয়-ভাবেই শেষ হল আক্রমণ।

॥ দুই ॥

ওয়ারশ'র হাসপাতাল থেকেই ইউজেনে বাপকে জানাল, সে ছুটি পেয়েছে, ফিরে আসছে ইয়েগোদনয়ে। বুড়ো ঘরে গিয়ে দরজা দিল, বেরিয়ে এল আবার সেই পরের দিন। কোচোয়ান নিকিতিত্চ্কে হুকুম দিল দ্রোঝকির সঙ্গে টগবগে ঘোড়াটা যুততে, সকালের খাবার খেল, তারপর ছুটল ভিয়েশেনস্কায়। ছেলেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাল, টেলিগ্রামটা একটা ছোটখাট চিঠি, পাঠাতে খরচ পড়ল চারশ রুবল।

অবশ্য, লিখবার মত কিছুই নেই লিস্তনিৎস্কির জীবনে। জীবন বয়ে চলেছে আগের মতই, কোন বৈচিত্র্যই নেই; শুধু মুনিষের দাম বেড়েছে, মদের টান পড়েছে।

কর্তা আজকাল প্রায়ই মদ খান, খিটখিটে, খুঁতধরা স্বভাব হয়ে উঠেছে তার। একদিন আর্কাসিনিয়াকে সে ডেকে পাঠাল, অনুযোগ করল :

—'কাজকর্ম করছ না কেন মন দিয়ে? কালকে সকালের খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল কেন? বাসন পরিস্কার হয় না কেন? ফের যদি এ রকম হয়, তাহলে বরখাস্ত করব। নোংরামি একেবারে বরদাস্ত করতে পারি নে আমি। কানে যাচ্ছে?'

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে কেঁদে ফেলল আর্কাসিনিয়া।

—'নিকোলাই আলেক্সিভিচ।' ফুঁপিয়ে উঠল সে। 'মেয়েটার অসুখ করেছে। দেখাশোনার জন্যে একটু ছুটি দিন। ওকে ছেড়ে আসতে পারছি নে।'

—'কি হয়েছে বাচ্চাটার?'

—'দমবন্ধ হয়ে আসছে।'

—'কি? ডিপথেরিয়া? আগে বলো নি কেন? আহাম্মুখ? এক্ষুনি দৌড়ে গিয়ে নিকিতিতচকে বলো, গাড়ি ছুটিয়ে ডাক্তার ডেকে আনুক ভিয়েশেনস্কা থেকে। দৌড়ে যাও!'

পরদিন সকালে ডাক্তার নিয়ে এল নিকিতিতচ। ডাক্তার অচেতন, জ্বরতপ্ত শিশুটিকে পরীক্ষা করল, আর্কাসিনিয়ার অনুনয়বিনয়ে কর্ণপাত না করে সোজা হাজির হল মনিবের কাছে। বুড়ো তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল :

—'কি হয়েছে বাচ্চার?' ডাক্তারের অভিবাদনের উত্তরে নিস্পৃহভাবে মাথা নেড়ে সে জিজ্ঞেস করল।

—'ডিপথেরিয়া।'

—'ভাল হবে? আশা আছে?'

—'খুব কম! শ্বাস উঠেছে।'

—'আহাম্মুখ!' তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল বুড়ো। 'ডাক্তারি পড়েছিলে কি করতে? ভাল করে দাও ওকে।' ডাক্তারের মুখের ওপরে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল, পায়চারি করতে লাগল হল ঘরে।

টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকল আর্কাসিনিয়া। বলল :

—'ভিয়েশেনস্কায় ফিরে যাবার জন্যে ঘোড়া চাইছেন ডাক্তার।'

—'ওকে বল, ওর মাথায় গোবর পোরা!' গোড়ালিতে ভরদিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বুড়ো। 'বলো, বাচ্চা ভাল না হলে, একপাও নড়তে পারবে না এখান থেকে। একটা ঘর দাও থাকতে, খেতে দাও।' মুঠো নাচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল জানলার ধারে, মিনিটখানেক ধরে জানলায় আঙুল বাজাল, তারপর ফিরে দাঁড়াল তার ছেলের একখানা ফটোর দিকে, ধাই-এর কোলে শিশুর ফটো। দুপা পিছিয়ে দাঁড়াল, স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওই দিকে।

মেয়েটা অসুস্থ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর্কাসিনিয়া ধরে নিল, নাতালিয়াকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই তাকে শাস্তি দিচ্ছেন ভগবান। মেয়ের জীবনের আশঙ্কায় মুষড়ে গিয়ে নিজের ওপর সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলল সে, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কাজ করার উপায় রইল না তার। 'ভগবান নিশ্চয়ই কেড়ে নেবেন না ওকে!' মাথার ভেতরে অবিরত ঝাপটা মেরে ফিরতে লাগল এই জ্বরতপ্ত চিন্তা; আর এটা বিশ্বাস না করে, মেয়েটা মারা যাবে এই কথাটা সর্বশক্তি দিয়ে বিশ্বাস না করার চেষ্টা করে, দয়া ভিক্ষার জন্যে ভগবানের কাছে পাগলের মত প্রার্থনা করতে লাগল—মেয়েটার প্রাণটা যেন বাঁচে।

জ্বর কিন্তু ছোট্ট প্রাণটুকুর নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে দিতে লাগল। মেয়েটা শুয়ে রইল মার্বেল পাথরের মত, অনেক কষ্টে গলা দিয়ে ভাঙা ভাঙা কান্না বেরিয়ে আসতে লাগল। ডাক্তার দিনে চারবার করে তাকে দেখল, সন্ধ্যের সময় শরৎ আকাশের হিম-শীতল তারার দীপ্তির দিকে তাকিয়ে, চাকরদের মহলের সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক টানতে লাগল।

সারারাত বিছানার পাশে হাঁটুগেড়ে রইল আকসিনিয়া। শিশুর গলার ঘড়ঘড়ানিতে বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল।

—'কি হয়েছে, কি হয়েছে, মামণি,' আকসিনিয়া আর্তনাদ করতে লাগল, 'ধন আমার, আমায় ছেড়ে যেও না, তানিয়া। ও আমার মানিক! হায়, ভগবান, কেন...?'

শিশু মাঝে মাঝে চোখের পাতাদুটো খুলতে লাগল, রক্ত ফেটেপড়া দুই চোখে তার দিকে এক চঞ্চল, ধরা-ছোঁয়ার-অতীত দৃষ্টিতে তাকাল। উদ্‌গ্রীব হয়ে মা তার দৃষ্টির অনুসরণ করল। মনে হল, সে দৃষ্টি যেন নিজেতেই মগ্ন, সে দৃষ্টি বেদনার্ত, আত্মসমাহিত।

মায়ের কোলেই মারা গেল মেয়েটি। শেষবারের মত হাঁ হয়ে গেল ছোট্ট মুখখানি, শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। ছোট্ট মাথাটা মায়ের কোল ছাড়িয়ে পেছন দিকে বেঁকে গেল, মেলেখফ বংশের ছোট ছোট চোখে বিস্ময়মাখা এক বিষণ্ণ দৃষ্টি ফুটে উঠল।

বিলের ধারে এক পুরনো পপলার গাছের নীচে বুড়ো সাশ্‌কা ছোট্ট একটা কবর খুঁড়ল, কফিনটা বয়ে নিয়ে এল, অনাড়ির মত ব্যস্ততায় মাটি চাপা দিয়ে দিল; তারপর বহুক্ষণ ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল, কাদামাটির স্তূপ থেকে কখন আকসিনিয়া উঠবে। অবশেষে আর সে অপেক্ষা করতে পারল না, নাক ঝেড়ে আস্তাবলে চলে গেল। জাবনার ডানার নীচে থেকে টেনে বার করল অ-ডি-কোলোন আর মদের দুটো গলা-সরু বোতল, একটা বোতলে দুটোকে মেশাল, তারপর সেটা আলোর দিকে তুলে ধরতে ধরতে বিড়বিড় করে বলে উঠল :

—'তার স্মৃতিতে! ওই শিশুর জন্যে যেন স্বর্গের দরজা খুলে যায়। দেবশিশুর মৃত্যু হয়েছে!'

॥ তিন ॥

তিন সপ্তাহ পর ইউজেনে লিস্তনিৎস্কি টেলিগ্রাম করল, বাড়ি আসার জন্যে রওনা হয়েছে সে। তাকে আনার জন্যে স্টেশনে এক তিন-ঘোড়ার ত্রোইকা পাঠান হল। জমিদারির সকলের মনেই কি হয় কি হয় ভাব। হাঁস মুরগী মারা হল, সাশ্‌কা একটা ভেড়ার চামড়া ছাড়িয়ে রাখল। ছোটকর্তা এসে পৌঁছুল রাত্রে। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা বৃষ্টি ঝরছিল, মাঠের ওপর বাতির আলোর ছোট ছোট পলায়নপর রেখা আছড়ে পড়ছিল। সাশ্‌কার হাতে গরম কোটটা ছুঁড়ে দিয়ে, একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে, উত্তেজিত হয়ে ইউজেনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। বাপ ছুটে এল, চলতে গিয়ে চেয়ারগুলো এদিকওদিক ছটকে পড়ল।

খাবারঘরে রাতের খাবার বাড়ল আর্কাসিনিয়া, বাপ-ছেলেকে ডাকতে গেল। চাবির ফুটো দিয়ে দেখতে পেল, বুড়ো বাপ ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁধের ওপর চুমু খাচ্ছে, কাঁধদুটো থরথর করে কাঁপছে। মিনিট কয়েক অপেক্ষা করে আবার তাকাল। এবার ইউজেনে মেঝের ওপর ছড়ানো এক বিরাট ম্যাপের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছে। পাইপের ধোঁয়ার কুণ্ডলি ছাড়তে ছাড়তে, চেয়ারের হাতলে উল্টোপিঠ দিয়ে বুড়ো ঘা মারছে, আর রুদ্ধকণ্ঠে গর্জন করছে :

—'হতে পারে না, তা হতে পারে না! আমি বিশ্বাস করি না!'

বোঝানোর ভঙ্গিতে ম্যাপের ওপরে আঙুল চালাতে চালাতে ইউজেনে শান্ত গলায় উত্তর দিল। তার জবাবে বুড়ো বলল :

—'সে ক্ষেত্রে দোষ তোমার সুপ্রীম কমাণ্ডের। তাদের দৃষ্টিশক্তির অভাব। দেখ, ইউজেনে, ঠিক এই ধরনের ঘটনা বলছি রুশ-জাপান যুদ্ধের। বলছি! বলছি!'

দরজায় ঘা দিল আর্কাসিনিয়া। বুড়ো উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে এল, তার মনটা প্রফুল্ল, চোখদুটো যুবজনোচিত উৎসাহে চকচক করছে। ১৮৭৯ সালে ভাঁটি দেওয়া এক বোতল মদই খেয়ে ফেলল ছেলের সঙ্গে। আর্কাসিনিয়া পরিবেশন করতে করতে তাদের প্রফুল্ল মুখ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, তার নিজের নিঃসঙ্গতার কথাই ভীষণভাবে মনে পড়ে গেল। এক কান্নাবিহীন আর্তি বিক্ষত করে তুলল তাকে, কিন্তু চোখে জল এল না। কান্না ঠেলে এল গলায়, কিন্তু চোখ রইল শুকনো। আর তাই পাথরের মত কঠিন বেদনা, দ্বিগুণ ভারী হয়ে বুকে চেপে রইল। খুব ঘুমুতে লাগল সে, শান্তি খুঁজে পেল তন্দ্রাচ্ছন্ন চৈতন্যলুপ্তিতে, কিন্তু ঘুমের মধ্যেও মেয়ের ডাক কানে এসে পেঁাছায়। সে কল্পনা করে মেয়ে তার পাশেই শুয়ে আছে, ফিসফিস করে 'মা,' 'মা' বলে ডাকছে, তাই শুনে পাশ ফিরে আঙুলে বালিস খিমচে ধরে। হিমশীতল ঠোঁটে উত্তর দেয়, 'কি হয়েছে, ধন আমার।' দিনের প্রখর আলোতেও মাঝে মাঝে মনে হয়, মেয়েটা তার হাঁটুর কাছেই রয়েছে, নিজেই বুঝতে পাবে, কখন যেন তার হাতখানা এগিয়ে গিয়েছে মেয়ের কোঁকড়া চুলে হাত বুলাবার জন্যে।

॥ চার ॥

বাড়িতে আসার পর তিন দিনের দিন ইউজেনে সন্ধ্যে পর্যন্ত বুড়ো সাশকার সঙ্গে আস্তাবলে বসে ছিল, তার মুখ থেকে শুনেছিল, আগের দিনের ডন কসাকের মুক্ত স্বাধীন জীবনের কলাকৌশলহীন কাহিনী। রাত নটার সময় উঠে পড়ল সেখান থেকে। আঙিনার ওপর ঝড়ো বাতাস বইছে ; পায়ের নীচে প্যাচ প্যাচ করছে কাদা। মেঘের ফাঁকে উঁকি মারছে হলদে রেখা টানা ত্রয়োদশীর চাঁদ। চাঁদের আলোতেই ঘড়ি দেখল ইউজেনে, তারপর চাকরদের মহলের দিকে ফিরল। সিগারেট ধরানোর জন্যে সিঁড়ির কাছে একটু থামল, এক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল, তারপর কাঁধদুটোয় ঝাঁকুনি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। সন্তর্পনে খিলটা তুলে দরজা খুলল সে, ঢুকল গিয়ে আর্কাসিনিয়ার ঘরে, তারপর দেশলাই জ্বালল।

—'কে ওখানে?' গায়ে চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে আর্কাসিনিয়া জিজ্ঞেস করল।

—'আমি, আমি, রিস্তুনিংস্কি।'

—'দাঁড়ান, এক্ষুনি কাপড় পরে নিচ্ছি।'

—'দরকার নেই কষ্ট করার। দু এক মিনিট থেকেই চলে যাব।' ওভারকোটটা ফেলে দিয়ে বিছানার একপাশে বসল সে।

—'মেয়েটা তাহলে মারাই গেল......

—'মারা গেল...,' তার কথারই প্রতিধ্বনি করল আর্কাসিনিয়া।

—'বেশ পাল্টে গিয়েছ তুমি। বুঝতে পারি, মেয়ে মারা যাবার অর্থ তোমার কাছে কি। কিন্তু মনে হয়, অযথা নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ; তাকে তো আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না, তোমার বয়েস কম, এখনো অনেক ছেলেপুলে হবার সময় আছে। নিজেকে সামলাও, যা হারিয়েছ তার সঙ্গে আপোশ করে ফেল। মোট কথা, সব কিছু তো আর হারাও নি তুমি। গোটা জীবনটাই পড়ে আছে সামনে।'

আর্কাসিনিয়ার হাতে চাপ দিল সে, নীচু গলায় কথা বলতে বলতে আলিঙ্গনের মত অথচ কর্তৃত্বের ভঙ্গিতে গায়ে হাত বুলাতে লাগল। স্বর নীচু করে একেবারে ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল; আর্কাসিনিয়ার চাপা কান্না শুনতে পেয়ে ভেজা গাল আর চোখে চুমু খেতে শুরু করল।

দয়া আর করুণায় মেয়ে মানুষের মন সহজেই গলে যায়। নৈরাশ্যের বোঝার ভারে ক্লান্ত হয়ে, কি করছে না করছে বুঝতে না পেরে, তীব্র, সুপ্ত এক কামনায় আর্কাসিনিয়া নিজেকে ইউজেনের কাছে সঁপে দিল। কিন্তু এক অভূতপূর্ব, সর্বধ্বংসী পুলকের কালো তরঙ্গ অন্তরে ঝাপটা মারতেই তার সম্বিৎ ফিরে এল, সে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল; কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে, লজ্জা বিসর্জন দিয়ে, শুধু সায়া পরেই, অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে দৌড়ে বাইরে এসে, সিঁড়ির ওপর দাঁড়াল। দরজা খোলা রেখেই তার পেছনে পেছনে বেরিয়ে এল ইউজেনে, চলতে চলতে ওভারকোটটা গলিয়ে নিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আনন্দ আর তৃপ্তির হাসি হাসল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে নরম বুকখানা ঘসতে ঘসতে ভাবল: 'সৎ লোকের দিক থেকে বিচার করলে, আমি যা করেছি তা লজ্জাকর, দুরাচার। প্রতিবেশিনীর সতীত্ব নষ্ট করেছি। কিন্তু মোটকথা, আমি তো বাপু ফ্রন্টে জীবন বিপন্ন করেছি। গুলিটা যদি মাথায় লাগত, তাহলে এতদিনে পোকার খোরাক হয়ে থাকতাম। আজকালকার দিনে সবাইকেই বেঁচে থাকার প্রতি মুহূর্ত পরিপূর্ণ কামনা বাসনা নিয়েই বাঁচতে হবে।' নিজের ভাবনায় মুহূর্তের জন্যে সে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু তার কল্পনা আবার সেই আক্রমণের মুহূর্তটি জাগিয়ে তুলল, সেই যে কেমন করে মরা ঘোড়ার পিঠ থেকে উঠে দাঁড়াতেই গুলি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। ঘুমে ঢুলে পড়তে পড়তে সে মনে মনে ভাবল, 'কাল এ সম্পর্কে ভাববার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে, আজ শুধু ঘুম।'

॥ পাঁচ ॥

পরদিন সকালে খাবার ঘরে একলা পেয়ে ইউজেনে আকসিনিয়ার দিকে এগিয়ে গেল, তার মুখে অপরাধীর হাসি, কিন্তু দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে, আকসিনিয়া হাতদুটো বাড়িয়ে দিল, পাগলের মত ফিস ফিস করে বলে উঠল :

—'সরে যা শয়তান!'

জীবন তার অলিখিত আইন মানুষকে দিয়ে ঘাড় ধরিয়ে মানিয়ে নেয়। তিন দিনের মধ্যেই ইউজেনে আবার গেল আকসিনিয়ার ঘরে, আর আকসিনিয়া তাকে বাধাও দিল না।

নবম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

চোখের হাসপাতালের লাগোয়া একটা ছোট বাগান। এই ধরণের ছাঁটকাট করা, অস্বস্তিকর বাগান মস্কোর আশেপাশে অনেক আছে। শহরের পাথুরে, বুক চাপা রুক্ষতা থেকে চোখ সেখানে বিশ্রাম পায় না; তাদের দিকে যতই তাকান যায়, আরও তীব্র, আরও বেদনাদায়কভাবে ততই অরণ্যের বন্ধন-বিহীন স্বাধীনতার কথা স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। হাসপাতালের বাগানে শরতের শ্যাম সমারোহ। কমলা আর তামাটে রঙের ঝরা পাতায় পথ ঢেকে গিয়েছে, ফুলগুলো ভোরেব তুষারে কুঁকড়ে গিয়েছে, ঘাসজমিতে সজল, সবুজের বান ডেকেছে। আস্তিক মস্কোর গির্জার ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে শুনতে, রোগীরা রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে বাগানের পথে পথে পায়চারি করে বেড়ায। দিন যেদিন খারাপ থাকে (সে বছরে খারাপ দিনের সংখ্যাই বেশি), এঘর থেকে ওঘরে যায়, নয়ত নিজেরা ক্লান্ত হয়ে, অপরকে ক্লান্ত করে বিছানায় শুয়ে থাকে।

হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে বে-সামরিকের সংখ্যাই বেশি। একটা ঘরে আহত সৈনিকদের জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। তারা আছে পাঁচজন : জান্ ভারেইকিস্ নামে লম্বামত এক লাত্‌ভীয়—লাল মুখ, নীল চোখ; সুশ্রী তরুণ ড্রাগুণ ইভান ভ্রুব্‌লেভ্‌স্কি; কোশিখ্ নামে এক সাইবেরীয় সার্প-স্যুটর্; এক ছটফটে মঙ্গোলীয় সৈনিক আর গ্রিগর। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে আর একজন সংখ্যায় বাড়ল। সে এল দুপুরবেলায়, সন্ধ্যেবেলাই তার অপারেশন হয়ে গেল। অপারেশনের ঘরে নিয়ে যাবার কয়েক মিনিট পরেই অন্যান্য রোগীরা শুনতে পেল চাপা গানের সুর। ফাটা গোলার উড়ন্ত টুকরো লেগে থেঁতলানো একটা চোখের অবশিষ্টটুকু যখন সার্জেন সরাতে লাগল, তখন ক্লোরোফর্ম করা অবস্থাতেই সে গান গাইতে লাগল, খিস্তি করতে শুরু করল। অপারেশনের

পর, অন্যান্য সৈনিকেরা যেখানে আছে, সেই ওয়ার্ডে তাকে নিয়ে আসা হল। ক্লোরো-ফর্মের ঝোঁক কেটে যেতেই সবাইকে সে জানাল, সে আহত হয়েছে জার্মান ফ্রন্টে, তার নাম গারান্‌ঝা, মেসিনগান চালাত, বাড়ি ইউক্রেনের চোর্‌নিগোভ্‌ জেলায়। তার ঠিক পাশেই গ্রিগরের বিছানা। গ্রিগরের সঙ্গে সে বিশেষ দোস্তি পাতিয়ে ফেলল। সন্ধ্যের তদারকি শেষ হলে তারা নীচু গলায় বহুক্ষণ ধরে গল্প করতে লাগল।

—'বলি, আছ কেমন?' আলাপটা প্রথম শুরু করল সে-ই।

—'চোখে সরষের ফুল দেখছি।'

—'তোমার চোখে হয়েছে কি?'

—'ইনজেকশন নিতে হচ্ছে।'

—'কতগুলো নিলে?'

—'এ পর্যন্ত, আঠারটা।'

—'খুব ব্যথা লাগে?'

—'আরামও লাগে না খুব।'

—'ওদের বল, চোখটা তুলে ফেলতে।'

—'কেন? অন্ধ হতে চাইনে আমি।'

পাণ্ডুরোগে হলদে গ্রিগরের তেরিয়া মেজাজের প্রতিবেশী সবকিছুর ওপরেই অসন্তুষ্ট। সরকার, লড়াই, নিজের ভাগ্য, হাসপাতালের খাবার, বাবুর্চি, ডাক্তার সব-কিছুকেই—যা তার মুখে আসতে লাগল তাই বলে শাপান্ত বাপান্ত করতে লাগল।

—'আমরা চাষীরা লড়াই করতে গিয়েছি কিসের জন্যে, জানতে চাই সেই কথা?' তার মুখে এক কথা।

—'সবাই যে জন্যে গিয়েছে, সেই একই কারণে।'

—'দূর! তুমি একটা হাঁদারাম! অন্যের কথাই তোতাপাখির মত আওড়াচ্ছ। আমরা লড়ছি তো বুর্জোয়াদের জন্যে, বুঝতে পার না সেটা? বুর্জোয়া কারা? তারা ফলের গাছের পাখি।'

শক্ত কথাগুলো সে গ্রিগরকে বুঝিয়ে দিতে লাগল, লঙ্কার গুঁড়োর মত খিস্তি-শব্দগুলো কথার মধ্যে মিশিয়ে দিতে লাগল। গ্রিগরকে বাধা দিতে হল, 'অত তাড়াতাড়ি বলো না। তোমার ইউক্রেনী টান বুঝতে পারি নে ছাই। আর একটু স্পষ্ট করে বল।'

—'তেমন অস্পষ্ট করে বলছি না তো, হে। তুমি মনে কর, তুমি লড়ছ জারের জন্যে; কিন্তু জার লোকটা কে? কেউ নন তিনি, আর জারিনা হচ্ছেন একটা ছুঁচো; কিন্তু তাঁরা দুজনেই পিঠের ওপর বসে আছেন গ্যাঁট হয়ে। দেখতে পাও না সেটা? বসে বসে ভদ্‌কা গেলে কারখানার মালিকরা, আর উকুন বাছতে হয় সেপাইদের। মুনাফা গোনে ধনীরা, মজুর ফেরে শূন্য হাতে। এই তো আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা। গোলামি কর হে, কসাক, গোলামি কর! আরও গোটাকয়েক ক্রশ বাগাও!'

গ্রিগরের কাছে এ পর্যন্ত যা অজ্ঞাত ছিল, দিনের পর দিন সেই সত্য প্রকাশ করে চলল সে, যুদ্ধের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করতে লাগল, কঠোর বিদ্রূপ করতে লাগল স্বৈরাচারী সরকারকে। আপত্তি তুলবার চেষ্টা করল গ্রিগর, কিন্তু অতি সরল—মারাত্মক সরল প্রশ্ন দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিল গারান্‌ঝা, সায় দিতে বাধ্য হল গ্রিগর।

সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যা, তা হচ্ছে এই যে, গ্রিগর ভাবতে শুরু করল গারান্‌ঝা যা বলে তাই ঠিক, তার প্রতিবাদ করতে সে অক্ষম। আতঙ্কিত হয়ে সে বুঝল, এই বুদ্ধিমান, তেরিয়া মেজাজের ইউক্রেনের মানুষটি, জার, দেশ, কসাক হিসাবে তার

ফৌজীকর্তব্য—সবকিছু সম্পর্কে আর আগেকার সমস্ত ধারণা ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে ধূলিস্যাৎ করে দিচ্ছে। গারান্‌ঝা আসবার এক মাসের মধ্যেই, যার উপরে ভিত্তি করে গ্রিগরের সমগ্র জীবনটা গড়ে উঠেছিল, সেই গোটা চিন্তাধারাই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই পচন ধরেছিল তাতে, ঝরঝরে করে দিয়েছিল যুদ্ধের ভয়াবহ অবিচারের ঘুণে, প্রয়োজন ছিল শুধু একটি মাত্র ধাক্কার। সেই ধাক্কাই দেওয়া হল, গ্রিগরের মনের ঘুম ভাঙল। পথ খুঁজে পাবার জন্যে এপাশ ওপাশ করতে লাগল সে, তার অস্বস্তির সমাধান খুঁজতে লাগল, অবশেষে আনন্দের সঙ্গেই তা গারান্‌ঝার উত্তরের মধ্যে খুঁজে পেল।

॥ দুই ॥

একদিন গভীর রাত্রে গ্রিগর বিছানা ছেড়ে উঠল, গারান্‌ঝাকে জাগাল। উঠে গিয়ে গারান্‌ঝার খাটের ধারে বসল। জানলার ভেতর দিয়ে শরতের চাঁদের সবুজমত আলো আসছে। গারান্‌ঝার খাঁজকাটা গাল দুটো কালচে লাল, চোখের কালো কোটর দুটি ঘামে চকচক করছে। হাই তুলে, পা দুটো চাদরে ঢেকে নিল। একটু বিরক্ত হয়ে বলল :

—'ঘুমোও নি তুমি?'

—'ঘুমুতে পারছি না।' গ্রিগর উত্তর দিল, 'এই কথাটার উত্তর দাও। লড়াই জিনিসটা একজনের কাছে আশীর্বাদ, অন্যজনের কাছে অভিশাপ. তাই না?'

—'বেশ, তারপর?' হাই তুলল গারান্‌ঝা।

—'দাঁড়াও!' রাগে আগুন হয়ে গ্রিগর ফিসফিস করে বলল। 'তুমি বল, ধনীদের মুনাফার জন্যেই আমাদের পাঠান হচ্ছে মৃত্যুর মুখে। কিন্তু জনসাধারণ কি করে? তারা কি বোঝে না? এমন কেউ কি নেই—তাদের জানায়, গিয়ে বলে, 'ভাইসব. এই জন্যেই প্রাণ দিচ্ছ তোমরা?'

—'কি করে বলবে? বলো আমাকে! ধরো, তুমি গিয়ে বললে। এখানে আমরা খাঁচায় পোরা হাঁসের মত ফিসফিস করে কথা বলছি, কিন্তু চেঁচিয়ে বলত দেখি, গুলি খেয়ে মরতে হবে। জনাসাধারণ একেবারে বধির। তাদের জাগাবে এই লড়াই। ঝড়ের পর আসবে সুদিন।'

—'কিন্তু এ সম্পর্কে করতে হবে কি? তাই বলো, শয়তান! আমাকে একেবারে ওলট পালট করে দিয়েছ তুমি।'

—'যাদের ওলট পালট করতে পারি, তাদেরই ওলট পালট করি। বিনা দ্বিধায় তুমি বন্দুক ঘুরিয়ে ধরবে। মানুষকে যারা নরকে পাঠিয়েছে তাদের গুলি করে মারতে হবে। তারা কে তা জানো তুমি!' বিছানার ওপর উঠে বসল গারান্‌ঝা, দাঁতে দাঁত ঘসে, হাতদুটো বাড়িয়ে দিল, 'বিশাল এক তরঙ্গ উঠবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তাদের সবাইকে।'

—'তাহলে, তুমি বলছ, সবকিছু ওলট পালট করে ফেলতে হবে?'

—'পুরনো কম্বলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে এই সরকারকে। চামড়া ছুলে নিতে হবে প্রভুদের, কারণ, ইতিমধ্যে বহুদিন ধরেই বহু মানুষ খুন করেছে ওরা।'

—'নতুন সরকার যখন হাতে পাবে, তখন লড়াইএর কি করবে তোমরা? ওরা তো লড়াই চালিয়েই যাবে, আমরা যদি না লড়ি, তখন আমাদের ছেলেরা লড়বে। যুগ যুগ ধরে মানুষ লড়াই করে আসছে, তখন কি করে লড়াইএর গোড়া তুলে ফেলবে, কি করে ধ্বংস করবে তাকে?'

—'কথাটা ঠিক, সৃষ্টির আদি থেকেই লড়াই চলে আসছে, আমাদেরও তাই করতে হবে, যদি না, আমরা সরকার নামে এই পাপটাকে ঝেঁটিয়ে তাড়াতে পারি। কিন্তু যখন প্রতিটি সরকার মেহনতী মানুষের সরকার হবে, তখন কেউ আর লড়াই করবে না। আমাদের করতেও হবে তাই। যখন জার্মান, ফরাসী এবং আর সকলেই চাষীমজুরের সরকার গড়ে তুলবে, তখন লড়াই হবে কি নিয়ে? দূর হয়ে যাবে সীমান্তের বাধা, দূর হবে রাগ, দ্বেষ। আঃ...।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল গারান্‌ঝা। জুলপির ডগা দুটো পাকাতে পাকাতে স্বপ্নাচ্ছন্নের মত হাসল, একটা চোখ চকচক করে উঠল। 'গ্রীস্‌কা! সেই দিনটি দেখার জন্যে আমার রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরাতে পারি।'

ভোর হয়ে আসা পর্যন্ত কথা চলল তাদের ভোরের ধূসর ছায়ায় এক অস্বস্তিকর ঘুমে ঢুলে পড়ল গ্রিগর।

॥ তিন ॥

সেপ্টেম্বর, অক্টোবর কেটে গেল। একঘেয়ে দিনগুলো কাটতে লাগল একের পর এক। সকাল নটায় রোগীদের এক কাপ চা দেওয়া হয়, এপাশ থেকে ওপাশ দেখা যায় এরকম দু চিলতে ফরাসী রুটি আর নখের ডগার মাপে মাখনের টুকরো। দুপুরের খাওয়ার পরও খিদে থেকে যায় তাদের। সন্ধ্যেবেলায় আবার সেই চা, একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে ঢকঢক করে এক গ্লাস জল খাওয়া। ফৌজী ওয়ার্ডে রোগীদের পরিবর্তন হল। প্রথমে গেল সাইবেরীয়টি, তারপর লাতভীয়। গ্রিগর ছাড়া পেল অক্টোবরের শেষ দিকে।

হাসপাতালের সার্জেন গ্রিগরের চোখ পরীক্ষা করে বললেন, চোখের দৃষ্টি ভালই আছে। কিন্তু হঠাৎ তার মাথার ঘা পেকে অল্প অল্প পুঁজ গড়ানোয় বদলি করে দেওয়া হল আর এক হাসপাতালে। গারান্‌ঝার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় গ্রিগর বলল :

—'আর কি দেখা হবে?'

—'দুটো পাহাড় কখনো এক জায়গায় হয় না।'

—'বেশ, হোখোল, আমার চোখ খুলে দিয়েছ তুমি, তার জন্যে ধন্যবাদ। এখন আমি দেখতে পাচ্ছি। আমি তো অতশত জানি না।'

—'রেজিমেণ্টে যখন ফিরে যাবে, যা বলেছি, কসাকদের বলো।'

—'নিশ্চয়ই বলব।'

—'যদি কখনো কোরানিখোভ্ জেলায় যাও, গোরোখোভ্‌কায় খোঁজ করো কর্মকার আঁদ্রেই গারান্‌ঝার. দেখা হলে খুবই খুশী হব। আচ্ছা এসো, ছোকরা!'

তারা আলিঙ্গন করল। একটা মাত্র চোখ, মুখ থেকে আড়াআড়ি গালের ওপর

পর্যন্ত ঝুলে যাওয়া খুশী খুশী রেখাগুলো—ইউক্রেনের গারান্‌ঝার এই ছবিটা বহুদিন জেগে রইল গ্রিগরের স্মৃতিতে।

॥ চার ॥

দ্বিতীয় হাসপাতালে গ্রিগরকে দশদিন কাটাতে হল। মনে মনে সে অনির্নীত সিদ্ধান্তগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। তার মধ্যে গারান্‌ঝার উপদেশের ধ্বংসাত্মক বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে; তার ধারণাগুলো গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। তার ওয়ার্ডের প্রতিবেশীর সঙ্গে সে খুবই কম কথাবার্তা বলে। তার চলাফেরার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল এক ধরনের সতর্ক সাবধানতা। জ্বরের ঘোরে দিনকতক পড়ে রইল, বিছানায় শুয়ে শুয়ে কানের ভেতরে ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনতে লাগল।

এক খানদানি মহিলা—রাজপরিবারের একজন—হাসপাতালে দর্শন দিতে এলেন। আসার খবর পেয়ে হাসপাতালের লোকজন সকালবেলায় ছুটোছুটি শুরু করে দিল, ধানের গোলায় আগুন লাগলে ইঁদুরের পাল যেমন করে ছুটোছুটি করে। আহতদের নতুন করে ধুয়েমুছে দেওয়া হল, নির্দিষ্ট সময়ের আগে বিছানার চাদরগুলো পাল্টানো হল। কিভাবে কথার জবাব দিতে হবে, কিভাবে ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে হবে, এমনকি তাও এক অল্পবয়সী ডাক্তার রোগীদের শিখিয়ে পড়িয়ে দিল। রোগীদের মধ্যেও উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়ল, এবং নির্দিষ্ট সময়ের বহু আগে থেকেই কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে ফিসফাস শুরু করে দিল। দুপুরের দিকে সদরদরজার কাছ থেকে মোটরের হর্ন শোনা গেল, আর কর্মচারী, অফিসারদের চিরাচরিত সংখ্যায় পরিবৃত হয়ে খানদানি মহিলাটি হাসপাতালের গেটের মধ্যে দিয়ে ঢুকে পড়লেন। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরতে লাগলেন তিনি, বোকা বোকা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—সে ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা তাঁর মত খানদানি বংশ আর সমাজের লোকেরই বৈশিষ্ট্য। আহতরা ড্যাবডেবে চোখে ছোট ডাক্তারের শেখানো মত যথাযথ উত্তর দিল। 'ঠিক বলেছেন, রানীমা,' কিংবা 'মোটেই না, রানীমা।' দুমুখো নিড়ুনির কাঁটায় বেঁধানো মেটে সাপের মত আঁকুপাকু করতে করতে বড় ডাক্তার তাদের উত্তরের ভাষ্য করে যেতে লাগল। রাজপরিবারের মহিলাটি আহত সেপাইদের মধ্যে ছোট ছোট আইকন বিতরণ করলেন। ঝলমলে উর্দি আর দামী খোসবায়ের একটা ঢেউ এগিয়ে এল গ্রিগরের দিকে। দাড়ি-না-কমানো মুখ, শুকিয়ে যাওয়া দেহ, জ্বরতপ্ত দেহ—গ্রিগর দাঁড়িয়ে রইল তার বিছানার পাশে। চোয়ালের বাঁকা হাড়ের ওপরকার বাদামি চামড়ার ঈষৎ কম্পনে ধরা পড়ল মনের উত্তেজনাটুকু।

—'এই হচ্ছেন ওঁরা!' গ্রিগর মনে মনে ভাবছিল। 'ওঁদের ফুর্তির জন্যে গ্রাম, দেশ থেকে তাড়িয়ে এনে আমাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুর মুখে। রক্তচোষার দল! মরুক সব! ওরা ছারপোকার জাত, পিঠে লেগে রয়েছে আমাদের। ওদের জন্যেই কি অপরের ফসলের ক্ষেত ঘোড়ার খুরে মাড়িয়ে দিয়েছি, যাদের চিনি না কোনদিন, খুন করেছি তাদের? ফসলকাটা মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে চিৎকার করে কেঁদেছি? আর আমাদের আতঙ্ক? ঘরসংসার থেকে আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে, ব্যারাকে উপোস করিয়ে রেখেছে। ওরা ওদিকে গণ্ডেপিণ্ডে গিলে ভুঁড়ি বাগিয়েছে! আমি তোদের

সেইখানে পাঠাব, বদমাসের দল! ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে বন্দুক হাতে দেব, উকুনে বোঝাই করে দেব, পচা রুটি আর পোকাপড়া মাংস গেলাব!'

অফিসারদের দলবলের ওপর থেকে ঘুরে গ্রিগরের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রাজপরিবারের মহিলাটির ফুলো ফুলো, ঝুলে-পড়া গালদুটোর ওপর।

—'ডন কসাক, সেণ্ট জর্জ ক্রশ।' গ্রিগরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাতে দেখাতে টেনে টেনে বড় ডাক্তার হাসল; তার গলার স্বরে মনে হল, ক্রশটা যেন সে-ই পেয়েছে।

—'কোন জেলা?' আইকনটা বাগিয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করলেন ভদ্রমহিলা।

—'ভিয়েশেনস্কা, রানীমা।

—'কি করে ক্রশটা পেলে?'

ভদ্রমহিলার স্বচ্ছ শূন্যদৃষ্টিতে চাপা রইল ক্লান্তি আর তৃপ্তিটুকু। তাঁর বাঁ-চোখের ভুরুটা জোর করে, ওপরের দিকে টেনে তোলা, মুখের ভঙ্গিটাকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যে এটা ইচ্ছে করেই করা। মুহূর্তের জন্যে গ্রিগরের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল, এক অদ্ভুত অনুভূতি জেগে উঠল ভেতরে ভেতরে। আক্রমণের মুখে এগিয়ে যাবার সময়ও এই ধরনের অনুভূতি জেগেছিল তার। ঠোঁটদুটো বেঁকে উঠল, থরথর করে কাঁপতে লাগল, থামাতে পারা গেল না।

—'মাফ করবেন...আমার ভীষণ...রানীমা...এই একটু দরকার।' ভেঙে পড়ার মত টলতে লাগল গ্রিগর, আঙুল দিয়ে বিছানার নীচেটা দেখিয়ে দিল।

আরও উঁচুতে উঠল ভদ্রমহিলার বাঁ-চোখের ভুরু। গ্রিগরের দিকে অর্ধেক বাড়িয়ে দেওয়া আইকন-ধরা হাতটা জমে শক্ত হয়ে উঠল। অসন্তোষ মাখানো ঠোঁটদুটো বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল। পাশের এক পাকা-চুল জেনারেলের দিকে তাকালেন ভদ্রমহিলা, কি যেন ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর পেছনে ভীড় করা দলবল এক দুর্বোধ্য অস্বস্তিতে বিব্রত হয়ে উঠল। তকমার নীচে ধবধবে শাদা দস্তানা গোঁজা লম্বা মত এক অফিসার আড়চোখে তাকাল, দ্বিতীয় একজন বোকার মত তাকিয়ে রইল; তৃতীয় একজন জিজ্ঞাসু-চোখ তার পাশের জনের দিকে তাকাল। পাকা-চুল জেনারেল সসম্ভ্রমে হাসল, রানীমাকে ইংরিজিতে উত্তর দিল। খুশী হয়ে তিনি আইকনটা গ্রিগরের হাতে গুঁজে দিলেন, এমন কি তাকে দিলেন সবচেয়ে বড় সম্মানটুকু—তার কাঁধে একটু হাতের ছোঁয়া।

অতিথিরা চলে যাবার পর গ্রিগর বিছানার ওপর ভেঙে পড়ল, বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল মিনিট কয়েক, কাঁধদুটো কাঁপতে লাগল। সে কাঁদতে লাগল, না, হাসতে লাগল, তা বলা কঠিন। তবে এটা ঠিক যে, যখন উঠল, তখন তার চোখদুটো শুকনো। সঙ্গে সঙ্গেই তার ডাক পড়ল বড় ডাক্তারের ঘরে।

—'তুমি একটা অজ চাষা।' ডাক্তার আঙুলে দাড়িটা মুঠো করে শুরু করল।

—'আমি অজ চাষা নই, ইতর-লোক আপনি!' লম্বা লম্বা পা ফেলে ডাক্তারের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে উত্তর দিল গ্রিগর। 'আপনাকে তো আর ফ্রণ্টে যেতে হয় না।' তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'বাড়ি পাঠিয়ে দিন আমাকে।'

ঘুরে দাঁড়াল ডাক্তার, লেখার টেবিলের কাছে যেতে যেতে আরও ভদ্রকণ্ঠে বলল :

—'পাঠিয়ে দিচ্ছি! চুলোয় যাও তুমি!'

বাইরে চলে এল গ্রিগর, হাসিতে কাঁপতে লাগল ঠোঁটদুটো, চোখদুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। রাজপরিবারের মহিলার সামনে এ হেন বর্বরোচিত,ক্ষমার অযোগ্য আচরণের জন্যে তিনদিন খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল গ্রিগরের। কিন্তু খাবার যুগিয়ে গেল বাবুর্চি আর তার সঙ্গীরা।

॥ পাঁচ ॥

নভেম্বর মাসের সতের তারিখের সন্ধ্যায় গ্রিগর তার জেলার প্রথম গ্রামে এসে পেঁাছুল। রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে কানে এল কসাক গান, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নদীর ধারে বসে গাইছে। চির পরিচিত গানের কথাগুলো শুনতে শুনতে এক হিমশীতল অনুভূতি বুকের ভেতরটায় আঁকড়ে ধরল, চোখদুটো কঠিন হয়ে উঠল। চিমনি থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে, লম্বালম্বা পা ফেলে গ্রামের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলল। পেছনে পেছনে ভেসে আসতে লাগল সেই গান।

—'ওই গান আমিও একদিন গাইতাম, কিন্তু আজ গলায় সুর নেই, জীবনে সে গানের তাল কেটে গিয়েছে। আজ আমি চলেছি আর একজনের বৌ নিয়ে ঘর করতে, নিজের বিশ্রামের কোন ঠাঁই নেই, কোন ডেরা নেই, যেন ঠিক নেকড়ের মত।' ক্লান্তভাবে এক তালে পা ফেলতে ফেলতে সে ভাবতে লাগল, তার ভুলপথে চলা বন্য জীবনের কথা ভেবে তিক্ত হাসি হাসল। গ্রামটা পেরিয়ে এল, পাহাড়ের মাথায় উঠে একবার পেছনে তাকাল। শেষ বাড়িটার জানলার ভেতর দিয়ে একটা ঝোলানো বাতির হলদে আলো এসে পড়েছে, সেই আলোয় দেখতে পেল, এক বুড়ী বসে বসে চরকা কাটছে।

রাস্তার পাশে পাশে ভিজে, বরফ মাখা ঘাসের ওপর দিয়ে চলতে লাগল সে। একটা ছোট গ্রামে রাত কাটিয়ে দিল, আঙ্গিনায় ভোরের আলো ফুটে উঠতেই রওনা হল আবার। ইয়াগোদনয়ে পেঁাছুল ঠিক সন্ধ্যের সময়। বেড়াটা লাফিয়ে পার হয়ে আস্তাবলের পাশ দিয়ে চলতে লাগল। সাশ্‌কার কাশির শব্দ কানে আসতেই দাঁড়িয়ে গেল। চেঁচিয়ে ডাকল :

—'সাশ্‌কা, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?'

—'কে রে? চিনি চিনি মনে হচ্ছে গলাটা। কে হে?'

লম্বাকোটটা কাঁধের ওপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সাশ্‌কা।

—'জয় ভগবান!. গ্রীস্‌কা যে? বলি, তুমি এলে কোত্থেকে?'

আলিঙ্গন করল দুজনে। গ্রিগরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সাশ্‌কা বলল :

—'ভেতরে এসো, তামাক খাও।'

—'না, এখন না। কাল খাব। আমি..'

—'এসো না, বলছি।'

অনিচ্ছাসত্বেও গ্রিগর পেছনে পেছনে ঢুকল। বসল একটা কাঠের চৌকির ওপর, আর বুড়ো কাশির দমক সামলাতে লাগল।

—'তা হলে, এখনো টিকে আছো দেখছি। এখনো হেঁটে চলে বেড়াচ্ছ?'

—'আমি একেবারে পাথরের মত শক্ত। ক্ষয় হয় না আমার।'

—'আকসিনিয়া কেমন আছে?'

—'আকসিনিয়া? তা, ভালই আছে?'

ভীষণ কেশে উঠল বুড়ো। গ্রিগর বুঝতে পারল, অস্বস্তি ঢাকবার জন্যে এটা বুড়োর অছিলা।

—'কোথায় কবর দিয়েছ তানিয়াকে?'

—'বাগানের মধ্যে একটা পপলার গাছের নীচে।'

—'তা বেশ, সব খবর বল?'

—'কাশিটা বড়ই কষ্ট দিচ্ছে, গ্রীসকা।'

—'তারপর?'

—'বে'চেবর্তে আছি সবাই। কর্তার মদ খাওয়া একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছে।'

—'আকসিনিয়া কোথায়?'

—'আছে চাকরদের মহলেই। একটু তামাক খেলে পারতে। এইটে টেনে দেখ, একেবারে সেরা।'

—'তামাক খেতে চাই নে। বলো, নয়ত, বেরিয়ে যাব...।' শরীরের সমস্ত ভর দিয়ে ঘুরে বসল গ্রিগর, মচমচ করে উঠল চৌকিটা। 'মনে হচ্ছে, কিছু লুকোচ্ছ তুমি। বলে ফেল!'

—'তাই বলব! চুপ করে থাকার মত শক্তি নেই আমার, গ্রীসকা; আর চুপ করে থাকাটাও লজ্জার ব্যাপার।'

—'বলো, তাহলে।' বুড়োর কাঁধের ওপর আদরের ভঙ্গিতে হাত দুখানা রেখে গ্রিগর বলল। পিঠ বে'কিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল সে।

—'একটা সাপ পুষে রেখেছ তুমি।' কর্কশ সরু গলায় হঠাৎ চে'চিয়ে উঠল সাশ্‌কা। 'দুধকলা দিয়ে একটা সাপ পুষেছ? আজকাল সে রঙ্গ জুড়েছে ইউজেনের সঙ্গে।'

বুড়োর চোয়াল বেয়ে কফের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। সেটা মুছে নিয়ে, পা-জামায় ঘসে হাতটা পরিষ্কার করল।

—'সত্যি কথা বলছ?' গ্রিগর জিজ্ঞেস করল।

—'নিজের চোখে দেখা। রোজ রাত্রে ইউজেনে যায় ওর ঘরে। মনে হয়, এখনও আছে তার ঘরে।'

—'তা, বেশ!' দাঁত দিয়ে নখ খু'টতে লাগল গ্রিগর, অনেকক্ষণ ঘাড়-কু'জো হয়ে বসে রইল, মুখের পেশিগুলো কু'চকে কু'চকে উঠতে লাগল।

—'মেয়েমানুষ হচ্ছে বেড়ালের জাত।' সাশ্‌কা বলে উঠল। 'যে সুড়সুড়ি দেবে তার গায়েই পিঠ ঘসবে। বিশ্বাস করতে নেই ওদের।'

একটা সিগারেট পাকিয়ে গ্রিগরের হাতে গু'জে দিল সে। বলল, 'খাও।'

সিগারেটে গোটাকয়েক টান দিল গ্রিগর, তারপর নিভিয়ে ফেলল আঙুলে চেপে। একটাও কথা না বলে বেরিয়ে এল। ভীষণভাবে হাঁপাতে হাঁপাতে চাকরদের মহলের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বারকয়েক হাত তুলল ঘা মারার জন্যে, কিন্তু প্রতিবারই তার হাতটা যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। অবশেষে যখন ঘা মারল, তখন প্রথমে টোকা মারল আঙুল দিয়ে, তারপর ধৈর্যহারা হয়ে দেয়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, হাতের মুঠো দিয়ে পাগলের মত জানলার কাচে আঘাত করতে লাগল। সে আঘাতে জানলার কাচ ঝন ঝন করে বেজে উঠল, রাত্রির নীলচে আলো কাচের গায়ে ক'পে কে'পে উঠল।

এক লহমার জন্যে আকসিনিয়ার ভয়ার্ত মুখখানা জানলায় ভেসে উঠল, তারপর দরজা খুলে দিল সে। গ্রিগরকে দেখতে পেয়ে চে'চিয়ে উঠল। গ্রিগর জড়িয়ে ধরল তাকে।

—'এত জোরে ঘা মেরেছ, ভয় পেয়ে গিয়েছি আমি। তুমি, তা ভাবতে পারি নি। ওগো...'

—'জমে গিয়েছি ঠান্ডায়।'

আকসিনিয়া টের পেল, গ্রিগরের সারা দেহ ঠকঠক করে কাঁপছে, কিন্তু হাতদুটো জ্বরো রোগীর মত গরম। আকসিনিয়া অকারণ ঘরের মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে লাগল, আলোটা জ্বালল, কাঁধের ওপরে একটা শাল জড়িয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিল।

—'তুমি আসবে তা ভাবতেও পারিনি। সেই কবে শেষ চিঠি লিখেছ। ভেবেছিলাম, তুমি আর আসবেই না। আমার শেষ চিঠিটা পেয়েছিলে? একটা পুঁটুলি পাঠাতে যাচ্ছিলাম তোমাকে, কিন্তু পরে ভাবলাম, দেখি কোন চিঠি পাই কিনা...।'

গ্রেটকোটটা না খুলেই গ্রিগর বেঞ্চের ওপর ধপ্ করে বসে পড়ল। দাড়ি না-কামানো গালদুটো জ্বালা করছে, গ্রেটকোটের টুপির একটা বড়সড় ছায়া পড়েছে। সে টুপিটা খুলছিল, কিন্তু হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে তামাকের থলিটা নাড়াচাড়া করতে লাগল, কাগজের জন্যে পকেট হাতড়াতে লাগল। এক অবোধ্য আর্তিতে আকসিনিয়ার মুখে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

মনে হল, তার অনুপস্থিতিতে রাক্ষুসে রূপ খুলেছে আকসিনিয়ার। তার অপরূপ মাথাটা খাড়া করে চলার মধ্যে এক নতুন, ভারিক্কী ঢং এসেছে, শুধু চোখদুটো আর কাঁপানো চুলের কুণ্ডনগুলো আগের মত আছে। তার কুলমজানো, আগুনজ্বলা রূপ এখন আর গ্রিগরের নয়। মনিবের ছেলের রক্ষিতা, এখন তার হওয়া কঠিনই বটে! গ্রিগর টিপ্পুনি কাটল :

—'তোমাকে আর ঝিয়ের মত দেখাচ্ছে না, বাড়ির গিন্নীর মত দেখাচ্ছে।'

চমকে উঠে আকসিনিয়া গ্রিগরের দিকে তাকাল, জোর করে একটু হাসল।

ফৌজী-থলিটা টানতে টানতে গ্রিগর দরজার দিকে এগুলো।

—'কোথায় যাচ্ছ?'

—'তামাক টানতে।'

সিঁড়ির ওপর এসে থলিটা খুলল গ্রিগর, থলির নীচে থেকে টেনে বার করল পরিষ্কার একটা সার্টে সযত্নে জড়ানো, হাতে আঁকা একখানি রুমাল। দুই রুবল দাম দিয়ে রুমালখানা কিনেছিল ঝিতোমিরের এক ইহুদি-ফেরীওয়ালার কাছ থেকে। চোখের মণির মত সযত্নে রেখে দিয়ে ছিল, মাঝে মাঝে টেনে বার করত, রুমালের রামধনু রঙের জলুষ দেখে খুশী হয়ে উঠত, আগে ভাগেই অনুভব করবার চেষ্টা করত, যখন আকসিনিয়ার চোখের সামনে মেলে ধরবে তখন সে কেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে। অকিঞ্চিৎকর উপহার! বড়লোক জমিদারের ছেলের উপহারের সঙ্গে কি আর সে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারে? চাপা কান্নার বেগ জোর করে চাপতে চাপতে রুমালখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল, ছেঁড়া টুকরোগুলো সিঁড়ির নীচে ঠেলে দিল। থলিটা বারান্দার বেঞ্চের ওপর ফেলে রেখে গ্রিগর ফের গিয়ে ঘরে ঢুকল। আকসিনিয়া বলল :

—'তুমি বসো, গ্রীসকা, বুট খুলে দিচ্ছি তোমার।'

কাজ না করে করে পরিষ্কার ধবধবে হয়ে উঠেছে আকসিনিয়ার হাত দুখানা। গ্রিগরের ভারী ফৌজীবুট ধরে সে টানাটানি শুরু করে দিল। তার হাঁটুতে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ধরে নিঃশব্দে কাঁদল। প্রাণভরে কেঁদে নিতে দিল গ্রিগর, তারপর জিজ্ঞেস করল :

—'কি হয়েছে তোমার? ফিরে আসায় খুশী হওনি নাকি?'

বিছানায় শুয়ে, তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল গ্রিগর। আকর্সিনিয়া জামাকাপড় ছাড়ল, তারপর সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়াল। সেখানে সেই ঠাণ্ডায়, কনকনে বাতাসে ভেজা থাম জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে। মাথার ওপরে উত্তুরে হাওয়ার ঝাপটের মরণ-সঙ্গীত। ভোর না হওয়া পর্যন্ত সে একভাবে, একঠাঁই দাঁড়িয়ে রইল।

॥ ছয় ॥

সকালবেলায় গ্রেটকোটটা কাঁধের ওপর আড়াআড়ি ফেলে গ্রিগর গেল কর্তার মহলে। বুড়ো কর্তা দাঁড়িয়ে ছিল সিঁড়ির ওপরে, গায়ে একটা লোমের জ্যাকেট, মাথায় হলদে অস্ত্রাখান টুপি।

—'আরে, এই যে আমাদের সেণ্ট জর্জের বীরপুরুষ! কিন্তু তুমি যে সত্যিকারের মরদ, দোস্তু!'

গ্রিগরকে স্যালুট করল সে, তারপর হাতটা বাড়িয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল :

—'থাকবে কিছুদিন?'

—'দু সপ্তাহ, হুজুর।'

—'কবর—দিলাম তোমার মেয়ের। দুঃখের...সত্যিই দুঃখের...'

চুপ করে রইল গ্রিগর। দস্তানা হাতে গলাতে গলাতে সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়াল ইউজেনে।

—'আরে, গ্রিগর যে? তুমি হাজির হলে কোত্থেকে?'

গ্রিগরের চোখে কালো ছায়া ঘনিয়ে এল, কিন্তু সে হাসল :

—'ছুটিতে এলাম, মস্কো থেকে।'

—'তোমার চোখে চোট লেগেছিল, তাই না? আমি শুনেছি তা। কি রকম ওস্তাদ হয়ে উঠেছে গ্রিগর, তাই না, বাবা?'

গ্রিগরের দিকে মাথা ঝুঁকাল সে, তারপর কোচোয়ানকে ডাকতে ডাকতে আস্তাবলের দিকে এগুলো :

—'ঘোড়া যোত, নিকিতিত্চ্!'

ঘোড়াটাকে সাজ পরানো শেষ হল নিকিতিত্চের। গ্রিগরের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে টগবগে ধূসর রঙের ঘোড়াটাকে নিয়ে এল সিঁড়ির কাছে। হাল্কা দ্রোঝ্কির চাকার নীচে তুষার জমা মাটি গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।

—'আপনার গাড়ি আজ আমাকে চালাতে দিন, হুজুর, আগেকার মত।' ইউজেনের দিকে ফিরে অনুনয়ের ভঙ্গিতে হাসল গ্রিগর।

—'বেচারী ভাবতেও পারছে না।' তৃপ্তির হাসি হেসে ইউজেনে মনে মনে ভাবল, প্যাঁস্নের আড়ালে তার চোখদুটো চকচক করে উঠল। সম্মতি দিল সে :

—'বেশ, ওঠ গাড়িতে।'

—'আরে একি, এই ত এলে, আর এরই মধ্যে ফেলে চললে তোমার যুবতী বৌকে!' উদার হাসি হাসল লিস্তনিৎস্কি।

গ্রিগরও হেসে উঠল। উত্তর দিল :

—'বৌ ত আর ভালুক নয়। জঙ্গলে পালিয়ে যাবে না।'

কোচোয়ানের আসনে গিয়ে বসল সে। চাবুকটা নীচে গুঁজে রেখে, লাগাম তুলে নিল হাতে।

—'আজ একখানা চালাব, ইউজেনে নিকোলাইভিচ!'

—'ভালো করে চালাও, চা খাওয়ার পয়সা পাবে।'

—'এরই মধ্যে ধন্যবাদ জানানোর মত আপনার কাছ থেকে কি যথেষ্ট পাই নি... আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, আপনি খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন...আমার আকসিনিয়াকে...তাকে দিয়েছেন...একটা...'

গ্রিগরের গলা হঠাৎ থেমে গেল। এক অস্পষ্ট, অস্বস্তিকর সন্দেহ ইউজেনের মনকে পীড়া দিতে লাগল। 'ও নিশ্চয়ই জানে না? নিশ্চয়ই না! জানবে কি করে?' আসনে হেলান দিয়ে গা এলিয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে।

—'দেরি করো না বেশি।' পেছন থেকে বুড়ো লিস্তনিৎস্কি চেঁচিয়ে বলল।

লাগাম ধরে ঘোড়ার মুখে টান মারল গ্রিগর, তাড়া দিল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটবার জন্যে। পনর মিনিটের মধ্যে তারা টিলাটা পেরিয়ে এল, দৃষ্টির বাইরে চলে গেল জমিদার বাড়ি। প্রথম উপত্যকায় এসে পৌঁছুতেই গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামল গ্রিগর, আসনের নীচে থেকে চাবুকটা টেনে বার করল।

—'করছ কি তুমি।' ভুরু কোঁচকাল ইউজেনে।

—'বুঝিয়ে দিচ্ছি, কি করছি।'

চাবুকটা শূন্যে দোলাল গ্রিগর, প্রচণ্ড জোরে ইউজেনের মুখের ওপর আড়াআড়ি আঘাত করল। তারপর, চাবুকের ডগাটা চেপে ধরে বাঁটটা দিয়ে অফিসারের মুখে আর হাতে পিটিয়ে চলল, নড়বার একটু অবসরও দিল না। প্যাঁস্‌নে ভেঙে কাচের একটা টুকরোয় ইউজেনের ভুরুর ওপরটায় কেটে গেল, রক্তের সরু ধারা গড়িয়ে এসে চোখে পড়ল। প্রথমে সে হাত দিয়ে মুখ ঢাকতে লাগল, কিন্তু আঘাত আসতে লাগল অবিশ্রান্ত। রক্তে আর ক্রোধে বিকৃত মুখে লাফিয়ে উঠল সে, নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল; কিন্তু পিছিয়ে গেল গ্রিগর, কব্জির ওপরে একটা ঘা মেরে হাতটা অবশ করে দিল।

—'এটা আকসিনিয়ার বদলা! এটা আমার বদলা! আকসিনিয়ার! আর একটা আকসিনিয়ার! আমার!'

চাবুক শিষ দিয়ে চলল, আঘাতের শব্দ উঠতে লাগল চটাস্ চটাস্ করে। অবশেষে গ্রিগর ইউজেনেকে ধাক্কা মেরে রাস্তার ওপরকার শক্ত কঠিন চাকার দাগের ওপর ফেলে দিল। লোহার নাল-লাগানো গোড়ালি দিয়ে নির্মমভাবে লাথি মারতে মারতে তাকে ওলট-পালট করতে লাগল। আর বেশি কিছু করার শক্তি যখন ফুরিয়ে গেল, তখন দ্রোঝ্‌কিতে উঠে, লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে, ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে দিল। গেটের কাছে দ্রোঝ্‌কিটা থামিয়ে রেখে, চাবুকটা মুঠো করে ধরে, বুকখোলা গ্রেট-কোটের ঝুল পায়ে বেধে হোঁচট খেতে খেতে, গ্রিগর ছুটে গিয়ে চাকরদের মহলে ঢুকল।

ঘটাং করে দরজা খুলে যাবার শব্দ কানে যেতেই ঘুরে তাকাল আকসিনিয়া।

—'ওরে খান্‌কি! ওরে কুত্তী!' শিষ দিয়ে উঠল চাবুক, সপাং করে তার মুখে এসে লাগল।

হাঁপাতে হাঁপাতে, গ্রিগর ছুটে বেরিয়ে এল আঙ্গিনায়, সাশ্‌কার প্রশ্নে কর্ণপাত না করে জমিদার বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। মাইল খানেক চলে আসার পর, আকসিনিয়া

তাকে ধরে ফেলল। হাপরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে নিঃশব্দে, তার পাশে পাশে হেঁটে চলল, মাঝে মাঝে গ্রিগরের জামার হাতায় টান দিতে লাগল। রাস্তার ধারে একটা বাদামি রঙের বেদীর কাছে, দু রাস্তার মোড়ে এসে এক অদ্ভুত দূরাগত কণ্ঠে বলে উঠল :

—'আমাকে ক্ষমা কর গ্রিগর!'

গ্রিগর দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, ঘাড় কুঁজো করে, গ্রেট-কোটের টুপিটা তুলে দিল। আকসিনিয়া দাঁড়িয়ে রইল বেদীর পাশে। একবারও পেছন ফিরে তাকাল না গ্রিগর, দেখতে পেল না, তার দিকেই হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে আকসিনিয়া দাঁড়িয়ে আছে।

॥ সাত ॥

তাতার্স্ক গ্রামের মাথার ওপরে, পাহাড়ের চূড়ো পর্যন্ত এসে গ্রিগর অবাক হয়ে দেখল তখনো তার হাতের মুঠোয় চাবুকটা ধরা আছে; ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটা, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে গ্রামের দিকে নীচে নামতে লাগল। তাকে দেখতে পেয়ে, অবাক হয়ে জানলায় জানলায় মুখের ভিড় জমতে লাগল। চলতে চলতে মেয়েদের যার সঙ্গেই দেখা হল, সে-ই মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাল।

নিজেদের বাড়ির গেটের কাছে লম্বামত, কালো চোখ, একটি সুশ্রী মেয়ে ছুটে এল তার সামনে, হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকালো। দুই হাতে তার গালদুটো চেপে ধরে মুখটা উঁচু করল গ্রিগর, চিনতে পারল দুনিয়াকে।

সিঁড়ি দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নেমে এল পান্তালিমন প্রোকোফিয়েভিচ্। গ্রিগর শুনতে পেল, ঘরের মধ্যে থেকে মা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। বাঁ-হাত দিয়ে সে বাপকে জড়িয়ে ধরল; দুনিয়া চুমু খেতে লাগল বাঁ-হাতে।

সিঁড়িটার ধাপে ধাপে প্রায় একই রকম, সেই পরিচিত বেদনাদায়ক মচ্‌মচ্ শব্দ। বারান্দায় উঠে এল গ্রিগর। তার বুড়ী মা ছেলেমানুষের মত দৌড়ে ছুটে এল, চোখের জলে গ্রেট-কোটের সুতোগুলো একেবারে ভিজিয়ে দিল, ছেলেকে বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে রইল, আর নিজের মাতৃভাষায় বিড়বিড় করতে লাগল—অসংলগ্ন কতগুলো শব্দ, কথায় তর্জমা করা যায় না। ওদিকে, দরজার পাশে—পাছে পড়ে না যায় সেই ভয়ে—দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল বিবর্ণ নাতালিয়া। গ্রিগরের চোখের দ্রুত, নিক্ষিপ্ত দৃষ্টি পড়তেই কাটাগাছের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল—তার ঠোঁটে যন্ত্রণার হাসি।

॥ আট ॥

রাত্রে বিছানায় শুয়ে বৌয়ের পাঁজরে খোঁচা মারল পান্তালিমন, ফিসফিস করে বলল :

—'চুপি চুপি যাও তো, দেখে এসো, ওরা একসঙ্গে শুয়েছে কিনা।'

—'খাটে ওদের বিছানা করে দিয়েছি আমি।'

—'যাও না, দেখে এসো! যাও না!'

ইলিনিচ্না উঠল, বড় ঘরের দরজার একটা ফুটো দিয়ে উঁকি মারল। ফিরে এসে বলল :

—'এক সঙ্গেই শুয়েছে ওরা।'

—'জয় ভগবান! জয় ভগবান!' করুণকণ্ঠে বলতে বলতে পান্তালিমন কনুইতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে, বুকে ক্রশ করল।

দশম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

১৯১৬ সাল। অক্টোবর। রাত্রি। বৃষ্টি আর বাতাস। অ্যালডার গাছে সমাকীর্ণ পোলিসির জলা-ভূমিতে ট্রেঞ্চের সারি। সামনে কাঁটাতারের বেড়া। ট্রেঞ্চগুলোর ভেতরে জমে আসা তরল কাদা। একটা নজর রাখার ঘাঁটির ভেজা টিনের ছাদ আবছা আবছা চকচক করছে। ডাগ-আউটগুলোর মধ্যে এখানে ওখানে আলো।

অফিসারদের একটা ডাগ-আউটের দরজার সামনে একজন গাঁট্টাগোট্টা অফিসার একমুহূর্তের জন্যে থামল, গ্রেট-কোটের বাঁধন থেকে ভেজা আঙুলগুলো পিছলে যাচ্ছে তার। অতিদ্রুত বাঁধনগুলো খুলে ফেলল সে, কলার থেকে জল ঝেড়ে ফেলল, দরজার মুখে, কাদার ভেতরে পায়ে মাড়ানো একটা খড়ের স্তূপে ঘসে বুট মুছে নিল, আর তারপরেই দরজায় ধাক্কা মারল, একটু কুঁজো হয়ে ডাগ-আউটের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ছোট একটা প্যারাফিনের বাতির হলদে আলো পড়ে তেলের মত চকচক করে উঠল তার মুখখানা। বুক খোলা জ্যাকেট গায়ে একজন অফিসার উঠে দাঁড়াল, এলো-মেলো ধূসর চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে নিয়ে হাই তুলল। জিজ্ঞেস করল :

—'বৃষ্টি পড়ছে।'

—'হ্যাঁ।' আগন্তুক উত্তর দিল, গ্রেট-কোটটা খুলে, দরজার কাছে একটা পেরেকের গায়ে ভিজে সপসপে টুপিটা সমেতই টাঙিয়ে রাখল। বলল :

—'এখানে তো বেশ গরমে আছেন!'

—'হালে ব্যবস্থা করেছি আগুন জ্বালাবার। তবুও খুবই অসুবিধে, মেঝে দিয়ে কাদা ঠেলে উঠছে। বৃষ্টিতে ভোগাবে। তোমার কি মনে হয়, বানচাক?'

লোমশ হাতদুখানা ঘসতে ঘসতে কুঁজো হয়ে আগুনের ধারে বানচাক উবু হয়ে বসল।

—'মেঝের ওপর আরও খানকতক তক্তা ফেলে নিন।' উত্তর দিল সে। 'আমাদের ডাগ-আউটে বেশ আরামে শুকনো খটখটেয় আছি। খালি পায়েই হাঁটতে পারি। লিস্তনিৎস্কি কোথায়?'

—'ঘুমিয়ে আছে। এক চক্কর পাহারা থেকে ঘুরে এসে শুয়ে পড়েছে তখন তখনি।'

—'জাগানো উচিত হবে?'

—'জাগাও। এক হাত দাবা খেলা যাক।'

তর্জনী দিয়ে মোটা ভুরু থেকে টোকা মেরে বৃষ্টির জল ফেলে দিল বানচাক, মনোযোগ দিয়ে আঙুলটা লক্ষ্য করল, তারপর শান্ত গলায় ডাকল :

—'ইউজেনে নিকোলাইভিচ!'

—'কি ব্যাপার?' কনুইতে ভর দিয়ে একটু উঁচু হল লিস্তনিৎস্কি।

—'একহাত দাবা চলবে?'

বিছানা থেকে পা নামিয়ে দিল ইউজেনে, নরম সাদা হাতের চেটো দিয়ে জোরে জোরে বুকটা রগড়াতে লাগল।

॥ দুই ॥

প্রথম চালটা শেষ হবার মুখে পাঁচ নং কোম্পানির দুজন অফিসার, ক্যাপ্টেন কালমিকোভ্ আর সুবল্টার্ন চুবোভ্ ঢুকল ঘরে।

'জোর খবর!' চৌকাঠ পার হতে হতে চেঁচিয়ে উঠল কালমিকোভ্। 'রেজিমেণ্টটা সম্ভবত সরিয়ে নেওয়া হবে।'

—'এ খবর শুনলেন কোথায়?' লেফটানাণ্ট মার্কুলোভ্ অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

—'এখুনি টেলিফোনে জানাল ব্যাটারীর কমান্ডার। সে কি করে জানল? আরে, সে যে সবে কাল ফিরেছে ডিভিসনের দপ্তর থেকে।'

—'স্নান করতে পারলে তোফা হত।' চুবোভ্ বলে উঠল। তার গলার স্বরে উল্লাসের স্পর্শ।

—'এখানে বড্ড স্যাঁতসেঁতে, মশাই, বড্ড স্যাঁতসেঁতে লাগছে।' কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি দেওয়াল আর কাদা প্যাচপেচে মেঝের চারপাশে তাকাতে তাকাতে অভিযোগ করল কালমিকোভ্।

—'ঠিক পাশেই বিল রয়েছে কিনা।' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে মার্কুলোভ বলল।

—'এখানে এই বিলের মধ্যে এত নিশ্চিন্ত আরামে আছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ জানান ভগবানকে!'

বানচাক বাধা দিয়ে বলে উঠল। 'অন্য সব এলাকায় ওরা আক্রমণ চালাচ্ছে, কিন্তু এখানে আমরা গুলি চালাই সপ্তাহে এক রাউন্ড।'

—'এ রকম গর্তে পচে মরার চেয়ে আক্রমণ করা ভাল।'

—'গুলির মুখে ছাতু হয়ে যাবার জন্যে কসাকদের পোষা হয় না। সেটা আপনার ভাল করেই জানার কথা, ক্যাপ্টেন মার্কুলোভ্।' বানচাক মন্তব্য করল।

—'তাহলে তোমার মতে, কেন আমাদের পোষা হয়?'

—'ঠিক উপযুক্ত সময়ে কসাকদের ঘাড়ে চেপে নিজেকে বাঁচানোর পুরনো খেলা দেখাবে সরকার।'

—'এবার তুমি উল্টো গাইতে শুরু করলে।' কালমিকোভ্ হাত নাড়ল।

—'উল্টো গাওয়া কি করে হল? সত্যকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না!'

—'এটা সত্য হল কিসে?'

—'কেন? সবাই জানে এটা সত্য। আপনিই বা কেন তা স্বীকার করবেন না?'

—'চুপ করুন, চুপ করুন, ভদ্রমহোদয়গণ!' চেঁচিয়ে উঠল চুবোভ্, তারপর নাটকীয়ভাবে মাথা নুইয়ে বানচাককে দেখিয়ে বলল, 'কর্নেট্ বানচাক এখন সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক দলের স্বপ্নরাজ্যের কথা ব্যাখ্যা করে শোনাবেন!'

—'আপনি সোস্যাল-ডেমোক্রাটদের পছন্দ করেন না, তাই না?' চুবোভের চোখে চোখ পড়তেই বানচাক হাসল। 'আমি বলছি যখন থেকেই ট্রেঞ্চের লড়াই শুরু হয়েছে, তখন থেকেই কসাক রেজিমেন্টগুলোকে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে নিরাপদ জায়গায়; তাদের রাখা হবে নিঃশব্দে, যতদিন না সেই উপযুক্ত মুহূর্তটি আসে।'

—'আর তারপর?' দাবার বড়েগুলো জড়ো করতে করতে লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

—'আর তারপর, ফ্রণ্টে যখন অশান্তি শুরু হবে,—তা যে হবে এ অবধারিত; লড়াই সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতে শুরু করেছে সৈন্যেরা, যে পরিমাণে পালাচ্ছে তা থেকেই এ প্রমাণ হয়—তখন কসাকদের ডাকা হবে বিপ্লব দমনের জন্যে। পাথরের চাঙড়ের মত কসাকদের হাতে ধরে রেখেছে সরকার। ঠিক সময়টি যখন আসবে, সেই পাথরের চাঙড় গড়িয়ে দিয়ে বিপ্লবের মাথা গুঁড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবে।'

—'তোমার অনুমানগুলোই বরং দুর্বল।' আপত্তি জানাল লিস্তনিৎস্কি। 'প্রথমেই ধরো, ঘটনার গতি সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা অসম্ভব। ভবিষ্যতের অশান্তি কিংবা ওই ধরনের অন্য কিছু সম্পর্কে কেমন ক'রে জানলে তুমি? কিন্তু এইভাবে দেখো: ধরো, মিত্রশক্তি জার্মানদের একেবারে চূর্ণ করে দিল, যুদ্ধ শেষ হলো বিজয় গৌরবে, তখন কসাকদের কি ভূমিকা হবে তোমার মতে?'

শুকনো হাসি হাসল বানচাক, বলল, 'যা হবে, তা ঠিক যবনিকা পতনের মত মোটেই নয়, বরং আরও বেশি চমক লাগানো...'

—'তুমি কবে এলে ছুটি থেকে?' কালমিকোভ্ জিজ্ঞেস করল।

—'দুদিন আগে।' বানচাক উত্তর দিল।

—'ছুটি কাটালে কোথায়?'

—'পিটার্সবুর্গে।'

—'পরিস্থিতি কেমন মনে হল সেখানে? আহা রে, মাত্র সাতটা দিন পিটার্সবুর্গে কাটাতে পারতাম যদি, তার জন্যে যে কোন কিছু দিয়ে দিতে রাজী!'

—'আরাম সেখানে অল্পই জুটবে।' হুঁসিয়ার হয়ে কথাগুলো ওজন করতে করতে বানচাক বলল। 'খাবারের ঘাটতি হয়েছে সেখানে। মজুর এলাকায় অনাহার, অসন্তোষ আর প্রচণ্ড অশান্তি।'

—'ভালোয় ভালোয় যুদ্ধ থেকে মুক্তি পাব না আমরা। আপনারা কি মনে করেন সবাই।' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল মার্কুলোভ্।

—'রুশ-জাপান যুদ্ধ জন্ম দিয়েছিল ১৯০৫ সালের বিপ্লবকে। এ যুদ্ধ শেষ হবে নতুন এক বিপ্লবে, বিপ্লবই শুধু নয়, গৃহ-যুদ্ধে।' বানচাক উত্তর দিল।

যেন তাকে বাধা দেবার জন্যেই এক অনিশ্চিত ভঙ্গি করল লিস্তনিৎস্কি, তারপর উঠে দাঁড়াল, ডাগ-আউটের এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত ভুরু কোঁচকাতে কোঁচকাতে পায়চারি করতে লাগল। চাপা ক্রোধের স্বরে বলল:

—'ওর মত লোককে আমাদের মত অফিসারদের মধ্যে দেখে অবাক হয়ে যাই আমি।' আঙুল দিয়ে সে বানচাককে দেখাল। 'আমি অবাক হয়ে যাই, কারণ আজ

পর্যন্তও স্পষ্ট বুঝতে পারি নি, দেশ সম্পর্কে, এই যুদ্ধ সম্পর্কে ওর ধারণাটা কি? সেদিন সে আবছা আবছা বলেছিল, কিন্তু স্পষ্টই আমাদের বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল, আমরা হেরে যাই, তাই ও চায়। ঠিক বলছি কি না, বানচাক?'

—'আমরা হেরে যাই, তা-ই আমি চাই।'

—'কিন্তু কেন? আমার মতে, তোমার রাজনৈতিক মতামত যা-ই হক না কেন, নিজের দেশের পরাজয় কামনা করা রাষ্ট্রদ্রোহ। যে কোন সৎ লোকের পক্ষেই এটা অসম্মানজনক।'

—'আপনাদের মনে আছে, দুমার সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক সদস্যেরা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল, ফলে, পরাজয়ের পথই প্রশস্ত হয়েছে?' মার্কুলোভ বলল বাধা দিয়ে।

—'ওদের মতের সঙ্গে তোমার মিল আছে, বানচাক?' লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

—'যখন বলেছি, আমরা হেরে যাই তা-ই আমি চাই, তখন এ স্পষ্ট যে আমার মিল আছে; আর, সোস্যাল-ডেমোক্রাটিক-বলশেভিক-পার্টির সদস্য হয়ে দুমার পার্টি-সদস্যদের মতের সঙ্গে মিল না ঘটাটাই হাস্যকর হবে আমার পক্ষে। আমি অবাক হয়ে যাই, এত বুদ্ধিমান আপনি ইউজেনে নিকোলাইভিচ্, তা সত্ত্বেও রাজনীতির দিক থেকে এত অজ্ঞ।'

—'সকলের আগে, সর্বপ্রথম আমি হচ্ছি রাজতন্ত্রের অনুগত সৈনিক। 'সোস্যালিস্ট-কমরেডদের' দেখলে পর্যন্ত মন বিদ্রোহ করে ওঠে' লিস্তনিৎস্কি বলে উঠল।

—'সকলের আগে, সর্বপ্রথম তুমি হচ্ছ একটি গাড়ল, তারপর, আত্ম-সন্তুষ্ট একটি ফৌজী জানোয়ার।' বানচাক মনে মনে ভাবল, তার মুখের ওপর থেকে হাসির রেখা মিলিয়ে গেল।

'আমরা অফিসাররা পড়ে গেছি এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে' যেন ক্ষমা চাইছে, এমনভাবে মার্কুলোভ বলল। 'রাজনীতি থেকে দূরে দূরে রেখেছি নিজেদের, বলতে গেলে, আমরা যেন আছি গ্রামের একেবারে এক প্রান্তে।'

ঝুলে-পড়া জুলপি দুটোয় টোকা দিতে দিতে ক্যাপ্টেন কালমিকোভ্ বসে রইল, তার মঙ্গোলীয় চোখ দুটো জ্বল জ্বল করতে লাগল। একটা বিছানার ওপরে শুয়ে রইল চুবোভ্, দেয়ালে টাঙানো মার্কুলোভের আঁকা একখানা ছবি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ছবির বিষয়বস্তু হচ্ছে, এক অর্ধ-উলঙ্গ নারীমূর্তি, মুখখানা সতী বেশ্যার মত। নগ্ন স্তন দুটির দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত, ছেনালি হাসি হাসছে। বাঁ-হাতের দুটি আঙুল দিয়ে একটি স্তনের বৃন্ত একপাশে টানছে, কড়ে আঙুলটা সতর্কভাবে ওপরের দিকে বাঁকানো। আধ-বোঁজা চোখের পাতার নীচে একটা ছায়া, তার তরল দুটি তারার নিবিড় উজ্জ্বলতা। ঈষৎ উঁচুকরা একটা কাঁধে খসে-পড়া সেমিজটা আটকে আছে, হাল্কা আলোর একটা আলতো ছায়া পড়েছে গলার হাড়ের গর্তের নীচে। তার ভঙ্গিতে এমন স্বাভাবিক শ্রী, এমন একটা বাস্তবিকতা রয়েছে—এমন আশাতীতভাবে সুন্দর তার বর্ণসৌষম্য যে পাকা হাতের আঁকা দেখে খুশী হয়ে চুবোভ্ হেসে উঠল, আলোচনার গতির দিকে কানও দিল না।

—'চমৎকার!' চোখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে। তার মন্তব্যটা হল এক বে-মক্কা সময়ে, কারণ ঠিক তখনই বানচাক বলেছিল :

—'জার-তন্ত্র ধ্বংস হবে, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনারা।'

তিক্ত হাসি হেসে সিগারেট পাকাতে পাকাতে লিস্তনিৎস্কি প্রথমে তাকাল বানচাকের দিকে, তারপর চুবোভের দিকে।

—'মার্কুলোভ, তুমি একজন পাকা শিল্পী।' চোখ টিপল চুবোভ্।

—'এটা শুধু একটা খসড়া…।'

—'কয়েক লক্ষ সৈন্য আমরা হারাতে পারি, কিন্তু এই দেশ যাদের লালন করেছে, পরাধীনতার হাত থেকে পিতৃভূমিকে বাঁচানো তাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য।' সিগারেটে কয়েকটা টান দিল লিস্তনিৎস্কি, কাচ পরিষ্কার করার জন্যে প্যাঁশ্‌নেটা খুলে নিল, পরিষ্কার করতে করতে দৃষ্টি-ক্ষীণ চোখে বানচাকের দিকে তাকিয়ে রইল।

—'মজুরের পিতৃভূমি বলে কিছু নেই।' জোর দিয়ে দিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করল বানচাক। 'মার্ক্সের এই কথাগুলোর মধ্যে গভীর সত্য রয়েছে। আমাদের কোন পিতৃভূমি ছিল না, আজও নেই। এই হতভাগা দেশ খাবার যুগিয়েছে, মদ যুগিয়েছে আপনাদের স্তেপের ওপরে বুনো ঝোপের মত আমরা মজুররা জন্মেছি…আমরা আর আপনারা একসঙ্গে—বাঁচতে পারি না।'

পকেট থেকে বড় একটা কাগজের তাড়া টেনে বার করল সে, লিস্তনিৎস্কির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে কাগজগুলো হাতড়াতে লাগল। তারপর, টেবিলের কাছে গিয়ে হলদে বিবর্ণ একখানা খবরের কাগজ মেলে ধরল।

—'একটু শুনবেন?' ইউজেনের দিকে সে ফিরে দাঁড়াল।

—'কি শুনব?'

—'যুদ্ধের ওপরে একটা প্রবন্ধ। খানিকটা পড়ব আমি। জানেনই তো তেমন লেখাপড়া শিখিনি, আমার বলার চেয়ে অনেক ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এতে :

> '‘জাতীয়’ সংগ্রামের পুরাতন ধুয়ার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী লুঠতরাজকে গোপন করিয়া বুর্জোয়ারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতেছে। ‘সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত কর,’ এই ধ্বনি তুলিয়া শ্রমিকশ্রেণী সেই ভাঁওতার মুখোস খুলিয়া দিতেছে। অবশ্য এবংবিধ রূপান্তর সাধন সহজসাধ্য নহে, এবং পৃথক পৃথক পার্টির ‘ইচ্ছায়’ তাহা সাধিত হইতে পারে না। ধনতন্ত্রের বাস্তব অবস্থা, ধনতন্ত্রের অন্তিম যুগের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যেই ওই রূপান্তর নিহিত আছে। সমাজতন্ত্রীদের কার্যক্রম চালান করিতে হইবে ওই পথে, কেবলমাত্র ওই পথেই। কোন পথে অগ্রসর হইলে গৃহযুদ্ধ ত্বরান্বিত করা যায়? ‘যুদ্ধঋণে কোনপ্রকার সহায়তা করা হইবে না, ‘নিজের দেশ’ সম্পর্কে উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারে সাহায্য করা হইবে না, সংকট উপস্থিত হওয়ায় বুর্জোয়ারা নিজেদের সৃষ্ট বিধিসম্মত সংগ্রামের সকল সুযোগ প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছে—তাই সংগ্রামের আইনসম্মত পদ্ধতিতে নিজেদের আবদ্ধ করিলে চলিবে না,—এই কার্যক্রমই গৃহযুদ্ধকে সুনিশ্চিত করিয়া তুলিবে। ইউরোপের প্রজ্জ্বলিত দাবানলে শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক এই গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।
>
> 'যুদ্ধ কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। খৃষ্টান ধর্মযাজকবা দেশপ্রেম, মানবতাবোধ এবং শান্তির কথা সুবিধাবাদীদের অপেক্ষা কোন অংশে কম প্রচার করে না। তাহারা যুদ্ধকে মনে করে ‘পাপ’। কিন্তু যুদ্ধ তাহা নহে। যুদ্ধ ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পর্যায়। এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থার মত যুদ্ধাবস্থাও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক রূপ। এ যুগের যুদ্ধ হইল জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ। কিন্তু এই সত্য হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, ‘উগ্র জাতীয়তা-বাদে’র যে-স্রোতে জনসাধারণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে আমরাও সেই স্রোতে গা ভাসাইয়া দিব। যুদ্ধকালে, যুদ্ধাবস্থায় এবং যুদ্ধোন্মত্ততার মধ্যে শ্রেণী-বিরোধ প্রবহমান

থাকে এবং তাহা প্রকট হইয়া ওঠে। এমতাবস্থায় কেবলমাত্র সামরিক চাকুরিতে যোগদানে অস্বীকৃতি, অথবা যুদ্ধকে আঘাত হানার প্রচেষ্টা বা অনুরূপ কার্য-কলাপ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, সশস্ত্র বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্রহীন সংগ্রাম হীন, মূঢ় স্বপ্ন; ইহা হইল প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ অথবা পর পর কতগুলি যুদ্ধ ব্যতিরেকেই ধনতন্ত্রবাদ বিনষ্ট করার হা-হুতাশ মাত্র। সমাজতন্ত্রীর কর্তব্য হইতেছে যুদ্ধের সময়ও শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ প্রচার করা; সকল দেশের বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদী সংঘর্ষের যুগে জাতিতে জাতিতে যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তরিত করার পথে কার্যক্রম পরিচালিত করাই সমাজতন্ত্রীদের কর্তব্য। 'যে কোন মূল্যে শান্তি চাই,'—এই ধরনের ভাবালুতাপূর্ণ নির্বোধ হা-হুতাশ বন্ধ কর, গৃহযুদ্ধের নিশান উড়াও। ইউরোপের সংস্কৃতির ভাগ্যাকাশ আজ সাম্রাজ্য-বাদীদের চক্রান্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই যুদ্ধের শেষে যদি পর পর কয়েকটি সাফল্য-মণ্ডিত বিপ্লব সংঘটিত না হয়, তবে অতি দ্রুত আরও যুদ্ধ ঘটিবে। 'শেষ-যুদ্ধের' উপকথা এক শূন্যগর্ভ, বিপদসঙ্কুল উপকথা, পশ্চাৎপদ অঞ্চলে প্রচলিত নিকৃষ্ট রূপকথা।'

শান্তগলায় ধীরে ধীরে পড়ে গেল বানচাক. শেষের লাইনগুলোয় এসে উদাত্ত, ঝংকৃত কণ্ঠস্বর চড়াল; প্রবন্ধ শেষ করল :

'আজ না হউক কাল, যুদ্ধের সময়ে না হউক যুদ্ধের পর বর্তমান যুদ্ধের সমকালে না হউক পরবর্তী যুদ্ধের সময়ে শতসহস্র শ্রেণীসচেতন শ্রমিক শ্রমিক-শ্রেণীর গৃহযুদ্ধের পতাকাতলে সমবেত হইবে। শুধু তাহারাই নহে, কোটি কোটি অর্ধ-শ্রমিক, যাহারা 'উগ্রজাতীয়তাবাদে'র ধূম্রজালে আচ্ছন্ন তাহারাও সমবেত হইবে। আরও সমবেত হইবে পাতি-বুর্জোয়ার দল, যুদ্ধের বিভীষিকা যাহাদিগকে কেবলমাত্র ভীত ও নিষ্পিষ্ট করিবে না, পরন্তু শিক্ষিত, জাগরিত ও সংগঠিত করিবে, 'স্বদেশী' 'বিদেশী' উভয়বিধ বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুত করিবে, শানিত করিবে।'

যখন সে শেষ করল, তখন এক দীর্ঘ-নীরবতা। তারপর মার্কুলোভ জিজ্ঞেস করল:

—'এটা রাশিয়াতে ছাপা হয়নি, তাই না?'

—'না?'

—'কোথায় ছাপা হয়েছে তাহলে?'

—'জেনেভায়। এটা বেরিয়েছে, ১৯১৪ সালের 'সোসাল-ডেমোক্রাট' পত্রিকার ৩৩ নং সংখ্যায়।'

—'কে লিখেছে প্রবন্ধটা?'

—'লেনিন।'

—'উনি বলশেভিকদের নেতা, তাই না?'

উত্তর দিলনা বানচাক। সাবধানে ভাঁজ করতে লাগল কাগজখানা. আঙুলগুলো ঈষৎ কাঁপতে লাগল। মার্কুলোভ মন্তব্য করল:

—'নিজের মতে টানবার অসাধারণ ক্ষমতা লোকটার...লোকটা যা বলে তাতে ভাববার অনেক কিছু আছে।'

আসন্ন ঝড়ের আগল খুলে দিল তার এই মন্তব্য। লিস্তনিৎস্কি স্বভাবতই উত্তেজিত হয়ে উঠল। সার্টের কলারের বোতাম আটকে নিয়ে একোণ থেকে ওকোণ পর্যন্ত দ্রুত পায়চারি করতে করতে কথার তুবড়ি ছোটাতে লাগল:

—'নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত একটি লোকের ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করবার এক করুণ প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধটি। আমাদের এই বাস্তবতার যুগে ভবিষ্যৎবাণীর বিশেষ সাফল্যলাভের আশা কম, এই ধরণের হলেও আরও কম। খাঁটি রুশ যে, সে এই ধরণের পাগলের প্রলাপকে ঘৃণায় এড়িয়ে চলবে। 'জনসাধারণের যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করা!' কি জঘন্য, ন্যক্কারজনক কথা!'

ভুরু কুঁচকে লিস্তনিৎস্কি তাকাল বানচাকের দিকে, তখনো সে ঝুঁকে রয়েছে কাগজের বাণ্ডিলের ওপর। লিস্তনিৎস্কি জ্বালাময়ী ভাষায় বললেও, তার নীচু, সরু গলার স্বরে কোন প্রভাবই পড়ল না।

—'বানচাক!' কালমিকোভ চেঁচিয়ে উঠল। 'একমিনিট দাঁড়াও লিস্তনিৎস্কি। বানচাক, শোন! আচ্ছা, ধরে নিলাম এই যুদ্ধ গৃহযুদ্ধে পরিণত হবে। কিন্তু তারপর কি হবে? তোমরা রাজতন্ত্র উচ্ছেদও করবে। কিন্তু তার বদলে কোন ধরণের সরকার গঠন করবে?'

—'মজুর শ্রেণীর সরকার?'

—'পার্লামেণ্ট হবে কি?'

—'ঠিক তা নয়!' বানচাক হাসল।

—'বেশ, তাহলে কি?'

—'মজুর-শ্রেণীর একনায়কত্ব!'

—'এবার বুঝেছি! কিন্তু বুদ্ধিজীবী আর চাষীরা? তাদের কি ভূমিকা হবে'

—'চাষীরা আমাদের অনুসরণ করবে, বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশও করবে। আর অন্যরা...তাদের আমরা এই করব।' দ্রুতভঙ্গিতে একটা কাগজ সে হাতের মুঠোয় পেঁচিয়ে ধরল, দাঁতের ফাঁক দিয়ে উচ্চারণ করতে করতে কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল, 'এই করব আমরা তাদের।'

—'স্বেচ্ছাসেবক হ'য়ে ফ্রণ্টে মরতে এসেছ কিজন্যে, অফিসারের পদেই বা উঠেছ কিসের জন্যে? উনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে, নিজের শ্রেণী-ভ্রাতাদের ধ্বংসের বিপক্ষে, অথচ, উনি একজন অফিসার!' বুটের ডগায় চাপড় মেরে হো হো করে হেসে উঠল কালমিকোভ্।

—'তোমার মেসিনগানের মুখে কতজন জার্মান মজুরকে কচুকাটা করেছ, হে?' লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

বানচাক দ্রুত কাগজের বাণ্ডিলটা ওল্টাল, টেবিলের ওপরে ঝুঁকে থাকা অবস্থাতেই উত্তর দিল:

—'কতজন জার্মানকে গুলি করে মেরেছি? এটা...একটা প্রশ্ন। নিজের ইচ্ছায় আমি এসেছি, কারণ আসতে আমাকে হতই। আমি মনে করি, এখানে ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে যে অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করেছি, তা পরে কাজে লাগবে। শুনুন:

> 'আধুনিক ফৌজকেই ধরা যাক। সংগঠন হিসাবে ইহা একটি অন্যতম সুন্দর দৃষ্টান্ত। আর এই সংগঠন এইজন্যই ভাল যে ইহা নমনীয়, একই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোককে কিভাবে একটিমাত্র ইচ্ছার অনুবর্তী করা যায় তাহা ইহা জানে। আজ হয়ত সেই লক্ষ লক্ষ লোক দেশের বিভিন্ন অংশে ঘরসংসারের কাজে লিপ্ত রহিয়াছে। কাল হয়ত ফৌজের ডাক আসিল আর তাহারা তৎক্ষণাৎ বিভিন্ন নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সমবেত হইল। আজ হয়ত তাহারা ট্রেঞ্চে বসিয়া আছে, হয়ত মাসের পর মাস বসিয়া আছে। কাল তাহারা আক্রমণ করিতে গেল। গুলিগোলা

হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আজ তাহারা ভেল্কি দেখাইতেছে। কাল তাহারা লড়াইয়ের খোলা ময়দানে তাক লাগাইতেছে। আজ তাহাদের অগ্রবর্তী দল মাটির নীচে মাইন পুঁতিতেছে। কাল আবার উড়ন্ত এয়োপ্লেনগুলি লক্ষ্য করিয়া মাইলের পর মাইল আগাইয়া চলিয়াছে। সংগঠন তাহাকেই বলে—যখন একটি মাত্র উদ্দেশ্যের জন্য একটিমাত্র ইচ্ছায় উদ্দীপ্ত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোক সামাজিক জীবন ও কর্মধারা পরিবর্তন করে, কর্মের ক্ষেত্র এবং ধারা পরিবর্তন করে, যখন পরিবর্তিত অবস্থা এবং সংগ্রামের প্রয়োজন অনুসারে অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার পরিবর্তন করে। বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামেও এই একই কথা প্রযোজ্য। আজ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি অনুপস্থিত...'

—'কিন্তু 'পরিস্থিতি' বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছ?' বাধা দিয়ে চুকোভ্ বলল।

বানচাক তার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন এখুনি সে ঘুম থেকে উঠেছে, আঙ্গুল দিয়ে ভুরুটা ঘসল, প্রশ্নটা ধরবার চেষ্টা করল।

—'আমি বলছি, 'পরিস্থিতি' বলতে কি বোঝাচ্ছ তুমি?'

—'বুঝতে পেরেছি আমি ঠিকই, কিন্তু আমার পক্ষে বুঝিয়ে বলাটা কষ্টকর।' শিশুর মত সহজ হাসি হাসল বানচাক। তার বড়সড় ভাবাচ্ছন্ন মুখে অদ্ভুত দেখাল হাসিটা। মনে হল যেন, শরতের বৃষ্টি-ধোয়া মাঠের ওপর দিয়ে এক ঝলক রোদ নেচে গেল। 'পরিস্থিতি' হচ্ছে একটা অবস্থা, কতগুলো ঘটনার সমাবেশ। পরিষ্কার হল এবার?'

অনির্দিষ্টভাবে হাত নাড়ল লিস্তনিৎস্কি, বলল: 'পড়, পড়ে যাও।'

> 'আজ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি অনুপস্থিত, জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা এবং তাহাদের কর্মতৎপরতা জোরদার করিবার মত অবস্থা নাই। আজ তাহারা ভোটের কাগজ আগাইয়া দিতেছে—তাহাই স্বীকার করিয়া লও। যাহারা জেলের ভয়ে চেয়ার আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকে তাহাদিগকে পার্লামেন্টে ঢুকাইবার জন্য কিংবা আরামের চাকুরীতে বসাইবার জন্য নহে, ইহার দ্বারা শত্রুকে আঘাত হানিবার জন্য কিভাবে সংগঠিত হইতে হইবে তাহাই জানিতে হইবে। কাল তাহারা হয়ত তোমাদের নির্বাচনের অধিকার কাড়িয়া লইয়া হাতিয়ার আর আধুনিকতম উন্নত ধরণের দ্রুতচালিত বন্দুক হাতে তুলিয়া দিবে। মৃত্যু আর ধ্বংসের এই অস্ত্রকে হাত পাতিয়া লইও, যাহারা যুদ্ধের ভয়ে ভীত তাহাদের ভাবাবেগের শূন্যগর্ভ আর্তনাদে কর্ণপাত করিও না। পৃথিবীতে এমন বহু জঞ্জাল রহিয়া গিয়াছে, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্য যাহাকে আগুনে, তলোয়ারে ধ্বংস করিতে হইবে; আর যদি জনসাধারণের ক্রোধ ও নৈরাশ্য ক্রমবর্ধমান হইয়া ওঠে, যদি বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা হইলে নূতন সংগঠনের কাজে হাত লাগাও, মৃত্যু ও ধ্বংসের এইসব কার্যকরী অস্ত্রকে নিজের দেশের সরকার এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য চালিত কর...'

দরজায় ধাক্কা দিয়ে পাঁচ নং কোম্পানির এক সার্জেন্ট-মেজর ঘরে ঢুকতে বানচাকের কথায় বাধা পড়ল।

কালমিকোভের দিকে ফিরে সার্জেন্ট-মেজর বলল, 'রেজিমেন্টের দপ্তর থেকে এক আর্দালী এসেছে হুজুর।'

গ্রেট কোট গায়ে চড়িয়ে বাইরে চলে গেল কালমিকোভ্ আর চুকোভ। মার্কুলোভ ছবি আঁকতে বসল। গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে, গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে, ডাগ্-

আউটের একোণ থেকে ওকোণ পর্যন্ত লিস্তনিৎস্কি পায়চারি করতে লাগল। কিছু-পরেই বানচাকও বিদায় নিল। বাঁ-হাতে গ্রেট কোটের কলারের ধারদুটো ধরে, ডান হাতে কোটটা গায়ের সঙ্গে চেপে সে এগিয়ে চলল ট্রেঞ্চের পেছল কাদার মধ্যে দিয়ে। সরু ট্রেঞ্চের খাঁজে খাঁজে আটকে, শিষ দিয়ে, ঘূর্ণী তুলে বাতাসের ঝড় বইছে। নিজের ডাগ্-আউটে যখন পেঁছুল, তখন আবার বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হয়ে উঠল, পচা অলডার-পাতার গন্ধ উঠতে লাগল, গা থেকে। তার মুখে লেগে রইল এক বিষণ্ণ হাসি। মেসিনগান বাহিনীর কমাণ্ডার ঘুমিয়ে পড়েছে, তখনো তার মুখে তিন রাত্তির জেগে তাস খেলার ছাপটা সুস্পষ্ট। স্বেচ্ছাসৈনিক হিসাবে যুদ্ধে যোগ দেবার দিন থেকে সঙ্গে রাখা, কাঁধে বওয়া থলিটা হাতড়াতে লাগল বানচাক, দরজার কাছে একতাড়া কাগজ জড়ো করল, তারপর আগুন ধরিয়ে দিল তাতে। দুটিন মাংস আর একমুঠো রিভলবারের গুলি পকেটে পুরে নিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে এল আবার। মুহূর্তের জন্যে ফাঁক করা দরজার মধ্যে দিয়ে বাতাসের ঝাপটা ঢুকে পড়ল, পোড়াকাগজের ছাইগুলো, উড়িয়ে নিয়ে ধোঁয়াওঠা বাতিটা দপ করে নিভিয়ে দিল।

॥ তিন ॥

বানচাক চলে যাবার পর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত পায়চারি করল লিস্তনিৎস্কি, তারপর এগিয়ে গেল টেবিলের কাছে। মার্কুলোভ তখনও ছবি আঁকছে; তার পেন্সিলের ডগার নীচে থেকে চৌকো সাদা কাগজের ওপরে সেই চিরাচরিত হালকা-হাসি মাখানো বানচাকের মুখখানা চক্ষুষ্মান হয়ে উঠছে।

—'ওর মুখখানা বেশ দৃঢ়তাব্যঞ্জক।' লিস্তনিৎস্কির দিকে ফিরে মন্তব্য করল মার্কুলোভ।

—'আচ্ছা, কি মনে হয় তোমার?' ইউজেনে জিজ্ঞেস করল।

—'বলা কঠিন!'

—'বলা কঠিন।' প্রশ্নের গুরুত্ব অনুমান করে মার্কুলোভ উত্তর দিল। 'লোকটা অদ্ভুত। এখন ধরা দিয়েছে পুরোপুরি। কিন্তু আগে আমি বুঝতেই পারিনি কি করে ওর রহস্য ভেদ করি। কসাকদের মধ্যে, বিশেষ করে মেসিনগানারদের মধ্যে লোকটার জনপ্রিয়তা অসাধারণ। লক্ষ্য করেছ সেটা?'

—'হুঁ, করেছি।' কিছুটা অনিশ্চিতভাবেই উত্তর দিল লিস্তনিৎস্কি।

—'মেসিনগানারদের প্রত্যেকটিই বলশেভিক। ওদের দলে টানতে ও নিশ্চিত সক্ষম হয়েছে। আজ ও যখন নিজেকে ধরা দিল, অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। এমনটি ও করল কিসের জন্যে? ওত জানে, ওর মত আমাদের কেউ সমর্থন করে না। তবু নিজেকে ধরা দিল অমনিভাবে। মাথাগরম মানুষওত নয় ও। ও হচ্ছে বিপদজনক।'

বানচাকের অদ্ভুত আচরণের কথা তখনো ভাবতে ভাবতে আঁকা ছবিটা ঠেলে সরিয়ে রাখল মার্কুলোভ, তারপর কাপড় ছাড়তে শুরু করল। ছাইরঙা মোজাটা ঝুলিয়ে রাখল উনুনের ওপর, ঘড়িতে দম দিল, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল সে। মার্কুলোভের পরিত্যক্ত টুলের ওপর বসল লিস্তনিৎস্কি, বানচাকের ছবির উল্টোপিঠে তরতর করে লিখতে শুরু করল:

মহামহিমবরেষু,

'আমার অনুমান সম্পর্কে আপনাকে পূর্বাহ্নে যাহা জানাইয়াছিলাম তাহা এখন সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হইয়াছে। আমাদের রেজিমেণ্টের অফিসারদের সহিত আলোচনায় (পাঁচ নং কোম্পানির ক্যাপ্টেন কালমিকোভ্, সুবলটার্ন চুকোভ্ এবং তিন নং কোম্পানির লেফটানাণ্ট মার্কুলোভ্ আমি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন) কর্নেট বানচাক নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং নিঃসন্দেহে তাঁহার পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী কি ধরণের কাজ চলাইয়া যাইতেছেন, তাহা বুঝাইয়া বলিয়াছেন; কেন যে তিনি বুঝাইতে গেলেন, তাহা আমি সম্পূর্ণ অনুধাবন করিতে পারি নাই। তাঁহার নিকট নিষিদ্ধ প্রকৃতির বহু কাগজ-পত্র ছিল। কর্নেট বানচাক নিঃসন্দেহে আমাদের রেজিমেণ্টের মধ্যে গোপন আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছেন (অনুমান করিতে পারা যায়, একমাত্র এইজন্যই তিনি আমাদের রেজিমেণ্টে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করিয়াছেন) এবং মেসিনগানাররাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হইয়াছে। সামরিক নির্দেশ অমান্য করিবার মত ঘটনাও ঘটিয়াছে, তাহা আমি পূর্বেই ডিভিসনের কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছি। কর্নেট বানচাক সদ্য ছুটি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে প্রচুর ধ্বংসাত্মক কাগজপত্র আনিয়াছেন। এখন হইতে তিনি আরও জোরের সহিত কাজ চালাইয়া যাইবেন।

"পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে আমার সিদ্ধান্ত ইহাই:

(১) কর্নেট বানচাকের অপরাধ সম্পূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে।

(২) তাঁহার বিপ্লবাত্মক কার্যাবলী বন্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা উচিত।

(৩) অতিদ্রুত মেসিন-গান বাহিনীকে ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত, তাহাদের মধ্য হইতে ভয়ংকর প্রকৃতির লোকদের সরাইয়া অন্যান্য সকলকে হয় পিছনে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত, নতুবা অন্য অন্য রেজিমেণ্টের সহিত মিশাইয়া দেওয়া উচিত।

'স্বদেশ ও রাজতন্ত্রকে সেবা করিবার আমার আন্তরিক ইচ্ছা আপনার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবে না ইহাই আমার প্রার্থনা।

"ক্যাপ্টেন ইউজেনে লিস্তনিৎস্কি।"

সেক্টর নং ৭

২রা নভেম্বর, ১৯১৬

॥ চার ॥

পরদিন খুব সকালে আরদালিকে দিয়ে লিস্তনিৎস্কি তার রিপোর্টটা ডিভিসন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিল। তারপর, প্রাতরাশ শেষ করে ট্রেঞ্চের মধ্যে ঘুরতে বেরুল। পিচ্ছিল মাটির পাঁচিলের পেছনে জলাজমির ওপরে কুয়াশা দুলছে, টুকরো-টুকরো হয়ে ঝুলছে যেন তারের বেড়ার কাঁটাগুলোয় আটকে গিয়েছে। প্রায় এক ইঞ্চি পুরু হয়ে চটচটে কাদা জমেছে ট্রেঞ্চের মেঝেতে। ফোঁকর দিয়ে গড়িয়ে আসছে ছোট ছোট বাদামিরঙের ধারা। কাদামাখা, ভেজাকোট গায়ে কসাকরা মাটির পাঁচিলের

পাত-লোহার ওপরে চায়ের কেতলি গরম করছে, গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে উবু হয়ে বসে তামাক টানছে, গল্প করছে, রাইফেলগুলো ট্রেঞ্চের দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখেছে।

—'কতবার বারণ করেছি তোমাদের পাত-লোহার ওপরে আগুন না-জ্বালাতে? মগজে বুঝি ঢোকেনা, শুয়োরের বাচ্চা সব?' কসাকদের প্রথম দলটার কাছে পৌঁছেই চিৎকার করে উঠল লিস্তনিৎস্কি।

অনিচ্ছাসত্ত্বে উঠে দাঁড়াল দুজন; অন্য সকলে গ্রেট-কোটের কোনা পেতে বসে বসে তামাক টানতে লাগল। দাড়িওলা এক কসাক, কানে তার দোদুল্যমান মাকড়ি, কেতলির নীচে কাঠ গুঁজে দিতে দিতে উত্তর দিল:

—'পাত-লোহার ওপর আগুন না জ্বালাতে হলে খুশীই হতাম। কিন্তু অন্য কিভাবে আগুন জ্বালাব, হুজুর? দেখুন না, কি কাদা।'

—'এক্ষুণি টেনে নাও পাত-লোহা!'

—'বলছেন কি? তাহলে কি বসে বসে উপোস করব? তাই চান?' ভুরু কুঁচকে, চোখে চোখে না তাকিয়ে প্রশ্ন করল এক চওড়ামুখ, বসন্তের দাগওয়ালা কসাক।

—'আমি বলছি, টেনে বার কর লোহার পাতটা!' বুটের ডগা দিয়ে এক লাথিতে ইউজেনে কেতলির নীচের জ্বলন্ত কাঠখানা সরিয়ে দিল।

কানে মাকড়িপরা কসাকটা ক্রোধের হাসি হেসে বিড়বিড় করতে করতে হতভম্বভাবে কেতলির জলটা ঢেলে ফেলে দিল:

—'হলত, হলত চা খাওয়া...'

চলমান ক্যাপ্টেনের মূর্তির দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল কসাকরা। দাড়িওলা কসাকের দুইচোখে ধক্‌ধক্ করে উঠল দুটি ছোট ছোট অগ্নিপিন্ড।

প্রথম দলের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় লিস্তনিৎস্কিকে পাকড়াও করল মার্কুলোভ। নতুন চামড়ার জার্কিনটা মচর্ মচর্ করতে করতে সে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল, তার গা থেকে ঘরে তৈরি তামাকের কড়া গন্ধ উঠছে। লিস্তনিৎস্কিকে একপাশে ডেকে নিয়ে হড়বড়্ করে বলল:

—'খবর শুনেছেন? কালরাতে বানচাক পালিয়েছে।'

—'বানচাক? কি হয়েছে?'

—'পালিয়েছে...বুঝলেন? মেসিনগানদলের কমান্ডার একই ডাগ্‌আউটে থাকেন, আমাকে বললেন, আমাদের কাছ থেকে যাওয়ার পর আর ফেরেনি সে। আমাদের ডাগ্-আউট থেকে বেরিয়ে নিশ্চয়ই পালিয়েছে সে। আপনার কি মনে হয়?'

ভুরু কুঁচকে লিস্তনিৎস্কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যাঁশনেটা মুছতে লাগল।

—'আপনি একটু বিচলিত হলেন মনে হচ্ছে?' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মার্কুলোভ তার মুখের দিকে তাকাল।

—'আমি? তোমার কি বুদ্ধি লোপ পেয়েছে? আমি বিচলিত হতে যাব কেন? অপ্রত্যাশিত সংবাদে একটু অবাক হয়েছি মাত্র।'

॥ পাঁচ ॥

দিন কয়েক পর লিস্তনিৎস্কির ডাগ্-আউটে হাজির হল সার্জেণ্ট-মেজর, মুখে তার দুশ্চিন্তার ছাপ। বহুক্ষণ তানা-নানা করার পর বলল:

—'আজ সকালে, বুঝলেন হুজুর, ট্রেঞ্চের ভেতরে কসাকরা এই কাগজগুলো পেয়েছে। ব্যাপারটা একটু বেখাপ্পা ধরণের। আপনাকে খবর দেওয়াই উচিত মনে করলাম...'

—'কিসের কাগজ?' বিছানা ছেড়ে উঠতে উঠতে জিজ্ঞেস করল লিস্তনিৎস্কি।

তার হাতে খানকতক দুমড়ানো টাইপ-করা ইস্তাহার দিল সার্জেণ্ট-মেজর। লিস্তনিৎস্কি পড়ল:

'সকল দেশের সর্বহারা এক হও!

'সৈনিক বন্ধুগণ,

দুই বৎসর ধরিয়া এই অভিশপ্ত লড়াই চলিতেছে। দুই বৎসর আপনারা অপরের স্বার্থ রক্ষার জন্য ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে পচিতেছেন। দুই বৎসর ধরিয়া সমস্ত জাতির চাষী ও মজুরের রক্ত ঝরিতেছে। লক্ষ লক্ষ নিহত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ আহত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ নারী বিধবা হইয়াছে, শিশু অনাথ হইয়াছে: এই নিধনযজ্ঞের ইহাই ফলাফল। কিসের জন্য আপনারা লড়াই করিতেছেন? কাহাদের স্বার্থ রক্ষা করিতেছেন? জারের সরকার লক্ষ লক্ষ সৈনিককে মৃত্যুর মুখে পাঠাইয়াছে নূতন দেশ দখলের জন্য, সেইসব দেশের মানুষকে পীড়ন করিবার জন্য—শৃংখলাবদ্ধ পোলাণ্ড ও অন্যান্য জাতিগুলিকে পূর্বে যেমন তাহারা পীড়ন করিয়াছে। অস্ত্রবলে পৃথিবীর শিল্পপতিরা বাজার ভাগ করিয়া লইতেছে, আর আপনারা, তাহাদের স্বার্থের লড়াইতে মৃত্যুর মুখে ছুটিতেছেন, আপনাদের মতই মেহনতী মানুষকে হত্যা করিতেছেন।

'নিজের ভ্রাতার যথেষ্ট রক্তপাত করা হইযাছে! মেহনতী মানুষ উঠুন, জাগুন! অস্ট্রিয়ান ও জার্মান সৈনিকেরা আপনাদের শত্রু নন, আপনাদের শত্রু জার, নিজের দেশের শিল্পপতি ও জমিদাররা। তাহাদের দিকে বন্দুক ঘুরাইয়া ধরুন। অস্ট্রিয়ান ও জার্মান সৈনিকদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করুন। যে কাঁটাতারের বেড়া জন্তুর মত আপনাদের পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ছাড়াইযা অপরের প্রতি আপনাদের হস্ত প্রসারিত করুন। আপনারা শ্রমের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ, এখনো আপনাদের হাতে রহিযাছে রক্তাক্ত শ্রমচিহ্ন। স্বৈরতন্ত্রের পতন হউক! সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নিপাত যাক! দুনিযার মেহনতী মানুষের ঐক্যের জয় হউক!'

ইস্তাহারটা পড়তে পড়তে রাগ চড়তে লাগল লিস্তনিৎস্কির। এক অর্থহীন ঘৃণায় পেয়ে বসল তাকে, যা ঘটবে তা অনুমান করে অভিভূত হয়ে গেল সে। মনে মনে ভাবল, 'শুরু হল এবার!' তখনি সে টেলিফোনে রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারকে খবরটা জানিয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল:

—'এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি?'

—'সার্জেণ্ট-মেজর আর ট্রুপ-অফিসারদের নিয়ে এখুনি খানাতল্লাসি শুরু করে দাও। প্রত্যেককে খানাতল্লাস করবে, অফিসারদের বাদ দেবে না। আজ ডিভিসনের কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করব, কবে তাঁরা রেজিমেণ্টকে ভেঙ্গে দেবেন। তাড়াতাড়ি করতেই বলব তাঁদের। খানাতল্লাসি করতে গিয়ে কিছু পেলে তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবে।'

—'আমার মনে হয়, এ কাজ মেসিনগানারদের।' ইউজেনে বলল।

—'তাই নাকি? আমি এখুনি কমাণ্ডারকে তার কসাকদের খানাতল্লাস করতে নির্দেশ পাঠাচ্ছি।'

ডাগ্-আউটে ট্রুপ-অফিসারদের জড়ো করে রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারের নির্দেশ জানিয়ে দিল লিস্তনিৎস্কি।

—'কি জঘন্য!' চটেমটে চিৎকার করে উঠল মার্কুলোভ্। 'আমরা এ ওকে খানাতল্লাস করব নাকি?'

—'প্রথম তোমার পালা, লিস্তনিৎস্কি।' এক তরুণ সুবলটার্ণ মন্তব্য করল।

—'না, 'হেড্' 'টেল্' করা যাক।'

—'ঠাট্টা রাখুন, মশাইরা', বাধা দিয়ে লিস্তনিৎস্কি বলে উঠল। 'বুড়ো কর্তা অবশ্য একটু বেশিই এগিয়েছেন; আমাদের রেজিমেণ্টের অফিসাররাত সবাই ধোয়া তুলসীপাতা। পাপী ছিল এক কর্ণেট বানচাক, সেত পালিয়েছে। কিন্তু আমাদের খানাতল্লাস করতে হবে কসাকদের। কেউ ডাকত সার্জেণ্ট-মেজরকে।'

সার্জেণ্ট-মেজর এক বয়স্ক কসাক, সেণ্ট জর্জক্রসের সঙ্গে বুকে তিনটে চিহ্ন। হাজির হল সে। একটু কেশে, অস্বস্তিভরে এক অফিসারের দিক থেকে আর এক অফিসারের দিকে তাকাতে লাগল।

—'তোমাদের কোম্পানিতে সন্দেহজনক কারা? কে এই ইস্তাহারগুলো ফেলেছে বলে তোমার মনে হয়?' প্রশ্ন করল লিস্তনিৎস্কি।

—'আমাদের কোম্পানিতে এমন কেউ নেই, হুজুর।' সে দৃঢ়প্রত্যয়ে উত্তর দিল।

—'ইস্তাহারগুলো পাওয়া গিয়েছে আমাদের এলাকায়। আমাদের ট্রেঞ্চে অন্য কোম্পানির কেউ এসেছিল?'

—'না, স্যার।'

—'আমরা সবাইকে খানাতল্লাস করব।' মার্কুলোভ্ হাত নাড়ল, তারপর দরজার দিকে এগুল।

খানাতল্লাসি শুরু হল। কসাকদের মুখে ফুটে উঠল সর্বপ্রকার অনুভূতির চিহ্ন। কেউ অবাক হয়ে ভুরু কোঁচকাতে লাগল, কেউ কেউ আতঙ্কিত হয়ে অফিসারদের দিকে তাকাতে লাগল। হতদরিদ্র সম্পত্তিগুলো হাতড়ে হাতড়ে দেখবার সময় কেউ কেউ অফিসারদের দিকে তাকিয়ে হাসতেও লাগল। প্রায় কিছুই মিলল না খানাতল্লাসিতে। শুধু একজন কসাকের গ্রেট-কোটের পকেটে ছিল দলাপাকান একটা ইস্তাহার।

—'এটা পড়েছ?' প্রশ্ন করল মার্কুলোভ।

—'সিগারেট পাকানোর জন্যে তুলে নিয়েছিলাম', মাটির দিকে তাকানো চোখদুটো না তুলেই হাসল কসাকটি।

—'হাসছ কেন দাঁত বার করে?' রাগে লাল হয়ে লোকটার দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগুতে এগুতে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল লিস্তনিৎস্কি। প্যাঁশনের নীচে তার চোখদুটো বিচলিতের মত পিটপিট করতে লাগল।

লাল হয়ে উঠল কসাকটার মুখ, মুখের হাসি যেন হাওয়ার দমকে নিভে গেল:

—'মাফ করবেন, হুজুর। পড়তেই জানি না প্রায়। সিগারেটের কাগজ নেই, তাই তুলে নিয়েছিলাম ওটা। দেখলাম পড়ে আছে, তুলে নিয়েছি তাই।' প্রায় ক্রুদ্ধস্বরে উঁচুগলায় সে বলে উঠল।

থুথু ফেলল লিস্তনিৎস্কি তারপর পেছন ফিরল। অন্যান্য অফিসাররাও তার পেছনে পেছনে চলে এল।

॥ ছয় ॥

পরদিন সরিয়ে নেওয়া হল রেজিমেণ্টকে, রাখা হল ফ্রণ্ট থেকে মাইল সাতেক পেছনে। মেসিনগানদলের দ্বজনকে গ্রেপ্তার করে, কোর্টমার্শাল করা হল, কাউকে কাউকে বদলি করা হল সংরক্ষিত রেজিমেণ্টে, কিছু সংখ্যককে ছড়িয়ে দেওয়া হল দ্বিতীয় কসাক ডিভিসনের রেজিমেণ্টগুলোতে। দিনকয়েক বিশ্রাম দেওয়ার পর রেজিমেণ্ট অপেক্ষাকৃত নিয়মের মধ্যে এল। কসাকরা গা হাতপা মুছল, পরিষ্কার করল নিজেদের, এমনকি দাড়িও কামাল। ট্রেঞ্চের প্রথামত তাদের দাড়ি কামাতে হল না। প্রথাটা এই: দাড়িতে আগুন লাগিয়ে আগুনের তাত গালে লাগার সঙ্গে সঙ্গে ভেজা গামছা গালে চেপে ধরা, তারপর পোড়া দাড়ি মুছে ফেলা। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'শুয়োর ছ্যাঁকা দেওয়া।' ফৌজী নাপিত কোন সময় এক খদ্দেরকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'শুয়োরের মত ছ্যাঁকা দেব? নইলে কেমন করে ছাঁটব দাড়ি?' সেই থেকেই এই নাম।

রেজিমেণ্ট আয়েস করতে লাগল। কসাকদের বাইরে থেকে মনে হল লঘু-চিত্ত, গল্পগুজবে ভীষণ মত্ত। কিন্তু লিস্তনিৎস্কি ও অন্যান্য অফিসাররা বুঝল, তাদের এই মনোভাবটা ওপর ওপর, একেবারে অস্থায়ী, নভেম্বরের একটি চমৎকার দিনের মত। রেজিমেণ্টে যে মুহূর্তে ফ্রণ্টে ফিরে যাবার একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল, সেই মুহূর্তে মুখের ভাব পালটে গেল তাদের, সবার ওপরে জেগে উঠল বিক্ষোভ, বিরক্তি আর অসহায়তা। স্পষ্ট হয়ে উঠল প্রচণ্ড ক্লান্তি আর বৈকল্য, সৃষ্টি হল মানসিক অস্থৈর্য আর ঔদাসীন্য।

লিস্তনিৎস্কি খুব ভাল করেই জানে, মানুষ যখন কোন উদ্দেশ্যের জন্যে লড়াই করে, তখন এই ধরনের মনোভাবের প্রভাবে কি ভয়ঙ্করই না হয়ে উঠতে পারে। ১৯১৫ সালে সে দেখেছিল, একটা কোম্পানিকে পাঁচবার পাঠান হয়েছিল আক্রমণ করতে, প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও বারবার তাদের আক্রমণ চালাবার নির্দেশ পালন করতে হয়েছিল। সেই কোম্পানির হতাবশিষ্টেরা অবশেষে নিজেদের খুশিমত এলাকা ছেড়ে এসেছিল, পেছনে চলে যাবার চেষ্টা করেছিল। লিস্তনিৎস্কির কোম্পানির ওপর হুকুম ছিল তাদের বাধা দেবার; যখন শেকলের মত ছড়িয়ে পড়ে কসাকরা তাদের থামাবার চেষ্টা করেছিল, তারা তখন গুলি চালাতে শুরু করেছিল। জন ষাটেকেরও বেশি অবশিষ্ট ছিল না তাদের, কিন্তু লিস্তনিৎস্কি লক্ষ্য করেছিল, মরিয়া হয়ে কি অর্থহীন বীরত্বের সঙ্গে আত্মরক্ষা করেছিল এই ষাটজন, মাথা পেতে দিয়েছিল কসাক তলোয়ারের নীচে, ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছিল মৃত্যুর মুখে, ধ্বংসের পথে, মনে মনে সংকল্প করেছিল, মৃত্যু আসুক আর না আসুক, কিছুই যায় আসে না তাদের।

এক ভয়ঙ্কর স্মৃতি রেখে গিয়েছে ঘটনাটি। উদগ্রীব হয়ে, সশংকচিত্তে মুখগুলো লক্ষ্য করতে লাগল লিস্তনিৎস্কি, ভাবতে লাগল, ওরাও একদিন পিছন ফিরে পশ্চাদপসরণ করবে কি না, মৃত্যু ছাড়া কেউ ওদের বাধা দিতে পারবে না তখন। ওদের চোখে ক্লান্তি আর চাপা ক্রোধের দৃষ্টি দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে মেনে নিতে হল, তা-ই করবে ওরা।

লড়াই শুরু হবার প্রথমদিকের দিনগুলো থেকে একেবারে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে কসাকদের। তাদের গানগুলোও হয়ে উঠেছে নতুন, এ গানের জন্ম হয়েছে লড়াই থেকে, গানের ভাবে এক গম্ভীর আনন্দহীনতা। যে কারখানার প্রশস্ত চালার নীচে কোম্পানিটা আছে, তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে প্রায় সময়ই তার কানে আসে এক কামনাকরুণ বিলাপের গান, ভাষায় যা বর্ণনা করা যায় না। শুনবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ে লিস্তনিৎস্কি, গানের সহজ বেদনাটুকু ভীষণভাবে অভিভূত করে তাকে। হৃদ্পিণ্ডের তালে তালে টান টান হয়ে ওঠে একটা তার, নীচু পর্দায় ধরা সুরের মূর্ছনা সেই তারে আঘাত করে এক বেদনাময় ঝঙ্কার তোলে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে লিস্তনিৎস্কি, তাকিয়ে থাকে শরতের বিষণ্ন সন্ধ্যায়, বুঝতে পারে, তার চোখ জলে ভিজে উঠছে।

রেজিমেণ্টটা বিশ্রাম করার পুরো সময়ের মধ্যে লিস্তনিৎস্কি একবার মাত্র শুনতে পেয়েছিল পুরনো এক কসাকগানের বীররসাত্মক কথাগুলি। সন্ধ্যেবেলায় প্রথামত রাউণ্ড দিয়ে ফিরছিল সে, চালার পাশ দিয়ে যাবার সময় গোলমাল আর অনেকগুলো আধা-মাতালের গলার আওয়াজ কানে এল। কোয়ার্টার-মাস্টার-সার্জেণ্ট পাশের শহরে গিয়েছিল জিনিসপত্তর কিনতে, কিছু বে-আইনী মদ নিয়ে ফিরে এসেছে, তাই দিয়ে কসাকদের একটু মৌজ করিয়েছে, এটা সে সহজেই অনুমান করে নিল। এখন তারা ঝগড়া করছে, কোন কিছু নিয়ে কিংবা কারুর সম্বন্ধে হাসাহাসি করছে। বেশ কিছুটা দূর থেকেই সে শুনতে পেল উদ্দাম, তীক্ষ্ন শিষের শব্দ আর কসাকগানের চড়া সুর।

শুনতে শুনতে অনিচ্ছাসত্বেও সে একটু হাসল, চেষ্টা করল ওই সুরের তালে তালে পা ফেলতে। মনে মনে ভাবল, 'কসাকদের মত পদাতিকবাহিনীর কারুর এমন বাড়ির জন্যে মন কেমন করে না।' কিন্তু আবেগবর্জিত যুক্তি আপত্তি জানাল, পদাতিক সৈন্যও স্বতন্ত্র নয়। তবু, জোর করে ট্রেঞ্চে বসে থাকাটা কসাকদের ওপর নিঃসন্দেহে বেশিরকম বেদনাদায়ক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কারণ, তাদের কাজের বিশিষ্ট প্রকৃতিই তাদের নিরবচ্ছিন্ন গতিশীলতায় অভ্যস্ত করে তুলেছে। আর, গত দুবছর ধরে তারা আটকে আছে ট্রেঞ্চের লড়াইতে, নয়ত এক জায়গায় বসে বসে এগিয়ে যাবার একটানা ব্যর্থ প্রচেষ্টায় দিন গুনছে। তবুও খাড়া হয়ে থাকবে তারা; যদি ভেঙ্গে পড়ে, তাহলে ভেঙ্গে পড়বে সকলের শেষে। তারা নিজেরাই একটা ছোট জাতি, সামরিক ঐতিহ্য তাদের, কারখানাব কুলি-মজুর কিংবা চাষা-ভুষো তারা নয়।

তার ভুলটা ভেঙ্গে দেবার জন্যে যেন ইচ্ছে করেই অন্য একটা গান ধরল এক ক্লান্ত কণ্ঠ। গানটা ধরে নিল অন্য কসাকরা; লিস্তনিৎস্কি শুনতে লাগল, কসাকদের আর্তি রূপ পেয়েছে গানের ভাষায়:

'ভগবানের পুজো করেন জোয়ান-অফিসার।
জোয়ান কসাক বলছে বাড়ি যাব।
'ও, অফিসার, হুজুর, মালিক,
বাড়ি ফিরতে দিন।
বাড়ি ফিবতে দিন আমাকে
বাপের কাছে যাব।
বাপের কাছে যাব, আমার মায়ের কাছে যাব,
ঘরে আমার আছে জোয়ান বৌ।''

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

ভোল্‌হিনিয়ার ভ্যাদিমির-ভোল্‌হিনিস্‌ক্‌ থেকে কোভেল্‌ পর্যন্ত এলাকাটা আটকে রেখেছিল বিশেষ-বাহিনী। আসলে ১৩নং বাহিনীই 'বিশেষ-বাহিনী', কিন্তু উচ্চপদস্থ জেনারেলরাও কুসংস্কারে প্রভাবিত হন বলেই এর নাম রাখা হয়েছে 'বিশেষ-বাহিনী'। ১৯১৬ সালের অক্টোবরের প্রথমদিকে এই এলাকায় এগিয়ে যাবার পরিকল্পনা করা হল, রাস্তা পরিস্কার করে ফেলা হল কামান দেগে দেগে।

আক্রমণের এলাকায় দুটো ডিভিসনকে নিযুক্ত করার নির্দেশ এল ৮০নং কোরের কর্তাদের ওপরে। যাদের বদলি করা হল তাদের মধ্যে রইল চোরনোগর্‌স্ক রেজিমেণ্ট। রাত্রিবেলায় ফ্রণ্ট থেকে স্তোখোদ্‌ নদীর ধারে সরিয়ে আনা হল রেজিমেণ্টকে, উল্টো-দিকে লোকদেখানো মত অগ্রসর হয়ে রেজিমেণ্ট ঘুরল, লাইনের দিকে পেছন দিয়ে সক্রিয় এলাকার দিকে মার্চ করে এগুতে লাগল।

পরদিন সকালে রেজিমেণ্টকে ছড়িয়ে দেওয়া হল এক বনের মধ্যে, পরিত্যক্ত ডাগ্‌আউটের ভেতরে ভেতরে; সেখানে চারদিন ধরে ব্যাটালিয়ন বাদ দিয়ে অর্ধেক-অর্ধেক কোম্পানি নিয়ে এগিয়ে গিয়ে আক্রমণের ফরাসী কায়দা শেখানো হল তাদের। তারপর আবার তারা এগিয়ে চলল। বনের মধ্যে দিয়ে, বনের মধ্যেকার ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে, কামানের চাকার দাগে ক্ষতবিক্ষত বনের পথ ধরে ধরে তিন তিনটে দিন এগিয়ে গেল। বাতাসে আলোড়িত, হালকা, ছোপছোপ কুয়াসা উড়তে লাগল, আটকে রইল পাইন গাছের মাথায় মাথায়, ধূমায়মান জলাভূমির নীলচে-সবুজের ওপরকার ফারগাছগুলোর মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হল। মানুষগুলো ভিজে জবজবে হয়ে উঠল, মেজাজ খিঁচড়ে গেল সবার। একটা গ্রামে এসে পেঁছুল তারা। আক্রমণের এলাকা থেকে খুব দূরে হবেনা সেটা। সেখানে বিশ্রাম করল কিছুদিন, প্রস্তুতি চলতে লাগল মৃত্যুপথযাত্রার।

॥ দুই ॥

একই সময়ে, ৮০নং ডিভিসনের নেতাদের সঙ্গে যুদ্ধস্থলের দিকে এগুচ্ছিল এক বিশেষ কসাক কোম্পানি। কোম্পানির সঙ্গে ছিল তাতাস্কি গ্রামের দ্বিতীয় রিজার্ভ-দলের কসাকরা, দ্বিতীয় দলটা গড়া হয়েছিল পুরোপুরি তাদেরই নিয়ে। সেই দলে ছিল হাত-কাটা শামিলের দুই ভাই, মিলের ভূত-পূর্ব ইঞ্জিন-ম্যান ইভান্‌ আলেক্সিয়েভিচ, আফোংকা ওঝিয়েরোভ্‌, ভূতপূর্ব আতামান মানিত্‌স্কোভ এবং আরও অনেকে।

১৬ই অক্টোবর সকালের দিকে চোরনোগোর্‌স্ক রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়ন যখন চলে যাবার আয়োজন করছে তখন গ্রামে ঢুকল কোম্পানিটা। সৈন্যরা তখন ছুটে বেরিয়ে আসছে আধ-ভাঙা, পরিত্যক্ত বাড়িগুলো থেকে, জমায়েত হচ্ছে রাস্তার ওপরে। কসাকরা এসে হাজির হল রাস্তার বাঁদিক দিয়ে। ইভান্ আলেক্সিয়েভিচ্ ছিল দ্বিতীয়দলের বাইরের দিকের একটা সারিতে। জল-জমা গর্ত বাঁচিয়ে চলার জন্যে মাটির দিকে চোখ রেখে মার্চ করছিল সে। পদাতিক বাহিনীর সার থেকে কে যেন তাকে নাম ধরে ডাকল, ঘাড় ফেরাল সে, সৈন্যদের দিকে তাকাল:

—'ইভান আলেক্সিয়েভিচ! পুরনো দোস্ত...'

বেঁটেখাটো চেহারার একটি সৈনিক নিজের প্লেটুন থেকে বেরিয়ে তার দিকে দৌড়ে আসছে। রাইফেলটা কাঁধের ওপর ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু ফিতেটা সরে গিয়েছে, কোমরে ঝোলানো থালা গেলাসের সঙ্গে রাইফেলের কুঁদো ঘটাং ঘটাং করছে।

—'চিনতে পারছ না আমাকে? এর মধ্যেই ভুলে গেলে?' চেঁচিয়ে উঠল সে।

সৈনিকটির মুখে গালে খোঁচা খোঁচা কটাশে দাড়ি, অতিকষ্টে তাকে ভালেত বলে চিনতে পারল ইভান্ আলেক্সিয়েভিচ। জিজ্ঞেস করল—'তুমি কোত্থেকে এলে হে?'

—'আমি আসছি এই রেজিমেন্টে, ৩১৮নং চোরনোগোর্‌স্কে। পুরনো কোনো বন্ধুকে এখানে দেখতে পাব, স্বপ্নেও কখনো ভাবতে পারিনি।'

ভালেতের ছোট্ট নেংরা হাতটা নিজের চওড়া শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে, খুশী হয়ে উত্তেজিতভাবে ইভান আলেক্সিয়েভিচ হাসল। কসাকদের সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে জোরে পা চালাতে লাগল ভালেত। ইভানের চোখে চোখ রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হল তাকে, আর কাছে কাছে বসানো তার নিজের ক্ষুদে ক্ষুদে শয়তানী চোখ-দুটোও অস্বাভাবিক কোমল ও আর্দ্র হয়ে উঠল।

—'আক্রমণ করতে যাচ্ছি আমরা..'

—'আমরাও।'

—'সে যাক, চলছে কেমন, ইভান আলেক্সিয়েভিচ?'

—'বলার মত কিছুই না।'

—'এখনও তাই। ১৯১৪ সালের পর থেকে ট্রেঞ্চ থেকে বেরুতেই পারিনি আমি।'

—'স্তক্‌মানকে মনে আছে? মরদ ছিল, আমাদের ওসিপ দাভিদোভিচ! এসব কি ঘটছে, তা ঠিক বলে দিতে পারত আমাদের। মরদ যদি কেউ থাকে, তবে সে-ই ছিল..'

—'মনে আছে মানে!' ছোট মুঠোটা ঝাঁকিয়ে, হাসিতে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা মুখখানা কুঞ্চিত করে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'নিজের বাপের চেয়ে বেশি মনে আছে তাকে। সে কি করছে, খবর টবর রাখ?'

—'সে এখন সাইবেরিয়ায়।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ইভান আলেক্সিয়েভিচ।

—'কেমন করে গেল?' বন্ধুর পাশাপাশি লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে চলতে খেঁকশিয়ালের মত কান খাড়া করে প্রশ্ন করল ভালেত।

—'জেলে আছে সে। যত দূর জানি, এতদিন মারা গেছে।'

কয়েক মুহূর্ত কথা না বলে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ভালেত। তার কোম্পানি যেখানে জমায়েত হচ্ছে সেদিকে তাকাল, তারপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ইভানের চোয়াল আর নীচের ঠোঁটের ঠিক নীচেকার গোলাকার টোলটার ওপর। ইভানের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল:

—'আচ্ছা আমি এবার!'

—'মনে হয় না, আবার দেখা হবে আমাদের।'

বাঁ-হাত দিয়ে টুপিটা খুলে ফেলল ইভান, নীচু হয়ে হাত দিয়ে ভালেতের কাঁধ-দুটো জড়িয়ে ধরল। প্রচণ্ড আবেগে চুমু খেল দুজনে, যেন তারা বিদায় নিচ্ছে চিরদিনের জন্যে। দাঁড়িয়ে পড়ল ভালেত। হঠাৎ তার মাথাটা নুয়ে পড়ল বুকের ওপর, ফলে, কটাশে গ্রেটকোটের ভেতর থেকে চোখে পড়তে লাগল শুধু তার কানের গোলাপী ডগাদুটো। জড়সড় হয়ে, হোঁচট খেতে খেতে পেছন ফিরল সে।

সার থেকে বেরিয়ে এল ইভান আলেক্সিয়েভিচ্, কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকল:

—'ও, বন্ধু! বন্ধু! তোমার মনে ত অনেক জ্বালা ছিল, তাই না! মনে আছে? মরদ ছিলে না তুমি...এ্যা?'

চোখের জলে ভেজা মুখখানা ফেরাল ভালেত, খোলা গ্রেটকোট আর ছেঁড়া সার্টের ভেতর দিয়ে হাড় বারকরা বুকের ওপর হাতের মুঠো দিয়ে ঘা মারতে মারতে বলল:

—'হ্যাঁ, ছিলাম! আমি ছিলাম শক্ত কঠিন! কিন্তু এখন ওরা গুঁড়ো করে দিয়েছে আমাকে...তেজী ঘোড়াটাকে হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে মেরেছে!'

আরও কিছু যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল সে, কিন্তু পাশের রাস্তায় মোড় ঘুরল কসাকরা, ইভান আর তাকে দেখতে পেল না।

॥ তিন ॥

কসাকরা গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই দেখা হতে লাগল আহতদের সঙ্গে, প্রথম প্রথম একজন, দুজন, তারপর একসঙ্গে কয়েকজন, অবশেষে দলকে দল। গুরুতরভাবে আহতদের নিয়ে গাদাগাদি করা খানকয়েক গাড়ি চলেছে টিকিয়ে টিকিয়ে। গাড়ি টানছে যে মাদী-ঘোড়াগুলো, তারা হাড়জিরজিরে। হাড় বারকরা পিঠে নিরবচ্ছিন্ন চাবুকের দাগ, জায়গায় জায়গায় ঘায়ের মধ্যে থেকে হাড় দেখা যাচ্ছে। অতিকষ্টে, নাকের আওয়াজ করতে করতে, ধুঁকতে ধুঁকতে গাড়ি টানছে তারা, কাদায় নাক ঠেকে যাচ্ছে প্রায়। মাঝে মাঝে একটা দাঁড়িয়ে পড়ছে, ভেতরে ঢুকে যাওয়া পাশদুটো অশক্তের মত ফুলে ফুলে উঠছে, নৈরাশ্যে মাথা ঝুঁকে পড়ছে। চাবুকের ঘা খেয়ে নড়ছে জায়গা থেকে, ডাইনে বাঁয়ে টলতে টলতে আবার টানতে শুরু করছে। গাড়ির ভেতরে জড়াজড়ি করে আছে আহতরা, এ ওকে সাহায্য করছে।

রাস্তা ছেড়ে এল কসাক কোম্পানি, বনের ভেতরে ঢুকে পড়ল। সন্ধ্যে পর্যন্ত জলের স্রোতনামা পাইনগাছগুলোর নীচে তাদের গাদাগাদি করে রাখা হল। বৃষ্টির জল কলারের ফাঁক দিয়ে সেঁধিয়ে গেল, পিঠ বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল; তাদের নিষেধ করে দেওয়া হল আলো জ্বালাতে, নিষেধ করা না-হলেও এই বৃষ্টিতে আলো জ্বালানো কঠিনই ছিল। সন্ধ্যে হব হব, এমন সময় নিয়ে আসা হল ট্রেঞ্চে। ট্রেঞ্চ অ-গভীর, উঁচুতে একমানুষ প্রমাণও হবে না, জলে ভর্তি, পচা কাদা, নতুন গজানো পাইন-চারার দুর্গন্ধ, বৃষ্টির ভেজা কোমল গন্ধ। অন্ধকারে ঢাকা পাইনবনের

ভেতরে দিয়ে কোম্পানিকে আবার নিয়ে আসা হল ট্রেঞ্চ থেকে। হাসি মস্করায় এ ওর উৎসাহ যুগিয়ে তারা এগিয়ে চলল। কে একজন শিস্ দিতে শুরু করল।

বনের মধ্যে একটা ছোট ফাঁকায় তারা দেখতে পেল মৃতদেহের এক দীর্ঘ সারি। এ ওর কাঁধের ওপর হুমড়ি খেয়ে মৃতেরা পড়ে আছে নানারকম—প্রায় বীভৎস—বিশ্রী ভঙ্গিতে। রাইফেল হাতে, গ্যাস-মুখোস বেল্টের সঙ্গে ঝোলানো এক সেপাই তাদের সামনে পাহারা দিচ্ছে। মৃতদেহগুলোর খুব কাছে নিয়ে আসা হল কসাকদের, এরই মধ্যে পচে ওঠা শ্বাসরোধী গন্ধ নাকে এল তাদের। কমাণ্ডার কোম্পানিকে থামাল, ট্রুপ-অফিসারদের নিয়ে এগিয়ে গেল সেই পাহারাদারদের কাছে, কি যেন বলাবলি করল। ইতিমধ্যে সার ভেঙে কসাকরা এগিয়ে গেল মৃতদেহগুলোর কাছে, মাথার টুপি খুলে নিয়ে তাকিয়ে রইল দেহগুলোর দিকে, মনে তাদের গোপন, অস্থির আতঙ্ক আর পাশবিক কৌতূহলের সেই অনুভূতি, মৃতের রহস্যের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে সমস্ত জীবন্ত প্রাণী যা অনুভব করে। মৃতদেহগুলো অফিসারদের; কসাকরা গুণে দেখল, সাতচল্লিশ জন। বেশিরভাগই অল্পবয়স্ক যুবক, চেহারা দেখে মনে হয়, কুড়ি থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়েস। ডানদিকের একেবারে কোণের লোকটার, যার গায়ে স্টাফ-ক্যাপ্টেনের তকমা আঁটা, বয়স বেশি। তার মুখটা হাঁ করা: হাঁ করা মুখের গহ্বরে গোপন রয়েছে শেষ চিৎকারের মূক প্রতিধ্বনিটুকু; তার ওপর ঝুলছে কালো লোমশ জুলপি; মৃত্যুপাণ্ডুর মুখে আড়াআড়ি কুঞ্চিত হয়ে আছে চওড়া ভুরু দুটো। তাদের দুতিনজনের মাথায় টুপি নেই। এক লেফটানাণ্টের চেহারার দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল কসাকরা, মৃত্যুতেও অপরূপ দেখাচ্ছে তাকে। সে শুয়ে আছে চিৎ হয়ে, বাঁ-হাতটা ছড়ানো, হাতের মুঠোয় একটা পিস্তল, সে মুঠো কোনোকালে আর খুলবে না। স্পষ্টই মনে হল, পিস্তলটা কেউ ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল, তার চওড়া হলদে কব্জিতে আঁচড়ের দাগ; কিন্তু ইস্পাত যেন গলে জমে গিয়েছে হাতের চেটোয়, আর আলাদা করা যাবে না। কোঁকড়ান রেশমি চুলের ওপরে একটা ভাঙা টুপি। মুখটা রয়েছে মাটির সঙ্গে নীচের দিকে গাল চেপে, যেন আদর করছে মাটিকে, তার কমলা-নীল ঠোঁটদুটো অবজ্ঞাভরে অদ্ভুতভাবে কুঁকড়ে আছে। তার ডানধারের প্রতিবেশী পড়ে আছে উপুড় হয়ে, গ্রেট-কোটটা জড়ো হয়ে আছে পিঠের ওপরে, ঝুলটা ছিঁড়ে গিয়েছে, খাঁকিরঙের পা-জামা আর হলদে চামড়ার বুটের ভেতরে শক্ত পা-দুটোর টানটান পেশিগুলো বেরিয়ে পড়েছে, গোড়ালিদুটো একদিকে বাঁকানো রয়েছে। তার মাথায় কোন টুপি নেই, মাথার খুলির ওপরের অংশটাও নেই, কারণ, সেটা উড়ে গিয়েছে গোলার একটা বড়মত টুকরোর আঘাতে। ফাঁকা খুলির চারপাশে ধার ঘেঁসে ভেজা চুলের ঘের, ভেতরে চকচক করছে গোলাপি রঙের বৃষ্টির জল। তার পাশেই পড়ে আছে একজন ছোটখাট শক্তসমর্থ অফিসার, গায়ে খোলা জার্কিন, সার্ট ছেঁড়া। খোলা বুকের ওপরে বেঁকে ঝুঁকে পড়েছে নীচের চোয়ালটা; মাথার চুলের নীচে সরু ফিতের মত কপালটা চকচক করছে, চামড়া পুড়ে কুঁকড়ে একটা নলের মত হয়ে উঠেছে। ভুরু আর চোয়ালের মধ্যে শুধু কয়েকটুকরো হাড় আর থকথকে লাল-কালো লেই। এসবের পেছনে, অসতর্কভাবে জড়ো করা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ওভারকোটের ছেঁড়া নেকড়া, মাথা যেখানে থাকবে সেখানে একটা থেঁতো করা পা। তার পরই একটি কিশোর, পুরন্ত ঠোঁটদুটো, ডিমের মত সুশ্রী মুখ। মেসিনগানের গুলির স্রোত বয়ে গিয়েছে তার বুকের ওপর দিয়ে, গ্রেটকোটে ফুটো রয়েছে চার জায়গায়, পোড়া মাংস উঁচু উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে ফুটোর মধ্যে দিয়ে। —'কাকে...কাকে

ডেকেছিল ও মরার সময়? মাকে?' তোতলাতে তোতলাতে ইভান আলেক্সিয়েভিচ বলে উঠল, দাঁতে দাঁতে ঠকঠক করতে লাগল; হঠাৎ পেছন ফিরে সে হাঁটিতে শুরু করল, এমনভাবে হোঁচট খেতে লাগল যেন অন্ধ হয়ে গিয়েছে।

বুকে ক্রশ করতে করতে কসাকরা তাড়াহুড়ো করে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে এল, একবার ফিরেও তাকালনা পেছনে। সরু ফাঁকা জায়গাটা পার হবার সময় অনেকক্ষণ নীরব হয়ে রইল তারা, যা চোখে দেখতে পেয়েছে তার স্মৃতি থেকে মুক্তি পেলে বাঁচে। কিছুক্ষণ পরে কোম্পানিকে থামান হল পরিত্যক্ত ডাগ্-আউটের এক গোলক-ধাঁধার কাছে; কসাকরা হাত পা ছড়িয়ে দাঁড়াল। বনের মাথায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বাতাসের ঝাপটায় মেঘ উড়িয়ে নিচ্ছে, ছিঁড়ে খুঁড়ে সরিয়ে দিচ্ছে, দূরে আকাশের তারার নীল বিন্দুগুলো ফুটে ফুটে উঠছে। এরই মধ্যে ডাগ্আউটের ভেতরে অফিসারদের জড় করল কমাণ্ডার, একটা মোমবাতির টুকরোর আলোয় একটা বাণ্ডিল খুলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বুঝিয়ে দিতে লাগল।

॥ চার ॥

কসাকরা যখন ডাগ্-আউটের ভেতরে বিশ্রাম করছে, তখন চোরনোগোরস্ক রেজিমেণ্টের প্রথম ব্যাটালিয়ন চলে গেল সামনে দিয়ে। কামানের গোলায় গোলায় গভীর বনে অসম্ভব রকমের গর্ত হয়েছে, সৈন্যরা পা টিপে টিপে সতর্কভাবে এগুতে লাগল; মাঝে মাঝে কেউ হয়ত পড়ে যায় ধপ্ করে, গালাগাল দিয়ে ওঠে চাপাগলায়। কোম্পানির একেবারে ডানধারে ভালেত, লম্বা সারির শেষের দিক থেকে দু'জনের পরে।

—'ও, সাঙাৎ!' বাঁ-দিক থেকে কে যেন হঠাৎ ফিসফিস করে উঠল।

—'বলো?' উত্তর দিল সে।

—'ঠিক আছত?'

সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট্ খেয়ে, জলে-ভর্তি এক গোলার গর্তের মধ্যে বসে পড়ে ভালেত বলল:

—'ঠিকই আছে!'

—'অন্ধকার, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার!' বাঁ-দিকে কে একজন বলল।

মিনিট দুয়েক এইরকমই চলল তারা একে অপরের কাছে অদৃশ্য হয়ে, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে আবার সেই চেরাগলা ঠিক ভালেতের কানে কানে ফিসফিস করে বলল:

—'একসঙ্গে চলা যাক। মন্দ হয় না তাহলে...'

জলেভর্তি বুট পেছল মাটির ওপরে হুঁসিয়ার হয়ে ফেলতে ফেলতে নিঃশব্দে চলতে লাগল তারা। হঠাৎ মেঘের পেছন থেকে বেরিয়ে এল শিং-বাঁকানো, দাগদাগ, একফালি চাঁদ, কুয়াসার ঢেউয়ের বুকে নৌকোর মত ভেসে চলল; পরিস্কার আকাশে পেঁাছে ঢালতে লাগল ম্লান জোছনার বন্যা। চাঁদের আলোয় পাইনের ভেজা চুড়োগুলো ফসফরাসের মত ঝকমক করতে লাগল, মনে হল, পাইনচারার গন্ধ আরও তীব্র হয়ে উঠল, ভেজা মাটিতে আরও ঠাণ্ডা, সোঁদাগন্ধ।

লম্বা সারিটাকে ধরবার জন্যে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল তারা। কিন্তু ভুল হয়ে গেল অন্ধকারে, কেমন করে যেন সামনে পেঁছে গেল। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরার পর, তারা একটা ট্রেঞ্চের অন্ধকার গর্ভে লাফিয়ে পড়ল, ট্রেঞ্চটা এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে অন্ধকারে।

—'এসো ডাগ্-আউটগুলো খুঁজি। খাবারমত কিছু মিলতে পারে।' অনিশ্চিত-ভাবেই প্রস্তাব করল ভালেতের সঙ্গী।

—'বেশ, চল।'

—'ডাইনে যাও তুমি। আমি বাঁ-দিকে যাচ্ছি। আর সবাই এসে পড়ার আগেই খুঁজতে হবে।'

দেশলাই জ্বালাল ভালেত, প্রথমেই যে ডাগ্-আউটটা দেখল তার খোলা দরজার ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ল। কিন্তু আবার ছুটে পালিয়ে এল বাইরে, যেন তাকে ছুট্কে ফেলে দিল পাথরছোঁড়া-কলে; ভেতরে দুটো মড়া পড়ে আছে এ ওর গায়ের ওপর আড়াআড়ি হয়ে। বৃথাই সে তিন তিনটে ডাগ্-আউট খুঁজে খুঁজে দেখল, ধাক্কা মেরে চতুর্থটার দরজা খুলল। এক অদ্ভুত খনখনে গলায় জার্মান কথা শুনে প্রায় ভিরমি খাবার উপক্রম হল তার:

—'কে ওখানে?'

ভালেতের সারা দেহ শিরশির করে উঠল, নিঃশব্দে পিছিয়ে এল লাফ দিয়ে।

—'কে? অটো নাকি? এত দেরী করলে কেন?' কাঁধের ওপর গ্রেট-কোটটা ঠিক করে নিতে নিতে, ডাগ্-আউট থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সে জিজ্ঞেস করল।

—'হাত তোল! হাত তোল! আত্মসমর্পণ কর!' কর্কশকণ্ঠে ভালেত চিৎকার করে উঠল।

বিস্ময়ে মূক হয়ে ধীরে ধীরে হাতদুটো তুলল জার্মানটা, একটু ঘুরে দাঁড়াল পাশে বাগিয়ে ধরা সঙীনের চকচকে ডগাটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কাঁধ থেকে গ্রেট-কোটটা পড়ে গেল, হাতুড়ি পিটিয়ে পিটিয়ে ক্ষতবিক্ষত চওড়া হাত দুখানা মাথার ওপর কাঁপতে লাগল; আঙুলগুলো নড়তে লাগল, যেন ভয়ের অদৃশ্য-তারে ঝঙ্কার তুলছে। ভঙ্গি পরিবর্তন না করে জার্মানটার বিশাল দেহের দিকে তাকিয়ে রইল ভালেত, তার উর্দিতে পেতলের বোতাম, বুট দুটো ছোট ছোট, একপাশে একটু কাত করা চুড়োহীন টুপি। হঠাৎ ভঙ্গি পরিবর্তন করে দুলে উঠল ভালেত, যেন গলিয়ে বেরিয়ে এল গ্রেট-কোট থেকে, গলা দিয়ে বেরুল এক সংক্ষিপ্ত, ঘড়ঘড়ে আওয়াজ—দম আটকানো বা কাশির শব্দ নয় সেটা। জার্মানটার দিকে আগিয়ে গেল সে।

—'পালাও!' ভাঙা গলায় ভালেত বলল। 'পালাও, জার্মান! কোন রাগ নেই তোমার ওপর! গুলি করব না আমি।'

ট্রেঞ্চের দেয়ালে রাইফেলটা হেলান দিয়ে রাখল সে, আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে জার্মানটার ডান হাত অবধি হাতটা বাড়িয়ে দিল। তার অঙ্গভঙ্গিতে আশ্বস্ত হল লোকটা, হাতদুটো নামাল, মন দিয়ে শুনতে লাগল রুশ-সৈনিকের কণ্ঠস্বরের অপরিচিত ঢঙ্।

বিনা দ্বিধায় ভালেত তার নিজের লোমশ, মেহনত-জীর্ণ হাতখানা বাড়াল, জার্মানের অসাড়, শীতল আঙুলগুলো চেপে ধরল। তারপর উঁচু করে দেখাল তার হাতের চেটো। চাঁদের আলো এসে পড়ল তার ওপর, স্পষ্ট হয়ে উঠল হাতের বাদামি কড়াগুলো। ভালেত হেসে বলল:

—'আমি মজুর!' কাঁপতে লাগল সে, যেন গায়ে জ্বর উঠেছে। 'তোমাকে মারব

কিসের জন্যে! পালাও!' মুদু একটা ধাক্কা মারল জার্মানটার কাঁধে, আঙুল দিয়ে বনের কালো রেখার দিকে দেখিয়ে দিল। 'পালাও, হাঁদারাম! এখুনি আমাদের লোকজন এসে পড়বে;...'

ভালেতের বাড়ানো হাতের দিকে তাকিয়ে রইল জার্মানটা, একটু এগিয়ে এল দেহটা, কানখাড়া করে বুঝতে চেষ্টা করতে লাগল দুর্বোধ্য কথাগুলোর অর্থ। এইভাবে মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে রইল সে, চোখদুটো নিবদ্ধ রইল ভালেতের চোখে, হঠাৎ তার ঠোঁটে এক উল্লাসের হাসি কেঁপে উঠল। একপা পেছনে হটে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল সে, জোরে চেপে ধরল ভালেতের হাত, উত্তেজনাভরে হাসিমুখে, রুশ-সৈনিকের চোখে চোখ রেখে হাতখানা নাড়াতে লাগল।'

—'আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ? ও, বুঝতে পেরেছি এখন... তুমি রুশ মজুর? আমারই মত একজন সোস্যাল-ডেমোক্র্যাট? এ্যাঁ...? ভাই, কখনো কি আমি ভুলব...? ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা আমি...কিন্তু তুমি চমৎকার লোক...আমি...'

বিদেশী শব্দের টগবগে তোড়ের মধ্যে একটিমাত্র পরিচিত শব্দ কানে এল ভালেতের—'সোসাল-ডেমোক্রাট'। হাতের হলদে চেটোটা টেনে নিল সে, বুকের ওপর চাপড় মেরে বলল:

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি একজন সোসাল-ডেমোক্রাট। ঠিকই ধরেছ তুমি। এখন পালাও...! বিদায়, ভাই। আর একবার হাতটা দাও। জানইত আমরা সব ভাই, ভাইয়ের কাছ থেকে ভাই কখনো এভাবে বিদায় নেয় না।'

ভীষণ অভিভূত হয়ে, সহজজ্ঞানে একে অপরকে বুঝে নিয়ে, হাতে হাত দিয়ে, চোখে চোখ রেখে তারা দাঁড়িয়ে রইল। রুশ-দল আসছে, তার শব্দ শোনা গেল বনের দিক থেকে। জার্মানটা ফিসফিস করে বলল:

—'আগামীদিনের শ্রেণী সংগ্রামে আমরা একই ট্রেঞ্চে থাকব, তাই না, কমরেড?' তারপর বিরাট ধুসর জন্তুর মত সে লাফ দিয়ে ট্রেঞ্চের ওপর উঠল।

মিনিটদুয়েক পরে রুশ-সৈন্যের দীর্ঘ সারিটা এসে পেঁছিুল সেখানে, তাদের সামনে অফিসার শুদ্ধ একটা চেক্ টহলদার দল। একটা ডাগ্-আউটের ভেতর থেকে গুঁড়ি মেরে ভালেতের সঙ্গী বেরিয়ে আসতেই সবাই একই সঙ্গে গুলি ছুঁড়ে বসেছিল আর কি।

—'আমি যে রুশ, দেখতে পাচ্ছনা?' কালো রুটি লেপেট ধরে, উদ্যত রাইফেলের নলের দিকে তাকিয়ে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল সে।

॥ পাঁচ ॥

ভোরের কিছু আগে চেক্ টহলদার দলটা একটা জার্মান অগ্রবর্তী ঘাঁটির ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল। জার্মানরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালিয়ে স্তব্ধতা চুরমার করে দিল। ঠিক একইরকম বিরতির পর আরও দু'দুবার গুলি চালাল তারা। ট্রেঞ্চের মাথার ওপরে আকাশে উড়ে গেল একটা রক্তিম হাউই, তার লাল ফুলকিগুলো নিভতে না নিভতেই জার্মান কামানগুলো থেকে গোলা দাগা শুরু হল। রুশ সৈন্যদের অনেকদূর

পেছন থেকে, স্তোখোদ্ নদীর ধারে কাছের কোন জায়গা থেকে গোলা ফাটার-আওয়াজ আসতে লাগল।

প্রথম গুলিটা ছুটবার সঙ্গে সঙ্গে, চেকদলের পেছনে প্রায় দুশ হাত সরে গিয়ে, কোম্পানি মাটিতে উপুড় হয়ে আছড়ে পড়ল। মাটির ওপর ছড়িয়ে গেল হাউই'এর রক্তিমাভা। সেই আভায় ভালেত দেখতে পেল, ঝোপঝাড়, গাছ-পালার মধ্যে দিয়ে সৈন্যরা পিঁপড়ের মত হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে, কাদামাটির দিকে আর নজর নেই তাদের, আশ্রয় খুঁজে নেবার তাগিদে মুখ গুঁজছে তার ভেতরে। প্রতিটি খানা খন্দে ভিড় জমিয়েছে তারা ক্ষুদ্রতম মাটির ঢিবির পেছনেও লুকিয়ে পড়েছে. ছোটখাট প্রতিটি গর্তের মধ্যে মাথা-গলিয়ে দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও, যখন গর্জমান মেসিনগানের গুলির ঝাঁকে কালবৈশাখীর ধারার মত পাইনবনে বান ডাকছে, তখন ঠিকমত টিকে থাকতে পারছে না। কাঁধের মধ্যে ঘাড় গুঁজে, শুঁয়োপোকার মত মাটি আঁকড়ে, হাত অথবা পা না-নেড়ে ঘসড়াতে ঘসড়াতে, পেছনে কাদার ওপরে দাগটেনে সাপের মত এঁকে বেঁকে, বুকে হেঁটে পিছিয়ে এল তারা। কেউ কেউ লাফিয়ে উঠে দৌড়ুতে শুরু করল। পাইনের চারাগাছগুলো ঝেঁটিয়ে নিয়ে নিয়ে, ডালপালা টুকরো টুকরো করে, ফাটন্ত বুলেটগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে, বন তছনছ করে সাপের মত হিস্ হিস্ করতে করতে মাটিতে গেঁথে যেতে লাগল।

চোরনোগোরুস্ক রেজিমেণ্টের প্রথম কোম্পানি আবার যখন ট্রেঞ্চের দ্বিতীয় সারিতে গিয়ে পৌঁছুল দেখা গেল সতের জন খোয়া গিয়েছে। একটু দূরে, বিশেষ বাহিনীর কসাকরাও জমায়েত হচ্ছিল। চোরনোগোরুস্ক কোম্পানির ডান দিকে এগিয়ে গিয়েছিল তারা, এগিয়ে গিয়েছিল হুঁসিয়ার হয়ে, এবং বোকা বানিয়েও দিতে পারত জার্মানদের, সংখ্যার জোরে তাদের ঘাঁটি দখল করে নিতে পারত। কিন্তু চেকদের ওপর যখন গুলি ছোঁড়া শুরু হল, তখনই গোটা এলাকা জুড়ে জার্মানরা সতর্ক হয়ে উঠেছিল। শত্রু এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে দুজন কসাককে মেরে ফেলল, অপর একজনকে আহত করল।

আধঘণ্টার মধ্যে রেজিমেণ্টের দপ্তর থেকে আরও একটা নির্দেশ এসে পৌঁছুল। কামান থেকে গোলা দেগে দেগে পথ পরিষ্কার করার পর চোরনোগোরুস্ক রেজিমেণ্ট আর বিশেষ কসাক কোম্পানিকে আক্রমণ করতে হবে আবার, ট্রেঞ্চের প্রথম সারি থেকে শত্রুকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

শতমুখী নদী স্তোখোদের পঁচিশ মাইল ভাটিতে তুমুল লড়াই বাধল। তিন সপ্তাহ ধরে কামানগুলো না থেমে গর্জন করে চলল। সার্চ-লাইটের আলোয় রাত্রে বহুদূরের বেগুনি আকাশ ফালা ফালা হয়ে গেল, আকাশে আবছায়া রামধনু রং ফুটে উঠতে লাগল। বহুদূরে থেকে যারা আগুনের শিখা আর যুদ্ধের বিস্ফোরণ লক্ষ্য করল, তাদের মনে এমন এক অস্বস্তি সংক্রামিত হয়ে উঠল, যা ব্যাখ্যা করা যায় না।

এদিকে ১২নং কসাক রেজিমেণ্ট—যার মধ্যে গ্রিগরের কোম্পানিও আছে—একটা জঙ্গলময় জলা-এলাকা আটকে রেখেছিল। দিনের বেলায় তারা উল্টোদিকে সার বাঁধা অস্ট্রিয়ানদের অগভীর ট্রেঞ্চগুলো লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। রাত্রে জলাভূমিতে সুরক্ষিত হয়ে ঘুমোয়, তাস খেলে। পাহারাদাররা শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, স্তোখোদ নদীর সেই পঁচিশ মাইল ভাটিতে, যেখানে একটানা লড়াই চলছে, সেখানে কমলারঙের আলোর ফুলঝুরি ফেটে পড়ছে।

এমনি এক গা-শির-শির-করা কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রিতে, যখন আকাশে—যেমনটি হয়ে থাকে তার চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট করে, বহুদূরের আলোর প্রতিফলন কেঁপে কেঁপে ওঠে—ডাগ্-আউট ছেড়ে বেরিয়ে এল গ্রিগর মেলেখফ, যোগাযোগের ট্রেঞ্চ ধরে এগিয়ে চলল বনের দিকে। ট্রেঞ্চের পেছনে নীচু পাহাড়টার কালো চুড়োর ওপর ধূসর তুলির টানের মত স্পষ্ট হয়ে আছে বন। গন্ধমাখা প্রশস্ত মাটিতে আছড়ে পড়ল সে। ডাগ্-আউটের ভেতরে শ্বাসরোধকরা, কষ্টদায়ক বাতাস, আটজন কসাক মিলে তাস খেলে যে টেবিলে, তার ওপরে জরাজীর্ণ লেপের মত ঝুলতে থাকে বাদামি রঙের তামাকের ধোঁয়া। কিন্তু এই পাহাড়ের চুড়োয়, বাতাস আসছে বনের ভেতর থেকে, এত নিঃশব্দে, যেন বাতাস এসে লাগছে উড়ে যাওয়া অদৃশ্য পাখির ডানা থেকে। তুষার-ছিন্ন ঘাস থেকে উঠছে এক শোকমন্থর আঘ্রাণ। গোলার আঘাতে ন্যাড়াবনের মাথায় অন্ধকার জমে আছে: দূর আকাশে জ্বলে জ্বলে নিভে আসছে মৃত্তিকার ধূমায়মান অগ্নি, ছায়াপথের একধারে উপুড় করা গাড়ির মত পড়ে আছে কাল-পুরুষ, উঁচিয়ে আছে তার হাতের তীরটা, একেবারে উত্তরে স্থির, ম্লানজ্যোতিতে মিটমিট করছে ধ্রুবতারা।

ওই তারার দিকে তাকাল গ্রিগর; হিমশীতল তার আলো, ম্লান, অথচ অদ্ভুতভাবে চোখে এসে বেঁধে; চোখের পাতার নীচে থেকে শীতল অশ্রু ঠেলে এল। স্মৃতির ঝলকে চোখের সামনে পষ্ট হয়ে উঠল যুদ্ধ শুরু হবার পরেকার বছরগুলো। মনে পড়ল সেই রাত্রির কথা, যেদিন সে ইয়াগোদনোয়ে গিয়েছিল আকসিনিয়ার কাছে। হঠাৎ বেদনা জাগিয়ে মনে পড়ল সেই মুখখানি; সেই প্রিয়, অথচ দূরে সরে যাওয়া মুখের রেখাগুলো, অনিশ্চিতভাবে ভেসে উঠল চোখের সামনে। হৃৎপিণ্ডের তাল দ্রুততর হয়ে উঠল। মনে করতে চেষ্টা করল সেই মুখখানি, শেষবারের মত যেমনটি

সে দেখেছিল—বেদনায় বিকৃত, গালের ওপরে চাবুকের লাল দাগ। কিন্তু স্মৃতিতে বারংবার ভেসে উঠতে লাগল আর একখানা মুখ, এক পাশে একটু কাত করা, ঠোঁটে ম্লান হাসি। দৃঢ়প্রত্যয়ে, কামনাতুরের মত আবার ঘাড় ফেরাল আর্কাসিনিয়া, জ্বলজ্বল করা কালো চোখে তার দিকে তাকিয়ে, নির্লজ্জ কামনাঘন, লালটুকটুকে ঠোঁটে, গদগদ প্রেমে কি যেন ফিসফিস করে বলল; তারপর ধীরে ধীরে তার দিক থেকে চোখ ফেরাল, ঘাড় ফিরিয়ে নিল, পুরন্ত ঘাড়ের কাছে সেই ফাঁপানো চুলের গুচ্ছ দুটি দেখতে পেল গ্রিগর। কত ভালইনা বাসত ওই গুচ্ছটিতে চুমু খেতে।

শিউরে উঠল গ্রিগর। মুহূর্তের জন্যে মনে হল, আর্কাসিনিয়ার চুলের অপরূপ, মনমাতানো গন্ধও ভেসে আসছে নাকে, নাকের পাশ-দুটো ফোলাল সে। কিন্তু না! ঝরাপাতার বিভ্রান্তিকর গন্ধ সেটা। ঝাপসা হয়ে এল আর্কাসিনিয়ার মুখখানা, মিলিয়ে গেল তারপরে। চোখ বুজল গ্রিগর, এবড়োখেবড়ো মাটির ওপর হাতখানা চেপে ধরল। মাটিতে শুয়েই রইল সে। ভেঙেপড়া পাইন গাছগুলোর অনেক পেছনে এক নিশ্চল উড়ন্ত, নীল প্রজাপতির মত ধ্রুবতারাটা ঝুলছে, ওই দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আরও অনেক কিছুর স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে গেল আর্কাসিনিয়া। আর্কাসিনিয়াকে ছেড়ে আসার পর তাতার্স্কে পরিবারের মধ্যে কাটানো সপ্তাহগুলোর কথা মনে পড়ল তার; রাত্রে নাতালিয়ার ক্ষুধার্ত, সর্বগ্রাসী আলিঙ্গন, তার আগেরদিনের কুমারীজনোচিত শীতলতা যেন পুষিয়ে দিতে চাইত; দিনের বেলায়, পরিবারের সতর্ক, প্রায় প্রতিদ্বন্দ্ব-জানানো হাবভাব; আর গ্রামের প্রথম সেণ্ট জর্জ ক্রশ পাওয়া বীরকে সম্ভাষণ করার সময় গ্রামের লোকের সম্মান দেখানো। সব জায়গায়—এমনকি বাড়িতেও, গ্রিগরের চোখে পড়ত, বিস্ময় আর সম্ভ্রমের তীর্যকদৃষ্টি। তারা সবাই যেন তাকে যাচিয়ে দেখত, যেন বিশ্বাসই করতে পারত না, এই সেই একই গ্রিগর, এমন ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, প্রাণবন্ত যুবক হয়ে উঠেছে। বুড়োরা তার সঙ্গে কথা বলত সমবয়সীর মত, দেখা হলেই মাথার টুপি খুলত। তার ফিটফাট, একটু ঝুঁকে পড়া চেহারা আর বুকের ক্রশের দিকে বিস্ময় গোপন না করেই যুবতী, বৃদ্ধারা তাকিয়ে থাকত। সে লক্ষ্য করত, একসঙ্গে গির্জায় কিংবা বারোয়ারিতলায় যাবার পথে স্বভাবতই কেমন গর্ব বোধ করত তার বাবা। আর, স্তাবকতা, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের এই সমস্ত সূক্ষ্ম, মেশাল দেওয়া বিষে ধীরে-ধীরে চাপা পড়ে তার চেতনা থেকে সেই সত্যটুকু মুছে গিয়েছিল, গারানঝা যার বীজ বুনেছিল। এক মানুষ হিসাবে তাতার্স্ক গ্রামে গিয়েছিল গ্রিগর, ফ্রণ্টে ফিরে এসেছিল আর এক মানুষ হয়ে। তার নিজের কসাক জাতীয় ঐতিহ্য, মায়ের বুকের দুধের সঙ্গে যা পাওয়া, সারাজীবন ধরে যাকে ভালবাসা, তা মাথা তুলে দাঁড়াল মহত্তর মানবিক সত্যকে ছাড়িয়ে।

বিদায় নেবার সময়, বুড়ো পান্তালিমন তার কাঁচা-পাকা দাড়িতে টোকা দিতে দিতে বলেছিল, 'আমি জানি, তুই সাঁচ্চা কসাকই হবি গ্রিগর। তুই যখন একবছরের, তোকে উঠোনে নিয়ে গিয়ে জিনছাড়া ঘোড়ার পিঠেই বসিয়ে দিয়েছিলাম, পুরনো কসাক প্রথা তা-ই। আর, তুই, তুই ক্ষুদে শয়তান, তুই কিনা ছোট্ট মুঠোয় খপ্ করে চেপে ধরেছিলি ঘোড়ার চুল; তখনই বলেছিলাম, সাঁচ্চা কসাক হবি তুই। হয়েছিসও তাই।'

সাঁচ্চা কসাক হয়েই ফ্রণ্টে ফিরে এসেছিল গ্রিগর। মনে মনে তখনো খাপ খাওয়াতে পারেনি যুদ্ধের এই অর্থহীনতা, কিন্তু তা সত্ত্বেও, বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করে চলেছিল কসাক-সম্মান।

১৯১৫ সালের মে মাসে ১৩নং জার্মান আয়রন রেজিমেণ্ট ওল্‌খোভ্‌শ্‌চিক্‌ গ্রামের কাছাকাছি এগ্নতে শ্নর্ন করেছিল ঝলমলে সব্নজ মাঠের ওপর দিয়ে। কট্‌কট্‌ কট্‌কট্‌ আওয়াজ তুলছিল মেসিনগান। ছোট্ট নদীটার ধারে ধারে বসান র্নশ রেজিমেণ্টের ভারী মেসিনগ্নলোও উত্তর দিচ্ছিল জোরের সঙ্গে। জার্মান আক্রমণের আঘাতটা সহ্য করছিল ১২নং কসাক রেজিমেণ্ট। শত্র্নর আগমনের প্রতীক্ষারত গ্রিগর তাকিয়েছিল পেছন দিকে, দেখতে পেয়েছিল মাঝ-বেলার আকাশে স্নর্যের গনগনে বলয়রেখাটি, আরও একটা স্নর্য দেখতে পেয়েছিল নল-খাগড়ায় ঢাকা নদীর জলে। নদীর ওপারে, পপলার গাছগ্নলোর পেছনে ছিল কসাকদের ঘোড়াগ্নলো, আর সামনে ছিল জার্মানদের সার, লোহার হেলমেটে তামার তৈরি ঈগলের হল্নদ ঝলকানি। বাতাসের একটা ঝাপটায় তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল কামানদাগার নীলচে ধোঁয়া। ধীরে স্নস্থে গ্নলি ছ্নঁড়তে শ্নর্ন করেছিল গ্রিগর, মন দিয়ে টিপ করে করে, একবার ছ্নঁড়ে আর একবার ছ্নঁড়বার আগে কমাণ্ডারের ম্নখে পাল্লার নির্দেশ শ্ননে শ্ননে। জামার হাতায় এসে বসেছিল একটা প্রজাপতি, সন্তর্পনে সরিয়ে দিয়েছিল সেটাকে। তারপর শ্নর্ন হয়েছিল আক্রমণ। রাইফেলের কুঁদোর ঘা মেরে এক লম্বা জার্মান লেফটানাণ্টকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল সে, বন্দী করেছিল তিনজনকে, মাথার ওপর দিয়ে গ্নলি ছ্নঁড়ে নদীর দিকে দৌড়্নতে বাধ্য করেছিল তাদের।

১৯১৫-সালের জ্নলাই মাসে একটা কসাকদল নিয়ে অস্ট্রিয়ানদের দখল করে নেওয়া একসার কামান উদ্ধার করেছিল গ্রিগর। সেই একই য্নদ্ধে শত্র্নর একেবারে পেছনে চলে গিয়েছিল, কাঁধে বয়ে নেওয়া মেসিনগান থেকে গ্নলি চালিয়েছিল তাদের ওপর, এগিয়ে-আসা অস্ট্রিয়ানদের হটে যেতে বাধ্য করেছিল। তারপর সে বন্দী করেছিল গোলগাল এক অফিসারকে, জিনের ওপরে চাপিয়ে নিয়েছিল তাকে, যেন সে একটা ভেড়া।

পাহাড়ের ধারে শ্নয়ে থাকতে থাকতে বিশেষ করে গ্রিগরের মনে পড়ল একটি ঘটনা, যখন তার দেখা হয়েছিল পরম শত্র্ন স্তেপান আস্তাখোভের সঙ্গে। ১২নং রেজিমেণ্টকে ফ্রণ্ট থেকে সরিয়ে এনে নিয়োগ করা হয়েছিল প্নর্ব প্র্নশিয়ায়। জার্মান-দের সাজানো ক্ষেতগ্নলো মাড়িয়ে ফিরছিল কসাক ঘোড়াগ্নলো, জার্মান গ্রামগ্নলোকে গ্নলির ম্নখে উড়িয়ে দিচ্ছিল কসাকরা। যে পথ দিয়ে তারা চলছিল সেই পথ বরাবর কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠছিল রক্তিম ধোঁয়ার প্নঞ্জ, পোড়া দেয়াল আর টালির ছাদগ্নলো গ্নঁড়িয়ে পড়ছিল ধ্নলোয়। স্তলপিন শহরের কাছে ২৭নং ডন-কসাক রেজিমেণ্টের পাশে গিয়ে আক্রমণ শ্নর্ন করেছিল রেজিমেণ্ট। দাদা পিয়োত্রা, পরিষ্কার করে দাড়ি গোঁফকামানো স্তেপান, আর গ্রামের অন্যান্য কসাকদের ম্নহ্নর্তের জন্যে দেখতে পেয়েছিল সে। পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল রেজিমেণ্টকে, জার্মানরা ঘিরে ফেলেছিল। শত্র্নর বেড়াজাল থেকে ম্নক্তি পাবার জন্যে বারটা কোম্পানি যখন একের পর একে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, গ্রিগর তখন দেখতে পেয়েছিল স্তেপানকে। ঘোড়াটা মারা পড়ায় তড়াক করে লাফিয়ে নেকড়ের মত নেমে চক্রাকারে ঘ্নরছিল। এক উল্লসিত সিদ্ধান্তে অস্থির হয়ে ঘোড়ার লাগামে টান দিয়েছিল গ্রিগর, স্তেপানকে পায়ের নীচে প্রায় দলে যখন শেষ কোম্পানিটা পেরিয়ে গিয়েছিল, তখন স্তেপানের কাছে ঘোড়া ছ্নটিয়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল:

—'রেকাবটা চেপে ধর!'

রেকাবের ফিতেটা চেপে ধরে গ্রিগরের ঘোড়ার পাশে পাশে প্রায় আধমাইলটেক

ছুটে এসেছিল স্তেপান। 'অত জোরে ঘোড়া ছুটিও না, অত জোরে না, দোহাই তোমার!' মুখ হাঁ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বারবার অনুনয় করেছিল সে।

জার্মান ব্যূহের ফাঁকের ভেতর দিয়ে সাফল্যের সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছিল তারা। তাদের কোম্পানিগুলো পিছু হটে যে বনের মধ্যে ঢুকেছিল, তা থেকে শ'চারেক হাত দূরেও হবে না, একটা গুলির ঘায়ে ছিটকে উঠেছিল স্তেপান, মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল। বাতাসে গ্রিগরের টুপি উড়ে গিয়েছিল, চুলগুলো ঝেঁপে পড়েছিল চোখের ওপর। চুল সরিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়েছিল সে, দেখতে পেয়েছিল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে স্তেপান এগিয়ে গিয়েছিল একটা ঝোপের দিকে, কসাক টুপিটা ছিঁড়ে ফেলে বসে বসে পা-জামার বোতাম খুলতে শুরু করেছিল। পাহাড়ের পেছন থেকে ছুটে আসছিল জার্মানরা। বেশ বুঝতে পেরেছিল গ্রিগর, স্তেপানের মরবার ইচ্ছে নেই, সেইজন্যেই ছিঁড়ে ফেলছিল পা-জামা, সে জানত জার্মানরা কসাককে কোন দয়া দেখায় না। হৃদপিণ্ডের স্পন্দন আয়ত্তে এনে ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে এসেছিল ঝোপের কাছে, ঘোড়া ছোটা-অবস্থাতেই লাফিয়ে নেমেছিল মাটিতে।

—'আমার ঘোড়ায় ওঠ!' স্তেপানকে হুকুম করেছিল সে।

ঘোড়ায় তুলে দেবার সময় স্তেপানের সংক্ষিপ্ত চাউনিটুকু ভুলবার মত নয়। রেকাব ধরে পাশে পাশে দৌড়ে এসেছিল গ্রিগর, তাদের মাথার ওপর দিয়ে শিষ মেরে গুলি ছুটছিল, ডাইনে বাঁয়ে পেছনে তোড়ের মুখে ছুটে আসা গুলির শব্দ উঠছিল পাকা বাবলার ফল ফাটার মত।

বনের মধ্যে বেদনাবিকৃত মুখে স্তেপান নেমে পড়েছিল জিন থেকে, তারপর খোঁড়াতে শুরু করেছিল। রক্ত ঝরছিল ডানপায়ের বুটের ভেতর থেকে, প্রতিটি পদক্ষেপে বুটের ছেঁড়া তলা থেকে বেরিয়ে আসছিল চেরি-ফুলের রঙের মত ক্ষীণ ধারা। একটা ঝাঁকড়া ওকগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে গ্রিগরকে কাছে আসতে ইসারা করেছিল। কাছে এলে স্তেপান বলেছিল:

—'রক্তে আমার বুট ভর্তি হয়ে উঠেছে!'

অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে ছিল গ্রিগর।

—'গ্রীস্‌কা! আজ যখন আক্রমণ করতে গিয়েছিলাম...শুনছো, গ্রিগর?' শত্রুর চোখে চোখে তাকাতে চেষ্টা করে স্তেপান বলেছিল। 'যখন আক্রমণ করতে গিয়েছিলাম, পেছন থেকে তিন তিনবার গুলি ছুঁড়েছিলাম তোমাকে লক্ষ্য করে..ভগবান বাধা দিয়েছে তোমাকে খুন করতে।'

চোখে চোখে মিলেছিল দুজনের। ভেতরে বসে যাওয়া কোটর থেকে চোখের তীক্ষ্ম মনিদুটো জ্বলজ্বল করে উঠেছিল অসহ্য যন্ত্রণায়। ঠোঁটদুটো প্রায় না নেড়েই সে বলেছিল।

—'তুমি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ...ধন্যবাদ...কিন্তু আকসিনিয়ার জন্যে ক্ষমা করব না...মন তা পারবে না ..আমাকে বাধ্য করোনা, গ্রিগর...'

—'বাধ্য তোমাকে করব না,' উত্তর দিয়েছিল গ্রিগর। আগের মতই শত্রু হিসেবে ছাড়াছাড়ি হয়েছিল তাদের।

মে মাসে, ব্রুসিলোভ বাহিনীব অন্যান্য সেকসনদের সঙ্গে লুৎস্কের কাছে তাদের রেজিমেন্ট ফ্রন্ট ভেঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল, আঘাত হেনে, আঘাত সহ্য করে হৈ হৈ ব্যাপার শুরু করে দিয়েছিল শত্রুর পেছনে। লভোতে গ্রিগর নিজে তার কোম্পানিকে দিয়ে একটা আক্রমণ চালিয়েছিল, একটা অস্ট্রিয়ান হাউইজার বাহিনীকে পেছনে হটিয়ে

দিয়েছিল। প্রায় মাসখানেক পরে এক রাত্রে সাঁতরে পার হয়েছিল বাগ্ নদী, পাকড়াও করেছিল এক পাহারাদারকে, গ্রিগর তাকে বেঁধে ফেলার আগে অন্ধকারের মধ্যে বহুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছিল তারা।

বীরের মত গ্রিগর তার কসাক-গৌরব রক্ষা করে এসেছে, কসাকের অমর বীরত্ব প্রমাণ করার প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করে এসেছে, জামাকাপড় ছেড়ে, শত্রুর পেছনে চলে গিয়ে ঘাঁটি দখল করে নেবার উন্মাদজনোচিত ঝুঁকিতে জীবনকে বিপন্ন করেছে; মনে মনে অনুভব করেছে, যুদ্ধের প্রথম দিকে অপরের ~~স্ব~~ বেদনাবোধ তাকে পীড়ন করত, তা চিরকালের জন্যে মুছে গিয়েছে। তার মন শক্ত হয়েছে, বৃষ্টিহীন কঠিন লবন-জমির মত। লবন-জমিতে যেমন জলের স্থান নেই, তার মনেও তেমনি মমতার স্থান নেই। নিরুত্তাপ অবজ্ঞায় সে খেলা করেছে অপরের জীবন দিয়ে, নিজের জীবন নিয়ে, নিজেকে গৌরবমণ্ডিত করেছে। চারটে সেণ্ট জর্জ ক্রশ এবং আরও চারটে অন্য মেডেল পেয়েছে সে। বিশেষ কোন কুচকাওয়াজের সময় সে দাঁড়ায় গিয়ে অসংখ্য যুদ্ধের বারুদের ধোঁয়ায় মলিন রেজিমেণ্টের ঝাণ্ডার নীচে। সে জানে, কি মূল্য সে দিয়েছে তার এই ক্রশ আর মেডেলগুলোর জন্যে।

গ্রেট-কোটের ধারদুটো পিঠের নীচে গুঁজে, বাঁহাতের কনুইতে ভর রেখে, পাহাড়ের ধারে শুয়ে রইল সে। তার স্মৃতি বিশ্বস্তের মত অতীতকে পুনর্জীবিত করে তুলল, সেই স্মৃতির জালে যৌবনের কোন পুরনো কাহিনী নীল মিহি সুতোর মত জড়িয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে বিষণ্ণভাবে, করুণাভরে তার ওপরে মনের চোখ রাখল, তারপর ফিরে এল বর্তমানে। অস্ট্রিয়ান ট্রেঞ্চের ভেতরে কে যেন ম্যাণ্ডোলীন বাজাচ্ছে। স্তোখোদ নদীর বুকের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে বাতাসে ঢেউ-তোলা মিহিসুরের মূর্ছনা, আলতোভাবে ছড়িয়ে পড়ছে মাটিতে, যে মাটি সদাসর্বদা মানুষের রক্তে ভিজে আছে। ঊর্ধ্ব আকাশে জ্বলজ্বল করছে তারা, কিন্তু অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে, জলা-ভূমির বুকে মধ্য-রাত্রির কুয়াশা নুয়ে পড়েছে। পর পর দুটো সিগারেট টানল গ্রিগর, তারপর মাটির কোল থেকে উঠল। ফিরে এল ট্রেঞ্চে।

॥ দুই ॥

ডাগ্-আউটের ভেতরে তখনো তাস খেলছিল সাথীরা। নিজের জায়গায় এসে শুয়ে পড়ল গ্রিগর, ঘুমিয়ে পড়ল তারপরে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল—শুষ্ক পাণ্ডুর, অন্তহীন স্তেপ, গোলাপীরঙের কাঁটা-ফুল আর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সুগন্ধি লতার মধ্যে মধ্যে নাল না-পরানো ঘোড়ার খুরের ছাপ। জনপ্রাণীহীন স্তেপ, ভয়াবহ নিঃশব্দ। কঠিন, বালিমাটির ওপর দিয়ে হাঁটছে সে, কিন্তু তার নিজের পায়ের শব্দই কানে আসছে না, আর তাতেই ভীত হয়ে উঠছে...মুহূর্তের জন্যে ঘুমের চট্‌কা ভেঙ্গে গেল তার অপরিচিত কোন ঘাস-পাতার গন্ধ নাকে গেলে একটুক্ষণের জন্য ঘোড়া যেমন করে, তেমনি করে ঠোঁট চিবুতে চিবুতে মাথা তুলল সে। তারপর আবার ঘুমে ঢলে পড়ল —নিরুদ্বেগ, নিঃস্বপ্ন ঘুম।

বুঝিয়ে বলা যায় না এমন একটা কুরে কুরে খাওয়া আর্তির পীড়া নিয়ে পরদিন ঘুম ভাঙল গ্রিগরের।

—'আজ উপোস করে আছ কিসের জন্যে। কাল রাতে বাড়ির স্বপ্ন দেখেছ নাকি?' উরিউপিন জিজ্ঞেস করল তাকে।

—'ধরেছ ঠিকই। স্তেপের স্বপ্ন দেখছিলাম...এমন মিইয়ে গিয়েছি আমি...বাড়ি ফিরে যেতে পারলে বাঁচি। ঘেন্না ধরে গিয়েছে জারের নোকরি করে...'

স্নায় দিয়ে হাসল উরিউপিন। একটানা সে আছে একই সঙ্গে একই ডাগ্-আউটে; একটা সবল জন্তু আর একটা সবল জন্তুকে যেমন সমীহ করে, তেমনই সমীহ করে সে গ্রিগরকে। তাদের সেই ১৯১৪ সালের ঝগড়ার পর থেকে আর কোন খিটিমিটিই বাধেনি; গ্রিগরের পরিবর্তিত চরিত্রে ও মনে উরিউপিনের প্রভাব স্পষ্টই ধরা পড়ে। উরিউপিনের দৃষ্টিভঙ্গিকে ভীষণভাবে বদলে দিয়েছে। ধীরে ধীরে বুঝলেও, দ্বিধাহীনভাবেই সে যুদ্ধ-বিরোধী মনোবৃত্তির দিকে ঝুঁকেছে। বিশ্বাসঘাতক জেনারেল আর জারের প্রাসাদের জার্মানদের সম্পর্কে ভীষণ আলোচনা করে। 'স্বয়ং জারিনাই যখন জার্মান বংশের তখন ভালো কিছু আশা করবার নেই হে...'

গ্রিগর গারানঝার কথাগুলো ব্যাখ্যা করতে যায়, কিন্তু কানেই তোলে না উরিউপিন।

—'গানটাতো ভালই, কিন্তু গলাটা বড় বাজখাঁই,' বসিয়ে মুচকি হেসে সে বলে, মিশা কোশেভয় তো পাঁচিলে ওঠা মোরগের মত দিনরাত ক'কর্ ক' করছে।' এই ধরনের বিপ্লবের মাথামুণ্ডু নেই, কোনই ফয়দা হয় না এতে, শুধুই ক্ষতি। মনে রেখো, কসাকদের যা দরকার, তা হচ্ছে তাদের নিজেদের সরকার, অন্য কোন সরকার নয়! আমাদের দরকার হচ্ছে নিকোলাই নিকোলেইচের মত জবরদস্ত জার; 'চাষী'দের সঙ্গে কোন মিলই নেই আমাদের, হাঁস আর শুয়োর কখনো দোস্ত হয় না। 'চাষী'রা চায় তাদের জন্য জমি, মজুররা চায় বেশি মজুরি। কিন্তু আমাদের তারা দেবে কি? জমিত আমাদের প্রচুরই আছে...ও হোঃ! আর চাই কি? আমাদের জার যে রাঙা-মুলো, তা অস্বীকার করে লাভ নেই! ওর বাপ ছিল জবরদস্ত, কিন্তু ব্যাটা বসে থাকবে, যতক্ষণ না বিপ্লব এসে কড়া নাড়ে, ঠিক যেমনটি হয়েছিল ১৯০৫ সালে, তারপর তারা গড়াতে গড়াতে একসঙ্গে যাবে জাহান্নমে। এতে করবার কিছুই নেই আমাদের; একবার যদি তারা জারকে তাড়াতে পারে, এসে পড়বে আমাদের ঘাড়ে। আবার সেই পুরনো লড়াই শুরু হবে এখানে, 'চাষী'দের দেবার জন্যে ওখানে কাড়তে শুরু করবে আমাদের জমি। চোখ কান খুলে সজাগ হয়ে থাকতে হবে আমাদের।'

—'তুমি শুধুই এক-তরফা ভাবো।' ভুরু কোঁচকায় গ্রিগর।

—'বড্ড বাজে বকো তুমি। বয়স কম, দুনিয়াটা দেখনি। কিছুদিন অপেক্ষা করো, বুঝবে কার কথা খাঁটি।'

এইভাবেই সাধারণত শেষ হয় তাদের তর্কাতর্কি। চুপ করে যায় গ্রিগর, উরিউপিন চেষ্টা করে অন্য কোন কথা পাড়তে।

॥ তিন ॥

সেইদিনই এক বিশ্রী ঘটনায় জড়িয়ে পড়ল গ্রিগর। দুপুর বেলা রোজকার মতই পাহাড়ের অপর প্রান্তে খাবার-গাড়ি এসে থামল। যোগাযোগের ট্রেঞ্চ বরাবর এ ওর গায়ে চাপাচাপি করে দাঁড়াল কসাকরা। তৃতীয় দলের জন্যে মিশা কোশেভয় গেল

খাবার আনতে, বড় একটা ডাণ্ডার সঙ্গে ঝুলিয়ে ধূমায়মান পাত্রগুলো নিয়ে ফিরে এল। ডাগ্‌আউটে ঢুকতে না ঢুকতেই চিৎকার করে উঠল সে:

—'এসব চলতে পারে না, ভাই সব! আমরা সব কুকুর, না, কি?'

—'ব্যাপার কি?' উরিউপিন জিজ্ঞেস করল।

—'মড়া ঘোড়ার মাংস খাওয়াচ্ছে।' রাগে চেঁচিয়ে উঠল কোশেভয়। সোনালী-চুলভরা মাথাটা পেছনে হেলিয়ে একটা বিছানার ওপরে পাত্রগুলো রাখল, উরিউপিনের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল:

—'নিজেই শুঁকে দেখ না ঝোলে কিসের গন্ধ!'

পাত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ল উরিউপিন, নাকের পাশ দুটো ফোলাল। তারপর বিরস মুখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কোশেভয়ও ভুরু কোঁচকাল, উরিউপিনের দেখাদেখি অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনা আপনিই নাকের পাশদুটো কাঁপতে লাগল। উরিউপিন সায় দিয়ে বলল:

—'মাংসটা খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

নাক সিঁটকিয়ে পাত্রটা ঠেলে দিয়ে গ্রিগরের দিকে তাকাল সে। গ্রিগর বিছানা ছেড়ে উঠল, ঝুঁকে নাক বাড়িয়ে দিল ঝোলের ওপর, তারপর ঝটকা মেরে সরে এল। আলসেমির ভঙ্গিতে সবচেয়ে কাছের পাত্রটা মাটিতে উল্টে ফেলে দিল।

—'ফেলে দিলে কিসের জন্যে?' উরিউপিন প্রশ্ন করল।

—'কিসের জন্যে, দেখতে পাচ্ছনা? তাকিয়ে দেখ! তুমি কি কানা? কি ওটা?' মেঝের ওপরে গড়িয়ে পড়া কাদামাখা ঝোলের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল গ্রিগর।

—'এইত! সুতো সুতো পোকা! আরে বাপ্‌সে! দেখতে পাইনিত! বেশ ওটা বাঁধাকপির ঝোল নয়, ময়দার সেমাই। মুরগীর ঠ্যাঙের বদলে, সুতো পোকা!' চেঁচিয়ে উঠল উরিউপিন।

ঘরের মধ্যে মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধতা। দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু ফেলল গ্রিগর। তারপর, তলোয়ার খুলে নিয়ে কোশেভয় বলল:

—'এই ঝোলকে গ্রেপ্তার করলাম আমরা। রিপোর্ট করব কোম্পানি কমাণ্ডারকে।'

—'ঠিক বলেছ, ভায়া!' উরিউপিন অনুমোদন করল। 'এই ঝোল, আর তোমাকে নিয়ে যাব আমরা। গ্রিগর পেছনে পেছনে আসবে, রিপোর্ট করবে।'

সঙীনের ডগায় ঝোলের পাত্রটা তুলে নিল উরিউপিন আর কোশেভয়, তারপর তাদের তলোয়ার খুলল। গ্রিগর পেছন পেছন চলল। ট্রেঞ্চের পাশ দিয়ে যাবার সময় ধূসর-সবুজ ঢেউএর মত ভিড় করে এল জিজ্ঞাসু কসাকদের একটা সারি, তারাও চলল পেছনে পেছনে।

অফিসারদের ডাগ্‌আউটের সামনে এসে সবাই থামল। বাঁ-হাতে টুপিটা চেপে ধরে, কুঁজো হয়ে গ্রিগর ঢুকল ডাগ্‌-আউটে ঢোকার গর্তে।

একটু পরেই, ওভার-কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে, উদ্বেগমিশ্রিত বিস্ময়ে গ্রিগরের দিকে পেছন ফিরে তাকাতে তাকাতে কোম্পানির কমাণ্ডার বেরিয়ে এল।

—'কি হয়েছে, বাবারা?' জমায়েৎ কসাকদের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল কমাণ্ডার।

তার সামনে এগিয়ে এল গ্রিগর, উত্তর দিল:

—'আমরা এক বন্দীকে এনেছি।'

—'কিসের বন্দী?'

—'ওই যে...' উরিউপিনের পায়ের কাছে রাখা ঝোলের পাত্রটা আঙ্গুল দিয়ে দেখাল গ্রিগর। 'ওই যে বন্দী। শুকে দেখুন, কি খায় আপনার কসাকরা।'

—'মরা ঘোড়ার মাংস দিতে শুরু করেছে!' তীব্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল মিশা কোশেভয়।

—'বদলি করে দিন কোয়াটার-মাস্টারকে। ঝোলের মধ্যে পোকা আছে!' অন্যান্যদের চিৎকার শোনা গেল।

সবার সোরগোল না থামা পর্যন্ত চুপ করে রইল কমাণ্ডার, তারপর কঠোর কণ্ঠে বলল:

—'চুপ করো সব! যথেষ্ট বলা হয়েছে! আজই বদলি করে দিচ্ছি কোয়াটার-মাস্টারকে। তার কাজকর্ম সম্পর্কে তদন্ত কমিটি বসাব আমি। মাংসটা যদি ভাল না হয়...'

—'ওকে কোর্ট-মার্শাল করুন!' পেছনে একটা চিৎকার শোনা গেল। নতুন চিৎকারের ঝড়ে চাপা পড়ে গেল কমাণ্ডারের গলা।

॥ চার ॥

রেজিমেণ্ট মার্চ করার সময় বদলি করতে হল কোয়াটার-মাস্টারকে। কসাকরা ঝোল নিয়ে কোম্পানি কমাণ্ডারের সামনে আসবার কয়েক ঘণ্টা পরেই নির্দেশ এল ফ্রণ্ট থেকে সরে যাবার, একটানা মার্চ করে তাদের যেতে হবে রুমানিয়ায়। রাত্রে কসাকদের জায়গায় এল সাইবেরীয় সার্প-স্যুটররা। পরদিন রেজিমেণ্ট ঘোড়ার পিঠে চাপল, এগিয়ে চলল সেই পথে।

মার্চ করে যেতে লাগল সতর দিন। খাবার কম পড়ায় ঘোড়াগুলো নেতিয়ে পড়তে লাগল। ফ্রণ্টের ঠিক পেছনে, বিধ্বস্ত যুদ্ধ-এলাকা বরাবর খাবার নেই কোথাও; অধিবাসীরা হয় পালিয়েছে আরও ভেতরে, নয়ত লুকিয়েছে বনে জঙ্গলে। বাড়িগুলোর হাঁ-করা দরজার ভেতর দিয়ে চোখে পড়ে বিষণ্ণ, রিক্ত দেয়ালগুলো। জনশূন্য রাস্তায় মাঝে মাঝে কসাকদের সামনে পড়ে গোমড়ামুখো আতঙ্কগ্রস্ত কোন গ্রামবাসী; সৈন্যদের দেখামাত্রই সে লুকোবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। একটানা মার্চ করার ফলে নেতিয়ে পড়ে, শীতে জমে, যে সব ধকল সহ্য করতে হচ্ছে তার জন্যে তিরিক্ষে হয়ে কসাকরা বাড়িগুলোর চাল থেকে খড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিতে লাগল। অন্যদের লুটপাটের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া গ্রাম থেকে সামান্যতম খাবারটুকুও ছিনিয়ে নিতে দ্বিধা করল না তারা। অফিসারদের কোন হুমকি তাদের নিরস্ত করতে পারল না।

রুমানিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি একটু সমৃদ্ধ গ্রামের এক গোলা থেকে কিছু যব চুরি করে আনতে পারল উরিউপিন। চুরি করার সময়েই ধরে ফেলেছিল গোলার মালিক, কিন্তু শান্তশিষ্ট সেই বয়স্ক বেসারেবিয়ানকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে যব এনে হাজির করল তার ঘোড়ার কাছে। ট্রুপ-অফিসার দেখতে পেল, সে ঘোড়ার ডাবা ভর্তি করে দিচ্ছে, ঘোড়াটার গর্তেঢোকা, হাড়-বারকরা পাশদুটিতে চাপড় মারছে। অফিসার চেঁচিয়ে উঠল:

—'উরিউপিন! ফিরিয়ে দাও যব। এর জন্যে গুলি খেয়ে মরতে হবে, শুয়োরের বাচ্চা!'

উরিউপিন অফিসারের দিকে আড়চোখে তাকাল, তারপর মাথার টুপিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রেজিমেণ্টে এতকাল কাটানোর মধ্যে এই সর্বপ্রথম সে বুক-ফাটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল:

—'কোর্ট-মার্শাল হবে! গুলি করবেন! মেরে ফেলুন এখুনি, কিন্তু যব আমি ফিরিয়ে দেব না...না খেয়ে মরবে নাকি আমার ঘোড়া, এ্যাঁ? যব আমি ফিরিয়ে দেব না, একটা দানাও না।'

উত্তর না দিয়ে ঘোড়াটার ভয়াবহ শীর্ণ পাশদুটোর দিকে তাকিয়ে, মাথা নাড়তে নাড়তে দাঁড়িয়ে রইল অফিসার। অবশেষে, গলার স্বরে বিমূঢ়তার আভাস দিয়ে মন্তব্য করল:

—'তেতে আছে ঘোড়াটা, এখনই কেন দানা খাওয়াচ্ছ?'

—'জিরিয়ে নিয়েছে এতক্ষণে।' মাটিতে ছড়িয়ে পড়া দানাগুলো জড়ো করে ডাবায় ঢালতে ঢালতে প্রায় ফিস ফিস করে উত্তর দিল উরিউপিন।

॥ পাঁচ ॥

নতুন জায়গায় রেজিমেণ্ট এসে পেঁৗছুল নভেম্বরের মাঝামাঝি। ট্রান্স-সিল্‌ভানিয়ার পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া গর্জন করে ফিরছে, হিমেল কুয়াশা নেমে এসেছে উপত্যকার বুকে, বরফের ওপরে। শীতের প্রথমেই বুনো জানোয়ারের পায়ের চিহ্ন হামেশাই চোখে পড়ে। লড়াই'এর সোরগোলে ভয় পেয়ে নেকড়ে, হরিণ আর বুনো ছাগলগুলো বনের আস্তানা ছেড়ে যাচ্ছে,পালাচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে।

নভেম্বরের কুড়ি তারিখে ৩২০নং চুড়োটা দখল করে নেবার চেষ্টা করল রেজিমেণ্ট। অস্ট্রিয়ানরা আগের দিন সন্ধ্যের সময় ট্রেঞ্চগুলো ধরে রেখেছিল, কিন্তু পরদিন সকালের আক্রমণের সময় তাদের জায়গায় এল পশ্চিম ফ্রণ্ট থেকে সদ্যপাঠানো স্যাক্‌সনরা। একটু একটু বরফে ঢাকা, পাথুরে উৎরাই বেয়ে কসাকরা নামতে লাগল; পাথর গড়িয়ে পড়তে লাগল, বরফের মিহি ধুলো উড়ল। চলতে চলতে অপরাধীর মত বোকা বোকা মুখে গ্রিগর হাসল, উরিউপিনকে বলল:

—'কিজন্যে যেন বড্ড ঘাবড়ে যাচ্ছি আজ সকালে। মনে হচ্ছে, আমি যেন এই প্রথম যুদ্ধে যাচ্ছি।'

এলোমেলো শেকলের মত সার বেঁধে উৎরাই বেয়ে নামতে লাগল কসাকরা। কেউ একটা গুলিও ছুঁড়ল না। শত্রুর ট্রেঞ্চগুলোয় অশুভ স্তব্ধতা। গ্রিগরের মুখে উৎকণ্ঠিত হাসি। তার বাঁকা নাক আর কালো জুলপিঢাকা গর্তে বসা গালের রং হলদেটে নীল; গুঁড়ো বরফে ঢাকা ভুরুর নীচে চোখদুটো নিরুত্তেজ কয়লার টুকরোর মত জ্বলজ্বল করছে। তার চিরাভ্যস্ত মানসিক স্থৈর্য ছেড়ে গিয়েছে তাকে। নিজের জন্যে, নিজের সঙ্গীদের জন্যে এমন উদ্‌বিগ্ন আর কখনো সে হয়নি। তার মনে হল, তার মন যেন চাইছে মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে, শিশুর মত ভাষায় মাটির

কাছে অনুযোগ করতে, যেন মাটি তার মা। সামনে ধূসর-বরফের ঘের-দেওয়া ট্রেঞ্চের সারির দিকে সে অবিশ্বাসমাখানো দৃষ্টি নিবদ্ধ করল, আর এই ভয়ঙ্কর অনুভূতি দমন করতে করতে, চোখের জল সামলে, উরিউপিনের সঙ্গে কথা বলে চলল।

শত্রুর গুলির প্রথম ঝাপটাতেই পড়ে গেল গ্রিগর, মাটিতে পড়ল আর্তনাদ করে। পিঠের ঝোলা থেকে ওসুদ-ব্যাণ্ডেজের বাক্সটা বার করবার চেষ্টা করল, কিন্তু জামার হাতার ভেতরে গরম রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে তাকে একেবারে কাহিল করে দিল। চিৎ হয়ে শুয়ে রইল সে; একটা বড় পাথরের পিছনে মাথা আড়াল করে, শুকিয়ে-আসা জিভ দিয়ে তুলোর মত নরম বরফের আস্তরণ চাটতে লাগল, বরফের গুঁড়ো মেশানো ধুলোয় তৃষ্ণার্তের মত কম্পিত ঠোঁটদুটো চেপে ধরতে লাগল। এক অস্বাভাবিক আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে শুনতে লাগল রাইফেলের গুলির কড়্কড়্ শব্দ আর সবকিছু ছাপিয়ে ওঠা কামানের মেঘ-গর্জন। মাথা তুলে দেখতে পেল, সামনে পেছনে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ঢালু বেয়ে দৌড়ে আসছে কসাকরা। এক অবর্ণনীয়, অযৌক্তিক আতঙ্ক তাকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল, রেজিমেণ্ট যেখান থেকে আক্রমণ শুরু করেছিল সেই ছিন্নভিন্ন পাইনবনের দিকে তাকে ছুটতে বাধ্য করল। জলের তোড়ের মত কোম্পানিগুলো বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তাদের পেছনে, ধূসর ঢালু-পথে ছোট ছোট ধূসর স্তূপের মত পড়ে আছে মৃতেরা; মেসিন-গানের ভয়াবহ চাবুক খেতে খেতে বিনা সাহায্যেই হামাগুড়ি দিয়ে আহতেরা নামছে।

মিশা কোশেভয়-এর হাতে ভর রেখে বনের ভেতর ঢুকল গ্রিগর। ঢালু জমিতে ঘা খেয়ে বুলেটগুলো ছটকে ছটকে উঠতে লাগল। জার্মানদের বাঁ-পাশে একটা মেসিনগান থেকে গুলি ছুটছে বৃষ্টির ধারার মত, শব্দ উঠছে, যেন খুব জোরে ছোঁড়া পাথরের অনেকগুলো টুকরো জমাটবাঁধা নদীর পাতলা বরফের আস্তরণে ঘা খেয়ে আওয়াজ তুলে ছট্‌কে ছট্‌কে যাচ্ছে।

—'ওরা বেশ গরম গরমই দিচ্ছে আমাদের!' প্রায় উল্লসিত হয়েই চিৎকার করে উঠল উরিউপিন। একটা পাইনগাছের লালচে গায়ে হেলান দিয়ে অলসভাবে গুলি ছুঁড়তে লাগল সে, জার্মানরা ট্রেঞ্চের ওপরে হুড় হুড় করে বেরিয়ে আসছে।

—'এতে শিক্ষা হবে মুখ্যুদের, এতেই শিক্ষা হবে!' গ্রিগরের হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করে উঠল কোশেভয়।

—'মানুষ হচ্ছে শুয়োবের পাল! যখন সব রক্ত ঢালা শেষ হবে তখন তারা বুঝবে কেন মরতে হচ্ছে গুলির মুখে।'

—'কি বকছ পাগলের মত?' উরিউপিন ভুরু কোঁচকাল।

—'বুদ্ধি যদি থাকে নিজেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু ওই মুখ্যুগুলো, ওদের কি হবে? হাতুড়ি ঠুকেও বুদ্ধি ঢোকানো যাবে না ওদের মগজে।'

—'ফৌজী-শপথের কথা মনে আছে? তুমি শপথ নিয়েছিলে, না, নাওনি?' ধমক দিয়ে উঠল উরিউপিন।

উত্তরের বদলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল কোশেভয় কম্পিত হাতে কিছু বরফ খুঁড়ে তুলল। কাঁপতে কাঁপতে, কাশতে কাশতে লোভীর মত সেই বরফ গিলতে লাগল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

ধূসর মেঘের ঢেউ তোলা আকাশের বুকে শরতের সূর্য গড়িয়ে পড়ছে তাতার্স্ক গ্রামের ওপর দিয়ে। ঊর্ধ্ব-আকাশে মৃদুমন্দ বাতাসে মেঘগুলো ধীরে ধীরে পশ্চিম-মুখে ভেসে চলেছে; কিন্তু গ্রামের বুকে, ডনের উপত্যকার গাঢ় সবুজ সমতলে, নিঃস্ব রিক্ত বনের মাথায়, সেই বাতাস বইছে ঝড়ের মত, উইলো আর পপলার গাছের মাথা নুয়ে পড়ছে, ডনের বুকে তরঙ্গ উঠছে, রাস্তায় রাস্তায় লালচে পাতার রাশি উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ক্রিস্তোনিয়ার মাড়াই-উঠোনে আলগাভাবে স্তূপ করে রাখা গমের খড়ের ঢিবিটা বাতাসে এলোমেলো করে দিল, চুড়োটা উড়িয়ে নিয়ে গেল, পিঠে-চাপা-দেওয়া সরু খুঁটিটা দূরে ছিট্‌কে ফেলে দিল। হঠাৎ নিড়ুনির-কাঁটায় বিঁধিয়ে নেবার মত করে সোনালী খড়ের একটা বোঝা তুলে নিল, বোঝাটা এনে ফেলল বাইরের উঠোনে, ঘুরপাক দিতে দিতে নিয়ে গেল রাস্তা পেরিয়ে, জনশূন্য বড়রাস্তার ওপরে ছড়িয়ে দিল দরাজ হাতে, অবশেষে সেই এলোমেলো বোঝাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল স্তেপান আস্তাখভের ঘরের চালে। উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল ক্রিস্তোনিয়ার বৌ, মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসের তাণ্ডব দেখল, তারপর আবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

যুদ্ধের তৃতীয় বছরে চোখে পড়বার মত অনেক চিহ্ন ফুটে উঠেছে গ্রামে। যে সব বাড়িতে কোন পুরুষ নেই সে সব বাড়ির চালাগুলো হাঁ করে আছে, উঠোনে জঞ্জাল জমেছে, সর্বত্র ছাপ ফেলে যাচ্ছে ক্রমবর্ধমান জীর্ণতা। ক্রিস্তোনিয়ার বৌকে সাহায্য করবার জন্যে আছে শুধু তার নয় বছরের ছোট্ট ছেলেটা। খামারের কাজেকর্মে তত পটু নয় আনিকুস্‌কার বৌ; নিঃসঙ্গ অবস্থার জন্যে নিজের রূপের দিকে ডবল নজর দেয় সে, মুখে মাখে জলুষ বাড়াবার রং, আর বয়স্ক কসাক বেশি না থাকায় তের চোদ্দ বছরের ছেলেদেরই পটিয়ে নেয়। খামারের কাজে অবহেলার মূর্তিমান সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আলকাতরা না-দেওয়া গেটগুলো। স্তেপান আস্তাখফের বাড়িটা একেবারে পোড়ো; বাড়ির মালিক তক্তা দিয়ে জানলাগুলো আটকে দিয়েছিল, ঘরের চাল খসে পড়েছে, চালের মাথায় বুনো গাছ গজিয়েছে, দরজার তালায় মরচে ধরেছে; ছাড়াপাওয়া গরুবাছুর খোলা গেটের ভেতর দিয়ে ঘোরে ফেরে, ঘাস আর আগাছা ভর্তি উঠোনে রোদবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আশ্রয় খোঁজে। ইভান তোমিলিনের ঘরের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ছে রাস্তার ওপরেই, পড়েনি শুধু একটা দোমুখো খুঁটির ঠেকো দিয়ে রেখেছে বলে। জার্মান আর রুশের অনেক বাড়ি চূর্ণ বিচূর্ণ করেছে, ভাগ্য যেন তাই প্রতিশোধ নিচ্ছে এই কঠোর গোলন্দাজের ওপরে।

গ্রামের প্রতিটি রাস্তায়, গলিতে এই একই দৃশ্য। একেবারে শেষ প্রান্তে শুধু পান্তালিমন মেলেখফের বাড়ি আর উঠোনের চেহারাটাই আছে আগের মত; সেখানে সব কিছুই বহাল তবিয়তে, ঠিকঠাক চলছে বলে মনে হয়; তবু তা পুরোপুরি ঠিক

নয়। গোলাবাড়ির ছাদের ওপরকার পাত-লোহার মোরগদুটো ক্ষয়ে ক্ষয়ে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে গিয়েছে; গোলাটাও একদিকে কাত হয়ে পড়েছে; পাকা চোখে আরও অনেক অবহেলার চিহ্ন ধরা পড়ে। একা একা সব কিছু করে উঠতে পারে না বুড়ো। ক্ষেতে ক্রমশই কম করে বীজ দেয়। শুধু লোক কমেনি মেলেখফ পরিবারে। পিয়োত্রা আর গ্রিগারের অনুপস্থিতি পুষিয়ে নেবার জন্যে ১৯১৫ সালের শরৎকালে নাতালিয়া জন্ম দিয়েছে যমজ সন্তানের। ছেলে আর মেয়ে দিয়ে পান্তালিমন আর ইলিনিচনা দুজনকেই খুশী করে দেবার মতই চতুর মেয়ে সে। ছেলে হতে খুবই কষ্ট পেয়েছে নাতালিয়া; এমন অনেক দিন গিয়েছে যখন পায়ের অসহ্য যন্ত্রণায় প্রায় হাঁটতেই পারেনি সে, একপা একপা করে টেনে টেনে টলতে টলতে হেঁটেছে। কিন্তু কষ্ট সহ্য করেছে দাঁতে দাঁত টিপে, তার লালচে, শীর্ণ, হাসিখুসি মুখখানায় কোন ছাপই পড়েনি! যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে উঠেছে, কপালে ফুটে উঠেছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, তাই দেখে ইলিনিচনা অনুমান করেছে তার কষ্ট, তাকে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তে অনুরোধ করেছে।

॥ দুই ॥

সেপ্টেম্বরের এক চমৎকার দিনে সময় হয়ে এসেছে বুঝতে পেরে রাস্তায় যাবার জন্যে পা বাড়াল নাতালিয়া। ইলিনিচনা জিজ্ঞেস করল:

—'কোথায় যাচ্ছ আবার?'

—'মাঠে। গরুগুলো ছেড়ে দিয়ে আসি।'

পেটের নীচে হাতদুখানা চেপে ধরে গোঙাতে গোঙাতে, দ্রুতপায়ে গ্রামের বাইরে চলে এল সে, এগিয়ে গেল বুনো কাঁটাগাছের এক জঙ্গলের ধারে। শুয়ে পড়ল সেখানে। ক্যানভাসের টুকরোয় জড়ানো যমজ শিশুদুটোকে বুকে করে গলিপথে যখন ফিরে এল, তখন সন্ধ্যে নেমে আসছে।

—'এই যে! দুষ্টু মেয়ে! এসব আবার কি! ছিলে কোথায় তুমি?'

কোন রকমে কথা খুঁজে পেল ইলিনিচনা।

—'বড় লজ্জা করছিল, তাই বাইরে চলে গিয়েছিলাম...আমি চাইনি যে...বাবার সামনে। আমি পরিস্কার হয়ে এসেছি, এদেরও ধুয়ে মুছে এনেছি। ধরুন...' ফ্যাকাসে হয়ে উত্তর দিল নাতালিযা।

দুনিয়া ছুটল দাই ডাকতে, একটা খোল সেলাই করতে বসে গেল দারিয়া। আনন্দে হেসে, কেঁদে ইলিনিচনা চেঁচিয়ে বলল:

—'খোল সেলাই রাখ, দারিয়া। এরা কি বেড়ালের বাচ্চা, যে খোলের ভেতরে পুরবে? জয় ভগবান, দুটো আবার! জয় ভগবান, একটা বেটা! নাতালিয়া... শুইয়ে দাও বিছানায়।'

পান্তালিমন যখন শুনল, তার ছেলের বৌয়ের যমজ সন্তান হয়েছে, তখন বিস্ময়ে হাতদুটো ছাড়িয়ে দিল, তারপর আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি আঁচড়াতে লাগল। দাই আসছিল, তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল পাগলের মত।

—'তুই একটা মিথ্যেবাদী, শকুনী বুড়ী।' থুথুরে বুড়ীর নাকের সামনে ঘুসিটা নাচাল সে। 'তুই মিথ্যেবাদী! এখনো লোপ পায় নি মেলেখফদের বংশ! একটা বেটা আর বেটী হয়েছে আমার বেটার-বৌয়ের। বেটার-বৌয়ের মত বেটার বৌ! জয় ভগবান! এত দয়ার শোধ আমি দেব কি করে?'

ফলন্ত বছর ছিল সেটা; গরুর বাছুর হল যমজ, ভেড়ার বাচ্চা হল যমজ, ছাগলেরও...এই সব যোগাযোগে অবাক হয়ে নিজের মনে মনেই যুক্তি খুঁজে নিল পান্তালিমন :

—'এটা একটা কপালের বছর, লাভের বছর! সব কিছুরই যমজ হচ্ছে! হা-হাঃ!'

॥ তিন ॥

বাচ্চাদুটোকে এক বছর ধরে মাই দিল নাতালিয়া। অন্য দুধ ধরাল সেপ্টেম্বরে, কিন্তু পরের বছর শরতের আগে সে সুস্থ সবল হয়ে উঠতে পারল না। তার শীর্ণ মুখে ঝিকমিক করতে লাগল দুধের মত সাদা দাঁত, চোখে ফুটে উঠল এক উষ্ণ দীপ্তি, রোগা হয়ে পড়ায় চোখদুটো মনে হয় অস্বাভাবিক বড়। ছেলেমেয়ের জন্যে সে জীবনটাই উৎসর্গ করে দিল। কিন্তু নিজের সম্পর্কে একেবারে উদাসীন। ধুইয়ে মুছিয়ে, জামা-কাপড় পরিয়ে, সেলাই করে, তাদের নিয়েই কাটাতে লাগল অবসর সময়। একটা পা ঝুলিয়ে দিয়ে বিছানার ওপর বসে প্রায়ই সে বাচ্চাদুটোকে দোলনা থেকে তুলে নেয়, ঘাড়ের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বার করে আনে তরমুজের মত হলুদ, বড়সড়, পরিপূর্ণ স্তনদুটো, দুটোকে একই সঙ্গে দুধ খাওয়ায়।

—'অনেকই তো মাই খেয়েছে ওরা। বড্ড বেশি মাই দাও ওদের।' নাতিদের—ছোট ছোট নিটোল পাদুটোয় চাপড় মারতে মারতে ইলিনিচনা মন্তব্য করে।

—'খাওয়াক খাওয়াক! দুধ বাঁচানোর দরকার নেই! দই ক্ষীরের জন্যে দুধ চাইনে আমরা!' ঈর্ষাতুর পান্তালিমন অভদ্রের মত বাধা দেয়।

॥ চার ॥

এই কবছর জীবনস্রোতে ভাঁটার টান ধরল ডন নদীর বেনো জলের মত। দিনগুলো আনন্দহীন, ক্লান্তিকর; দিন কাটে অগোচরে, একটানা ব্যস্ততায় কাজের মধ্যে দিয়ে, তুচ্ছ প্রয়োজনে, ছোটখাট আনন্দে, আর যারা লড়াই করতে গিয়েছে তাদের জন্যে গভীর, বিনিদ্র উদ্বেগে। পোস্টাপিসের ছাপে ছাপে ভর্তি খামে পোরা, পিয়োত্রা আর গ্রিগরের চিঠি আসে কালেভদ্রে। গ্রিগরের শেষ চিঠিখানা অন্য কারও হাতে পড়েছিল; বেশ মন দিয়ে বেগুনে কালিতে ধেবড়ে দেওয়া হয়েছে চিঠির অর্ধেকটা, মেটে কাগজের প্রান্তে কালি দিয়ে এক দুর্বোধ্য চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রিগরের

চেয়ে পিয়োত্রাই বেশি লেখে চিঠি; দারিয়ার কাছে যে চিঠি লেখে, তাতে চালচলন শোধরাবার জন্যে অনুনয় বিনয় করে। স্ত্রীর অশোভন চালচলনের গুজব স্পষ্টতই তার কানে গিয়ে পৌঁছেচে। চিঠির সঙ্গে টাকা পাঠিয়েছিল গ্রিগর, তার মাইনে, আর ক্রশের দরুণ ভাতা। ইঙ্গিত দিয়েছিল, ছুটি নেবার চেষ্টা করছিল কিন্তু তা মঞ্জুর হয় নি। দুই ভাইএর পথ গিয়েছে একেবারে বিপরীত দিকে। যুদ্ধ পীড়িত করছে গ্রিগরকে, মুখের সব রক্ত শুষে নিয়েছে, রঙ হয়ে উঠেছে ফ্যাকাশে পাণ্ডুর। কিন্তু অতি দ্রুত, অতি সহজে পিয়োত্রা উঠছে ওপরের ধাপে; কোম্পানি কমাণ্ডারের নেক-নজরের রাস্তা চিনে নিয়েছে, সে পেয়েছে দুটো ক্রশ; ১৯১৬ সালের শরৎকালে তাকে করপোরাল করা হয়েছে। আজকাল চিঠিতে লিখছে, সে চেষ্টা করছে যাতে তাকে অফিসারদের কোন স্কুলে পাঠানো হয়। গ্রীষ্মের সময় পাঠিয়েছিল এক জার্মান অফিসারের হেলমেট, জামা আর তার নিজের ফটো। ফটোর মধ্যে থেকে তাকিয়ে আছে আত্মসন্তুষ্ট পিয়োত্রা, বয়সের ছাপ পড়েছে শরীরে, বাঁকানো শনের মত গোঁফজোড়া ওপরদিকে আটকানো, চাপা নাকের নীচে চিরপরিচিত হাসিতে ঠোঁটদুটো ফাঁক-করা। জীবন প্রসন্ন হয়েছে পিয়োত্রার ওপর; লড়াই তাকে উল্লসিত করে তুলেছে, কারণ লড়াই এক অভাবিত সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। লড়াই যদি না বাধত, তাহলে তার মত এক সাধারণ কসাক কি কখনো অফিসারের পদ আর অন্য ধরণের মধুর জীবনের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারত? শুধু একটি মাত্র ব্যাপারে পিয়োত্রার জীবনে এক অপ্রীতিকর দিক রয়ে গিয়েছে; তার স্ত্রী সম্পর্কে কুৎসিত গুজব রটেছিল গ্রামে। ১৯১৬ সালের শরৎকালে ছুটি পেয়েছিল স্তেপান আস্তাখফ; ফিরে এসে রেজিমেণ্টের সমস্ত কোম্পানির কাছে ডাঁট নিতে নিতে শুরু করেছিল পিয়োত্রার বৌকে নিয়ে মজাসে সময় কাটানোর গল্প। সে সব গল্প বিশ্বাস করে নি পিয়োত্রা; মুখ কালো হয়ে উঠলেও সে হেসে বলেছে :

—'স্তেপান মিথ্যেবাদী! গ্রিগরের শোধ নিতে চেষ্টা করছে।'

একদিন স্তেপান যখন ডাগ-আউট থেকে বেরিয়ে আসছিল, দৈবাৎ হোক আর ইচ্ছে করেই হোক, তার হাত থেকে পড়ে গেল একখানা সুচের কাজ-করা লেস দেওয়া রুমাল। পিয়োত্রা ছিল তার ঠিক পেছনে, তুলে নিল রুমালখানা। সঙ্গে সঙ্গেই তার স্ত্রীর হাতের কাজ চিনতে পারল। আবার সেই পুরনো শত্রুতা শুরু হল দুজনের মধ্যে। সুযোগ খুঁজতে লাগল পিয়োত্রা; মৃত্যু ওৎ পেতে রইল স্তেপানের ওপর। পিয়োত্রা যদি পারত, তাহলে স্তেপানের মাথার খুলি ফাটিয়ে শুইয়ে রেখে আসত দভিনা নদীর পাড়ে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে, ঘটনাচক্রে, এক জার্মান ঘাঁটি উড়িয়ে দেবার অভিযানে চলে গেল স্তেপান। তার সঙ্গে যে কসাকরা গিয়েছিল তারা ফিরে এসে বলল, কাঁটা-তার কাটবার শব্দ শুনতে পেয়ে একটা হাত-বোমা ছুঁড়ে দিয়েছিল এক জার্মান। কসাকরাও গিয়ে পৌঁছুতে পেরেছিল তার কাছে, একটা ঘুঁসিতে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল স্তেপান। কিন্তু গুলি চালিয়ে দিয়েছিল আর এক জার্মান শান্ত্রী, স্তেপান পড়ে গিয়েছিল। কসাকরা দ্বিতীয় শান্ত্রীকে বেয়নেটে গেঁথে ফেলেছিল, স্তেপানের ঘুঁসিতে ভিরমি লাগা জার্মানকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল। স্তেপানকেও তুলে নেবার চেষ্টা করেছিল তারা। কিন্তু ভীষণ ভারী হওয়ায় তাকে ফেলে আসতে হল। অনুনয় করেছিল স্তেপান, 'ফেলে যেও না, ভাই সব! ও সাথীরা! ফেলে যাচ্ছ কেন আমাকে?' কিন্তু তারের ফাঁক দিয়ে মেসিনগানের গুলি আসছিল বৃষ্টির ধারার মত, কসাকদের হামাগুড়ি দিতে দিতে আসতে হয়েছিল। পেছন থেকে স্তেপান ডেকে-

ছিল, 'ভাই সব ভাই সব!' কিন্তু কি আর করা যাবে? নিজের জানটা তো বাঁচাতে হবে আগে! স্তেপানের এই পরিণামের কথা শুনে স্বস্তি অনুভব করল পিয়োত্রা, পাছার ঘায়ে গরম তেল লাগালে যেমন স্বস্তি অনুভব করা যায়; কিন্তু এ সত্ত্বেও, সিদ্ধান্ত করল, যখন ছুটি পাবে বাড়ি গিয়ে দারিয়ার রক্তপাত করিয়ে ছাড়বে। সে স্তেপান নয়! এ সব চলতে দেবে না সে! খুন করে ফেলার কথাও ভাবল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তা বাতিল করে দিল। 'মাগীকে খুন করে, জীবনটাই নষ্ট করি আর কি? জেলে পাঁচ, এত পরিশ্রম মাঠে মারা যাক, হারাই সব কিছু?' শুধু ঠেঙানি দেবারই সিদ্ধান্ত করল সে, কিন্তু ঠেঙানিটা এমন দেবে যাতে লেজ নাড়ার আর ইচ্ছে না থাকে। 'চোখ উপড়ে ফেলব মাগীর।' ট্রেঞ্চে বসে বসে সে ভাবে। দ্‌ভিনা নদীর কাদা-পেছল খাড়া পাড় থেকে এমন কিছু বেশি দূরে নয় সে ট্রেঞ্চ।

॥ পাঁচ ॥

সেবার শরতে স্বামীহীন অতৃপ্তজীবনের সবটুকু পুষিয়ে নিল দারিয়া। একদিন সকালে বাড়ির সকলের আগে চিরাচরিত প্রথায় উঠল পান্তালিমন প্রোকোফিয়েভিচ, বেরিয়ে এল বাইরের আঙিনায়। যা দেখল, তাতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। গেটটা খুলে ফেলেছে কব্জা থেকে, ছুঁড়ে দিয়েছে রাস্তার মাঝখানে। এ এক অপমান, লজ্জার ব্যাপার! বুড়ো তৎক্ষণাৎ পাল্লাদুটো যথাস্থানে বসিয়ে দিল, তারপর সকালের খাওয়া-দাওয়া সেরে দারিয়াকে বাইরে ডেকে গ্রীষ্মকালের রান্নাঘরের ভেতরে নিয়ে এল। কি কথাবার্তা হয়েছিল তাদের তা কেউ জানে না, কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই দুনিয়া দেখতে পেল, আলুথালু বেশে হাঁউমাউ করতে করতে দারিয়া রান্নাঘরের বাইরে ছুটে এল, তার মাথার রুমাল একদিকে কাত হয়ে আছে। দুনিয়া দেখল, ছুটে যেতে যেতে দারিয়াও কাঁধদুটো ঝাঁকাল, জলে-ভেজা ক্রুদ্ধমুখে ধনুকের মত কালো ভুরুদুটো কেঁপে কেঁপে উঠল। ফোলা ঠোটের ফাঁকে সাপের মত হিসহিস শব্দ করল :

—'দাঁড়াও না বুড়ো হাবড়া। শোধ দেব তোর কড়ায় গণ্ডায়!'

দুনিয়া দেখল, তার জ্যাকেট পিঠের দিকে ছিঁড়ে গিয়েছে, নিরাবরণ কাঁধের ওপর সদ্য আঘাতের লাল দাগ। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে বারান্দায় অদৃশ্য হয়ে গেল, আর গ্রীষ্মকালের রান্নাঘর থেকে পান্তালিমন খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল, চলতে চলতে একটা নতুন চামড়ার লাগাম গুটিয়ে নিল। দুনিয়া শুনল তার বাপ বলল :

—'তোর ছেনালি আমি ঘুচিয়ে দেব, কুত্তী! খান্‌কি মাগী!'

শৃঙ্খলা ফিরে এল বাড়িতে। দিন কয়েক দারিয়া ভিজে বেড়ালের মত, 'তৃণাদপি সুনীচ' হয়ে ঘুরে বেড়াল। রাত্রে বিছানায় শুতে যায় সকলের আগে আগে; নাতালিয়ার সহানুভূতি মাখা চোখে চোখ পড়লে ভুরু নাচিয়ে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিরুত্তাপ হাসি হাসে, যেন বলতে চায়, 'রোসো না, আমিও দেখে নেব!' চারদিনের দিন এমন একটা ঘটনা ঘটল, যা জানল শুধু দারিয়া আর পান্তালিমন। তারপর থেকে দারিয়া ঘুরতে লাগল হাসিমুখে, বিজয়গর্বে আর সপ্তাহখানেক ধরে বুড়ো ঘুরল ধন্দ হয়ে, ঠেঙানি-খাওয়া বেড়ালের মত উড়ুউড়ু মনে। কি ঘটেছিল, তা তার বৌকেও বলল না, এমনকি,

স্বীকারোক্তির সময় ঘটনাটা আর সে সম্পর্কে তার পাপ-চিন্তার কথাটাও ফাদার ভিস্-সারিওনের কাছে চেপে গেল।

যা ঘটেছিল তা এই। দারিয়ার পুরোপুরি পরিবর্তন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে নি পান্তালিমন, তাই বৌ ইলিনিচনাকে বলল :

—'দারিয়াকে রেয়াৎ করো না। আরও বেশি করে খাটাও। কাজ করতে নেমে ও ভুলচুক করে না। ছিঁচকে ছুঁড়ি একটা; কেবল মাথায় ঘুরছে কখন রাত্তিরে বেরুবে।'

নিজেই সে দারিয়াকে মাড়াই-উঠোন পরিষ্কার করতে লাগিয়ে দিল, কাঠের টুকরো গুলো জড়ো করিয়ে খিড়কির উঠোনে রাখল, ভূষি-ঘর পরিষ্কার করতে সাহায্য করল। সেইদিনই দুপুরের দিকে সে ঠিক করল, ঝাড়াই-কলটা গোলা থেকে সরিয়ে ভূষি-ঘরের ভেতরে নেবে। তার জন্যে হাত লাগাতে ডাকল ছেলের বৌকে।

জ্যাকেটের কলারের নীচে ঢুকে যাওয়া ভূষিগুলো ঝেড়েঝুড়ে, রুমালটা ঠিক করে নিয়ে বেরিয়ে এল দারিয়া, মাড়াই-উঠোন পেরিয়ে ঢুকল গিয়ে গোলার ভেতরে। একটা তুলো দেওয়া আট-পৌরে গরম কোট গায়ে, ছেঁড়া ঝুলিঝুলি পা-জামা পরনে পান্তালিমন চলল আগে আগে। উঠোনটা ফাঁকা। শরতের পশম দিয়ে সুতো পাকাচ্ছে মা, দুনিয়া হাতে হাতে যোগান দিচ্ছে, নাতালিয়া কালকের রুটির জন্যে ময়দা মেখে রাখছে। গ্রামের পেছন দিকে সূর্যাস্তের আলোয় লাল হয়ে উঠেছে। গির্জায় সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টা বাজছে। স্বচ্ছ আকাশের একেবারে উর্ধ্বে স্থির হয়ে ঝুলছে একটুকরো র‍্যাপ্‌স-বেরি রঙের মেঘ। ডনের ওপারে পাতাবিহীন ধূসর পপলার গাছের ডালে ডালে জ্বলন্ত গিঁটের মত কালো কালো দাঁড়কাক দুলছে। সন্ধ্যেবেলাকার নিঃসীম নিস্তব্ধতায় প্রতিটি শব্দ শোনায় তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট। গোয়াল থেকে নাকে আসছে কাঁচা গোবর আর খড়ের গন্ধ। পান্তালিমন আর দারিয়া ধরাধরি করে লাল রঙের জরাজীর্ণ ঝাড়াই-কলটা ভূষি-ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল, এক কোণে বসিয়ে রাখল। গা থেকে ভূষি ঝেড়েঝুড়ে বাইরে যাবার জন্যে পেছন ফিরল পান্তালিমন। ফিসফিস করে চাপাগলায় দারিয়া ডাকল :

—'বাবা!'

ঝাড়াই-কলের কাছে ফিরে যেতে যেতে পান্তালিমন জিজ্ঞেস করল :

—'কি হল?'

—'এখানে, বাবা, কি যেন এখানে...দেখুন তো এসে।' পাশে বেঁকে, বুড়োর কাঁধের ওপর দিয়ে খোলা দরজার দিকে চোরা চউনিতে তাকিয়ে দারিয়া বলল। তাব সামনে এসে দাঁড়াল বুড়ো। হঠাৎ হাতদুটো বাড়িয়ে দিল সে, গলাটা জড়িয়ে ধরে, আঙুলে আঙুল লটকে পেছন হঠল, বুড়োকে টেনে আনতে আনতে ফিসফিস করে বলল :

—'এখানে, বাবা...এখানে...খুব নরম এখানে...'

—'কি হয়েছে তোমার?' শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করল পান্তালিমন।

মাথাটা এপাশ ওপাশ করতে করতে সে দারিয়ার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু, তার দাড়িতে গরম নিঃশ্বাসের হলকা ছাড়তে ছাড়তে, দারিয়া তার মাথাটা আরও জোরে মুখের কাছে টেনে আনতে লাগল; হাসতে হাসতে ফিস ফিস করে কথা বলতে লাগল।

—'ছাড়, ছেড়ে দে, কুত্তী।' ঠিক পেটের কাছে বেটার বউএর ফুলে ফুলে ওঠা পেটটা অনুভব করতে করতে পান্তালিমন ঝটাপটি করতে লাগল। আরও কাছে টেনে এনে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল দারিয়া, তাকে টেনে নামাল বুকের ওপর।

—'সর্বনাশী! মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে মাগীর! মোলো যা! ছেড়ে দে আমাকে!' তার মুখ দিয়ে থুথু ছটকাতে লাগল।

—'ইচ্ছে করে না?' হাঁপাতে হাঁপাতে দারিয়া বলল। গলা ছেড়ে দিয়ে একটা ধাক্কা মারল বুড়োর বুকে। 'না কি, সে খ্যামতাই নেই আর? তাহলে, মাতব্বরি করতে আসিস না আমার ওপর। বুঝতে পারলি?'

পায়ের ওপর লাফিয়ে উঠল দারিয়া; তাড়াতাড়ি ঘাঘরাটা টেনেটুনে নিয়ে, পিঠ থেকে ভূষিগুলো ঝেড়ে ফেলে, বুড়োর বিহ্বল মুখের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

—সেদিন ঠেঙিয়েছিলি কেন আমাকে? আমি কি বুড়ী? তুইও কি এমনি ছিলি না বয়সকালে? আমার সোয়ামি...? তার সঙ্গে দেখাই নেই এক বছর! করব কি আমি...কুত্তা নিয়ে রাত কাটাব? তোর নিকুচি করি, এক ঠেঙে! এই নে, দেখ!' এক অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করল সে; ভুরু নাচাতে নাচাতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজার কাছে গিয়ে আর একবার খুঁটিয়ে দেখল জামাকাপড়, জ্যাকেট আর রুমাল থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলল, তারপর পান্তালিমনের দিকে পিছন ফিরে, না তাকিয়েই বলল :

—'এ ছাড়া থাকতে পারব না আমি। মরদ চাই আমার, যদি তোর ইচ্ছে না হয়... নিজেই যোগাড় করে নেব একটা। কিন্তু মুখ বুঁজে থাকবি তুই।'

চোরের মত, দ্রুত পদক্ষেপে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল সে, একবার পেছন ফিরে তাকালও না, অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে; আর সেখানে সেই ঝাড়াই-কলের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল পান্তালিমন, দাড়ি চিবোতে চিবোতে ভূষি-ঘরের চারপাশে অপরাধীর মত এলোমেলো দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। যা ঘটে গেল, তাতে ভ্যাবাচাকা খেয়ে পান্তালিমন ধোঁকায় পড়ে মনে মনে ভাবতে লাগল, 'ওর কথাই হয়তো ঠিক! ওর সঙ্গে বদমাইসি করাই হয়তা আমার উচিৎ ছিল।'

॥ ছয় ॥

নভেম্বর মাসে হিমেল মুঠোয় চেপে ধরল বরফ। আগেভাগেই বরফ পড়া শুরু হল। গ্রামের মাথার দিকে, বাঁকের মুখে ডন জমাট বেঁধে উঠল। মাঝে মাঝে কেউ সাহস করে ওপারে চলে যায় কপোত-নীল বরফ মাড়িয়ে। ভাটির দিকে, শুধু নদীর কিনারে কিনারে পাতলা বরফের সর পড়ল, তোলপাড় করে স্রোত ছুটল মাঝ বরাবর, মাথা উঁচিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল। কালোচুড়োর নীচেকার জলায়, প্রায় বিশ হাত জলের নীচে, শীতকালীন নিদ্রার প্রস্তুতিতে শীট্-মাছগুলো বহু আগেই ডুব মেরেছে। ধারে কাছে রয়েছে কার্পগুলো। শুধু পাইক-মাছগুলো প্রাণপণে স্রোত উজিয়ে চলেছে, হেরিং-মাছ তাড়া করতে গিয়ে বাঁধটা এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে। কাঁকড়াগুলোর ওপরেই রয়েছে স্টারলেট্-মাছ। নদীতে জাল ফেলে মাছধরার জন্যে জেলেরা আরও জোর বরফ-পড়ার আশায় আশায় বসে আছে।

নভেম্বর মাসে মেলেখফরা গ্রিগরের একটা চিঠি পেল। রুমানিয়া থেকে লিখছে, চোট লেগেছে তার ; বাঁ-হাতের হাড় গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে গুলি লেগে, তাই চোট সারার

সময় তাকে নিজের জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রথমটার পিছু পিছু মেলেখফ পরিবারে হাজির হল আর এক বিপদ। আঠার মাস আগে টাকার দরকার হয়েছিল পান্তালিমনের, একশ' রুবল ধার করেছিল সার্জি মোখোভের কাছ থেকে। তার বদলে একটা খরিদ-নামা লিখে দিয়েছিল। গরমের সময় বুড়োকে ডেকে আনা হল মোখোভের দোকানে, ধার শোধ করার ইচ্ছে আছে কিনা জিজ্ঞেস করা হল। আধাআধি খালি তাকগুলো, আর ঝকঝকে কাউণ্টারে পান্তালিমনের এলোমেলো দৃষ্টি ঘুরতে লাগল, সে ইতস্তত করতে লাগল। অবশেষে বলল :

—'সবুর করুন একটু; একটু গুছিয়ে নিতে দিন আমাকে, সব শোধ করে দেব।'

কিন্তু 'একটু গুছিয়ে নেওয়া' আর হল না বুড়োর। জমিতে ফলন হয়েছে কম, গরুবাছুরগুলোও বেচার মত নয়। হঠাৎ, জুন মাসে বরফ-পড়ার মত, গ্রামের কাছারীতে হাজির হল পেয়াদা, পান্তালিমনকে ডেকে পাঠাল, হম্বিতম্বি করে বলল :

—'ফেলো দেখি একশ' রুবল।'

সেইদিনই টাকা এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি যাবার অনুমতি চাইল পান্তালিমন। কিন্তু বাড়ি না গিয়ে সোজা চলল কোরশুনভের বাড়ির দিকে। বারোয়ারি-তলায় দেখা হয়ে গেল নুলো শামিলের সঙ্গে। শামিল অভ্যর্থনা জানাল :

—'এখনো বহাল তবিয়তে আছ, কর্তা?'

—'কোনরকমে কণ্টেসৃষ্টে।'

—'কদ্দুর যাওয়া হচ্ছে?'

—'একটু কাজে যাচ্ছি, কোরশুনভের ওখানে।'

—'কোরশুনভ? বেশ খোস-মেজাজেই পাবে ওদের। শুনেছি, ওর ব্যাটা মিত্‌কা ফিরে এসেছে ফ্রন্ট থেকে।'

—'তাই নাকি?'

—'তাই তো শুনেছি।' শামিল জবাব দিল চোখ আর গাল কুঁচকে। থলেটা বের করে আবার বলল, 'তামাক খাও হে, বুড়ো কর্তা। কাগজ আমার, তামাক তোমার।'

একটা সিগারেট ধরাল পান্তালিমন; কোরশুনভের কাছে যাবে, কি যাবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দো-মনা করতে লাগল। অবশেষ, যাওয়াই সাব্যস্ত করল, তারপর এগুতে লাগল খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

—'একটা ক্রশও পেয়েছে মিত্‌কা। চেষ্টা করছে তোমার ব্যাটাদের সমান সমান হতে। ঝোপেঝাড়ে যত চড়ুই আছে, প্রায় ততো ক্রশ পেয়েছি আমরা গাঁয়ে।' শামিল পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল।

আস্তে আস্তে গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে হেঁটে এল পান্তালিমন। কোরশুনভের বাড়ির জানলা দিয়ে ভেতর দিকে তাকাল, তারপর এগিয়ে গেল গেটের কাছে। স্বয়ং মিরনই এল তাকে এগিয়ে নিতে। বুড়োর খাঁজ-পড়া মুখখানা আনন্দে ঝলমল করছে।

—'শুনেছ আমাদের সু-খবরটা?' পান্তালিমনের হাতের মধ্যে হাতটা গলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল কোরশুনভ।

—'এক্ষুনি আমাকে বলল, আলেক্সি শামিল। কিন্তু আমি এসেছি অন্য কাজে...'

—'রাখ তোমার কাজ! বাড়ির ভেতরে এসো, কথাবার্তা বলো ছেলেটার সঙ্গে। সু-খবরটা পেয়ে মদ খাবার জন্যে একটু তোড়জোড় করছিলাম।'

—'আমাকে তা না বললেও হত।' একটু হাসল পান্তালিমন, নাকের পাশদুটো ফোলাল। 'তার গন্ধ পেয়েছি আগেই।'

ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে দিল মিরন, একটু পাশে সরে দাঁড়াল পান্তালিমনকে যেতে দেবার জন্যে। সে চৌকাট পেরিয়ে ঘরে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল মিত্‌কার ওপর। একটা টেবিলের পেছনে মিত্‌কা বসে আছে।

—'এই যে এখানে; আমাদের সিপাই ব্যাটা!' মিত্‌কার কাঁধের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, জলভরা চোখে ঠাকুর্দা গ্রীশাকা চেঁচিয়ে উঠল।

মিত্‌কার বড়সড় হাতখানা হাতের মধ্যে নিল পান্তালিমন, অবাক হয়ে তাকিয়ে একপা পিছিয়ে দাঁড়াল।

—'আরে, কি দেখছেন অমন করে?' মুখে একটু হাসি টেনে কর্কশ কণ্ঠে মিত্‌কা জিজ্ঞেস করল।

—'না তাকিয়ে পারছি না। অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি। একই সঙ্গে যেতে দেখলাম তোমাকে আর গ্রিগরকে, বাচ্চা ছিলে তো তখন। এখন দেখ তো তাকিয়ে! পুরোদস্তুর কসাক, এখনই আতামান রেজিমেন্টের যুগ্যি হয়ে উঠেছ।'

জলভরা চোখে লুকিনিচ্‌না তাকিয়ে ছিল মিত্‌কার দিকে, সেইভাবে তাকিয়েই একটা গেলাসে সে ভদ্‌কা ঢালবার চেষ্টা করল। কি করছে তা দেখতে না পেয়ে কানাতেই মদ ঢেলে ফেলল।

—'আরে, এই অকম্মার ধাড়ি! করছ কি, নষ্ট করছ অমন মদটা!' মিরন চেঁচিয়ে উঠল তাকে লক্ষ্য করে।

—'তোমার আনন্দের জন্যে, তোমার জন্যে, মিত্‌কা, তোমার বাড়ি আসার জন্যে!' ঘরের চারপাশে চোখ বুলাতে বুলাতে পান্তালিমন বলে উঠল। এক নিঃশ্বাসে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলল ভদ্‌কাটুকু। আস্তে আস্তে ঠোঁট, আর জুলপিদুটো হাতের চেটো দিয়ে মুছে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল গেলাসের তলায়; মাথা পেছনে হেলিয়ে পড়ে থাকা অবশিষ্ট ফোঁটাটুকু হাঁ-করা মুখের মধ্যে ঢেলে দিল, তারপর দম নিয়ে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে চোখ পিটপিট করতে করতে একটা নুন মাখানো শশার টুকরো কামড়ে খেতে শুরু করল। আর এক গেলাস ঢেলে দিল লুকিনিচ্‌না। সঙ্গে সঙ্গে হাস্যকরভাবে বুঁদ হয়ে পড়ল বুড়ো। মিত্‌কা হাসিমুখে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। কবছর না দেখার পর এখন আর চেনাই যায় না, এমন আশ্চর্য পরিবর্তন হয়েছে ছেলেটার। তিন বছর আগে চমৎকার ফিটফাট যে মিত্‌কা গিয়েছিল ফৌজের কাজ করতে, এই কালো জুলপিওয়ালা জোয়ান কসাকটার মধ্যে আজ তার প্রায় কিছুই নেই। বেশ ভারিক্কী চেহারা হয়েছে তার, কাঁধদুটো চওড়া হয়েছে, মুটিয়েও গিয়েছে বেশ, ওজন সওয়া দুমণের কম হবে না নিশ্চয়ই। মুখে আর গলার স্বরে কর্কশতা এসেছে, বয়েসের চেয়ে বড় দেখায় তাকে। শুধু একই রকম আছে চোখদুটো, ঠিক আগের মতই চঞ্চল, অস্থির।

ভাবনাচিন্তাহীন মুক্ত বিহঙ্গমের জীবন মিত্‌কার: আজ যা পেলাম তা বেশ, কাল কি হবে, তা কাল দেখা যাবে। সিপাই গিরিতেও তেমন আঠা নেই তার; মনটা ভয়লেশহীন হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কোন সম্মান অর্জনের জন্যে নিজে সে এগিয়ে যায় নি কখনো, যদিও কাগজপত্রে যখন তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তখন সেটা তার ভালই লেগেছে।

দুবার কোর্ট-মার্শাল হয়েছে তার। একবার এক পোল স্ত্রীলোককে ধর্ষণ করার জন্যে, আর একবার চুরি করার জন্যে। তিন বছরের লড়াইএর মধ্যে অসংখ্যবার সাজা পেয়েছে সে, একবার তো কোর্ট-মার্শালে তাকে গুলি করে মারার রায় দিয়েছিল

আর কি। কোনরকমে ফসকে আসতে পেরেছে। রেজিমেণ্টের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য চরিত্রের হলেও, কসাকরা তাকে পছন্দ করে তার স্ফূর্তিবাজ, লম্পট চরিত্রের জন্যে, তার খিস্তির গান, বন্ধুত্ব আর এক-রোখা স্বভাবের জন্যে। অফিসারেরা পছন্দ করে তার ডাকাবুকো চালচলনের জন্যে। হেসে খেলে দুনিয়ার বুকে মিত্‌কা ঘুরে বেড়ায় হালকা চালে, নেকড়ের মত পা ফেলে; তার মধ্যে নেকড়ের স্বভাব আছে অনেকখানি। কারণ, মিত্‌কার কাছে জীবনটা সরল, ঋজু, চষা জমির মত সামনে প্রসারিত, তার ওপর দিয়ে সে ঘুরে বেড়ায় নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব নিয়ে। তার চিন্তাধারাও এই রকমেরই আদিম ধরণের সহজ এবং সরল। যদি খিদে লাগে, চুরি কর, চুরি কর বন্ধুদের কাছ থেকেও; খিদে লাগলে চুরিও করে মিত্‌কা। বুটজোড়া যদি ছিঁড়ে যায়, তাহলে দুনিয়ার সহজতম কাজ হচ্ছে জার্মান বন্দীর পা থেকে বুট খুলে নেওয়া। যদি সাজা পাও, তাহলে যেমন করেই হোক পুষিয়ে নিতে হবে অপরাধটা; আর পুষিয়েও নেয় মিত্‌কা, জার্মান-ঘাঁটিতে গিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসে আধ-মরা জার্মান-শান্ত্রীকে, স্বেচ্ছায় এগিয়ে যায় সবচেয়ে বিপজ্জনক অভিযানে। ১৯১৫ সালে আহত হয়ে বন্দী হয়েছিল সে; কিন্তু সেই রাত্রেই হাতের নখ ছিঁড়ে খুঁড়ে, আঁচড়ে আঁচড়ে, ঘরের চালা ফুটো করে পালিয়ে এসেছিল, পালাবার সময়েও ঘোড়াটানা গাড়ির কিছু সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এসেছিল স্মারকচিহ্ন হিসাবে। এইভাবেই অনেক কিছু পেরিয়ে এসেছে মিত্‌কা।

—'তাহলে ক্রশ পেয়েছ তুমি?' মাতালের মত হেসে পান্তালিমন বলল।

—'কসাকদের মধ্যে ক্রশ পায় নি কে?' ভুরু কোঁচকাল মিত্‌কা।

—'ও একটু গর্বিত স্বভাবের।' তাড়াতাড়ি বাধা দিতে গেল বুড়ো গ্রীসাকা।

—'ঠিক আমার মত ও। মাথা নোয়ায় না কারো কাছে।'

—'ক্রশ মেলে না তার জন্যে,' চটে গিয়ে প্রায় জবাব দিতে যাচ্ছিল পান্তালিমন, কিন্তু মিরন তাকে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে এল, একটা বাক্সের ওপরে বসে জিজ্ঞেস করল :

'নাতালিয়া আছে কেমন? নাতিনাতনীরা? সব ভাল তো? কাজে এসেছিলে, তাই বলেছিলে না? কি কাজ? বলে ফেল, নয়ত আবার মদ খাব আমরা, নেশা জমলে বলার মত অবস্থা থাকবে না তোমার।'

—'কিছু টাকা দাও! দোহাই যিশুর! বাঁচাও আমাকে! নইলে, সর্বনাশ হয়ে যাবে এই...এই দেনার ব্যাপারে।' মাতালেব বিগলিত দীনতায় অনুনয় করতে লাগল পান্তালিমন। মিরন বাধা দিয়ে বলল :

—'কত দরকার?'

—'একশ রুবল।

বুকের ভেতরে হাতড়ে একটা তেলচিটে রুমাল বার করল কোরশুনভ, রুমালের গিঁট খুলে দশখনা দশ-রুবলের নোট গুনলেন। পান্তালিমন বলল :

—'তোমাকে ধন্যবাদ, মিবন গ্রিগরিয়েভিচ্‌। বিপদ থেকে বাঁচালে তুমি আমাকে।'

—'ধনাবাদের কিছু নেই। নিজেদের আত্মীয়স্বজনেরই ব্যাপাব যখন...'

॥ সাত ॥

পাঁচদিন বাড়িতে রইল মিত্‌কা। রাত কাটাতে লাগল আনিকুশ্‌কার বৌএর সঙ্গে। মেয়েটার অনটন দেখে মায়া হয়েছিল, বেশি মায়া হয়েছিল মেয়েটার ওপরই, বেচারী সহায়সম্বলহীনা, সরলা বিরহিনী। দিন কাটাতে লাগল আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ঘুরে। একটা মাত্র পাতলা ওভার-কোট গায়ে, টুপিটা মাথার পেছন দিকে হেলিয়ে শীতের মুখে তুড়ি দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ফিরতে লাগল। এক সন্ধ্যায় সে হাজির হল মেলেখফদের বাড়িতে। অত্যধিক গরম রান্নাঘরটার মধ্যে জেগে উঠল বরফ, আর সেপাইএর গায়ের তিক্ত, তীব্র গন্ধ—সে গন্ধ ভোলা যায় না কখনো। বসে বসে লড়াইএর, গ্রামের খবরাখবরের গল্প করল, তারপর, দারিয়ার দিকে সবুজ চোখদুটো ঠেরে বাইরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। তার পেছনে দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে যেতেই মোমবাতির শিখার মত আন্দোলিত হয়ে উঠল দারিয়া, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রুমালটা মাথায় বাঁধতে যাচ্ছিল, কিন্তু ইলিনিচ্‌না জিজ্ঞেস করল :

—'কোথায় চললে, দারিয়া?'

—'একটু বাইরে যাব।'

—'আমি যাব তোমার সঙ্গে।'

মাথা না তুলে বসে রইল পান্তালিমন, যেন তাদের প্রশ্নোত্তর কানেই যায় নি তার। নেকড়ের মত ঝকমক করা দুই চোখের পাতা নীচু করে, তার পাশ দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল দারিয়া। ভীষণভাবে টলমল করতে করতে পেছন পেছন চলল শাশুড়ী, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে মিত্‌কা কাশছিল, পা ঘসছিল মাটিতে। দরজার খিল খোলার শব্দ শুনতে পেয়ে সিঁড়ির কাছে ফিরে আসার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

—'কে ও মিত্‌কা? পথ ভুল করিস নি তো আঙিনায়?' বিদ্বেষ-ভরা গলায় ইলিনিচ্‌না ডেকে বলল। 'গেটটা আটকে দিস, নইলে সারারাত আছড়াবে হাওয়ায়।'

—'না, পথ ভুল করি নি। আটকে দিচ্ছি গেট।' বিরক্ত হয়ে মিত্‌কা জবাব দিল, তারপর বড় বড় পা ফেলে রাস্তা পেরিয়ে সোজা আনিকুশ্‌কার বাড়ির দিকে এগুতে লাগল।

ছদিনের দিন মিরন ছেলেকে গাড়ি করে নিয়ে গেল মিল্লেরোভো স্টেশনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, সার-দেওয়া সবুজ কামরাগুলো ঘটাং ঘটাং করতে করতে চলে গেল; ফোলা ফোলা চোখদুটো না তুলে তারপর অনেকক্ষণ চাবুক দিয়ে প্ল্যাটফর্মের মাটি খুঁড়ল। ছেলের জন্যে লুকিনিচ্‌না কাঁদল: বুড়ো গ্রীসাকা কাশল, হাতের চেটোয় নাকের সিক্‌নি ঝাড়ল, তারপর চেটোটা কোটে ঘসে মুছে ফেলল। আর কাঁদল আনিকুশ্‌কার বিরহিনী বৌ সে কাঁদল মিত্‌কার বিরাট দেহটা স্মরণ করে আলিঙ্গনের সময় এমন তপ্ত হয়ে উঠত সে দেহ; মিত্‌কার কাছ থেকে গনোরিয়া ধরেছে, কাঁদল তার যন্ত্রণা সইতে সইতে।

॥ আট ॥

বাতাস যেমন ঘোড়ার কেশরে জট পাকায়, সময় তেমনি জট পাকালো দিনগুলো নিয়ে। বড়দিনের ঠিক আগে অপ্রত্যাশিতভাবে বরফ গলতে শুরু করল, কয়েকদিন ধরে একটানা বৃষ্টি ঝরল, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে শুকনো পথে জলের ধারা নামল গর্জন করে; নদীর ভেতরে সরু হয়ে এগিয়ে যাওয়া ডাঙা-জমিতে সবুজ হয়ে উঠল গত বছরের ঘাস, ডনের কিনারে কিনারে ফেণার তরঙ্গ জাগল, বিতিকিচ্ছিরি নীল রঙ ধরল বরফে, বরফ ফেঁপে উঠল। এক অবর্ণনীয় মিষ্টি গন্ধ উঠল কালো মাটির বুক থেকে। জলের বুদ্বুদ উঠল বড় রাস্তার ওপরকার গাড়ির চাকার দাগে দাগে। গ্রামের পেছন-দিকের কর্দমাক্ত চুড়োগুলোয় নতুন ধ্বস নামল, হাঁ করে রইল লাল লাল গর্তগুলো। পচা ঘাসের তীব্র গন্ধ ভেসে এল দক্ষিণা বাতাসে, দুপুরের দিকে বসন্তকালের মতই কপোত-নীল হালকা ছায়া দিগন্তে ঘাপটি মেরে রইল। গ্রামের ভেতরে, বেড়ার গায়ে গায়ে স্তূপ-করা ছাইএর গাদার চুড়োয় কম্পনজাগা বৃষ্টির জল জমল। খড়ের গাদার চারপাশে মাড়াই-উঠোনে মাটি গলতে শুরু করেছে, পথ চলতে ভেজা খড়ের তৃপ্তিকর মিষ্টি গন্ধ নাকে আসে। দিনের বেলায় বরফের কুঁচি ঝোলা খড়ের চালা আর কার্নিস বেয়ে বেয়ে জল গড়ায়, ম্যাগপাইগুলো বেড়ার ওপরে বসে একটানা কিচির মিচির করে। মিরন কোরশুনভের উঠোনে গ্রামের ষাঁড়টা শীতের আশ্রয় নিয়েছিল, অকাল-বসন্তের আমেজ পেয়ে ডেকে উঠল ক্রুদ্ধ হয়ে। শিঙের গুঁতোয় বেড়াটা ভেঙে ফেলল, খুরের ঘায়ে ছিটিয়ে দিল চূর্ণবিচূর্ণ, জলঝরা বরফ।

ডনের বরফে ভাঙন ধরল বড়দিনের পরের দিন। প্রচণ্ড ঠোকাঠুকি করে, আর্তনাদ তুলে বরফ ভেসে চলল মাঝ নদী বরাবর। ভাসন্ত বরফের চাঙড়গুলো ধাক্কা খেয়ে পাড়ে এসে লাগল নিদ্রালু, অতিকায় মাছের মত। ডনের ওপারে, উত্তেজনা-জাগানো দক্ষিণা বাতাসের তাড়া খেয়ে পপলার গাছগুলো অনড়, নমনীয় ওড়ার ভঙ্গিতে আকাশে ডানা মেলে দিল।

কিন্তু রাত্রের দিকে পাহাড়গুলো গর্জন করতে শুরু করল, দাঁড়কাকগুলো ডানা ঝটপট করতে করতে বারোয়ারিতলায় কা কা রব জুড়ে দিল; ক্রিস্তোনিয়ার শুয়োরটা একগোছা খড় মুখে করে মেলেখফদের উঠোনের ওপর দিয়ে ছুটে গেল। পান্তালিমন বুঝতে পারল, বসন্তের সম্ভাবনা গোড়াতেই নষ্ট হয়ে গেল, কালই শুরু হবে আবার বরফ পড়া। রাত্রেই বাতাস ঘুরে গেল পুব দিকে, জলের ওপরে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ বরফের সর পড়ল। সকালের মধ্যেই বাতাস বইতে শুরু করল মস্কোর দিক থেকে, বরফ জমাট বেঁধে উঠল। আবার শুরু হল শীতের রাজত্ব। কেবল ভাসন্ত বরফের টুকরোগুলো বিশাল বিশাল সাদা-পাতের মত ডনের মাঝ বরাবর ভেসে চলল; বরফ-পড়া রিক্ত মাটির বুক থেকে উৎরাইএর মুখে ধোঁয়া উঠতে লাগল।

বড়দিনের কিছু পরে, এক সভায় গ্রামের কেরানি পান্তালিমনকে জানাল. গ্রিগরের সঙ্গে কামেনস্কায় তার দেখা হয়েছিল; সে তাকে বাপমাকে জানাতে অনুরোধ করেছে, শিগগীরই তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

বিপ্লব

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

ছোট ছোট, লালচে লোমশ হাত দুখানা দিয়ে জীবনের নাড়ী বুঝতে পারে সার্জি মোখোভ। কখনো কখনো জীবন খেলা করছে তার সঙ্গে, কখনো কখনো ডুবন্ত মানুষের গলায় বাঁধা পাথরের মত ভারী হয়ে চেপে বসেছে। যথেষ্ট দূরদৃষ্টি আছে তার। জীবনে বহু হাঙ্গামাই পোয়াতে হয়েছে সার্জি প্লাতোনোভিচ্‌কে। বহুকাল আগে—তখনো যখন কল চালাত—মণ প্রতি নাম মাত্র দাম দিয়ে কসাকদের কাছ থেকে ফসল কিনতে হয়েছিল, তারপর গাড়ি বোঝাই করে আটহাজার মণ গম গ্রামের বাইরে নিয়ে গিয়ে নদীর জলে ফেলে দিতে হয়েছিল। ১৯০৫ সালের কথাও তার মনে আছে। বড়লোক হয়েছে মোখোভ, প্রায় ষাট হাজার রুব্‌ল জমিয়েছে, সেই টাকা ভলগা-কামা ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে। কিন্তু বহুদূর থেকেই সে গন্ধ পেল, প্রচণ্ড আলোড়নের দিন আসছে। সেই দুর্দিনের অপেক্ষাতেই সে রইল, তার অনুমান ভুল হল না।

ইতিমধ্যে ফেব্রুয়ারি মাসেই রাস্‌পুতিন ও জার পরিবারের শহুরে-কেচ্ছা ডনের ধারের গ্রামগুলোয় ছড়িয়ে পড়েছে। মার্চ মাসে সার্জি প্লাতোনোভিচ্ স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদের সংবাদ জানাল। চাপা উদ্বেগ আর আশংকায় কসাকরা সংবাদটা শুনল। মোখোভের দরজাবন্ধ দোকানঘরের চারপাশে সেইদিনই কসাক জোয়ান বুড়োরা ভিড় করল। গ্রামের নতুন আতামান এক লাল-চুল, ট্যারা-চোখ কসাক। খবর শুনে সে একেবারে ভেঙে পড়ল। দোকানের বাইরে যে উত্তেজিত আলোচনা চলছে তাতে কোন অংশই নিল না, কেবল অসংলগ্নের মত মাঝে মাঝে বলে উঠতে লাগল :

--'ইস্, কি যে ব্যাপার স্যাপার ঘটছে! এখন আমরা কি করব?'

দোকানের বাইরে ভিড় দেখে মোখোভ বেরিয়ে এসে বুড়োদের সঙ্গে কথা বলা সাব্যস্ত করল। রাকুনের লোমের কোটটা গায়ে চাপিয়ে , ক্ষুদে ক্ষুদে রুপোর অক্ষরে নাম লেখা ছড়িতে ভর দিয়ে, বাড়ির সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

—'এই যে, মোখোভ, আপনি তো অনেক লেখাপড়া জানেন, আমরা অজ্ঞ, মুখ্যু, বলুন তো এরপর এখন কি হবে?' উৎকণ্ঠায় হাসি হেসে মাত্‌ভেই কাস্তুলিন প্রশ্ন করল।

মোখোভ মাথা নোয়াতেই বুড়োরা সসম্ভ্রমে টুপি খুলল, ভিড়ের মাঝখান দিয়ে যাবার জন্যে পথ করে সরে দাঁড়াল।

—'আমাদের জারকে ছাড়াই থাকতে হবে..' ওদের একটু যাচাই করার ভাব নিয়েই মোখোভ শুরু করল।

বুড়োরা সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিল। 'কিন্তু জারকে বাদ দিয়ে চলবে কি করে?' 'বাপ-ঠাকুর্দা কাটিয়ে এল জারের রাজত্বে, আর এখন জারের দরকার নেই?' 'মাথা কেটে ফেললে, পা কি আর বেঁচে থাকে!' 'কোন ধরণের সরকার হবে

আমাদের?' 'বলুন না, সার্জি প্লাতোনোভিচ্! বলুন, ভয় পাবার কি আছে?'

—'হয়তো উনি নিজেই জানে না।' হেসে একজন মন্তব্য করল।

সার্জি মোখোভ তার পুরনো জুতোর দিকে বোকার মত তাকাল, তারপর বেশ কষ্ট করে কথাগুলো উচ্চারণ করে করে বলল :

—'স্টেট দুমা শাসন করবে। আমাদের হবে সাধারণতন্ত্র।'

জোর করে একটু হাসল সে, চারপাশে তাকিয়ে বুড়োদের চিন্তান্বিত মুখগুলো দেখল। চিরাচরিত ভঙ্গিতে দাড়িটা দুভাগে ভাগ করল, তারপর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে চলল। কার ওপর ক্রোধ তা কেউ বুঝল না।

—'এখন বোঝ, রাশিয়াকে ওরা কোথায় নিয়ে এসেছে। ওরা আমাদের 'চাষা'দের সঙ্গে সমান করে দেবে। সব সুযোগ সুবিধে কেড়ে নেবে। সবচেয়ে বড় কথা, আগের দিনের অপমান, অসম্মান ফিরিয়ে আনবে। বড়ই খারাপ দিন আসছে...সরকার কাদের হাতে যায় তার ওপরই সবকিছু নির্ভর করছে, নইলে আমাদের একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

—'যদি বেঁচে থাকি, সবই দেখতে পাব!' মাথা ঝাঁকাল বোগোতিরিয়েভ, লোমশ ভুরুর ভেতর দিয়ে অবিশ্বাস ভরে মোখোভের মুখের দিকে তাকাল। 'আপনি আপনার পথ দেখুন, সার্জি প্লাতোনোভিচ্, এখন আমাদের ভালও তো হতে পারে?'

—'কি করে ভাল হবে?' বিষ-ঝরানো কণ্ঠে মোখোভ প্রশ্ন করল।

—'নতুন সরকার হয়তো লড়াইতে ক্ষ্যান্ত দিতে পারে। হতেও পারে তা, পারে না কি?'

হাত দোলাল মোখোভ। অসংলগ্নভাবে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো চিন্তা করতে করতে, কারখানার কথা, ব্যবসার মন্দার কথা ভাবতে ভাবতে ঠেলেঠুলে বাড়ির ভেতর চলল। মনে পড়ল, এলিজাবেথ আছে মস্কোয়, ভ্ল্যাদিমির শিগ্‌গীরই নোভোচেরকাশ থেকে ফিরে আসবে। ছেলেমেয়ের জন্যে উদ্বেগের ভোঁতা খোঁচাটুকুতে তার চিন্তার অস্থির অসংলগ্নতা নষ্ট হল না। বুড়োদের দিকে একবার পেছনে তাকিয়ে সে রেলিঙের গায়ে থুথু ফেলল, ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

—'হায় ভগবান!' মোখোভ ভাবতে লাগল। 'কেমন করে পালটে যায় সব কিছু! বুড়ো বয়স পর্যন্ত আমি আহাম্মুকই রয়ে গেলাম! ভেবেছিলাম জীবনটা হয়তো সুখের হবে, কাজের বেলায় কিন্তু পাহারাদারের মতই একা এক সঙ্গীহীন হয়ে রইলাম। আমি টাকা করেছি জালজুয়াচুরি করে, কিন্তু ধর্মপথে তো টাকা হয় না...আমি সবাইকে নিংড়ে নিয়েছি, এখন আসবে বিপ্লব; আর কাল হয়তো আমার নিজের চাকর-বাকররাই ঘাড় ধরে আমার বাড়ি থেকে বার করে দেবে। সর্বনাশ হোক ব্যাটাদের। ছেলেমেয়ের কি হবে? ভ্ল্যাদিমির তো একটা নির্বোধ...আর, কি যে মানে হয় এ সবের? কিছুই আসে যায় না, হয়তো...'

॥ দুই ॥

অসংলগ্ন চিন্তা আর অবচেতনা কামনায় পীড়িত হয়ে বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে সেই রাত্রে তার ভাল ঘুম হল না। ইউজেনে লিস্তনিৎস্কি ফ্রন্ট থেকে বাড়ি ফিরেছে জানতে পেরে, পরদিন সকালেই ঠিক করল ইয়েগোদনয়ে যাবে, গিয়ে জানবে আসল অবস্থাটা কি, মন থেকে উদ্বেগজনক অনুমানের অসহ্য বোঝাটা ঝেড়ে

ফেলবে। ইয়েমেলিয়ানও তাই হালকা শ্লেজটাতে ঘোড়া যুতল, মনিবকে নিয়ে ইয়েগোদনয়ে চলল।

গ্রামের মাথার ওপরে সূর্য একটা হলদে রঙের পাকা খুবানীর মত নিটোল, পুষ্ট হয়ে উঠেছে, তার ওপরে নীচে ধোঁয়ার মত মেঘ ভাসছে। কনকনে তুষার-বাতাস রসাল, পাকা ফলের গন্ধে ম ম করছে। ঘোড়ার খুরের নীচে রাস্তার বরফ গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, নাক থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া বাতাসে উড়ে গিয়ে কেশরের গায়ে বিন্দু বিন্দু বরফ হয়ে জমছে। ঠাণ্ডার আমেজে আর গাড়ির মিঠে দুলুনিতে মোখোভ বসে বসে ঢুলতে লাগল।

ইয়েগোদনয়ে পৌঁছুল দুপুর বেলায়। একটা পাটকিলে রঙের মাদী বোর্ঝোই কুকুর সিঁড়ির ওপরেই তাকে অভ্যর্থনা জানাল। পথ আগলে দাঁড়িয়ে, সামনের পা দুটো টান টান হয়ে একটা হাই তুলল। অন্যান্য কুকুরগুলো সিঁড়ির চারধারে শুয়ে ছিল, মাদীটার পেছনে পেছনে তারাও আলসের মত উঠে দাঁড়াল।

শুকনো খটখটে, আলোময়, ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে কুকুর আর ভিনিগারের ঝাঁঝালো গন্ধ। একটা বাক্সের ওপরে রয়েছে অফিসারের ককেশীয় টুপি, রুপোর বিনুনিওয়ালা মাথা-ঢাকা আর একটা ককেশীয় জোব্বা। পাশের ঘর থেকে এক মোটাসোটা, গোল-গাল স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল, মোখোভকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল; তারপর, লাল টুকটুকে মুখের গম্ভীরভাব পরিবর্তন না করে জিজ্ঞেস করল :

—'নিকোলাই আলেক্সিয়েভিচ্‌কে চাই? ডেকে দিচ্ছি।'

এই মোটাসোটা সুশ্রী স্ত্রীলোককে আকসিনিয়া বলে চিনতে কষ্ট হল মোখোভের। আকসিনিয়া কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পেরেছিল, তাই ঠোঁটে ঠোঁট চেপে, অস্বাভাবিক-ভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। টোকা না দিয়েই সে হল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, পেছনকার দরজাটা বন্ধ করে দিল। মিনিট দুয়েক পরেই আবার সে বেরিয়ে এল, তার পেছনে পেছনে বুড়ো লিস্তনিৎস্কি। অভ্যর্থনার হাসি হেসে বিনীতভাবে বলে উঠল :

—'আরে, মোখোভ ব্যাপারী যে! হঠাৎ কি মনে করে? এসো, ভেতরে এসো।' সে একপাশে সরে দাঁড়াল, হলঘরে ঢুকবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আহ্বান জানাল।

সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াল সার্জি প্লাতোনোভিচ্, সামাজিক পদমর্যাদায় উঁচু লোকদের এমনি করে মাথা নুইয়ে সম্মান দেখানো সে বহুকাল আগেই রপ্ত করে নিয়েছে। হলঘরে ঢুকে পড়ল। পাঁশ্‌-নে পরা চোখদুটো কুঞ্চিত করতে করতে তার দিকে এগিয়ে এল ইউজেনে লিস্তনিৎস্কি। একগাল হেসে, মোখোভের হাত ধরল। হাসতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত। মোখোভকে নিয়ে এসে চেয়ারে বসাল। আকসিনিয়াকে চা আনতে বলল বুড়ো লিস্তনিৎস্কি, তারপর টেবিলের ওপর হাত রেখে মোখোভের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল :

—'গ্রামে তোমাদের সব চলছে কেমন? শুনেছ নাকি...সু-খবরটা?'

জেনারেলের গালের নীচের নিখুঁত কামানো মাংসের ভাঁজের দিকে মুখ তুলে তাকাল মোখোভ, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল :

—'না শুনে উপায় কি?'

—'ব্যাপার যে এমন হয়ে দাঁড়াবে তা কি মারাত্মক ভাবেই না নির্দিষ্ট হয়েছিল!' বুড়ো বলল, তার গলার নলিটা কেঁপে কেঁপে উঠল। 'যুদ্ধের প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম আমি। যাই বলো, এ বংশের ধ্বংস অনিবার্য ছিল।'

—'কি ঘটেছে তার সঠিক খবরই পাই নি আমরা।' উত্তেজিতভাবে মোখোভ বলল। ছটফট করে উঠল চেয়ারে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে চলল, 'এক সপ্তাহের মধ্যে খবরের কাগজের মুখই দেখি নি আমরা। যেই শুনলাম, ইউজেনে নিকোলাইভিচ্ ছুটিতে বাড়ি এসেছেন, ঠিক করলাম চলে আসি, এসে জিজ্ঞেস করি সত্যিকারে কি ঘটেছে, এর পরেই বা কি ঘটবে আশা করা যায়।'

ইউজেনের মুখে এখন আর হাসি নেই। সে উত্তর দিল :

—'মারাত্মক ব্যাপার...সোজা কথায় মনোবল নষ্ট হয়ে গিয়েছে সৈন্যদের। আর লড়াই চালাতে চায় না ওরা, লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। সত্যি বলতে কি, সৈন্য বলতে যা বোঝায়, এ বছরে আমাদের হাতে তা কিছুই নেই। তারা হয়ে উঠেছে গুণ্ডা বদমাশের দল, বেআদব আর বুনো। বাবা কিছুতেই বুঝতে পারেন না এটা। তিনি বুঝে উঠতে পারেন না কতদূর মনোবল ভেঙে গিয়েছে আমাদের ফৌজের। ইচ্ছে করে, ওরা ঘাঁটি ছেড়ে আসে, ডাকাতি করে, বে-সামরিক লোকজনকে খুন করে, অফিসারদের খুন করে, লুঠপাট করে...ফৌজী নির্দেশ মানতে অস্বীকার করা তো আজকাল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।'

—'মাছ পচে মাথার দিক থেকে।' তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলি ছাড়ল বুড়ো লিস্তনিৎস্কি।

—'আমি তা বলব না।' ভুরু কোঁচকাল ইউজেনে, একটা চোখের পাতা থরথর করে কেঁপে উঠল। 'আমি তা বলব না। ফৌজে পচন ধরেছে নীচে থেকে, পচন ধরিয়েছে বলশেভিকরা। এমন কি কসাক ডিভিসনগুলো, বিশেষ করে যারা পদাতিকদের খুব কাছাকাছি আছে, তারাও মনের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য নয়। এক প্রচণ্ড ক্লান্তি আর বাড়ি ফিরে যাবার ইচ্ছা...আর এই বলশেভিকরা...'

—'ওরা চায় কি?' নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করে উঠল মোখোভ।

—'ওহ্...' ইউজেনে হাসল। 'ওরা কি চায়...! কলেরার জীবাণুর চেয়েও ওরা জঘন্য। জঘন্য এই অর্থে যে মানুষের সঙ্গে অতি সহজেই মিশে যায় ওরা, ঢুকে পড়ে সৈন্যদের একেবারে ঠিক মাঝখানে। অবশ্য, ওদের মতবাদের কথাই বলছি আমি... আলাদা থেকে বাঁচবার কোন উপায় নেই ওদের খপ্পর থেকে। বলশেভিকদের মধ্যে কিছু কিছু অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক আছে, সন্দেহ নেই। তাদের একজনের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল আমাকে। ওদের মধ্যে একদল সহজবুদ্ধির গোঁড়া লোকও আছে, কিন্তু বেশির ভাগই হচ্ছে বেআদব, চরিত্রহীন, জানোয়ার। তারা বলশেভিক মতবাদের আসল কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না, মাথা ঘামায় শুধু কি করে লুঠপাট করবে, কি করে ফ্রণ্ট থেকে পালাবে। তারা চায়, সবচেয়ে আগে, নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিতে, যে কোন শর্তে, যুদ্ধ—যাকে নাম দিয়েছে তারা 'সাম্রাজ্যবাদী' যুদ্ধ—বন্ধ করে দিতে, এমন কি পৃথক সন্ধি শর্তেও; তারপর, জমি চাষীর হাতে, কারখানা মজুরের হাতে তুলে দিতে। অবশ্য এ যেমন অলীক, তেমনি অবাস্তব কল্পনা, কিন্তু এই ধরণের আদিম কৌশলেই তারা ফৌজের মনোবল ভেঙে দিতে সক্ষম হয়েছে।'

সমস্ত শরীর সামনে ঝুঁকিয়ে এমনভাবে শুনতে লাগল মোখোভ, মনে হতে লাগল যেন এখুনি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠবে।

ইউজেনে বলে চলল, বিপ্লব শুরু হবার আগেই সে কেমন করে রেজিমেণ্ট ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল, ভয় পেয়েছিল কসাকরা আক্রমণ করবে। পেত্রোগ্রাদের যে সব

ঘটনা তার নিজের চোখে দেখা তার কাহিনী শোনাল। কথা শেষ হয়ে গেলে কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপর মোখোভের নাকের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল বুড়ো লিস্তনিৎস্কি :

—'যাকগে, শরতে যে খয়েরি ঘোড়াটা দেখে শুনে গিয়েছিলে, কিনবে তুমি সেটা?'

—'এই রকম সময়ে এমন ধরণের কথা আপনি পাড়েন কি করে, নিকোলাই আলেক্সিয়েভিচ্।' করুণভাবে ভুরু কোঁচকাল মোখোভ, হতাশ্বাসের ভঙ্গিতে হাতখানা দোলাল।

॥ তিন ॥

এদিকে, মোখোভের কোচোয়ান ইয়েমেলিয়ান মৌজ করছিল, চা খাচ্ছিল চাকরদের ঘরে বসে। একটা লাল রুমাল দিয়ে গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে খবর বলছিল গ্রামের। খাটের বাঁকা পিঠে বুক ঠেকিয়ে, তুলোর মত নরম একটা শাল মুড়ি দিয়ে আকসিনিয়া দাঁড়িয়েছিল বিছানার ধারে। সে জিজ্ঞেস করল :

—'মনে হয়, আমাদের ঘরটা এতদিনে ধ্বসে পড়েছে?'

—'না, ধ্বসে পড়বে কেন?' সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল ইয়েমেলিয়ান।

—'আর আমাদের পড়শি মেলেখোভরা, কেমন আছেটাছে তারা?'

—'ভালই আছে তারা!'

- 'ছুটিতে ফিরে আসে নি পিয়োত্রা?'

—'তেমন তো শুনি নি কিছু।'

-'আর গ্রিগর?'

—'বড়দিনের পর বাড়ি এসেছিল গ্রিগর। গত বছর তার বৌএর যমজ ছেলে হয়েছে। চোট লেগেছিল গ্রিগরের।'

—'চোট লেগেছিল?'

—'হ্যাঁ, হাতে। কামড়াকামড়ি করলে মাদী কুকুরের যেমন হয়, তেমনি তার সারা গায়ে দাগদাগড়া। ক্রুশ বেশি, না দাগ বেশি, তা বুঝা দায়।'

—'কেমন দেখতে হয়েছে. .মানে, গ্রীসকা?' জিজ্ঞেস করল আকসিনিয়া। কান্নার একটা ঢোক গিলে কাশল, তারপর নাকটা মুছল।

—'ঠিক সেই আগের মতই; বাঁকা নাক আর ময়লা রং।'

—'আমি তা বলছি নে...বুড়োটে বুড়োটে দেখায় তাকে?'

—'তা কি করে জানব? একটু বুড়োটে হয়েছে হয়তো। ওর বৌএর ছেলে হয়েছে যমজ। বেশি বুড়োটে হবার কথা নয়তো তার।'

—'বড্ড ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে।' কেঁপে উঠে আকসিনিয়া বলল, তারপর বাইরে চলে এল।

—'বদগন্ধ বিষ-পিঁপড়ে যদি কেউ থাকে তো ওই মাগী!' ইয়েমেলিয়ান ঘোঁৎ করে শব্দ করল। 'এই তো কিছুদিন আগেই গাঁয়ের পথে ঘুরঘুর করত গাছের ছালের জুতো পরে, আর আজ তিনি একেবারে ভদ্দর ঘরের গিন্নি। 'বড্ড ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে!' ছোঃ, আরে তুই উঠেছিস নর্দমা থেকে, তোর মা নির্ঘাৎ কুত্তী বিইয়েছিল! এমন

মেয়েছেলে সর্বনাশী হয়। অমন ঘাটের মড়া অনেক দেখা আছে।...বড্ড ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে। পা-চাটা সাপ! শিকনি গড়ানো মাদীঘোড়া! ছোঃ!'

সে এত অপমান বোধ করল যে, অষ্টম কাপ চাটা শেষ করতে পারল না। উঠে পড়ল সে; দ্রুশ করে, উদ্ধত ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাতে তাকাতে, বুট দিয়ে ইচ্ছে করে পরিষ্কার মেঝেটা ময়লা করতে করতে বাইরে চলে এল। ফিরে আসার সময় সারা পথ সে মনিবের মতই গোমড়ামুখে বসে রইল। মনের যত ঝাল ঝাড়তে লাগল ঘোড়ার ওপর, চাবুকের ডগা দিয়ে কুৎসিতভাবে ঘোড়ার পাছায় খোঁচা মারতে লাগল, ঘোড়ার চোদ্দ-পুরুষের শ্রাদ্ধ করতে লাগল। তার স্বভাবের বিপরীত আচরণ করল আজ, মনিবের সঙ্গে একটা কথাও বলল না। সার্জি প্লাতোনোভিচও বসে রইল ভয়ার্ত স্তব্ধতায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

মার্চ বিপ্লব শুরু হবার আগে, দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টে সংরক্ষিত একটি পদাতিক ডিভিসনের প্রথম ব্রিগেড আর তার সঙ্গে যুক্ত ২৭নং ডনকসাক রেজিমেণ্টকে সরিয়ে আনা হল ফ্রণ্ট থেকে; যে অশান্তি শুরু হয়েছে তা দমন করতে তাদের বদলি করা হবে পেত্রোগ্রাদে। বিগ্রেডটাকে নিয়ে আসা হল পেছনে, শীতের জামাকাপড় দেওয়া হল, কয়েকদিন খাওয়ানো দাওয়ানো হল, তারপর পাঠানো হল ট্রেন বোঝাই করে। কিন্তু ঘটনাবলী এগুতে লাগল রেজিমেণ্টের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে। রওনা হওয়ার দিনই জোর গুজব ছড়িয়ে পড়তে লাগল, সর্বাধিনায়কের সদর দপ্তরে সম্রাট নাকি সিংহাসন ছেড়ে দিলেন এই মর্মে এক হুকুম-নামায় সই দিয়েছেন।

মাঝ-পথেই ফেরানো হল ব্রিগেডকে। রাঝ্গোন স্টেশনে ২৭নং কসাক রেজিমেণ্টকে ট্রেন থেকে নামবার নির্দেশ দেওয়া হল। গাড়িতে গাড়িতে আটক হয়ে গেল রেল লাইন। কোটের ওপর লাল পট্টি এঁটে, রুশ ধরনের কিন্তু ইংলণ্ডে তৈরি ভাল ভাল রাইফেল কাঁধে ফেলে সৈন্যরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঘোরাফেরা করতে লাগল। তাদের অনেককেই মনে হল উত্তেজিত; উৎকণ্ঠিত হয়ে তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল কসাকদের নিয়ে কোম্পানি গড়া হচ্ছে।

বৃষ্টিঝরা, ক্লান্তিকর দিনটা। স্টেশনের ঘরগুলোর ছাদ থেকে কল কল করে জল ঝরছে। স্থায়ী রাস্তাগুলোয় তেলা তেলা জল ভর্তি ডোবায় পুরু ভেড়ার চামড়ার মত ধুসর আকাশের ছায়া প্রতিফলিত হচ্ছে। এ লাইন থেকে ও লাইনে যাওয়া ইঞ্জিনের চাপা গর্জন কানে আসছে। গুদামঘরের পেছনে রেজিমেণ্টের চোখে পড়ল, ব্রিগেডের কমাণ্ডার আসছে কালো কুচকুচে ঘোড়ায় চড়ে। রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিগেড-কমাণ্ডার এসে হাজির হল কসাকদের সামনে, রাশ টেনে ঘোড়া থামাল। কোম্পানিগুলোর দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর, মনের মত কথা বেছে নেবার জন্যে থেমে থেমে, হোঁচট খেতে খেতে এক বক্তৃতা শুরু করল:

—'কসাকগণ! জনগণের ইচ্ছায় সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাইএর রাজত্বের...এ্যাঁ...পতন

হয়েছে। শাসনভার ন্যস্ত হয়েছে স্টেট দ্যুমার অস্থায়ী কমিটির হাতে। সৈন্যবাহিনী, এবং তাদের মধ্যে তোমরা এই সংবাদ মেনে নেবে...এ্যাঁ শান্তভাবে...কসাকের কর্তব্য হচ্ছে দেশকে বাঁচানো, বাইরের শত্রুর হাত থেকে আর...এ্যাঁ...আর, বলতে কি...বাইরের শত্রুর হাত থেকে। যে গন্ডগোল শুরু হয়েছে, তা থেকে দূরে সরে থাকব আমরা, নতুন সরকার গড়ার পথ বেছে নেবার ভার ছেড়ে দেব বে-সামরিক জনগণের ওপরে। দূরে সরে থাকব আমরা! লড়াই আর রাজনীতি ফৌজের পক্ষে...এ্যাঁ...খাপ খায় না। যখন সমস্ত কিছুর ভিত্তি...এ্যাঁ...নড়ে ওঠে, তখন আমাদের কঠোর হতে হবে...' এই পর্যন্ত বলে, বক্তৃতায় অনভ্যস্ত, বৃদ্ধ ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল উপযুক্ত উপমার জন্যে ইতস্তত করতে লাগল, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল রেজিমেণ্ট। ' কঠোর হতে হবে ইস্পাতের মত। কসাকের ফৌজী-কর্তব্য হচ্ছে অফিসারের নির্দেশ মেনে চলা। আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করব কৃতিত্বের সঙ্গে, আগে যেমন আমরা করেছি, আর পেছনে যারা আছে' (পেছনে হাত দিয়ে ঝেণ্টানোর মত ভঙ্গি করল) 'ওই স্টেট দ্যুমা নির্ধারণ করুক দেশের ভাগ্য। যখন লড়াই শেষ করব, তখন আমরা অংশ গ্রহণ করব দেশের আভ্যন্তরীণ জীবনে, কিন্তু বর্তমানে.. সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব না, বিশ্বাসঘাতকরা করতে পারি না...রাজনীতির কোন স্থান নেই সৈন্যবাহিনীতে।'

॥ দুই ॥

কিছুদিন স্টেশনেই রইল কসাকরা। অস্থয়ী সরকারের আনুগত্যের শপথ নিল, সভাসমিতিতে যোগ দিল, স্থানীয় বড় বড় দলে জমায়েত হল, কিন্তু স্টেশনে ছুটোছুটি করে ঘুরে বেড়ানো সৈন্যদের থেকে নিজেদের দূরে দূরে রাখল। সভাসমিতিতে যে-সব বক্তৃতা শুনেছে তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল, প্রতিটি সন্দেহজনক কথা অবিশ্বাসের সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, অবশেষে তাদের সকলেই কেমন করে যেন এই সিদ্ধান্তে পৌছুল যে, যদি এখন স্বাধীনতাই এসে থাকে, তাহলে তার অর্থ হল যুদ্ধ বন্ধ হওয়া। এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অফিসারদের লড়াই করা কষ্টকর হয়ে উঠল, কষ্টকর হয়ে উঠল একথা বোঝানো যে রাশিয়াকে শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতেই হবে।

নেতৃত্বের ওপরমহলকে যে বিভ্রান্তিতে পেয়ে বসল তার গুরুতর প্রভাব দেখা দিল নীচের মহলেও। ডিভিসনটা যে পেত্রোগ্রাদের মাঝপথে আটকে পড়ে আছে, মনে হল, তার অস্তিত্ব যেন ব্রিগেডের নেতারা পুরোপুরি ভুলে বসে আছে। যে আট দিনের রসদ দেওয়া হয়েছিল সৈন্যরা তা খেয়ে দেয়ে বসে রইল. তারপর ধারেকাছের গ্রামগুলোতে ভিড় করতে লাগল। যাদুমন্ত্রে চোলাই মদ আত্মপ্রকাশ করল বাজারে, মাতাল সৈনিক আর অফিসার এক সাধারণ দৃশ্য হয়ে উঠল।

স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে কসাকরা ভিড় করতে লাগল কামরাগুলোর মধ্যে, কবে তাদের ডন প্রদেশে নিয়ে যাওয়া হবে তারই অপেক্ষায় রইল। দ্বিতীয় সংরক্ষিত দলটাকে ভেঙে দেওয়া হবে, এই ধরনের গুজব জোরদার হয়ে উঠল। ঘোড়া-গুলোকে যত্ন করার ব্যাপারে তারা অ-মনোযোগী হয়ে উঠল, দিন কাটাতে লাগল বাজার-খোলায়, ট্রেঞ্চ থেকে আনা হেলমেট, ওভার-কোট আর তামাক দিয়ে ব্যবসা শুরু করল।

অবশেষে যখন নির্দেশ এল, রেজিমেণ্টকে ফ্রণ্টে ফিরতে হবে, তখন প্রকাশ্য অসন্তোষ ব্যক্ত হল সেই নির্দেশ পেয়ে। দ্বিতীয় কোম্পানি প্রথমে এগ্বতে অস্বীকার করল, কসাকরা কামরাগ্বলোর সঙ্গে ইঞ্জিন জ্বড়তে দিল না। কিন্তু রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার হ্বমকি দেখাল, তাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হবে। উত্তেজনা শান্ত হল। গাড়ি আস্তে আস্তে ফ্রণ্টের দিকে এগিয়ে চলল, আর প্রতিটি কামরায় পরিস্থিতির উত্তেজিত আলোচনা চলতে লাগল।

এক জংসন স্টেশনে কসাকরা কামরা ছেড়ে হ্বড়হ্বড় করে বেরিয়ে এল, যেন আগে থেকেই তাদের মধ্যে ঠিকঠাক করা ছিল। কমাণ্ডারের প্রতিশ্রুতি আর হ্বমকিতে কান না দিয়ে এক সভা শ্বর্ব করে দিল। প্রাচীন স্টেশনমাস্টার কসাকদের মধ্যে ঘ্বরে ঘ্বরে কামরায় ফিরে যেতে, লাইন পরিষ্কার করে দিতে ব্বথাই অন্বনয় বিনয় করতে লাগল। কসাকরা এক সার্জেণ্ট আর সাধারণ চেহারার কসাকের বক্তৃতা অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে শ্বনতে লাগল। কসাকটিকে বেশ কষ্ট করে করে ক্রোধের অন্বভূতির উদ্গার করতে হচ্ছিল :

—'কসাক ভাই সব! এ সব মোটেই ভাল নয়! আবার ওরা সব কিছ্ব ভণ্ডুল করে দিয়েছে! ওরা আমাদের বোকা বানাতে চায়। যদি বিপ্লবই হয়ে থাকে, যদি সবাই স্বাধীনতাই পেয়ে থাকে, তাহলে ওদের লড়াই থামিয়ে দেওয়া উচিত। জনসাধারণ, আর আমরা কসাকরা কি লড়াই চাই? ঠিক কিনা, বল?'

—'ঠিক বলেছ, ঠিক ঠিক।'

—'পেণ্টুল টেনে তুলে পাছা ঢাকার সাধ্য নেই আমাদের! আর একেই ওঁরা লড়াই বলেন?'

—'লড়াই চুলোয় যাক, আমরা বাড়ি ফিরে যাব।'

—'ইঞ্জিন খ্বলে দাও। চল হে সব, চল।'

—'কসাক ভাই সব! দাঁড়াও দাঁড়াও! কসাক ভাই সব! থাম!' হাজার গলার ওপর দিয়ে নিজের গলা চড়াবার চেষ্টা করে বেঁটেখাটো কসাকটা চিৎকার করতে লাগল। 'দাঁড়াও! ইঞ্জিনের গায়ে কেউ হাত দিও না! আমরা চাই শ্বধ্ব এই বোকা বানানোর ফন্দিটা ভেস্তে দিতে। আস্বন দেখি রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার মশাই, দেখান আমাদের কাগজপত্তর; আমরা দেখতে চাই সত্যিসত্যিই আমাদের ফ্রণ্ট থেকে ডাকা হয়েছে কিনা, এটা তাদের শ্বধ্ব আর একটা জোচ্চ্বরি কি না।'

ব্বদ্ধিস্বদ্ধি গ্বলিয়ে, থরথর করে কাঁপা ঠোঁটে রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার রেজিমেণ্টকে ফ্রণ্টে নিয়ে যাবার ডিভিসন কর্তৃপক্ষের টেলিগ্রামটা জোরে চেঁচিয়ে পড়ার পর কসাকরা আবার ট্রেনে চাপতে রাজি হল।

একটা কামরায় চাপল তাতার্স্ক গ্রামের ছজন কসাক। পিয়োত্রা মেলেখফ, নিকোলাই কশেভয় (মিত্কার খ্বড়ো), আনিকুশ্কা, ফিওদোত্ বোদোভ্স্কোভ, মার্কোলোভ্ কোঁকড়ানো দাড়ি আর জ্বলজ্বলে হরিণচোখে কসাকের মত দেখতে এক জিপসি), আর মাক্সিম গ্রিয়াঝ্নোভ। গ্রিয়াঝ্নোভ চরিত্রহীন, ফ্বর্তিবাজ স্বভাবের কসাক। ডাকা-ব্বকো ঘোড়া চোর হিসেবে সারা ডন এলাকায় পরিচিত। কামরার মধ্যে অস্বস্তিকর বতাস ঢুকছে, তাড়াহ্বড়ো করে তৈরি আস্তাবলে মাথা ঢাকা অবস্থায় ঘোড়াগ্বলো দাঁড়িয়ে আছে, মেঝের মাঝখানে একতাল কাদার ওপর থেকে ভেজা কাঠের ধোঁয়া উঠছে, ঝাঁঝালো ধোঁয়া এঁকে বেঁকে দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। কসাকরা আগ্বনের চারপাশে ঘিরে বসেছে, দ্বর্গন্ধ কম্বলগ্বলো পায়ের ওপরে বিছিয়ে রেখে শ্বকিয়ে নিচ্ছে।

বোলোভ্‌স্কোভ খালি পা দুখানা আগুনে তাতাতে তাতাতে মোম লাগানো সুতো দিয়ে বুটের হাঁ-করা তালির ওপর দিকটা চটপট সেলাই করে নিচ্ছিল। বিশেষ কাউকে লক্ষ না করেই সে বলতে শুরু করল :

—'যখন ছোট ছিলাম, শীতের সময় আমি উঠে শুতাম উনুনের ওপরে; আর আমার ঠাকুমা (তখন তার বয়স একশ) আঙুল দিয়ে আমার মাথার উকুন বাছতে বাছতে বলত : 'ও সোনা, ও বাপধন মাক্সিম! আগেকার দিনে মানুষ আজকের মত দিন কাটাত না, তারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকত, আইনমাফিক চলত, কেউ তাদের আক্রমণ করতেও সাহস করত না। কিন্তু, দাদু, তুই বড় হয়ে বেঁচে থেকে দেখবি, গোটা দুনিয়া ঢাকা পড়ে যাবে তারে তারে, লোহার নাক-ওয়ালা পাখির ঝাঁক উড়বে আকাশে, দাঁড়কাক যেমন করে তরমুজ ঠুকরে খায়, তেমনি করে ঠুকরে খাবে মানুষকে। ছেলে বাপের বিপক্ষে যাবে, ভাই ভাইএর বিপক্ষে। আগুন লাগলে ঘাসের যেমন হয়, তেমনই অবস্থা হবে মানুষের।' একটু চুপ করে আবার বলে চলল গ্রিয়াঝ্‌নোভ। 'ঠাকুমা বুড়ী যা হবে বলত, তাইতো হতে চলেছে হে। টেলিগ্রাফ আবিষ্কার হয়েছে, সেই হচ্ছে তার। লোহার পাখি হচ্ছে উড়ো-জাহাজ। আর দুর্ভিক্ষও হবে নির্ঘাৎ। এ কয় বছর— অর্ধেক জমিতে চাষ দিয়েছে আমার জাতভাইরা, জমানো ফসলের অতি সামান্যই অবশিষ্ট আছে। সর্বত্রই এক। ফসল যদি মারা যায়, তাহলেই তো দুর্ভিক্ষ।'

—'কিন্তু ভাই যাবে ভাইএর বিপক্ষে এটা একটু বাড়িয়ে ভাবা, তাই না?' প্রশ্ন করল পিয়োত্রা মেলেখফ।

লোমহীন মুখখানা কুঁচকে ভয় পাওয়ার ভঙ্গি করে আনিকুসকা চেঁচিয়ে উঠল :

—'রানীমার শ্রীচরণে পেন্নাম, আরও কতকাল তবু লড়াই চালিয়ে যেতে হবে?'

—'যতদিন না তোমার দাড়ি গজায় নপুংসক।' ভেংচি কেটে কশেভয়ই বলল।

হো হো করে হেসে উঠল সবাই। আনিকুসকা হকচকিয়ে গেল। কিন্তু তার মধ্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে গ্রিয়াঝ্‌নোভ বলে উঠল :

—'না, যথেষ্ট হয়েছে আমাদের! সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে! এখানে এই নরকে পড়ে আছি, উকুনের কামড় খেয়ে মরছি; বাড়িতে বৌ-ছেলেমেয়েও এত দুর্ভোগ ভুগছে যে কাটলেও তাদের গা থেকে রক্ত বেরুবে না।'

—'গাঁ গাঁ করে চেঁচাচ্ছো কিসের জন্যে?' জুলপি চিবুতে চিবুতে ঠাট্টার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল পিয়োত্রা।

—'জানোই তো কিসের জন্যে!' কোঁকড়ানো দাড়ির আড়ালে হাসিটুকু গোপন করে মার্কুলোভ গ্রিয়াঝ্‌নোভের হয়ে উত্তর দিল। 'জানোই তো কসাকের কি দরকার, কিসের জন্যে হেদিয়ে মরে কসাক...তাতো জানাই আছে; কখনো কখনো রাখাল গরুর পাল মাঠে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, যতক্ষণ রোদের তাপে ঘাসের শিশির না শুখোয়, গরুগুলো ঠিকমতই থাকে; যেই সূর্য মাথার ওপরে ওঠে ডাঁশ কামড়াতে শুরু করে। আর এখানেও ঠিক তাই.' এই বলে ঘুরে পিয়োত্রার মুখোমুখি বসল, 'কর্পোরাল মশাই, গরুগুলো তখন হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়তে শুরু করে, পা ছুঁড়তে থাকে। জানা আছেই তো তোমার! না-বোঝার ভান করার দরকার নেই। নিজেই তো বাপু গরু চরিয়েছ। রাখাল ছোটে তাদের থামাবার জন্যে, কিন্তু তারা ছোটে বানের জলের মত, এই যেমন আমরা জার্মানদের দিকে ছুটেছিলাম। আর, তখন তুমি চেষ্টা করো তাদের থামাতে!'

—'এসব কথার অর্থ কি?'

উত্তর তখনি জবাব দিল না মার্কুলোভ। একগোছা দাড়ি আঙুলে জড়িয়ে নিয়ে নির্মমভাবে টানতে লাগল। তারপর, বলল। এবারে সে গম্ভীর, মুখে হাসি নেই আর।

—'চার বছর ধরে লড়াই করছি আমরা.. ঠিক তো, ঠিক কি না বল? ওরা আমাদের ট্রেঞ্চে ঢুকিয়ে দেবার পর চার চারটে বছর পার হল। কিন্তু কিসের জন্যে, কেন? কেউ তা জানে না। কিন্তু আমি যা বলছি তা এই, আজ হোক কাল হোক, কোন গ্রিয়াঝ্নোভ কি মার্কুলোভ কেটে পড়বেই ফ্রণ্ট থেকে, তারপর পেছনে পেছনে কাটবে রেজিমেণ্ট, রেজিমেণ্টের পেছনে গোটা ফৌজ...যা ঘটবে তা এই।'

—'তাহলে এই কথাই বলতে চাইছ তুমি!'

—'হ্যাঁ, এই কথাই! আমি অন্ধ নই, দেখতে পাচ্ছি সবকিছু সরু সুতোয় ঝুলছে। শুধু একজন কেউ বলুক, 'ব্যস্!' আর তাহলে সবাই খসে পড়বে কাঁধ থেকে কোট খসে পড়ার মত।'

—'তোমার একটু বেশি সতর্ক হওয়া উচিত।' উপদেশ দিল বোদোভ্স্কোভ। 'মনে রেখো পিয়োত্রা কর্পোরাল।'

—'কোনো বন্ধুকে আমি কখনো ফ্যাসাদে ফেলি নি।' ফেটে পড়ল পিয়োত্রা।

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে, রাগ কোরো না। আমি শুধু ঠাট্টা করছিলাম।'

পিয়োত্রার রাগ দেখে মুখের চেহারা পালটে গেল বোদোভ্স্কোভের, উঠে পড়ল সে, পায়ের শব্দ করতে করতে ঘোড়াগুলোর কাছে এগিয়ে গেল। কামরার আর এক কোণে অন্যান্য গ্রামের কসাকরা চাপাগলায় কথা বলছিল। কিছুক্ষণ পরে তারা একটা গান ধরল। ওদের আগুনের ধারে আসতে আমন্ত্রণ জানাল কশেভয়। স্টেশন থেকে ভেঙে নেওয়া বেড়ার কিছুটা অংশ আগুনে ফেলে দিল। আবার শুরু হল গান, এবার অনেক বেশি আনন্দোচ্ছল।

কিন্তু রক্তে-ভেজা শ্বেত-রাশিয়ার মাথার ওপরে তারার সার গভীর শোকে কাঁদতে লাগল। রাত্রির ধূমায়িত, তরল অন্ধকার হাঁ করে রইল। ঝরাপাতা, ভ্যাপসা পচা কাদা আর মার্চ মাসের গলা বরফের গন্ধে ভরপুর মাটির সঙ্গে বাতাস খুনসুটি করতে লাগল।

॥ তিন ॥

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই রেজিমেণ্ট ফ্রণ্টের কাছাকাছি পেঁাছে গেল। গাড়িখানা এক জংসন স্টেশনে থামল। ট্রেন থেকে নামবার নির্দেশ নিয়ে এল কর্পোরালরা। লাইনের ওপর তাড়াতাড়ি তক্তা ফেলে ঘোড়াগুলোকে নামানো হল, ভুলে ফেলে যাওয়া জিনিস-পত্তরের জন্যে ছুটোছুটির পর্ব চলল, পথের ভেজাবালির ওপরে জরাজীর্ণ বোঝাগুলো সোজাসুজি ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।

পিয়োত্রা এগিয়ে যাচ্ছিল, রেজিমেণ্ট-কমাণ্ডারের এক আর্দালি ডেকে বলল :

—'কমাণ্ডার তোমাকে ডাকছেন স্টেশনে।'

গ্রেট-কোটে পট্টিটা ঠিক করে নিয়ে আস্তে আস্তে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের দিকে এগুলো পিয়োত্রা। চলতে চলতে বলল :

—'আমার ঘোড়াটার দিকে একটু নজর রেখ, আনিকুশ্কা।'

আনিকুশকা নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল তার দিকে, তার বিষণ্ণ তিক্ত মুখের চিরাচরিত ক্লান্তির সঙ্গে উদ্বেগ এসে মিশল। রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার কেন তাকে ডেকেছে, সেই

কথা ভাবতে ভাবতে, কাদামাখা বুটের দিকে নজর রেখে চলতে চলতে পিয়োত্রার দৃষ্টি একটা ছোট দলের ওপর গিয়ে পড়ল। প্ল্যাটফর্মের একেবারে কোণে, গরম জলের ঘরের কাছে তারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে সে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। এক লালমুখো কসাককে ঘিরে জনকুড়ি সেপাই দাঁড়িয়ে আছে, ঘরের দিকে পেছন দিয়ে কসাকটাও ফাঁদে পড়ার মত অস্বস্তিজনক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। পিয়োত্রা তার দাড়ি-ঢাকা মুখের দিকে '৫২' সংখ্যা লেখা তার সার্জেণ্টের নীল তকমার দিকে তাকাল। মনে হল, লোকটাকে কোন জায়গায় আগে নিশ্চয়ই দেখেছে।

—'ব্যাপার কি?' সামনে যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল তার পিঠে হাত দিয়ে পিয়োত্রা কৌতূহলভরে জিজ্ঞেস করল।

—'পালাচ্ছিল, ধরেছি...তোমাদের কসাকদেরই একজন।'

কসাকটাকে আগে কোথায় দেখেছে পিয়োত্রা তাই মনে করবার চেষ্টা করল। পাকড়াও-করা লোকটা সেপাইদের খোঁচামারা প্রশ্নের কোন জবাব দিচ্ছে না, গোলার খোল কেটে তৈরি একটা তামার মগ থেকে ঢকঢক করে গরম জল খাচ্ছে, আর জলে ভিজিয়ে শুকনো বিস্কুট চিবুচ্ছে। চিবুনোর সময়, জলের ঢোক গেলার সময় দূরে দূরে বসানো ড্যাবডেবে চোখদুটো বুঁজে বুঁজে আসছে। নীচের দিকে চারপাশে তাকানোর সময় চোখের পাতাদুটো কাঁপছে। বন্দুকে সঙ্গীন চড়িয়ে তার পাশে পাহারা দিচ্ছে এক বয়স্ক, গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারার সেপাই। হৈ চৈ না করে সেপাইরা তাকে বাজিয়ে দেখছে। জলখাওয়া শেষ করে তাদের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে কসাকটা তাকাল। হঠাৎ তার শিশুর মত সরল নীল চোখদুটো কঠিন হয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি ঢোক গিলে জিভ চাটল, তারপর কর্কশ, ভারি গলায় চেঁচিয়ে উঠল :

—'আমি কি জানোয়ার? তোমরা মানুষকে খেতেও দেবে না, শুয়োরের বাচ্চা সব? আগে কখনো মানুষ দেখ নি?'

সেপাইরা হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল ; কিন্তু তার প্রথম কথাটা কানে যেতে না যেতেই পিয়োত্রার মনে লোকটার পরিচয় ঝলক দিয়ে উঠল।

—'ফোমিন! ইয়াকোব!' চিৎকার করে উঠে সে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে গেল।

হকচকিয়ে, বোকার মত ভঙ্গি করে লোকটা মগ নামাল, তারপরে, হাসিহাসি মুখে, চিবুতে চিবুতে ভ্যাবাচাকা খাওয়া চোখে পিয়োত্রার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল :

—'আমি তো বাপু চিনতে পারছিনে তোমাকে?'

—'তোমার বাড়ি রাবিয়োঝিনে? তাই না?'

—'হ্যাঁ। আর তোমার বাড়ি নিশ্চয়ই ঝেলান্স্কায়?'

—'না, ভিয়েশেন্স্কায়। কিন্তু আমি তোমাকে ঠিকই চিনি। বছর চারেক আগে তুমি আমার বাবাকে হাটে একটা বলদ বেচেছিলে।'

সেই একই রকম শিশুর মত সরল হাসি মুখে টেনে ফোমিন মনে করতে চেষ্টা করল। স্পষ্ট দুঃখের সঙ্গে বলল :

—'না, ভুলে গিয়েছি। মনে করতে পারছিনে তোমাকে।'

—'তুমি ৫২ নং এ ছিলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'দল ছেড়ে পালিয়েছ? কেন পালালে, ভাই?'

ফোমিন লোমের টুপিটা খুলে ফেলল, একটা জরাজীর্ণ থলে বার করল। একটু ঝুঁকল সে, আস্তে আস্তে টুপিটা বগলের নীচে ঠেলে দিল, কাগজের একটা কোণা ছিঁড়ে নিল, আর তারপরই শুধু তীব্র, বাষ্পাচ্ছন্ন, কম্পিত দৃষ্টিতে পিয়োত্রার দিকে স্থির হয়ে তাকাল। কর্কশকণ্ঠে বলে উঠল :

—'আর পারলাম না, ভাই।'

তার চোখের দৃষ্টিতে অনড় হয়ে কাশল পিয়োত্রা, হলদে জুলপিটা কামড়াতে লাগল।

—'বার্তাচিত শেষ করে ফেল, নইলে তোমাদের জন্যে আমি ফ্যাসাদে পড়ব।' পাহারাদার সেপাইটা বন্দুক কাঁধে তুলতে তুলতে মন্তব্য করল।

—'চল হে, বাপধন।'

ফোমিন তাড়াতাড়ি থলের মধ্যে মগটা পুরে ফেলল, চোখে চোখে না তাকিয়েই পিয়োত্রার কাছ থেকে বিদায় নিল, তারপর, ভালুকের মত দুলতে দুলতে ভারিক্কী ভঙ্গিতে পাহারাদারের সঙ্গে স্টেশন কমাণ্ডাণ্টের অফিসের দিকে এগিয়ে চলল।

॥ চার ॥

পিয়োত্রা দেখতে পেল, প্রথম শ্রেণীর কামরার মধ্যে একটি টেবিলের ওপর কোম্পানির দুজন কমাণ্ডারের সঙ্গে রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার ঝুঁকে আছে।

—'তুমি আমাদের বসিয়ে রেখেছ, মেলেখফ।' কর্নেল বিরক্তি-মাখানো ক্লান্ত চোখ-দুটো কোঁচকাল।

পিয়োত্রা নির্দেশ শুনল : তার রেজিমেণ্টকে ডিভিসন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, কসাকদের ওপর কড়া নজর রাখা দরকার, তাদের নজরে পড়ার মত ভাব-ভঙ্গির খবর কোম্পানির কমাণ্ডারকে দিতে হবে। অপলক দৃষ্টিতে কর্নেলের মুখের দিকে তাকিয়ে পিয়োত্রা মন দিয়ে শুনতে লাগল, কিন্তু ফোমিনের কম্পিতদৃষ্টি, আর সেই 'আর পারলাম না ভাই' কথাটা তার স্মৃতিতে এমনভাবে গেঁথে রইল যে ভুলে ফেলা কঠিন হল।

গরম, ভাপ-ওঠা কামরা ছেড়ে বাইরে এল পিয়োত্রা, তার কোম্পানিতে ফিরে চলল। নিজের কামরার কাছে আসতে আসতে দেখতে পেল একদল কসাক কামারকে ঘিরে ভিড় জমিয়েছে। ফোমিন আর তাদের কথাবার্তা সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি সে পা চালিয়ে দিল। ঘোড়ার খুরে নতুন নাল পরানো সম্পর্কে কামারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। প্রভাহের তুচ্ছ উদ্বেগ আর আশংকা মুহূর্তের জন্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু তা শুধু মুহূর্তের জন্যে। একটা কামরার পেছন থেকে সাদা, নরম তুলতুলে শাল গায়ে একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। শ্বেত-রাশিয়ার মেয়েদের চেয়ে পৃথক ঢঙে তার কাপড়-চোপড় পরা। তার দেহের আশ্চর্য পরিচিত ভঙ্গি দেখে পিয়োত্রা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ স্ত্রীলোকটি তার দিকে মুখ ফেরাল, তারপর কাঁধ আর যৌবনোচ্ছল অপরূপ দেহটা দোলাতে দোলাতে তার দিকেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে লাগল। আর, মুখ-চোখ বুঝতে পারার মত খুব কাছে না হলেও পা ফেলার আলতো ভঙ্গি দেখেই পিয়োত্রা তার বৌকে চিনতে পারল। হৃদপিণ্ডে একটা তৃপ্তিকর, চিনচিন-করা ঠাণ্ডার আমেজ ছড়িয়ে পড়ল। অপ্রত্যাশিত

বললেই তার আনন্দ মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তার বিশেষ আনন্দ হয়েছে অন্যেরা যাতে তা মনে না করে সেইজন্যে ইচ্ছে করেই হাঁটার গতি কমিয়ে তারদিকে এগ্‌লো। দারিয়াকে ব্‌কে জড়িয়ে ধরে প্রথামত তিনবার চুম্‌ খেয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, কিন্তু অন্তরের গভীর উত্তেজনা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। ঠোঁটদ্‌টো থরথর করে কাঁপতে লাগল, গলা দিয়ে স্বর বের্‌ল না। অবশেষে ধরা গলায় বলল :

—'ভাবতেও পারি নি তুমি আসবে।'

—'তোমার চেহারা কি পালটে গিয়েছে গো।' দারিয়া হাততালি দিয়ে উঠল। 'একেবারে চিনতে পারা যাচ্ছে না! দেখছ, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চলে এলাম। বাড়ির কেউ আসতে দেবে না আমাকে। কিন্তু আমি ঠিক করলাম, যাবই। আপনার-জনের সঙ্গে দেখা করবই।' স্বামীর গায়ে লেপটে, ভেজা ভেজা ম্‌খের দিকে তাকিয়ে তড়বড় করে সে বলে চলল।

কামরাগ্‌লোর চারপাশে ভিড় জমাল কসাকরা, আড়চোখে তাকিয়ে বিকৃতস্বরে ঠাট্টা করতে লাগল :

—'পিয়োত্রাটা বেড়ে আছে!'

—'আমার ব্‌ড়ী খানকিটা দেখা করতেও আসে না।'

—'পিয়োত্রা একরাতের জন্যে বৌকে বন্ধ্‌দের ধারও দিতে পারে। আমাদের অভাব দেখে তার দয়া...'

এই ম্‌হ্‌র্তে পিয়োত্রা ভুলে গেল যে, সে নিজে প্রতিজ্ঞা করেছিল বৌকে নির্মম শাস্তি দেবে। তামাকের ছোপ লাগা থ্যাবড়া আঙ্‌ল দিয়ে দারিয়ার বাঁকা ভুর্‌দ্‌টোয় টোকা দিতে দিতে, উল্লসিত হয়ে সবার সামনেই তাকে ব্‌কে জড়িয়ে ধরল। দারিয়াও ভুলে গেল, মাত্র দ্‌ রাত আগে সে এক পশ্‌-চিকিৎসকের সঙ্গে কামরার মধ্যে রাত কাটিয়েছে। ড্রাগ্‌ন-দলের পশ্‌-চিকিৎসকটি খারকোভ থেকে তার রেজিমেণ্টে ফিরছিল। তার গোঁফজোড়া অদ্ভুত নরম আর কালো ছিল। কিন্তু সে তো দ্‌ রাত আগে; আর এখন, অকৃত্রিম আনন্দে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে, ছলনাহীন স্বচ্ছ্‌দৃষ্টিতে ম্‌খের দিকে তাকিয়ে স্বামীকে সে ব্‌কে জড়িয়ে ধরল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

ছ্‌টি থেকে ফেরার পর লিস্তনিৎস্কি প্‌রনো রেজিমেণ্টে যোগ দিল না সোজা গেল ডিভিসনের দপ্তরে। বড়কর্তা এক অল্পবয়সী জেনারেল, নামকরা অভিজাত ডন-কসাক পরিবারের ছেলে। আগের রেজিমেণ্টের কসাকদের নিয়ে তার যে অস্‌বিধে হয়েছিল, সেকথা মনে রেখে, খ্‌শী হয়েই সে চোদ্দ নম্বর রেজিমেণ্টে বদলির ব্যবস্থা করে দিল।

বদলি হতে পেরে উল্লসিত হল লিস্তনিৎস্কি।সেই দিনই দ্‌ভিন্‌স্কে চলে গেল, সেখানেই আছে চোদ্দ নম্বর রেজিমেণ্ট। রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারকে খবর দিল। জানতে পেরে খ্‌শী হল, বেশির ভাগ অফিসারই রাজতন্ত্রী, কসাকদের মতিগতিও কোনরকমেই

বিপ্লবাত্মক নয়। তারা অত্যন্ত অনিচ্ছায় অস্থায়ী সরকারের শপথ নিয়েছে, চারপাশে যেসব ঘটনা ঘটেছে তাতে কোন অংশই নেয় নি। নিরীহ, শান্ত, বশংবদ কসাকদের রেজিমেণ্ট আর কোম্পানির কমিটিতে নির্বাচিত করা হয়েছে। নতুন পরিবেশে আরও সহজভাবে নিঃশ্বাস ফেলল লিস্তনিংস্কি।

প্রায় দু মাস ধরে রেজিমেণ্টকে দ্ভিন্স্কে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, একটিমাত্র দলে সমবেত হয়ে তারা বিশ্রাম করছিল। আগে দুটো কোম্পানিকে পদাতিক ডিভিসনে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল, রিগা থেকে দ্ভিন্স্ক পর্যন্ত ফ্রণ্টে ফ্রণ্টে ঘুরছিল; কিন্তু এক সাবধানী লোকের হাতে পড়ে কোম্পানিগুলো এক হয়েছে, এখন তারা যেকোন কাজের জন্যে তৈরি। অফিসারদের কড়া নজরে থেকে কসাকরা দৌড়ঝাঁপ করে, ঘোড়াগুলোকে আচ্ছা করে খাওয়ায়, বাইরের প্রভাব থেকে দূরে সরে নিরুত্তাপ, ঢিলে-ঢালা দিনগুলো কাটিয়ে দেয়। কসাকদের মধ্যে রেজিমেণ্টের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অপ্রীতিকর গুজব রটে: ওদিকে অফিসাররা প্রকাশ্যেই তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে— আস্থাভাজন নেতার পরিচালনায় তারা নাকি অদূর ভবিষ্যতেই ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেবে।

একটু এগিয়ে পশ্চিমেই প্রসারিত হয়ে আছে ফ্রণ্ট। সেখানে, ভয়াবহ উত্তেজনায় সৈন্যবাহিনীর দিন কাটছে, সেখানে সাময়িক সরবরাহের ঘাটতি. সেখানে খাবারের অভাব। 'শান্তি' নামক ভৌতিক শব্দটিকে অসংখ্য হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইছে সৈন্যরা। উগ্র ক্রোধের স্রোত বইছে সৈন্যদলের মধ্যে, ঝরনার জলের মত বুদ্বুদ উঠছে।...কিন্তু দ্ভিন্স্কে শান্ত, শিষ্ট, নিরুদ্বেগে দিন কাটায় কসাকরা, ফ্রণ্টে যা কিছু দুঃখভোগ করেছিল তা সবই স্মৃতির গভীরে চাপা পড়ে গিয়েছে। অফিসাররা নিয়মিত তাদের সভায় হাজিরা দেয়, আরাম করে খেয়ে দেয়ে। অতি উৎসাহে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে।

॥ দুই ॥

এইভাবেই কাটল জুলাইয়ের প্রথম দিন পর্যন্ত। ষোল তারিখে নির্দেশ এল, এক মুহূর্ত দেরি না করে এগুতে হবে। পেত্রোগ্রাদের দিকে এগুতে শুরু করল রেজিমেণ্ট। কুড়ি তারিখে রাজধানীর কাঠ-বিছানো রাস্তায় রাস্তায় কসাকদের ঘোড়ার খুরে খটাখট আওয়াজ উঠল।

নেভ্স্কি প্রস্পেক্টের ধারের বাড়িগুলোয় আস্তানা গাড়ল রেজিমেণ্ট, লিস্তনিংস্কির কোম্পানিকে একটা অফিস-বাড়ি দেওয়া হল। অধৈর্যে, উল্লাসে অপেক্ষা করা হচ্ছিল কসাসদের জন্যে : তাদের জন্যে নির্দিষ্ট বাড়িগুলো শহরের কর্তৃপক্ষ যেভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়েছেন, তাতেই তা স্পষ্ট প্রমাণ হয়। নতুন চুনকামে ধবধব করছে দেয়ালগুলো, তকতকে ঝকঝকে মেঝে, আলো-বাতাস-খেলা, পরিচ্ছন্ন একতলাটা বেশ আরামপ্রদই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরগুলো দেখল লিস্তনিংস্কি, মনে হল, এর চেয়ে ভালো কিছু আর হতে পারে না। দেখেশুনে খুশী হয়ে সে আঙিনার দরজার দিকে পা বাড়াল: তার সঙ্গে ফিটফাট জামাকাপড় পরা, বেঁটেখাটো একজন পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বাড়িখানা দেখানোর ভার পড়েছে তারই ওপরে।

অন্যমনস্কের মত পৌর প্রতিনিধির বকবকানি শুনতে শুনতে আঙিনা পেরিয়ে

এগিয়ে গেল লিস্তানিৎস্কি, আস্তাবলের জন্যে ঠিক করা গুদাম ঘরটা দেখল। বুঝিয়ে বলল :

—'আস্তাবলে আর একটা দরজা ফুটিয়ে নিতে হবে আমাদের। একশ' কুড়িটা ঘোড়ার পক্ষে তিনটে দরজায় চলবে না। বিপদের সময় ঘোড়াগুলোকে বাইরে আনতেই আধ-ঘণ্টা লেগে যাবে। ব্যাপারটা আগে খেয়াল করা হয় নি আশ্চর্য তো। ব্যাপারটা জানাতে হবে রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারকে।'

কাজটা এখুনি শুরু করতে হবে শুনে লোকটা গাঁইগুঁই করতে লাগল। লিস্তনিৎস্কি তাকে ফেলে রেখে, কোম্পানির অফিসারদের জন্যে সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট ওপরতলার ঘরে চলে এল। ক্যাম্প-খাটের ওপরে আছড়ে পড়ে চুপচাপ শুয়ে রইল। অনুভব করতে লাগল, গায়ে লেপটে ঠাণ্ডা আমেজ দিয়ে সার্টের ঘাম শুকিয়ে আসছে। পথ-চলার ধকলে ক্লান্ত হয়ে ইচ্ছে হল না যে উঠে হাতমুখ ধোয়। তবু ক্লান্তি দমন করে অবশেষে উঠল, জামাকাপড় খুলল, ভালো করে হাতমুখ ধুল, তারপর তোয়ালে দিয়ে গা মুছল। হাতমুখ ধুয়ে বেশ তাজা হয়ে উঠল সে। দিনকয়েক আগে শহরে যে গোলযোগ হয়েছিল তার খবর পড়বার জন্যে খবরের কাগজটা তুলে নিতে যাবে, এমন সময় রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারের কাছ থেকে ডাক এল। অনিচ্ছাসত্বেও বিছানা ছেড়ে উঠল সে, জামাকাপড় পরল, তারপর চলল নেভস্কি প্রস্‌পেক্টের দিকে। একটা সিগারেট ধরিয়ে এগুতে লাগল রাস্তা বরাবর। পুরুষের সোলার টুপি, 'বোলা'র টুপি,সাদা টুপি, আর কৃত্রিমভাবে সাদাসিধে প্রমাণ-করা মেয়েদের ফিট্‌ফাট টুপির তরঙ্গ উঠছে রাস্তায়। রঙের বন্যায় মাঝে মাঝে কোন সৈনিকের মাথার গণতান্ত্রিক সবুজ টুপি ভাসছে ডুবছে।

সমুদ্রের দিক থেকে গা-জুড়ানো, তাজা বাতাস ভেসে আসছে, কিন্তু বাড়ির সারিতে ধাক্কা খেয়ে ফুরফুরে, এলোমেলো দমকায় ছড়িয়ে পড়ছে। ইস্পাতের মত, বেগুনে ছোপ দেওয়া আকাশে মেঘ ভেসে চলেছে দক্ষিণমুখে; দুধের মত সাদা মেঘের স্তূপে অতি স্পষ্ট খাঁজ কাটা কাটা দাগ। শহরের বুকে ভ্যাপসা গুমোট চেপে বসেছে, বৃষ্টি নামবে। গরম পিচ, পোড়া পেট্রোল, পাশের সমুদ্রের গন্ধ, একাধিক সুগন্ধির অনির্নীত গন্ধ আর, বড় শহরের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক অসংখ্য বিচিত্র গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে।

দোকানগুলোর রোদ আড়াল দেওয়া ঢাকনা থেকে রাস্তার ওপরে জলপাইএর মত হলদে মন্থর আলোর রেখা পড়েছে। ঢাকনাগুলো বাতাসে দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠছে, আলোর রেখা কেঁপে কেঁপে উঠছে, আর চলমান পথিকের পায়ের নীচে থেকে সরে সরে যাচ্ছে। দুপুর হওয়া সত্ত্বেও, লোকের ভিড় জমেছে নেভ্‌স্কিতে। যুদ্ধের কবছরে শহরের জীবনের সঙ্গে লিস্তনিৎস্কি অপরিচিত হয়ে উঠেছিল, আজ সে উল্লসিত তৃপ্তিতে গিলতে লাগল বিচিত্র শব্দের গর্জন, মোটরের ভেঁপু, খবরের কাগজ বিক্রি-ওয়ালাদের চিৎকার। ধোপ-দুরস্ত জামাকাপড় পরা, দুধ-ঘি খাওয়া মানুষের ভিড়ে নিজেকে যেন আপনার জনের মধ্যে মনে হল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে না ভেবে পারল না:

—'কি খুশি, কি ফুর্তি, কি আনন্দ এখন তোমাদের! তোমরা সবাই: ব্যবসায়ী, ফাটকার দালাল, সরকারী কর্মচারী, জমিদার, মহাশয় ব্যক্তিরা সব! মাত্র তিনদিন আগে, ঠিক এই রাস্তা ধরেই মজুর আর সৈনিকেরা যখন গলিতধাতুর স্রোতের মত ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল, তখন কেমন মনে হয়েছিল তোমাদের? সত্যি বলতে কি, আমি তোমাদের জন্যে খুশী, আবার খুশীও নই। তোমাদের সুখশান্তিতে কি করে উল্লাস প্রকাশ করব তা আমি জানি না...'

তার মিশ্রিত অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করল লিস্তনিৎস্কি, বুঝতে কষ্ট হল না যে, তার এই ধরনের মনে করার আর ভাবার কারণ হচ্ছে, যুদ্ধ এবং যুদ্ধের মধ্যে যে জীবন তাকে যাপন করতে হয়েছে, তা এই দুধ-ঘি খাওয়া, পরিতৃপ্ত নরনারীর ভিড় থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

—'যেমন, ধরো তুমি,' এক তরুণের ফুলোফুলো গোলাপী গালের দিকে চোখ পড়তেই সে মনে মনে ভাবল, 'ফ্রন্টে যাও নি কেন তুমি? মনে হচ্ছে, কোন কারখানার মালিক কিংবা জাঁদরেল ব্যবসায়ীর ছেলে, তাই কেটে বেরিয়ে এসেছে ফৌজী ব্যারাক থেকে, ষাঁড়ের গোবর! এখনি উনি 'পিতৃভূমি রক্ষা'র জন্যে খেটে খেটে চর্বি বাড়াচ্ছেন!'

যে বাড়িতে রেজিমেন্টের প্রধান দপ্তর আছে, তার সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল সে। তেতলার সিঁড়িতে পা দেবার আগে একটা সিগারেট খেয়ে নিল, পাঁশনেটা মুছল, তারপর উঠতে লাগল তেতলায়, সেখানেই দপ্তর রয়েছে।

রেজিমেন্টের কমান্ডার লিস্তনিৎস্কির সামনে পেত্রোগ্রাদের একখানা ম্যাপ বিছিয়ে ধরল, দেখিয়ে দিল তার কোম্পানিকে কোন এলাকার সরকারী বাড়িগুলোকে পাহারা দিতে হবে। একটা একটা করে বাড়িগুলো বিশদভাবে চিনিয়ে দিল তাকে, পাহারা বসাবার সময় ও কায়দা সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ দিল। শেষ করল এই বলে :

—'শীত-প্রাসাদে কেরেন্স্কি...'

—'কেরেন্স্কির কোন কথা বলবেন না!' লিস্তনিৎস্কি হিংস্রভাবে বিড়বিড় করে উঠল, মুখখানা মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে উঠল।

—'অবস্থা বুঝে আপনাকে চলতে হবে, ইউজেন নিকোলাইভিচ্।'

—'কর্নেল, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি...'

—'শুনুন না, মশাই...'

—'আমি অনুরোধ করছি আপনাকে!'

—'আপনার মেজাজটা...'

—'পুতিলোভ কারখানার দিকে এখুনি কি আমাকে টহলদার দল পাঠাতে হবে?' জোরে জোরে দম নিতে নিতে লিস্তনিৎস্কি শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল।

ঠোঁট কামড়াল কর্নেল, একটু হাসল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল :

—'এখুনি, এই মুহূর্তে! আর, পাঠাবেন কোন গ্রুপ-অফিসারকে ভার দিয়ে, কোন নড়চড় হয় না যেন।'

লিস্তনিৎস্কি ঘুরে দাঁড়াল। কর্নেলের সঙ্গে তার কথাবার্তার স্মৃতিতে মুষড়ে বাইরে চলে এল। সদর দরজার প্রায় বাইরে এসেই চতুর্থ ডন-কসাক রেজিমেন্টের একটা টহলদার দলকে দেখতে পেল। অফিসারের ঘোড়ার মুখোস থেকে তাজা ফুল বিষণ্ণভাবে নুয়ে আছে, লোকটার শনের মত জুলপি-ওয়ালা মুখখানা হাসিতে বেঁকে আছে।

—'দেশ বচানেওয়ালা জিন্দাবাদ!' রাস্তা ছেড়ে নেমে এসে এক বাক্য-বাগীশ ভদ্রলোক টুপি নেড়ে চিৎকার করে উঠল।

ভদ্রভাবে সেলাম করল অফিসার, তারপর খটাখট আওয়াজ তুলে টহলদার দল এগিয়ে গেল। যে ভদ্রলোকটি কসাকদের জয়ধ্বনি করল তার থুথু ওঠা, উত্তেজিত মুখের দিকে তাকাল লিস্তনিৎস্কি, গলায় সযত্নে বাঁধা রঙীন গলাবন্ধটা দেখল, তারপর ভুরু কুঁচকে কোম্পানির দপ্তরের গেটের মধ্যে দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল।

॥ তিন ॥

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সর্বাধিনায়ক হিসাবে জেনারেল কোর্নিলোভের নিয়োগ চতুর্দশ কসাক-রেজিমেন্টের অফিসাররা বিশেষভাবে সমর্থন করল। শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে তারা লোকটার লৌহ-দৃঢ়-চরিত্রের বিস্তর প্রশংসা করল; যে ডামাডোলের মধ্যে অস্থায়ী সরকার দেশকে এনে ফেলেছে, তা থেকে তিনি নিঃসন্দেহে উদ্ধার করতে পারবেন। তাঁর নিয়োগকে বিশেষ করে স্বাগত জানাল লিস্তনিৎস্কি। কোম্পানির তরুণ অফিসার অার বিশ্বস্ত কসাকদের মারফতে সে জানতে চেষ্টা করল, নীচের তলার কসাকরা ব্যাপারটা কি ভাবে নিল; কিন্তু যে খবর পেল, তাতে মোটেই খুশী হতে পারল না; কারণ, কসাকরা হয় চুপ করে রইল নয়ত নিরুৎসাহে উত্তর দিল:

—'এতে কোন ইতর বিশেষ হবে না আমাদের।'

—'তিনি যদি শান্তি আনার চেষ্টা করেন, তাহলে অবশ্য '

—'তিনি এলে আমাদের কোন বিশেষ সুবিধে হবে না।'

কোর্নিলোভের নিয়োগের কয়েকদিনের মধ্যে অফিসারদের ভেতরে গুজব রটে গেল, ফ্রন্টে মৃত্যুদণ্ড আবার প্রবর্তনের জন্যে তিনি সরকারকে চাপ দিচ্ছেন; সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ চালানো যার ওপর নির্ভর করে, সেই ধরণের অন্যান্য কড়াব্যবস্থা চালু করতে চাইছেন; কিন্তু কেরেনস্কি বাধা দিচ্ছে, চেষ্টা করছে তাঁকে সরিয়ে সেই জায়গায় কোন বশংবদ জেনারেলকে বসাতে। তাই, সর্বাধিনায়ক হিসাবে কোর্নিলোভের নিয়োগ জানিয়ে পয়লা আগস্টের সরকারী ইস্তাহার বেরুলে সবাই ভীষণ অবাক হয়ে গেল। সেইদিনই সন্ধ্যায় রেজিমেন্টের অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করবার সময় লিস্তনিৎস্কি সোজাসুজি প্রশ্নটা উত্থাপন করল: 'তারা কার দিকে?'

—'ভদ্রমহোদয়গণ!' উত্তেজনা দমন করে সে বলল। 'আমরা এক পরিবারের মত বাস করছি, তবু এ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অমীমাংসিত রয়ে গিয়েছে। এখন আমরা যেহেতু সামরিক কর্তৃত্ব এবং সরকারের মধ্যে সংঘর্ষের পথে পরিষ্কার এগিয়ে চলেছি, আমাদের এ প্রশ্নের মীমাংসা করে নিতে হবে, আমরা কার দিকে। কারও কাছ থেকে কোন কিছু গোপন না করে আসুন আমরা বন্ধুর মত আলোচনা করি।'

তার এই আমন্ত্রণে প্রথম উত্তর দিল লেফটানান্ট আতার্শচিকোভ:

—'জেনারেল কোর্নিলোভের জন্যে আমি নিজের রক্ত দিতে, অন্যের রক্তপাত করতেও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তাঁর সততায় কোন খাদ নেই, একমাত্র তিনিই পারেন রাশিয়াকে পায়ের ওপর দাঁড় করাতে। দেখুন, এরই মধ্যে তিনি কি করেছেন ফৌজে। তাঁর জন্যেই কমাণ্ডারের হাত-বাঁধা অবস্থার উন্নতি হয়েছে কিছুটা, আর এর আগে ছিল শুধু কমিটি আর কমিটি, দলভাঙানো আর দল থেকে পালানো। এ সম্পর্কে কোন আলোচনার কি থাকতে পারে?' মারমুখী হয়ে সে কথাগুলো বলল; শেষ হলে অফিসারদের দিকে তাকিয়ে প্রতিদ্বন্দ্ব-জানানোর ভঙ্গিতে কেসের গায়ে সিগারেট ঠুকতে লাগল।

—'বলশেভিক, কেরেন্স্কি আর কোর্নিলোভের মধ্যে যদি বেছে নিতে হয়, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই কোর্নিলোভকে নেব।' অপর একজন বলল।

—'কোর্নিলোভ কি চান তা বুঝা কঠিন: তিনি কি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চান, না, ফিরিয়ে আনতে চান অন্য কিছু...' মন্তব্য করল তৃতীয় একজন।

—'এটা কোন উত্তর হল না! যদি উত্তর হয়, তাহলে মানে হয় না কোনো। কিসের ভয় পাচ্ছেন আপনি: রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার?'

—'তার কোন ভয় নেই আমার; বরং তার উল্টো।'

—'বেশ, তাহলে কি বলতে চাইছেন আপনি?'

—'ভদ্রমহোদয়গণ!' দোল্‌গোভ বলে উঠল, সামরিক নৈপুণ্য দেখিয়ে সবে সে কর্পোরাল থেকে কর্নেট পদে উঠেছে। 'কি নিয়ে ঝগড়া করছি আমরা? খোলাখুলি বলুন, ছেলে যেমন মাকে আঁকড়ে থাকে, আমরা কসাকরা তেমনি আঁকড়ে ধরে থাকব জেনারেল কোর্নিলোভকে। ওঁকে ছাড়লে সর্বনাশ হবে আমাদের। রাশিয়া আমাদের আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলবে। আমাদের কি করতে হবে তা পরিষ্কার: তিনি যে পথে যাবেন, আমরাও যাব সঙ্গে।'

—'একেবারে খাঁটি কথা!' দোল্‌গোভের পিঠে চাপড় দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আতার্শ্‌চিকোভ। 'এখন বলুন, ভদ্রমহোদয়গণ!' গলার স্বর চড়িয়ে সে বলল: 'বলুন, আমরা কোর্নিলোভের পক্ষে, কি পক্ষে নই?'

—'নিশ্চয়ই তার পক্ষে।'

হাসতে হাসতে, এ ওকে চুমু খেতে খেতে অফিসাররা চা-পান করতে লাগল। এতক্ষণ যে আড়ষ্ট ভাব ছিল তা কেটে গেল, গত কয়েকদিনে যে সব ঘটনা ঘটেছে, আলোচনার মোড় ঘুরল সেই দিকে।

—'আমরা সবাই সর্বাধিনায়কের পক্ষে, কিন্তু কসাকরা একটু মুষড়ে আছে।' একটু হালকাভাবেই দোল্‌গোভ মন্তব্য করল।

—''মুষড়ে আছে' কেমন?' লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

—'গুম হয়ে আছে ওরা, যত গড়বড় ত সেইখানেই। শুয়োরের বাচ্চারা বাড়ি ফিরতে চায় বৌ-এর কাছে। ওদের জীবন তত আরামের নয়, মধুরও নয়।'

—'কসাকদের মতে আনবার দায়িত্ব ত আমাদের।' টেবিলের ওপরে দুম করে একটা কিল মেরে আর একজন অফিসার বলে উঠল। 'সেইজন্যেই ত আমরা অফিসাররা আছি।'

চামচে দিয়ে গেলাসের গায়ে ঠুনঠুন করে আওয়াজ করল লিস্তনিৎস্কি, সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ভেবেচিন্তেই বলতে শুরু করল:

—'আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের এই মুহূর্তের কাজ হচ্ছে কসাকদের সত্যিকারের অবস্থা বুঝিয়ে বলা। কমিটিগুলোর প্রভাব থেকে দূরে সরিয়ে আনতে হবে কসাকদের। এখন থেকে তাদের কাছে ভিন্ন পন্থায় এগুতে হবে। আগের দিনে, যেমন ধরুন ১৯১৬ সাল হলে, চাবুক মারতে পারতাম কসাককে, তারপর, পরের দিনের লড়াইতে পেছন থেকে গুলি খেয়ে মরার ঝুঁকিও নিতে পারতাম। কিন্তু মার্চ-বিপ্লবের পর থেকে ভিন্ন পথে চলতে হচ্ছে আমাদের, কারণ, যদি কোন আহাম্মুককে মেরে বসি, তাহলে সে স্বচ্ছন্দে সেইখানেই আমাকে খুন করে দিতে পারে, পরের কোন উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে না। এখন আবার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, এখন আমাদের বন্ধুভাবে দলে টানতে হবে কসাকদের। তার

ওপরেই নির্ভর করছে সব কিছু।' বিশেষ জোর দিয়ে সে বলে উঠল: 'প্রথম ও চতুর্থ রেজিমেণ্টে এখন কি ঘটছে তা আপনারা জানেন? পুরনো দিনের মত একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে অফিসাররা দূরে দূরে ছিলেন, ফলে শেষ কসাকটি পর্যন্ত বলশেভিকদের প্রভাবে এসে গিয়েছে একথা স্পষ্ট, যে সব ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটবে, তা আমরা এড়িয়ে যেতে পারব না। যারা কোনো কিছু কানে তুলতে চায় না, তাদের আগে থাকতে সতর্ক করে দিয়েছে ১৬ই ও ১৮ই জুলাই'এর অভ্যুত্থান।... কোর্নিলোভের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ফৌজের বিরুদ্ধে হয় আমাদের লড়তে হবে, নয়ত আবার একটা বিপ্লব আনবে বলশেভিকরা। তারা দম নিচ্ছে, শক্তি সংহত করছে, আর আমরা ঢিল দিয়ে আছি। এটা কি ভাল হচ্ছে?'

—'সত্যি কথা, লিস্তনিৎস্কি।'

—'কবরের দিকে এক পা বাড়িয়ে আছে রাশিয়া।'

—'আমার কথা হচ্ছে, যখন আগামী যুদ্ধ শুরু হবে...আমি গৃহ-যুদ্ধের কথা বলছি,—সবে বুঝতে শুরু করেছি তা অনিবার্য—তখন আমাদের বিশ্বস্ত কসাকের প্রয়োজন হবে। যে সমস্ত কমিটি বলশেভিকদের দিকে ঝুঁকেছে, তাদের হাত থেকে কসাকদের সরিয়ে আনার জন্যে আমাদের লড়তে হবে। এইটেই সবচেয়ে দরকার! মনে রাখবেন, নতুন কোন গোলযোগ শুরু হলে প্রথম ও চতুর্থ রেজিমেণ্টের কসাকরাই তাদের অফিসারদের গুলি করে মারবে...'

—'ঠিক কথা; কোন ভণিতাও করবে না তারা।'

—'...আর তাদের অভিজ্ঞতা থেকে—বড়ই তিক্ত অভিজ্ঞতা—শিক্ষা নিতে হবে আমাদের। প্রথম ও চতুর্থ রেজিমেণ্টের কসাকদের ব্যাপার তাড়াতাড়ি ফয়সালা করে ফেলতে হবে (সেক্ষেত্রে, তারা কসাকই নয়!)। মাঠ থেকে আগাছা উপড়ে ফেলতে হবে! যে ভুলের জন্যে পরে অনেক মূল্য দিতে হবে, তার হাত থেকে আমাদের নিজেদের কসাকদের বাঁচাতে হবে।'

লিস্তনিৎস্কির পর উঠল কোম্পানি কমাণ্ডারদের একজন এক বয়স্ক অফিসার। ন'বছর আছে সে রেজিমেণ্টে, আহত হয়েছে চারবার। সে যুদ্ধের আগের সময়কার কসাক রেজিমেণ্টের চাকরির অসুবিধার কথা বলতে লাগল। কসাক অফিসারদের রাখা হত পেছনে, একেবারে আড়ালে; পদোন্নতি হত শম্বুক গতিতে; তার মতে, জার সিংহাসনচ্যুত হবার সময় কসাক নেতাদের নিষ্ক্রিয়তার এই ছিল কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যে কোন শর্তে কোর্নিলোভকে সমর্থন করা, এবং কসাক সৈন্যের মৈত্রীসংঘ ও অফিসারদের মৈত্রীসংঘের মুখ্য সমিতির মারফতে কোর্নিলোভের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। এই বলে সে শেষ করল; 'কোর্নিলোভ ডিক্টেটর হন। কসাকদের কাছে তা হবে পরিত্রাণের সামিল। জারের অধীনে যেমন ছিলাম, তার চেয়ে হয়ত ভালই থাকব তাঁর অধীনে।'

ভোর পর্যন্ত বসে বসে আলাপ আলোচনা করল অফিসাররা। ঠিক হল, অবসর সময়ে ব্যাপৃত রাখার জন্যে ও আনুগত্য-টলানো রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে দূরে সরিয়ে আনার জন্যে, সপ্তাহে তিনদিন করে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কসাকদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে, কসরত করিয়ে, রোজ পড়িয়ে শুনিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখতে হবে। সভা ভঙ্গ হবার আগে, ঠাট্টার ছলে চায়ের গেলাসে ঠোকাঠুকি করে শুভকামনা করা হল, দোলগোভ আর আতার্শিকোভ এক পুরনো কসাক গান ধরল:

'......তবু আমাদের ডন গর্বিত, তরঙ্গ-ধীর ডন আমাদের পিতা;
ধর্মহীনের পায়ে নোয়ায়নি মাথা,
মস্কোর কাছে জীবনধারার দীক্ষা চায়নি কভু;
তলোয়ারমুখে তুর্কী সেনারে করেছে সম্ভাষণ
যুগযুগান্ত ধরে;
ডনের এ দেশ, এই স্তেপ, এই কসাক মাতৃভূমি,
মেরীমাতা আর স্বধর্ম-রক্ষণে,
মুক্ত স্বাধীন এই ডন শত তরঙ্গসঙ্কুল
বছরে বছরে যুঝেছে নিরন্তর।'

হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি হাত দুখানা রেখে একবারও হোঁচট না খেয়ে একটানা গেয়ে চলল আতার্শচিকোভ, মুখখানা অস্বাভাবিক কঠিন হয়ে উঠল। শুধু গানের শেষ দিকে লিস্তনিৎস্কি দেখল, তার গাল বেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে নামছে।

॥ চার ॥

অন্যান্য কোম্পানির অফিসাররা চলে যাবার পর আতার্শচিকোভ লিস্তনিৎস্কির বিছানায় এসে বসল। বুকের ওপরকার পাজামা আটকানোর পট্টিদুটো নাড়তে নাড়তে ফিসফিস করে বলল:

—'বুঝলে, ইউজেনে.. ডন আমার ভয়ঙ্কর প্রিয়—তার সবকিছু পুরনো, তার যুগযুগান্তের কসাক জীবনধারা। আমি ভালবাসি আমার কসাকদের, কসাক মেয়েদের। ভালবাসি সবাইকে। স্তেপের 'ওয়ার্ম-উডে'র গন্ধ নাকে এলে কান্না পায় আমার... যখন সূর্যমুখি ফুল ফোটে, বাতাসে যখন বৃষ্টি-ধোয়া আঙুর-লতার গন্ধ ভাসে, সব-কিছু ভালবাসি এত গভীরভাবে, বুকটা টনটন করে, বুঝতে পারলে, আর এখন আমি ভাবছি: এই সব দিয়ে সেই কসাকদেরই আমরা বোকা বানাচ্ছি নাত? তারা এই পথেই চলবে এই কি আমরা চাই?'

—'কি বলতে চাইছ তুমি?' হুঁসিয়ার হয়ে প্রশ্ন করল লিস্তনিৎস্কি।

—'কসাকদের পক্ষে এটা শ্রেষ্ঠ পথ কি না তাই ভাবছি।'

—'কিন্তু তাহলে তাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠপথ কি?'

—'জানি না তা. .কিন্তু তারা এমন করে. মূলগতভাবে আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে কেন? বিপ্লব সোজাসুজি আমাদের ভেড়া আর বাছুরে ভাগ করে দিয়েছে; আমাদের স্বার্থকে পৃথক বলে মনে হয়।'

—'দেখতে পাচ্ছ না?' সতর্কভাবে শুরু করল লিস্তনিৎস্কি। 'এতেই ঘটনা বুঝে উঠতে পারার পার্থক্যটা ধরা পড়ে। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা অনেক উঁচুদরের, পরিস্থিতিকে খুঁটিয়ে বুঝতে পারি আমরা, কিন্তু ওদের কাছে সব কিছু আরও আদিম, আরও সরল। দিনরাত বলশেভিকরা ওদের মাথায় ঢোকাচ্ছে, যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে, নয়ত, গৃহযুদ্ধে পরিণত করতে হবে। ওরা আমাদের সম্পর্কে কসাকদের মন বিষিয়ে দিচ্ছে। আর, ওরা ক্লান্ত বলে, ওদের মধ্যে পশুর দিকটা বেশি বলে, পিতৃভূমির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রখর নৈতিক চেতনা আমাদের মত ওদের অত নেই বলে, এটা

অত্যন্ত স্বাভাবিক যে ওদের মধ্যেই বলশেভিকরা তাদের মতবাদের সুবিধাজনক জমি খুঁজে পাবে। সত্যি বলতে গেলে, কসাকদের কাছে পিতৃভূমি বলতে আসলে বোঝায় কি? বড়জোর একটা নির্বিশেষ ধারণা। ওরা এইরকম ভাবে, 'ডন-অঞ্চল ফ্রণ্ট থেকে অনেক দূরে, জার্মানরা অতদূরে কোনোকালেই আসতে পারবে না।' যত গোলমালত এখানেই। এ যুদ্ধ গৃহযুদ্ধে পরিণত হলে তার ফলাফল কি হতে পারে সে কথা ওদের বুঝিয়ে বলতে হবে।'

কথা বলার সময়েই ইউজেনে বুঝতে পারছিল তার কথার ঠিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না, নিজেকে আবার ঝিনুকের মত বুজিয়ে ফেলছে আতার্শ্চিকোভ। তার বলা শেষ হলে, কথা না বলে বহুক্ষণ সে বসে রইল। যত চেষ্টাই করুক না কেন, আতার্শ্চিকোভ কোন গোপন চিন্তার সূত্র অনুসরণ করছে লিস্তনিৎস্কি তা ধরতে পারল না। ক্ষুণ্ণ হয়ে ভাবল, 'আমার উচিত ছিল আগে ওর মনের কথাটা শেষ করতে দেওয়া...'

শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিয়ে নিজের বিছানায় এল আতার্শ্চিকোভ। লিস্তনিৎস্কি শুয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে লাগল। বন্ধুর মনকে অশান্ত করে তুলছে কিসে তা তলিয়ে বুঝতে না পারার অক্ষমতায় পীড়িত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। পলকহীন চোখে ধূসর, মসৃণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আর্কাসিনিয়াকে, কানায় কানায় আর্কাসিনিয়াময় ছুটির দিনগুলোকে মনে পড়ে গেল। নানা সময়ে নানা নারীর পথ তার পথের সঙ্গে মিশেছে, হঠাৎ জাগা, তাদের টুকরো-টাকরা স্মৃতিতে ভাবনার পার্শ্ব-পরিবর্তনে আরাম বোধ করে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

॥ পাঁচ ॥

. ইভান লাগুতিন নামে এক কসাক ছিল লিস্তনিৎস্কির রেজিমেণ্টে। রেজিমেণ্টের ফৌজী বিপ্লবী কমিটিতে যারা প্রথম নির্বাচিত হয়েছিল সে ছিল তাদের মধ্যে একজন। পেত্রোগ্রাদে রেজিমেণ্ট এসে পৌঁছুনোর আগে অবধি সে অসাধারণ কোনো বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারেনি; কিন্তু আগস্টের প্রথম দিকে ট্রুপ-অফিসার ইউজেনেকে জানাল, মজুর ও সৈনিকদের প্রতিনিধির পেত্রোগ্রাদ সোবিয়েতের সামরিক বিভাগে যাওয়া আসার অভ্যাস আছে লোকটার, দলের অন্যান্য কসাকদের সঙ্গে লোকটা দিনরাত গুজগুজ করে, সকলের ওপরে হতচ্ছাড়া প্রভাবও আছে তার। পাহারা আর টহল দেওয়ার কাজ অস্বীকার করার দুটো ঘটনা ঘটেছে, লাগুতিনের প্রভাবেই সেগুলো ঘটেছে বলে ট্রুপ-অফিসার চালিয়ে দিল। লিস্তনিৎস্কি ঠিক করল, লোকটাকে ভাল করে জানতে হবে, বুঝে নিতে হবে সে কি ভাবছে। শিগগীরই সুযোগ মিলে গেল একটা। কয়েক রাত পরে পুতিলোভ কারখানার চারধারের রাস্তায় টহল দেবার ভার পড়ল লাগুতিনের দলের ওপরে, লিস্তনিৎস্কি ট্রুপ-অফিসারকে জানাল, এবার সে নিজে ভার নেবে। আর্দালিকে ঘোড়া সাজাতে হুকুম দিয়ে আঙিনায় বেরিয়ে এল সে।

ইতিমধ্যেই ঘোড়ায় চেপে অপেক্ষা করছিল দলটা। তাদের সে বাইরে নিয়ে এল, কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো রাস্তা পেরিয়ে এল। ইচ্ছে করেই

পিছিয়ে পড়ল লিস্তনিৎস্কি, তারপর লাগুতিনকে কাছে ডাকল। ঘোড়া ফিরিয়ে নিল লোকটা, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাতে তাকাতে কাছে এল। লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল:

—'কি হে, কমিটির সর্বশেষ খবর কি?'

—'এখুনি বলবার মত কিছু না।' উত্তর দিল সে।

—'কোন জেলার লোক তুমি, লাগুতিন?'

—'বুকানোভ্স্ক।'

—'গ্রাম?'

—'মিত্কিন।'

—'বিয়ে করেছ?' একটু চুপ করে থেকে, সেই অবসরে লোকটার মুখখানা খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল।

—'হ্যাঁ। বৌ আর দুটো বাচ্চা আছে।'

—'আর ক্ষেতি?'

—'ক্ষেতি বলেন নাকি তাকে?' অবজ্ঞার ভঙ্গি করে উত্তর দিল লাগুতিন, তার গলার স্বরে আত্মধিক্কার। 'দিন আনি, দিন খাই আমরা। সারাজীবনটাই আমাদের একটানা ব্যাগার খাটা, আর লড়াই করা।' একটু চুপ করল সে, তারপর কর্কশকণ্ঠে বলে উঠল, 'একেবারে বালিতে ঢাকা আমাদের জমি।'

লিস্তনিৎস্কিকে একবার বুকানোভ্স্ক জেলার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছিল; তার স্পষ্ট মনে আছে সেই সুদূর, বিচ্ছিন্ন অঞ্চলটা, দক্ষিণে অকেজো, সমতল জলা-ভূমিতে ঘেরা, খোপ্রা নদীর খেয়ালী বাঁকে বাঁকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা।

—'মনে হয়, বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে তোমার।'

—'কেন করবে না, স্যার? যত তাড়াতাড়ি পারি, বাড়ি ফিরতে চাই নিশ্চয়ই। লড়াইএর মধ্যে অনেক কিছু মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে।'

—'কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ফিরে যেতে পারবে বলেত মনে হয় না বাপু।'

—'আমার ত মনে হয় ঠিক পারব।' লাগুতিন উত্তর দিল।

—'কিন্তু লড়াইত এখনো শেষ হয়নি।'

—'শিগ্গীরই শেষ হয়ে যাবে। শিগ্গীরই ফিরে যাব আমরা।' গোঁ-ভরে উত্তর দিল সে।

—'আমরা নিজেরা নিজেরা লড়াই করব আগে। তাই মনে হয় না তোমার?'

জিনের ধনুক থেকে চোখ না তুলে, মুহূর্ত পরে উত্তর দিল লাগুতিন:

—'কার সঙ্গে লড়াই হবে, তাহলে?'

—'লড়াই করবার মত তো অনেকই আছে. .হয়ত বলশেভিকদের সঙ্গেই।'

আবার চুপ করল লাগুতিন, যেন ঘোড়ার খুরের একটানা খটাখট আওয়াজের তালে তালে সে দুলতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে উত্তর দিল:

—'ওদের সঙ্গে ত আমদের কোন ঝগড়া নেই।'

—'কিন্তু জমির কি হবে?'

—'প্রত্যেকের জন্যেই যথেষ্ট জমি আছে।'

—'বলশেভিকরা কি চাইছে তা জান?' ইউজেনে জিজ্ঞেস করল।

—'সামান্য কিছু কানে এসেছে আমার।'

—'ধরো, আমাদের জমি দখল করার জন্যে, আর কসাকদের পরাধীন করার জন্যে

বলশেভিকরা যদি আমাদের আক্রমণ করে তাহলে আমাদের কি করা উচিত? রাশিয়াকে বাঁচানোর জন্যে তুমি লড়ছ জার্মানদের সঙ্গে, তাই না?

—'জার্মানদের ব্যাপারটা আলাদা।'

—'আর বলশেভিকদের ব্যাপারটা?'

—'কেন, স্যর।' লাগ্‌নুতিন বলে উঠল। স্পষ্টতই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছে সে। চোখ তুলে লিস্তনিৎস্কির চোখে চোখে তাকাতে চেষ্টা করল। 'বলশেভিকরা আমার জমির শেষ টুকরোটা কেড়ে নিতে যাবে না। আমার শুধু এক ভাগ আছে, তা দিয়ে তাদের কোন দরকারই হবে না...কিন্তু আপনি অথ্‌শেী হবেন, হবেন নাত, স্যর...? আপনার বাবাইত আছেন, কুড়ি হাজার একর জমি তাঁর..'

—'কুড়ি হাজার নয়, আট হাজার...'

—'তাতে কিছু ইতর বিশেষ হয় না। আট হাজারও ছোটখাট ব্যাপার নয়। তারই বা কি অধিকার আছে? আপনার বাবার মত আরও অনেক আছে রাশিয়া জুড়ে। একবার ভেবে দেখুন পোড়া পেটের জন্যে সবার কি চাই। আপনি খেতে চান, আর সবাইও খেতে চায়। জারের সময় সবকিছু ছিল অন্যায় বড় দুঃসময় ছিল গরীবদের। আপনার বাবার ভোগের জন্যে ওরা দিয়েছে আট হাজার একর, কিন্তু আমার মত তিনিও দুজনের খাবার একলা খেয়ে উঠতে পারেন না। লজ্জার ব্যাপার এটা। ঠিক পথেই যাচ্ছে বলশেভিকরা, অথচ আপনারা চান আমরা ওদের সঙ্গে লড়াই করি।'

ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে প্রথম দিকে শুনছিল লিস্তনিৎস্কি। কিন্তু যখন যুক্তি বিস্তার করতে শুরু করল, তখন আর নিজেকে সামলাতে পারল না, মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। হুমকি দিয়ে বলল:

—'তুমি তাহলে বলশেভিক?'

—'নামে কিছু আসে যায় না।' লাগ্‌নুতিন উত্তর দিল। 'নামের প্রশ্ন নয় এসব, প্রশ্ন হচ্ছে অধিকারের। মানুষ অধিকার চায়, কিন্তু চিরকাল তাদের কবর দেওয়া হচ্ছে, মাটি চাপানো হচ্ছে।'

—'বলশেভিকরা তোমাকে কি শেখাচ্ছে তাত স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে থেকে সময় নষ্ট করনি দেখছি।'

—'না ক্যাপ্টেন সাহেব, আমাদের মত ধৈর্যশীলদের আমাদের জীবনই শিখিয়েছে, বলশেভিকরা শুধু শুকনো কাঠে আগুন লাগিয়েছে।'

—'ও সব গপ্‌পো রাখ।' ধমক দিল লিস্তনিৎস্কি। এতক্ষণে পুরোপুরি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সে। 'জবাব দাও আমার কথার! এখুনি তুমি আমার বাবা আর সাধারণভাবে জমিদারদের কথা বলছিলে, কিন্তু আমার মত তুমিও ত জান, ওটা হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তোমার যদি দুটো সার্ট থাকে, আর আমার একটাও না থাকে, তাহলে কি বলতে চাও, তোমার কাছ থেকে একটা আমি নিয়ে নেব?'

লাগ্‌নুতিনের মুখ দেখতে পেল না লিস্তনিৎস্কি, কিন্তু তার উত্তর শুনে অনুমান করে নিল, সে হাসছে।

—'নিজের ইচ্ছেতেই বাড়তি সার্টটা আমি দিয়ে দেব। ফ্রণ্টে থাকতে শুধু বাড়তি সার্টটাই আমি দিইনি, শেষ সার্টটাও দিয়ে দিয়েছি, খালি গায়ে গ্রেট-কোট পরে থেকেছি। আর একটু জমি হারিয়ে এমন কিছু ক্ষতি হবে না কারুর।'

—'এখনি কি তোমার যথেষ্ট জমি নেই?' গলার স্বর চড়াল লিস্তনিৎস্কি।

উত্তরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লাগ্‌নুতিন:

—'আপনি কি ভাবেন, শুধু নিজের কথাই আমি ভাবছি? পোলাণ্ডে গিয়েছিলাম আমরা...দেখেছেন ত সেখানকার মানুষের কেমন করে জীবন কাটে? ডনের ধারেই বা কেমন করে আমাদের চারপাশের মানুষেরা জীবন কাটাচ্ছে? আমি দেখেছি তা! রক্ত গরম হয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট! আপনি কি ভাবেন, তাদের জন্যে দুঃখ হবে না আমার?'

একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল লিস্তনিৎস্কি, কিন্তু সামনের কারখানার অতিকায় ধূসর বাড়িগুলোর পেছন দিক থেকে হঠাৎ চিৎকার উঠল; 'ধরো, ধরো।' ঘোড়ার খুরের খটাখট আওয়াজ উঠল, তারপর একটা গুলির শব্দ। জোরসে চাবুক কসিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল লিস্তনিৎস্কি। সে আর লাগ্‌নুতিন পাশাপাশি ছুটল; দেখল, এক কোণে থেমে ভিড় জমিয়েছে কসাকরা। জনকয়েক ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে, একটা লোক ভিড়ের মাঝখানে ঝটাপটি করছে। জিন থেকে ঝুঁকে আছে ট্রুপ-সার্জেণ্ট আর্‌ঝানোভ, একটা বেঁটেখাটো লোকের সার্টের কলার চেপে ধরে আছে, আর মাটিতে দাঁড়িয়ে জন তিনেক কসাক তার হাত মোচড়াচ্ছে।

—'ব্যাপার কি?' লিস্তনিৎস্কি ভিড়ের মধ্যে ঘোড়াটা গলিয়ে দিয়ে বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করল।

—'ঢিল ছুঁড়ছিল, শালা শয়তান।'

—'একজনকে ঢিল মেরে ছুটে পালাচ্ছিল...'

—'ধোলাই লাগাও, আর্‌ঝানোভ!' অপর একজন কসাক চিৎকার করে উঠল।

ক্রোধে প্রায় আত্মহারা হয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে লিস্তনিৎস্কি চিৎকার করে উঠল:

—'কে তুমি!'

বন্দী মাথা তুলল, কিন্তু তার ফ্যাকাসে মুখে ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে চেপে রইল।

—'কে তুমি?' আবার প্রশ্ন করল লিস্তনিৎস্কি। 'ঢিল ছোঁড়া হচ্ছিল, খচ্চর? চুপ কর সব! আর্‌ঝানোভ, ধোলাই লাগাও।' ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে সে হুকুম দিল।

লোকটাকে তিন চার জন কসাক মাটিতে ফেলে দিল, তারপর চাবুক তুলল। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে লিস্তনিৎস্কির দিকে ছুটল লাগ্‌নুতিন।

—'ক্যাপ্টেন সাহেব...করছেন কি?...ক্যাপ্টেন সাহেব!' কম্পিত আঙুলে লিস্তনিৎস্কির হাঁটু চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল সে: 'এমন ধারা করতে পারেন না আপনি? একটা মানুষ তো...করছেন কি আপনি?'

ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর দিকে লাগামটা নাড়াল লিস্তনিৎস্কি, কোন উত্তর দিল না। কসাকদের কাছে দৌড়ে গেল লাগ্‌নুতিন, আর্‌ঝানোভের কোমরটা জাপ্টে ধরে টেনে আনতে চেষ্টা করল। কিন্তু বাধা দিল আর্‌ঝানোভ, বিড়বিড় করে বলতে লাগল:

—'অমন ধারা করোনা বলছি! করো না! ঢিল ছুঁড়বে, আর কিছু বলতে পারব না আমরা? ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও! তোমার ভালোর জন্যে বলছি!'

একজন কসাক ঝুঁকে কাঁধের রাইফেলটা শূন্যে তুলে লোকটার নরম শরীরে কুঁদোর ঘা মেরে দিল। একটা চাপা, আদিম বন্য চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়। 'আঃ—আঃ—আঃ—আঃ! মেরে ফেল্লে আমাকে!' কয়েক মুহূর্তের জন্যে সব চুপচাপ, তারপর আবার সেই আওয়াজ উঠল, কিন্তু এবারে অনেক সতেজ, আটকে আটকে

খাওয়া, যন্ত্রণায় থর থর করে কাঁপা। প্রতিটি আঘাতের পরে আর্তনাদের মধ্যে মধ্যেই সে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ করতে লাগল:

—'শুয়োরের পাল! বিপ্লবের...শত্রু সব! মার...মার। ও—ওঃ!'

লাগুতিন দৌড়ে ফিরে গেল লিস্তনিৎস্কির কাছে, তার হাঁটুর সঙ্গে লেপ্টে, নখ দিয়ে জিনটা আঁচড়াতে আঁচড়াতে ধরা গলায় বলল:

—'ছেড়ে দিন ওকে!'

—'সরে দাঁড়াও!' ধমকে উঠল লিস্তনিৎস্কি।

—'ক্যাপ্টেন...লিস্তনিৎস্কি! শুনছেন...? এর কৈফিয়ৎ দিতে হবে!' ঘুরে দাঁড়িয়ে, লোকটার চারপাশের ভিড় থেকে দূরে দাঁড়ানো কসাকদের কাছে ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠল লাগুতিন, 'ভাই সব! আমি বিপ্লবী কমিটির একজন সদস্য...আমি হুকুম দিচ্ছি তোমাদের, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাও ওকে...! এর কৈফিয়ৎ দিতে হবে তোমাদের! এখন আর পুরনো দিন নেই!'

যুক্তিহীন এক অন্ধ ঘৃণায় আত্মহারা হয়ে গেল লিস্তনিৎস্কি। চাবুক দিয়ে ঘোড়ার দুই কানের মাঝখানে ঘা মেরে ছুটিয়ে এল লাগুতিনের কাছে। তেলমাখানো চকচকে পিস্তলটা মুখের ওপরে তুলে ধরে গর্জন করে উঠল:

—'চুপ কর, বিশ্বাসঘাতক! বলশেভিক! গুলি করব তোকে!'

চূড়ান্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে সংযত করল সে, ট্রিগার থেকে আঙুলটা সরিয়ে নিল, পেছনের পাদুটোয় ভর করিয়ে ঘোড়াটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল শেষে।

কয়েক মিনিট পর তার সন্ধানে বেরুল তিনজন কসাক। দুই ঘোড়ার মাঝখানে বন্দীকে টানতে টানতে নিয়ে চলল দুজনে। লোকটার গায়ে রক্তে-ভেজা জামাটা লেপ্টে গিয়েছে। দুজন কসাক বগলের নীচে হাত গলিয়ে দিয়েছে; অসহায়ভাবে টলছে সে, পা-দুটো পাথরের ওপরে উঠছে পড়ছে। প্রায় থেঁতো করা রক্তাক্ত মুখ উঁচু-উঁচু দুই কাঁধের মাঝখানে পেছন দিকে নেতিয়ে ঝুলছে। ঘোড়া চালিয়ে সামনে কিছুদূর এগিয়ে গেল তৃতীয় কসাকটা। দেখতে পেল, একটা রাস্তার কোণে এক দ্রোঝ্‌কি-ওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। রেকাবের ওপরে দাঁড়িয়ে দুলকি চালে তার কাছে গিয়ে পেঁছুল। চোখমুখ পাকিয়ে বুটের ডগায় চাবুকের ঘা মেরে দ্রোঝ্‌কি-ওয়ালাকে এক সংক্ষিপ্ত হুকুম দিল। অনুগত বশংবদের মত তাড়াতাড়ি সে দ্রোঝ্‌কিটা রাস্তার মাঝখানে চালিয়ে নিয়ে এল, কসাক দুজন সেখানেই থেমে দাঁড়িয়েছিল।

॥ ছয় ॥

পরদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে লিস্তনিৎস্কির মনে হল, সে এক বিরাট ভুল করেছে যা আর শোধরানো যাবে না। গতরাত্রের দৃশ্য, আর লাগুতিন ও তার মধ্যে যা ঘটেছিল তা মনে করতে করতে ঠোঁট কামড়াল সে। জামাকাপড় পরতে পরতে ঠিক করল, লাগুতিনকে এখন ছেড়ে দেওয়াই ভালো; তার ফলে, রেজিমেণ্টের কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক কোনরকম খারাপ হয়ে পড়াটা এড়ানো যাবে। দলের অন্যান্য কসাকরা ব্যাপারটা ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই সমীচীন হবে, তারপর নিঃশব্দে তাকে সরিয়ে দিলেই চলবে। তিক্ত বিদ্রূপের সঙ্গে মনে মনে ভাবল:

—'কসাকদের সঙ্গে দহরম মহরমের কথা যখন বলি, তখন এইটেই আমরা বোঝাতে চাই।'

॥ সাত ॥

আগস্টের মাঝামাঝি এক চমৎকার, রোদ্দুরে ঝলমলকরা দিনে লিস্তনিৎস্কি আর আতার্শচিকোভ শহরের ভেতরে বেড়াতে বেরুল। অফিসারদের সভার শেষে তাদের দুজনের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল, তার পর এমন কিছু ঘটেনি, যা তাদের মনের মধ্যে জেগেওঠা অনিশ্চয়তা দূর করতে পারে। নিজের মত প্রকাশ করা বন্ধ রেখেছে আতার্শচিকোভ, যখনই লিস্তনিৎস্কি তার মন খোলাবার চেষ্টা করেছে, সে তখনই টেনে দিয়েছে সেই দুর্ভেদ্য যবনিকা, অপরের দৃষ্টি থেকে নিজের স্বরূপকে আড়াল দেবার জন্যে বেশির ভাগ লোকই যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। লিস্তনিৎস্কি শুধু এই সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে, জাতির বিভিন্ন অংশকে বিভক্ত করার সংঘর্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার সংগ্রাম করতে গিয়ে আতার্শচিকোভ বলশেভিকদের আশাআকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কসাকদের জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে যুক্ত করে ফেলছে। আর, তার এই সিদ্ধান্ত আতার্শচিকোভের সঙ্গে আরও বেশি হৃদ্যসম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে তাকে বিরত করে রেখেছে।

মাঝেমাঝে দু'একটা মন্তব্য করতে করতে তারা নেভস্কি প্রসপেক্ট দিয়ে ঘুরতে লাগল। চোখ তুলে একটা রেস্তোরাঁ দেখিয়ে লিস্তনিৎস্কি প্রস্তাব করল:

—'চল কিছু খাই গিয়ে।'

—'বেশ, চল।' তার সঙ্গী রাজি হল।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে জানলার ধারে একটা টেবিলের সামনে বসল তারা। নীচু করা পর্দার ভেতর দিয়ে ভাঙা রোদ হলদে সূচের মত টেবিল-ঢাকনায় এসে বিঁধছে। টেবিলের ওপরে সাজানো-ফুলের মৃদু গন্ধ ছাপিয়ে রান্নার খোসবায় উঠছে। বরফ দেওয়া বীটের ঝোলের অর্ডার দিল লিস্তনিৎস্কি, ফুলদানি থেকে তুলে নেওয়া লালচে-হলদে ফুলের পাঁপড়ি খুঁটতে খুঁটতে চিন্তিত মুখে বসে রইল। রুমাল দিয়ে ঘামে-ভেজা ভুরু দুটো মুছল আতার্শচিকোভ। অনবরত মিটমিট করা, ক্লান্ত, নত চোখে পাশের টেবিলের পায়ায় রোদের খেলা দেখতে লাগল। তখনও তাদের খাওয়া শেষ হয়নি, এমন সময় জোরে জোরে কথা বলতে বলতে দুজন অফিসার ঢুকল রেস্তোরায়। খালি টেবিল খুঁজতে গিয়ে প্রথমজন তার রোদে-পোড়া মুখটা লিস্তনিৎস্কির দিকে ফেরাল. তার কাল চোখ দুটো আনন্দে ঝলমল করে উঠল।

—'আরে, এযে লিস্তনিৎস্কি! সত্যিই ত?' চেঁচিয়ে উঠল সে, তারপর দ্বিধাহীন দৃঢ় পদক্ষেপে লিস্তনিৎস্কির কাছে এগিয়ে এল।

সঙ্গে সঙ্গেই লিস্তনিৎস্কি চিনল ক্যাপ্টেন কালমিকোভ আর তার সঙ্গী চুকোভকে। খুশী হয়ে করমর্দন করল। আতার্শচিকোভের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল:

—'তোমরা এখানে কি করে এলে হে?'

জ্লপি পাকাতে পাকাতে কালমিকোভ উত্তর দিল:

—'আমাদের ডাক পড়েছে পেত্রোগ্রাদ থেকে। পরে বলব সব। আগে তোমার কথা বল। ১৪নং রেজিমেণ্টে কেমন কাটছে তোমার?'

একসঙ্গে রেস্তোরাঁ থেকে বেরুল তারা। আর সকলের থেকে পিছিয়ে রইল কালমিকোভ আর লিস্তনিৎস্কি, পাশের এক রাস্তায় ঢুকে প্রায় ফিসফিস করে কথা বলতে বলতে শহরের এক নির্জন অংশের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

—'আমাদের তৃতীয় দলকে হাতে রাখা হয়েছে রুমানিয়া ফ্রণ্টে।' কালমিকোভ লিস্তনিৎস্কিকে বলতে লাগল। 'দিন দশেক আগে এক রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারের কাছ থেকে নির্দেশ পেলাম, অন্য এক অফিসারের হাতে কোম্পানিকে দিয়ে দিতে হবে, আমাকে আর চুকোভকে ডিভিশন কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে হবে, যেখানে পাঠানো দরকার তাঁরা পাঠাবেন। চমৎকার! গেলাম তাঁদের কাছে। তাঁরা জেনে শুনে বললেন আমাদের এখুনি গিয়ে রিপোর্ট করাতে হবে জেনারেল ক্রিমোভের কাছে। আমরাও তাই গেলাম সদর দপ্তরে। ক্রিমোভের সঙ্গে দেখা হল, কোন কোন অফিসারকে তাঁর কাছে পাঠানো হচ্ছে তা জানানো হয়েছিল তাঁকে। আমাকে খোলাখুলি বল্লেন, এমন লোকদের হাতে সরকার পড়েছে যারা ইচ্ছে করে দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারের মাথায় যে দলটা আছে তাদের সরিয়ে দিতে হবে, সম্ভবত অস্থায়ী সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে সামরিক ডিক্টেটরী বসাতে হবে।' সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে তিনি জেনারেল কোর্নিলোভের নাম করলেন, তারপর বললেন, আমাকে পেত্রোগ্রাদে যেতে হবে, অফিসারদের মৈত্রী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির হাতে কাজের ভার ছেড়ে দিতে হবে। এখন কয়েকশ' বিশ্বস্ত অফিসার হাজির হয়েছে শহরে। বুঝতেই পারছ, আমাদের ভূমিকা কি হবে? অফিসারদের মৈত্রী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি আমাদের কসাকদের মৈত্রী সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করে যাচ্ছে। রেল-জংশনগুলোয় আর ডিভিশনের মধ্যে তড়িৎ-বাহিনী তৈরি করা হচ্ছে।

—'কিন্তু কি হবে শেষ পর্যন্ত? তোমার কি মনে হয়?'

—'সেই ত কথা! কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, তুমি এখানে আছ, অথচ এখনো অবস্থা কি জানোনা? সরকারের ভেতরে বিদ্রোহ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই, আর ক্ষমতা দখল করবেন কোর্নিলোভ। ওপরের আর নীচের জাঁতায় পড়েছে কেরেন্স্কি। একজন না একজন পিষবেই তাকে। একদিনের বাদশা সে। আমরা অফিসাররা অবশ্য দাবার বড়ে; আমরা জানি না, কি চাল দেবে খেলোয়াড় আমাদের নিয়ে। যেমন ধরো না কেন, সদর দপ্তরে কি ঘটছে তা আমি জানি না, কিন্তু আমি একথা জানি, জেনারেলদের মধ্যে একটা গোপন বোঝাপড়া হচ্ছে...'

—'কিন্তু ফৌজ...? ফৌজ কি কোর্নিলোভের পেছনে থাকবে?' লিস্তনিৎস্কি জিজ্ঞেস করল।

—'সৈন্যরা থাকতে চাইবে না অবশ্যই। কিন্তু আমাদের নিয়ে যেতেই হবে তাদের সেই দিকে।

—'বামপন্থীদের চাপে কোর্নিলোভকে বরখাস্ত করতে চেষ্টা করছে কেরেন্স্কি, সে কথা ত জান?'

—সাহসই পাবে না সে। কাল সে নিজেই হাত জোড় করবে। এ সম্পর্কে অফিসারদের মৈত্রী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি তার মতামত একেবারে দ্বিধাহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে।' কালমিকোভ উত্তর দিল। 'কোর্নিলোভকে বরখাস্ত করার কোন

কথাই উঠতে পারে না। গতকাল তার শহরে ঢোকাটা দেখেছিলে? সে এক রাজসিক ব্যাপার! এক স্কোয়াড্রন তোকিন ছিল তার রক্ষী। মেসিনগান চাপানো ছিল প্রত্যেক মোটরে। আর একসঙ্গে সবাই মিলে গিয়েছিল শীত-প্রাসাদে, কেরেন্‌স্কি আছে সেখানে। একেবারে খোলাখুলি সাবধান করে দেওয়া! লোম খাড়া খাড়া টুপির নীচে তেকিনদের মুখগুলো যদি দেখতে! দেখবার মত জিনিস ছিল!'

হাঁটতে হাঁটতে শহরের মাঝখানে ফিরে এল দুজনে। তারপর বিদায় নিল।

—'আমরা চোখের আড়াল হব না, ইউজেনে।' করমর্দন করতে করতে কালমিকোভ বলল। 'বড় কঠিন দিন আসছে! পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা চাই, নইলে খতম হয়ে যাবে।'

লিস্তনিৎস্কি হাঁটতে শুরু করেছিল, এমন সময় আবার পেছন থেকে কালমিকোভ ডাকল:

—'আরে, আমি বলতে ভুলে গিয়েছি। মার্কুলোভকে মনে আছে? সেই যে ছবি আঁকত?'

—'হ্যাঁ; বল?'

—'মারা গিয়েছে মে মাসে। একেবারে আচমকা। এর চেয়ে জঘন্য মৃত্যু আর দেখা যায় না। টহল দেবার সময় একজনের হাতের ওপরেই হাতবোমা ফেটে গিয়েছিল, কনুই থেকে তার হাত দুখানাই উড়ে গিয়েছিল। পাশেই ছিল মার্কুলোভ, পাওয়া গেল তার নাড়িভুঁড়ির কিছুটা অংশ। তিন বছর ধরে সে মৃত্যুকে এড়িয়ে এসেছিল...'

আরও কিছু যেন চেঁচিয়ে বলল সে, কিন্তু ধুসরধুলোর ঝাপটা উঠল বাতাসে, শুধু শেষের কয়েকটা কথাই কানে এল লিস্তনিৎস্কির। লিস্তনিৎস্কি হাত নাড়ল, তারপর এগুতে লাগল, মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে লাগল পেছনে।

॥ আট ॥

সরকারী সম্মেলনের জন্যে ২৬শে আগস্ট কোর্নিলোভ সদর দপ্তর থেকে মস্কো যাত্রা করল। দিনটা গরম, মেঘলাই বলা চলে। আকাশকে মনে হয় এ্যালুমিনিয়মে ঢালাই করা। একেবারে মাথার ওপরে স্পষ্ট রেখায়িত নরম তুলতুলে মেঘ ঝুলছে। সেই মেঘ থেকে রামধনুর বিচিত্র রঙে বিচ্ছুরিত বৃষ্টের বাঁকা ধারা নামতে শুরু করল; লাইনের ওপর দিয়ে ছুটে চলা ট্রেনের মাথায় বৃষ্টির ধারা নামতে লাগল; বহুদূরের বার্চগাছের সুস্পষ্ট রেখার ওপরে, প্রথমে শরতের পৃথিবীর বিধবা বেশ ভিজিয়ে বৃষ্টি ঝরতে লাগল। ট্রেন এগিয়ে চলল ধুসর ধোঁয়ার রেখা টেনে। কোর্নিলোভ জানলার ধারে বসে বাইরের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল, তার রোদে-পোড়া মুখ আর ঝুলে পড়া কালো জুলপির ওপরে বৃষ্টির উষ্ণ ফোঁটা অঝোরে ঝরতে লাগল। বাতাসের এলোমেলো ঝাপটায় কপালের ওপরে ঝেঁপে পড়া চুলের গোছা উড়িয়ে নিতে লাগল।

কোর্নিলোভ আসার আগের দিন ক্যাপ্টেন লিস্তনিৎস্কি মস্কোয় এসে পেঁছেছিল। পেত্রোগ্রাদের কসাক সৈন্যদের সোবিয়েতের তরফ থেকে দরকারী কাগজপত্র দেওয়া

হয়েছিল তাকে। মস্কোতে মোতায়েন কসাক রেজিমেন্টের কর্তৃপক্ষের হাতে কাগজপত্র দিতে গিয়ে জানতে পারল কোর্নিলোভ আসছে।

সেদিন দুপুরে লিস্তনিৎস্কি সর্বাধিনায়ককে দেখতে স্টেশনে এল। স্টেশনের প্রতীক্ষাগৃহে আর রেস্তোরাঁয় মুখ্যত ফৌজী লোকেরই একটা বিরাট জনতা জড় হয়েছে। সামরিক একাডেমি থেকে প্ল্যাটফর্মে সামরিক অভিনন্দনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, মস্কোর মহিলাদের মৃত্যু-বাহিনীকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। প্রায় তিনটের সময় কোর্নিলোভের ট্রেন এসে পৌঁছুল। লিস্তনিৎস্কি দেখতে পেল, জনকয়েক অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে কোর্নিলোভ ট্রেন থেকে নামল সামরিক অভিবাদন নিল, সৈন্য জর্জ বীরদের মৈত্রী সমিতি, সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনীর অফিসার আর কসাক সৈন্যদের মৈত্রী সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিচিত হল।

কোর্নিলোভ এগিয়ে আসতেই স্টেশনের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা সুবেশা মহিলারা প্রচণ্ড পুষ্পবৃষ্টি শুরু করে দিল। একটা গোলাপ তার তকমায় আটকে গিয়ে ঝুলতে লাগল। ঈষৎ বিমূঢ়ভাবে অনিশ্চিত একটা ভঙ্গি করে সে ফুলটা ঝেড়ে ফেলে দিল। এক দাড়িওয়ালা বয়স্ক অফিসার তোতলাতে তোতলাতে কসাক রেজিমেন্টের তরফের অভিনন্দন বাণী পড়তে শুরু করল। কিন্তু ভিড়ের ধাক্কায় দেয়ালের গায়ে গিয়ে পড়ায়, কি বলল, তা লিস্তনিৎস্কি শুনতে পারল না। বক্তৃতার পাঠ শেষ হলে এগুলো কোর্নিলোভ, হাতে হাতে শেকল বেঁধে পথ করে দিল অফিসাররা। তার জামার হাতায় ঠোঁট ছোঁয়াবার চেষ্টায় এক বিস্রস্তবাসা, স্বাস্থ্যবতী মহিলা পাশে ঠেলে এল। স্টেশনে ঢুকবার মুখে কাঁধে তুলে নিল কোর্নিলোভকে, বাইরে নিয়ে এল জয়জয়কার দিয়ে। কাঁধের একটা জোর ধাক্কা দিয়ে এক হোমড়া-চোমড়া বয়স্ক ভদ্রলোককে সরিয়ে দিতে পারল লিস্তনিৎস্কি, কোর্নিলোভের পা ধরে ফেলল; তারপর কাঁধের ওপর চাপিয়ে নিল জেনারেলের পা-দুখানা। ভার সম্পর্কে খেয়াল না করে, নিজের উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে, টাল সামলাবার চেষ্টা করতে করতে, জনতার গর্জন আর ব্যাণ্ডের আওয়াজে বধির হয়ে আস্তে আস্তে এগুতে লাগল সে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে তারা এল স্কোয়ারের ভেতরে। সামনে দাঁড়িয়ে এক জনতা, সৈন্যদের সবুজ সারি, আর একটা কসাক কোম্পানি। জলে ভরে ওঠা চোখদুটো মিটমিট করতে করতে, ঠোঁটের অপ্রতিরোধ্য কম্পন সংযত করবার চেষ্টা করে টুপির চূড়োয় হাত ছোঁয়ালো সে। এরপর শুধু মনে রইল তালগোল পাকানো স্মৃতি, ক্যামেরার খট্‌খট, জনতার উন্মাদনা জুংকারদের আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ আর জেনারেল কোর্নিলোভের ছোটখাট মূর্তিটা—খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে স্যালুট নিচ্ছে।

॥ নয় ॥

পরদিন পেত্রোগ্রাদে ফিরে গেল লিস্তনিৎস্কি। নিজের কামরার ওপরের বার্থে উঠে পড়ল সে, জামা খুলে ফেলে কোর্নিলোভের কথা ভাবতে ভাবতে সিগারেট টানতে লাগল।

প্রায় ঠিক একই সময়ে, মস্কোর সরকারী সম্মেলনের এক বিরতির ফাঁকে, ফিসফিস

করে কথা বলতে বলতে গ্রেট থিয়েটারের এক বারান্দায় দুই জেনারেল পায়চারি করছিল। একজন মাথায় ছোট, মঙ্গোলীয় ধাঁচের মুখ; অপরজন হৃষ্টপুষ্ট, চৌকো মাথায় ছোটো ছোটো করে ছাঁটা ঘন চুল।

—'ঘোষণাপত্রে এমন কোন দিক আছে কি, যাতে ফৌজী কমিটিগুলো ভেঙ্গে দেওয়া যায়?' কোর্নিলোভ প্রশ্ন করল।

—'হ্যাঁ, আছে।' কালেদিন উত্তর দিল।

—'সম্মিলিত মোর্চা আর অটুট ঐক্য হচ্ছে সম্পূর্ণ অপরিহার্য।' কোর্নিলোভ বলে উঠল। 'আমি যা ইঙ্গিত করেছি সেইসব ব্যবস্থা কার্যকরী করা ছাড়া পরিত্রাণের উপায় নেই। ফৌজ যুদ্ধের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এই ধরনের ফৌজ নিয়ে জয়লাভ ত হবেই না, এমন কি তেমন ধরনের আক্রমণের মুখে এ ফৌজ দাঁড়াতেও পারবে না। বলশেভিকদের প্রচারে ভাঙন ধরেছে ডিভিসনগুলোয়। আর এই পেছনে? দেখতেই পাচ্ছেন, রাশ টানার ব্যবস্থা করবার যে কোন প্রচেষ্টায় কেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে মজুরদের মধ্যে। ধর্মঘট আর বিক্ষোভের মিছিল! সম্মেলনের সদস্যদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে...এ এক কেলেঙ্কারি! বে-সামরিক অংশকে সামরিক আওতায় আনা, কঠোর পিটুনি শাসন চালু করা, নির্মমভাবে সমস্ত বলশেভিকদের উচ্ছেদ করা—এই হচ্ছে আমাদের এখনকার কাজ। ভবিষ্যতে আপনার সমর্থন পাব, ধরে নিতে পারি কি, জেনারেল কালেদিন?'

—'আমি পুরোপুরি আপনার দিকে।'

—'সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। ধন্যবাদ। দেখতেই পাচ্ছেন, দৃঢ়চিত্তে, শক্ত হয়ে কাজ করা যখন দরকার, ঠিক তখনই সরকার কেমন আধা-খেঁচড়া ব্যবস্থা আর বোলচালে নিজেকে ঢেকে রাখছে। আমরা সৈনিকরা অভ্যস্ত আগে কাজ করতে, পরে কথা বলতে। ওরা ঠিক তার উল্টো করে। বেশত, সময় আসছে যখন তারা তাদের আধা-খেঁচড়া ব্যবস্থার ফলভোগ করবে। এই অসম্মানজনক খেলায় নামবার কোন ইচ্ছে নেই আমার। আমি দু নৌকোয় পা দিইনে।'

কোর্নিলোভ থামল, তারপর কালেদিনের উর্দির একটা বোতাম মোচড়াতে মোচড়াতে নিজের উত্তেজনায় তড়বড় করে বলতে লাগল:

—'খাঁচার দরজা ওরা খুলে দিয়েছে, আর এখন ভয় পাচ্ছে ওদের নিজেদের বিপ্লবী গণতন্ত্রকে। রাজধানীর কাছাকাছি বিশ্বস্ত সৈন্যদলকে সরিয়ে আনতে আমাকে অনুরোধ করছে, আবার একই সঙ্গে নিজেরা কোন সত্যিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ভয় পাচ্ছে। এক পা এগুচ্ছে, এক পা পেছুচ্ছে...আমাদের সমস্ত শক্তি সম্পূর্ণ সংহত করে এবং জোর নৈতিক চাপ দিয়েই একমাত্র আমরা সুবিধা আদায় করতে পারি সরকারের কাছ থেকে। যদি না পারি ..তখন দেখা যাবে। আমি ফ্রণ্ট খুলে দিতেও ইতস্তত করব না। জার্মানরাই না হয় ওদের ঘটে বুদ্ধি ঢোকাবে!'

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে ভাবল সে, তারপর বলল, 'এই অধিবেশনের পর আমার কামরায় আপনাকে, আর বাদবাকি সবাইকে আশা করব। ডন-অঞ্চলের পরিস্থিতি কি রকম?

কালেদিনের চৌকো মাথাটা বুকের ওপরে নুয়ে পড়ল, বিষণ্ণ নতদৃষ্টিতে সে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। উত্তর দিতে গিয়ে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল:

'কসাকদের ওপরে আগেকার মত আস্থা আর আমার নেই। আর এই মুহূর্তে পরিস্থিতি বিচার করাটাও কঠিন। একটা আপোস করা দরকার। কসাকদের হাতে

রাখার জন্যে কিছু কিছু সুবিধে দিতেই হবে। এ সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু ব্যবস্থাও করতে শুরু করেছি, কিন্তু সফল হব এমন কোন কথা আমি দিতে পারব না। কসাক ও বিদেশীদের মধ্যে সংঘর্ষের আশংকাও করছি। শুধু জমি...এই মুহূর্তে তাদের সমস্ত চিন্তা জমিতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।'

—'নিজেকে আগলাবার জন্যে হাতের কাছে বিশ্বস্ত কসাক ডিভিসন তৈরি রাখবেন অবশ্য অবশ্য। ফিরে গিয়ে ফ্রন্ট থেকে ডন অঞ্চলে কিছু রেজিমেন্ট পাঠিয়ে দেবার পথ খুঁজে বার করব।'

—'যদি পারেন, তাহলে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ থাকব।'

—'বেশ, তাহলে আজ সন্ধ্যেয় আমরা ভবিষ্যতের সহযোগিতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের পরিকল্পনার সার্থক কার্যকারিতা সম্পর্কে আমার বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়। কিন্তু ভাগ্য হচ্ছেন চটুলা কামিনী, জেনারেল। সব কিছু সত্ত্বেও তিনি যদি বিমুখ হন, তাহলে ডন-অঞ্চলে আপনাদের কাছে ঠাঁই মিলবে আশা করতে পারি কি?'

—'শুধু ঠাঁই নয়, প্রতিরক্ষাও। আতিথেয়তার জন্যে কসাকরা বিখ্যাত।' আলোচনার মধ্যে এই প্রথম হাসল কালেদিন।

এক ঘণ্টা পরে, ডন কসাকদের আতামান কালেদিন, রুদ্ধশ্বাস শ্রোতাদের বারটা কসাক রেজিমেন্টের ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র পড়ে শোনাল। সেইদিন থেকে কালো মাকড়সার জালের মত বিরাট এক ষড়যন্ত্রের অসংখ্য সুতো ছড়িয়ে দেওয়া হল সমগ্র ডন-অঞ্চলে, কুবানে, উরালে, কসাক দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে, এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

জুলাই মাসের প্রতি-আক্রমণের সময় তোপের মুখে উড়ে গিয়েছিল একটা ছোট শহর; সেই শহরের ধ্বংসস্তূপ থেকে মাইলখানেক দূরে অবিশ্বাস্যভাবে ঘুরপাক খেয়ে ট্রেঞ্চগুলো এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে ডন পেরিয়ে। সেই বনের বাইরের দিক বরাবর অঞ্চলটা বিশেষ কোম্পানি ধরে রেখেছিল।

তাদের পেছনে, ফার আর তাজাতাজা বার্চের দুর্ভেদ্য সবুজ বন পেরিয়ে টুকটুকে হয়ে আছে বুনো-গোলাপ ঝোপের ফলগুলো। সরু হয়ে এগিয়ে আসা বনের একটা অংশের পেছনে, গোলার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত একটা পাকারাস্তা ডানদিকে চলে গিয়েছে। বনের প্রান্তে গুলির ঘায়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ঝোপ-ঝাড় কষ্টেসৃষ্টে টিকে আছে, এখানে সেখানে একটা দুটো নিঃসঙ্গ গাছের পোড়া গুঁড়ি। এখানে চোখে পড়ে ট্রেঞ্চের সামনেকার হলদে-বাদামি মাটির বাঁধগুলো, খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে কোঁচকানো ভুরুর মত ট্রেঞ্চগুলো সুদূর দিগন্তে চলে গিয়েছে। তাদের পেছনে, এমনকি পাতাপচা জলাভূমি

আর ভাঙাচোরা রাস্তাটাও প্রাণ-চাঞ্চল্য আর বাতিল করা পরিশ্রমের স্পষ্ট সাক্ষী হয়ে আছে। কিন্তু বনের ধারের দৃশ্য নিরানন্দ অরুচিকর মনে হয় চোখে।

আগস্ট মাসে একদিন মোখোভের কলের ভূতপূর্ব মজুর ইভান আলেক্সিয়েভিচ পাশের শহরে গিয়েছিল, জিনিস-পত্তরের গাড়িখানা ছিল সেখানে। সন্ধ্যের মুখে সে ফিরল। ডাগ্-আউটের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে ঝাখার কোরোলিওভের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। লক্ষ্যহীনভাবে হাত নাড়াতে নাড়াতে প্রায় ছুটছে ঝাখার, বালির বস্তাগুলোর কোণায় কোণায় তলোয়ারখানা আটকে যাচ্ছে। পথ দেবার জন্যে সরে দাঁড়াল ইভান আলেক্সিয়েভিচ, কিন্তু তার উর্দির একটা বোতাম চেপে ধরে রুগ্ন হলদে চোখ দুটো গোল গোল করে, ফিসফিসিয়ে বলল:

—'শুনেছ? আমাদের ডাইনের ফৌজ ফ্রন্ট ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পালিয়ে যাচ্ছে বোধ হয়?'

—'কি বলছ তুমি? হয়ত বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে ওদের। চল ট্রুপ-অফিসারের কাছে যাই, জেনে আসি।'

ঝাখার ফিরল, পেছল মাটিতে পড়তে পড়তে, হোঁচট খেতে খেতে বরাবর অফিসারদের ডাগ্‌আউটের দিকে এগিয়ে চলল।

কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যেই কোম্পানির জায়গায় এল পদাতিক বাহিনী, আর শহরের পথ ধরল কোম্পানি। পরদিন সকালে ঘোড়ায় চাপল সবাই, পেছনে মার্চ করে একটানা এগিয়ে চলল।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। বার্চগাছের মাথাগুলো বিমর্ষভাবে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। রাস্তা গিয়েছে বনের মধ্যে দিয়ে। ঝরাপাতার ভ্যাপসা, পচা, কটু গন্ধ শুঁকে ঘোড়াগুলো নাকের আওয়াজ করতে লাগল, তাড়াতাড়ি পা ফেলতে লাগল। রুদ্রাক্ষের মালার মত বৃষ্টি-ধোয়া 'সপুর্জে'র ফেকাড়ি ঝুলছে, সাদা সাদা আ-গাছার ফেণা-জড়ানো মাথাগুলো ভৌতিক পাণ্ডুরতায় চকচক করছে। বাতাসের ঝাপটায় গাছ থেকে বড় বড় জলের ফোঁটা সওয়ারদের গায়ে ঝরে পড়ল। গ্রেট-কোট আর টুপিগুলো ভেজা দাগে কালো হয়ে উঠল, যেন গুলির ছিটে ছিটে দাগ লাগল। তামাকের ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠে সারির মাথার ওপর দিয়ে ভেসে চলল। অজ্ঞাত গন্তব্যস্থল নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা চলল। ট্রেঞ্চগুলোর নাম দেওয়া হয়েছিল 'নেকড়ের কবরখানা'; সেই কবরখানা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে, এতেই উল্লসিত হয়ে একটু পরেই গান ধরা হল। সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা এক স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপল তারা। ট্রেন গড়িয়ে চলল প্স্কোভের দিকে। আর কিছু পরেই তারা জানতে পারল, তৃতীয় কোম্পানির একটা অংশের সঙ্গে অশান্তি দমন করার জন্যে তাদের পেত্রোগ্রাদে পাঠানো হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ কামরায় কামরায় আলোচনা থেমে গেল; অরপর এক নিদ্রালু স্তব্ধতার রাজত্ব।

—'তপ্ত খোলা থেকে একেবারে...' অবশেষে সকলের মনের কথাটা একজন ব্যক্ত করল।

ইভান আলেক্সিয়েভিচ কোম্পানির কমিটির স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল। প্রথম যেখানে ট্রেন থামল, সে সেখানেই নেমে পড়ল। হাজির হল কমাণ্ডারের কাছে। বলল:

—'কসাকরা উত্তেজিত অবস্থায় আছে, ক্যাপ্টেন।'

ইভানের চিবুকের গভীর টোলটার দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হেসে ক্যাপ্টেন উত্তর দিল:

—'আমি নিজেই উত্তেজিত অবস্থায় আছি হে।'

—'আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

—'পেত্রোগ্রাদে।'

—'বিদ্রোহ দমন করার জন্যে?'

—'বিদ্রোহে সাহায্য করতে যাচ্ছ তা নিশ্চয়ই ভাবনি, ভেবেছ নাকি?'

—'আমরা কোনটাই চাইনে।'

—'ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের মতামত ওরা চাইছে না।'

—'কিন্তু কসাকরা...'

—'কসাকদের আবার কি?' ক্রুদ্ধ হয়ে অফিসার বাধা দিল। 'আমি নিজেই জানি কসাকরা কি ভাবছে। তুমি কি মনে কর, এ কাজ আমি পছন্দ করি? নিয়ে যাও এটা, কোম্পানিকে পড়ে শোনাওগে। পরের স্টেশনেই আমি কসাকদের সঙ্গে কথা বলব।'

স্পষ্ট বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে কমাণ্ডার একটা ভাঁজ করা টেলিগ্রাম হাতে দিল। নিজের কামরায় ফিরে এল ইভান। টেলিগ্রামটা সাবধানে হাতে করে নিয়ে এল, ওটা যেন জ্বলন্ত কয়লার টুকরো, বলল, 'অন্য সব কামরায় কসাকদের ডাকো।'

ততক্ষণে ট্রেন চলতে শুরু করেছে, কিন্তু কসাকরা লাফিয়ে লাফিয়ে ইভানের কামরায় এসে ঢুকল। এমনি করে প্রায় জন তিরিশেক হল। ইভান তাদের বলল:

—'একটা টেলিগ্রাম পড়ে শোনাতে দিয়েছেন কমাণ্ডার।'

ভয়াবহ স্তব্ধতার মধ্যে সর্বাধিনায়ক কোর্নিলোভের ঘোষণাপত্র চেঁচিয়ে পড়তে লাগল ইভান আলেক্সিয়েভিচ:

> 'আমি, সর্বাধিনায়ক কোর্নিলোভ সমগ্র জাতির সম্মুখে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার সৈনিকজনোচিত কর্তব্য, স্বাধীন রাশিয়ার নাগরিক হিসাবে আমার আনুগত্য, এবং আমার চূড়ান্ত স্বদেশ প্রেম, পিতৃভূমির অস্তিত্বের এই সংকটজনক মুহূর্তে অস্থায়ী সরকারের নির্দেশ পালন করিতে এবং সৈন্য ও নৌ-বাহিনীর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব হইতে পদত্যাগ করিতে অস্বীকৃতি জানাইতে বাধ্য করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সমস্ত ফ্রন্টের নেতৃবর্গের দ্বারা সমর্থিত হইয়া আমি সমস্ত রুশ জনগণের নিকট ঘোষণা করিতেছি যে, আমার পদ হইতে অপসারণ অপেক্ষা মৃত্যুকেও আমি বরণীয় মনে করি। রুশ জনগণের খাঁটি সন্তান চিরকাল নিজের কর্তব্য সাধন করিতে করিতেই মৃত্যুবরণ করিবে এবং পিতৃভূমির জন্য প্রাণ বলি দিবে।
>
> 'জনগণের রক্তের সন্তান আমি, জনগণের সেবায় সমগ্র জীবন আমি দান করিয়াছি, আমার জনগণের মহান অধিকার রক্ষায় অস্বীকৃতি জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নহে। এক দুর্বিনীত শত্রু রহিয়াছে আমাদের মধ্যে, উৎকোচ ও বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে সে শুধু স্বাধীনতার সর্বনাশই ঘটাইতেছে না, রুশ জনগণেব অস্তিত্বকে পর্যন্ত ধ্বংস করিতেছে। রুশ জনসাধারণ, জাগো, দেখ কোন অতল গহ্বরে দেশ নামিয়া যাইতেছে!
>
> 'সমস্ত অশান্তি এড়াইয়া, রুশ রক্তপাতের সমস্ত সম্ভাবনা বন্ধ করিয়া, পারস্পরিক দোষারোপ এবং অস্থায়ী সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত লাঞ্ছনা ও অসম্মান উপেক্ষা করিয়া, আমি নিজে, সরকারকে সম্বোধন করিয়া বলিতে চাই: 'সামরিক প্রধান দপ্তরে আপনারা আসুন আমার নিকটে সেখানে আপনাদের

স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি আমি দিতেছি এবং আমার সহিত একযোগে জাতীয় প্রতিরক্ষার এমন এক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলুন যাহা স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হইবে, এবং এক মহান, স্বাধীন জাতির উপযুক্ত মহান ভবিষ্যতের দিকে রুশ-জাতিকে পরিচালিত করিবে।'

জেনারেল কোর্নিলোভ।'

পরের স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্যে থেমে রইল ট্রেন।* কসাকরা কামরার বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কোর্নিলোভের টেলিগ্রাম, আর কেরেন্‌স্কির অপর একখানা টেলিগ্রাম নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। কেরেন্‌স্কির টেলিগ্রামখানা পড়ে শোনাল কোম্পানির কমাণ্ডার, তাতে কোর্নিলোভকে দেশদ্রোহী আর প্রতি-বিপ্লবী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। কসাকরা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভ্রান্তের মত আলোচনা করতে লাগল, আর এমনকি অফিসাররা পর্যন্ত বিমূঢ় হয়ে গেল।

—'তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে সব কিছু।' অভিযোগ করল মার্তিন শামিল। 'কে যে দোষ করল বুঝি কি করে ছাই?'

—'ওরা এ ওকে খোঁচাচ্ছে, ফৌজকেও খোঁচাচ্ছে!'

—'সবাই ওরা মাথার ওপরে থাকতে চায়।'

একদল কসাক ইভান আলেক্সিয়েভিচের কাছে এল, দাবি জানাল:

—'চল কমাণ্ডারের কাছে, কি করতে হবে জেনে এসো।'

দল বেঁধে তারা এল কোম্পানি কমাণ্ডারের কাছে, দেখল কামরার ভেতরে অফিসাররা বৈঠকে বসেছে। ইভান আলেক্সিয়েভিচ ভেতরে ঢুকে জানাল:

—'ক্যাপ্টেন, কসাকরা জানতে চায় তারা কি করবে।'

—'এক্ষুণি আমি যাচ্ছি তাদের কাছে।' কমাণ্ডার উত্তর দিল।

কামরার শেষপ্রান্তে অপেক্ষা করতে লাগল গোটা কোম্পানি। কমাণ্ডার ভিড়ের মধ্যে ঢুকে মাঝখানে এগিয়ে গেল, তারপর হাত তুলল:

—'আমরা সর্বাধিনায়ক, আর আমাদের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের অধীন, কেরেন্‌স্কির নই।' কমাণ্ডার বলল। 'ঠিক কি না, বল? আর তাই, প্রশ্ন না তুলে আমরা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করব, পেত্রোগ্রাদের দিকেই যাব! সর্বশেষে, গাড়ি যখন দনো স্টেশনে পৌঁছুবে আমরা জানতে পারব পরিস্থিতি কি, সেখানে আমরা পাব প্রথম ডন ডিভিসনের কমাণ্ডারকে। উত্তেজিত না হতে অনুরোধ জানাচ্ছি আমি। এই ধরণের দিনকালের মধ্যেই আমরা এসে পড়েছি।'

কসাকদের ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করে, তাদের প্রশ্নের ভাসা ভাসা উত্তর দিয়ে, সৈনিকের কর্তব্য, দেশ ও বিপ্লব সম্পর্কে কমাণ্ডার বকবক করে গেল। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। কথা বলতে বলতেই ট্রেনের সঙ্গে ইঞ্জিনখানা জোড়া হয়ে গেল (কসাকরা জানতেও পারল না যে দুজন অফিসার স্টেশন মাস্টারকে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে যাত্রা ত্বরান্বিত করে দিল) আর সবাই যার যার কামরায় উঠে পড়ল।

॥ দুই ॥

আবার চলতে শুরু করল সৈন্য বোঝাই ট্রেনখানা, এগুতে লাগল দুনো স্টেশনের দিকে। ঘোড়াকে খাইয়ে কসাকরা ঘুমুতে লাগল, নয়ত, তামাক টানতে টানতে, বাইরে আকাশের দিকে তাকিয়ে আধ-খোলা দরজার ধারে বসে রইল। দরজার ফাঁক দিয়ে ছুটে চলা তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইল ইভান আলেক্সিয়েভিচ। গত কয়েক ঘণ্টা ধরেই পরিস্থিতি সম্পর্কে ভাবছে সে, অবশেষে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, যেমন করেই হক, তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে,—পেত্রোগ্রাদের দিকে কোম্পানির আর এগুনো বন্ধ করতেই হবে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, সবচেয়ে ঠিক কোন পন্থায় কসাকদের নিজের মতে আনতে পারবে।

ভাবনার মোড় ফিরল স্তকমানের দিকে। একদিন ওসিপ্ দাভিদোভিচ্ তাকে বলেছিল: 'ইভান আলেক্সিয়েভিচ, একবার শুধু এই জাতীয় গলদগুলো ঝরে যেতে দাও, তুমি একখণ্ড রক্তমাংসের ইস্পাত হয়ে উঠবে, আমাদের পার্টির অসংখ্যদের মধ্যে একটা দানা। আর গলদ তোমার ঝরে যাবেই! হাতুড়ির ঘায়ে, আগুনে পুড়ে সব খাদ মরে যায়।' ইভান ভাবল, ভুল সে করেনি। যদিও সে পার্টির বাইরে আছে, তবুও প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছে, যৌবনোচিত উৎসাহে এগিয়ে গিয়েছে পার্টির দিকে, পার্টির কাজে। পুরনো সমাজ ব্যবস্থার প্রতি এক অনড় ঘৃণার আগুনে পুড়ে, গড়ে পিটে সে এক বিশ্বস্ত বলশেভিক হয়ে উঠেছে। অনুভূতিহীন কসাকদের মধ্যে খুবই কষ্ট হয়েছে তার, সাহায্য করার একজনও সঙ্গী ছিল না। নিজের রাজনৈতিক অজ্ঞতা তাকে ভীষণভাবে বিঁধত, তাই সে পথ হাতড়ে হাতড়ে এগুতো, প্রতিটি ধাপ নিজের শ্রেণী-চেতনা দিয়ে যাচাই করে নিত। যুদ্ধের কয় বছরে সে এক অভ্যাস তৈরি করে নিয়েছিল, যখনই কোনো অসুবিধে ঘটত মনে মনে প্রশ্ন করত: 'এমন হলে ঠিক কি করত স্তকমান?' তার ধারণায় স্তকমান যা করত, তাই সে করবার চেষ্টা করত। এই রকমই হয়েছিল গ্রীষ্মকালে—যখন সে শুনতে পেয়েছিল প্রস্তাবিত গঠনতান্ত্রিক বিধান-সভার কথা। প্রথম সে খুশী হয়েই এই ধারণার দিকে ঝুঁকেছিল, কিন্তু পরে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠল, মনে পড়ে গেল স্তকমানের কথা: 'জনসাধারণের নাম নিয়ে যারা বোলচাল দেয়, কিন্তু কাজের বেলায় বুর্জোয়াদেরই স্বার্থ বাঁচায়, জনসাধারণের মধ্যেকার সংগ্রামী-বৈপ্লবিক আন্দোলন দুমুখো নীতি দিয়ে যারা দুর্বল করে, কখনো, কোনো সময়ের জন্যে বিশ্বাস করতে যেওনা তাদের।' তারপর, আর দ্বিধা না করে, সে প্রস্তাবের বিপক্ষে চলে গেল; পরে খুব আনন্দ হল, যখন দেখল, তার সিদ্ধান্তই সমর্থিত হয়েছে ফ্রন্ট থেকে ছাপা বলশেভিকদের সংবাদপত্রে।

এই নতুন ক্ষেত্রেও সেই একই রকম: কোর্নিলোভের ঘোষণাপত্রের আগেও সে বুঝতে পেরেছিল, কোর্নিলোভের পথের সঙ্গে কসাকদের পথ মিলতে পারে না, তবু তার শ্রেণী-চেতনা তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, কেরেন্স্কিকে সমর্থন করাও তাদের কাজ নয়। প্রশ্নটা নিয়ে বারবার সে নাড়াচাড়া করতে লাগল, সিদ্ধান্ত করল, কোম্পানিকে পেত্রোগ্রাদে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। যদি সংঘর্ষ কারও সঙ্গে বাধে, তাহলে বাধবে

নিশ্চয়ই কোর্নিলোভের সঙ্গে; কিন্তু তা কেরেনস্কির পক্ষে গেলে চলবে না, তার সরকারের পক্ষেও না, তা যাবে তার পক্ষে, যে সরকার কেরেনস্কির পরে গড়ে উঠবে। এ সম্পর্কে সে দৃঢ়নিশ্চিত হল যে, যে সরকার সে চাইছে, কেরেনস্কির পতন হলেই সেই সরকার আসবে। গ্রীষ্মকালে পেত্রোগ্রাদের পার্টির কার্যনির্বাহক কমিটির সামরিক বিভাগে গিয়েছিল সে; কোম্পানির কমান্ডারের সঙ্গে এক সংঘর্ষের ব্যাপারে উপদেশের জন্যে কোম্পানি থেকে তাকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে সে কমিটির কার্যপদ্ধতি দেখেছিল, জনকয়েক বলশেভিক কমরেডের সঙ্গে আলোচনা করেছিল, আর, মনে মনে ভেবেছিল: 'এই শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে উঠুক আমাদের মজুরের রক্তে মাংসে, আর তারপর হবে এক সরকার। মর, ক্ষতি নেই, ইভান, কিন্তু আঁকড়ে থাক ওকে, যেমন করে শিশু মায়ের স্তনের বোঁটা আঁকড়ে থাকে।'

ঘোড়াঢাকা চটের ওপরে শুয়ে শুয়ে প্রগাঢ় প্রীতিভরে বারবার সে ভাবতে লাগল সেই মানুষটির কথা, যার শিক্ষায় প্রথম চিনতে পেরেছিল এই নতুন সুকঠিন পথ। মনে পড়ল, কসাকদের সম্পর্কে একবার স্তকমান বলেছিল: 'মজ্জায় মজ্জায় রক্ষণশীল এই কসাকরা। তাদের কাউকে যখন বলশেভিক মতবাদের মূলকথা বোঝাতে যাবে তখন এই কথাটা ভুলোনা কিন্তু; কাজ করতে হবে হুঁসিয়ার হয়ে, ভেবেচিন্তে, পরিস্থিতি বুঝে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। প্রথম প্রথম খুবই অবজ্ঞার ভাব দেখাবে তারা, ঠিক যেমনটি আমাকে দেখাতে তুমি আর মিশা কোশেভয়; কিন্তু তাতে ঘাবড়ে যেও না। শক্ত করে বাটালি চালাও—পরিণামে জয় আমাদের অনিবার্য।'

॥ তিন ॥

কোর্নিলোভকে সমর্থন না করার জন্যে সকালে যখন বোঝাবার চেষ্টা শুরু করেছিল, ইভান ধরে নিয়েছিল, কিছু কিছু আপত্তি উঠবে কসাকদের তরফ থেকে। নিজের কামরার সঙ্গীদের সঙ্গে যখন কথা শুরু করল, বোঝাল, দেশের লোকের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে পেত্রোগ্রাদে না গিয়ে ফ্রন্টে ফিরে যাবার দাবি তোলাই তাদের উচিত হবে, তখন কসাকরা স্বেচ্ছায় রাজী হয়ে গেল, আর এগুনো অস্বীকার করতে পুরোপুরি তৈরি হল। ইভানের মতের সবচেয়ে কাছাকাছি এসে গেল ঝাখার কোরোলিওভ আর তুরিলিন নামে এক কসাক: কামরায় কামরায় ঘুরে, সবার সঙ্গে কথা বলে তারা সারাদিন কাটাল। সন্ধ্যের দিকে একটা স্টেশনের কাছাকাছি যখন গাড়ির গতি কমে এল, তৃতীয় দলের এক সার্জেন্ট লাফিয়ে উঠে এল ইভানের কামরায়।

—'যেখানে প্রথম গাড়ি থামবে, সেখানেই নামবে কোম্পানি।' ইভানকে সে চেঁচিয়ে বলল। 'কসাকরা কি চায় তা যদি না বোঝ, তাহলে কেমন ধারা কমিটির সভাপতি তুমি? আর যাব না আমরা! আমাদের গলায় ফাঁস জড়াচ্ছে অফিসাররা, আর তুমি এদিকেও না ওদিকেও না। এই জন্যে তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি?'

—'অনেক আগেই তোমাদের একথা বলা উচিত ছিল।' ইভান হাসল।

গাড়ি প্রথম থামতেই কামরা থেকে লাফিয়ে নামল ইভান, তুরিলিনকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল স্টেশন-মাস্টারের কাছে। হুকুম করল:

—'আর এগুতে দেবেন না ট্রেন। আমরা এখানে নামছি।'

—'সে আবার কি?' বিমূঢ় হয়ে সে জিজ্ঞেস করল। 'আমার নির্দেশ আছে আপনাদের যেতে দেবার...'

—'চুপ করে থাকুন!' কর্কশকণ্ঠে বাধা দিল তুরিলিন।

তারা স্টেশন কমিটিকে খুঁজে বার করল। তার সভাপতি পাকাচুল, ভারিক্কী চেহারার এক টেলিগ্রাফ-বিশেষজ্ঞ, তাকে বুঝিয়ে বলল সব ঘটনা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ড্রাইভার স্বেচ্ছায় ইঞ্জিন খুলে এক পাশে নিয়ে গেল। কসাকরা স্থায়ী রাস্তার ওপরে তাড়াতাড়ি তক্তা নামিয়ে কামরা থেকে ঘোড়াগুলো বাইরে নিয়ে আসতে শুরু করল। ইঞ্জিনের পাশে পাইপটা ফাঁক করে, হাসি হাসি মুখের ঘাম মুছতে মুছতে দাঁড়িয়ে রইল ইভান। কোম্পানির কমাণ্ডার তার দিকে ছুটতে ছুটতে এল।

—'তোমরা করছ কি? জানো যে...'

—'জানি জানি', ইভান বাধা দিল। 'আর বাগড়া দেবেন না, ক্যাপ্টেন।' তার নাকের পাশ দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল; ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে মারমুখী ভঙ্গিতে সে বলে উঠল:

—'যথেষ্ট গলাবাজি করেছেন, মশাই। এখন হুকুম চালাব আমরা।'

—'সর্বাধিনায়ক কোর্নিলোভ...' চটে আগুন হয়ে কমাণ্ডার তোতলাতে লাগল।

কিন্তু ইভান তাকিয়ে রইল তার বুটের দিকে, স্থায়ী রাস্তার বালিতে শক্ত হয়ে বসে গিয়েছে বুট দুটো। হাঁফ ছেড়ে, হাত নেড়ে ক্যাপ্টেনকে উপদেশ দিল:

—'ক্রুশের বদলে গলায় ঝুলিয়ে রাখুন কোর্নিলোভকে; আমাদের আর কোন প্রয়োজন নেই।'

অফিসার পিছিয়ে গেল, দৌড়ে ছুটে গেল তার কামরায়। এক ঘণ্টার মধ্যে স্টেশন ছেড়ে সুশৃংখলভাবে ঘোড়ায় চেপে কোম্পানি এগুতে লাগল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। একজন অফিসারও সঙ্গে গেল না। প্রথম দলের আগে আগে নেতা হয়ে চলল ইভান আলেক্সিয়েভিচ, সহকারী হল ঝোলা-কান, বেঁটে তুরিলিন।

কমাণ্ডারের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ম্যাপ দেখে দেখে অতিকষ্টে এগুতে এগুতে তারা এক গ্রামে এসে পৌঁছুল, রাতের জন্যে থামল সেখানে। এক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল, ফ্রণ্টে ফিরে যাওয়া হবে, কেউ থামাবার চেষ্টা করলে, লড়াই করতে হবে। ঘোড়ার পা ছেঁদে, পাহারা খাড়া করে শুয়ে শুয়ে ভোরের প্রতীক্ষা করতে লাগল কসাকরা। আগুন জ্বালানো হল না। স্পষ্টই বোঝা গেল অধিকাংশই মনমরা হয়ে আছে; চিরাচরিত হাসিঠাট্টা মুলতুবি রেখে শুয়ে রইল তারা, এ ওর কাছে মনের কথা গোপন রাখল।

—'যদি ওরা ভাল করে ভেবে দেখে, ফিরে গিয়ে সব কিছু মেনে নেয়?' গ্রেট-কোটের নীচে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে ভাবতে লাগল ইভান। তার ভাবনা যেন তুরিলিনের কানে গেল, এগিয়ে এল সে। জিজ্ঞেস করল:

—'ঘুমুলে নাকি, ইভান?'

—'এখনও ঘুমুইনি।'

তার পাশে উবু হয়ে বসল তুরিলিন, একটা সিগারেট ধরিয়ে ফিসফিস করে বলল:

—'ঘাবড়ে গিয়েছে কসাকরা...ক্ষতি যা করার, করে ফেলেছে, এখন ভয় পাচ্ছে। বেশ ফ্যাসাদটা বাধিয়েছি আমরা। তুমি কি বল?'

—'দেখা যাকত!' শান্ত কণ্ঠে ইভান উত্তর দিল। 'তুমিত ভয় পাওনি, পাচ্ছ নাকি?'

মাথা চুলকাল তুরিলিন, বাঁকা হাসি হেসে বলল:

—'সত্যি বলতে কি, পাচ্ছি। প্রথমটায় পাইনি, কিন্তু একটু ভয় ভয় করছে এখন।'

চুপ ক'রে গেল তারা। মাঠের ওপরে বিছিয়ে রইল প্রশান্ত, উদার নিশীথ স্তব্ধতা। ঘাসের বুকে শিশির ঝরতে লাগল। ঝিরঝিরে হাওয়ায় কসাকদের নাকে জলো-ঘাস, পচাপাতা, কাদা-মাটি, আর শিশিরভেজা ঘাসের পাঁচমেশালি গন্ধ ভেসে এল। মাঝে মাঝে ঘোড়া পা তুলতে গিয়ে টুংটাং আওয়াজ উঠল, নয়ত, নাক-ঝাড়ার আওয়াজ, তারপর ধপাস করে শব্দ, হয়ত কোন ঘোড়া মাটিতে বসে পড়ল। তারপর, আবার নিদ্রাতুর স্তব্ধতা, বহুদূরের কোন বুনো হাঁসের প্রায় অস্পষ্ট কর্কশ ডাক. কাছাকাছি কোথাও তার সঙ্গিনীর সাড়া দেওয়া কক্ কক্ আওয়াজ। অন্ধকারে অদৃশ্য ডানার দ্রুত সাঁই সাঁই শব্দ। প্রান্তরের কুয়াশাজড়ানো আর্দ্রতা। পশ্চিমে দিগন্তের কোণে মাথা উঁচুকরা, গাঢ় বেগুনে রঙের মেঘের তরঙ্গ দুলতে লাগল। আর একেবারে মহাশূন্যে, পন্দেকোভের প্রাচীন ভূ-খণ্ডের মাথার ওপরে প্রশস্ত, পায়ে-মাড়ান পথের মত, বিনিদ্র তর্জনী উঁচিয়ে ছায়াপথ বিস্তৃত হয়ে রইল।

॥ চার ॥

সকালে আবার যাত্রা শুরু করল কোম্পানি। তারা চলতে লাগল গ্রামের ভেতর দিয়ে; মেয়েরা, আর মাঠে গরু তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেতে ছোট ছোট ছেলেরা পেছন থেকে ধীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ভোরের আলোয় ইঁটের মত লাল টকটকে হয়ে ওঠা একটা টিলার ওপরে উঠল সবাই। তুরিলিন পেছনে তাকিয়েছিল, পা দিয়ে ইভানের রেকাব ছুঁয়ে বলল:

—'তাকিয়ে দেখ পেছনে! ঘোড়-সওয়ার আসছে।'

পেছনে গ্রামের দিকে তাকাল ইভান, দেখতে পেল. গোলাপি ধুলোর মেঘ উড়িয়ে তিনজন ঘোড়-সওয়ার ছুটে আসছে। সে হুকুম দিল:

—'কোম্পানি, থাম!'

কসাকরা তাদের অভ্যস্ত গতিতে চকবন্দি হয়ে দাঁড়াল। আধ-মাইলের মধ্যে আসতেই ঘোড়-সোয়াররা ঘোড়া কদমে নামিয়ে নিল। তাদের মধ্যে একজন, এক কসাক-অফিসার, সাদা রুমাল বার করে মাথার ওপরে নাড়তে লাগল। এগিয়ে আসা ঘোড়-সওয়ারদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কসাকরা। সামনে এসে দাঁড়াল খাঁকি-উর্দি পরা কসাক অফিসারটি, অপর দুজনের পরনে ককেশীয় উর্দি, তারা একটু পেছনে রইল।

তাদের দিকে সামনে এগিয়ে গিয়ে ইভান আলেক্সিয়েভিচ জিজ্ঞেস করল:

—'কি দরকার আমাদের কাছে?'

—'তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি।' টুপিটায় একটু হাত ছুঁইয়ে অফিসারটি বলল। 'কোম্পানির ভার নিয়েছে কে?'

—'আমি নিয়েছি।'

—'আমি হচ্ছি প্রথম ডন কসাক ডিভিসনের দূত, আর এই অফিসার দুজন

উপজাতি ডিভিসনের প্রতিনিধি।' লাগামে টান দিয়ে, ঘোড়ার ঘামে ভেজা ঘাড়ে টোকা দিতে দিতে বুঝিয়ে বলতে লাগল অফিসারটি। 'যদি পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাও, তাহলে সবাইকে ঘোড়া থেকে নামতে বল। ডিভিসনের বড়কর্তা জেনারেল গ্রেকোভের মৌখিক নির্দেশ জানাতে হবে।'

কসাকরা ঘোড়া থেকে নামল, অফিসাররাও নামল। ভিড় ঠেলেঠুলে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল তারা। কসাকরা রাস্তা ছেড়ে ছোটমত চক্র করে দাঁড়াল। কসাক অফিসার বলতে লাগল:

—'কসাক সব! তোমরা কি করছ তা একবার ভেবে দেখ, একই কথাই বোঝাতে এসেছি আমরা, তোমাদের আচরণের যে গুরুতর পরিণতি হবে তা যাতে এড়ান যায় আমরা সেজন্যেই এসেছি। গতকাল ডিভিসনের কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছেন, তোমরা একজনের বদমাইসি মতলবের খপ্পরে পড়েছ, নিজেরা খুশিমত ট্রেন ছেড়ে এসেছ; আজ আমাদের পাঠান হয়েছে তোমাদের নির্দেশ জানাতে, এখুনি স্টেশনে ফিরে যেতে হবে। গতকাল উপজাতি ডিভিসনের ফৌজ আর অন্যান্য ঘোড়সওয়ার দল পেত্রোগ্রাদ দখল করেছে; আজ এ সম্পর্কে টেলিগ্রাম পেয়েছি আমরা। আমাদের অগ্রবর্তীদল শহরে ঢুকে পড়েছে, সরকারী দপ্তর, ব্যাংক, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন অফিস ও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দখল করে নিয়েছে। অস্থায়ী সরকার পালিয়েছে, তার পতন হয়েছে। ভেবে দেখ, কসাকরা! ডিভিসনের কমাণ্ডারের হুকুম যদি না মান, তোমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী পাঠান হবে। তোমাদের আচরণকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করা হবে, ফৌজী দায়িত্ব পালনের অস্বীকৃতি হিসাবে ধরে নেওয়া হবে। যদি বিনাসর্তে সব মেনে নাও, একমাত্র তাহলেই রক্তপাত এড়াতে পারবে।'

অফিসাররা এগিয়ে আসার সময়েই ইভান আলেক্সিয়েভিচ বুঝে নিয়েছিল, ওদের সঙ্গে আলোচনাটা এড়ানো সম্ভব হবে না, কারণ তাহলে, সে যা চায় তার উল্টো ফলই হবে। কোম্পানি ঘোড়া থেকে নামলে তুরিলিনকে চোখ টিপে সে নিঃশব্দে অফিসারদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। মাটির দিকে তাকিয়ে, বিষণ্নমুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল কসাকরা; কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে ফিসফাস শুরু করল। ইভানের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা পর্যন্ত অস্বস্তিতে উসখুস করতে লাগল; গোটা কোম্পানি মাথা না তুলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, যেন প্রার্থনা করছে সবাই।

ইভান বুঝে নিল, কসাকরা নতিস্বীকার করার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আর কয়েক মিনিট মাত্র, তারপরই অফিসার তার বক্তৃতায় ওদের স্বমতে এনে ফেলবে। যে প্রভাব সে ফেলেছে, তা যেমন করেই হক কাটিয়ে দিতে হবে। হাত তুলল ইভান, বিস্ফারিত, দুটি অদ্ভুত, সাদা সাদা চোখ ভিড়ের গায়ে বুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

—'ভাই সব! দাঁড়াও একটু!' অফিসারের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল:

—'টেলিগ্রামটা আছে আপনার সঙ্গে?'

—'কোন টেলিগ্রাম?' বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল ক্যাপ্টেন।

—'যে টেলিগ্রামে বলা হয়েছে পেত্রোগ্রাদ দখল হয়েছে।'

—'না, নেই। কেন, টেলিগ্রাম দিয়ে কি হবে?'

—'নেই রে! নেই ওঁর কাছে!' একটি মাত্র স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল গোটা কোম্পানির বুক থেকে। কসাকদের অনেকেই মাথা তুলল, ইভানের মুখের দিকে আশায় আশায় তাকাল। গলার কর্কশ স্বর চড়িয়ে ইভান বিদ্রুপভরে চেঁচিয়ে উঠল:

—'বলছেন, আপনার কাছে নেই সেটা? তাহলে আপনার মুখের কথায় মেনে নিতে হবে? এত সহজে বোকা বানাতে পারবেন না আমাদের!'

—'এটা একটা ধাপ্পা!' একসঙ্গে গর্জন করে উঠল গোটা কোম্পানি।

—'টেলিগ্রামটা আমাদের নামে পাঠান হয়নি। শোন কসাকরা!' বোঝাবার চেষ্টায় অফিসারটি তার হাতখানা বুকের সঙ্গে চেপে ধরল।

কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। আবার কসাকদের সহানুভূতি ও বিশ্বাস ফিরে পেয়েছে বুঝতে পেরে কাঁচের ওপরে হীরের দাগের মত ইভান কেটে কেটে বলতে লাগল:

—'টেলিগ্রাম যদি পেয়েও থাকেন, আপনাদের সঙ্গে আমাদের রাস্তা মিলতে পারে না। নিজের জাতের লোকের সঙ্গে আমরা লড়তে চাইনে। জনসাধারণের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে যাব না। কিছুতেই না! মুর্খদের টেনে প্রকাশ্যে বার করা হয়েছে। আমরা জেনারেলদের সরকার গড়তে সাহায্য করব না। এই হচ্ছে সাফ কথা!'

কসাকরা চিৎকার করে সম্মতি জানাতে লাগল। 'বেশ একহাত নিচ্ছে ওদের!', ঠিক, ঠিক, ইভান!', 'ওদের কেটে পড়তে বল!'

ইভান অফিসারদের দিকে তাকাল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধৈর্য ধরে কসাক অফিসারটি অপেক্ষা করছে; তার পেছনে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে অপর দুজন দাঁড়িয়ে আছে। ওদের একজন এক সুশ্রী তরুণ ইংগুশ, বুকে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে, আমলকির মত তার কুঁতকুঁতে চোখদুটো চকচক করছে। অপরজন বয়স্ক, পাকাচুল এক ওসেতিন্, হাসি হাসি চোখে কসাকদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ইভান এখানেই আলোচনা পর্বের ইতি করে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু কসাক অফিসারটি তার মনের ভাব বুঝে নিল। ইংগুশ অফিসারের সঙ্গে ফিসফিস করে কি যেন বলে চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল·

—'শোন ডন-কসাকরা! উপজাতি ডিভিসনের প্রতিনিধিকে বলতে দেবে?'

অনুমতির অপেক্ষা না করেই, ফুলজরিকাটা সরু কোমরবন্ধটা বিচলিতভাবে নাড়তে নাড়তে ইংগুশ অফিসারটি সামনে এসে দাঁড়াল।

—'কসাক ভাই সব! এত হৈ হল্লার মানে কি? জেনারেল কোর্নিলোভকে তোমরা চাও না? তোমরা লড়াই চাও? বেশ? লড়াই পাবে তোমরা? আমরা ভয় পাইনি। মোটেই ভয় পাইনি! আজই গুঁড়ো করে দেব তোমাদের। দু দুটো রেজিমেণ্ট আমাদের পেছনে রয়েছে। বোঝ!' বেশ শান্ত ধীর ভাবেই সে প্রথমদিকে শুরু করেছিল, কিন্তু বলতে বলতে আরও আবেগতপ্ত হয়ে কথাগুলো বেরিয়ে আসতে লাগল, ভাঙা ভাঙা রুশের সঙ্গে তার নিজের ভাষার টুকরো কথা মিশতে লাগল। 'ওই কসাকটাই তোমাদের গড়বড় করে দিয়েছে। ও বলশেভিক, আর ওর কথায় তোমরা নাচছ! বোঝ! আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না? গ্রেপ্তার করো ওকে! হাতিয়ার কেড়ে নাও!'

ইভান আলেক্সিয়েভিচের দিকে সাহসের সঙ্গে আঙুল তুলে দেখাল সে ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গি করতে করতে ভিড়ের গায় চোখ বুলিয়ে নিল, মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠল। তার সঙ্গীটি আবেগহীন শান্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইল, আর কসাক অফিসারটি তলোয়ারের গিঁটটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। আবার চুপ করে গেল কসাকরা, বিমূঢ়, উত্তেজিত হয়ে উঠল সবাই। ইংগুশ অফিসারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ইভান; মন খারাপ করে ভাবতে লাগল, এক কথাতেই খতম করে দিতে পারত সে, কসাকদের

নিয়ে চলে যেতে পারত, সুযোগের সেই মুহূর্তটি ফসকে যেতে দিয়েছে। কিন্তু বাঁচিয়ে দিল তুরিলিন। মরিয়ার মত হাত নেড়ে ভিড়ের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে সে গর্জন করে উঠল। মুখ থেকে থুথু ছিটকাতে লাগল।

—'ড্যামনার দল সব! শয়তান...খচ্চর...! খানকির মত মিঠে মিঠে বুলি শোনাচ্ছে, আর তোমরা তাই কান খাড়া করে শুনছ! যা চায়, ওই অফিসাররা তাই তোমাদের দিয়ে করাবে! করছ কি সব? করছ কি? কোথায় ওদের কেটে কুচি কুচি করবে, না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কপচানি শুনছ! মুণ্ডু ওড়াও ওদের, রক্তগঙ্গা বইয়ে দাও! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গজালি করছ, আর ওদিকে আমাদের ঘেরাও করে ফেলছে। মেসিনগান দিয়ে কচুকাটা করবে! মেসিনগান যখন চালাতে শুরু করবে, তখন বেশিক্ষণ আর মিটিং চালাতে হবে না! যতক্ষণ না ফৌজ এসে হাজির হয়, ওরা ইচ্ছে করে চোখে ধুলো দিয়ে রাখছে। ধ্যেৎ, কসাক বল নিজেদের? তোমরা সব মাগীর দল!'

—'ঘোড়ায় চাপো সবাই!' ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ বজ্রকণ্ঠে হেঁকে উঠল।

ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে গোলার মত ফেটে পড়ল তার কণ্ঠস্বর। কসাকরা ঘোড়ার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মিনিটখানের মধ্যেই কোম্পানিটা আবার ফৌজী কায়দায় সার বেঁধে দাঁড়াল।

—'শোন! কসাকরা শোন!' ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠল।

ইভান কাঁধ থেকে বন্দুকটা খুলে নিল। ট্রিগারটা শক্ত করে আঙুলে চেপে ধরে চিৎকার করে বলল:

'কথার পালা শেষ হয়েছে! এখন যদি কথা বলতে হয় সে কথা হবে এই ভাষায়!'

চোখমুখ পাকিয়ে বন্দুকটা নাড়াল সে।

দলের পর দল রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল। পেছনে তাকিয়ে দেখল, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে অফিসাররা ঘোড়ার পিঠে চাপল। ইংগুশ অফিসারটি বারবার হাত তুলে তুলে ভয়ংকরভাবে তর্ক করতে লাগল; তার জামার আস্তিনের সাদা ধবধবে কাপড় বরফের মত ঝকমক করে উঠল। শেষবারের মত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই ইভানের চোখে পড়ল সেই ঝলমলে সিল্কের অংশটা, আর হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল বাতাসের ঝাপট-লাগা উচ্ছ্বসিত ডনের বুক, তার ফেণায়িত সবুজ ঢেউ, আর ঢেউয়ের চুড়োয় চুড়োয় কাত হয়ে পাক-খাওয়া গাঙ্-চিলের একখানা সাদা ধবধবে ডানা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

পেত্রোগ্রাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া কোর্নিলোভের সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন অংশ পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূব থেকে এগিয়ে আসা আট আটটা রেল-লাইনের বিরাট এলাকা জুড়ে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে গেল। সমস্ত বড় বড় স্টেশন, এমনকি হল্ট, আর পাশের ছোট লাইনগুলোতেও আস্তে আস্তে চলা সৈন্য-বোঝাই ট্রেনে গাদাগাদি হয়ে উঠল। রেজিমেণ্টগুলো উচ্চ-পদস্থ অফিসারদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, এলো-মেলো কোম্পানিগুলো নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলল। পথের মাঝখানেই বারবার পালটানো নির্দেশ, আর অসংলগ্ন হুকুমনামায় ডামাডোল আরও চরমে উঠল। এরই মধ্যে সৈন্যদের মনে জেগে উঠেছিল উদ্বিগ্ন, বিচলিত ভাব, এর ফলে তা আরও জোরালো হয়ে উঠল। রেল-শ্রমিকদের মূলগত বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে, বিপত্তির পর বিপত্তি কাটিয়ে পেত্রোগ্রাদের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল কোর্নিলোভের সৈন্যদল।

লালরঙের কামরায় কামরায় সমস্ত কসাক জেলার আধ-পেটা খাওয়া কসাকরা উপবাস-জীর্ণ ঘোড়াগুলোর পাশে পাশে ভিড় করে রইল। ট্রেনগুলো রাস্তা খালি পাওয়ার জন্যে স্টেশনে স্টেশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল; কামরা থেকে বেরিয়ে এসে কসাকরা হুড়হুড় করে ঢুকতে লাগল স্টেশনের বসবার ঘরে, নয়তো ভিড় করতে লাগল স্থায়ী রাস্তায়, আগের ট্রেনের ফেলে যাওয়া খাবার কুড়িয়ে খেতে লাগল, লোক-জনের বাড়ি থেকে চুরি করতে লাগল, খাবারের গুদাম লুঠ করতে লাগল।

রেল-লাইনে আটকা পড়ে, রাস্তায় নামতে ইতস্তত করতে লাগল কমাণ্ডাররা. গাড়ির ভেতরেই তারা রয়ে গেল।

॥ দুই ॥

প্রথম ডনকসাক ডিভিসনের অন্যান্য রেজিমেণ্টের সঙ্গে, ইউজেনে লিস্তনিৎস্কি আগে যাতে ছিল, সেই রেজিমেণ্টকেও রেভেল-নার্ভা রেল-লাইন বরাবর পেত্রোগ্রাদের বিরুদ্ধে ঠেলে দেওয়া হল। ১০ই সেপ্টেম্বর বিকেল পাঁচটায় দুটো রেজিমেণ্ট হাজির হল নার্ভা স্টেশনে। কমাণ্ডার জানতে পারল, নার্ভা ছাড়িয়ে স্থায়ী রাস্তাটা ধ্বংস করা হয়েছে, তার ফলে সে রাত্রে আর এগুনো অসম্ভব। ঘটনাস্থলের দিকে লাইন-পাতার একটা দলকে পাঠানো হয়েছে, যদি তারা সময়মত লাইনটা চালু করতে পারে, তাহলে খুব ভোরে

ট্রেন ছাড়তে পারে। ইচ্ছেয় হক, আর অনিচ্ছেয় হক, এটা মেনে নিতে হল কমাণ্ডারকে। গালগাল দিতে দিতে, কণ্টেসংন্টে পা-দানি বেয়ে কামরার মধ্যে ঢুকল, অন্যান্য অফিসারদের খবরটা জানাল, তারপর চা খেতে বসে গেল।

মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি। একটা কনকনে হাওয়া বইছে ফিন উপসাগর থেকে। স্থায়ী রাস্তা আর কামরায় কামরায় কসাকরা গল্পগ্‌জব করার জন্যে ভিড় করেছে। ট্রেনের এক কোণ থেকে গান ধরল এক তর্‌ণ কসাক, অন্ধকারে, অভিযোগের স্‌র উঠল, কার উদ্দেশ্যে তা কেউ জানে না।

একজন লোক বেরিয়ে এল ধ্‌সর গ্‌দামঘরের পেছন থেকে। একটু রাস্তার ওপরে চকচক করছে। রাস্তার এদিক ওদিক তাকাল, তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে কামরার দিকে এগ্‌তে লাগল। লাইনের কাঠের ওপরে পা-ফেলার ধ্‌প ধ্‌প আওয়াজ উঠতে লাগল, কিন্তু দ্‌ই লাইনের মাঝখানের বালিছড়ানো পথে চলতে গিয়ে পায়ের শব্দ চাপা পড়ে গেল। শেষ কামরার পেছনটা ঘ্‌রে গেল সে; দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল যে কসাকটি, সে গান বন্ধ করল, চেঁচিয়ে উঠল :

—'কে যায়?'

—'কাকে চাইছ তুমি?' না থেমেই অনিচ্ছাভরে উত্তর দিল লোকটি।

—'এত রাতে ঘ্‌রঘ্‌র করছ কিসের জন্যে?'

লোকটা বরাবর হাঁটতে হাঁটতে ট্রেনের মাঝামাঝি কামরাগ্‌লোর কাছে এসে হাজির হল, একটা কামরার দরজার ভেতর দিয়ে মাথা গলিয়ে জিজ্ঞেস করল :

—'আপনারা কোন কোম্পানি?'

—'আমরা সব বন্দী!' অন্ধকারে কে একজন হেসে উঠল।

—'ঠাট্টা নয়। দরকার আছে।'

—'দ্‌ নম্বর।'

—'চার নম্বররা সব কোথায়?'

—'সামনে থেকে ছয়ের কামরা।'

ছয়ের কামরার দরজার সামনে একজন কসাক উব্‌ হয়ে, আর দ্‌জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক টানছিল। লোকটা এগিয়ে আসতেই নিঃশব্দে চোখ তুলে তিনজনে তাকাল।

—'নমস্কার, কসাকরা!'

—'নমস্কার!' নবাগতের ম্‌খের দিকে তাকিয়ে তাদের একজন উত্তর দিল।

—'নিকিতা দ্‌গিন বেঁচে আছে? এখানে আছে সে?'

—'এই যে আমি।' উব্‌ হয়ে বসেছিল যে, সে উত্তর দিল। সিগারেটটা পায়ে মাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। 'কিন্তু আমি আপনাকে তো চিনি না। কে আপনি?' গ্রেট-কোট গায়ে, নোংরা ফৌজী-টুপি মাথায় নবাগতের ম্‌খটা ভাল করে দেখার জন্যে দাড়িওয়ালা ম্‌খখানা বাড়িয়ে দিল সে। হঠাৎ হাতের ম্‌ঠোয় তার দাড়িটা চেপে ধরে অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

—'ইলিয়া! বানচাক! আপনি কোথা থেকে উদয় হলেন।'

বানচাকের লোমশ হাতখানা নিজের হাতে চেপে ধরে, ঝুঁকে পড়ে, আরও শান্ত গলায় সে বলল :

—'এরা সবাই আমাদের লোক। ভয় পাবার কোন কারণ নেই। এখানে এলেন কি করে? বল্‌ন দেখি, যমের অর্‌চি!'

অন্য কসাকদের সঙ্গে করমর্দন করল বানচাক, তারপর ভাঙা ভাঙা, খ্যানখেনে গলায় উত্তর দিল :

—'পেত্রোগ্রাদ থেকে আসছি, খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাকে। হাতে কাজ আছে। আলোচনা করতে হবে। তুমি বেঁচে আছ, ভাল আছ জেনে খুশী হলাম, ভাই। চল, কামরার ভেতরে যাই।'

পা-দানি বেয়ে কামরার ভেতরে ঢুকল তারা। একজনকে পায়ের ঠোক্কর দিয়ে ফিসফিস করে দুগিন বলল :

—'উঠে পড়, ছোকরা! এক কাজের মেহমান এসেছে। জলদি! ওঠো, উঠে পড়।'

নড়ে চড়ে উঠে বসল কসাকটা। তামাক আর ঘোড়ার ঘামের গন্ধমাখা এক জোড়া বিশাল হাত অন্ধকারেই বানচাকের মুখখানা বুলিয়ে বুলিয়ে মন দিয়ে পরখ করল, হাতের মালিক জিজ্ঞেস করল ·

—'বানচাক নাকি?'

—'ঠিক ধরেছ। আর তুমি, চিকামাসোভ?

—'হ্যাঁ। দেখে খুশী হলাম, দোস্ত। দৌড়ে গিয়ে তিন নম্বরের লোকদের ডেকে আনব?

—'সেটা ভাল প্রস্তাব।'

তিন নম্বরের প্রায় শেষ লোকটিও এসে হাজির হল, শুধু দুজন রইল ঘোড়ার কাছে। বানচাকের কাছে গিয়ে, কসাকরা তার হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে দিল, ঝুঁকে পড়ে লণ্ঠনের আলোয় মুখখানা দেখতে লাগল। সহযাত্রীসুলভ আবেগতপ্ত স্বাগত-কামনার এক অখণ্ড সুর বেজে উঠল তাদের শুভ-সম্ভাষণে।

কসাকরা বানচাককে লণ্ঠনের দিকে মুখ করে বসাল, তার চারধারে সবাই ভিড় করে দাঁড়াল। যারা কাছে ছিল, তারা উবু হয়ে বসল, আর সবাই গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুগিন কাশল :

—'সেদিন তোমার চিঠি পেয়েছি, ইলিয়া, কিন্তু চিঠি পেলেও, তোমার সঙ্গে দেখা হক, তাই চাইছিলাম, আমরা কি করব সে সম্পর্কে তোমার উপদেশ চাইছিলাম। পেত্রোগ্রাদে পাঠাচ্ছে আমাদের।'

—'ব্যাপার হচ্ছে এই, ইলিয়া।' দরজার কাছে দাঁড়ান এক কসাক বলল। তার কান থেকে ঝুলছে একটা মার্কড়ি। এই সেই কসাক, পাত-টিনের ওপরে জল গরম করার জন্যে একদিন যে লিস্তনিৎস্কির কাছে ধমক খেয়েছিল। 'ব্যাপারটা হচ্ছে, নানা-ধরনের লোক আসছে আমাদের কাছে, যাতে পেত্রোগ্রাদে না যাই তার জন্যে চেষ্টা করছে; বলছে, আমাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই করা উচিত নয়। বলছে এই ধরনের আরও সব কথা। ওদের কথা শুধু শুনে যাই আমরা, কিন্তু বেশি বিশ্বাস করতে পারিনে। ওরা আমাদের জাতের লোক নয় ওরা হয়তো আমাদের কোন বে-মক্কা জায়গায় নিয়ে ফেলবে। যদি পেত্রোগ্রাদে যেতে না চাই তাহলে কোর্নিলোভ তার বুনোদের ডিভিসন আমাদের ওপরে লেলিয়ে দেবে, তাহলেও তো রক্তপাত ঘটবে। কিন্তু তুমি তো আমাদের জাতেরই কসাক, তোমার ওপরে আমাদের আস্থা বেশি। তুমি যে চিঠি লিখেছিলে আর খবরের কাগজ পাঠিয়েছিলে, তার জন্যে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ...আমাদের সিগারেটের কাগজ কমতি হয়ে পড়েছিল...'

—'ওসব কি মিছে কথা বলছ, মুখ্যু?' ক্রুদ্ধ হয়ে বাধা দিল একজন। 'অক্ষর চেনো না, তাই তুমি অমনধারা ভাব। কিন্তু আমরা সবাই তোমার মত নই। যেন

শুধু সিগারেটের জন্যেই কাগজ খরচ করেছি আমরা! আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত আমরা পড়ে ফেলেছি, ইলিয়া।'

কসাকদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হাসল বানচাক। বসে বসে কথা বলতে অসুবিধে বোধ হল; তাই সে উঠে দাঁড়াল, লণ্ঠনের দিকে পিঠ দিয়ে আশ্বাসের ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে বলতে লাগল :

—'পেত্রোগ্রাদে কিছুই করবার নেই তোমাদের। কোনো বিদ্রোহই সেখানে হয়নি। কেন তোমাদের সেখানে পাঠান হচ্ছে, তা জানো? অস্থায়ী সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্যে। কিন্তু কে তোমাদের চালাচ্ছে? জারের জেনারেল কোর্নিলোভ। কিন্তু কেরেন্‌স্কিকে কেন লাথি মেরে হটাতে চায় সে? তার গদিতে বসবার জন্যে। শোন, কসাকরা! তোমাদের ঘাড়ের কাঠের জোয়ালটা ওরা খুলতে চায়, কিন্তু তার বদলে ওরা পরাবে লোহার জোয়াল! দুটো বদমাইশের মধ্যে যে কম বদমাইশ, তাকেই বেছে নিতে হবে। তাই না? নিজেরাই ভেবে দেখ : জারের সময় ওরা ঘুঁসি চালাত, তারপর তোমাদের দিয়ে লড়াই করাত। কেরেন্‌স্কির সময়ে ওরা এখনও চাইছে লড়াই করাতে, কিন্তু ঘুঁসি আর চালায় না। কেরেন্‌স্কির আমলে সামান্য একটু উন্নতি হয়েছে, তবু তো হয়েছে। কিন্তু এসব আরও ভাল হবে যখন কেরেন্‌স্কির পর ক্ষমতা যাবে বলশেভিকদের হাতে। ওরা সরকার পাক হাতে, তখন সঙ্গে সঙ্গে শান্তি আসবে। আমি কেরেন্‌স্কির দিকে নই। জাহান্নমে যাক কেরেন্‌স্কি, ওরা সব এক গোয়ালের গরু!' একটু হাসল বানচাক, হাত দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল, তারপর বলে চলল : 'কিন্তু মজুরের রক্তপাত না করতে, এখনকার মত অস্থায়ী সরকারকে বাঁচাতে আমি তোমাদের অনুরোধ জানাচ্ছি। কেন অস্থায়ী সরকারকে বাঁচাবে? কারণ, তার জায়গায় যদি কোর্নিলোভ আসে, তাহলে মজুরের রক্তে রাশিয়ায় গঙ্গা বইবে, তার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে মেহনতি মানুষের হাতে দেওয়া বড়ই কঠিন হবে।'

—'একটু দাঁড়াও, ইলিয়া।' বানচাকের মতই মোটাসোটা এক বেঁটেমত কসাক পেছনের সার থেকে এগিয়ে এল। একটু কাশল সে, অতিপ্রাচীন ওকগাছের বৃষ্টি-ধোওয়া শেকড়ের মত লম্বা লম্বা হাতদুখানা ঘসল। কচিপাতার মত সবুজ হাসি হাসি চোখে বানচাকের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল :

—'এখুনি তুমি জোয়াল সম্পর্কে বললে। কিন্তু বলশেভিকরা যখন ক্ষমতা পাবে, তখন কোন জোয়াল আমাদের ঘাড়ে চাপাবে?'

—'তুমি নিজের ঘাড়ে নিজেই কি জোয়াল চাপাবে?'

—'নিজের ঘাড়ে চাপানো' বলতে কি বোঝাতে চাও তুমি?'

—'ধরো, বলশেভিকরা এলে সরকার চালাবে কে? তুমি চালাবে, যদি তোমাকে নির্বাচিত করা হয়, নয়তো দুগিন, নয়তো এই ইনি। সেটা হবে নির্বাচিত সরকার, একটা সোবিয়েত। বুঝলে?'

—'কিন্তু সবচেয়ে ওপরে থাকবে কে?'

—'কেন, যাকে নির্বাচিত করা হবে। যদি তোমাকে ঠিক করে, তুমিই হবে সকলের ওপরে।'

—'সত্যি সত্যি হবে? মিছে কথা বলছ না তো, ইলিয়া?'

হেসে উঠল কসাকরা, সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। এমনকি দরজার কাছে খাড়া পাহারাদার পর্যন্ত একটুক্ষণের জন্যে জায়গা ছেড়ে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

—'কিন্তু জমি নিয়ে কি করতে চায় ওরা?'

—'আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে না তো?'

—'ওরা কি লড়াই থামাবে? না, কি তখন তখনই—ওদের জন্যে লড়াই করতে বলবে?'

—'সত্যি সত্যি কি হবে তাই বল। এখানে একেবারে অন্ধকারে পড়ে আছি।"

একবার এদিক, আর একবার ওদিক করতে করতে বানচাক কসাকদের মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল, তারা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল। তার উদ্যমের সাফল্য সম্পর্কে প্রথম দিকের অনিশ্চয়তা মন থেকে একেবারে কেটে গেল। কসাকদের মনের গতি বুঝতে পেরে সে এইটুকু নিশ্চিত হতে পারল, যা-ই ঘটুক না কেন ফৌজের ট্রেনখানা নার্ভাতেই আটকে থাকবে। আগের দিন সে নিজেই যখন পেত্রোগ্রাদের পার্টি কমিটির কাছে কসাকদের মধ্যে প্রচারের প্রস্তাব দিয়েছিল, তখন তার মনে সাফল্য সম্পর্কে স্থির বিশ্বাসই ছিল; কিন্তু নার্ভায় পৌঁছে মনে সন্দেহ জাগল। সে জানে, কসাকদের সঙ্গে কসাকদের ভাষাতেই কথা বলতে হয়; হয়তো সে তা পারবে না, এই ভয়ই পেয়েছিল। কারণ, ফ্রন্ট ছাড়ার পর সে শুধু মজুরদের সঙ্গেই মিশেছে, আবার সে মজুরদের অভ্যাস আর কথা বলার ভঙ্গি পুরোপুরি রপ্ত করে নিয়েছে।

যখন কসাকদের সামনে প্রথম বলতে শুরু করল, তার নিজের গলার স্বরের অনিশ্চিত হোঁচট খাওয়া নিজের কানেই তখন ধরা পড়ল। আর সে অস্থির হয়ে সেই ধরনের কথা খুঁজতে লাগল, যা প্রত্যয় জাগাবে, বিরুদ্ধযুক্তি চুরমার করে দেবে। কিন্তু মুখ থেকে সাবানের ফেনার মত শুধুই ফাঁকা বুলি বেরিয়ে আসতে চায়, প্রাণহীন চিন্তার জালে মনটা জড়িয়ে যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল সে, বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে নিতে ভাবতে লাগল: 'আমার ওপরে এই বিরাট কাজের ভার পড়েছে, আর আমি নিজেই তা ভণ্ডুল করে দিচ্ছি। অন্য কেউ হলে হাজার গুণ ভাল করে বলতে পারত। দূর ছাই, কি হাঁদারাম আমি!'

যে কসাকটা জোয়ালের কথা জিজ্ঞেস করল, সে যেন ধাক্কা মেরে তাকে তার নির্বোধ ক্লীবতা থেকে সরিয়ে আনল। তারপর, তার উত্তর থেকে যে আলোচনার সূত্রপাত হল, তা তাকে আত্মস্থ হবার সুযোগ দিল। সে এক অনাস্বাদিত শক্তি প্রবাহ অনুভব করল, দামী দামী, বাছা বাছা, সহজ, অনাড়ম্বর, যুতসই কথা বেরিয়ে আসতে লাগল; প্রশান্ত ভাবেব আড়ালে নিজের উত্তেজনা গোপন রেখে, বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চটপট করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে লাগল. টগবগে ঘোড়ার সওয়ারের মত আলোচনার গতি চালিয়ে নিয়ে গেল।

—'নিয়মতান্ত্রিক বিধানসভা কেন খারাপ, বোঝাও আমাদের?' প্রশ্নের বাণ ছুটতেই লাগল। 'তোমাদের লেনিন—তাঁকে জার্মানরা পাঠিয়েছে, তাই না?' 'তুমি নিজের ইচ্ছায় এসেছ, না অন্য কেউ তোমাকে পাঠিয়েছে?' 'মেনশেভিকরাও কি জনসাধারণের লোক নয়?' 'আমাদের তো ফৌজী কাউন্সিল আর জনসাধারণের সরকার আছে। সোবিয়েতের দরকার কি আমাদের?'

একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেল সে। সকালবেলায় দুটো কোম্পানিকে এক সাধারণ সভায় ডাকা হবে, এই ঠিক করে ছোট্ট সভাটা মাঝরাতেব পরে ভাঙল। কামরার ভেতরেই রাত কাটাল বানচাক; চিকামাসোভ তার লেপের নীচে আসতে বলল তাকে। ক্রুশ করে শুতে শুতে সাবধান করে দিল:

—'নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমুতে পারবে, ইলিয়া...কিন্তু আমাদের খুবলে খায় উকুনে। আমাদের সঙ্গে শুয়ে যেন সাবাড় হয়ে যেও না। উকুনগুলো এমন গোলগাল আর মোটাসোটা, প্রত্যেকটিই এক একটা ডিমের মত বড়...' একটু চুপ করে রইল সে, তারপর শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল :

—'বানচাক, কোন জাতের লোক লেনিন? মানে, কোথায় তিনি জন্মেছেন, বড় হয়েছেন?'

—'লেনিন? তিনি রুশ।'

—'যাঃ?'

—'হ্যাঁ, সত্যি; তিনি রুশ।'

—'না ভায়া, তোমার ভুল! বেশ বোঝা গেল, তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানো না তুমি।' গলার স্বরে একটু বিজ্ঞতার ভাব ফুটিয়ে চিকামাসোভ বলল। 'জানো কোথাকার লোক তিনি? আমাদের জাতের। ডন-কসাকদের ভেতর থেকে তিনি এসেছেন, তাঁর জন্ম সালস্কোভ প্রদেশে, ভিয়েলিকোক্নিয়াজোয়ে জেলা...বুঝলে? সবাই বলে, ফৌজে তিনি গোলন্দাজ ছিলেন। তা তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়; ভাটি-অঞ্চলের কসাকদের মত—শক্ত গালের হাড়, সেই একই রকম চোখ।'

—'তুমি কি করে জানলে?'

—'কসাকরা নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা করছিল, তাই আমি শুনেছি।'

—'না, চিকামাসোভ। তিনি রুশ; জন্মেছেন সিমব্রিক্সে।'

—'বিশ্বাস করিনে তোমার কথা। কেন করি না, তাত সহজ। পুগাচোভকে ধরো; তিনি কসাক ছিলেন? আর স্তেংকারাঝিন্? আর, তিমোফিয়েভিচ্ ইয়ের্মাক্? এতেই বোঝ! জারের বিরুদ্ধে গরিবদের যারা মাথা তুলে দাঁড় করিয়েছে, এমন কোন লোক তাদের মধ্যে নেই যে কসাক নয়। আর তুমি বলছ তিনি সাইবেরিয়ার এক জেলার লোক! এমন ধারা কথা শুনলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়, ইলিয়া...'

হাসিমুখে বানচাক জিজ্ঞেস করল :

—'তাহলে, সবাই বলে তিনি কসাক?'

—'হ্যাঁ। তিনি কসাকই, শুধু এখন তিনি তা প্রকাশ করবেন না। যখনই তাঁর মুখ দেখতে পাব, তখনই বুঝতে পারব।' একটা সিগারেট ধরাল চিকামাসোভ, না-সেঁকা তামাকের কড়া-গন্ধ ছাড়ল বানচাকের মুখে। চিন্তিতভাবে একটু কাশল : 'এক তাজ্জব ব্যাপার বলছি তোমাকে, এই নিয়ে হাতহাতি হয়ে গিয়েছে আমার সঙ্গে। বুঝলে, ভ্লাদিমির ইলিচ্ যদি আমাদের মত কসাক আর একজন গোলন্দাজই হবেন, তাহলে জ্ঞানবুদ্ধি পেলেন কোথা থেকে? সবাই বলে, লড়াইয়ের প্রথম দিকে জার্মানরা তাঁকে বন্দী করে ছিল, সেখান থেকে সব কিছু শিখে নিয়েছেন; কিন্তু যখন তিনি ওদের মজুরদের বিদ্রোহ করাতে লাগলেন, তখন ওরা ঘাবড়ে গেল। 'ভাগো এখান থেকে,' তাঁকে জার্মানরা বলল। 'এখান থেকে ভাগো, নিজের দেশে যাও। বাপরে বাপ, এমন ঠ্যালা দিচ্ছ যে আর সামলাতেই পারব না।' তাই তারা তাঁকে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন, কারণ ভয় পেয়ে গেল, তাদের দেশের মজুরদের বিদ্রোহ ঘটিয়ে দেবেন। হুঃ হুঃ! বুঝলে ভায়া, উনি হচ্ছেন কালাপাহাড়।' চিকামাসোভ শেষ কথাগুলো ডাঁটের মাথায় বলল, তারপর অন্ধকারে আনন্দে হেসে উঠল। 'তুমি কখনো তাঁকে দেখনি, দেখেছ? না? আপশোস। সবাই বলে তাঁর মাথাটা বিরাট বড়।' চিকামাসোভ কাশল, নাক দিয়ে ধোঁয়ার ধূসর কুন্ডলি বেরিয়ে এল। 'কোন জারকে তিনি কথায় কখনো হারাতে

দেননি! না, ইলিয়া। আমার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। এতে সন্দেহ কিসের? এমন লোক কখনো সাইবেরিয়ার জেলায় জন্মাতে পারে না।'

বানচাক চুপ করে রইল, একটুকরো হাসি লেগে রইল মুখে। তার ঘুম আসতে দেরি হল; সার্টের নীচে জ্বালাধরানো, প্রাণান্তকর কুটকুটি ছড়িয়ে গায়ের ওপর উকুন ঝাঁক বেঁধে এল। চিকামাসোভ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, পাশেই নাক ডাকাতে লাগল। একটা ছটফট করা ঘোড়া তার ঘুমের দফা একেবারে রফা করে দিল। বানচাক এপাশ ওপাশ করতে লাগল। সে যে জেগে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে, রাগের মাথায় এই কথাটাই মনে করতে করতে আগামীকালের জনসভার কথা ভাবতে শুরু করে দিল। আপনাআপনি মনে পড়ে গেল ১৯০৫ সালের আক্রমণের একটি ঘটনা; আর নিজেকে এক অ-পরিচিত পথে খুঁজে পাবার উল্লাসে, তার মন যেন একগুঁয়ের মত স্মৃতির টুকরোটাকরা জাগিয়ে তুলতে শুরু করল: মৃত রুশ আর জার্মান সৈন্যদের মুখ, বীভৎস ভঙ্গি; প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের বর্ণহীন দিকগুলো; কামান গর্জনের প্রতিধ্বনি; মেসিনগানের কট্‌কট্‌ আর গুলির ফিতে ঘোরার শব্দ; এক বীরত্বের গান—এত অপূর্ব যে বুকটা প্রায় টনটন করে ওঠে; যে মেয়েকে একদিন ভাল বেসেছিল তার ঠোঁটের আবছায়া রেখা; তারপর আবার যুদ্ধের ছিন্ন ছিন্ন অংশ; এক পাহাড়ের মাথায় ঘুমিয়ে থাকা তার সহকর্মীদের কবর...

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে, উঁচু গলায় বলে উঠল, হয়তো বা মনে মনেই শুধু ভাবল: 'আমি আমৃত্যু এই স্মৃতি বয়ে বেড়াব। শুধু আমি একা নই, যারা এই জীবন পেরিয়ে আসবে তারা সবাই। আমাদের গোটা জীবনটাই পঙ্গু, অভিশপ্ত! ওরা ধ্বংস হোক! ধ্বংস হোক! মৃত্যুতেও ওদের অপরাধ মুছে যাবে না...'

দাঁতে দাঁত ঘসল বানচাক; যে ঘৃণার বিষে ভরে উঠল, তাতে প্রায় দম আটকে আর্তনাদ করে উঠল। বসে বসে লোমশ বুকখানা ডলতে লাগল, মনে হল, বুকের ভেতরে ঘৃণা টগবগ করছে, দম ফেলতে বাধা পাচ্ছে, যন্ত্রণা হচ্ছে হৃদপিণ্ডের নীচে।

॥ তিন ॥

সে যখন ঘুমিয়ে পড়ল তখন ভোর হয় হয়। আর সকালবেলায় আরও ফ্যাকাসে, আরও মনমরা হয়ে সে গেল রেল-শ্রমিকদের কমিটির কাছে, কসাকদের ট্রেন যাতে নার্ভার বাইরে না যায় তার জন্যে অদের ধরাধরি করল, তারপর তাদের সাহায্য সুনিশ্চিত করার জন্যে গ্যারিসন কমিটির খোঁজে বেরুল।

গুদামঘরের মরচে-ধরা ছাদ পেরিয়ে রোদ্দুর ঝরছে, গানের মত সুরেলা এক নারীকণ্ঠস্বর ভেসে আসছে, তাই দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে, উদ্দেশ্যের সম্ভাব্য সাফল্যে উল্লসিত হয়ে সকাল আটটার সময় সে গাড়িতে ফিরে এল। অল্পক্ষণের জন্যে হলেও প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল শেষ রাতে। স্থায়ী রাস্তার বেলে-মাটি ভিজে সপসপে, গড়িয়ে যাওয়া জলের ধারার সরু সরু দাগ; ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে মাটি থেকে, এখনও মাটিতে স্পষ্ট হয়ে আছে বৃষ্টির ফোঁটার গর্তগুলো, যেন গুটিবসন্ত হয়েছিল।

কামরাগুলো ঘুরে যেতেই গ্রেট-কোট গায়ে, কাদামাখা বুট-পায়ে একজন অফিসার তার দিকে এগিয়ে এল। বানচাক ক্যাপ্টেন কালমিকোভকে চিনতে পেরে চলার গতি

কমিয়ে দিল। কাছে আসতেই কালমিকোভ থেমে গেল, তার উত্তাপহীন, বাঁকা বাঁকা চোখদুটো চকচক করে উঠল :

—'কর্নেট বানচাক? এখনও ছাড়া আছ তুমি? মাপ করো, তোমার সঙ্গে 'হ্যাণ্ড-সেক' করতে পারব না...'

—'বড় বেশি তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন; হ্যাণ্ডসেকের ইচ্ছে আমারও নেই।' খোঁচা মেরে বানচাকও উত্তর দিল।

—'এখানে তুমি কি করছ? গা বাঁচাচ্ছ? নাকি...পেত্রোগ্রাদ থেকে এলে? দোস্তু কেরেনস্কির কাছ থেকে নাকি?'

—'একি আদালতের জেরা?'

—'এক সময়ে যে সহকর্মী ছিল এমন এক পলাতকের ভাগ্যে কি ঘটল, তা জানবার স্বাভাবিক কৌতূহল মাত্র।'

বানচাক কাঁধ ঝাঁকাল। একটু হাসল :

—'নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। কেরেনস্কির কাছ থেকে আমি আসিনি।'

—'কিন্তু এখানে তুমি বিরাট বিপদের মুখে আছ। তুমি একেবারে একা, নির্বান্ধব। কিন্তু সে যাই হোক, তুমি কি এবং কে, তাই বল? তকমা নেই, অথচ গায়ে ফৌজী গ্রেট-কোট।' অবজ্ঞা আর করুণার দৃষ্টিতে কালমিকোভ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বানচাককে দেখতে লাগল। 'রাজনীতির দালালি? ঠিক ধরেছি কি না, বল?' উত্তরের অপেক্ষা না করে, লম্বা লম্বা পা ফেলে সে ঘুরে চলে গেল।

বানচাক দেখতে পেল, কামরার মধ্যে দুগিন তার অপেক্ষায় বসে আছে।

—'কোথায় ছিলে তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ওদিকে যে সভা শুরু হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে।'

—'শুরু হয়ে গিয়েছে?'

—'হ্যাঁ। আমাদের কোম্পানির কমাণ্ডার কালমিকোভ গিয়েছিল পেত্রোগ্রাদে, আজ সকালে ফিরেছে, আর ফিরেই কসাকদের এক সভা ডেকেছে। এক্ষুনি গেল বক্তৃতা দিতে।'

যেখানে সভা হচ্ছে, দুগিনকে নিয়ে বানচাক গেল সেখানে। গুদামঘরের পেছনে কসাক উর্দি আর গ্রেট-কোটের জমাট, ধূসর-সবুজ ভিড়। অফিসারদের ঘেরের মধ্যে ভিড়ের মাঝখানে একটা পিপের ওপর কালমিকোভ উঠে দাঁড়িয়েছে, তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট গলায় চিৎকার করছে :

—'...নিয়ে যেতে হবে চূড়ান্ত জয়ের দিকে। ওঁরা আমাদের বিশ্বাস করেন, সে বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করব আমরা। বলশেভিকরা আর কেরেনস্কির দালালরা রেল-লাইন ধরে আমাদের সৈন্যদের এগুতে বাধা দিচ্ছে। সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে আমরা নির্দেশ পেয়েছি, যদি রেলপথে যাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে, আমরা ঘোড়ায় চেপে পেত্রোগ্রাদের দিকে এগুব। আজই এগুতে হবে আমাদের। যাও, ট্রেন থেকে নামবার জন্যে তৈরি হও।'

কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে ভিড়ের মধ্যে পথ করে নিয়ে ঘেরের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল বানচাক, অফিসারদের দলের দিকে না গিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল :

—'কসাক কমরেড সব! পেত্রোগ্রাদের শ্রমিক আর সৈনিকরা আমাকে পাঠিয়েছে তোমাদের কাছে। ভাইএর বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে, বিপ্লবকে ধ্বংস করার জন্যে তোমাদের

অফিসাররা ওকালতি করছেন। যদি তোমরা জনগণকে আক্রমণ করতে চাও, যদি রাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে চাও, যদি পঙ্গু, অথর্ব না হওয়া পর্যন্ত, মরে ভূত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালাতে চাও, তাহলে তাই করো! কিন্তু পেত্রোগ্রাদের শ্রমিক আর সৈনিকরা জানে, তোমরা ভাইয়ের রক্তপাত করবে না। তারা তোমাদের ভ্রাতৃত্বের জ্বলন্ত অভিনন্দন পাঠিয়েছে। তারা তোমাদের শত্রু হিসাবে দেখতে চায় না, দেখতে চায় বন্ধু হিসাবে...'

আর তাকে বলতে দেওয়া হল না। এক অবর্ণনীয় হৈ হৈ শব্দ হয়ে গেল। চিৎকারের ঝড় যেন কালমিকোভকে ঝাপটা মেরে পিপের ওপর থেকে ফেলে দিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে এগিয়ে গেল বানচাকের দিকে, কয়েক হাত দূরে এসে থামল, তারপর কসাকদের দিকে ফিরে দাঁড়াল :

—'শোনো কসাকরা! গত বছর কর্নেট বানচাক ফ্রণ্ট ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তা তোমরা জান। আর তোমরা এই কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতকের কথা শুনেছ?'

ছয় নম্বর কোম্পানির কমাণ্ডার মেজর মুখিন তার হেঁড়েগলার চিৎকারে কালমিকোভের গলা ডুবিয়ে দিল :

—'গ্রেপ্তার কর, বদমাসকে! আমরা রক্ত ঢেলেছি, আর উনি পেছনে পালিয়ে জান বাঁচিয়েছেন! ধরো ওকে!'

—'একটু দাঁড়াও, দাদা!' 'বলতে দাও ওকে।' 'কোনো পলাতককে আমরা চাইনে।' 'বলে যাও, বানচাক।' 'ধ্বংস হোক ওরা!' 'শুনিয়ে দাও, বানচাক, আচ্ছা করে ওদের শুনিয়ে দাও!' কসাকদের মধ্যে থেকে পরস্পরবিরোধী চিৎকারের ঐকতান উঠল।

রেজিমেণ্টের বিপ্লবী কমিটির সভ্য, এক লম্বামত, টুপি-হীন কসাক পিপের ওপরে লাফিয়ে উঠল। সরু গলার সঙ্গে লটকানো তার চাঁছা-ছোলা মাথাটা সাপের মত একবার এদিকে আবার ওদিকে নড়তে লাগল। বিপ্লবের শত্রু, জেনারেল কোর্নিলোভের হুকুম না মানার জন্যে জ্বালাময়ী ভাষায় সে কসাকদের আহ্বান জানাল, জনসাধারণের জীবনে যুদ্ধের সর্বধ্বংসী ফলাফলের কথা বলল। বক্তৃতার শেষে সে বানচাকের দিকে ঘুরে দাঁড়াল :

—'আর আপনি, কমরেড,' সে চেঁচিয়ে বলল, 'ভাববেন না যে অফিসারদের মত আমরা আপনাকে ঘেন্না করি। আমরা খুশী হয়েছি আপনাকে দেখে। আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কারণ, আপনি যখন অফিসার ছিলেন, কসাকদের কখনো ঠেঙলাননি, আপনি ছিলেন কসাকদের ভাইএর মত। কোনদিন আপনার মুখ থেকে কড়া কথা শুনিনি আমরা; আপনি একথা মনেও করবেন না, আমরা মুখ্যু বলে মানুষের মত ব্যবহার কাকে বলে তা বুঝতে পারি না। গরুমোষও মিষ্টি কথা বুঝতে পারে, মানুষ তো দূরের কথা। আপনার সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। আমরা অনুরোধ করছি, পেত্রোগ্রাদের মজুরদের জানাবেন, তাদের বিরুদ্ধে অমারা একখানা হাতও ওঠাব না।'

সমর্থনসূচক ধ্বনির গর্জন উঠল কাড়া-নাকাড়ার আওয়াজের মত। গর্জন উঠল অস্বাভাবিক উচ্চ-গ্রামে, নামতে লাগল ধীরে ধীরে, তারপর স্তব্ধ হয়ে গেল।

কালমিকোভ আবার লাফিয়ে উঠল পিপের ওপর। তার সুঠাম দেহটা কসাকদের চোখের সামনে হেলতে দুলতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে, মড়ার মত ফ্যাকাসে মুখে সে বলে চলল ডনের গৌরব আর সম্মানের কথা, কসাক-বৃত্তির ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যের কথা, অফিসার আর সৈনিকেরা যে রক্ত ঢেলেছে, তার কথা।

কালমিকোভের পর বলতে শুরু করল পাকাচুলো এক কসাক। বানচাককে আক্রমণ করে বলা প্রতিটি কথা জনতা চিৎকার করে ডুবিয়ে দিল, পিপে থেকে তাকে টেনে নামাল। তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠল চিকামাসোভ। এমনভাবে হাত নাড়তে লাগল, মনে হল যেন কাঠ ফাঁড়ছে। চিকামাসোভ গর্জন করে উঠলঃ

—'আমরা যাব না। আমরা ট্রেন থেকে নামব না! কালমিকোভ বলছেন, কসাকরা কোর্নিলোভকে সাহায্য করার কথা দিয়েছে; কিন্তু কথা দেব, কি দেব না, তা কেউ কি আমাদের জিজ্ঞেস করেছিল? কোর্নিলোভকে কোন কথা দিই নি আমরা! কথা দিয়েছে অফিসাররা আর কসাক মৈত্রী সমিতি। তারা সাহায্য করুক গে তাঁকে!'

ক্রমবর্ধমান হারে একের পর এক বক্তা উঠতে লাগল পিপের ওপরে। বানচাক মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল, গালদুটো লাল টকটকে হয়ে উঠল, মুখ আর গলার শিরা দপদপ করতে লাগল। বিদ্যুতের প্রবাহ বইছে চারপাশে। আর একটু মাত্রা ছাড়ালে, হঠাৎ কোন কিছু করে বসলে, রক্তপাত ঘটে যেত। কিন্তু গ্যারিসন থেকে সৈন্যরা দঙ্গল বেঁধে চলে এল, আর অফিসাররাও সভা ছেড়ে গেল।

আধঘণ্টা পরে দুগিন ছুটতে ছুটতে এল বানচাকের কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল :

—'ইলিয়া, কি করি আমরা এখন? কি যেন বুদ্ধি ঠাউরেছে কালমিকোভ। মেসিনগানগুলো নামিয়ে নিচ্ছে, কোথায় যেন খবর পাঠাল ঘোড়ায় করে।'

—'এক্ষুনি যাচ্ছি! জনকুড়ি কসাককে জড়ো করো। দৌড়ে যাও!'

অফিসারদের কামরার পাশে দাঁড়িয়ে কালমিকোভ আর তিনজন অফিসার মেসিন-গানগুলো ঘোড়ার পিঠে চাপাচ্ছিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে তাদের দিকে এগিয়ে গেল বানচাক একবার পেছনের কসাকদের দিকে ফিরে তাকাল, তারপর গ্রেট-কোটের পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে, একটা পিস্তল টেনে বার করল :

—'কালমিকোভ, আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম!' হেঁকে উঠল সে। 'হাত তুলুন..'

ঘোড়ার কাছ থেকে লাফ দিয়ে সরে এল কালমিকোভ, খাপ থেকে পিস্তল টেনে নেবার জন্যে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু তার মাথার ওপর দিয়ে বোঁ করে একটা বুলেট ছুটে গেল, আর শঙ্কাজনক, ভারীগলায় বানচাক চেঁচিয়ে উঠল :

—'হাত তুলুন।'

তার পিস্তলের ঘোড়ার হাতুড়িটা আস্তে আস্তে উঠে আধ-খাড়া হয়ে রইল। কোঁচকান চোখে ওইদিকে তাকাল কালমিকোভ তারপর আস্তে আস্তে হাতদুটো তুলল, আঙুল-গুলো একটু একটু কাঁপতে লাগল। অনিচ্ছায় হাতিয়ারগুলো তুলে দিল অফিসাররা। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে নিয়ে কসাকরা মেসিনগানগুলো কামরার ভেতরে নিয়ে গেল।

—'এগুলোয় পাহারা বসাও।' দুগিনকে বানচাক বলল। 'চিকামাসোভ, তুমি অফিসারদের গ্রেপ্তার করে এখানে নিয়ে এসো। কালমিকোভকে নিয়ে আমি আর দুগিন যাচ্ছি গ্যারিসনের বিপ্লবী কমিটির কাছে। ক্যাপ্টেন কালমিকোভ, দয়া করে এগিয়ে আসুন।'

—'তাজ্জব...তাজ্জব...।' কামরার ভেতরে উঠে, বানচাক, দুগিন আর কালমিকোভ চলে যাচ্ছে, তাই দেখতে দেখতে তারিফ করার ভঙ্গিতে একজন অফিসার মন্তব্য করল।

—'কি লজ্জা! লজ্জার কথা, মশাইরা! একেবারে বাচ্চা ছেলের মত করলাম আমরা! বদমাসটাকে একটা ঘা বসাবার কথাও কারুর মনে পড়ল না' কালমিকোভের দিকে যখন পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছিল, সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল, তাহলেই

সব ঢুকে যেত।’ চটেমটে অন্যান্য অফিসারদের দিকে তাকাল মেজর সুখিন, কেস থেকে একটা সিগারেট নিতে গিয়ে আঙুলে আঙুল জড়িয়ে গেল। মাঝে মাঝে দৃষ্টি বিনিময় করতে করতে নিঃশব্দে সিগারেট ধরাল অফিসাররা। বানচাক যে বিদ্যুৎগতিতে কাজ হাসিল করে নিয়েছে, তাতেই বসিয়ে দিয়েছে তাদের।

কালো জুলপির ডগাটা কামড়াতে কামড়াতে, কোন কথা না বলে, খানিকদূর পাশাপাশি হেঁটে এল কালমিকোভ। বাঁ-গালটা জ্বালা করতে লাগল, যেন কেউ বুরুশ ঘসে দিয়েছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় সবাই থমকে দাঁড়াতে লাগল, অবাক হয়ে এ ওর সঙ্গে ফিসফিস করতে লাগল। শহরের মাথার ওপরে সন্ধ্যার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। রাস্তার ধারে ধারে ঢালাই-করা লাল ধাতুপিণ্ডের মত ঝরাপাতা রাশীকৃত হয়ে আছে। গির্জার সবুজ গম্বুজের চারপাশে দাঁড়কাকগুলো পাক খাচ্ছে। স্টেশনের ওপারে, আবছায়া মাঠের ওপারে, হিম নিঃশ্বাস ছড়িয়ে রাত্রি আগেই নামতে শুরু করেছে; কিন্তু তখনো চোখে পড়ছে, দক্ষিণে ছেঁড়া ছেঁড়া সিসে-সাদা মেঘের দল হাওয়ার মুখে ছুটে চলেছে। অদৃশ্য সীমান্ত পার হয়ে এসে রাত্রি কালো কালো ছায়াগুলোকে হটিয়ে নিয়ে চলেছে।

স্টেশনের কাছে এসে কালমিকোভ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। বানচাকের মুখে থুথু ছিটিয়ে চিৎকার করে উঠল :

—‘বদমাস...’

মুখ সরিয়ে থুথুর ছিটে এড়াল বানচাক, ভুরুদুটো টেনে তুলল। পিস্তল বাগিয়ে ধরার জন্যে আঙুলগুলো সুড়সুড় করে উঠল। কিন্তু নিজেকে সংযত করে অফিসারকে এগিয়ে যেতে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিল।

যুদ্ধের ক বছরের তীব্র যন্ত্রণা, আতঙ্ক, বে-পরোয়া মনোভাব, আর রুদ্ধ কামনা থেকে জন্মানো শাপমন্যির ফোয়ারা ছুটিয়ে, বীভৎস গালাগাল দিতে দিতে এগিয়ে চলল কালমিকোভ।

—‘তুই বিশ্বাসঘাতক! এর মাশুল দিতে হবে তোকে!’ মাঝে মাঝে থেমে, বানচাকের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল।

—‘এগিয়ে চলুন! বলছি, এগিয়ে চলুন.’ বানচাক বারবার ধমকাতে লাগল।

হাতদুটো মুঠো করে, উত্তেজিত ঘোড়ার মত টানটান হয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল কালমিকোভ। ততক্ষণে তারা জলের ট্যাঙ্কের কাছাকাছি এসে পড়েছে। দাঁতে দাঁতে ঘসে সে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল :

—‘তোদের তো পার্টি নয়, তোরা সমাজের যত উচ্ছিষ্ট, তলানি। কে তোদের নেতা? জার্মান ফৌজী নেতারা। বলশেভিক...! দো-আঁশলা কুকুরের দল! তোদের পার্টিকে বেশ্যার মত পয়সা দিয়ে কেনা যায়। জঘন্য সব! জঘন্য সব, খতম করে দাও সবাইকে...! ওরা নিজের দেশের বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তোদের সবাইকে এক দড়িতে লটকাতে পারতাম যদি...কিন্তু সময় আসবে! জার্মানীর টাকার লোভে তোদের লেনিন রাশিয়াকে বেচে দেয়নি? ঘুস নিয়েছে..আর এখন গা ঢাকা দিয়েছে...দাগী আসামী...’

—‘দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ান!’ হাঁপাতে হাঁপাতে কথাগুলো উচ্চারণ করতে করতে ধীর মস্তিষ্কে বানচাক হুকুম করল।

দুগিন উত্তেজিত হতে শুরু করেছিল। সে চেঁচিয়ে উঠল :

—‘ইলিয়া! বানচাক! দাঁড়াও একটু! কি করতে যাচ্ছ তুমি? থামো, থামো!’

ক্রোধে বিকৃত, লাল টকটকে মুখে বানচাক কালমিকোভের সামনে লাফিয়ে পড়ে

মাথায় ঘা মারল। কার্লামিকোভের মাথা থেকে টুপিটা ছিটকে পড়ে গেল। সেটা পা দিয়ে মাড়িয়ে, জলের ট্যাঙ্কের গম্বুজের অন্ধকার ইটের দেয়ালের দিকে বানচাক তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলল।

—'উঠে দাঁড়ান!'

—'কি করতে যাচ্ছিস তুই...? তোর...সাহস হবে সাহস হবে আমাকে গুলি করতে?' বাধা দেবার জন্যে ঝটাপটি করতে করতে কার্লামিকোভ গর্জাতে লাগল।

তাকে ছুঁড়ে দিল বানচাক, দেয়ালের গায়ে ধাক্কা লাগল পিঠ। হঠাৎ বুঝতে পেরে, সোজা হয়ে দাঁড়াল কার্লামিকোভ।

—'আমাকে তাহলে গুলি করতে যাচ্ছিস!'

দ্রুতহাতে গ্রেট-কোটের বোতাম আটকাতে আটকাতে সে একপা সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

—'কর গুলি, শুয়োরের বাচ্চা! গুলি কর..! আর দেখ কি করে রুশ অফিসার মরে..! মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আমি.. আঃ!'

বুলেট গিয়ে বিঁধল তার মুখে। জলের ট্যাঙ্কের গম্বুজের চারপাশে সেই গুলির শব্দের প্রতিধ্বনি বেজে উঠল। বাঁ-হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরল কার্লামিকোভ, হোঁচট খেল, তারপর পড়ে গেল। অর্ধমৃতের মত নুয়ে পড়ল মাটিতে, রক্তমাখা ভাঙা দাঁত-গুলো থুথুর সঙ্গে বুকের ওপর উগড়ে দিল, জিভ দিয়ে ঠোঁটদুটো চাটল। ভেজা মাটির সঙ্গে পিঠটা লাগবার আগেই আবার গুলি করল বানচাক। থরথর করে কেঁপে উঠল কার্লামিকোভ, একপাশে কাত হয়ে গেল, তারপর নিদ্রাতুর পাখির মত মাথাটা বুকের ওপরে ভেঙে পড়ল, একবার কি দুবার ফুঁপিয়ে উঠল।

পেছন ফিরে, চলতে শুরু করল বানচাক। দুগিন ছুটতে লাগল পেছনে পেছনে।

—'ইলিয়া! বানচাক! ওকে গুলি করলে কিসের জন্যে?'

স্থিরদৃষ্টিতে দুগিনের চোখে চোখ রেখে কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল বানচাক, তারপর এক অদ্ভুত রকমের শান্ত নম্র গলায় বলল :

—'হয় আমরা মারব, নয়তো, ওরা আমাদের মারবে! এর মাঝখানে আর কোন পথ নেই। এ লড়াইতে বন্দী করা নেই। রক্তের বদলে রক্ত। নির্মূল করার লড়াই... বুঝতে পারলে।' কার্লামিকোভের মত লোকদের শেষ করে দিতে হবে, সাপের মত থেঁতলাতে হবে। আর যারা তাদের দয়া দেখানোর জন্যে আমতা আমতা করবে, তাদেরও গুলি করে মারতে হবে। বুঝতে পারলে? কিসের জন্যে আমতা আমতা করছ? নিজেকে সামলাও! শক্ত হও! কালমিকোভের হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, মুখ থেকে সিগারেটটা পর্যন্ত না সরিয়ে আমাদের গুলি করত; আর তুমি কি, ছিঁচ-কাঁদুনে।'

কিন্তু মাথা নড়তে লাগল দুগিনের, দাঁতে দাঁতে লেগে ঠকঠক করতে লাগল; তারপর বিশাল পা দুটোর ওপর দেহের ভার ছেড়ে দিয়ে হোঁচট খেয়ে চলতে শুরু করল।

কোন কথা না বলে নির্জন রাস্তা দিয়ে তারা হাঁটতে লাগল। পেছন ফিরে তাকাল বানচাক। পূর্বদিকে ধেয়ে চলা, মৃত্যুশোকাচ্ছন্ন বিষণ্ণ মেঘের দল নীচের আকাশে ফেনায়িত হয়ে উঠছে। সেপ্টেম্বরের স্বচ্ছ আকাশের একটুখানি জায়গা থেকে শিং বাঁকানো, বৃষ্টি-ধোওয়া চাঁদ, মড়ার মত সবুজ, বাঁকা-চোখে তাকিয়ে আছে। এক কোণে এক সৈনিক, আর সাদা শাল জড়ানো এক স্ত্রীলোক গায়ে গায়ে লেপ্টে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সৈনিকটি স্ত্রীলোককে বুকে জড়িয়ে ধরল, ফিস ফিস করে কি যেন বলে নিজের কাছে টেনে আনল। কিন্তু স্ত্রীলোকটি তার বুকে ধাক্কা মারল, মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে ধরা গলায় বিড়বিড় করে বলল : 'বিশ্বাস করি না তোমাকে! বিশ্বাস করি না তোমাকে!' একটা চাপা খিলখিল হাসি তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ছটকে এল।

॥ চার ॥

কেরেনস্কি পেত্রোগ্রাদে ডেকে পাঠালে, তেরই সেপ্টেম্বর গুলিতে আত্মহত্যা করল জেনারেল ক্রিমোভ।

ক্রিমোভের বাহিনীর বিভিন্ন দলের কমান্ডার আর প্রতিনিধিরা বশ্যতা জানাতে হুড়হুড় করে শীত-প্রাসাদে আসতে শুরু করল। যারা এই সেদিনও অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পেত্রোগ্রাদের দিকে এগুচ্ছিল, এখন তারা দাসের মত সেলাম ঠুকতে লাগল, কেরেনস্কির পায়ে মাথা খুঁড়তে লাগল, চূড়ান্ত আনুগত্যের ভাবভঙ্গি দেখিয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত করতে চেষ্টা করল। মনের দিক থেকে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, মৃত্যু-যন্ত্রণায় ক্রিমোভের বাহিনী ছটফট করতে লাগল। নিছক নিষ্কর্মা থেকেই কোন কোন দল তখনও পেত্রোগ্রাদের দিকে এগুতে লাগল, কিন্তু তাদের অগ্রগতির আর কোন অর্থই রইল না, কারণ কোর্নিলোভের বিদ্রোহ খতম হয়ে গেল, প্রতিক্রিয়ার বিস্ফোরণের হাউই নিভতে শুরু করল; আর দেশের অস্থায়ী ভাগ্যবিধাতা ফুলে ফেঁপে, নেপোলিয়নের মত তালঠুকে ঘুরতে লাগল, রাশিয়ার 'পরিপূর্ণ রাজনৈতিক সংহতি'র কথা সরকারী বৈঠকে বৈঠকে বলে বেড়াতে লাগল।

ক্রিমোভের আত্মহত্যার আগের দিন জেনারেল আলেক্সেভকে সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করা হয়েছিল। নিজের অবস্থার অনিশ্চিত স্বরূপ বুঝতে পেরে, হুঁসিয়ার, খুঁতখুঁতে আলেক্সেভ প্রথমে সে পদ গ্রহণ করতে পুরোপুরি অস্বীকার করেছিল; কিন্তু পরে, কোর্নিলোভ এবং তার সরকার-বিরোধী বিদ্রোহের সংস্থার সঙ্গে যারা জড়িত হয়েছিল, তাদের শাস্তি লঘু করে দেবার উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই পদ গ্রহণ করতে রাজি হল। আলেক্সেভ কোর্নিলোভের সঙ্গে তার সদর দপ্তরে টেলিফোনে সোজাসুজি যোগাযোগ করল, তার নিয়োগ আর আশু উপস্থিতি সম্পর্কে ভূতপূর্ব সর্বাধিনায়কের মতিগতি বুঝতে চেষ্টা করল। মাঝে মাঝে বাধা পড়লেও, আপোস-চুক্তির আলোচনা চলল গভীর রাত্রি পর্যন্ত।

চোদ্দই সেপ্টেম্বর আলেক্সেভ সদর দপ্তরে হাজির হল। সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায়, অস্থায়ী সরকারের নির্দেশে, কোর্নিলোভ, লুকোমস্কি আর রোমানোভস্কিকে গ্রেপ্তার করল। পরদিন বেরদিচেভে, জেনারেল মার্কোভ, ভাননোভস্কি আর এরদেলির সঙ্গে, দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সর্বাধিনায়ক জেনারেল দেনিকিন গ্রেপ্তার হল। এইভাবেই ইতি হল কোর্নিলোভের বিদ্রোহের। কিন্তু ইতি হলেও, এ থেকে জন্ম নিল এক নতুন বিদ্রোহ; কারণ, ভাবী গৃহযুদ্ধ আর বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিস্তৃত আক্রমণ-পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ের জন্ম হল এই 'কোর্নিলোভের দিনগুলোর' মধ্যেই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

নভেম্বরের প্রথম দিকে একদিন সকালে রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারের কাছ থেকে ক্যাপ্টেন লিস্তনিৎস্কি নির্দেশ পেল, তার কোম্পানি নিয়ে পায়ে হেঁটে শীত-প্রাসাদের স্কোয়ারে যেতে হবে। সার্জেণ্ট-মেজরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে, তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরে নিল। হাই তুলতে তুলতে, গালাগাল দিতে দিতে অন্যান্য অফিসাররাও উঠল। আঙিনায় এল সবাই। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল কোম্পানি। লিস্তনিৎস্কি জোর কদমে মার্চ করিয়ে নিয়ে চলল। জনহীন নেভ্স্কি প্রস্পেক্ট। বহুদূরে থেকে মাঝে মাঝে গুলির শব্দ ভেসে আসছে। শীত-প্রাসাদের স্কোয়ারের চারধারে একখানা সাঁজোয়া গাড়ি ঘুরছে, টহল দিয়ে ফিরছে জুংকাররা। রাস্তায় রাস্তায় মরুভূমির স্তব্ধতা। শীত-প্রাসাদের ফটকের সামনে জুংকারদের একটা দল, আর চার নম্বর কোম্পানির কসাক অফিসারদের সঙ্গে কসাকদের দেখা হল। তাদের একজন কোম্পানির কমাণ্ডার। লিস্তনিৎস্কিকে এক পাশে ডেকে নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল :

—'আপনাদের সঙ্গে সব কোম্পানিই আছে?'

—'হ্যাঁ। কেন?'

—'দুই, পাঁচ, আর ছয় নম্বর আসতে অস্বীকার করেছে; কিন্তু আমাদের সঙ্গে মেসিন-গানের দল আছে। আপনার কসাকদের মতিগতি কেমন?'

একটু হাত নাড়ল লিস্তনিৎস্কি, উত্তর দিল :

—'খারাপ! কিন্তু এক নম্বর আর চার নম্বরের অবস্থা কি রকম?'

—'ওরা নেই এখানে। ওরা আসবে না। বলশেভিকদের কাছ থেকে আজ একটা আক্রমণের আশংকা আছে, জানেন তো? কি হচ্ছে, তা ভগবানই জানে।' বিষণ্ণভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল সে, তারপর আবার বলল, 'এ সবকিছু ফেলে দিয়ে, যদি ডনে ফিরে যেতে পারতাম, কি খুশীই হতাম...'

লিস্তনিৎস্কি কোম্পানিকে প্রাসাদের আঙিনায় নিয়ে এল। কসাকরা হাতিয়ারগুলো জড়ো করে রেখে, প্রশস্ত আঙিনায় ঘুরতে লাগল, আর ওদিকে অফিসাররা একটা কোণে জমায়েত হয়ে সিগারেট টানতে টানতে আলাপ-আলোচনা শুরু করল।

কিছুক্ষণ পরে একটা জুংকার রেজিমেণ্ট, আর নারী ব্যাটালিয়ান এসে হাজির হল। প্রাসাদের বারান্দায় বারান্দায় মেসিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল জুংকাররা। উঠোনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল নারী-বাহিনী। তাদের দিকে ঘেঁসে এল কসাকরা, অশ্লীল রসিকতা শুরু করে দিল। একজনের পিঠে চাপড় মেরে এক সার্জেণ্ট-মেজর মন্তব্য প্রকাশ করল :

—'বাচ্চা বিয়োনোই তোমাদের কাজ, মাসি, ব্যাটা-ছেলেদের ব্যাপারে ঢোকা, তোমাদের কাজ নয়।'

—'বাচ্চা তোমরাই বিয়োও গে!' পাল্টা মুখঝামটা দিল বে-রসিকা 'মাসি'।

কসাকরা হাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু তাদের ফূর্তির ভাব দুপুরের দিকে ঝিমিয়ে গেল। প্লেটুনে ভাগ হল নারী-সৈন্যরা, বিশাল বিশাল পাইন কাঠ দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করল ফটকের সামনে। তাদের নেত্রী, পুরুষালি গড়নের এক বিশাল বপু নারী, মানানসই গ্রেট-কোটে সেণ্ট জর্জ মেডেল আঁটা। স্কোয়ারের চারধারে আরও ঘন ঘন সাঁজোয়াগাড়ি চক্কর দিতে লাগল। জুংকাররা গুলির বাক্স আর মেসিনগানের ফিতে টেনে টেনে ভেতরে নিয়ে যেতে লাগল।

লাগুতিনের একদল গুণগ্রাহী আর জেলার লোকজন তাকে ঘিরে কি যেন আলোচনা করতে লাগল। অফিসাররা উধাও হয়ে গেল, কসাকরা আর নারী-সৈন্যরা ছাড়া কেউ রইল না আঙিনায়। গোটাকয়েক পরিত্যক্ত মেসিনগান পড়ে রইল ফটকের পাশে, আড়াল দেবার লোহার পাতগুলো চকচক করতে লাগল।

সন্ধ্যের দিকে হালকা বরফ পড়া শুরু হল। না খেয়ে এমনিভাবে পড়ে থাকায়, কসাকরা গজগজ করতে লাগল। একজন বাতলাল :

—'খাবারের গাড়ির জন্যে কাউকে পাঠানো উচিত।'

পাঠান হল দুজনকে। আরও ঘণ্টা কয়েক বসে রইল কসাকরা, কিন্তু না খাবারের গাড়ি, না খবর দেবার লোক, কেউ এল না। ঠিক সন্ধ্যের অন্ধকার নামবার মুখে গেটের সামনে জড়ো হল নারী ব্যাটালিয়ান, কাঠগুলোর পাশে লম্বা লাইন বেঁধে শুয়ে পড়ল, তারপর স্কোয়ার লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। কসাকরা কোন অংশ নিল না গুলি ছোঁড়ায়, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক টানতে লাগল, আর আরও বেশি করে তিরিক্ষে হয়ে উঠতে লাগল। অবশেষে দেয়ালের কাছে কোম্পানিকে জড়ো করল লাগুতিন, ভয়ে ভয়ে প্রাসাদের জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে ভিড়ের সামনে বলতে শুরু করল :

—'এখন এই তো অবস্থা! এখানে আমাদের করার কিছুই নেই। বেরুতেই হবে এখান থেকে, নইলে অকারণ ভোগান্তি হবে আমাদের। রাজবাড়ি লক্ষ্য করে ওরা গুলি চালাবে, তখন আমরা কোথায় থাকব? অফিসাররা হাওয়া হয়ে গিয়েছে.. শুধু আমরা এখানে থেকে মরব? চল, দেশে ফিরে যাই, আমরা কেন এই ফ্যাসাদে পড়তে যাই? আর, অস্থায়ী সরকারের কথা যদি বল কি এমন সগ্গে তুলেছে আমাদের? কি বল সব, কসাকরা?'

—'আমরা যদি আঙিনা থেকে বেরুতে যাই, বলশেভিকরা গুলি ছুঁড়বে।' একজন কসাক আপত্তি তুলল।

—'তাহলে এসো ভাগ হয়ে যাই...'

—'না, শেষ পর্যন্তই এখানে থাকা যাক।'

—'আমরা সবাই কসাইখানার ভেড়া, এখানে বসে আছি কসাই কখন আসবে।

—'যা খুশী তোমার কর, আমাদের দল বাইরে যাবে।'

—'আমরা যাব!'

—'বাইরে বলশেভিকদের কাছে লোক পাঠাও। তারা আমাদের ছেড়ে দিক, আমরাও তাদের ছেড়ে দেব।'

এক নম্বর আর চার নম্বর কোম্পানির কসাকরাও এসে যোগ দিল সেই সভায়। আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর, তিন কোম্পানি থেকে তিনজন কসাক ফটকের ভিতর দিয়ে বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তিনজন জাহাজীকে সঙ্গে নিয়ে তারা ফিরে

এল। কাঠের বাধাটা লাফিয়ে পার হয়ে, ইচ্ছাকৃত বেপরোয়া ভঙ্গিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে, উঠোনের আড়াআড়ি এগিয়ে আসতে লাগল জাহাজীরা। কসাকদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল তিনজন। তাদের মধ্যে একজন সুশ্রী তরুণ, কালো-জুলপি, গায়ে জাহাজী জ্যাকেট, মাথার পেছনে টুপিটা ঠেলে দেওয়া। সে ঠেলেঠুলে ভিড়ের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। তারপর বলতে শুরু করল :

—'কসাক কমরেডরা! আমরা বিপ্লবী বাল্‌তিক্‌-নৌ-বাহিনীর প্রতিনিধি, আপনারা শীত-প্রাসাদ ছেড়ে যান, আমরা এই প্রস্তাব জানাতে এসেছি। কেন আপনারা শত্রু বুর্জোয়াদের সরকারকে বাঁচাবেন? বুর্জোয়াদের ছেলেরা, ওই জুংকাররা বাঁচাক তাদের! অস্থায়ী সরকারকে বাঁচাবার জন্যে একটি সৈনিকও এগিয়ে আসেনি, আর এক নম্বর ও চার নম্বর রেজিমেণ্টের আপনাদের বন্ধুরা আমাদের হাতে হাত মিলিয়েছে। যারা আমাদের দিকে আসতে চান, তাঁরা বাঁ-দিকে যান।'

—'একটু দাঁড়ান ভাই!' এক নম্বর কোম্পানির একজন সার্জেণ্ট-মেজর এগিয়ে এল সামনে। 'খুশী মনেই আমরা যাব, কিন্তু ধরুন, যদি বলশেভিকরা গুলি চালাতে শুরু করে?'

—'কমরেডরা! পেত্রোগ্রাদের ফৌজী বিপ্লবী কমিটির তরফ থেকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সম্পূর্ণ নিরাপদে আপনারা বাইরে যেতে পারবেন। কেউ আপনাদের চুলের ডগাও ছোঁবে না।' জাহাজী তরুণটি উত্তর দিল।

কসাকরা ইতঃস্তত করতে লাগল। নারী-ব্যাটালিয়ানের জনকয়েক কাছে এল, মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে শুনল, তারপর আবার ফিরে গেল ফটকের কাছে। একজন দাড়িওয়ালা কসাক চেঁচিয়ে ডাকল :

—'এই, মেয়েরা, আসবে আমাদের সঙ্গে?'

—'রাইফেল তুলে নিয়ে চলতে শুরু কর।' সিদ্ধান্ত স্থির করে নিয়ে লাগুতিন বলে উঠল।

—'মেসিনগানগুলো কি সঙ্গে নেব?' কালো-জুলপিওয়ালা জাহাজীকে একজন মেসিনগানার জিজ্ঞেস করল।

—'হ্যাঁ। জুংকারদের জন্যে রেখে যেও না।'

কসাকরা আঙিনা ছেড়ে যাবে ঠিক এমন সময়, তাদের অফিসাররা হাজির হল। জাহাজীদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল। চলতে শুরু করল কোম্পানিগুলো। মেসিনগান নিয়ে সামনে চলল মেসিনগান-বাহিনী। ভেজা পাথরে ঘসা লেগে চাকার ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ উঠল। এক নম্বর কোম্পানির আগের দলের সঙ্গে সঙ্গে চলল জ্যাকেট-পরা জাহাজীটা। লম্বা মত, পাকাচুল এক কসাক তার হাতায় টান মারল, অপরাধীর মত বলল :

—'ভাই, তুমি কি ভাবছ, সাধারণ-লোকের বিপক্ষে যেতে চেয়েছিলাম আমরা? জোচ্চুরি করে ওরা আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে; কিন্তু আগে যদি জানতাম আমরা আসতাম না।' ভীষণভাবে মাথা ঝাঁকাল সে। 'বিশ্বাস করো আমার কথা, কিছুতেই আসতাম না। গা ছুঁয়ে বলছি!'

ফটকের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল কসাকরা, সেখানে জমাট ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে নারী-ব্যাটালিয়ান। কাঠের বেড়ার ওপরে একজন কসাক লাফিয়ে উঠল, বোঝানোর ভঙ্গিতে অর্থময়ভাবে তর্জনী নেড়ে বলে উঠল :

—'শোন, তোমরা! আমরা বাইরে যাচ্ছি, মেয়েলি বুদ্ধির দোষে তোমরা এখানে

—'বাচ্চা তোমরাই বিয়োও গে!' পাল্টা মুখঝামটা দিল বে-রসিকা 'মাসি'।

কসাকরা হাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু তাদের ফুর্তির ভাব দুপুরের দিকে মিলিয়ে গেল। প্লেটুনে ভাগ হল নারী-সৈন্যরা, বিশাল বিশাল পাইন কাঠ দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করল ফটকের সামনে। তাদের নেত্রী, পুরুষালি গড়নের এক বিশাল বপু নারী, মানানসই গ্রেট-কোটে সেন্ট জর্জ মেডেল আঁটা। স্কোয়ারের চারধারে আরও ঘন ঘন সাঁজোয়াগাড়ি চক্কর দিতে লাগল। জুংকাররা গুলির বাক্স আর মেসিনগানের ফিতে টেনে টেনে ভেতরে নিয়ে যেতে লাগল।

লাগুতিনের একদল গুণগ্রাহী আর জেলার লোকজন তাকে ঘিরে কি যেন আলোচনা করতে লাগল। অফিসাররা উধাও হয়ে গেল, কসাকরা আর নারী-সৈন্যরা ছাড়া কেউ রইল না আঙিনায়। গোটাকয়েক পরিত্যক্ত মেসিনগান পড়ে রইল ফটকের পাশে, আড়াল দেবার লোহার পাতগুলো চকচক করতে লাগল।

সন্ধ্যের দিকে হালকা বরফ পড়া শুরু হল। না খেয়ে এমনিভাবে পড়ে থাকায়, কসাকরা গজগজ করতে লাগল। একজন বাতলাল :

—'খাবারের গাড়ির জন্যে কাউকে পাঠানো উচিত।'

পাঠান হল দুজনকে। আরও ঘণ্টা কয়েক বসে রইল কসাকরা, কিন্তু না খাবারের গাড়ি, না খবর দেবার লোক, কেউ এল না। ঠিক সন্ধ্যের অন্ধকার নামবার মুখে গেটের সামনে জড়ো হল নারী ব্যাটালিয়ান, কাঠগুলোর পাশে লম্বা লাইন বেঁধে শুয়ে পড়ল, তারপর স্কোয়ার লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। কসাকরা কোন অংশ নিল না গুলি ছোঁড়ায়, শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাক টানতে লাগল, আর আরও বেশি করে তিরিক্ষে হয়ে উঠতে লাগল। অবশেষে দেয়ালের কাছে কোম্পানিকে জড়ো করল লাগুতিন, ভয়ে ভয়ে প্রাসাদের জানলাগুলোর দিকে তাকিয়ে ভিড়ের সামনে বলতে শুরু করল :

—'এখন এই তো অবস্থা! এখানে আমাদের করার কিছুই নেই। বেরুতেই হবে এখান থেকে, নইলে অকারণ ভোগান্তি হবে আমাদের। রাজবাড়ি লক্ষ্য করে ওরা গুলি চালাবে, তখন আমরা কোথায় থাকব? অফিসাররা হাওয়া হয়ে গিয়েছে.. শুধু আমরা এখানে থেকে মরব? চল, দেশে ফিরে যাই, আমরা কেন এই ফ্যাসাদে পড়তে যাই? আর, অস্থায়ী সরকারের কথা যদি বল কি এমন সগ্গে তুলেছে আমাদের? কি বল সব, কসাকরা?'

—'আমরা যদি আঙিনা থেকে বেরুতে যাই, বলশেভিকরা গুলি ছুঁড়বে।' একজন কসাক আপত্তি তুলল।

—'তাহলে এসো ভাগ হয়ে যাই...'

—'না, শেষ পর্যন্তই এখানে থাকা যাক।'

—'আমরা সবাই কসাইখানার ভেড়া, এখানে বসে আছি কসাই কখন আসবে।

—'যা খুশী তোমার কর, আমাদের দল বাইরে যাবে।'

—'আমরা যাব!'

—'বাইরে বলশেভিকদের কাছে লোক পাঠাও। তারা আমাদের ছেড়ে দিক, আমরাও তাদের ছেড়ে দেব।'

এক নম্বর আর চার নম্বর কোম্পানির কসাকরাও এসে যোগ দিল সেই সভায়। আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর, তিন কোম্পানি থেকে তিনজন কসাক ফটকের ভিতর দিয়ে বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তিনজন জাহাজীকে সঙ্গে নিয়ে তারা ফিরে

এল। কাঠের বাধাটা লাফিয়ে পার হয়ে, ইচ্ছাকৃত বেপরোয়া ভঙ্গিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে, উঠোনের আড়াআড়ি এগিয়ে আসতে লাগল জাহাজীরা। কসাকদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল তিনজন। তাদের মধ্যে একজন সুশ্রী তরুণ, কালো-জুলপি, গায়ে জাহাজী জ্যাকেট, মাথার পেছনে টুপিটা ঠেলে দেওয়া। সে ঠেলেঠুলে ভিড়ের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। তারপর বলতে শুরু করল :

—'কসাক কমরেডরা! আমরা বিপ্লবী বাল্‌তিক্‌-নৌ-বাহিনীর প্রতিনিধি, আপনারা শীত-প্রাসাদ ছেড়ে যান, আমরা এই প্রস্তাব জানাতে এসেছি। কেন আপনারা শত্রু বুর্জোয়াদের সরকারকে বাঁচাবেন? বুর্জোয়াদের ছেলেরা, ওই জুংকাররা বাঁচাক তাদের! অস্থায়ী সরকারকে বাঁচাবার জন্যে একটি সৈনিকও এগিয়ে আসেনি, আর এক নম্বর ও চার নম্বর রেজিমেণ্টের আপনাদের বন্ধুরা আমাদের হাতে হাত মিলিয়েছে। যারা আমাদের দিকে আসতে চান, তাঁরা বাঁ-দিকে যান।'

—'একটু দাঁড়ান ভাই!' এক নম্বর কোম্পানির একজন সার্জেণ্ট-মেজর এগিয়ে এল সামনে। 'খুশী মনেই আমরা যাব, কিন্তু ধরুন, যদি বলশেভিকরা গুলি চালাতে শুরু করে?'

—'কমরেডরা! পেত্রোগ্রাদের ফৌজী বিপ্লবী কমিটির তরফ থেকে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, সম্পূর্ণ নিরাপদে আপনারা বাইরে যেতে পারবেন। কেউ আপনাদের চুলের ডগাও ছোঁবে না।' জাহাজী তরুণটি উত্তর দিল।

কসাকরা ইতঃস্তত করতে লাগল। নারী-ব্যাটালিয়ানের জনকয়েক কাছে এল, মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে শুনল, তারপর আবার ফিরে গেল ফটকের কাছে। একজন দাড়িওয়ালা কসাক চেঁচিয়ে ডাকল :

—'এই, মেয়েরা, আসবে আমাদের সঙ্গে?'

—'রাইফেল তুলে নিয়ে চলতে শুরু কর।' সিদ্ধান্ত স্থির করে নিয়ে লাগুতিন বলে উঠল।

—'মেসিনগানগুলো কি সঙ্গে নেব?' কালো-জুলপিওয়ালা জাহাজীকে একজন মেসিনগানার জিজ্ঞেস করল।

—'হ্যাঁ। জুংকারদের জন্যে রেখে যেও না।'

কসাকরা আঙিনা ছেড়ে যাবে ঠিক এমন সময়, তাদের অফিসাররা হাজির হল। জাহাজীদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল। চলতে শুরু করল কোম্পানিগুলো। মেসিনগান নিয়ে সামনে চলল মেসিনগান-বাহিনী। ভেজা পাথরে ঘসা লেগে চাকার ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ উঠল। এক নম্বর কোম্পানির আগের দলের সঙ্গে সঙ্গে চলল জ্যাকেট-পরা জাহাজীটা। লম্বা মত, পাকাচুল এক কসাক তার হাতায় টান মারল, অপরাধীর মত বলল :

—'ভাই, তুমি কি ভাবছ, সাধারণ-লোকের বিপক্ষে যেতে চেয়েছিলাম আমরা? জোচ্চুরি করে ওরা আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে; কিন্তু আগে যদি জানতাম, আমরা আসতাম না।' ভীষণভাবে মাথা ঝাঁকাল সে। 'বিশ্বাস করো আমার কথা, কিছুতেই আসতাম না। গা ছুঁয়ে বলছি!'

ফটকের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল কসাকরা, সেখানে জমাট ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে নারী-ব্যাটালিয়ান। কাঠের বেড়ার ওপরে একজন কসাক লাফিয়ে উঠল, বোঝানোর ভঙ্গিতে অর্থময়ভাবে তর্জনী নেড়ে বলে উঠল :

—'শোন, তোমরা! আমরা বাইরে যাচ্ছি, মেয়েলি বুদ্ধির দোষে তোমরা এখানে

রয়ে গেলে। তা থাকো, কিন্তু খচরামি করো না! যদি আমাদের পেছন থেকে গুলি ছোঁড়, আমরা ফিরে এসে কেটে কুচি কুচি করে ফেলব। মাথায় ঢুকল? আচ্ছা, তাহলে এখনকার মত আসি।'

কাঠের পাঁচিল থেকে লাফিয়ে নামল সে, মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাতে তাকাতে দলটাকে ধরবার জন্যে ছুটতে শুরু করল। কসাকরা প্রায় স্কোয়ারের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছুল, এমন সময় তাদের একজন পেছনে তাকাল, তারপর উদগ্রীব হয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

—'দেখ, দেখ! একজন অফিসার ছুটে আসছে পেছনে পেছনে।'

ঘাড় ফেরাল অনেকেই। টুপিটা চেপে ধরে, হাত নাড়াতে নাড়াতে একজন লম্বা মত অফিসার ছুটে আসছে স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে।

—'তিন নম্বর কোম্পানির আতার্শচিকোভ।'

—'নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে আসতে চায়।'

—'বেড়ে সাহস লোকটার!'

কোম্পানির দিকে জোরে দৌড়ে আসতে লাগল আতার্শচিকোভ, হাসির ঝলক তার মুখে। হাত নাড়তে লাগল, হাসতে লাগল।

—'জোরে, ক্যাপ্টেন! জোরে।' সবাই চিৎকার করতে লাগল।

একটিমাত্র গুলির শব্দ ছিটকে এল প্রাসাদের ফটকের দিক থেকে। হাতদুটো শূন্যে ছুঁড়ে হোঁচট খেল আতার্শচিকোভ, তারপর পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে, উঠে দাঁড়াবার জন্যে চেষ্টা করে চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। যেন কারও নির্দেশ পেয়ে গোটা কোম্পানি ঘুরে দাঁড়াল প্রাসাদের দিকে। মেসিনগানাররা ফটকের দিকে তাক করে মেসিনগান ঘোরাল। ফিতে ঘোরার ঘড় ঘড় আওয়াজ উঠল। কিন্তু পাইন কাঠের বেড়ার আড়ালে জনপ্রাণীও নজরে পড়ল না। তাড়াতাড়ি কোম্পানি আবার সার বেঁধে জোর পায়ে এগিয়ে চলল। শেষ দলের দুজন কসাক গিয়েছিল আতার্শচিকোভের কাছে তারা এসে দলের সঙ্গে মিশল; গোটা কোম্পানি যাতে শুনতে পায় তেমন জোরে, তাদের একজন চেঁচিয়ে বলল :

—'গুলিটা ঠিক বাঁ কাঁধের নীচে বিঁধেছে। খতম হয়ে গিয়েছে!'

কোম্পানির পা ফেলার আওয়াজ উঠল জোর, কঠিন। কালো জুলপিওয়ালা জাহাজী হাঁক দিল :

—বাঁ দিকে ঘোর...এগিয়ে চল!'

স্তব্ধতার আবরণে ঢাকা, জনমানবহীন, জবুথবু বিশাল রাজপ্রাসাদ ছেড়ে, চাকার ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলল বাঁ দিকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

দুদিন ধরে পেছনে হঠছিল বার নম্বর কসাক রেজিমেণ্ট। আস্তে আস্তে আসছিল তারা, প্রতিপদে লড়াই করতে হচ্ছিল, তবু তারা হঠে আসছিল। উঁচুনীচু, এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে আসছিল রুশ আর রুমানীয় বাহিনীর মালপত্তরের গাড়ি-গুলো। হঠে আসা বাহিনীগুলোর পাশের দিকে গভীর আক্রমণ চালিয়ে জার্মান-অস্ট্রীয় যুক্ত ডিভিসনগুলো ঘিরে ফেলল, ঘেরের মুখ বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করতে লাগল।

বার নম্বর রেজিমেণ্ট, আর ঠিক তার পাশের রুমানীয় ব্রিগেডটা ঘেরাও হয়ে পড়ার বিপদ দেখা দিয়েছে, এ খবরটা ব্যাপক হয়ে পড়ল সন্ধ্যের দিকে। রাত্রে নির্দেশ এল, পার্বত্য জাতিদের নিয়ে গড়া ডিভিসনের কামানগুলোর সাহায্যে, উপত্যকার নীচের দিকের অঞ্চলে, পেছনের ঘাঁটি আগলে বার নম্বর রেজিমেণ্টকে দাঁড়াতে হবে। পাহারা দাঁড় করিয়ে, এগিয়ে আসা শত্রুর জন্যে প্রস্তুত হল রেজিমেণ্ট।

সেই রাত্রে গোপন পাহারার ভার পড়ল মিশা কোশেভয়, আর আলেক্সি বিয়েশ্নিক নামে তাতার্স্কি গ্রামের আর একজন কসাকের ওপর। এক পরিত্যক্ত কুয়োর ধারে খোলা জায়গায় তারা গা-ঢাকা দিয়ে রইল, তুষার মেশানো হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। থেকে থেকে একঝাঁক বুনো রাজহাঁস মেঘাচ্ছন্ন আকাশে উড়ে যেতে লাগল, উদগ্র চিৎকারে ওড়ার নিশানা দিতে লাগল। ধূমপান নিষেধের নির্দেশে চটেমটে সঙ্গীর কাছে ফিসফিস করে মিশা কোশেভয় বলতে শুরু করল :

—'এ এক অদ্ভুত জীবন, আলেক্সি! মানুষ পথ হাতড়ে হাতড়ে হাঁটে, সবাই যেন অন্ধ; এর সঙ্গে ওর দেখা হয়, আবার দুজন দুদিকে চলে যায়, কখনো কখনো এ ওকে মাড়িয়ে যায়...এখানে এই মৃত্যুর কিনারায় তুমি বসে আছ, আর নিজেকে কঠোরভাবে এ প্রশ্ন না করে পারো না; কেন? এসব কিসের জন্যে? আমার তো মনে হয় না, মানুষের চেয়ে আরও ভয়ংকর কোনো কিছু দুনিয়ায় আছে: যাই কর না কেন, মানুষের মনের তল তুমি পাবে না...এখানে এই আমি তোমার পাশে শুয়ে আছি, আর তুমি কি ভাবছ তা আমি জানি না, কোনদিন জানতামও না; কোন ধরনের জীবন তুমি পেছনে ফেলে এসেছ তাও আমি জানি না, আর আমার সম্পর্কেও বেশি কিছু তুমি জানো না .. হয়তো আমি তোমাকে এখন খুন করতে চাইছি, আর তুমি আমাকে বিস্কুট এগিয়ে দিচ্ছ, কি ভাবছি তার ধারণাও তোমার নেই।...নিজেদের সম্পর্কে সামান্যই জানে লোকে। গরমকালে আমি ছিলাম হাসপাতালে। আমার পাশে ছিল মস্কোর এক সেপাই। দিনরাত সে আমাকে জিজ্ঞেস করত, কসাকরা কেমন করে থাকে, কি খায়, আরও কত রকম, তা খোদাই জানে। তাদের বিশ্বাস, চাবুক ছাড়া আর কিছু চেনে না কসাকরা; তারা ভাবে কসাক হচ্ছে অসভ্য বর্বর, তার মন ত নয়, বোতলের ভোঁতা কাঁচ।

তবু আমরা তো তাদের মতই মানুষ, তাদের মতই নারী ও যুবতীকে ভালবাসি; নিজেদের দুঃখে আমরা কাঁদি, কিন্তু পরের আনন্দে উল্লসিত হই না। তোমার কি মনে হয়, আলেক্সি? খুবেই ছেলেমানুষ আমি, কিন্তু জীবনের কি উদগ্র ক্ষুধা আমার; যখন ভাবি, দুনিয়ায় কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে আছে, তখন আমার বুকের মধ্যে টনটন করে..মেয়েদের সম্পর্কে এত কোমল হয়ে পড়েছি যে, ব্যথা পাবার জন্যে তাদের সকলকেই আমি ভালবাসতে পারি। লম্বা হোক, বেঁটে হোক, মোটা কিংবা রোগা হোক, যতকাল সুশ্রী থাকবে, তাদের সঙ্গেই আমি রাত কাটাতে পারি। কিন্তু জীবনে শুধু একসঙ্গে একটিকেই মাত্র পাওয়া যায়, যতদিন না মরবে, যতদিন না সে তেতো হয়ে উঠবে, ততদিন তার সঙ্গে ঘর করতে হবে। আর তারপরেই ওরা যুদ্ধ শুরু করার কথা ভাবল, আর...'

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল মিশা কোশেভয়; আকাশের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে, স্বপ্নাতুরের মত মৃদু হেসে, চুপ করে রইল। হিমকঠিন, দুরধিগম্য প্রশান্ত মাটিকে জড়িয়ে ধরল দু হাতে।

পাহারা বদল হয়ে ছাড়া পাবার একঘণ্টা আগে জার্মানরা তাদের ধরে ফেলল। একটা মাত্র গুলি ছুঁড়তে পেরেছিল বিযেশ্‌নিক; দাঁত কড়মড় করতে করতে, মৃত্যু-যন্ত্রণায় মোচড়াতে মোচড়াতে, তারপর মাটিতে পড়ে গেল। এক জার্মান বেয়নেটে তার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল, ফুসফুস ফুটো হয়ে গেল, শিরদাঁড়ায় গিঁথে গিয়ে বেয়নেটটা থরথর করে কেঁপে উঠল। কুঁদোর ঘা খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল কোশেভয়। এক পালোয়ান জার্মান আধ মাইল তাকে কাঁধে করে নিয়ে এল। মিশার জ্ঞান হল, মনে হল রক্ত মাথায় উঠেছে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সে, তারপর শক্তি সঞ্চয় করে, অল্প আয়াসেই জার্মানটার পিঠ থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। তারদিকে একসঙ্গে গুলি ছুঁড়ল সবাই, কিন্তু অন্ধকার আর ঝোপঝাড়ের জন্যে তার সুবিধে হল, সে পালিয়ে এল।

॥ দুই ॥

হটে আসা বন্ধ হওয়া, আর ঘেরাও থেকে রুমানিয় বাহিনী বেরিয়ে আসার পর বার নম্বর রেজিমেণ্টকে পেছনে সরিয়ে আনা হল। পলাতকরা যাতে গলিয়ে যেতে না পারে, তার জন্য রাস্তা বন্ধ করে ঘাঁটি বসানোর নির্দেশ দেওয়া হল। দরকার হলে গুলি করে তাদের থামাতে হবে, ধরা পড়লে পাহারা দিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হবে।

ঘাঁটি বসানোর কাজে প্রথম যাদের পাঠানো হল মিশা কোশেভয় তাদের মধ্যে একজন। সে, আর তিনজন কসাক সকালবেলায় গ্রাম ছেড়ে চলে এল, রাস্তার কাছাকাছি একটা বাজরার ক্ষেতের কোণায় লুকিয়ে রইল। বনের ধার দিয়ে রাস্তাটা বরাবর এগিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে একটা গড়িয়ে চলা চষা উপত্যকার মধ্যে। তারা পালা করে নজর রাখতে লাগল। দুপুরবেলায় দেখতে পেল, রাস্তা ধরে জনদশেক সৈন্য আসছে তাদের দিকে। বনের ধারে এসেই তারা থামল, সিগারেট ধরাল, স্পষ্টই বোঝা গেল, কোন রাস্তায় যাবে তাই আলোচনা করল, তারপর এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিল।

—'চেঁচিয়ে ডাকব নাকি?' বাজরার ক্ষেতের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আর সবাইকে জিজ্ঞেস করল কোশেভয়।

—'মাথার ওপর দিয়ে গুলি চালাও।'

—'এই, কে যায়! থামো!'

কসাকদের প্রায় দুশ হাতের মধ্যে এসে পড়েছিল সৈন্যরা; ডাক শুনতে পেয়ে, মুহূর্তের জন্যে থামল, তারপর আবার আস্তে আস্তে এগুতে লাগল।

—'থামো!' শূন্যে গুলি চালিয়ে একজন কসাক চিৎকার করে উঠল।

বন্দুক ছে'চড়াতে ছে'চড়াতে তারা আস্তে আস্তে চলা সৈন্যদের ধরে ফেলবার জন্যে ছুটল।

—'থামো নি কেন, এ্যাঁ? আসছ কোত্থেকে? কোথায় যাচ্ছ? ছাড়পত্তর দেখাও!' ঘাঁটির ভার ছিল যে সার্জেণ্টের ওপর, সে চিৎকার করে বলল।

সৈন্যরা থামল। আস্তে আস্তে রাইফেল খুলে নিল তিনজন। একজন ঝুঁকে পড়ে, একটা বুটের ওপরের অংশের সঙ্গে নীচের অংশটা বাঁধা সুতোয় নতুন করে গি'ট দিল তারা সবাই অবিশ্বাস্য রকমের নোংরা, আর ছে'ড়া পোশাক পরা। স্পষ্টই বোঝা গেল, রাত কাটিয়েছে কোন বনের মধ্যে আগাছার ঝোপের পাশে, কারণ গ্রেট-কোটের গায়ে গায়ে বাদামি রঙের চোরকাঁটা খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে। দুজনের মাথায় পদাতিক দলের টুপি, অন্যদের মাথায় লোমের টুপি, কান-ঢাকবার বোতাম নেই, দড়িগুলো পতপত করে উড়ছে। একজন লম্বা, কু'জোমত সৈন্যকে দলের পাণ্ডা মনে হল; তার গর্তে-ঢোকা গাল দুটো কাঁপছে। মারাত্মক স্বরে সে চেঁচিয়ে উঠলঃ

—'কি চাও তোমরা? কোন ক্ষতি করেছি তোমাদের? কেন আমাদের পিছু নিয়েছ?'

—'তোমাদের ছাড়-পত্তর!' গলার স্বর কঠিন করে ধমক দিল সার্জেণ্ট।

নীল-চোখ, নতুন পোড়া ইটের মত লাল টকটকে চেহারার একজন সৈনিক পকেট থেকে হাত-বোমা টেনে বার করল। সার্জেণ্টের মুখের সামনে সেটা নাচিয়ে, সঙ্গীদের দিকে একবার ফিরে তাকাল, তারপর ইয়ারোশ্লাভ বুলিতে তড়বড় করে বলতে শুরু করল :

—'এই যে আমার ছাড়-পত্তর! এই যে! এতেই এ বছরের মত ছাড়-পত্তরের কাজ চলবে! নিজের কথা ভাবো, যদি এটা ছুঁড়ি, তাহলে পরে কুড়িয়ে নেবার মত হাড়গোড়ও থাকবে না। বুঝতে পারলে? মাথায় ঢুকল?'

—'ইয়ার্কি রাখ!' সার্জেণ্ট ভুরু কু'চকে তার বুকে একটা খোঁচা মারল, 'ইয়ার্কি রাখ, ভয় দেখানোর চেষ্টাও করো না। এর মধ্যেই যথেষ্ট ভয় পেয়ে গেছি। কিন্তু বাপু যদি পলাতক হও, তাহলে ঘাঁটিতে ফিরে চল। তোমাদের মত লোককেই সেখানে জড় করা হচ্ছে।'

এ ওর দিকে তাকিয়ে বন্দুক খুলে নিল সৈন্যরা। তাদের মধ্যে একজন লম্বামত, রোগাটে—দেখলেই চেনা যায় খনিমজুর—বে-পরোয়া দৃষ্টিতে কসাকদের দিকে তাকিয়ে চাপা-গলায় বলে উঠল:

—'বেয়নেটের সোয়াদ বুঝিয়ে দেব কিন্তু, দিব্যি গেলে বলছি! ভাগো এখান থেকে! নইলে যে আগে এগিয়ে আসবে, তাকেই গুলি খেতে হবে।'

নীলচোখো সৈন্যটি হাত-বোমাটা মাথার ওপরে ঘোরাল; লম্বামত কু'জো লোকটি সার্জেণ্টের গ্রেট-কোটের গায়ে মরচে-ধরা বেয়নেটের খোঁচা লাগাল; খনিমজুরটা

কোশেভয়ের দিকে তাক করে বন্দুকের বাঁট দোলাল। এক বেঁটেমত সৈন্যের গ্রেট-কোটের কোনা ধরে একজন কসাক হাতের কাছে টেনে আনল, ভয়ে ভয়ে সে পেছনে তাকাতে লাগল, পাছে পেছন থেকে কোন আঘাত এসে পড়ে।

জনারের শুকনো পাতায় মর্মরধ্বনি বেজে উঠল। আর গড়িয়ে চলা উপত্যকা পেরিয়ে, বহুদূরের নীল, তরঙ্গায়িত পাহাড়ের রেখাটা মাথা তুলল। গ্রামের কাছাকাছি, ঘাসজমিতে লাল, বাদামী গরুগুলো চরে বেড়াচ্ছে। বরফমেশানো ধুলোর ঘূর্ণিঝড় বাতাসের ঝাপটায় বন পেরিয়ে উড়ে গেল। নিদ্রাতুর শান্তিঢালা, নিরুদ্বেগ নভেম্বরের দিন; অনুজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত গ্রামপ্রান্তরে এক স্বর্গীয় প্রশান্তি ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এই রাস্তার ওপারেই এক অবর্ণনীয় ক্রোধে মানুষেরা ধস্তাধস্তি করছে; বীজ বোনা উর্বর, বৃষ্টির জলে পরিতৃপ্ত এই মাটির বুক বিষিয়ে দেবার প্রস্তুতি চলেছে।

সবার উন্মাদনা একটু কমল। সৈন্যরা আর কসাকরা কিছুটা শান্ত হয়ে কথাবার্তা শুরু করল। মিশা কোশেভয় চটে মটে বলল:

—'মাত্র তিনদিন আগে আমাদের ঘাঁটি থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে। কই, আমরাত পেছনে পালিয়ে আসিনি! তোমরা পালাচ্ছ, লজ্জা করে না! সঙ্গীসাথীদের ফেলে যাচ্ছ! ফ্রণ্ট আগলাবে কে? আমারই বন্ধু বেয়নেটের খোঁচা খেয়ে মরেছে আমার পাশে, আর তোমরা বলছ, যুদ্ধের স্বাদ আমরা পাইনি। আমরা যে স্বাদ পেয়েছি, তোমাদেরও পেতে হবে!'

—'এত কথার দরকারটা কি?' একজন কসাক বাধা দিল। 'তর্ক না করে চল এখন বড়কর্তাদের কাছে।'

—'পথ ছেড়ে দাও, কসাকরা! নইলে, গুলি চালাব আমরা, দিব্যি গেলে বলছি, গুলি চালাব!' ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে একজন সৈনিক বলে উঠল। অসহায়ের মত হাত দুটো মেলে ধরল সার্জেণ্ট।

—'তা আমরা পারব না, ভাই! ইচ্ছে হয় খুন কর, কিন্তু তবু তোমরা যেতে পাবে না; ওই গ্রামেই আমাদের কোম্পানির ঘাঁটি...'

লম্বামত, কুঁজো লোকটি কখনো ভয় দেখাতে লাগল, কখনো তোষামোদ করতে লাগল, কখনো আবার বিনীত হয়ে অনুরোধ জানাতে লাগল। অবশেষে সে ঝুঁকে পড়ল, নোংরা ঝুলি থেকে একটা বোতল টেনে বার করল, কোশেভয়কে চোখ ঠেরে চাপা স্বরে বলল:

—'আমরা টাকা দেব; আর তাকিয়ে দেখ...জার্মান ভদ্‌কা...আরও কিছু যোগাড় করে দেব। যিশুর দিব্যি, আমাদের যেতে দাও। বাড়িতে ছেলেপুলে আছে, নিজেরাইত বোঝ কেমন লাগে...একেবারে ভেঙে পড়েছি আমরা, মনের বাসনায় কুরে কুরে খেয়েছে... আর কতকাল এ সহ্য করা যায়? ভগবান! তোমরা পথ আটকাবে না নিশ্চয়ই?' বুটের ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি সে থলেটা বার করল, দুখানা ময়লা কেরেন্‌স্কির এক রুবলের নোট নিয়ে জোর করে কোশেভয়ের হাতে গুঁজে দিতে লাগল। নাও নাও! যিশুর দিব্যি...! কিছু ভেবোনা...কোনরকমে পথ করে চলে যাব। টাকাটা কিছু নয়...টাকা ছাড়াই আমরা চালিয়ে নেব। নাও! আরও কিছু দেব আমরা...'

লজ্জায় লাল হয়ে, হাতখানা পেছনে করে, মাথা নাড়তে নাড়তে পিছিয়ে এল কোশেভয়। মুখে রক্ত ঝলক দিয়ে উঠল, চোখে জল ঠেলে এল। মনে মনে ভাবল: 'বিয়েশ্‌নিকের মৃত্যু আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে।! নইলে, আমি নিজে যুদ্ধের

বিরোধী, অথচ এদের গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করছি। কি অধিকার আছে আমার? এখানে কি করছি আমি? কি নীচ, কি জঘন্য আমি।'

সার্জেণ্টের কাছে গিয়ে মিশা একপাশে ডেকে নিয়ে গেল তাকে, তার চোখের দিকে না তাকিয়ে বলল:

—'ছেড়ে দিইনা কেন ওদের? কি বল তুমি? যাক গে ওরা।'

সার্জেণ্ট এমনভাবে তাকাতে লাগল, যেন কি এক লজ্জার ব্যাপার করছে। উত্তর দিল:

—'যাকগে ওরা...! ওদের নিয়ে কি এমন কচু করব আমরা? শিগ্‌গীরই আমাদেরও অমনি করতে হবে...লুকোবার চেষ্টা করে লাভ কি?'

সৈন্যদের দিকে ফিরে সে রাগতভাবে চেঁচিয়ে উঠল:

—'হারামজাদারা! তোদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছি, মানসম্মান রেখে চলছি, আর তোরা কিনা টাকার গরম দেখাচ্ছিস! তোরা কি ভাবিস, আমাদের টাকার অভাব?' রাগে আগুন হয়ে সে চেঁচাতে লাগল, 'সরিয়ে নে টাকা, নইলে টানতে টানতে ঘাঁটিতে নিয়ে যাব...'

কসাকরা সরে দাঁড়াল। এগিয়ে চলল সৈন্যরা। দূর গ্রামের জনশূন্য রাস্তার দিকে ফিরে তাকিয়ে, পলাতকদের লক্ষ্য করে চিৎকার করে কোশেভয় বলল:

—'এই! গাধার দল! দিনের আলোয় যাচ্ছ কিসের জন্যে? ওই ত বন রয়েছে ওখানে; দিনটা ওখানে কাটাও, রাতে পথ চলো। নইলে, অন্য ঘাঁটির হাতে পড়বে, তারা কিন্তু ধরবে।'

কি করবে বুঝতে না পেরে চারধারে তাকাল সৈন্যরা, তারপর সার বেঁধে মর্মরিত বনের দিকে এক পাল নেকড়ের মত এগুতে লাগল।

॥ তিন ॥

নভেম্বরের মাঝামাঝি কসাক সৈন্যদের কানে পেত্রোগ্রাদের বিপ্লবের গুজব এসে পৌঁছুতে লাগল। ওপরওয়ালাদের আর্দালিরা, যারা সাধারণত বেশি খবর রাখে, তাদের কাছ থেকে পাকা খবর মিলল যে অস্থায়ী সরকার আমেরিকায় পালিয়েছে; তারা বলল, জাহাজীদের হাতে ধরা পড়েছিল কেরেন্‌স্কি, তাকে একেবারে মাথা মুড়িয়ে, বেশ্যার মত আলকাতরা মাখিয়ে, দুদিন ধরে পেত্রোগ্রাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘোরানো হয়েছিল।

পরে যখন অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ এবং বলশেভিকদের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার সরকারী খবর এল, তখন কসাকরা শান্ত হয়ে গেল, কিন্তু উদ্বিগ্ন রইল। যুদ্ধ শেষ হবে এই আশাতেই অনেকে উল্লসিত হল। কিন্তু কেরেন্‌স্কির সঙ্গে অশ্বারোহীরা পেত্রোগ্রাদের দিকে এগুচ্ছে, আর দক্ষিণ থেকে কালেদিন কসাক রেজিমেণ্ট নিয়ে চাপ দিচ্ছে, এই গুজবের প্রতিধ্বনি শঙ্কা জাগিয়ে তুলল।

ফ্রণ্ট ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। অক্টোবরে সৈন্যরা পালাচ্ছিল এলোমেলো, ছাড়া-ছাড়া দলে; কিন্তু ডিসেম্বরের গোড়া থেকে পুরো কোম্পানি, রেজিমেণ্ট আর ডিভিসন-

গুলো জায়গা ছেড়ে দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে পিছিয়ে আসতে লাগল; কখনো কখনো তারা আসতে লাগল শুধু হালকা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, কিন্তু প্রায়ই বেশির ভাগ তারা সঙ্গে নিয়ে আসতে লাগল রেজিমেণ্টের সম্পত্তি; গুদাম ভেঙ্গে, অফিসারদের গুলি করে, পথে পথে লুটপাট করতে করতে, বাঁধ-ভাঙা, ঝড়ো উদ্দাম বন্যার মত তারা ফিরতে লাগল দেশ-গাঁয়ের দিকে।

এই নতুন অবস্থায় বার নম্বর রেজিমেণ্টের পলাতকদের আটকাবার কাজ অর্থহীন হয়ে পড়ল। পদাতিকদল হটে আসার ফলে যে ফাঁক আর ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল, তা আটকাবার ব্যর্থ চেষ্টায় তাদের ফের ফ্রণ্টে পাঠিয়ে, আবার ডিসেম্বরে পেছনে নিয়ে আসা হল; পাঠিয়ে দেওয়া হল কাছের রেল স্টেশনে; রেজিমেণ্টের সমস্ত সম্পত্তি, মেসিন-গান, বাড়তি গোলাবারুদ আর ঘোড়াগুলো গাড়িতে চাপিয়ে তারা যাত্রা করল সংগ্রাম-জর্জর রাশিয়ার হৃদপিণ্ডের দিকে।

ইউক্রেনের মধ্যে ডনের দিকে এগিয়ে চলল বার নম্বর রেজিমেণ্টের গাড়ি। ঝুনামেংকার অনতিদূরে বলশেভিকরা তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করল। আপোস-আলোচনা চলল আধঘণ্টা ধরে। মিশা কোশেভয় আর কোম্পানির বিপ্লবী কমিটির আর পাঁচজন কসাক সভাপতি অস্ত্রশস্ত্রসমেত এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইল:

—'অস্ত্রশস্ত্র' দিয়ে কি করবে তোমরা?' স্টেশন-সোবিয়েতের সদস্যরা জিজ্ঞেস করল।

সবার হয়ে কোশেভয় উত্তর দিল:

—'আমাদের বুর্জোয়া আর জেনারেলদের জবাই করব। কালেদিনের লেজ কাটব!'

ট্রেন এগুতে দেওয়া হল। ক্রেমেনচুগে আবার তাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা হল। যখন কসাকরা কামরার খোলা দরজায় মেসিনগান বসিয়ে স্টেশনের দিকে তাক করল, আর কসাক কোম্পানিরা সার বেঁধে লাইন বরাবর শুয়ে রণংদেহি মূর্তি ধরল, একমাত্র তখনই তাদের যেতে দেওয়া হল। ইয়েকাতেরিনোশ্লাভে এসে একদল রেড-গার্ডের সঙ্গে গুলি চালাচালি করেও কোনো লাভ হল না; আংশিকভাবে রেজিমেণ্টকে নিরস্ত্র করা হল: মেসিনগান, একশ বাক্সেরও বেশি গুলিবারুদ, টেলিফোনের যন্ত্রপাতি, আর কিছু তারের বাণ্ডিল বাজেয়াপ্ত করা হল। অফিসারদের গ্রেপ্তার করার প্রস্তাবে কসাকরা অসম্মতি জানাল। সারা রাস্তায় তারা একটিমাত্র অফিসারকে হারাল, সে এক এড্‌জুটাণ্ট। কসাকরা নিজেরাই তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল।

চ্যাপলিনের কাছে দুর্ঘটনার ফলে রেজিমেণ্টকে লড়াইতে জড়িয়ে পড়তে হল। লড়াই বেধেছিল সন্ত্রাসবাদী আর ইউক্রেনীয়দের মধ্যে। তিনজনকে হারাতে হল। কি এক সার্প-স্ন্যাটার ডিভিসনের সৈন্যবাহিনী ট্রেনে আটকা-পড়া-লাইন অতিকষ্টে পরিষ্কার করে, নিছক গায়ের জোরে তারা বাধা ভেঙে বেরিয়ে এল।

॥ চার ॥

তিনদিন পরে রেজিমেণ্টের এক নম্বর সেকসন মিল্লেরোভো স্টেশনে ট্রেন থেকে নামল। অর্ধেক লোক দল ছেড়ে সোজা বাড়ির দিকে রওনা হল। আর বাদবাকি সুশৃংখল-ভাবে কারগিন্ গ্রামে এসে পেঁছুল। পরদিন তারা যুদ্ধে পাওয়া স্মারক-চিহ্ন, আর অস্ট্রিয়ানদের হাত থেকে দখল করা ঘোড়াগুলো বেচে দিল, রেজিমেণ্টের টাকাকড়ি আর সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল।

সন্ধ্যের সময় কোশেভয় আর তাতাস্কর্ গ্রামের অন্যান্য কসাকরা গ্রামের দিকে রওনা হল। একটা পাহাড়ের ওপরে উঠতে হল ঘোড়ায় চেপে। নীচে চীর নদীর বরফের মত সাদা, আঁকাবাঁকা পাড়ে ছড়িয়ে আছে কারগিন গ্রাম, ডনের উজানে সবচেয়ে সুন্দর গ্রাম। কারখানার চোঙা থেকে ধোঁয়ার এলোমেলো স্তূপ উঠছে, বারোয়ারিতলায় কালো কালো মানুষের ভিড় জমেছে. সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টা বাজছে। কারগিন গ্রামের উৎরাই পেরিয়ে ক্লিমোভ্স্কি গ্রামের কাছের উইলোর মাথাগুলোও চোখে পড়ছে। তাদেরও পেছনে বরফে ঢাকা দিগন্তের সবুজ-নীলে অস্তসূর্যের দীর্ঘায়িত রশ্মি ঝলমল করে উঠছে, মেঘাচ্ছন্ন বিষণ্ণতায় ধূমায়িত হয়ে উঠছে।

তিনটে আপেল-গাছ গজানো একটা ন্যাড়া ঢিবি পেরিয়ে গেল আঠারজন ঘোড়-সওয়ার. জিনের মচ্‌মচি তুলে জোর কদমে ছুটতে লাগল উত্তর পূবে। পাহাড়ের সারের পেছনে বরফাচ্ছন্ন রাত্রি চোরের মত ঘাপটি মেরে আছে। মুখ ঢাকা দিয়ে নিয়ে, থেকে থেকে ঘোড়াগুলোকে তাড়া দিয়ে, কসাকরা ধাপে ছুটিয়ে দিতে লাগল। শক্ত কঠিন রাস্তায় প্রায় যন্ত্রণার মতই ঘোড়ার খুরের খটাখট্ আওয়াজ উঠতে লাগল। ঘোড়ার খুরের নীচে দিয়ে রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে স্রোতের মত বয়ে যেতে লাগল। গলতে শুরু করায় মসৃণ, ঝকমকে. চাঁদের আলোর প্রতিফলনে তরল, সাদা ধবধবে বরফ, কাপড়ের পাড়ের মত দুপাশে সরে সরে যেতে লাগল।

নিঃশব্দে কসাকরা ঘোড়াগুলোকে তাড়া দিতে লাগল। রাস্তা ছুটতে লাগল দক্ষিণে। পূবে এক বনের বলয়রেখা। রাস্তার পাশে পাশে বরফের ওপরে খরগোসের পায়ের ছোট ছোট দাগ চোখে পড়তে লাগল। স্তেপের মাথার ওপরে ঝকমকে জড়োয়া কাজকরা কসাক কোমরবন্ধের মত ছায়া-পথ আকাশকে জড়িয়ে রইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

১৯১৭ সালের শরতের শেষে গ্রামে ফিরতে লাগল কসাকরা। প্রৌঢ় খ্রিস্তোনিয়া, আর যে তিনজন কসাক বাহান্ন নম্বর রেজিমেণ্টে ঢুকেছিল, তারা ফিরে এল। আনিকুশ্‌কা ফিরে এল, গোলন্দাজ ইভান তোমিলিন ও ইয়াকোব পোদ্‌কোভা ফিরে এল। তাদের পর এল মার্তিন শামিল, ইভান আলেক্সিয়েভিচ, ঝাখার কোরোলিওভ, আর লম্বা ঢ্যাঙা বোর্শচেভ্‌। ডিসেম্বর মাসে অপ্রত্যাশিতভাবে হাজির হল মিত্‌কা কোরশুনোভ। আর এক সপ্তাহ পরে এল বার নম্বর রেজিমেণ্টের একটা গোটা দল: মিশা কোশেভয়, প্রোখোর ঝিকোভ্‌, ইয়েপিফান্‌ মাক্‌সায়েভ্‌, আন্‌দ্রি কোশুলিন, আর ইয়েগোর্‌ সিনিলিন। রেজিমেণ্ট থেকে ছট্‌কে পড়েছিল বোদোভ্‌স্কোভ, এক অস্ট্রিয়ান অফিসারের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া একটা চমৎকার বাদামি রঙের ঘোড়ায় চেপে সে এল সোজা ভোরোনেঝ্‌ থেকে। পরে সে দিনরাত গল্প করে বেড়াতে লাগল, কেমন করে ভোরোনেঝ্‌ প্রদেশের বিপ্লব বিক্ষুব্ধ গ্রামগুলোর ভেতর দিয়ে গলিয়ে এসেছে, শুধু ঘোড়াটার তাকদের ভরসাতেই কেমন করে রেড-গার্ডদলের নাকের ওপর দিয়ে পালিয় আসতে পেরেছে। তারপর এল মার্কুলোভ, পিয়োত্রা মেলেখফ আর নিকোলাই কোশেভয়। নিকোলাই পালিয়ে এসেছে বলশেভিক হয়ে যাওয়া সাতাশ নম্বর রেজিমেণ্ট থেকে। তারাই খবর দিল হালে গ্রিগর মেলেখফ ছিল দু নম্বর সংরক্ষিত কসাক রেজিমেণ্টে, সে বলশেভিকদের দলে চলে গিয়েছে, কামেন্‌স্কাতেই রয়ে গিয়েছে। তারা পেছনে রেখে এসেছে সেই দাগী ঘোড়া-চোর মাক্সিম্‌ গ্রিয়াঝ্‌নোভকেও: অশান্তিময় দিনকালের অভিনবত্ব আর হাটেমাঠে দিনকাটানোর সম্ভাবনায় সে বলশেভিকদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তারা বলল, মাক্সিম এক অদ্ভুত কুৎসিৎ ঘোড়া বাগিয়েছে অদ্ভুত তার স্বভাব এক গোছা রুপোলি চুল পিঠ বরাবর চলে গিয়েছে, বিশেষ কোন ভাল জাতেরও নয় লম্বা ঢ্যাঙা, রংটাও গাইগরুর মত লাল। গ্রিগরের বিশেষ কোন উল্লেখ করল না তারা। স্পষ্টই বোঝা গেল, উল্লেখ করতে তারা অনিচ্ছুক। তারা জানে আজ তার পথ গ্রামের পথের বিপরীত দিকে গিয়েছে, দুটো পথ আবার পাশাপাশি মিলবে কি না তা অনিশ্চিত।

কসাকরা যে সব বাড়ি-ঘরে গৃহস্বামী অথবা সম্ভাব্য অতিথি হয়ে ফিরে এল, সেই সব বাড়ি ঘর আনন্দ উল্লাসে পূর্ণ হয়ে উঠল। যারা চিরকালের জন্যে আত্মীয়, প্রিয়জনকে হারিয়েছে তাদের গভীর বেদনায়, আরও তীব্র, আরও নির্মমভাবে প্রকট হয়ে উঠল সেই আনন্দ উল্লাস। কত কসাক হারিয়ে গেল, কত কসাক ছড়িয়ে রইল গ্যালিসিয়া, বুকোভিনা, পূর্ব-প্রুসিয়া, কার্পেথিয়া, রুমানিয়ার হাটে মাঠে—তাদের মৃতদেহ পড়ে রইল, কামানের শোক গর্জনের মধ্যে পচে গলে মাটিতে মিশতে লাগল। বন্ধুদের হাতে গড়া কবরের ঢিবিগুলো এতদিনে আগাছায় ভরে উঠল, তাদের গায়ে

বৃষ্টির ধারা নামল, বাতাসের ঝাপটায় ওড়া বরফের স্তূপে কবরগুলো ঢেকে গেল। কসাক নারীরা এলোচুলে বারবার উঠোনের কোণে ছুটে গিয়ে, চোখের ওপরে হাত রেখে যতই দূরে তাকাক না কেন, প্রিয়জনের ফিরে আসা দেখবার ভাগ্য এ জীবনে তাদের আর কখনো হবে না। জন্মদিন, আর শ্রাদ্ধবাসরে যতই তারা কাঁদুক না কেন, পুবালি হাওয়া তাদের সেই কান্না কখনো বয়ে নিয়ে যাবে না গ্যালিসিয়া, পূর্ব-প্রুশিয়ার বন্ধুদের হাতে গড়া সেই আগাছায় ঢাকা, ঢিবিগুলোতে।

কবরে ঘাস গজায়, বেদনায় সময়ের পলি পড়ে। যারা চলে গেল, তাদের চিহ্ন উড়িয়ে নিয়ে গেল বাতাসে; প্রিয় পরিজনকে দেখার জন্যে যারা বেঁচে রইল না—যারা বাঁচল না, তাদের স্মৃতি, আর সেই রক্তাক্ত বেদনা সময় ভুলিয়ে দেবে, কারণ, মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত, পৃথিবীর আলোহাওয়ায় বিচরণের মেয়াদও কারুর দীর্ঘ নয়।

প্রোখোর শামিলের বউ যখন দেখে, তার দেওর মার্তিন শামিল পোয়াতি বৌকে বুকে জড়িয়ে ধরে, কিংবা ছেলেমেয়েদের জিনিসপত্তর দেয়, আদর করে, তখন সে শক্ত মাটিতে মাথা কোটে, ঘরের মেঝের মাটি দাঁত দিয়ে কামড়ে তোলে। আছাড়িপিছাড়ি খায়, হাতে পায়ে ভর দিয়ে ঘরের মেঝেয় হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়, আর তার একপাল ভেড়ার মত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে চারপাশ ঘিরে মাকে দেখে আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দেয়।

কাঁদো, কাঁদো ডুকরে কেঁদে ওঠো, অভাগিনী! আনন্দহীন, দুর্বহ জীবনের ফলে যে কটি চুল অবশিষ্ট আছে, তাই মুঠোমুঠো করে ছেঁড়ো; দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াও যতক্ষণ না রক্ত কেটে পড়ে; কাজ করে করে ক্ষতবিক্ষত হাত দুখানা মোচড়াও, শূন্য ঘরের মেঝেতে যত খুশি মাথা কোটো! তোমার ঘরের মালিক আজ নিরুদ্দেশ, তোমার স্বামী নিরুদ্দেশ, তোমার ছেলে মেয়েরা বাপকে হারিয়েছে; আর মনে রেখো, তোমাকে কিংবা তোমার অনাথ শিশুদের কেউ বুকে জড়িয়ে ধরবে না, ক্লান্ত হয়ে যখন এলিয়ে পড়বে, রাত্তিরে তখন কেউ আর তোমার মাথাটা বুকে চেপে ধরবে না, একদিন সে যেমন বলত, কেউ আর তেমন করে বলবে না, 'কিচ্ছু ভেবো না, আনিস্কা,' যা হক করে আমরা চালিয়ে নেব!' আর তোমার স্বামী জুটবে না, কারণ খেটে খেটে, ভাবনায় চিন্তায়, ছেলেমেয়ের ধকলে তুমি শুকিয়ে গিয়েছ, সারা মুখে খাঁজ পড়েছে। তোমার ওই অর্ধ-উলঙ্গ, শিকনি-গড়ানো ছেলে মেয়ের বাপ হতে কেউ এগিয়ে আসবে না। দুর্বহ পরিশ্রমে হাঁপাতে হাঁপাতে একাই তোমাকে চাষের কাজ, টানা হেঁচড়ার সমস্ত কাজ করে করে যেতে হবে। মাড়াইকল থেকে নিড়ুনি দিয়ে ডাঁটা পাতা সরিয়ে দিতে হবে, গাড়িতে বোঝাই করতে হবে, নিড়ুনির মাথায় গমের ভারী বোঝা ঠেলে তুলতে হবে, আর সেই সঙ্গেই তুমি বুঝতে পারবে তোমার তলপেটে কিসে যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলছে। তারপর তোমার ছেঁড়া কানি মুড়ি দিয়ে যন্ত্রণায় মোচড়া মুচড়ি করবে, রক্তস্রাব গড়িয়ে নামবে।

একটা পুরনো পা-জামা বার করে উল্টেপাল্টে শুঁকতে শুঁকতে বিয়েশ্‌নিকের মা আকুল হয়ে কাঁদল; মিশা কোশেভয়ই তার যে শেষ জামাটা ফিরিয়ে এনে দিয়েছিল, শুধু তারই ভাঁজে তার ঘামের কিছুটা গন্ধ খুঁজে পাওয়া গেল। তাতেই মাথা গুঁজে বুড়ী মা আছড়ে আছড়ে হাউ হাউ করে কাঁদল, চোখের জলে কালিঝুলিমাখা নোংরা জামাটা একেবারে ভিজিয়ে দিল।

সানিৎস্কোভ্, ওঝিয়েরোভ্, কালিনিন, লিখোভিদোভ্, ইয়েরমাকোভ ও আরও অনেকের পরিবার অনাথ হয়ে গেল।

শুধু স্তেপান আস্তাখফের জন্যে কেউ কাঁদল না। তার তক্তা-আঁটা, ধ্বসে পড়া, গ্রীষ্মকালেও থমথমে বাড়িখানা, খালি পড়ে রইল। আকসিনিয়া ইয়াগোদনোয়েই থাকে, তার কথা খুব কমই শুনতে পাওয়া যায়; গ্রামে সে কখনো পা দেয়নি, দেবার ইচ্ছেও তার নেই।

॥ দুই ॥

একের পর এক তরঙ্গের মত ডনের উজান-অঞ্চলের কসাকরা গ্রামে ফিরতে লাগল। ভিয়েশেনস্কা জেলার গ্রামগুলোয় প্রায় সবাই ফিরে এল ডিসেম্বরের মধ্যে। দশ থেকে চল্লিশজনের এক একটা করে দল দিনরাত তাতার্স্ক গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে লাগল। তারা এগুতে লাগল ডনের বাঁ-পাড়ের দিকে।

—'কোত্থেকে আসা হচ্ছে, সেপাইদের?' বুড়োরা বাইরে এসে জিজ্ঞেস করে।

—'চোর্নায়া রেচ্‌কা থেকে; ঝিমোভ্‌না থেকে; দুব্রোভ্‌কা থেকে; গোরোখোভ্‌স্কা থেকে।' একের পর এক উত্তর আসে।

—'লড়াই খতম করে এলে, তাহলে?' কেউ হয়ত খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করে।'

কোন ভালমানুষ, শান্তশিষ্ট ঘোড়-সওয়ার হয়ত উত্তর দেয়:

—'যথেষ্ট হয়েছে, দাদু! কিছু আর নেই আমাদের!'

কিন্তু বেশি বে-পরোয়া আর অশিষ্ট যে, সে গালাগাল দেয়, বুড়োদের উপদেশ দেয়:

—'যাও, যাও, ঘরে যাও, বুড়ো হাবড়ার দল। নিজেদের চরকায় তেল দাও গে! এত জিজ্ঞেসা কিসের জন্যে?'

শীতের শেষ দিকে নোভোচের্কাসের কাছাকাছি গৃহযুদ্ধের সূচনা দেখা দিল, কিন্তু ডনের উজানের গ্রামগুলোয় এক শ্মশানের স্তব্ধতা জেগে রইল। শুধু এক আভ্যন্তরীন, গোপন-বিরোধ ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল কসাকদের ঘরে ঘরে, মাঝে মাঝে তা বাইরেও প্রকাশ হয়ে পড়তে লাগল। ফ্রন্ট থেকে ফিরে আসা কসাকদের সঙ্গে কিছুতেই বনিয়ে উঠতে পারল না বুড়োরা।

ডন প্রদেশের রাজধানীর কাছে যে লড়াই চলতে লাগল, তার কথা সবাই শুনল লোকমুখে। যে সব বিভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষণগুলো মাথা তুলেছে, সেগুলো সম্পর্কে আবছা আবছা ধারণা নিয়ে, মন দিয়ে সব কিছু শুনে তারা ঘটনা লক্ষ্য করতে লাগল।

জানুয়ারী পর্যন্ত শান্ত-ধারায় বয়ে চলল তাতার্স্ক গ্রামের জীবন। ফ্রন্ট থেকে যে কসাকরা ফিরেছে, তারা বৌ-এর পাশে বসে সময় কাটাতে লাগল, প্রাণভরে দুবেলা গিলতে লাগল। যুদ্ধের সময় যে তীব্র যন্ত্রণা তাদের সইতে হয়েছে, যে বোঝা বইতে হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি যে তাদের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে, তারা বিশেষ কোন খেয়ালই করল না তার।

নবম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

লড়াইএর ময়দানে দক্ষতা দেখানোর জন্যে, ১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাসে গ্রিগর মেলেখফকে অফিসার পদে উন্নীত করা হয়েছিল, তাকে দু নম্বর সংরক্ষিত দলের ট্রুপ-কমাণ্ডার করা হয়েছিল। ফুসফুসে একটা ব্যথা হওয়ায়, ছুটি নিয়ে সে বাড়ি এসেছিল। ছ' সপ্তাহ বাড়িতে থাকার পর, জেলার স্বাস্থ্যদপ্তর তাকে সুস্থ বলে সাব্যস্ত করলে, সে ফিরে এসেছিল রেজিমেণ্টে। নভেম্বর বিপ্লবের পর সে কোম্পানি কমাণ্ডারের পদে উঠল। ঠিক এই সময়েই, চারপাশের ঘটনাবলী, আর ইয়েফিস ইঝ্‌ভারিন নামে রেজিমেণ্টের এক অফিসারের প্রভাবে তার মতামত বেশ কিছুটা পালটে গেল।

ছুটি থেকে ফেরার দিনই ইঝ্‌ভারিনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গ্রিগরের, তারপর থেকে কাজের সময়ে, কাজের পরে, প্রায়ই দেখা করত। ইঝ্‌ভারিন ছিল এক অবস্থাপন্ন কসাক পরিবারের ছেলে। নোভোচেরকাসের জুংকার ট্রেনিং কলেজে তার শিক্ষা, কলেজ থেকে সোজা ফ্রণ্টে দশ নম্বর ডন কসাক রেজিমেণ্টে এসেছিল। রেজিমেণ্টে একবছর ছিল। সেণ্ট জর্জ ক্রশ পেয়েছিল, শরীরের স্থানে অস্থানে হাত-বোমার চোদ্দটা টুকরো বিঁধেছিল। পরে তাকে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল দুনম্বর সংরক্ষিত রেজিমেণ্টে।

বহু গুণ, আর অসাধারণ প্রতিভা ছিল ইঝ্‌ভারিনের; সাধারণ কসাক অফিসারদের চেয়ে অনেক উঁচুতে ছিল শিক্ষার মান। সে ছিল উগ্র কসাক জাতীয়তাবাদী। মার্চ বিপ্লব তাকে বিকাশের সুযোগ এনে দিয়েছিল, সে স্বাতন্ত্র্যকামী গোষ্ঠীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। ডন অঞ্চলের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন আর গ্রেট রাশিয়ার অধীনস্থ হবার আগে কসাকদের যে ধরনের সরকার ছিল, সেই ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সে কৌশলী প্রচার চালাত। ইতিহাস সম্পর্কে তার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, অতিমাত্রায় উৎসাহী হলেও, স্বচ্ছ-দৃষ্টি আর বিচার-বুদ্ধির স্থৈর্য ছিল। প্রাণস্পর্শী ভাষায় সে বর্ণনা করত, যখন তারা নিজেদের সরকার হাতে পাবে, যখন একটি রুশও তাদের দেশে থাকবে না, নিজেদের সীমান্তে পাহারায় দাঁড়িয়ে সেলাম না ঠুকে যখন কসাকরা গ্রেট্-রাশিয়ার আর ইউক্রেনের সঙ্গে সমানে সমানে কথা বলবে, তাদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের বিনিময় করবে,—তখন ডনকসাকদের মুক্ত স্বাধীন ভবিষ্যৎ জীবন কেমন হবে। সরলমতি কসাক আর অল্পশিক্ষিত অফিসারদের সে মাথা ঘুরিয়ে দিত। গ্রিগরও তার প্রভাবে পড়েছিল। প্রথম দিকে তুমুল তর্ক হত, কিন্তু অর্ধ-শিক্ষিত গ্রিগরের পাল্লা দেবার ক্ষমতাই হত না প্রতিপক্ষের সঙ্গে; কথার লড়াইতে ইঝ্‌ভারিন সহজেই জিতে যেত। সাধারণত ব্যারাকের কোণে বসে তর্ক হত, যারা শুনত তারা সব সময়েই ইঝ্‌ভারিনের পক্ষ নিত। সযত্নেলালিত, গভীরতম অনুভূতিকে নাড়া দিয়ে নিজের মতামতে কসাকদের অভিভূত করে ফেলত। গ্রিগর জিজ্ঞেস করত:

—'আমাদের ত গম ছাড়া আর কিছু নেই, রাশিয়াকে বাদ দিয়ে আমরা কি করে বাঁচব।'

ইঝ্‌ভারিন ধৈর্য ধরে ব্যাখ্যা করত:

—'শুধু ডন অঞ্চলেরই সম্পূর্ণ স্বাধীন, আর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা ত আমি ভাবছি না। যুক্তরাজ্যের ভিত্তিতে, অর্থাৎ পরস্পরের সহযোগিতায় আমরা কুবান, তেরেক এবং ককেসাসের পার্বত্য জাতিদের সঙ্গে এক হয়ে থাকব। ককেসাস খনি-সম্পদে সমৃদ্ধ; সব কিছুই পাওয়া যাবে সেখানে।'

—'কয়লাও পাওয়া যাবে?'

—'ডনের খনি অঞ্চল ত আমাদের হাতের কাছে।'

—'কিন্তু তাত রাশিয়ার।'

—'তার মালিক কে এবং কার সীমানায়, সেটা তর্কের বিষয়। কিন্তু ডনের খনি অঞ্চল রাশিয়ার মধ্যে যদি চলেও যায়, তাহলেও খুব কমই হারাব। আমাদের যুক্ত-রাজ্যের ভিত্তি কলকারখানার ওপর হবে না। আমাদের দেশ কৃষিভিত্তিক, আর সেই জন্যে, রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা কয়লা দিয়ে আমরা ছোট ছোট কলকারখানা চালাব। শুধু কয়লা নয়! আরও অনেক কিছু আমাদের কিনতে হবে রাশিয়ার কাছ থেকে; কাঠ, ধাতুজাত জিনিসপত্র, আরও কত কি: তার বদলে আমরা রাশিয়াকে ভাল জাতের গম দেব, তেল দেব।

—'কিন্তু আলাদা হয়ে আমাদের লাভ কি হবে?'

—'তার উত্তর সোজা। প্রথমত, তাদের রাজনৈতিক রক্ষণাবেক্ষণ থেকে আমরা স্বাধীন হব। রাশিয়ার জারেরা যে ব্যবস্থা ধ্বংস করেছিল, তা আমরা আবার চালু করব, সমস্ত বিদেশীদের হটাব। দশ বছরের মধ্যে, যন্ত্রপাতি আমদানি করে আমরা কৃষিকে এমন উঁচু স্তরে নিয়ে যাব যে দশ গুণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠব। এ দেশ আমাদের। আমাদের পূর্বপুরুষের রক্তে এর মাটি ভিজেছে, হাড়ে এর সার হয়েছে; কিন্তু চার চারশ বছর ধরে আমরা রাশিয়ার পায়ের নিচে আছি, রাশিয়ার স্বার্থই বাঁচিয়ে আসছি, নিজেদের কথা ভাবিনি। সমুদ্রে বেরুবার পথ আমাদের আছে। একটা শক্তিশালী নৌ-বহর আমরা গড়ে তুলব; কখনো ইউক্রেন, এমন কি রাশিয়াও কখনো, আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন করতে সাহস পাবে না। তখন জীবন হবে রূপকথার মত!'

আর দশজনের মত মাথায় লম্বা, সুশ্রী গড়ন, আর চওড়া কাঁধে ইঝ্‌ভারিন ছিল খাঁটি কসাকের মতই। তার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ছিল অপক্ক ওটের মত, মুখখানা লাল টকটকে, সাদামত গড়ানে কপাল, শুধু গালে আর ভুরুর পাশ বরাবর রোদে পোড়া দাগ। উঁচু নমনীয় গলার স্বর; যখন কথা বলত, হঠাৎ বাঁ-ভুরুটা ওঠানোর আর নাক কোঁচকানোর অভ্যাস ছিল তার, মনে হত সে যেন কি শুঁকছে। পা-ফেলার প্রাণবন্ত ভঙ্গি প্রত্যয়দৃঢ় চলা-ফেরা, আর কালো চোখের স্পষ্ট চাউনি রেজিমেণ্টের অন্যান্য অফিসারদের থেকে তাকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছিল। কসাকদের এক অকপট শ্রদ্ধা জন্মেছিল তার ওপর, সে শ্রদ্ধা সম্ভবত স্বয়ং রেজিমেণ্টের কমাণ্ডারের চেয়েও বেশি।

ইঝ্‌ভারিন আর গ্রিগর একসঙ্গে অনেক আলোচনা করত। পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, বুঝতে পারত গ্রিগর; মস্কোর হাসপাতালে গারানঝার সঙ্গে দেখা হবার পর যেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তেমনই মনে হত। গারান্‌ঝা আর ইঝ্‌ভারিনের কথাগুলোর তুলনামূলক বিচার করত, কার মধ্যে সত্য আছে তা নির্ধারণের চেষ্টা

করত। কিন্তু পারত না। এসব সত্ত্বেও, প্রায় নিজের অনিচ্ছাতেই, অবচেতনভাবে সে নূতন বিশ্বাসকে গ্রহণ করে ফেলেছিল।

নভেম্বর বিপ্লবের কিছু পরে ইঝ্ভারিনের সঙ্গে তার এক দীর্ঘ আলোচনা হল। পরস্পরবিরোধী আবেগে জর্জরিত হয়ে, সে একদিন ক্যাপ্টেনকে সতর্কভাবে প্রশ্ন করল, বলশেভিকদের সম্পর্কে সে কি ভাবে। গ্রিগর বলল:

—'বল দেখি, ইয়েফিস ইভানিচ্। বলশেভিকরা ঠিক, কি ঠিক নয়, তোমার কি ধারনা?'

ভুরূদুটো তুলে, হাসির ছলে নাকটা কোঁচকাল ইঝ্ভারিন, উত্তর দিল:

—'বলশেভিকরা কি ঠিক? হা—হাঃ! তুমি যেন ঠিক মায়ের পেট থেকে পড়লে, খোকা। নিজেদের কর্মসূচি, নিজেদের পরিকল্পনা আর আশা-আকাংখা আছে বলশেভিকদের। তাদের দিক থেকে তারা ঠিক, আর আমাদের দিক থেকে আমরা ঠিক। বলশেভিকদের পার্টির পুরো নাম জানো? জানো না? পুরোনাম হচ্ছে 'রুশ সোসাল-ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টি।' বুঝলে? 'শ্রমিক!' এখন তারা ভাব করছে চাষী আর কসাকদের সঙ্গে, কিন্তু শ্রমিক-শ্রেণীই তাদের ভিত্তি। তারা শ্রমিকদের মুক্তি আনছে, কিন্তু সবচেয়ে নিকৃষ্ট দাসত্ব আনছে চাষীদের। বাস্তবজীবনে এ কখনো সম্ভব হয় না যে সবাই সমান ভাগ পাবে। বলশেভিকরা যদি জিতে যায়, তাহলে শ্রমিকদের ভাল হবে, বাদবাকি সকলের খারাপ হবে। যদি রাজতন্ত্র ফিরে আসে, তাহলে জমিদার আর তাদের মত লোকজনের ভাল হবে, কিন্তু বাদবাকি সকলের খারাপ হবে। আমরা কাউকেই চাই না—একেও না, ওকেও না। আমরা চাই আমাদের নিজেদের জিনিস, আর সবচেয়ে আগে আমাদের মুক্তি পেতে হবে সমস্ত শুভানুধ্যায়ীর হাত থেকে, তা সে কোর্নিলোভ, কেরেন্স্কি আর লেনিন—যে-ই হক। ঈশ্বর আমাদের বন্ধুদের হাত থেকে রক্ষে করুন, আমরা নিজেরাই আমাদের শত্রুর মোকাবেলা করতে পারব।'

—'কিন্তু তুমি ত জানো, বেশির ভাগ কসাকই বলশেভিকদের দিকে ঝুঁকেছে।'

—'গ্রিগর, বন্ধু, এটা বুঝতে চেষ্টা কর, কারণ এটাই হচ্ছে মূলকথা। এই মুহূর্তে চাষী আর কসাকদের পথ বলশেভিকদের সঙ্গে মিশেছে। একথা সত্যি, কিন্তু কেন তা জানো? তার কারণ, বলশেভিকরা শান্তি চায়, এখুনি শান্তি চায়, আর লড়াই সম্পর্কে এই মুহূর্তে এই হচ্ছে কসাকদের মনোভাব!' নিজের লাল টকটকে ঘাড়ে চটাস্ করে একটা চড় মারল সে, ওপরে টেনে তোলা ভুরুটা টানটান করে চেঁচিয়ে উঠল:

—'আর এইজন্যেই কসাকদের মগজে বলশেভিক মতবাদ বাসা বেঁধেছে, তারা ধাপে ধাপে বলশেভিকদের দিকে এগিয়ে চলেছে ..কিন্তু যে মুহূর্তে লড়াই শেষ হবে, কসাকদের সম্পত্তি দখলের জন্যে বলশেভিকরা হাত বাড়াবে, কসাক আর বলশেভিকদের পথ আলাদা হয়ে যাবে! এই হচ্ছে মূলগত, আর ইতিহাসের গতিপথে অনিবার্য। কসাকদের জীবনযাপনের বর্তমান বিধিব্যবস্থা, আর সমাজতন্ত্র—বলশেভিক বিপ্লবের যা চরম পরিণতি—এ দুটোর মধ্যে আছে এক দুস্তর নদী এক গভীর খাদ। বলো, এ সম্পর্কে তোমার কি বলার আছে, বলো?'

—'আমার এই বলার আছে যে, আমার মাথায় এ ঢোকেনা!' আমতা আমতা করে অস্ফুট কণ্ঠে গ্রিগর বলল। 'ঠিক বেঠিক বুঝে ওঠা আমার পক্ষে দায়। বাতাসের ঝাপটায় জড় করা বরফের মত সারা স্তেপময় ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

—'এ ভাবে তুমি এ থেকে পরিত্রাণ পাবে না। যা হোক কিছু করার জন্যে জীবন নিজেই তোমাকে বাধ্য করবে, যে কোন একটা দিকে তোমাকে ঠেলে নিয়ে যাবে।' ইঝ্ভারিন তার বক্তব্য শেষ করল।

॥ দুই ॥

এই আলোচনা হয়েছিল নভেম্বরের গোড়ার দিকে। পরে সেই মাসেই গ্রিগরের দেখা হয়ে গেল আর একজন কসাকের সঙ্গে, ডনের বিপ্লবের ইতিহাসে যে একটা বড় অংশ গ্রহণ করেছিল। দুপুর থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছিল। সন্ধ্যের দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। দ্রোঝ্দোভের সঙ্গে দেখা করার সিদ্ধান্ত করল গ্রিগর। দ্রোঝ্দোভ্ আটাশ নম্বর রেজিমেণ্টের সুবল্টার্ন, গ্রিগরের নিজের জেলা থেকে এসেছে। গ্রিগর দেখল দ্রোঝ্দোভের এক সঙ্গী রয়েছে: রক্ষীদলকে সার্জেণ্ট-মেজরের তকমা আঁটা এক স্বাস্থ্যবান, শক্তসমর্থ কসাক জানলার দিকে পিঠ দিয়ে ক্যাম্প-খাটের ওপরে বসে আছে। লোকটা বসে আছে কুঁজো হয়ে, কালো সুতির পাজামায় মোড়া পা-দুটি অনেকখানি ফাঁক করা, বিশাল লোমশ হাতদুখানা চওড়া হাঁটুর ওপরে রাখা। তার উর্দিটা ফাটফাট করছে, হাতের নিচে কুঁচকে কুঁচকে আছে। দরজা খোলার শব্দ হতেই সে খাটো ঘাড়টা ফেরাল, কঠিন দৃষ্টিতে গ্রিগরের দিকে তাকাল, তারপর, ফোলা ফোলা চোখের পাতা নামিয়ে চোখের হিম কঠিন দৃষ্টিকে আড়াল করে দিল।

—'এসো দুজনের আলাপ করিয়ে দেই! গ্রিগর, ইনি পোদ্তিয়েলকোভ, উস্ত্-খোপের্স্কের লোক, আমাদের প্রায় প্রতিবেশী।' দ্রোঝ্দোভ বলল।

দুজনে নিঃশব্দে করমর্দন করল। গ্রিগর বসে নব-পরিচিতকে সিগারেট দিল। ঠাসা প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করতে গিয়ে পোদ্তিয়েলকোভের বড় বড় লালচে আঙুলে বহুক্ষণ আঙুল জড়িয়ে গেল, ধাঁধাঁয় লাল হয়ে বিরক্তিতে গাল দিয়ে উঠল। অবশেষে একটা সিগারেট বার করে নিতে পারল; তারপর, হাসি হাসি চোখে গ্রিগরের মুখের দিকে তাকাল। তার সহজ সরল ভঙ্গিটা গ্রিগরের ভারী ভাল লাগল। জিজ্ঞেস করল:

—'কোন গ্রামে আপনার বাড়ি?'

—'আমার জন্ম ক্রুতোভ্স্কিতে, কিন্তু এখন থাকি উস্ত্-ক্রিনোভ্স্কিতে। ক্রুতোভ্স্কির নাম শুনেছেন বোধ হয়।'

পোদ্তিয়েলকোভের মুখে সামান্য বসন্তের দাগ। জুলপি দুটো কড়া করে পাকানো। ছোট ছোট কানের ওপরে চুল পাট করে আঁচড়ানো, বাঁ-ভুরুর ওপরে কায়দা করে তুলে দেওয়া। বিরাট তোবড়ানো নাকটা, আর চোখদুটো বাদ দিলে, চেহারাটা বেশ একটা মনোরম ছাপ ফেলতে পারত। প্রথম দৃষ্টিতে তার চোখের অসাধারণত্ব কিছুই বুঝতে পারেনি গ্রিগর, কিন্তু খুব কাছ থেকে তাকাতেই বুঝতে পারল চোখদুটো সীসের মত ভারি। পাতার সরু ফাঁক দিয়ে চোখদুটো কামান ছোঁড়ার ফোকর থেকে

ছোট ছোট গোলার মত চকচক করছে, চোখের দৃষ্টি একটিমাত্র জায়গাতেই ভারি হয়ে, কিম্ভুত গোঁয়ারের মত আটকে আছে।

একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে গ্রিগর পোদ্‌তিয়েলকোভের দিকে কৌতূহলভরে তাকাল। লোকটার চোখের পলকই পড়ল না প্রায়। কথা বলার সময় চোখের আনন্দ-হীন দৃষ্টি শ্রোতার দিকে স্থির হয়ে রইল, নয়ত একটা কিছু থেকে আর একটা কিছুতে সরে গেল, কিন্তু তার কোঁকড়ানো, রোদে পোড়া কটাশে চোখের পাতাদুটো সবসময় নত, নিষ্পলক হয়েই রইল। ক্বচিৎ কখনো ফোলাফোলা পাতাদুটো নামিয়েই সঙ্গে সঙ্গেই আবার উঁচু করল।

'এটা একটা বেশ আলোচনার জিনিস।' আলোচনা শুরু করল গ্রিগর। 'লড়াই শেষ হবে, আবার আমরা ঘরসংসার শুরু করব। ইউক্রেনের একটা আলাদা সরকার হবে, আর ডনে শাসন করবে ফৌজী কাউন্সিল।'

—'তার মানে আতামান কালেদিন।' শান্তগলায় পোদ্‌তিয়েলকোভ সংশোধন করে দিল।

—'সে একই কথা। পার্থক্য কোথায়?'

—'না, কোনো পার্থক্যই নেই।' পোদ্‌তিয়েলকোভ স্বীকার করে নিল।

—'জননী রাশিয়াকে আমরা সেলাম ঠুকে দিয়েছি,' ইঝ্‌ভারিনের কথার সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তি শুরু করল গ্রিগর; এই ধরনের কথা শুনে, দ্রোঝ্‌দোভ আর রক্ষীদলের এই আগন্তুকের কি প্রতিক্রিয়া হয়, তাই দেখার কৌতূহল হল তার। 'আমরা নিজেদের সরকার গড়ব, নিজেদের ধরনের জীবন গড়ব। কসাকদের দেশ থেকে ইউক্রেনের লোকেরা দূর হয়ে যাক; আমরা সীমান্তে পাহারা বসাব, 'হোখোল'দের ঢুকতে দেব না! অতীতে পূর্বপুরুষেরা যেমন করে থাকত, আমরা সেইরকমভাবে থাকব। আমার মতে, বিপ্লব আমাদের ভালর জন্যেই। তোমার কি মত দ্রোঝ্‌দোভ্‌?'

সায় দিয়ে হাসল দ্রোঝ্‌দোভ্‌। উত্তর দিল·

—'নিশ্চয়ই আমাদের ভালর জন্যে। 'চাষা'রা আমাদের শক্তি নিংড়ে নিত, তাদের অধীনে আমাদের বাঁচার যো ছিল না। সমস্ত আতামানরাই ছিল জার্মান: ভন্‌ টাওবে, ভন্‌ গ্রাব্‌বে, আরও কত নাম তা খোদাই জানে। জমি দেওয়া হয়েছিল এইসব অফিসারদের। একবার যা করেই হক, নিঃশ্বাস ফেলার সময় মিলবে।'

—'কিন্তু এসবে রাশিয়া কি রাজী হবে?' শান্তগলায় প্রশ্ন করল পোদ্‌তিয়েলকোভ, প্রশ্নটা করল বিশেষভাবে কাউকে উদ্দেশ্য না করে।

—'রাজী তাকে হতেই হবে।' জোর দিয়ে গ্রিগর বলল।

—'সে যাই হক না কেন, যথাপূর্বংই রয়ে যাবে। সেই পুরনো কাশুন্দী, শুধু একটু বেশি ঘোঁটা।'

—'একথা বলছেন কি করে?'

—'নিশ্চয়ই তাই হবে।' ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো দ্রুত ঘুরিয়ে আনল পোদ্‌তিয়েল-কোভ, গ্রিগরের দিকে জোরালো দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, 'ঠিক আগের মতই চলবে আতামানদের রাজত্ব, যাদের খেটে খেতে হয় তাদের আগের মতই পীড়ন করবে। আগের মতই 'হুজুরে'র দরবারে ধর্না দিতে হবে, তিনি গলাধাক্‌কা দেবেন। চমৎকার জীবনই বটে! বুকে পাথর চাপানো, তাছাড়া আর কিছুই না।'

গ্রিগর উঠে দাঁড়াল। ঘরের এককোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত পায়চারি করতে শুরু করল। অবশেষে পোদ্‌তিয়েলকোভের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল:

—'তাহলে কি করব আমরা?'

—'শেষ পর্যন্ত এগ্নতে হবে!'

—'কোন পর্যন্ত?'

—'একবার যখন লাঙল মাঠে দেওয়া হয়েছে, তখন শেষ পর্যন্ত মাটি তৈরি করতে হবে। একবার যখন জার আর প্রতি-বিপ্লবকে উৎখাত করেছেন, তখন জনগণের হাতে যাতে সরকার যায়, তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। প্নরনো দিনের কথা সবই গাল-গল্প। প্নরনো কালে জাররা আমাদের পীড়ন করত, এখন জার যদি পীড়ন না করে, অন্যরা করবে।'

—'তাহলে, আপনি কোন পথ বাতলাতে চান, পোদ্‌তিয়েলকোভ?'

—'নির্বাচিত, জনগণের সরকার। জেনারেলদের হাতে পড়লে আবার লড়াই হবে, আর আমরা তা এড়াতে পারি। যদি সারা দ্ননিয়া জ্নড়ে আমরা জনগণের সরকার গড়ে তুলতে পারি, যাতে আর কখনো জনগণ পীড়িত না হয়, আর কখনো লড়াই করতে না হয়! কিন্তু এখন কি পেলাম আমরা? প্নরনো পা-জামা যদি উল্টে পরা যায়, তাহলে যেমন ফুটো তেমনি থাকে। আমাদের প্নরনো দিনের হাত থেকে রেহাই পাওয়াই ভাল, নইলে ওরা এমন বোঝাই চাপাবে যে, জারের চেয়েও খারাপ অবস্থা হবে।'

হাত দিয়ে গ্রিগর শ্নন্যে ম্নঠি পাকাল, তারপর শোকার্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল:

—'আমাদের কি জমি ছেড়ে দিতে হবে? সকলের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে?'

—'না...তা কেন করতে যাব?' মনে হল, ধাঁধাঁয় পড়ে গেল পোদ্‌তিয়েলকোভ, থতমত খেয়ে গেল এ প্রশ্নে। 'জমি আমরা ছেড়ে দেব না। আমরা জমি নিজেদের মধ্যে ভাগ করব, কসাকদের মধ্যে ভাগ করব; প্রথমে জমি কেড়ে নেব জমিদারদের কাছ থেকে। কিন্তু চাষীদের হাতে কিছ্নই দেব না। যদি একবার ওদের মধ্যে ভাগ করতে শ্নর্ন করি, তাহলে আমাদের ফতুর করে দেবে।'

—'আর আমাদের শাসন করবে কে?'

—'আমরাই আমাদের শাসন করব।' প্রাণের আবেগে আরও উত্তপ্ত হয়ে পোদ্‌তিয়েলকোভ্ উত্তর দিল। 'আমাদের নিজেদের সরকার গড়ব। শ্নধ্ন কালেদিনদের জিনের বাঁধন একটু আলগা হতে দিন, শিগ্‌গীরই কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দেব।'

ধ্নমায়মান জানলার সামনে থমকে দাঁড়াল গ্রিগর। কি-এক-খেলায় মত্ত ছোট ছোট বাচ্চাগ্নলোর দিকে, উল্টোদিকের বাড়িগ্নলোর ভেজা ছাদ আর বেড়ার গায়ে নিঃসঙ্গ এক পপলার গাছের বিবর্ণ ধ্নসর ডালগ্নলোর দিকে রাস্তায় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। পোদ্‌তিয়েলকোভ আর দ্রোঝ্‌দোভের তর্ক চলতে লাগল; তাতে আর সে কান দিল না। পীড়াদায়ক চিন্তার জটিলজালের ফাঁক দিয়ে দিনের আলো দেখবার জন্যে, কোন একটা সিদ্ধান্তে পেঁছিবার জন্যে মনের সঙ্গে যন্ত্রণাকর লড়াই করতে লাগল।

গ্রিগর প্রায় মিনিট দশেক ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানলার কাঁচে আঙ্নল দিয়ে আঁকিব্নকি কাটতে লাগল। উল্টোদিকের নিচু বাড়িটার ছাদের সমান রেখায় প্রথম শীতের হিমেল স্নর্যাস্ত গনগনে আগ্ননের মত জ্বলতে লাগল। ছাদের ছাতাপড়া চ্নড়ো থেকে স্নর্য ঝুলছে যেন খাঁজে খাঁজে আটকে গিয়েছে, এখ্ননি যে কোন একদিকে গড়িয়ে পড়বে। শহরের বাগান থেকে ঝরা পাতার দল রাস্তা দিয়ে মর্মর শব্দ তুলে ছ্নটল। আর ইউক্রেনের দিক থেকে বয়ে আসা ঝড়ো হাওয়া বারবার শহরের ব্নকে হানা দিয়ে ফিরতে লাগল।

গৃহ যুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

যারা বলশেভিক বিপ্লবের ভয়ে পালিয়েছিল, তাদের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠল নোভোচেরকাশ্ শহর। বাঘা বাঘা জেনারেলরা, যারা আগে ছিল রুশ-বাহিনীর ভাগ্যবিধাতা, প্রতিক্রিয়াশীল ডন-কসাকদের মধ্যে সমর্থন পাওয়া, আর সোবিয়েতে গঠিত রশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আশায় ডনের ভাটি অঞ্চলে ভিড় করতে লাগল। ১৫ই নভেম্বর জেনারেল আলেক্সেভ হাজির হল শহরে। কালেদিনের সঙ্গে আলোচনার পর স্বেচ্ছাবাহিনী গড়ে তোলার কাজে লাগল। গিফসার, জুংবার, আর উত্তর থেকে যারা পালিয়ে এসেছিল, তারাই হল ভবিষ্যতের স্বেচ্ছাবাহিনীর মেরুদণ্ড। ছাত্র, সৈনিক, কসাকদের মধ্যে যারা সবচেয়ে সক্রিয় প্রতিক্রিয়াশীল, আর যারা রোমাঞ্চকর ব্যাপার খোঁজে, কেরেন্‌স্কির নোটেও যারা মোটা মাইনে পেতে চায়, তাদের নিয়েই মেরুদণ্ডের চারপাশে তিন সপ্তাহের মধ্যে পুতিগন্ধময় মাংসের প্রলেপ পড়ল।

ডিসেম্বরের প্রথম দিকে আরও জেনারেল এসে হাজির হল। ডিসেম্বরের উনিশ তারিখে স্বয়ং কোর্নিলোভ এল শহরে। ইতিমধ্যে রুমানীয় ও অস্ট্রো-জার্মান ফ্রণ্ট থেকে প্রায় সমস্ত কসাক রেজিমেণ্টকে সরিয়ে এনে, ডন প্রদেশের প্রধান প্রধান রেল-পথ বরাবর তাদের ছাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল কালেদিন। কিন্তু তিন বছরের যুদ্ধে শ্রান্তক্লান্ত, ফ্রণ্ট থেকে ফিরবার মুখে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কসাকরা, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়বার বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না। রেজিমেণ্টগুলোর তিনভাগের দু ভাগও অটুট ছিল কিনা সন্দেহ, ঘর-সংসার তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছিল, আর কসাকদের ঘরমুখো গতিকে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি ছিল না পৃথিবীতে।

কালেদিন যখন ডিসেম্বর মাসে বিপ্লবী রোস্তোভের বিরুদ্ধে অগ্রবর্তী দলকে পাঠাবার প্রথম চেষ্টা করল, কসাকরা আক্রমণ করতে অস্বীকার করল, কিছুদূর গিয়েই ফিরে এল। কিন্তু টুকরোটাকরা ডিভিসনগুলোকে সংগঠিত করার ব্যাপক আয়োজনের সুফল দেখা দিল। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি কালেদিনের হাতে এল কিছু কিছু নির্ভর-যোগ্য স্বেচ্ছাবাহিনীর দল।

তিন দিক থেকে রেড-গার্ডদের দল এগিয়ে আসতে লাগল প্রদেশের দিকে। ডনের প্রতিক্রিয়াশীলদের আঘাত হানবার জন্যে, খারকোভ্ আর ভোরোনেঝে শক্তি সমাবেশ করা হতে লাগল। মেঘ জমল, জমাট বাঁধল, কালো হয়ে উঠল ডনের আকাশে। ইউক্রেনের দিক থেকে বয়ে আসা বাতাসে, ইতিমধ্যেই ভেসে আসতে শুরু করেছিল, প্রথম সংঘর্ষের কামান গর্জন।

নিরানন্দ, বিষণ্ণ দিন আসছে ডনে, এগিয়ে আসছে দুঃসময়।

॥ দুই ॥

হলদে-সাদা তরঙ্গায়িত মেঘ ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে নোভোচেরকাশের আকাশে। গির্জার ঝকমকে বৃত্তাকার চুড়োর ঠিক ওপরে, অসীম শূন্যে মেঘহীন নীলিমার বিস্তারে, ধূসর, তুলতুলে পালকের মত মেঘের টুকরো দুলছে, তার দীর্ঘপুচ্ছ নুয়ে পড়েছে, ঝলমল করছে গোলাপি-রুপালি রং।

নভেম্বরের এক সকালে মস্কোর ট্রেনে নোভোচেরকাশে পৌঁছুল বানচাক। পুরনো ওভারকোটের ধার নামিয়ে দিয়ে সকলের শেষে কামরা থেকে বেরিয়ে এল। বে-সামরিক পোশাকে বেশ একটু বাধোবাধো, একটু খাপছাড়া ঠেকতে লাগল তার।

সস্তা, খেলো সুটকেশটা বগলদাবা করে সে চলল শহরের ভেতরে। শহরের এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত হেঁটে এলেও, সারা রাস্তায় একটা লোকও নজরে পড়ল না। আধঘণ্টা হাঁটার পর একটা ছোট, পড়পড় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বহুকাল মেরামত হয়নি বাড়িটা; বাড়ির গায়ে কালের হস্তাক্ষর ছাদ ধ্বসে পড়ছে, দেয়ালগুলো হেলে পড়েছে, কপাট আলগা হয়ে ঝুলছে, জানলাগুলো তেরচা হয়ে আছে। কাঠের গেটটা খুলতে খুলতে বাড়ি আর ছোট্ট উঠোনে চোখ বুলিয়ে নিল বানচাক; তারপর, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

বাড়ির সরু বারান্দার অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে কাঠ-কুটো বোঝাই একটা সিন্দুক। তার একটা কোণায় অন্ধকারে ধাক্কা লাগল হাঁটুতে, কিন্তু ব্যথা গ্রাহ্য না করে দরজা খুলে ফেলল সে। প্রথম নীচু ঘরটায় কেউ নেই। চৌকাঠের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ঘরের দিকে এগুল। এই একটি বাড়িরই বৈশিষ্ট্য সেই ভয়ঙ্কর পরিচিত গন্ধে মাথা ঘুরতে লাগল তার। ঘরের সবকিছু চোখ দিয়ে গিলতে লাগল : কোণার দিকে সেই আইকন, বিছানা, টেবিল, তার ওপরে ছোপ ছোপ, ছোট্ট আয়নাখানা, কয়েকখানা ফটো, গোটাকয়েক রোগা রোগা চেয়ার, একটা সেলাই-কল, আর উনুনের ওপরে একটা রঙ-চটা সামোভার। বুকের ভেতর হঠাৎ ভীষণ ধড়াস ধড়াস শুরু হল; সুটকেশটা মেঝের ওপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরের চারপাশে তাকাতে লাগল। উঁচু, সদ্য রঙ-করা উনুনটা যেন অভ্যর্থনা জানাল: নীল সুতির পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারল একটা বুড়ো কটাসে রঙের বেড়াল, প্রায় মানুষের মত কৌতুহলে ঝকঝক করে উঠল তার চোখ দুটো। একটা এঁটো থালা পড়ে আছে টেবিলের ওপরে, টুলের ওপরে রয়েছে একটা পশমের গুলি, আর আধখানা বোনা মোজা শুদ্ধ চারটে চকচকে কাঁটা।

বানচাক ছুটে বেরিয়ে এল সিঁড়ির ওপরে। উঠোনের শেষ প্রান্তে একটা চালাঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল এক কুঁজোমত বৃদ্ধা। 'মা! ঠিক তো? মা-ই তো?' ঠোঁট-দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল। মাথার টুপি খুলতে খুলতে সে বৃদ্ধার দিকে ছুটল।

—'কাকে চাই?' চোখের ওপরে হাতের আড়াল দিয়ে দাঁড়িয়ে সতর্কভাবে প্রশ্ন করল বৃদ্ধা।

—'মা, মাগো!' কর্কশ আওয়াজ ফেটে পড়ল বানচাকের গলা থেকে। 'আমাকে চিনতে পারছ না তুমি?'

পড়ি কি মরি করে ছুটল মায়ের দিকে; দেখতে পেল, তার ডাক শুনতে পেয়ে, চোট খাওয়ার মত টলে পড়ল মা। ছুটতে চাইল, কিন্তু শক্তিতে কুলাল না, একটু একটু পা বাড়িয়ে বাড়িয়ে এগুতে লাগল, যেন এগুতে হচ্ছে বাতাস ঠেলে ঠেলে। মাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল বানচাক, চুমু খেতে লাগল বলিরেখাঙ্কিত মুখে, ভয়ে, আনন্দে বিহ্বল দুই চোখে, আর তার নিজের চোখদুটোও মিটমিট করতে লাগল অসহায়ভাবে।

—'ইলিয়া! ইলিউশা! খোকা রে!...চিনতে পারিনি আমি, কোত্থেকে এলি তুই?' ফিসফিস করে বলতে লাগল বৃদ্ধা।

বাড়ির ভেতরে এল দুজনে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওভার-কোটটা ছুঁড়ে দিল বানচাক, টেবিলের পাশে এসে বসল।

—'ভাবতেও পারিনি আবার দেখতে পাব তোকে...কতকাল হয়ে গেল...খোকা... এতবড় হয়ে গিয়েছিস, এত বুড়ো বুড়ো দেখাচ্ছে, কি করে চিনব, বল?'

—'সে যাক, তুমি কেমন আছ, মা?' একটু হেসে প্রশ্ন করল সে।

অসংলগ্নভাবে উত্তর দিতে দিতে মা ঘরময় তড়বড় করে বেড়াতে লাগল, টেবিল পরিষ্কার করতে লাগল, সামোভারে কয়লা দিতে লাগল। জলভরা চোখে বারবার সে ছুটে আসতে লাগল ছেলের মাথায় হাত বুলোতে, ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। জল গরম করল, ছেলেকে কিছু খেতে দিল, নিজের হাতে তার মাথা ধুইয়ে দিল, বাক্সের তলা থেকে গোটাকয়েক পুরনো রঙ-ওঠা পরিষ্কার জামা কাপড় টেনে বার করল, তারপর প্রশ্ন করে করে, তিক্তভাবে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে মাঝরাত পর্যন্ত বসে রইল।

ঘুমুবার জন্যে বানচাক যখন বিছানায় শুল, পাশের গির্জায় তখন ঠিক রাত দুটোর ঘণ্টা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমিয়ে পড়ল; আর স্বপ্ন দেখতে লাগল, আবার সে ইস্কুলের ছাত্র হয়ে গিয়েছে, খেলে খেলে ক্লান্ত হয়ে বই সামনে নিয়ে ঢুলছে, আর মা যেন রান্নাঘরের দরজা খুলে ঢুকে রুক্ষগলায় জিজ্ঞেস করছে, 'ইলিয়া, কালকের পড়া তৈরি হয়েছে?' এক গভীর সুখতৃপ্ত হাসি লেগে রইল মুখে। বানচাক ঘুমুতে লাগল।

রাত্রে একাধিক বার মা উঠে এল তার কাছে, লেপটা, বালিশটা টেনেটুনে ঠিক করে দিয়ে গেল, বিশাল কপালে চুমু খেল, তারপর আবার নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

বানচাক শুধু একটা দিন রইল বাড়িতে। সকালবেলায় ফৌজী গ্রেট-কোট গায়ে এক কমরেড এল দেখা করতে, চাপাগলায় কি সব আলোচনা করল; সে চলে যেতে যেতেই হুড়যুদ্ধু লাগিয়ে দিল সে, তাড়াতাড়ি সুটকেশটা বোঝাই করে ফেলল, বেমানান ওভার-কোটটা গলিয়ে নিল। মায়ের কাছ থেকে তাড়াহুড়ো করে বিদায় নিল, কথা দিল, একমাসের মধ্যেই আবার দেখা করবে। মা জিজ্ঞেস করল :

—'আবার কোথায় চললি, ইলিয়া?'

—'রোস্তোভে, মা; রোস্তোভে। শীগগীরই ফিরে আসব।...মন খারাপ করো না, মা...মন খারাপ করো না।' মাকে উৎসাহ দিতে লাগল।

তাড়াতাড়ি গলা থেকে ছোট ক্রুশটা খুলে নিল মা, ছেলেকে চুমু খেতে খেতে মাথার ওপর দিয়ে সুতোটা গলিয়ে দিল। কম্পিত আঙুলে সুতোটা গলায় বাঁধতে বাঁধতে ফিস ফিস করে বলতে লাগল :

—'এটা গলায় রাখিস, ইলিয়া। হে যিশু, ওকে বাঁচিও, রক্ষা করো, প্রভু; ওকে আড়াল দিয়ে রেখো। ও ছাড়া কেউ নেই আমার সংসারে...'

আবেগভরে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে, আর নিজেকে চেপে রাখতে পারল না মা, ঠোঁটের কোণদুটো থরথর করে কেঁপে উঠল, গভীর তিক্ততায় নীচের দিকে নুয়ে পড়ল।

বসন্তের বৃষ্টির ধারার মত বানচাকের লোমশ হাতে ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের জল ঝরতে লাগল। জড়ানো হাত দুটো গলা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, আষাঢ়ে মেঘের মত মুখে, সে ছুটে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে।

॥ তিন ॥

রোস্তোভ স্টেশনে গিস্‌গিস্‌ করছে লোকের ভিড়; মেঝেতে হাঁটু-সমান উঁচু সিগারেটের পোড়া টুকরো আর সূর্যমুখী ফুলের বিচির খোসা। স্টেশনের ময়দানে কেল্লার সৈন্যরা নিজেদের জিনিসপত্তর, তামাক আর চোরাই মাল দিয়ে বেচাকেনা করছে। দক্ষিণ দেশের বন্দরে যেমনটি চোখে পড়ে, সেই রকম বহুজাতের লোক দঙ্গল বেঁধে ধীরে সুস্থে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগুতে এগুতে, পার্টি কমিটির বাড়িটা খুঁজে বার করল বানচাক। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল দো-তলায়। কিন্তু আর একটু এগুতেই বাধা দিল এক রেড-গার্ড তার কাঁধে জাপানী ধরনের রাইফেল। বেয়নেটের বদলে নলের সঙ্গে একটা ছোরা বাঁধা। রেড-গার্ড জিজ্ঞেস করল :

—'কাকে চাই, কমরেড?'

—'কমরেড আব্রামসনকে। আছেন?'

—'বাঁ-দিকে তিন নম্বর ঘর।'

নির্দেশিত ঘরের দরজা খুলল বানচাক; দেখতে পেল, বেঁটে খাটো, নাক লম্বা, কালো চুল একজন লোক এক বয়স্ক রেল-মজুরের সঙ্গে কথা বলছে। বাঁ-হাতটা জ্যাকেটের ভেতরে ঢোকানো, ডানহাতটা যথারীতি শূন্যে উঠছে পড়ছে।

—'এতে মোটেই চলবে না' কালো চুল লোকটা চেঁচাচ্ছে। 'একে সংগঠন বলে না! এভাবে যদি প্রচার কাজ চালান, তাহলে যা চাই, তার উলটো ফল ফলবে।'

রেলমজুরের মুখে অপরাধীর মত উদ্বিগ্ন ছাপ দেখে বানচাক বুঝতে পারল, নিজের সমর্থনে কিছু যেন বলতে চাইল সে, কিন্তু অপরজন তার মুখ খুলতে দিল না। স্পষ্টতই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল সে, চিৎকার করে উঠল :

—'কাজ থেকে এক্ষুনি বরখাস্ত করুন মিত্‌চেংকোকে! এ আর সহ্য করা হবে না! আপনাদের মধ্যে যা ঘটছে, তা আমরা আর চলতে দেব না। এর জন্যে বিপ্লবী ট্রাইবুনালের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে ভিয়েরখোভিয়েতস্কিকে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? করেছেন? আমি দেখব, তাকে যাতে গুলি করে মারা হয়।' রুক্ষভাবে বক্তব্য শেষ করল সে। নিজেকে পুরাপুরি আয়ত্তে আনার আগেই সে ক্রুদ্ধমুখখানা বানচাকের দিকে ফেরাল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল :

—'কি চাই?'

—'আপনিই কমরেড আব্রামসন?' বানচাক জিজ্ঞেস করল।

—'হ্যাঁ।'

পেত্রোগ্রাদ পার্টি-কমিটির কাগজপত্র তার হাতে দিয়ে জানলার ধারিতে এসে বসল বানচাক। আব্রামসন মন দিয়ে চিঠিগুলো পড়ল, তারপর বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল :

—'একটু অপেক্ষা করুন; দু এক মিনিট পরেই আমরা কথা বলছি।'

রেল-মজুরকে বিদায় দিয়ে বাইরে চলে গেল আব্রামসন। কয়েক মিনিট পরে ফিরে এল গাঁট্টা-গোঁট্টা, দাড়িগোঁফচাঁছা এক অফিসারকে নিয়ে। অফিসারের নীচের চোয়ালে আড়াআড়ি একটা তলোয়ারের কোপের দাগ।

—'ইনি হচ্ছেন আমাদের ফৌজী বিপ্লবী কমিটির একজন সদস্য।' আব্রামসন বানচাককে পরিচয় করিয়ে দিল। 'আর কমরেড বানচাক, আপনি তো একজন মেসিন-গানার, তাই না?'

—'হ্যাঁ।'

—'ঠিক আপনার মত লোককেই আমরা খুঁজছিলাম।' হাসল অফিসারটি। আব্রামসন জিজ্ঞেস করল :

—'মজুরদের রেড-গার্ড নিয়ে আমাদের জন্যে মেসিনগান দল গড়তে পারবেন? যত শীগ্‌গীর সম্ভব?'

—'চেষ্টা করব। এটা সময়ের ব্যাপার।'

—'বেশ, কত সময় লাগবে আপনার? এক সপ্তাহ...দু সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ!' হাসি হাসি মুখে অপর ব্যক্তিটি ঝুঁকে পড়ল বানচাকের দিকে।

—'কয়েক দিন।'

—'চমৎকার!'

কপালটা ঘসল আব্রামসন, স্পষ্ট বিরক্তিতে বলতে শুরু করল :

—'শহরের কেল্লার একটা অংশের মনোবল বিশ্রীরকমে ভেঙ্গে পড়েছে, তাদের ওপর নির্ভর করা যায় না। সর্বত্রই যেমন, কমরেড বানচাক, আমার মনে হয়, এখানেও আমাদের আশাভরসা মজুরদের ওপরে। জাহাজীদের ওপরেও অবশ্য; কিন্তু সৈন্যদের ক্ষেত্রে..' দাড়িতে গোটাকয়েক টান দিল সে, তারপর জিজ্ঞেস করল : 'আপনার ট্যাঁকের অবস্থা কেমন? আচ্ছা, সে আমরা ব্যবস্থা করে দেব। আজ কিছু খাওয়া হয়েছে? না, নিশ্চয়ই হয়নি।'

বানচাক মনে মনে ভাবল : 'মুখ দেখেই যখন বলে ফেললে পেট ভরা, না পেটে ক্ষিদে, তখন তোমারও নিশ্চয়ই একটু আধটু উপোসের স্বাদ, জানা আছে, দাদা।' একজন লোকের সঙ্গে আব্রামসনের ঘরের দিকে চলতে চলতে তার কথাই ঘুরতে লাগল মনে : 'বাহাদুর লোক, খাঁটি বলশেভিক! কঠিন, কিন্তু ভেতরটা বেশ ভাল, নরম-সরম। ধ্বংসাত্মক কাজ যে করে, তার মৃত্যুদণ্ডের কথা দুবার ভাবেন না, কিন্তু কমরেডদের কি দরকার, তা ঠিক বুঝতে পারেন।'

আব্রামসনের ঘরে যখন পৌঁছুল, তখনো তার সাক্ষাৎকারের অভিভূত ভাবটা কাটেনি। কিছু খেয়ে নিল সে, তারপর, বই-ঠাসা ছোট্ট ঘরের বিছানায় বিশ্রামের জন্যে গা এলিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ চার ॥

পার্টি কমিটির ঠিক করা মজুরদের নিয়ে পর পর চার দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ব্যস্ত রইল বানচাক। সর্বসাকুল্যে তারা ষোলজন; শান্তিকালীন পেশা, বয়স, আর, এমন কি জাতেরও অদ্ভুত পার্থক্য তাদের। দুজন স্টিভেডোর—খ্‌ভিলিচ্‌কো

নামে একজন ইউক্রেনীয়, আর মিখালিজে নামে এক রুশ-গ্রীক; কম্পোজিটার স্তেপানোভ; আটজন লোহা কারখানার মজুর; পারামানোভ খনির মজুর ঝেলেন্‌কোভ; গিয়েভোর্‌-কিয়ান্‌ত্‌ঝ্‌ নামে রুগ্ন চেহারার এক আর্মেনীয় রুটিওয়ালা; রেবিণ্ডার নামে এক রুশ-জার্মান, তালা-চাবির ওস্তাদ কারিগর; আর রেল-কারখানার চারজন মজুর। বানচাকের কাছে সতর নম্বর শিক্ষানবীশের কাগজ নিয়ে এল একটি মেয়ে; গায়ে তার তুলোর ফৌজী ওভার-কোট, পায়ের মাপের চেয়ে অনেক বড় বুট দুটো। তার হাত থেকে খাম-বন্ধ চিঠিটা নিতে নিতে বানচাক জিজ্ঞেস করল :

—'ফেরার সময় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন?'

মেয়েটি হাসল; এক গোছা চুল খসে পড়েছিল রুমালের নীচে, অস্বস্তিতে সেটা সরিয়ে দিল, তারপর আমতা আমতা করে উত্তর দিল :

—'আপনার কাছেই আমাকে পাঠিয়েছেন ' মুহূর্তের ধাঁধালাগা ভাবটা কাটিয়ে উঠে তারপর বলল, '...মেসিন-গানার হিসেবে।'

লাল হয়ে উঠল বানচাকের মুখ-চোখ।

—'ওঁদের কি বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে? আমি কি মেয়েদের ব্যাটালিয়ন গড়ছি? মাফ করবেন, এ ঠিক আপনার কাজ নয় কিন্তু; বেশ পরিশ্রমের কাজ, পুরুষের মত শক্তি দরকার। না, আমি আপনাকে নিতে পারব না।'

ভুরু কোঁচকাতে কোঁচকাতে চিঠিটা খুলল সে, তাড়াতাড়ি বুঝে নিতে লাগল মর্মার্থটুকু। অনুমতি পত্রে শুধু এইটুকুই লেখা আছে যে, পার্টি সদস্য আন্না পোগুদ্‌কো'কে মেসিনগান দলে পাঠানো হল; কিন্তু তারই সঙ্গে আছে আব্রামসনের একখানা চিঠি। আব্রামসন লিখছে :

'প্রিয় কমরেড বানচাক,

'একজন ভাল কমরেডকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। নাম আন্না পোগুদ্‌কো। তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ আমদের মেনে নিতে হয়েছে। আশা করি তাকে পাকা মেসিন-গানার করে তুলতে পারবেন। মেয়েটিকে আমি চিনি। আমি বিশেষ সুপারিশ করতে পারি, কর্মী হিসাবে মেয়েটির দাম হয় না। শুধু অনুরোধ করছি, একটা জিনিসের ওপর নজর রাখবেন : মেয়েটি বিচ্ছু, স্বভাবে একটু উগ্র (এখনো পুরোপুরি যৌবনে পা দেয়নি)। অবিমৃষ্যকারিতার হাত থেকে ওকে বাঁচাবেন। নজর রাখবেন।

'শেখানোর কাজে তাড়াতাড়ি করুন। শোনা যাচ্ছে, কালেদিন আমাদের আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছে।

'বিপ্লবী অভিনন্দন সহ,

'আব্রামসন।'

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার দিকে তাকাল বানচাক। সদর দপ্তরের জন্যে মাটির নীচের ঘরটা তাকে দেওয়া হয়েছে। ঘরের ম্লান আলোয় ছায়া পড়েছে মেয়েটির মুখে, মুখের রেখাগুলো ঢেকে দিয়েছে।

—'আচ্ছা, বেশ!' অশোভনভাবেই বলে উঠল বানচাক। 'যদি এতই ইচ্ছে আপনার...আর আব্রামসনও অনুরোধ করেছেন, থাকুন।'

মেসিনগানের চারপাশে ভিড় করে, এ ওর কাঁধে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে সবাই

কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখতে লাগল, পাকা হাতে বানচাক কেমন করে প্রতিটি অংশ খুলে ফেলছে। প্রতিটি অংশের কাজ বুঝিয়ে, নাড়াচাড়া করার কায়দা কানুন শিখিয়ে দিয়ে আবার জোড়া লাগাল সে। শিখিয়ে দিল, কি করে গুলি ভরতে হয়, দেখতে হয়, কি করে বাঁকা পথে গুলি ছুটে যায়, কেমন করে পাল্লা ঠিক করতে হয়। তারপর দেখাল, কি করে শত্রুর গুলির আড়াল নিতে হয় : কায়দামাফিক জায়গায় মেসিন গান বসানো, আর গুলির বাক্সগুলো ঠিক ঠিক সাজানোর ব্যাপারটাও বোঝালো।

রুটিওয়ালা গিয়েভোর্কিয়ান্ত্‌স্‌ ছাড়া আর সতরজনই বেশ তাড়াতাড়ি শিখে ফেলল। যতবারই বানচাক তাকে বোঝাল, ততবারই ভুল করল; অবশেষে মাথা গুলিয়ে, ধন্দ হয়ে বিড়বিড় করতে লাগল :

—'ঠিক হয় না কেন রে? দূর...আমি একটা মুখ্যু...এটা তো ওখানে বসবে... আর এখন হচ্ছে না কেন!' হতাশ হয়ে চিৎকার করে উঠল সে। 'হচ্ছে না কেন?'

—'হচ্ছে না এইজন্যে!' তাকে ভেংচে বোগাভোই বলে উঠল : 'তুমি একটা হাঁদারাম, তাই হচ্ছে না। ওটা এইখানে বসবে।' দৃঢ়-প্রত্যয়ে সে মেসিনগানের অংশটা ঠিক জায়গাতেই বসিয়ে দিল।

—'একেবারে হাঁদারাম।' হেঁপো-রুগী, জার্মান রেবিণ্ডার সায় দিলে বলল।

শুধু বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল স্তেপানোভ্‌, তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল :

—'দাঁত না খিঁচিয়ে, নিজের কমরেডকে দেখিয়ে দেওয়া উচিত।'

তাকে সমর্থন করল ক্রুতোগোরভ্‌, রেল-কারখানার বিশাল বপু এক মজুর।

—'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছ, হাঁদারা, আর কাজ বসে থাকবে তোমাদের জন্যে! হয় আপনার এই সঙ্‌গুলোকে শেখান, নয়তো, ফেরত পাঠিয়ে দিন, কমরেড বানচাক! বিপ্লবের বিপদ সামনে, আর ওঁরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছেন! ওঁরা আবার পার্টির লোক!' বিশাল হাতুড়ির মত মুঠোটা নাচাল সে।

প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে সবকিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করে চলল আন্না পোগুদ্‌কো। সাগ্রহে সে বানচাকের গায়ের সঙ্গে লেপটে রইল, জামার হাতা ধরে টানতে লাগল; মেসিনগানের পাশ থেকে কিছুতেই সরানো গেল না তাকে।

- 'জলের-বাক্সে জল যদি জমে যায়, তাহলে কি হবে?' 'ঝোড়ো বাতাস বইলে কি ভাবে ঘোরাতে হবে?' সাগ্রহে কালো দুটি চোখ তুলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল সে।

তার উপস্থিতিতে বানচাকের কেমন যেন বাধবাধ ঠেকতে লাগল, যেন তারই শোধ নেবার জন্যে আরও বেশি কড়া হয়ে উঠল তার ওপরে, কথাবার্তায় বড় বেশি রকমের নিস্পৃহ হয়ে গেল। কিন্তু রোজ সকালে ঠিক সাতটায়, জামার হাতার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে, বিশাল ফৌজীবুট মসমস করতে করতে আন্না যখন মাটির তলার ঘরটায় ঢোকে, তখন এক উত্তেজক অনুভূতিতে মনটা কেমন যেন করে ওঠে। মেয়েটি তার চেয়ে মাথায় খাটো, সত্যিকারের স্বাস্থ্যবতী, কাঁধ দুটো সম্ভবত একটু গোল। বিশাল চোখ দুটো ছাড়া, তেমন বিশেষ সুন্দরী বলা চলে না তাকে; শুধু ওই চোখ দুটোই তার মুখে এনেছে এক বন্য শ্রী।

প্রথম চারদিন তো তার মুখের দিকে তাকাবার ফুরসতই পেল না বানচাক। ঘরটায় তেমন আলো ঢোকে না, আর যদি মুখখানা ভালো করে দেখার ফুরসতও মিলত, তাহলেও খুবই অস্বস্তিতে পড়তে হত তাকে। পাঁচ দিনের দিন সন্ধ্যেবেলায় একসঙ্গে বেরুল তারা। আগে আগে মেয়েটি। সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়ে কি যেন

প্রশ্ন করে ঘাড় ফেরাল তার দিকে। ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল উত্তরের অপেক্ষায়; তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে, চুলগুলো পেছনে সরিয়ে দিতে লাগল। কিন্তু তার প্রশ্ন শুনতে পায় নি বানচাক। আস্তে আস্তে উঠতে লাগল সিঁড়ি ভেঙে, এক মধুর বেদনাময় অনুভূতি চেপে বসল বুকে। এ অনুভূতিকে ভাল করে চেনে সে: তার জীবনের সব কটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ঘোরার সময়ে এই অনুভূতিই খোঁচা মেরেছে তাকে। মেয়েটির গোলাপি গাল দুটো, চোখের সাদা অংশের পটভূমিকায় গাঢ় নীলিমা, আর কালোবৃত্তের অতলান্ত গভীরতার দিকে তাকাতেই আবার সেই অনুভূতি জেগে উঠল। রুমালটা না খুলে চুল ঠিক করতে অসুবিধে মনে হল মেয়েটির, আর তাই করতে গিয়ে গোলাপি নাকের পাশ দুটো একটু কেঁপে উঠল। তার মুখের রেখাগুলো কঠোর অথচ শিশুর মত কোমল। তার উঁচু করা ওপরের ঠোঁটে একটু টোল খাওয়া, মুখের রঙের চেয়ে একটু বেশি লালচে। রুপোলি দাঁতে চুলের কাঁটাটা কামড়ে ধরে সহজ, সরল রূপ-কথার মত চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রইল সে, বাঁকা ভুরু দুটো কাঁপতে লাগল; মনে হল, পাইন বনের প্রভাতী মর্মরধ্বনির মত মিলিয়ে যাবে এখুনি।

প্রচণ্ড উল্লাস আর আনন্দের তরঙ্গ ভাসিয়ে নিয়ে গেল বানচাককে। যেন আঘাত খেয়ে মাথা নীচু করল, তারপর আধা-রসিকতা, আধা-গাম্ভীর্যে বলল:

—'আন্না পোগুদ্‌স্কো, আপনি যেন কারুর মুখের মত।'

—'বাজে কথা!' দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল আন্না, তারপর হাসল। 'বাজে কথা, কমরেড বানচাক! জিজ্ঞেস করছিলাম, কাল সকালে কখন যেতে হবে চাঁদ-মারিতে।'

ওই হাসিটুকুতে আরও সহজ, আরও অধিগম্য, আরও পার্থিব করে তুলল তাকে। তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল বানচাক; অন্যমনস্কের মত রাস্তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, বাড়িগুলোর মাথায় আটকে যাওয়া সূর্য সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে লাল রঙের বন্যায়। শান্ত গলায় সে উত্তর দিল:

—'সকাল আটটায়। কোনদিকে যাবেন? কোথায় যাবেন?'

শহরতলির একটা ছোট রাস্তার নাম করল আন্না। একসঙ্গে চলল দুজনে। কথা না বলে অনেক দূর চলে এল। অবশেষে তীর্যকদৃষ্টি হেনে আন্না জিজ্ঞেস করল:

—'আপনি কি কসাক?'

—'হ্যাঁ।'

—'আপনি কি অফিসার ছিলেন?'

—'আমি অফিসার!'

—'কোন জেলার লোক আপনি?'

—'নোভোচেরকাস।'

—'অনেক দিন আছেন রোস্তোভে?'

—'কয়েকদিন।'

—'তার আগে?'

—'পেত্রোগ্রাদে ছিলাম।'

—'কবে পার্টিতে এসেছেন?'

—'১৯১৩ সালে।'

—'পরিবার কোথায়?'

—'নাভোচেরকাসে।' তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে, অনুনয়ের ভঙ্গিতে হাতখানা বাড়িয়ে

দিল বানচাক। 'একটু থামুন, এবারে আমাকে প্রশ্ন করতে দিন। রোস্তোভেই আপনার জন্ম?'

—'না। আমার জন্ম ইয়েকাতেরিনোস্লাভ্ প্রদেশে, কিন্তু এখানে আছি বেশ কিছুদিন।'

—'আপনি ইউক্রেনীয়?'

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করল আন্না, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল :

—'না।'

—'ইহুদি?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু কি করে জানলেন? কথায় টান আছে আমার?'

—'না।'

—'তাহলে কি করে বুঝলেন আমি ইহুদি?'

আন্নার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার জন্যে গতি কমিয়ে দিল বানচাক, তারপর উত্তর দিল :

—'আপনার কান,—কান আর চোখের গড়ন। তাছাড়া আপনার জাতের ছাপ খুব কমই আছে।' একটু ভাবল সে, তারপর আবার বলল, 'আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন, এটা ভালই হয়েছে।'

—'কেন?' কৌতূহলভরে প্রশ্ন করল আন্না।

—'ইহুদিদের একটু বিশেষ দুর্নাম আছে! আমি জানি, সেটা সত্যি বলেই অনেক মজুর বিশ্বাস করে—বুঝতেই পারছেন, আমি নিজেই মজুর কিনা—ইহুদিরা শুধুই হুকুম চালায়, কখনো গুলির মুখে এগিয়ে যায় না। এটা সত্যি নয়। আর এটা যে সত্যি নয়, তা আপনিই খুব ভাল করে প্রমাণ করে দেবেন।'

আস্তে আস্তে হেঁটে চলল দুজনে। আন্না ইচ্ছে করেই বাড়িফেরার দূর রাস্তাটা ধরল। নিজের সম্পর্কে আরও কিছু বলার পর, কোর্নিলোভের আক্রমণ, পেত্রোগ্রাদের মজুরদের মতিগতি, নভেম্বর বিপ্লব সম্পর্কে আবার তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করল। জাহাজঘাটার কোন দিক থেকে যেন একটা বন্দুকের গুলির শব্দ কানে এল, তারপরেই স্তব্ধতা ছিন্ন করে একটা মেসিনগান গর্জে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই সে জিজ্ঞেস করল :

—'কোন জাতের মেসিনগান এটা?

—'লুইস্।'

—'কতখানি ফিতে খরচ হয়েছে?'

বানচাক উত্তর দিল না। একটা নোঙর ফেলা ট্রলার থেকে সার্চ-লাইটের আলোয় সন্ধ্যার আগুনরাঙা আকাশে কমলা রং ছড়াচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে তারিফ করতে লাগল সে।

ঘণ্টাতিনেক নির্জন শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরল দুজনে, অবশেষে ছাড়াছাড়ি হল আন্নার বাড়ির সামনে এসে।

এক আন্তরিক তৃপ্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে ঘরে ফিরল বানচাক। নিজেকে ইচ্ছে করেই ধোঁকা দেবার জন্যে মনে মনে ভাবতে লাগল :

—'চমৎকার কমরেড মেয়েটি, খুবই বুদ্ধিমতী! বড় ভাল লাগল কথা বলে। কয়েক বছরে এমন বুনো হয়ে উঠেছি, লোকের সঙ্গে বন্ধুর মত মেলামশা করা দরকার, নইলে পিঁপড়ে খাওয়া বিস্কুটের মত ঘুণ ধরে যায় মনে।

ফৌজী বিপ্লবী কমিটির এক বৈঠক থেকে ফিরে এসে তখনই মেসিন-গানার

দলের শিক্ষাদান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করল আল্লামসন। শেষে জিজ্ঞেস করল আমার কথা। বলল :

—কেমন করছে ও? যদি ওকে উপযুক্ত মনে না করেন, তাহলে স্বচ্ছন্দে ওকে অন্যকাজে লাগিয়ে দিতে পারি।'

—'না, না।' ভয় পেয়ে গেল বানচাক। 'খুবই করিতকর্মা মেয়ে।'

তার সম্পর্কে আলোচনা করার এক অদম্য ইচ্ছায় পেয়ে বসল বানচাককে, প্রচণ্ড মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে সে ইচ্ছা দমন করতে হল তাকে।

॥ পাঁচ ॥

ডিসেম্বরের আট তারিখে রোস্তোভের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্যে সৈন্য পাঠাতে শুরু করল কালেদিন। আলেক্সেভের অফিসারদের দলের পর দল এগুতে লাগল রেল-লাইন ধরে, তাদের ডান দিকে সাহায্য করতে লাগল জুংকারদের একটা ভারি দল, আর বাঁদিকে পোপোভের স্বেচ্ছাবাহিনী।

শহরের বাইরে চারপাশে ইতস্তত ছড়ানো রেড্-গার্ডদের সারিকে অস্থির উদ্বেগে পেয়ে বসল। কিছু কিছু মজুর—তাদের অনেকে জীবনে এই প্রথম রাইফেল হাতে পেয়েছে—ভয়ে কালি হয়ে গেল; কাদামাটির সঙ্গে একেবারে লেপ্টে রইল; ওদিকে মাথা তুলতে লাগল কেউ কেউ, বহুদূর থেকে এগিয়ে আসা প্রতিবিপ্লবীদের ক্ষুদে ক্ষুদে মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা সহ্য করতে না পেরে, নির্দেশের অপেক্ষা না করেই, গুলি চালাতে শুরু করে দিল রেড-গার্ডরা। প্রথম গুলির আওয়াজ কানে যেতেই গালাগাল দিয়ে উঠল বানচাক। মেসিনগানের পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিল সে, লাফিয়ে পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াল, চিৎকার করে উঠল:

—'গুলি থামাও!'

গুলির ঝাপটার শব্দে তার চিৎকার ডুবে গেল। হাত নাড়ল সে, গুলির শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার করার চেষ্টা করল, তারপর, বোগোভয়কে হুকুম দিল মেসিনগান চালিয়ে দিতে। কাদামাখা, হাসিহাসি মুখখানা মেসিনগানের পেছনদিকে এগিয়ে নিয়ে এল বোগোভয়, হাত রাখল ট্রিগারের ডাণ্ডার ওপরে। মেসিন-গানের বুলেটের চিরপরিচিত কট্ কট্ শব্দ বানচাকের কানে এসে বিঁধল। পাল্লা কতখানি নিখুঁত হল দেখবার জন্যে শত্রুর দিকে তাকাল সে, তারপর লাইন বরাবর ছুটল অন্যান্য মেসিন-গানগুলোর দিকে। চিৎকার করে উঠল:

—'চালাও গুলি!'

—'হারে-রে-রে-রে...!' ভয়ার্ত অথচ খুশী খুশী মুখখানা তার দিকে ফিরিয়ে গর্জন করে উঠল খ্ভিলিচ্কো।

মাঝখানে তৃতীয় মেসিন-গানটা যারা চালাচ্ছিল, তারা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। ওই দিকে ছুটে গেল বানচাক। মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে দূরবীণ দিয়ে

দেখতে লাগল। পরিষ্কার দেখতে পেল, বুলেটের ঘায়ে অনেকদূরের ধূসর ঢিবিগুলো ছুট্‌কে ছুট্‌কে উঠছে। মাটিতে শুয়ে পড়ে বানচাক খুব ভাল বুঝল, মেসিন-গানের পাল্লা যাচ্ছেতাই রকমের বে-ঠিক।

—'নিচু করে, ওরে হারামজাদারা, নিচু করে!' লাইন বরাবর বুকে হেঁটে এগুতে এগুতে সে চিৎকার করতে লাগল। শিষ দিয়ে বুলেট ছুটে যেতে লাগল ঠিক মাথার ওপর দিয়ে। নিখুঁতভাবে গুলি ছুঁড়ছে শত্রু, যেন একটা কুচকাওয়াজের মাঠ।

মেসিনগানের মুখটা হাস্যকরভাবে একদিকে কাত করা; তার চারপাশে এ ওর ঘাড়ের ওপর পড়ে আছে চালকরা। না থেমে গুলি ছুঁড়ে চলেছে গ্রীক মিখালিজে, বাড়তি গুলিগুলো নিরর্থক খরচ করে চলেছে। তার কাছাকাছি ভয়-বিহ্বল স্তেপানোভ, আর পেছনে উপুড় হয়ে আছে এক রেল-মজুর, পিঠটা কচ্ছপের মত উঁচু হয়ে আছে।

মিখালিজেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে অনেকক্ষণ মন দিয়ে দেখল বানচাক। আবার যখন মেসিনগান থেকে গুলি ছুটতে শুরু করল তখন সঙ্গে সঙ্গেই ফল ফলল। দৌড়ে আসছিল একদল জুংকার, তারা ঢালু বেয়ে পালাতে শুরু করল, কাদামাটির ওপরে একজন সঙ্গীকে ফেলে গেল পেছনে।

মেসিনগান ওদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেরটার কাছে ফিরে এল বানচাক। দেখল, কাত হয়ে শুয়ে শাপশাপান্ত করছে বোগোভয়, পায়ের একটা ক্ষত বাঁধছে। তার জায়গা নিয়েছে রেবিণ্ডার, বুদ্ধিমানের মত গুলি ছুঁড়ছে. হিসেব করে করে গুলি খরচ করছে, মুখে উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র নেই।

বাঁ-দিক থেকে খরগোসের মত লাফাতে লাফাতে ছুটে এল গিয়েভোরকিয়ান্‌ৎঝ, যতবার মাথার ওপর দিয়ে গুলি ছুটে গেল ততবারই মাটিতে আছড়ে আর্তনাদ ক'রে চিৎকার করতে লাগল:

—'আমি পারছি না...আমি পারছি না...গুলি ছুটছে না! মেসিনগানের মুখ আটকে গেছে!'

লাইন বরাবর বানচাক ছুটল অকর্মণ্য মেসিনগানটার দিকে। একটু দূরে থাকতেই দেখতে পেল, একপাশে হাঁটু গেড়ে আছে আন্না, এগিয়ে আসা শত্রুদের দেখছে হাতের আড়াল দিয়ে।

—'শুয়ে পড়!' বানচাক চেঁচিয়ে উঠল, তার জন্যে ভয়ে কালো হয়ে উঠল মুখ। 'শুয়ে পড়, শুয়ে পড় বলছি!'

তার দিকে তাকাল আন্না, হাঁটু গেড়ে বসেই রইল। বানচাকের মুখ থেকে অনর্গল গালাগাল বেরিয়ে আসতে লাগল। তার কাছে ছুটে গিয়ে জোরে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিল।

মেসিন-গানের ঢালের পাশে বসে হাঁপাচ্ছিল ক্রুতোগোরোভ, বানচাককে বিড় বিড় করে বলল:

—'খতম হয়ে গেছে! আর চলবে না!' ঘুরে গিয়ে ভোরাকিয়ান্‌তের দিকে তাকাতেই চিৎকারে ফেটে পড়ল সে। 'পালিয়েছে, জাহান্নমে যাক! আপনার জানোয়ারটা পালিয়েছে...হাঁউমাউ করে একেবারে মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে আমার...ঠিকমত কাজ করতে দেবে না কাউকে!'

সাপের মত এঁকে বেঁকে হামা দিয়ে উঠল গিয়ে ভোরাকিয়ান্‌ৎঝ, তার কালো দাড়িতে কাদা লেপটানো। তার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল ক্রুতোগোরেভ, তারপর গুলির আওয়াজ ছাপিয়ে গর্জন করে উঠল:

—'গুলির ফিতে কি করেছিস? জানোয়ার! ওকে সরিয়ে নিয়ে যান, বানচাক, নইলে খুন করব আমি!'

বানচাক মেসিনগানটা পরীক্ষা করল। একটা গুলি শক্ত হয়ে গিঁথে গিয়েছে ঢালের গায়ে। হাত সরিয়ে নিল বানচাক, যেন ছ্যাঁকা লাগল হাতে। মেসিনগান ঠিক করে দিল সে, নিজের হাতে গুলি ছোঁড়ার কায়দা দেখিয়ে দিল, আলেক্সেভের এগিয়ে আসা লোকদের শুয়ে পড়তে বাধ্য করল। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগল আড়াল নেবার জন্যে।

এগিয়ে আসতে লাগল শত্রুর সারি। জোরালো হয়ে উঠল তাদের গুলি। রেড-গার্ডদের তিনজন মারা পড়ল। সহকর্মীরা তাদের বন্দুক আর গুলি নিয়ে নিল: মৃতের কোন প্রয়োজন হয় না হাতিয়ারের। ক্রুতোগোরোভের মেসিন-গানের পাশে শুয়ে পড়েছিল আম্রা আর বানচাক, তাদের চোখের সামনে গুলি লেগে এক তরুণ রেড-গার্ড পড়ে গেল। মোচড়াতে মোচড়াতে আর্তনাদ করতে লাগল, মাটিতে পা আছড়াতে লাগল, অবশেষে হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে কাশল, শেষবারের মত খাবি খেল নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে। তীর্যকদৃষ্টিতে বানচাক তাকাল আম্রার দিকে। মৃত তরুণের পায়ের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বিস্ফারিত চোখে চঞ্চল আতঙ্ক জমাট হয়ে উঠল, ক্রুতোগোরোভ চিৎকার করে উঠল তা শুনতে পেল না:

—'ফিতে .ফিতে! ওরে ছুঁড়ি, একটা ফিতে এগিয়ে দে!'

পাশের দিকে জোর আক্রমণ চালিয়ে কালেদিনের সৈন্যরা রেড-গার্ডদের পেছনে হটিয়ে দিল। কালো গ্রেট-কোট, আর পলায়নপর মজুরদের উর্দিগুলো এগুতে পেছুতে লাগল শহরতলির রাস্তায় রাস্তায়। একেবারে ডান দিকের কোণের মেসিন-গানটা প্রতি-বিপ্লবীদের হাতে পড়ল। এক ঝংকারের গুলিতে মারা গেল মিখালিঝে, বেয়নেটে গিঁথে গেল দ্বিতীয় চালক, শুধু পালাতে পারল কম্পোজিটর স্তেপানোভ।

বন্দরের বিপ্লবী ট্রলারগুলো থেকে যখন গোলা ছুটতে শুরু হল, তখনই বন্ধ হল পশ্চাদপসরন। রেড-গার্ডরা ইতস্তত করে ফিরল, তারপর এগিয়ে গেল আক্রমণ করতে। আম্রা, ক্রুতোগোরোভ আর গিয়েভোরকিয়ান্‌ৎঝকে জড়ো করল বানচাক। হঠাৎ দূরের একটা বেড়ার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল ক্রুতোগোরোভ, ছোট ছোট নরমূর্তি সেখানে জমায়েত হচ্ছে। ক্রুতোগোরোভ চেঁচিয়ে উঠল:

—'ওই যে ওরা ওখানে!'

সেইদিকে মেসিনগান ঘোরাল বানচাক। বসে পড়ল আম্রা, দেখতে লাগল, বেড়ার পাশে সব নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। কিছু পরে, বেশ মেপে মেপে গুলি ছুঁড়তে লাগল প্রতি-বিপ্লবীরা, আকাশের কুয়াসাচ্ছন্ন পটে অদৃশ্য ছিদ্র সৃষ্টি করে গুলিগুলো ছুটে যেতে লাগল মাথার ওপর দিয়ে। মেসিন-গানের ভেতরে ঘুরবার সময় নাকাড়ার মত বাজতে লাগল ফিতেটা। কৃষ্ণসাগরের নৌবহরের নাবিকদের ছোঁড়া গোলাগুলো সামনে ছুটে যেতে লাগল শিস্ দিয়ে। এতক্ষণে পাল্লায় পেয়ে গেল নাবিকরা, এক জায়গায় তাক্ করে গোলা ছুঁড়তে লাগল। কালেদিনের পলায়নপর সৈন্যদের বিক্ষিপ্ত দলগুলোর মাথার ওপর ফেটে পড়তে লাগল গোলাগুলো। একটা দলের ঠিক মাঝখানে গিয়ে একটা গোলা ফেটে গেল, বিস্ফোরণের ধূসর স্তম্ভ চারদিকে মানুষজন ছিটিয়ে ফেলল। দূরবীনটা ফেলে দিয়ে, নোংরা হাতে চোখ ঢেকে আম্রা আর্তনাদ করে উঠল।

—'কি হল?' তার দিকে ঝুঁকে চেঁচিয়ে উঠল বানচাক।

ঠোঁটে ঠোঁট টিপে ধরল আম্রা, বিস্ফারিত চোখদুটো চকচক করে উঠল:

—'আমি পারব না..'

—'সাহস আনো! শুনছ...আন্না, শুনছ? অমন করতে নেই। করতে নেই...' আন্নার কানে বাজতে লাগল ধমকের স্বর।

ডানপাশে এক উপত্যকায়, একটা উঁচু ঢিবির ঢালুতে কিছু কিছু শত্রু সৈন্য জমতে শুরু করেছিল। বানচাকের চোখে পড়ল তা। মেসিনগান নিয়ে সে ছুটল আরও সুবিধাজনক জায়গায়, তারপর গুলি ছুঁড়তে লাগল উপত্যকা লক্ষ্য করে।

সন্ধ্যের দিকে প্রথম মিহি বরফ ঘুরপাক খেয়ে নামতে লাগল রুক্ষ মাটিতে। এক ঘণ্টার মধ্যেই ভেজা, চটচটে বরফে মাঠঘাঠ, কালোকালো মৃতদেহগুলো একেবারে ঢেকে গল। কালেদিনের বাহিনী হটে গেল।

রাতটা মেসিন-গানের ঘাঁটিতেই কাটাল বানচাক। শুকনো মাংস চিবুতে লাগল ফুতোগোরোভ, থুথু ফেলে শাপমন্যি করতে লাগল। এক আঙ্গিনার ফটকের কাছে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে সিগারেটের আগুনে কালসিটে পড়া হাত দুখানা গরম করতে লাগল গিয়েতোরকিয়ানৎস্থ। ঠকঠক করে কাঁপা আন্নাকে গ্রেটকোটে জড়িয়ে কার্তুজের বাক্সের ওপর বসে রইল বানচাক। চোখ থেকে হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে চুমু খেতে লাগল আন্নার হাতে। অনেক কষ্টে মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল অনভ্যস্ত কোমল কথাগুলো:

—'হয়েছে, হয়েছে; এমন কি করে হল তোমার...? তুমিত শক্ত ছিলে...আন্না, শোনো, সামলাও নিজেকে! আন্না...লক্ষ্মী...এ অভ্যেস হয়ে যাবে। তোমার গর্ব, তোমার অহঙ্কার যদি ফিরতে বাধা দেয়, তোমাকে স্বতন্ত্র হতে হবে। অমন করে তাকাতে নেই মড়ার দিকে! মনকে ওসব ভাবতে দিও না! সামলে নাও তুমি। বুঝতে পেরেছ এখন; তুমি বলেছিলে তুমি খুব শক্ত, কিন্তু মেয়েলি দিকটাই বড় হয়ে গেল তোমার!'

চুপ করে রইল আন্না। শীতের মাটি, আর মেয়েলি উষ্ণ গন্ধ তার হাতে।

ঝিরঝিরে বরফে আকাশ ঢেকে দিল বিশাল পুরু চাদরে। মাঠঘাট, আঙ্গিনা, জন্তুর মত অন্ধকারে ঘাপটি মারা শহর—সব কিছু ঢুলে পড়ল তন্দ্রার ঘোরে।

॥ ছয় ॥

ছয়দিন ধরে লড়াই চলল রোস্তোভের চারপাশে। লড়াই চলতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়, মোড়ে মোড়ে। দু দুবার স্টেশন ছেড়ে দিয়ে এল রেড-গার্ডরা, আবার দু দুবার শত্রুকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এই ছয়দিনে কাউকেই বন্দী করল না কোন পক্ষ।

একদিন দুপুরের শেষ দিকে স্টেশন পেরিয়ে যাচ্ছিল আন্না আর বানচাক। দেখতে পেল, দুজন রেড-গার্ড গুলি করে মারল এক বন্দী অফিসারকে। আন্না মুখ ফিরিয়ে নিতেই প্রায় মারমুখী ভঙ্গিতে বানচাক বলে উঠল:

—'এর অর্থ পরিষ্কার! খুন করতে হবে ওদের, দয়া না দেখিয়ে শেষ করে দিতে হবে। ওরা আমাদের দয়া দেখায় না, আর দয়া আমরা চাইও না। কেন তাহলে দয়া

দেখাতে যাব ওদের? মাটি থেকে এই আ-গাছা উপড়ে ফেলে দিতে হবে। প্রশ্ন যখন বিপ্লবের ভবিষ্যতের, তখন ভাবাবেগের কোন স্থান হতে পারে না। ঠিকই করেছে মজুররা!'

যুদ্ধের তৃতীয় দিনে অসুস্থ হয়ে পড়ল বানচাক। তবু খাড়া হয়ে রইল দিন কয়েক; অনবরত বমিবমি, আর সারা দেহে দুর্বলতা বোধ করতে লাগল। মাথার ভেতরে ভোঁ ভোঁ করা শুরু হল, অসহ্য ভারী হয়ে উঠল মাথাটা।

পনরই ডিসেম্বর ভোরবেলায় শহর ছেড়ে দিল রেড-গার্ডরা। আন্না আর কুতোগোরোভের গায়ে ভর দিয়ে, আহত আর মেসিনগান বোঝাই গাড়ির পেছনে এসে দাঁড়াল বানচাক। অসহায় দেহটা অতিকষ্টে খাড়া করে রাখল, যেন ঘুমের ঘোরে লোহার মত ভারি পা-দুটো বাড়িয়ে দিতে লাগল, শুনতে পেল, যেন বহুদূর থেকে আন্না বলছে:

—'গাড়িতে উঠুন, ইলিয়া। শুনতে পাচ্ছেন? কি বলছি, তা বুঝতে পারছেন? আপনাকে গাড়িতে উঠতে বলছি; আপনার অসুখ হয়েছে।'

কিন্তু আন্নার কথাগুলো বুঝতে পারল না বানচাক, বুঝতেও পারল না যে, সে ভেঙে পড়েছে, টাইফাসের কবলে পড়েছে। মাথাটা আঁকড়ে ধরল সে, আগুন-ঢালা, জ্বরতপ্ত মুখে লোমশ হাত দুখানা চেপে ধরল। তার মনে হল, চোখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে, আর অদৃশ্য এক পর্দার আড়ালে অন্তবিহীন, চঞ্চল জগৎটা পিছিয়ে যাচ্ছে, পায়ের নীচে থেকে সরে সরে যাচ্ছে। বিকারের ঘোরে চোখের সামনে কল্পনায় জেগে উঠতে লাগল অদ্ভুত সব দৃশ্য। কুতোগোরোভ তাকে গাড়ির ভেতরে ঢোকাবার চেষ্টা করছিল, তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে করতে বার বার থমকে দাঁড়াতে লাগল।

—'না, না! দাঁড়াও...! কে তুমি.. ? আন্না কোথায়? একটু মাটি তুলে দাও হাতে...খতম কর ওদের।...আমি হুকুম করছি, মেসিনগান চালিয়ে দাও ওদের ওপরে... দাঁড়াও, দাঁড়াও! বড় গরম!' আন্নার মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে কর্কশ কণ্ঠে সে চেঁচাতে লাগল।

জোর করে তাকে গাড়িতে তুলে দিল সবাই। মুহূর্তের জন্যে নাকে এল কড়া পাঁচ-মেশালি গন্ধ, চোখের সামনে ঝলক দিয়ে উঠল এলোমেলো নানান রঙ; নিজের চেতনাকে সজাগ রাখার জন্যে সে লড়তে লাগল আতঙ্কিত হয়ে, কিন্তু পারল না। একটা কালো, শব্দহীন শূন্যতায় ছেয়ে ফেলল তাকে। শুধু চোখের সামনে কোথায় কোন মহাশূন্যে জ্বলতে লাগল এক নীলকান্তমনির বিন্দু, আঁকিবুকি, আর এলোমেলো বিদ্যুতের লাল টকটকে আগুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

কার্নিস থেকে ঝোলা বরফ খসে খসে পড়ছে, কাঁচের মত আওয়াজ করে চুরমার হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। বরফ গলে গ্রামের বুকে জেগে উঠেছে নালা ডোবা, ভিজে সপসপে মাটি। গরুবাছুর নাকে শু'কে শু'কে ঘুরে বেড়াচ্ছে রাস্তায় রাস্তায় উঠোনে জড়োকরা কাঠকুটোর গাদায় ঠোকরাতে ঠোকরাতে চড়ুইগুলো কিচিরমিচির করছে যেন এটা বসন্ত। আস্তাবল থেকে একটা পাটকিলে রঙের ঘোড়া পালাল, মার্তিন সাশ্বিল তাকে ধরবার জন্যে বারোয়ারিতলার মধ্যে দিয়ে ছুটল। দড়িদড়ি লেজটা শূন্যে উ'চিয়ে, এলোমেলো কেশর হাওয়ায় নাচিয়ে, ঘোড়াটা ধনুকের মত বে'কে তুড়ি লাফ মারল, চাট মেরে আধ-গলা বরফের তাল ছিটিয়ে দিল, বারোয়ারিতলায় একটা চক্কর দিয়ে গির্জার পাঁচিলের কাছে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে ই'ট শু'কতে লাগল। মনিবকে অনেকটা কাছে আসতে দিল, হাতের লাগামটার দিকে আড়চোখে তাকাল, তারপর আবার ছুট মারল চারপা তুলে।

জানুয়ারী মাস উষ্ণ, মেঘাচ্ছন্ন দিনের আলিঙ্গনে মাটিকে বে'ধে ফেলছে। অকাল-বানের আশঙ্কায় ডনের ওপর নজর রাখল কসাকরা। বাড়ির পেছনের উঠোনে দাঁড়িয়ে মিরন কোরশুনভ তাকিয়েছিল মাঠের পুরু বরফের দিকে, তাকিয়ে ছিল জমাট-বাঁধা ধুসর-সবুজ ডনের দিকে, ভাবছিল: 'এবারও জমছে, গত বছরও ঠিক এমনিই জমেছিল। বরফ, বরফ আর বরফ, বরফ ছাড়া আর কিছু নেই! ভয় হচ্ছে, নীচের মাটি না শক্ত হয়ে ওঠে।'

খাকি উর্দি গায়ে মিত্কা গোয়াল পরিষ্কার করছিল। তার মাথার পেছন দিকে সাদা পশমি টুপিটা যেন যাদুবলে আটকে আছে। ঘামে ভেজা রুক্ষ চুল কপালের ওপর পড়তেই নোংরা, দুটি হাতের চেটো দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিল। গেটের সামনে গোবরের স্তূপ জমে আছে, একটা লোমওয়ালা ছাগল সেই গাদাটা মাড়াচ্ছে। বেড়ার গায়ে গাদাগাদি করে আছে, ভেড়ার পাল। মায়ের চেয়েও বড়সড় একটা ভেড়ার বাচ্চা দুধ খাওয়ার চেষ্টা করল, তার মা কিন্তু মাথা নীচু করে তাকে দূরে ঠেলে দিল। শিং-বাঁকানো একটা কালো ভেড়া লাঙলে গা ঘসতে লাগল।

মাড়াই-উঠোনে চলে এল মিরন, বাদবাকি খড়ের পরিমাণ পেশাদারী দৃষ্টিতে হিসেব করতে লাগল। ছাগলে জনারের খড় ছড়িয়ে ফেলেছে, সেগুলো জড় করতে শুরু করল। কিন্তু কানে কানে এল অপরিচিত কণ্ঠস্বর। আঁচড়টা গাদার ওপর ফেলে দিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এল সে।

পা-ফাঁক করে দাঁড়িয়ে মিত্কা একটা সিগারেট পাকাচ্ছে, তার দু আঙুলের ফাঁকে দামী কাজকরা তামাকের থলেটা ধরা। থলেটা তার কোন গ্রাম্য প্রেয়সীর উপহার। তার সঙ্গে রয়েছে খ্রিস্তোনিয়া আর ইভান আলেক্সিয়েভিচ। খ্রিস্তোনিয়া তার টুপির

ভেতর থেকে তামাকের কাগজ বার করছে। বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে ইভান আলেক্সিয়েভিচ পা-জামার পকেট হাতড়াচ্ছে। তার চাঁছাছোলা মুখে বিরক্তির চিহ্ন, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সে কি যেন খুঁজে পাচ্ছে না।

—'ভাল তো মিরন গ্রিগরিয়েভিচ্?' ক্রিস্তোনিয়া মিরনকে সম্ভাষণ করল।

—'ভাল!'

—'আসুন, তামাক খান।'

—'না, এখুনি খেলাম।'

তেকোণা টুপিটা খুলে নিয়ে মিরন ওদের সঙ্গে করমর্দন করল, খোঁচা খোঁচা সাদা চুলে হাত বুলিয়ে একটু হাসল। জিজ্ঞেস করল :

—'আমাদের কাছে কি তোমাদের কোন কিছু দরকার আছে?'

ক্রিস্তোনিয়া তার আপাদ-মস্তক চোখ বুলাল, তখন তখনই উত্তর দিল না। কাগজে থুথু ফেলে খসখসে বিশাল জিভ দিয়ে ঘসল, তারপর সিগারেট পাকিয়ে নিয়ে উত্তর দিল :

—'মিত্‌কার সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

কাঁধে একটা জাল নিয়ে ঠাকুর্দা গ্রীসাকা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। টুপি খুলে নিয়ে ইভান আর ক্রিস্তোনিয়া তাকে নমস্কার করল। সিঁড়ির ওপরে জালটা নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াল সে। বলল :

—'বলি, ঘরে বসে রয়েছ কেন, সেপাইরা? বৌ নিয়ে খুব মজা লুঠছ?'

—'কেন, কি হয়েছে!' ক্রিস্তোনিয়া প্রশ্ন করল।

—'থামো, ক্রিস্তোনিয়া! বলো না যে কিছুই জানো না!'

—'সত্যি, আমি জানি না!' ক্রিস্তোনিয়া উত্তর দিল। 'যিশুর দিব্যি, দাদু, আমি কিছুই জানি না।'

—ভোরোনেঝ থেকে সেদিন একজন লোক এসেছিল, এক ব্যবসাদার, সার্জি মোখোভের বন্ধু, না কি রকম আত্মীয় : তা ঠিক জানি না। যাই হোক, সে এসে বললে, নতুন ধরনের সেপাইরা, বলশাক না কি, তারা চেরত্‌কোভে এসে পৌঁছেছে। রাশিয়া আমাদের সঙ্গে লড়তে আসছে। আর তোমরা ঘরে বসে আছ! যতসব ষাঁড়ের গোবর...তোর কানে যাচ্ছে, মিত্‌কা? হাঁ না কিছুই বলবি নে? তোমরাই বা এ সম্পর্কে কি মনে কর?'

—'আমরা এ সম্পর্কে কিছুই মনে করি না!' ইভান আলেক্সিয়েভিচ হাসল।

—'কিছু মনে করো না, সেই তো লজ্জার কথা!' বুড়ো গ্রীসাকা রেগে টং। 'ফাঁদ পেতে তিতির পাখির মত পাকড়াবে তোমাদের! চাষারা ধরে নিয়ে গিয়ে তোমাদের নাক থেঁতলাবে!'

অলক্ষ্যে হাসল মিরন গ্রিগরিয়েভিচ। ক্রিস্তোনিয়া তার অনেকদিন না-কামানো গালে হাত ঘসল। মিত্‌কার দিকে তাকিয়ে ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ সিগারেট টানতে লাগল, আর মিত্‌কার দুই চোখে আগুনের কনা ঝিলিক মেরে উঠতে লাগল। সে হাসছে, না চাপা বিরক্তিতে গরগর করছে তা বলা অসম্ভব।

আরও কিছু কথাবার্তার পর ইভান ও ক্রিস্তোনিয়া মিরনের কাছ থেকে বিদায় নিল। মিত্‌কাকে গেটের কাছে ডেকে নিয়ে এসে ইভান ধমক দিল :

—'কালকের বৈঠকে যাওনি কেন?'

—'সময় পাইনি।'

—'কিন্তু মেলেখফদের বাড়ি যাবার তো সময় পেয়েছিলে?'

মাথার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মিত্‌কা টুপিটাকে একেবারে কপালের ওপর এনে ফেলল, চাপা ক্রোধে বলল :

—'যাইনি, যাইনি, ব্যস ফুরিয়ে গেল। এ নিয়ে আলোচনায় সময় নষ্ট করে লাভ কি?'

—'তুমি আর পিয়োত্রা মেলেখফ ছাড়া গ্রামের সব লড়াই-ফেরতারাই গিয়েছিল। গ্রাম থেকে কামেনস্কায় প্রতিনিধি পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেছি আমরা। ২৩শে জানুয়ারি সেখানে লড়াই-ফেরতাদের সভা হবে। লটারি করে আমরা ঠিক করেছি, আমি, ক্রিস্তোনিয়া আর তুমি যাব।'

—'আমি যাচ্ছি না।' মিত্‌কা দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল।

—'তোমার মতলব কি হে?' ভুরু কুঁচকে ক্রিস্তোনিয়া তার উর্দির বোতাম চেপে ধরল। 'সাথী সাঙাৎদের ছেড়ে যাচ্ছ?'

—'পিয়োত্রা মেলেখফের সঙ্গে ওর গলায় গলায় ভাব।' ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ বলে উঠল। সে যে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, তা নজরে পড়ল। ক্রিস্তোনিয়ার জ্যাকেটের হাতা ধরে নাড়া দিয় বলল : 'চলো, চলো। এখানে আর কিছু করার নেই। তা হলে তুমি যাবে না, মিত্রি?'

—'না। বলেছি তো না, আমার সাফ কথা।'

চোখের দিকে না তাকিয়ে মিত্‌কা হাতটা বাড়িয়ে দিল। তারপর বিদায় নিযে পেছন ফিরে রান্নাঘরে চলে গেল।

—'নিমকহারাম!' ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ বিড়বিড় করে উঠল, তার নাকের পাশ দুটো ফুলে উঠল। মিত্‌কার পেছনে তাকিয়ে উঁচুগলায় বলে উঠল : 'নিমকহারাম!'

বাড়ি ফেরার পথে তারা লড়াই-ফেরতা জনকয়েককে জানিয়ে দিল, মিত্‌কা যেতে অস্বীকার করেছে, তারা দুজনই পরের দিন সভায় যোগ দিতে রওনা হবে।

॥ দুই ॥

তারা তাতার্স্ক থেকে রওনা হল একুশে জানুয়ারি। ইয়াকোভ পোদ্‌কোভা তাদের কামেন্‌স্কা পর্যন্ত পেঁছে দিতে রাজী হল। তার ভাল জাতের ঘোড়া দুটো খুব তাড়াতাড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে এসে তাদের চড়াই-পথে টেনে নিয়ে চলল। বরফগলায় রাস্তা বেরিয়ে পড়েছে, যেখানে যেখানে বরফ গলেছে স্লেজ সেখানে মাটিতে আটকে ঝাঁকুনি দিতে লাগল, ঘোড়া দুটো গলার দড়িতে টান মারতে লাগল। স্লেজের পেছন পেছন হেঁটে চলল কসাকরা। ভোরের বাতাসে লাল টকটকে হয়ে, জুতোর নীচে মিহি বরফ গুঁড়িয়ে পোদ্‌কোভা পাশে পাশে হেঁটে চলল। রাস্তার ধারের গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের ওপর দিয়ে চড়াই-পথে উঠতে গিয়ে হাঁপাতে লাগল ক্রিস্তোনিয়া। ১৯১৬ সালে দ্‌ভিনাতে জার্মান গ্যাস ঢুকেছিল ফুসফুসে, তাই সে খাবি খেতে লাগল।

পাহাড়চুড়োয় বাতাস আরও জোরালো, আরও কনকনে। কসাকরা চুপ করে রইল। ভেড়ার চামড়ার কলারে মুখ ঢেকে নিল ইভান অলেক্সিয়েভিচ্। একটা বনের কাছাকাছি

এসে পৌঁছল সবাই। রাস্তাটা এই বন ভেদ করে একটা টিবির মাথায় গিয়ে উঠেছে। বনের মধ্যে হুহু করে বাতাস বইছে। রসালো ওকগাছের গুঁড়িতে গুঁড়িতে সোনালি-সবুজ শেওলার আঁশ আঁশ ভাঁজ পড়েছে। দূরে কোথায় একটা ম্যাগ-পাই কিচির-মিচির করে উঠল, ডানা ঝাপটে রাস্তার এপার থেকে ওপারে উড়ে গেল। উড়ে যেতে গিয়ে বাতাসের ধাক্কায় ওড়ার পথ থেকে সরে সরে আসতে লাগল, রঙিন পালকগুলো এলোমেলো হয়ে গেল, একপাশে কাত হয়ে পাখিটা প্রাণপণে উড়তে লাগল।

গ্রাম ছেড়ে আসার পর থেকে এ পর্যন্ত একটি কথাও বলেনি পোদ্‌কোভা। ইভান আলেক্সিয়েভিচের দিকে ঘুরে সে ইচ্ছে করেই বলল (স্পষ্টই বোঝা গেল, বহু চিন্তার পর সে মনের কথাই ভাষায় ব্যক্ত করছে) :

—'সভায় গিয়ে সেই চেষ্টাই করো, যাতে লড়াই না করেই কাজকম্মো করা যায়। লড়াই হলে কেউ ইচ্ছে করে লড়তে আসবে না।'

—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' খ্রিস্তোনিয়া সায় দিল। মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে মনে মনে পাখির ভাবনাচিন্তাহীন, আনন্দময় জীবনের তুলনা করতে করতে, সে ঈর্ষার চোখে ম্যাগ-পাইটার আপন খেয়ালে ওড়া দেখতে লাগল।

॥ তিন ॥

তেইশ তারিখে সন্ধ্যের মুখে তারা কামেনস্কায় পৌঁছুল। বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে কসাকরা দলে দলে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে চলেছে। সর্বদাই চোখে পড়ার মত উত্তেজনা। ইভান আর খ্রিস্তোনিয়া গ্রিগর মেলেখফের বাসা খুঁজে বার করল কিন্তু শুনল, সে বাসায় নেই। বাড়িউলী এক বয়স্ক স্ত্রীলোক, মাথায় পাকা চুল; তাদের বলল গ্রিগর সভায় গিয়েছে।

তারা যখন এসে পৌঁছুল ততক্ষণে সভার কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকগুলো জানলাওয়ালা বিরাট ঘরখানায় সমস্ত প্রতিনিধিদের জায়গা কুলোচ্ছে না, তাই অনেকে সিঁড়ির ওপর, বারান্দায়, পাশের ঘরগুলোয় ভিড় করে আছে।

প্রাণপণে কনুয়ের চাপ দিতে দিতে খ্রিস্তোনিয়া ইভানকে ফিসফিস করে বলল, 'ঠিক পেছন পেছন থেকো।' একটু ফাঁক করতে পারলে ইভান তার ভেতর দিয়ে গলিয়ে পেছন পেছন চলল। কসাকরা হেসে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সসম্ভ্রমে খ্রিস্তোনিয়ার দিকে তাকাতে লাগল। তাদের সকলের চেয়েও খ্রিস্তোনিয়া মাথায় প্রায় আধ-হাত উঁচু। পেছনের দেয়ালের দিকে গ্রিগরকে দেখতে পেল তারা। বসে বসে তামাক টানছে, আর একজন প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলছে। গ্রামের লোক দেখতে পেয়েই হাসিতে তার কালো জুলপি দুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। চেঁচিয়ে বলল :

—'আরে, এখানে তোমাদের উড়িয়ে আনল কোন হাওয়ায়? এই যে, ইভান আলেক্সিয়েভিচ্! বলি আছ কেমন, খ্রিস্তোনিয়া!'

—'খুব খারাপ না।' বিশাল হাতের মুঠোয় গ্রিগরের হাত দুটো চেপে ধরে খ্রিস্তোনিয়াও হেসে উত্তর দিল।

—'গ্রামের সবাই কে কেমন আছে?'

—'ভাল সবাই। সবাই আশীর্বাদ জানিয়েছে। তোমার বাবা বলেছেন একবার এসে দেখা করে যেতে।'

—'আর পিয়োত্রা আছে কেমন?'

—'পিয়োত্রা ' ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ বিশ্রীভাবে হাসল। 'পিয়োত্রা আমাদের সঙ্গে মেশে না।'

—'আমি জানি! নাতালিয়া আছে কেমন? ছেলেমেয়েরা? ওদের সঙ্গে দেখাটেখা হয়েছে?'

—'সবাই ভাল আছে, তোমার খবর শুধিয়েছে।'

কথা বলতে বলতেই ক্রিস্তোনিয়া টেবিলের পেছনে মঞ্চের ওপরে বসা দলটার দিকে তাকাল। পেছনে দাঁড়িয়েও সে যে কোন লোকের চেয়ে ভাল দেখতে পাচ্ছিল। অধিবেশনের মুহূর্তের বিরতির সুযোগে গ্রিগর তাদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল। ইভান তাকে গ্রামের সমস্ত খবর দিল, যে বৈঠক থেকে তাদের কামেন্‌স্কায় পাঠান হয়েছে সংক্ষেপে লড়াই-ফেরতাদের সেই বৈঠকের কথা বলল। সে পাল্টা আবার কমেন্‌স্কার হালচাল সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করল, কিন্তু টেবিলের ধারে বসে থাকা একজন লোক চিৎকার করে উঠল:

—'কসাক ভাইসব, এবার খনি-মজুরদের একজন প্রতিনিধি বলছেন। তাঁর কথাগুলো মন দিয়ে শুনতে অনুরোধ করছি, আর দয়া করে গোলমাল করবেন না।'

পুরু-ঠোঁট, মাথায় আর দশজনের মতই লম্বা একজন লোক সুন্দর চুলগুলো পেছন দিকে ঠেলতে ঠেলতে বলতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে বহুকণ্ঠের গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেল।

খনিমজুরটির আবেগতপ্ত, জ্বলাময়ী বক্তৃতার একেবারে গোড়া থেকেই গ্রিগর আর অন্যান্য কসাকরা তার প্রত্যয়জাগানো বাচনভঙ্গিতে সম্মোহিত হয়ে গেল। সে বলতে লাগল কালেদিনের বিশ্বাসঘাতক রাজনীতি সম্পর্কে, এই কালেদিন রাশিয়ার মজুর চাষীর বিরুদ্ধে কসাকদের ঠেলে দিচ্ছে। সে বলতে লাগল কসাক আর মজুরদের সমস্বার্থের কথা, বলশেভিকদের উদ্দেশ্যের কথা, এই বলশেভিকরাই আজ কসাক প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

—'খেটেখাওয়া কসাকদের দিকে আজ আমরা বন্ধুভাবে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, আমরা আশা করি, প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আমাদের 'এই লড়াইতে, লড়াই-ফেরতা কসাকদের মধ্যে আমরা বিশ্বস্ত মিত্র খুঁজে পাব।' তার রামশিঙার মত গলার আওয়াজ গম গম করে উঠল: 'জারের রুশ-জার্মান যুদ্ধের ময়দানে মজুর আর কসাকরা একই সঙ্গে খুন ঢেলেছে; আর আজ বুর্জোয়াদের ঘুঘুর বাসা ভাঙবার লড়াইতেও আমরা একসঙ্গে থাকব। আমরা একসঙ্গে থাকবই! যারা যুগযুগান্ত ধরে খেটেখাওয়া মানুষদের শেকলে বেঁধে রেখেছে, আমরা হাত ধরাধরি করে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে যাব।'

—'ঠিক ঠিক! হ্যাঁ, ঠিক বলছে!' মুখটা অর্ধেক হাঁ করে শুনতে শুনতে ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ বারবার বিড়বিড় করতে লাগল।

অন্যান্য বক্তার পর চুয়াল্লিশ নম্বর রেজিমেন্টের একজন প্রতিনিধি উঠে দাঁড়াল। নিজের এলোমেলো, শক্ত শক্ত কথার ভারে সে যেন নেতিয়ে পড়ল; মনে হল, বক্তৃতা দেওয়াটা তার কাছে হাওয়ায় দাগ কাটার মতই কষ্টকর। কিন্তু কসাকরা বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গেই তার কথাগুলো শুনতে লাগল, শুধু ক্বচিৎ কখনো সমর্থনসূচক

চিৎকার করে যা একটু আধটু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে লাগল। স্পষ্টই বোঝা গেল তার কথাগুলো কসাকদের মধ্যে রীতিমত সাড়া জাগিয়ে তুলছে।

—'ভাইসব! আমাদের এই সভায় এই গুরুতর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে হবে, যাতে তা লোকের কাছে লজ্জাকর না হয়ে ওঠে, যাতে সবকিছু ধীরশান্তভাবে, সবকিছু ভালভাবে সমাধা হতে পারে। আমি যা বলতে চাইছি তা এই যে, জঘন্য লড়াইকে বাদ দিয়ে আমাদের পথ খুঁজে নিতে হবে। এমনিতেই তো সাড়ে তিন বছর আমরা ট্রেঞ্চে পচেছি, আর যদি এখন আমাদের আবার লড়তে হয় তাহলে কসাকরা এমনিতেই মারা পড়বে...'

—'ঠিক ঠিক!'

—'আমরা লড়াই চাই না।'

—'ফৌজী পরিষদ আর বলশেভিকদের সঙ্গে আমরা এ নিয়ে আলোচনা করব।'

সভাপতি পোদ্‌তিয়েলকোভ টেবিলের ওপর দুম দুম করে কিল মারতেই হৈচৈ থেমে গেল। চুয়াল্লিশ নম্বর রেজিমেণ্টের প্রতিনিধিটি বলে উঠল :

—'নোভোচেরকাসে আমরা প্রতিনিধি পাঠাব, স্বেচ্ছাসেবক আর পার্টিজানদের এখান থেকে চলে যেতে অনুরোধ করব। আর বলশেভিকদেরও এখানে কিছুই করার নেই। মেহনতকারীদের দুশমনের মোকাবেলা আমরা নিজেরাই করতে পারব। আমরা কারুর কাছ থেকেই কোন রকম সাহায্য চাইনে, যদি দরকার হয়, তাহলে তখন সাহায্যের জন্যে ডাকব।'

লিস্তনিৎস্কির রেজিমেণ্টে লাগুতিন নামে যে কসাকটি ছিল, চুয়াল্লিশ নম্বর রেজিমেণ্টের প্রতিনিধির পর সে বলতে উঠে জ্বলাময়ী ভাষায় পাল্টা জবাব দিল। অনবরত চিৎকারে সে বাধা পেতে লাগল। প্রস্তাব করা হল, দশ মিনিটের জন্যে সভার কাজ বন্ধ রাখতে হবে; কিন্তু যেই সব চুপচাপ হল, পোদ্‌তিয়েলকোভ চিৎকার করে উত্তেজিত কসাকদের বলতে লাগল :

—'কসাক ভাইসব! এখানে আমরা তর্ক করছি, আলোচনা করছি কিন্তু মেহনতী মানুষের দুশমন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে না। নেকড়ের পেটও ভর্তি থাক, ভেড়াটাও বহাল তবিয়তে থাকুক, সবাই ভাবছি এমন হলে ভাল হয়, কিন্তু কালেদিন যা ভাবছে তা ঠিক এরকম নয়। তার সইকরা একটা নির্দেশনামা আমরা ধরে ফেলেছি, তাতে আছে, যারা যারা এই সভায় যেগ দেবে তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। সেটা চেঁচিয়ে পড়ে শোনাচ্ছি।'

নির্দেশনামা পড়ে শোনাতে শোনাতেই প্রতিনিধিদের উত্তেজনার ঢেউ উঠল, এমন হট্টগোল শুরু হল যা আগের চেয়েও বেশি। অবশেষে বহুকণ্ঠের গর্জন থামল। আর মঞ্চের ওপর থেকে কসাক ক্রিভোশ্‌লিকোভের মেয়েলি সরু গলার স্বর ধীরে ধীরে নেমে আসা স্তব্ধতার বুকে গিয়ে তীরের মত বিঁধল :

—'কালেদিন ধ্বংস হোক! কসাক সামরিক বিপ্লবী পরিষদের জয় হোক!'

জনতা হুংকার দিয়ে উঠল। প্রচণ্ড আওয়াজের ঝাপটের মধ্যেই সমর্থনসূচক চিৎকার কানে এল। হাতটা শূন্যে তুলে দাঁড়িয়ে রইল ক্রিভোশ্‌লিকোভ, শুধু আঙুলগুলো এ্যাস্‌পেন-গাছের পাতার মত একটু একটু কাঁপতে লাগল। কান-ফাটানো চিৎকার থামতে না থামতেই সে তেমনি সরু, মেয়েলি গলায় চেঁচিয়ে উঠল :

—'আমি প্রস্তাব করছি, এখানে যে প্রতিনিধিরা উপস্থিত আছেন তাঁদের মধ্যে

থেকে কসাক সামরিক বিপ্লবী সমিতি নির্বাচন করা হোক, আর নির্দেশ দেওয়া হোক সেই সমিতি লড়াই চালিয়ে যাবে কালেদিনের বিরুদ্ধে আর অন্যান্য সব...'

—'হো-ও-ও-ওঃ!' গোলাফাটার মত একটা চিৎকার জেগে উঠল, ছাদ থেকে একটুকরো পলেস্তারা খসে পড়ে গেল।

তখন তখনই সভায় সমিতির নির্বাচন পর্ব শুরু হয়ে গেল। চুয়াল্লিশ নম্বর রেজিমেণ্টের প্রতিনিধির মোড়লিতে একটা ছোট দল কালেদিনের সরকারের সঙ্গে গোলমালের একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান করার কথা বলতে লাগল। কিন্তু বেশির ভাগই তাদের আর সমর্থন করল না। কালেদিনের গ্রেপ্তারী নির্দেশনামা কসাকদের ক্ষেপিয়ে দিল, তারা দাবি জানাল সক্রিয় প্রতিরোধের।

রেজিমেণ্টের দপ্তরে জরুরি তলব পড়ায় নির্বাচনের শেষ পর্যন্ত গ্রিগরের থাকা সম্ভব হল না। বাইরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্রিস্তোনিয়া আর ইভানকে বলল :

—'সব মিটে গেলে আমার ঘরে চলে এসো। কে কে ঠিক হল জানবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রইলাম।'

রাত হয়ে যাবার পর হাজির হল ইভান। গ্রিগর দরজার মুখেই দাঁড়িয়েছিল, তাকে জানাল :

—'সভাপতি হয়েছে পোদ্‌তিয়েলকোভ, আর ক্রিভোশ্‌লিকোভ সম্পাদক।'

—'সভ্য কারা কারা?'

—'ইভান লাগুতিন, গোলোভাচেভ্‌, মিনায়েভ্‌, কুদিনোভ্‌ আর জনকয়েক।'

—'কিন্তু ক্রিস্তোনিয়া কোথায়?' গ্রিগর জিজ্ঞেস করল।

—'জনকয়েক কসাকের সঙ্গে সে গিয়েছে কামেন্‌স্কার কর্তাব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে। সে কি করে যেন ব্যবস্থ করে নিল, আমি থামাতে পারলাম না।'

॥ চার ॥

ভোরের আগে ফিরতে পারল না ক্রিস্তোনিয়া। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল, নীচু গলায় কি যেন বিড়বিড় করতে লাগল। আলো জ্বালাল গ্রিগর, দেখতে পেল, তার মুখখানা রক্তে মাখানো, কপালে আড়াআড়িভাবে গুলি ঘসড়ে যাওয়ার দাগ।

—'কে করেছে? বেঁধে দেব? দাঁড়াও দাঁড়াও, ব্যাণ্ডেজ বার করছি।' লাফ দিয়ে গিয়ে গ্রিগর তার ফার্স্ট-এডের থলেটা নিয়ে এল।

—'সেরে যাবে, তাড়াতাড়িই সেরে যাবে, কুকুরের যেমন করে সারে।' ক্রিস্তোনিয়া গর গর করতে লাগল। 'ফৌজী কমাণ্ডার তার নিজের পিস্তল ছুঁড়েছে। আমরা তার কাছে গেলাম ভদ্রলোকের মতন সবরকমের সম্মান দেখালাম, আর সে কিনা নিজে বাধা দিতে এল। আর একজন কসাককেও ঘায়েল করেছে। ভেবেছিলাম, ওর কলজেটা টেনে বার করি, দেখি অফিসারের কলজে কেমন হয়, কিন্তু আর সবাই তা করতে দিল না। নইলে ওকে আমি দেখিয়ে দিতাম!'

॥ পাঁচ ॥

কামেন্‌স্কায় লড়াই-ফেরতাদের সভা হবার ঠিক আগেই গ্রিগরের বন্ধু লেফটান্যাণ্ট ইঝ্‌ভারিন রেজিমেণ্ট থেকে পালিয়ে গেল। পালাবার আগের দিন রাত্রে সে গ্রিগরের কাছে এসেছিল, কোন পথে যাবে সে সম্পর্কে অস্পষ্ট ইঙ্গিতও করেছিল। বলেছিল :

—'এ অবস্থায় রেজিমেণ্টে কাজ করা আমার পক্ষে কষ্টকর। বলশেভিক আর পুরনো রাজতন্ত্রী—এই দুই চরম শাসন-ব্যবস্থার মাঝখানে কসাকরা দুলছে। কালেদিনের সরকারকে কেউ সমর্থন করতে চায় না, তার একমাত্র কারণ, সে এমন হাবভাব করছে যেন শিশুর হাতে নতুন খেলনা পড়েছে। যা দরকার, তা হচ্ছে, একজন শক্ত, জবরদস্ত মানুষ, যে বিদেশীদের যথাস্থানে পাঠাবে। কিন্তু আমার মতে, এখন কালেদিনকে সমর্থন করাই ভাল, নইলে আমরা সবকিছুই হারাব।' একটু চুপ করে সেই অবসরে সিগারেট ধরিয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার মনে হচ্ছে তুমি 'লাল' মত মেনে নিয়েছ?'

—'প্রায়।' গ্রিগর স্বীকার করেছিল।

—'মনে প্রাণে? না কি গোলুবোভের মত, কসাকদের কাছে নাম কেনার জন্যে?'

—'আমার নাম কেনার কোন দরকার নেই। আমি নিজেই পথ খুঁজছি।'

—কিন্তু তুমি কানাগলিতে পড়েছ, পথ তুমি খুঁজে পাওনি।'

—'দেখা যাক...'

—'আশঙ্কা হচ্ছে, আমরা শত্রু হিসেবেই মুখোমুখি দাঁড়াব গ্রিগর।'

—'লড়াইএর ময়দানে কোন শত্রুই বন্ধু নয়।' গ্রিগর হেসেছিল।

আরও কিছুক্ষণ বসে বসে ইঝভারিন গল্প করেছিল তারপর বিদায় নিয়েছিল। পরদিন সকালেই সে বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

॥ ছয় ॥

সভার সমস্ত সদস্যদের গ্রেপ্তার ও সবচেয়ে বিপ্লবী কসাক ডিভিসনগুলোকে নিরস্ত্র করার জন্যে কালেদিন যে দশ নম্বর ডন-কসাক রেজিমেণ্টকে পাঠিয়েছিল সেই রেজিমেণ্ট পরদিনই কামেন্‌স্কায় এসে পেঁছুল। যখন ট্রেন থেকে নামল, ঠিক তখন স্টেশনে একটা সভা হচ্ছে। নবাগত কসাকরা সভার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল, অন্যান্য রেজিমেণ্টের লোকজনের সঙ্গে মিশে গেল। বলশেভিকরা তখন তখনই তাদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনার যে গাঁজলা তুলে দিল, তা খুব তাড়াতাড়িই কাজ করল। রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার যখন কালেদিনের হুকুম তামিল করতে বলল, তারা অস্বীকার করে বসল।

ইতিমধ্যেই কামেন্‌স্কা তৎপরতায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে; তাড়াহুড়ো করে জড়ো করা কসাক ডিভিসনগুলো পাঠান হচ্ছে বিভিন্ন কেন্দ্র দখল করতে; সৈন্য-বোঝাই ট্রেন পাঠান

হচ্ছে। প্রতি বাহিনীতে অফিসারদের নির্বাচন করা হচ্ছে। যারা লড়াই এড়াতে চায়, তারা নিঃশব্দে শহর থেকে কেটে পড়ছে, অথচ তখনো বিভিন্ন গ্রাম থেকে দেরি করে পাঠানো প্রতিনিধিরা সভায় যোগ দিতে আসছে। কামেন্‌স্কায় রাস্তায় রাস্তায় এমন প্রাণচাঞ্চল্য আগে আর কখনো দেখা যায়নি।

ছাব্বিশে জানুয়ারি ডনের ফৌজী সরকারের এক প্রতিনিধি দল শহরে এল আলাপ-আলোচনার জন্যে। স্টেশনে এক বিরাট জনতা তাদের দেখতে এল। আতামানের দেহরক্ষী দলের কসাকরা তাদের পথ দেখিয়ে পোস্টাপিসের বাড়িতে নিয়ে এল, ফৌজী বিপ্লবী সমিতি সেখানে সরকারী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনায় সারারাত কাটিয়ে দিল।

সম্মেলনে কোন ফয়সালা হল না। রাত প্রায় দুটোর সময় যখন বোঝা গেল একমত হওয়া যাবে না, তখন প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য প্রস্তাব করল ফৌজী বিপ্লবী সমিতির তরফ থেকে নোভোচেরকাশে একটা প্রতিনিধি দল পাঠানো হোক, যাতে করে ভবিষ্যৎ সরকার গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যেতে পারে। প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

ডন-সরকারের প্রতিনিধিরা চলে গেল, তাদের পিঠে পিঠেই ফৌজী বিপ্লবী সমিতির প্রতিনিধিরা নোভোচেরকাশে রওনা হল। পোদ্‌তিয়েলকোভ তাদের নেতা। আতামান রেজিমেণ্টে যে অফিসারদের কামেন্‌স্কায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের প্রতিভূ হিসাবে আটকে রাখা হল।

॥ সাত ॥

গাড়ির জানলার বাইরে তুষার-ঝড় গর্জন করে ফিরছে। ভগ্ন-প্রায় বরফের বেড়ার ওপরে হাওয়ায় জড়ো করা বরফের স্তূপ চোখে পড়ছে। কেবিনঘর, টেলিগ্রাফের খুঁটি আর সীমানাহীন, রুক্ষ, বরফাচ্ছন্ন একঘেয়ে স্তেপ উত্তরে সরে সরে যাচ্ছে। কামরাটা হিমশীতল, তামাকের ধোঁয়ায় অন্ধকার। নোভোচেরকাশে তাদের দৌত্য সম্পর্কে প্রতিনিধি দলের কোন সদস্যই কিছুমাত্র আশা রাখে না। কথাবার্তা যা হল, তা অতি সামান্যই। বুকচাপা নিস্তব্ধতা। অবশেষে পোদ্‌তিয়েলকোভ সকলের মনের কথাটাই প্রকাশ করে বসল :

—'কিছুই হবে না। আমরা রাজি হতে পারব না।'

আবার তারা চুপচাপ বসে রইল। তারা এসে পড়ল নোভোচেরকাশের কাছাকাছি। মিনায়েভ বলতে শুরু করল :

—'আগের দিনে আতামান রেজিমেণ্টের মেয়াদ ফুরুলে কসাকরা বাড়ি ফেরার জন্যে তল্পিতল্পা বাঁধত। বাক্স বোঝাই করে, ঘোড়া আর জিনিসপত্তর রেলগাড়িতে চাপাত। গাড়ি ছেড়ে দিত। আর ঠিক ভোরোনেঝের কাছে এসে, যেখানে রেল লাইন প্রথম ডনের ওপর দিয়ে গিয়েছে, ইঞ্জিনের ড্রাইভার আস্তে আস্তে চালাতে শুরু করে দিত, যত আস্তে পারা যায়...সে জানত সামনে কি আসছে আর যেই গাড়িটা পুলের ওপর উঠত...আরে ব্বাস্‌! সে এক দেখার জিনিস! কসাকরা একেবারে পাগল হয়ে যেত :

"ডন'! ডন! শান্ত ডন! আমাদের বাপ; আমাদের অন্নদাতা! জয়, জয়, ডনের জয়!'
আর জানালার ভেতর দিয়ে, পুল পেরিয়ে ডনের জলে গিয়ে পড়ত টুপি, পুরনো উর্দি, পা-জামা, সার্ট, আরও কত কি, তা ভগবানই জানে! মেয়াদ শেষ করে ফেরার পথে তারা ডনকে উপহার দিত। জলের দিকে তাকালে মাঝে মাঝে মনে হত, নীল আসমান টুপিগুলো যেন রাজহাঁস কিংবা ফুলের মত ভেসে চলেছে...এটা ছিল অনেক-কালের পুরনো রীতি।'

ট্রেনের গতি আস্তে আস্তে কমে গেল, অবশেষে একসময় থেমে গেল। কসাকরা উঠে পড়ল। জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে মুখ বেঁকিয়ে হেসে ক্রিভোশ্‌লিকোভ বলল :

—'তাহলে, এসে পৌঁছুনো গেল নেমন্তন্নবাড়িতে!'

—'অতিথিদের খুব ভালরকম অভ্যর্থনা করবে না কিন্তু!' স্কাচ্‌কোভ ঠাট্টা করার চেষ্টা করল।

লম্বামত এক ক্যাপ্টেন জানান না দিয়েই দরজা খুলে কামরার মধ্যে ঢুকে পড়ল। প্রতিনিধি দলের সদস্যদের ভাল করে দেখে নিল। তার চোখে শত্রুর দৃষ্টি। তারপর ইচ্ছাকৃত কর্কশভাবে বলল :

—'আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবার নির্দেশ পেয়েছি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কামরা থেকে বেরিয়ে আসুন, বলশেভিক মহোদয়গণ। জনতা আর...আপনাদের নিরাপত্তার কোন গ্যারান্টি আমি দিতে পারব না।'

তারা বেরিয়ে আসতেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা, লম্বা জুলপিওয়ালা এক অফিসার চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে, হারামজাদারা, বিশ্বাসঘাতকরা!' ফ্যাকাসে হয়ে গেল পোদ্‌তিয়েলকোভ, বিমূঢ় দৃষ্টিতে ক্রিভোশ্‌লিকোভের দিকে তাকাল। অফিসারদের বেশ ভালরকম একটা দল প্রতিনিধি দলকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল। রাস্তাতেই খতম করে দেবার দাবী জানাতে জানাতে এক উন্মত্ত জনতা তাদের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী প্রধান দপ্তরের একেবারে দরজা পর্যন্ত চলে এল। শুধু অফিসার আর জুংকাররাই নয়, সুবেশা মহিলা, ছাত্ররা, এমন কি জনকয়েক কসাকও তাদের খিস্তি করতে লাগল।

যত লোক জড় হয়েছে সবাই আঁটবার মত বড় নয় সরকারী দপ্তরের ঘরখানা। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা টেবিলের একধারে বসে থাকতে থাকতেই সরকারী দল এসে হাজির হল। বোগায়েভ্‌স্কিকে সঙ্গে নিয়ে একটু ঝুঁকে, নেকড়ের মত দৃঢ় পদক্ষেপে কালেদিন এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। তার চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে পড়ল। অফিসারের ফিতে লাগান টুপিটা ধীরে সুস্থে টেবিলের ওপর রাখল, চুলগুলো পেছনে সরিয়ে দিয়ে, উর্দির পাশের দিকের বিরাট পকেটের বোতাম আঁটল। তারপর বোগায়েভ্‌স্কির দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে কি যেন বলল। তার প্রতিটি ভঙ্গিতে, চালচলনে নিশ্চিত, দৃঢ় প্রত্যয় আর পরিণত শক্তির সুস্পষ্ট চিহ্ন। ভাবী আলোচনা সম্পর্কে বোগায়েভ্‌স্কিকেই বেশি উত্তেজিত মনে হল। বসে বসে সে ফিসফিস করতে লাগল, ঠোঁটদুটো একটুও নড়তে দেখা গেল না, প্যাঁশ্‌নের আড়ালে বাঁকা চোখদুটো ঝকমক করতে লাগল। তার মনের বিচলিত ভাব ধরা পড়তে লাগল হাতের অস্থির নড়াচড়ায়, কখনো কলার টেনেটুনে ঠিক করতে লাগল, চোয়ালে হাত বুলাতে লাগল, কখনো বা ভুরু টেনে তুলতে লাগল। বাদবাকি সরকারী প্রতিনিধিরা কালেদিনের দুই পাশে বসে রইল। ঠিক উল্টো দিকে বসা পোদ্‌তিয়েলকোভের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জেনারেল বলল, 'মনে হয়, এবার শুরু করা যেতে পারে।'

পোদ্‌তিয়েলকোভ হাসল, সবাই শুনতে পায় এমনভাবে গলার স্বর চড়িয়ে প্রতিনিধি দলে উপস্থিতির কারণ ব্যক্ত করল। ফৌজী বিপ্লবী কমিটির তৈরি চরম-পত্রখানা বার করল ক্রিভোশ্‌লিকোভ্‌, টেবিলের ওপর দিয়ে এগিয়ে দিল, কিন্তু কালেদিন হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল :

—'প্রত্যেক সরকারী সদস্য আলাদা আলাদা করে পড়ে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। আপনাদের চরমপত্র অনুগ্রহ করে জোরে জোরে পড়া হোক। আমরা তারপর আলোচনা করব।'

ক্রিভোশ্‌লিকোভ উঠে দাঁড়াল। সামরিক আতামান ও তার সরকারের পদচ্যুতি দাবির চরমপত্র পড়ে শোনানোর সময় তার মেয়েলি সরু গলার স্বর জমাট হলঘরের মধ্যে অস্পষ্টভাবে বাজতে লাগল। তার স্বর থামতে না থামতেই কালেদিন উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করল :

—'কোন কোন দল আপনাদের এই চরমপত্রের অধিকার দিয়েছে?'

ক্রিভোশ্‌লিকোভের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে পোদ্‌তিয়েলকোভ জোরে জোরে হিসেব করতে লাগল :

—'আতামান রক্ষীবাহিনী, কসাক রক্ষীবাহিনী, ছয় নম্বর আর বত্রিশ নম্বর ব্যাটারি, চুয়াল্লিশ নম্বর রেজিমেণ্ট...'প্রতিটি ডিভিসনের নাম করার সময় বাঁ-হাতের আঙুলগুলো নোয়াতে লাগল, আর একটা বিদ্রূপের চাপা হাসি হলঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পোদ্‌তিয়েলকোভ ভুরু কোঁচকাল, লোমশ হাত দুখানা টেবিলের ওপরে রেখে গলা চড়াল : 'আটাশ নম্বর রেজিমেণ্ট, আটাশ নম্বর ব্যাটারি, সাতাশ নম্বর রেজিমেণ্ট, চোদ্দ নম্বর রেজিমেণ্ট...'

তার বলা শেষ হতেই কালেদিন গোটাকয়েক গুরুত্বহীন প্রশ্ন করল, তারপর টেবিলের ধারিতে বুকটা চেপে ধরে পোদতিয়েল কোভের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। প্রশ্ন করল :

'গল কমিসারদের সোবিয়েতের কর্তৃত্ব আপনি স্বীকার করেন?'

ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে পোদ্‌তিয়েলকোভ গেলাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল, জামার হাতায় জুলফি মুছে ভাসা ভাসা ভাবে উত্তর দিল :

—'সমস্ত জনসাধারণই কেবল তার উত্তর দিতে পারে।'

সহজ সরল পোদ্‌তিয়েলকোভ হয়ত আরও বেশি কিছু বলে ফেলতে পারে এই আশঙ্কায় ক্রিভোশ্‌লিকোভ্‌ বাধা দিয়ে বলল :

—'যে সরকারে জাতীয় স্বাধীনতাকামী দলগুলোর প্রতিনিধিরা থাকবে, এমন কোন সরকারের বিরুদ্ধাচরণ কসাকরা করবে না। কিন্তু আমরা কসাক, সরকারকে আমাদের কসাক সরকারই হতে হবে।'

—'যখন ব্রোন্‌স্তেইন আর ওই ধরনের লোকজন সোভিয়েতের মাথায় রয়েছে তখন এই মন্তব্যের কি ব্যাখ্যা আমরা করব?'

—'রাশিয়া তাদের বিশ্বাস করে, আমরাও তাদের বিশ্বাস করব।'

—'তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন?'

—'হ্যাঁ।'

টেবিলের ওপর আঙুল বাজাল কালেদিন, তারপর সপ্রশ্নভাবে জিজ্ঞেস করল :

—'বলশেভিকদের সঙ্গে আপনাদের মিল কোথায়?'

—'আমরা চাই ডন-প্রদেশে কসকদের স্বায়ত্বশাসন।'

—'তা বেশ, কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সত্তরই ফেব্রুয়ারি এক সামরিক পরিষদ ডাকা হচ্ছে? সদস্যদের নতুন নির্বাচন হবে। আপনারা যুক্ত-নিয়ন্ত্রণে রাজি আছেন?'

—'না।' চোখ তুলে তাকাল পোদ্‌তিয়েলকোভ, জোর গলায় উত্তর দিল : 'আপনারা যদি সংখ্যালঘু হন, আমরা খুশিমত আপনাদের চালাব।'

—'কিন্তু সেটা ত জোর খাটানো হবে!'

—'হ্যাঁ।'

বোগায়েভস্কি পোদ্‌তিয়েলকোভের দিক থেকে ক্রিভোশ্‌লিকোভের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল :

—'আপনারা সামরিক পরিষদকে স্বীকার করেন?'

- 'সেই পর্যন্ত করি যতক্ষণ...' পোদ্‌তিয়েলকোভ কাঁধ ঝাঁকাল।

'রেজিমেন্টে ফৌজী বিপ্লবী সমিতি জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সভা ডাকবে। ফৌজীবাহিনীর কর্তৃত্বে তার কাজ চলবে। সেই সভায় যদি খুশি না হই, তাহলে আমরা তাকে মানব না।'

—'কিন্তু এ ব্যাপারের বিচারক হবেন কারা?' কালেদিন ভুরু তুলে তাকাল।

—'জনসাধারণ।' পোদ্‌তিয়েলকোভ গর্বের সঙ্গে মাথাটা পেছন দিকে হেলাল।

কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার কালেদিন বলতে শুরু করল। হলঘরের সমস্ত কোলাহল থেমে গেল, তার অনুচ্চ শরতের মত উজ্জ্বলতাবিহীন কন্ঠস্বর নিস্তব্ধতায় স্পষ্ট বাজতে লাগল :

—'স্থানীয় ফৌজী বিপ্লবী কমিটির দাবিতে সরকার তার ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারে না। বর্তমান সরকার ডন প্রদেশের সমস্ত জনগণের দ্বারাই নির্বাচিত হয়েছে, একমাত্র তারাই—কোন বিশেষ অংশ নয়—আমাদের ক্ষমতা ছেড়ে দেবার দাবি জানাতে পারে। আপনারা বলশেভিক হাতের কলকাটি মাত্র। আপনারা নিজেদের ঘাড়ে যা নিয়েছেন, কসাকদের প্রতি তার বিরাট দায়িত্ব না বুঝেই জার্মানীর ঘুষখোরদের মত কাজ করে চলেছেন। এই ব্যাপার আবার ভেবে দেখার জন্যে আমি আপনাদের বলছি কারণ সমগ্র জনসাধারণের ইচ্ছা যে সরকারের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে আপনারা নিজের মাতৃভূমিতে ভয়াবহ দুর্দশা ডেকে আনছেন। আমি কর্তৃত্ব আঁকড়ে ধরে থাকব না। এক বিরাট সামরিক পরিষদ ডাকা হবে, এবং সেখান থেকেই দেশের ভাগ নির্ধারিত হবে। তা না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার পদে থাকব। আমি শেষ বারের মত বলছি, আপনারা আপনাদের অবস্থাটা বুঝুন।'

পোদ্‌তিয়েলকোভ তার চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিল। উত্তেজনায় তোতলাতে তোতলাতে, এক সর্বব্যাপী প্রত্যয়ের শক্তিকে ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করতে করতে কঠোরভাবে জবাব দিল :

—'ফৌজী সরকারকে যদি বিশ্বাস করা যেত তাহলে আমি সমস্ত দাবি প্রত্যাহার করতাম। কিন্তু জনসাধারণ বিশ্বাস করেনা! আমরা নই, গৃহ-যুদ্ধ শুরু করেছেন আপনারাই। আপনারা কেন কসাকদের দেশে পালিয়ে আসা জেনারেলদের আশ্রয় দিয়েছেন? সেই জন্যেই ত আমাদের এই শান্ত ডন দেশে বলশেভিকরা লড়াই করতে আসছে। আমি আপনাদের কাছে মাথা নোয়াবো না। তার আগে আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে! আমি বিশ্বাস করি না যে ফৌজী পরিষদ ডনকে বাঁচাতে পারে। কেন আপনারা খনিমজুরদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাচ্ছেন? বলুন, ফৌজী

পরিষদ যে গৃহযুদ্ধ এড়াবে তার কি গ্যারাণ্টি আছে? জনসাধারণ আর যুদ্ধ-ফেরত কসাকরা আমাদের দিকে!'

হাওয়ার মর্মর শব্দের মত একটা হাসি হলঘরের মধ্যে খেলে গেল, পোদ্‌তিয়েল-কোভের নামে ক্রোধের উদ্গারও কানে এল। সেই দিকে লালটকটকে মুখটা ফিরিয়ে, প্রচণ্ড ক্রোধ গোপন করার কোন চেষ্টাও না করে সে চিৎকার করে উঠল।

—'আজ আপনারা হাসছেন, কিন্তু শায়েস্তা হবার আগে আপনাদের কাঁদতে হবে।' কালেদিনের দিকে ঘুরে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। 'আমরা দাবি জানাচ্ছি যে, আপনি আমাদের হাতে—মেহনতী জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে সরকার ছেড়ে দিন, আর সমস্ত বুর্জোয়া আর স্বেচ্ছাবাহিনীদের সরিয়ে দিন।'

কালেদিনের অনুমতি নিয়ে ডনের ফৌজী সরকারের জনকয়েক বক্তা বিপ্লবী কমিটির সদস্যদের সঙ্গে এক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলবার চেষ্টা করতে লাগল। হলঘরে নীলচে ছায়া ঘনিয়ে এল, তামাকের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে উঠল। জানলার নীচে সূর্য তার প্রাত্যহিক পথপরিক্রমার ছেদ টেনে দিচ্ছে। বাইরের শার্সির গায়ে জমাট-বাঁধা ফারগাছের ডাল আটকে আছে।

অবশেষে আর সহ্য করতে পারল না লাগুতিন। একজন বক্তাকে বাধা দিয়ে সে কালেদিনের দিকে ঘুরে বলল:

—'যা হোক, একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো যাক: শেষ করার সময় হয়েছে।'

বোগায়েভ্‌স্কি ফিসফিস করে ভর্ৎসনা করল:

—'উত্তেজিত হবেন না, উত্তেজিত হবেন না, লাগুতিন! এক গেলাস জল খান। যার মৃগী রোগ আছে, তার পক্ষে উত্তেজিত হওয়া বিপদজনক। আর তাছাড়া, বক্তাকে বাধা দেওয়াটা তো কাজের কথা নয়; এখানে তো এটা সোবিয়েত নয়!"

একটু পরেই কালেদিন উঠল। তার উত্তর আগেই তৈরি ছিল, আর সে ইতিমধ্যেই কামেনস্কার দিকে একটা বিরাট দলকে এগুনোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তবু সে কালক্ষয় করছিল। সম্মেলন শেষ ক'রে দিল এক দীর্ঘসূত্রী প্রস্তাব দিয়ে:

—'ডন সরকার বিপ্লবী কমিটির প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখবে, আগামীকাল সকাল দশটায় লিখিত উত্তর দেবে।'

॥ আট ॥

ফৌজী বিপ্লবী কমিটির প্রতিনিধিদের হাতে ফৌজী সরকার পরদিন সকালে যে উত্তর দিল তাতে কমিটির প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হল; কমিটি ভেঙে দিয়ে সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে স্থানীয় ফৌজী পরিষদের অধীনে সঁপে দিতে বলা হল। আরও প্রস্তাব করা হল যে, ডন প্রদেশে অগ্রসর হবার ব্যাপারটির শান্তিপূর্ণ সমাধানের আলোচনার উদ্দেশ্যে ফৌজী বিপ্লবী কমিটি যেন বলশেভিকদের কাছে এক যুক্ত প্রতিনিধি দল পাঠানোর ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করে। প্রতিনিধিরা শেষের প্রস্তাবটি গ্রহণ করল। তাগানরোগে পাঠানো প্রতিনিধি দলের সদস্য হল লাগুতিন আর স্কাচ্‌কোভ্‌। পোদ্‌তিয়েলকোভ আর অন্যান্য সবাই তখনকার মত নোভোচেরকাশে

আটকে রইল। কিন্তু ইতিমধ্যেই কর্নেল চোরনেত্‌সোভের অধীনে কালেদিনের সৈন্যরা লিখি স্টেশন দখল করে কামেনস্কার দিকে এগুতে লাগল। কামেনস্কা দখল করল তিরিশে জানুয়ারি।

বিপ্লবী ফৌজকে তাড়াহুড়ো করে কামেন্‌স্কা ছেড়ে আসতে হল। ক্ষীয়মাণ কসাক কোম্পানিগুলো এলোমেলোভাবে ট্রেনে গাদাগাদি করে চাপলো, যা সহজে বহা যাবে না এরকম সবকিছু পেছনে ফেলে গেল। সংগঠনের অভাব, যথেষ্ট শক্তিমান এই সৈন্যদলগুলোকে জড়ো করে চালনা করবার মত একজন জবরদস্ত অফিসারের অভাব, ভালো করেই বুঝতে পারা গেল। তখনকার দিনে নির্বাচিত কমাণ্ডারদের মধ্যে গোলুবোভ্‌ নামে এক ক্যাপ্টেন সাধারণের ঊর্ধ্বে উঠেছিল। সে সাতাশ নম্বর জঙ্গী কসাক রেজিমেন্টের নেতৃত্ব নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই নির্মমভাবে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনল। কসাকরা তাকে নত মস্তকে মেনে নিল, যখন বুঝতে পারল গোটা রেজিমেন্টের যে গুণটির অভাব তার তা-ই আছে : আছে ঐক্য গড়ে তোলার, দায়িত্ববণ্টন আর পরিচালনার ক্ষমতা। শহর ছেড়ে আসার সময় যে সব কসাকরা গাড়ি বোঝাই করতে দেরি করছিল তাদের সে খেঁকাতে লাগল :

—'কি হল তোমার? তুমি কি লুকোচুরি খেলছ? যাও, যাও, হাত চালাও! বিপ্লবের নামে আমি এখুনি তোমাকে মেনে নিতে হুকুম করছি,...কি বললে? কে সেই বাক্যবাগীশ? আমি তাকে গুলি করব! ব্যস, ব্যস,, চুপ...! তুমি হচ্ছ ছদ্ম প্রতি-বিপ্লবী, তুমি কমরেড নও!'

আর কসাকরাও মেনে নিল। এমন কি অনেকে তার এই তর্জনগর্জন বেশ পছন্দও করল, কারণ তখনো তাদের মনে পুরনো দিনের টান আছে। আগেকার দিনে যে সবচেয়ে বেশি তর্জনগর্জন করতে পারত, কসাকদের কাছে সব সময়ে সে-ই হত সেরা কমাণ্ডার।

॥ নয় ॥

ফৌজী বিপ্লবী কমিটির দলগুলো পিছিয়ে এল গ্লুবোকায়। কার্যত নেতৃত্ব গেল গোলুবোভের হাতে। দুদিনেরও কম সময়ের মধ্যে সে বিচ্ছিন্ন দলগুলোকে নতুন করে গড়ে নিল, গ্লুবোকা দখলে রাখার দরকারী ব্যবস্থা করে ফেলল। তার দাবি অনুসারে এক সংরক্ষিত রেজিমেন্টের দুটো কোম্পানি আর আতামান রেজিমেন্টের একটা কোম্পানি নিয়ে গড়া একটা ডিভিশনের নেতৃত্ব গ্রিগর মেলেখফের হাতে দেওয়া হল।

দোসরা ফেব্রুয়ারি গ্রিগর যখন রেল-লাইনের ধার বরাবর চৌকিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে বেরুল, তখন গোধুলি নামছে। বেশ বোঝা গেল, রাত্রে বরফ পড়বে, ফুরফুরে হাওয়া বইছে পুবদিক থেকে। আকাশ পরিচ্ছন্ন। তার পায়ের নীচে খচ্‌মচ্‌ করে বরফ গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। চাঁদ উঠছে আস্তে আস্তে, উঠছে একপাশে কাত হয়ে, যেন দুর্বল কোন রুগী সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে ওপরে উঠছে। বাড়িগুলোর পেছনে স্তেপের বুক থেকে কালচে-লাল ধোঁয়া উড়ছে। এই সেই সন্ধ্যার মুহূর্তটি, যখন সমস্ত রেখা, সমস্ত রং আর দূরত্ব ঝাপসা হয়ে যায়; দিনের আলো তখনো রাত্রির সঙ্গে জট পাকিয়ে

থাকে, মনে হয় সবকিছু অবাস্তব, সবকিছু তরল। এই মুহূর্তে মনে হয়, গন্ধেরও যেন তার নিজস্ব, আরও সূক্ষ্ম ছায়া-শরীর আছে।

ঘুরে দেখার কাজ শেষ করে গ্রিগর নিজের আস্তানায় ফিরে এল। বাড়িওয়ালা এক রেল-কর্মচারী। সামোভার ধরিয়ে সে টেবিলের ধারে এসে বসল। জিজ্ঞেস করল:

—'আপনারা আক্রমণ করতে যাচ্ছেন?'

—'জানিনা।' গ্রিগর উত্তর দিল।

—'নাকি, ওদের জন্যে এখানে অপেক্ষা ক'রে থাকবেন?'

—'দেখা যাক।'

—'সেইত বুদ্ধিমানের কথা। আমার মনে হয় না যে. আক্রমণ করার মত আপনাদের কিছু আছে, সে ক্ষেত্রে অপেক্ষা করাই ভাল। জার্মানীর সঙ্গে লড়াইতে আমি মাটি খোঁড়ার দলে ছিলাম, লড়াইয়ের কায়দাকানুন বেশ ভাল করেই জানি। আপনাদের সৈন্য খুব কম?'

—'তাতেই যথেষ্ট হবে।' এই অপ্রীতিকর আলোচনা এড়াবার চেষ্টা করল গ্রিগর।

টেবিলের ওপরে হুমড়ি খেয়ে, ওয়েস্টকোটের নীচে হাত চালিয়ে চুপসানো পেটটা চুলকাতে চুলকাতে লোকটি কিন্তু প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলল।

—'অনেক কামান? বন্দুক, গোলা?'

—'আপনি ফৌজে ছিলেন; সৈনিকের কর্তব্য কি তা জানেন না?' রাগ দেখিয়ে গ্রিগর উত্তর দিল, এমন ভাঁটার মত চোখ পাকাল, যে লোকাটা চমকে পিছিয়ে গেল। 'আমাদের সৈন্য, আমাদের কায়দাকানুন সম্পর্কে প্রশ্ন করার কি অধিকার আপনার আছে? আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিয়ে জেরা করতে পাঠাব. '

—'ও হরি.. অফিসার! তাই বল'...লোকটা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল, উদ্বেগে প্রায় দম আটকে এল তার। 'আমি একটা হাঁদা...হাঁদা মাফ করবেন!'

কিছুক্ষণ পরেই দুনম্বর সংরক্ষিত দলের ছয়জন কসাক ফিরে এল। এই বাড়িতেই তাদের থাকার জায়গা হয়েছিল। হৈ চৈ করে হাসিগল্প করতে করতে তারা চা খেতে বসল। প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল গ্রিগর, কিন্তু তাদের কথাবার্তার টুকরো টাকরা কানে আসতে লাগল। একজন সেইদিনকারই একটা ঘটনা বলছিল :

—'এটা যখন ঘটে আমি তখন হাজির ছিলাম। গোরলোভ্‌কার এগার নম্বর খনি থেকে তিনজন মজুর এসে বলল, তারা দল গড়ে তুলেছে, কিন্তু তাদের হাতিয়ার নেই। তাই তারা আমাদের কাছে বাড়তি কিছু হাতিয়ার চাইল। আর পোদতিয়েলকোভ্‌... নিজের কানে শুনলাম...তাদের বলল, অন্য কোনোখানে গিয়ে চান, কমরেড, আমাদের এখানে বাড়তি কিছু নেই।' কিন্তু সে কি করে বলতে পারল যে হাতিয়ার নেই? আমি জানি, আমাদের রাইফেল মজুদ আছে। সে চায় না যে 'চাষারা' এর মধ্যে নাক গলাক...'

—'তা সে ঠিকই!' আর একজন বলে উঠল। 'ওদের হাতিয়ার দিলে ওরা লড়তেও পারে, নাও লড়তে পারে, কিন্তু যেই জমির ব্যাপার আসবে অমনি হাত বাড়িয়ে বসবে!'

প্রথম বক্তাটি ভেবে ভেবে উত্তর দেওয়ার সময় গেলাসের গায়ে চামচ দিয়ে চিন্তিতভাবে টুং টুং করে ঘা দিতে লাগল :

—'না, এধরণের ব্যাপার হতে দেওয়া চলবেনা। সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে

বলশেভিকরা আমাদের সঙ্গে মাখামাখি রফা করবে, আর আমরাও তো একরকমের বলশেভিক। আগে কালেদিনকে লাথি মেরে তাড়াই, তারপর দেখা যাবে...'

—'কিন্তু, ভায়া" এক প্রত্যয়দৃঢ় উঁচু গলার মন্তব্য শোনা গেল: 'দেখতে পাওনা, দেবার মত কিছুই নেই আমাদের। ভাগাভাগিতে বড় জোর বিঘে আড়াই করে জমি পাই, বাদবাকি একেবারে অকেজো। তাতে আমরা দেবটা কি?'

—'তোমাদের কাছ থেকে ওরা জমি নেবেনা কিন্তু নেবার মত জমি অন্যের অনেক আছে।'

ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে গ্রিগরের কানে এল, কসাকরা রাতের মত মেঝের ওপরেই শুয়ে পড়ছে; তখনো তর্ক করছে জমি নিয়ে, কিভাবে জমি ভাগাভাগি হবে সেই বিষয় নিয়ে।

॥ দশ ॥

ভোরের আগেই জানলার ঠিক বাইরেই একটা আওয়াজ শুনে সবাই জেগে উঠল। গ্রিগর সার্টটা গলিয়ে নিল, মুহূর্তের জন্যে হাতটা লটকে গেল, উর্দিটা আঁকড়ে ধরে, ছুটতে ছুটতেই বুট পরে নিল। রাস্তায় গুলির আওয়াজ উঠল। ঘড় ঘড় করতে করতে একখানা গাড়ি ছুটে বেরিয়ে গেল। দরজার বাইরে কে একজন ভয়ার্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল:

—'হাতিয়ার নাও...হাতিয়ার নাও...ধুত্তোর নিকুচি করেছি!'

বাইরের হানাদারদের হটিয়ে চেরনেত্‌সোভের দলবল শহরে ঢুকে পড়েছে। কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারে ঘোড়সোয়াররা পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। লোকজন দৌড়ুচ্ছে, বুটের খটাখট শব্দ বাজছে। রাস্তার এক কোণে একটা মেসিনগান বসান হয়েছে। জনতিরিশেক কসাকের একটা সার রাস্তা আটকে রেখেছে। আর একদল রাস্তা ধরে দৌড়ে গেল। চারদিক কাঁপিয়ে একসার কামান পাশ দিয়ে চলে গেল, ঘোড়াগুলো কদমে ছুটছে, পিছিয়ে পড়া সওয়াররা চাবুক হাঁকড়াচ্ছে। খুব কাছাকাছি কোন এক জায়গা থেকে হঠাৎ মেসিন-গানের গর্জন শুরু হল। পরের রাস্তাতেই একখানা খানা-গাড়ি মুখ থুবড়ে উল্টে পড়ে আছে, বেড়ার খুঁটির সঙ্গে আটকে আছে একখানা চাকা। 'শালা অন্ধ! চোখে দেখতে পাওনি?' আতঙ্কিত কণ্ঠের এক হুঙ্কার উঠল।

অতিকষ্টে নিজের কোম্পানিকে জড় করে গ্রিগর জোরসে ঘোড়া ছুটিয়ে স্টেশনের দিকে ছুটল। দেখতে পেল, কসাকরা ইতিমধ্যেই স্রোতের মত হটে আসছে। সামনের দিকের একজনের রাইফেল চেপে ধরে গ্রিগর ধমক দিল:

—'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

—'ছেড়ে দাও!' কসাকটা টানাটানি করতে লাগল। 'ছেড়ে দাও, হারামজাদা! আমাকে আটকাচ্ছ কিসের জন্যে? দেখতে পাচ্ছ না আমরা হটে যাচ্ছি?'

—'মার শালাকে...! ধাক্কা মেরে সরিয়ে দে হাঁদারামকে!' অন্য সকলে চিৎকার করে উঠল।

স্টেশনের শেষদিকে একটা লম্বা গুদাম ঘরের কাছে গ্রিগর তার কোম্পানিকে ছড়িয়ে

ছড়িয়ে দাঁড় করাল, কিন্তু পলায়নপর কসাকদের নতুন এক ঢেউ তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। গ্রিগরের কোম্পানির কসাকরাও তাদের সঙ্গে মিলতে শুরু করে একই সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় পালিয়ে ফিরে যেতে লাগল।

—'থাম! হল্ট, নইলে গুলি করব!' রাগে কাঁপতে কাঁপতে গ্রিগর গর্জন করতে লাগল।

কিন্তু তারা তার দিকে ফিরেও তাকাল না। মেসিনগানের এক ঝাঁক গুলি রাস্তা ঝেঁটিয়ে দিয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে কসাকরা রাস্তার ওপর উপুড় হয়ে পড়ল, বুকে হেঁটে পাঁচিলের কাছাকাছি গিয়ে গলির মোড়ে মোড়ে পালিয়ে গেল।

—'এখন আর ওদের আটকাতে পারবে না, মলেখফ!' দৌড়ে যেতে যেতে একজন ট্রুপ-অফিসার চিৎকার করে বলে গেল। দাঁত কড়মড় করতে করতে রাইফেল উঁচিয়ে গ্রিগর তার পেছন পেছন ছুটল।

যে আতঙ্ক কসাকদের পেয়ে বসল তার পরিণতি হল, বেশির ভাগ সাজ-সরঞ্জাম পেছনে ফেলে গুবোকা থেকে বিশৃঙ্খলভাবে পুরোপুরি পলায়ন। কোম্পানিগুলোকে আবার জড় করে পাল্টা-আক্রমণে পাঠানো সম্ভব হল একমাত্র সেই ভোরের দিকে।

আগুনের মত রাঙা হয়ে, ঘামতে ঘামতে, গোলুবোভ বুক-খোলা একটা ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট গায়ে, নিজের সাতাশ নম্বর রেজিমেণ্টের সার বরাবর ক্যানকেনে গলায় চিৎকার করে ছুটতে লাগল :

—'উঠে এসো! শুয়ে থাকা চলবে না! এগোও এগোও।'

লড়াই শুরু হল ছটায়। বরফজমা মাটিতে কালো জরির ফিতের মত নক্সা এঁকে কসাক আর ভোরোনেঝ্ থেকে আসা রেড-গার্ডের পাঁচমেশালি ফৌজ দল বেঁধে এগুতে লাগল। পুব থেকে কনকনে হাওয়া বইতে লাগল। হাওয়ায় ওড়ানো মেঘের নীচে রক্তের মত লাল টকটকে সকাল হল। আতামান কোম্পানির অর্ধেককে চৌদ্দ নম্বর ব্যাটারিকে আড়াল দিতে পাঠিয়ে গ্রিগর অন্যদের নিয়ে আক্রমণ করল।

প্রথম গোলাটা চোরনেত্‌সোভের সৈন্যদের অনেক পেছনে গিয়ে পড়ল। বিস্ফোরণ যেন ছিন্নভিন্ন নীল-কমলা পতাকার মতো শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মাথার ওপর দিয়ে আর একটা গোলা শিস কেটে উড়ে গেল। এক মুহূর্তের কঠিন স্তব্ধতা—রাইফেলের গুলির আওয়াজে আরও জমাটবাঁধা, তারপরেই বিস্ফোরণের দূরাগত প্রতিধ্বনি। সামনের দিকের শত্রুসৈন্যরা শুয়ে পড়তে শুরু করল। বাতাসের ঝাপটার মুখে চোখ দুটো কুঁচকে গ্রিগর তৃপ্তির সঙ্গে ভাবল, 'পাল্লায় পেয়ে গেছি আমরা!'

ডানপাশে রয়েছে চুয়াল্লিশ নম্বর রেজিমেণ্টের কোম্পানিরা। মাঝখানে গোলুবোভ তার নিজের রেজিমেণ্টকে চালাচ্ছে। গ্রিগর তার বাঁ-দিকে। তারও পেছনে বাঁ-পাশকে আড়াল দিয়ে রেড-গার্ড দলগুলো। তিনটে মেসিনগান দেওয়া হয়েছে গ্রিগরদের কোম্পানিকে। একজন বেঁটে মত হৃষ্টপুষ্ট রেড-গার্ড তাদের কমাণ্ডার। মুখখানা বিষন্ন, লোমশ হাত। চমৎকার নিশানা করে মেসিনগান চালানোর নির্দেশ দিয়ে শত্রুর আক্রমণের উদ্যোগ একেবারে পঙ্গু করে দিচ্ছে। আতামান কসাকদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া মেসিনগানের কাছে সর্বক্ষণ খাড়া আছে। তার পাশে, সৈনিকের উর্দি গায়ে হৃষ্টপুষ্ট একটি মেয়েছেলে। কসাকদের সারের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গ্রিগর ভাবল মেয়েছেলে! লড়াই করতে চলেছে, অথচ মাগকে পেছনে রেখে আসতে পার না। ছেলেপুলেগুলো আর গদির বিছানাটাও সঙ্গে নিলে পারত!'

মেসিনগান দলের কমাণ্ডার কাছে এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল :

—'আপনি এই অংশকে চালাচ্ছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আতামান কোম্পানির সামনে আমি গুলির বাঁধ দেব। শত্রু তাদের এগুনো বন্ধ করে দিচ্ছে।'

—'ঠিক আছে!' গ্রিগর সম্মত হল। মুহূর্তের জন্যে শুদ্ধ মেসিনগানের দিক থেকে একটা চিৎকার শুনে সে ঘুরে দাঁড়াল, শুনতে পেল দাড়িওয়ালা এক মেসিনগানার ক্ষেপে গিয়ে গর্জন করছে :

—'বানচাক! মেসিনগান গলিয়ে ফেলব যে! তুমি মানুষ না, দাঁত্য, অমনধারা তুমি করতে পারবে না!'

সৈনিকের উর্দি-পরা মেয়েছেলেটা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। রুমালের নীচে তার জ্বলজ্বল করা কালো চোখদুটো গ্রিগরকে আকসিনিয়ার কথা মনে পড়িয়ে দিল, আর মুহূর্তের জন্যে সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে, নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

॥ এগার ॥

দুপুরবেলা গোলুবোভের কাছ থেকে একজন আর্দালি ছুটে এল, নির্দেশ নিয়ে এল, গ্রিগরকে তার দুই কোম্পানি নিয়ে জায়গা ছেড়ে সরে আসতে হবে. শত্রুর ডান-পাশটা ঘিরে ফেলতে হবে; সম্ভব হলে, বুঝতে না পারে এমনভাবে কাজ হাঁসিল করতে হবে। প্রধান অংশ শেষ আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বাঁ-দিক থেকে আঘাত করতে হবে। গ্রিগর তৎক্ষণাৎ তার কোম্পানিদের সরিয়ে আনল, ঘোড়ায় চাপিয়ে উপত্যকা বরাবর আট মাইল ধরে অর্ধচন্দ্রের আকারে এগিয়ে চলল। ঘোড়াগুলো হোঁচট খেতে লাগল গভীর বরফের মধ্যে পড়ে গা ঝাড়া দিতে লাগল; কখনো কখনো বরফ একেবারে বুক পর্যন্ত উঠল। কান পেতে গুলির শব্দ শুনে গ্রিগর উদগ্রীব হয়ে হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল। রুমানিয়ায় এক মৃত জার্মান অফিসারের হাত থেকে খুলে নেওয়া হাতঘড়িটা তার জয়ের স্মারক। কম্পাস দেখে সে তাদের পথ দেখাতে লাগল। কিন্তু তাতেও যা দরকার তার চেয়েও বেশি করে বাঁ-দিকে সরে যেতে লাগল। চওড়ামত একটা নাবাল পেরিয়ে তারা খোলা মাঠে এসে পড়ল। ঘেমে নেয়ে ঘোড়ার গা থেকে ধোঁয়া উঠছে, কুঁচকির খাঁজগুলো জবজবে হয়ে গিয়েছে। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ার হুকুম দিল গ্রিগর, সকলের আগে নিজে উঠতে লাগল চড়াই পথে। ঘোড়াগুলোকে উপত্যকাতেই রেখে যাওয়া হল। খাড়া চড়াই বেয়ে কসাকরা চলল তার পেছনে পেছনে। গ্রিগর পেছনে তাকাল। বরফাচ্ছন্ন চড়াই পথে এক কোম্পানিরও বেশি কসাকদের ছড়িয়ে থাকতে দেখে নিজেকে শক্তিমান মনে হল, নিজের ওপর বিশ্বাস আরও বেড়ে গেল। আরও অনেকের মতই লড়াই করতে নেমে গ্রিগরকে যূথ-সংস্কারে ভীষণভাবে পেয়ে বসল।

লড়াই-এর অবস্থাটা এক নজরে দেখে নিয়ে গ্রিগর বুঝতে পারল সে অন্তত আধঘণ্টা দেরি করে ফেলেছে। এক দুঃসাহসিক কৌশলে গোলুবোভ দুইদিকেই পাশ থেকে আক্রমণ চালিয়ে চোরনেৎসোভের সৈন্যদের পেছনটা প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, এখন তাদের সামনে থেকে আঘাত করছে। তপ্ত কড়াতে তেল ফোটার মত রাইফেলের গুলির

চড়বড় শব্দ ছ্টছে, মনোবল হারানো শত্রুকে কামানের গোলা ঝেঁটিয়ে নিয়ে চলেছে, অবিরল ধারায় গোলা পড়ছে। গ্রিগর চিৎকার করে উঠল:

—'এগোও।'

নিজের কোম্পানিদের নিয়ে গ্রিগর পাশে আক্রমণ করল। কসাকরা এমনভাবে এগ্তে লাগল যেন কুচকাওয়াজ করছে। কিন্তু চোরনেৎসোভ দলের এক ঝান্ মেসিনগানার এমন প্রচন্ড গ্লিবৃষ্টি শ্রু করল যে তিনজন সঙ্গে সঙ্গে ভূপাতিত হল। তারা জান বাঁচাতে মাটিতে শ্য়ে পড়ল।

বিকেলের প্রথম দিকে একটা গ্লি লেগে গ্রিগরের হাঁটুর ওপরে মাংসে গিঁথে গেল। আগ্নঢালা যন্ত্রণা আর রক্তক্ষরণে বমিবমি বোধ করে গ্রিগর দাঁতে দাঁত ঘসল। ব্কে হেঁটে সে সারের বাইরে চলে এল। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে চোট লেগে আধা বিকারগ্রস্তের মত পায়ের ওপর লাফিয়ে উঠল। গ্লিটা বেরিয়ে যায়নি পেশির মধ্যে গিঁথে আছে, সেইজন্যে যন্ত্রণা আরও বেশি তীব্র হয়ে উঠল। আগ্নঢালা, কুরে কুরে খাওয়া যান্ত্রণায় একটুও নড়তে পারল না, আবার সে শ্য়ে পড়ল। শ্য়ে থাকতে থাকতে মনের পর্দায় স্পষ্ট ভেসে উঠল পেনিসিল্ভানিয়ার পাহাড়ে বার নম্বর রেজিমেণ্টের সেই আক্রমণ, যাতে সে হাতে চোট পেয়েছিল...

কোম্পানিগ্লোর ভার নিল গ্রিগরের সহকারী; দ্জন কসাককে হ্কুম করল গ্রিগরকে পেছনের ঘোড়ার কাছে নিয়ে যেতে। তাকে ঘোড়ার ওপর বসিয়ে দিতে দিতে কসাক দ্জন সহান্ভূতির সঙ্গেই হাঁটুটা বেঁধে ফেলার উপদেশ দিল। ইতিমধ্যেই জিনের ওপর চড়ে বসেছিল গ্রিগর, কিন্তু গড়িয়ে পড়ে গেল, পাজামা খ্লে ফেলে যন্ত্রণায় ভুর্ কুঁচকে তাড়াতাড়ি রক্তঝরা ক্ষতটা বেঁধে ফেলল। তারপর নিজের আর্দালিকে সঙ্গে নিয়ে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে সেই একই ঘোরাপথে সেই জায়গাতেই ফিরে এল, যেখান থেকে পাল্টা-আক্রমণ শ্রু হয়েছিল। ঘ্মঘ্ম চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল বরফের ওপরে ঘোড়ার খ্রের দাগগ্লো, উপত্যকার পরিচিত দৃশ্য-রেখা; পাহাড়ের ওপারের ঘটনাগ্লোকে ইতিমধ্যেই মনে হতে লাগল অনেক কাল আগেকার ঘটনা।

উপত্যকার মধ্যে দিয়ে প্রায় দ্ মাইল তারা ঘোড়ায় চড়ে এল। চলে চলে ঘোড়াদ্টো ক্লান্ত হয়ে পড়ার উপক্রম হল।

—'চল ফাঁকায় যাই!' আর্দালির দিকে তাকিয়ে ঘড়াৎ করে নাকের আওয়াজ করল গ্রিগর তারপর নিজের ঘোড়াটাকে নাবালের ঢাল্র দিকে ঘ্রিয়ে নিল।

বহ্দ্রে চোখে পড়ল, ইতস্তত ছড়ানো মৃতদেহগ্লো শান্ত হয়ে বসে থাকা কাকের ঝাঁকের মত পড়ে আছে। দিগন্তের কোলে ছোট্ট একটা সওয়ারহীন ঘোড়া জোর কদমে ছ্টছে। গ্রিগর দেখতে পেল, শত্রুসৈন্যের ম্ল অংশ বিধ্বস্ত ও চ্র্ণবিচ্র্ণ হয়ে, লড়াই থেকে সরে গিয়ে গ্র্বোকার দিকে পিছ্ হটছে। ঘোড়াটাকে সে কদমে ছ্টিয়ে দিল। সামনে কিছ্দ্রে কসাকদের গোটাকয়েক বিক্ষিপ্ত দল। সবচেয়ে কাছের দলটার কাছে আসতেই গ্রিগর গোল্বোভ্কে চিনতে পারল। জিনের ওপরে জড় হয়ে বসে আছে, ভেড়ার চামড়ার জামাটা বোতামখোলা, পশমের টুপিটা মাথার পেছনে ঠেলে দেওয়া, ঘামে ভুর্দ্টো ভিজে জবজবে। জ্লপিতে পাক দিয়ে সে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল:

—'মেলেখফ বাহাদ্র লেড়কা! একি, চোট লেগেছে? সর্বনাশ! হাড় ভাঙেনিত?' উত্তরের অপেক্ষা করেই সে একগাল হেসে ফেলল 'একেবারে গ্ঁড়ো করে দিয়েছি ওদের! একেবারে গ্ঁড়ো! অফিসারদের ডিভিশন এমনভাবে গ্ঁড়ো করে দিয়েছি যে আর কখনো জড় করতে পারবে না।'

গ্রিগর একটা সিগারেট চাইল। সারা স্তেপ জুড়ে কসাক আর রেড-গার্ডরা স্রোতের মত ছুটে চলেছে। দূরের জনতার মধ্যে থেকে একজন কসাক ঘোড়াছুটিয়ে আসতে আসতে খানিক দূর থেকেই চিৎকার করে বলল:

—'চল্লিশজন ধরা পড়েছে, গোলুবোভ্! চল্লিশজন অফিসার, চোরনেৎসোভ্ তাদের মধ্যে একজন!'

—'মিথ্যে কথা!' উদগ্রীব হয়ে জিনের ওপরে ঘুরে বসল গোলুবোভ্, তারপর তার সাদা-পা ঘোড়াটার পিঠে নির্মমভাবে চাবুক কসতে কসতে বন্দীদের দেখবার জন্যে ছুটে বেরিয়ে গেল।

একটু অপেক্ষা করল গ্রিগর, তারপর সেও ঘোড়া ছোটাল পেছনে পেছনে।

তিরিশজন কসাক পাহারা দিয়ে আনছে বন্দী অফিসারদের, সবার সামনে বড় বড় পা ফেলে চোরনেৎসোভ্ হাঁটছে। পালাবার চেষ্টায় ভেড়ার চামড়ার কোটটা ফেলে দিয়েছে, গায় শুধু পাতলা চামড়ার জারকিন। বাঁ-কাঁধের তকমা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে, বাঁ-চোখের ওপরে সদ্য ঘসা লেগে রক্ত পড়ছে। দৃঢ়পদক্ষেপে দ্রুত হেঁটে আসছে সে। একপাশে কাত হয়ে থাকা পশমের টুপিটা তার চেহারায় এক ভাবনাচিন্তাহীন, তরুণোচিত ভাব ফুটিয়ে তুলেছে। গোলাপী মুখখানায় ভয়ের লেশমাত্র ছায়া নেই। স্পষ্টই বোঝা যায়, বেশ কয়েকদিন দাড়ি কামান হয়নি, কারণ গালে ও চোয়ালে দাড়ির সোনালি প্রলেপ পড়েছে। তার দিকে ছুটে আসা কসাকদের সে রূঢ়দৃষ্টিতে অতি দ্রুত দেখে নিল, তীব্র ঘৃণার কুঞ্চনে দুই ভুরুর মাঝখানটা কালো হয়ে উঠল। দেশলাই ঠুকে, ঠোঁটের এক কোণে শক্ত করে আটকান সিগারেট ধরাল।

অফিসারদের বেশির ভাগই তরুণ, শুধু একজন কি দুজনের চুলে সাদা ছোপ ধরেছে। একজনের পায়ে চোট লেগেছে, সে পিছিয়ে পড়ছিল। মুখে বসন্তের দাগওয়ালা, ছোটখাটো এক কসাক বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। চোরনেৎ-সোভের প্রায় ঠিক পাশেই এক লম্বা মত, ডাকাবুকো এক ক্যাপ্টেন। আরও দুজন হাত ধরাধরি করে হাঁটছে, তারা হাসছে; তাদের পেছনে পেছনে আসছে হৃষ্টপুষ্ট এক জুংকার মাথায় টুপি নেই। আর একজন অফিসার তাড়াতাড়িতে কাঁধের চারপাশে একটা উর্দি জড়িয়ে নিয়েছে। আরও একজনের টুপি নেই, অফিসারদের লাল মাথা-ঢাকাটা সুন্দর চোখ-দুটোর ওপরে টেনে দিয়েছে।

ঘোড়া চালিয়ে তাদের পেছনে চলে এল গোলুবোভ্। দাঁড়িয়ে পড়ে কসাক পাহারা-দারদের চেঁচিয়ে বলল:

—'শোন তোমরা! ফৌজী-বিপ্লবের সময়কার শৃংখলা অনুযায়ী এই বন্দীদের নিরাপত্তার জবাবদিহি তোমাদের করতে হবে। দেখো, ওরা যেন অক্ষত দেহে সদর দপ্তরে পেঁছোয়।'

এক কসাক ঘোড়সোয়ারকে কাছে ডাকল সে, একটা চিঠি লিখে পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌কে সেটা পেঁছে দিয়ে আসতে নির্দেশ দিল। তারপর গ্রিগরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল:

—'দপ্তরে যাচ্ছ নাকি, মেলেখফ?'

সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে গোলুবোভ্ তার খুব কাছে ঘোড়াটা নিয়ে এসে বলল:

—'পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌কে বলো, চোরনেৎসোভের জন্যে আমি দায়ী রইলাম। বুঝলে? আচ্ছা, এখন এসো!'

বন্দীদের ভিড়টাকে পেছনে ফেলে গ্রিগর আগেআগে বিপ্লবীকমিটির দপ্তরের দিকে

চলল। দপ্তরটা বসান হয়েছে একটা ছোট গ্রামের কাছে। দেখতে পেল, অফিসার, বার্তাবহ আর কসাক আর্দালিরা পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌কে ঘিরে রয়েছে। মিনায়েভ আর পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ এইমাত্র লড়াই-এর ময়দান থেকে ফিরেছে। গ্রিগর পোদ্‌তিয়েল-কোভ্‌কে একপাশে ডেকে খবর দিল:

—'এখুনিই বন্দীরা এখানে এসে পেঁছুবে। গোলুবোভের চিট পেয়েছেন?'

পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ ভীষণভাবে চাবুকটা দোলাল, রক্ত জমাট চোখদুটো নামিয়ে চিৎকার করে উঠল:

—'নিকুচি করেছি গোলুবোভের! মজার আব্দার পেয়েছে! সে চোরনেৎসোভের দায়িত্ব নেবে, তাই না? ওই প্রতি-বিপ্লবী, ডাকাতটার দায়িত্ব! না না, সে হবে না! ওদের সবাইকে আমি গুলি করাব, খতম করিয়ে দেব!'

—'গোলুবোভ্‌ বলেছে ওর জন্যে দায়ী থাকবে।' গ্রিগর আপত্তি জানাল।

—'আমি ওকে ছেড়ে দেব না! আমি যা বলেছি, তা আমি করবই। ব্যস, ফুরিয়ে গেল! বিপ্লবী আদালতে ওর বিচার হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে, রায় অনুযায়ী কাজ হবে। অন্যদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে! তুমি জানো'...এগিয়ে আসা বন্দীদের দিকে তীব্র-দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে একটু শান্তগলায় বলল, 'তুমি জানো ও কত রক্তপাত করিয়েছে? রক্তের গঙ্গা বইয়েছে ! কত খনি-মজুরকে ও গুলি করে মেরেছে?' আবার রাগে তোত্‌লাতে তোত্‌লাতে উন্মত্তের মত চোখ পাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আমি ওকে হাতছাড়া করব না।'

—'এতে চিৎকার করার কি আছে!' গ্রিগরও গলা চড়াল। ভেতরে ভেতরে সে কাঁপছিল, যেন মনের মধ্যে পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ তার উন্মত্ততা সঞ্চার করে দিয়েছে। 'বিচার করার লোক এখানে অনেক আছে। আপনি ফিরে যান ওখানে!' গ্রিগরের নাকের পাশদুটো থরথর কাঁপতে লাগল, আঙুল দিয়ে পেছনে লড়াইয়ের মাঠটা দেখিয়ে দিল। 'ওখানে আপনাদের অনেকেই আছে, যারা বন্দীদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায়!'

হাতের মুঠোয় চাবুকটা শক্ত করে চেপে ধরে পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ পিছিয়ে গেল। নিরাপদ দূরত্ব থেকে চেঁচিয়ে উঠল.

—'ওখানেও ছিলাম আমি! ভেবোনা যে এই গাড়ি নিয়ে গা বাঁচাচ্ছি! মুখ বুজে থাক, মেলেখফ! বুঝলে? তুমি বলবার কে? ওসব অফিসারি ঢং ছাড়! বিচার করবে বিপ্লবী কমিটি, আর কোন কেউ..'

গ্রিগর তার দিকে ঘোড়াটা এগিয়ে নিয়ে গেল, মুহূর্তের জন্যে চোটলাগার কথা ভুলে গিয়ে জিন থেকে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু যন্ত্রণায় কুঁকড়ে মাটির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গেল। পা থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। বিনা সাহায্যেই তবু সে উঠে দাঁড়াল, ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে কোনরকমে একটা গাড়ির ভেতর গিয়ে ঢুকল, তারপর পেছনের চাকার স্প্রিংয়ের গায়ে হেলান দিয়ে বসে পড়ল।

বন্দীরা এসে পড়ল। পাহারাদারদের কেউ কেউ আর্দালি আর নেতাদের দেহ-রক্ষীর কাজে লাগানো কসাকদের সঙ্গে মিশে গেল। তাদের মধ্যে লড়াই-এর আগুন তখনও পর্যন্ত নেভেনি। হালফিল লড়াই সংক্রান্ত মতামত আদানপ্রদান করতে করতে তাদের চোখ অশুভ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করতে লাগল।

পুরু বরফের ওপরে ভারী ভারী পা ফেলে পোদ্‌তিয়েলকোভ বন্দীদের দিকে এগিয়ে গেল। বাঁ-পাটা অন্যমনস্কের মত নাড়াতে নাড়াতে, দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে, অবজ্ঞায় কুঞ্চিত স্বচ্ছ ভয়লেশহীন চোখে, সামনে বেশ খানিকটা দূরে থেকেই

চোরনেৎসোভ্ তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল। পোদ্তিয়েলকোভ্ও ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে, পায়ে না-মাড়ানো বরফের ওপর নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি বুলাতে বুলাতে সোজা তার কাছে চলে এল। চোখ তুলে তাকাতেই চোরনেৎসোভের ঘৃণামাখা, ভয়লেশহীন, অবজ্ঞাভরা দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলল।

—'তাহলে তোমাকে ধরেছি শয়তান!' এক পা পিছিয়ে এসে, চাপা ঘড়ঘড়ে গলায় পোদ্তিয়েলকোভ্ বলল। একটা বাঁকা, কুটিল হাসি তলোয়ারের কোপের মত তার দুইগালে কেটে বসে গেল।

—'কসাকদের বিশ্বাসঘাতক! কুকুর! দেশদ্রোহী!' দাঁতের ফাঁক দিয়ে চোরনেৎসোভ্ থুথু ছুঁড়ল।

পোদ্তিয়েলকোভ্ মাথা ঝাঁকাল, যেন একটা চোট এড়িয়ে গেল। তার মুখখানা কালো হয়ে গেল, হাঁ করে অতিকষ্টে একটা দম নিল।

এরপর যা হল, তা বিস্ময়কর গতিতে ঘটে গেল। দাঁত খিঁচিয়ে, ফ্যাকাসে মুখে, হাতের মুঠো দুটো বুকের সঙ্গে লেপ্টে, গোটা দেহ সামনের দিকে বেঁকিয়ে, চোরনেৎসোভ্ লম্বা লম্বা পা ফেলে পোদ্তিয়েলকোভের দিকে এগিয়ে গেল। থরথর কাঁপা ঠোঁট থেকে শাপমন্যি মেশানো দুর্বোধ্য শব্দ ঝরতে লাগল। সে কি বলছে, তা শুনতে পেল শুধু পায়ে পায়ে পিছিয়ে আসা পোদ্তিয়েলকোভ্।

—'তোরও সময় আসবে...জেনে রাখিস!' এমন গলা চড়াল যে কথাগুলো বন্দী, পাহারাদার আর অফিসারদের সবারই কানে এসে পেঁছুল।

—'বটে...' তলোয়ারের মুঠাটা হাতড়াতে হাতড়াতে গলা ভেঙে পোদ্তিয়েলকোভের কথা আটকে গেল।

সংক্ষিপ্ত স্তব্ধতা। মিনায়েভ, ক্রিভোশ্লিকোভ ও আরও জনছয়েক পোদ্তিয়েল-কোভের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদের পায়ের নীচে মড়মড় করে বরফ গুঁড়িয়ে গেল। কিন্তু তাদের আগেই এগিয়ে গেল সে। গোটা শরীর ডাইনে বেঁকিয়ে, নুয়ে পড়ে খাপ থেকে তলোয়ারখানা হেঁচকা টানে বার করে নিল, ভয়ঙ্কর বেগে সামনে লাফিয়ে পড়ে প্রচণ্ড শক্তিতে চোরনেৎসোভের মাথায় আড়াআড়ি কোপ বসিয়ে দিল।

গ্রিগর দেখল, চোরনেৎসোভ্ শিউরে উঠল, চোট এড়ানোর জন্যে বাঁ-হাতটা উঁচু করল; দেখল, তলোয়ারের মুখে হাতের কব্জিটা কাগজের মত কেটে গেল, আর তলোয়ারখানা চোরনেৎসোভের অরক্ষিত মাথার ওপরে এসে পড়ল। প্রথমে পড়ে গেল পশমের টুপিটা; তারপর ডাঁটা-ভাঙা ভুট্টা-গাছের মত চোরনেৎসোভ আস্তে আস্তে বসে পড়ল, মুখখানা মুচড়ে বিকৃত হয়ে গেল, নিদারুণ যন্ত্রণায় দুইচোখ কুঁচকে, ভ্রূকুটি করে উঠল, যেন সামনে বিদ্যুৎ চমকেছে।

চোরনেৎসোভ্ পড়ে যেতেই পোদ্তিয়েলকোভ্ আবার কোপ মারল, তারপর পেছন ফিরে, রক্তমাখা তলোয়ারখানা মুছতে মুছতে ভারী ভারী পা ফেলে হেঁটে চলে গেল। গাড়ির গায়ে ধাক্কা খেয়ে সে পাহারাদারদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। দম-আটকানো গলায় হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল:

—'সাবাড় কর ওদের, সাবাড় কর! সবকটাকে সাবাড় কর! আমরা কাউকে বন্দী রাখব না।'

পাগলের মত গুলি ছুটতে লাগল। অফিসাররা এলোমেলো, ধাক্কাধাক্কি করে পালাতে গেল। সেই সুন্দর, মেয়েলি-চোখ, লাল টুপিওয়ালা লেফটানাণ্ট দুইহাতে মাথা চেপে পালাতে গেল। একটা গুলি লেগে সে শূন্যে লাফিয়ে উঠল, যেন কোন

বাধা টপকাতে গেল। মাটিতে পড়ে আর সে উঠল না। লম্বামত ক্যাপ্টেনকে দুজন কসাক কাটতে গেল। তলোয়ারের ফলাটা সে হাত দিয়ে চেপে ধরল, হাত থেকে রক্ত গড়িয়ে তার জামার হাতায় পড়তে লাগল। শিশুর মত আর্তনাদ করতে করতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, চিৎ হয়ে শুয়ে বরফের ওপরে মাথাটা গড়াতে লাগল; তার মুখখানা জুড়ে শুধু রক্তজমাট দুটি চোখ, কালো ঠোঁট এক কান্নায় ছিন্নভিন্ন। তার মুখে, ঠোঁটে তলোয়ারের কোপের পর কোপ পড়তে লাগল, তবুও সে যন্ত্রণায় আতঙ্কে ক্ষীণস্বরে আর্তনাদ করে চলল। তার ওপরে দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে এক কসাক গুলি চালিয়ে তাকে শেষ করে দিল। জুংকারটি ব্যূহ প্রায় ভেদ করে ফেলেছিল, কিন্তু তাকে ধরে ফেলা হল, এক আতামান কসাকের চোট খেয়ে সে পড়ে গেল। ছুটতে গিয়ে এক অফিসারের কোট হাওয়ায় পৎপৎ করে উড়ছিল, সেই একই কসাক তার পিঠে গুলি করল। অফিসারটি মাটিতে বসে পড়ল, যতক্ষণ না মরে, আঙুল দিয়ে বুক খিমচাতে লাগল। এক পাকা-চুলো লেফটানান্ট সেই জায়গাতেই মারা পড়ল; শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে পা দিয়ে বরফের মধ্যে একটা গভীর গর্ত খুঁড়ে ফেলল; দয়াপরবশ হয়ে এক কসাক যদি তার যন্ত্রণা না থামিয়ে দিত, তাহলে গলাসি-পরানো বেয়াড়া ঘোড়ার মত অমনি করে পা ছুঁড়তে থাকত।

হত্যাকাণ্ড শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রিগর তড়াক করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েছিল, পোদ্‌তিয়েলকোভের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গেল। কিন্তু মিনায়েভ তাকে ধরে ফেলল, হাতদুটো মুচড়ে পিস্তলটা কেড়ে নিল, তারপর আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ধমক দিল:

--'আর তুমি .মতলব কি তোমার?'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

রোদ্দুরের ঝলকানি আর মেঘহীন আকাশের নীলিমার বন্যায় পাহাড়ের চোখ-ধাঁধানো ঝকঝকে, বরফঢাকা শিরদাঁড়াটা সাদা ধবধবে হয়ে উঠেছে, গুঁড়ো চিনির মত ঝিলমিল করছে। পাহাড়ের নীচে ইতস্তত ছড়ানো গ্রামখানা ছেঁড়াকাঁথার মত পড়ে আছে। ডানদিকে, ছোট ছোট পল্লী আর জার্মানদের বসতিগুলো টুকরো টুকরো নীল, শান্তির নীড়। গ্রামের বাঁ-দিকে পা-ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা পাহাড়, জলের ধারা নেমে নেমে গায়ে তার দাগদাগাড়ি। ধারে ধারে টেলিগ্রাফের খুঁটি পোতা। দিনটা অস্বাভাবিক রকমের পরিস্কার, হিমশীতল। সূর্যের চারধারে রামধনু রং ছিটিয়ে ধোঁয়ার মত কুয়াশার স্তম্ভ। উত্তুরে হাওয়া বইছে, হাওয়ার দাপটে স্তেপের বুকে বরফ উড়ছে। কিন্তু বরফাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ প্রান্তর দিগন্ত পর্যন্ত ঝকঝকে পরিস্কার। শুধু পূবদিকে, আকাশ যেখানে দিগন্তে মিশেছে, সেখানে একখানা বেগুনে রঙের কুয়াশা স্তেপের ওপরে ওৎ পেতে আছে।

গ্রিগরকে বাড়ি নিয়ে যেতে পান্তালিমন প্রোকোফিয়েভিচ এসেছিল মিল্লেরোভোয়। ঠিক করেছিল গ্রামে না থেমে একেবারে কাশারা পর্যন্ত চলে যাবে, সেখানেই রাত কাটাবে। গ্রিগরের এক টেলিগ্রাম পেয়ে সে রওনা হয়েছিল তাতার্স্ক থেকে, দেখতে পেল ছেলে 'চাষা'দের এক সরাইখানায় তার জন্যে অপেক্ষা করছে। গ্লুবোকায় পায়ে চোট লাগার পর গ্রিগর একখানা হাসপাতাল-গাড়িতে এক সপ্তাহ ঘুরে মিল্লেরোভায় এসেছিল। পা সেরে গেলে ঠিক করল, বাড়ি যাবে। সে চলল অসন্তোষ আর আনন্দের মিশ্র অনুভূতি নিয়ে: অসন্তোষ এই জন্যে যে, ডনের ক্ষমতা অধিকারের সংগ্রাম যখন তুমুল হয়ে উঠেছে ঠিক তখনই সে রেজিমেণ্ট ছেড়ে এসেছে, আর এইজন্যে আনন্দ যে, আবার প্রিয় পরিজনকে দেখতে পাবে। আকসিনিয়াকে দেখবার ইচ্ছেটা সে নিজের কাছ থেকেও গোপন করে রেখেছিল, কিন্তু আজ সে তার কথা না ভেবে পারল না।

বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎটা কেমন বাধোবাধো ঠেকল। গুম হয়ে পান্তালিমন গ্রিগরের মুখের দিকে তাকাল (পিয়োত্রা যেন কানের কাছে ফিসফিস করছে), অসন্তুষ্টি আর উদ্বেগ দুই চোখে বাসা বাঁধল। সন্ধ্যের সময় ডনের ব্যাপারস্যাপার সম্পর্কে গ্রিগরকে বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করল, আর স্পষ্টই বোঝা গেল, ছেলের উত্তর শুনে সে খুশী হতে পারল না। পাটকিলে দাড়ি চিবুতে চিবুতে, পায়ের বুটের দিক তাকিয়ে নাক দিয়ে ঘড়াৎ করে আওয়াজ করল, দোমনা করেই সে তর্ক জুড়ল, কিন্তু কালেদিনের সমর্থনে কথা বলতে গিয়ে একেবারে ক্ষেপে উঠল; আগে যেমন করত, তেমনি করেই গ্রিগরকে ধমকে থামিয়ে দিল, এমনকি খোঁড়া পা-খানাও মাটিতে দুএকবার ঠুকল।

—'ওসব আমাকে বলতে আসিস না! গত শরতে কালেদিন তাতার্স্কে এসেছিলেন। বারোয়ারিতলায় সভা হয়েছিল, টেবিলের ওপরে দাঁড়িয়ে তিনি বুড়োদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন; বেদবাক্যের মত ভবিষ্যতের কথা জানিয়েছিলেন: এদেশে 'চাষা'রা ঢুকবে, লড়াই হবে, আর কি করব না করব সে সম্পর্কে যদি আমরা মনস্থির না করি তাহলে তারা আমাদের সর্বস্ব কাড়বে, এদেশে বসবাস শুরু করবে। তিনি তখনই জানতেন লড়াই বাধবে। বল, কি বলবিরে, শুয়োরের বাচ্চা? তোদের চেয়ে তিনি কম জানেন? অমন একজন লেখাপড়া জানা জেনারেল, লড়াই করেছেন, কার চেয়ে তিনি কম জানেন? কামেনস্কার লোকগুলো তোর মতই সব মুখ্যু বাক্যবাগীশ, তারাইত মানুষকে ভোগাচ্ছে। তোদের পোদ্‌তিয়েলকোভ্—কে লোকটা? সার্জেণ্ট-মেজর? ও হো! কাজ করতত আমার সঙ্গেই। তাহলে আজ আমাদের এই অবস্থা!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাপের সঙ্গে তর্ক করল গ্রিগর। আগেই সে জানত বাপের মনোভাব কি হবে। তার ক্ষেত্রে আজ আর এক নতুন জিনিস এসে জুটেছে: চোরনেৎসোভের মৃত্যু, বিনা বিচারে অফিসারদের হত্যাকাণ্ড সে ভুলতে পারছে না, ভুলতে পারবে না।

ঘোড়াদুটো শ্লেজখানাকে অনায়াসে টেনে নিয়ে চলল। গ্রিগরের জিন চাপানো ঘোড়াটা পেছনে বাঁধা। নামকরা গ্রাম আর বসতিগুলো একের পর এক আসতে লাগল। গ্রামে ফেরার সারাটা রাস্তা সে অসংলগ্নভাবে, উদ্দেশ্যহীনের মত সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো ভাবতে লাগল, অন্তত ভবিষ্যতের কোন দিকদর্শন চোখে পড়ে কিনা তারই চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু বাড়িতে বসে বিশ্রাম করা ছাড়া আর কিছুই তার মনের চোখে ধরা পড়ল না। 'বাড়ি ফিরে গেলে কিছুদিন বিশ্রাম নেব, পায়ের চোটটা সারাব, আর তারপর...' মনে মনে সে কাঁধ ঝাঁকাল। 'দেখা যাবে তখন। সময়কালে বোঝা যাবে।'

লড়াই করে করে ক্লান্তিতে সে ভেঙে পড়েছে। বিক্ষুব্ধ, ও বিদ্বেষ-ভারাক্রান্ত, যুদ্ধং দেহি, দুর্বোধ্য জগৎটাকে পেছনে ফেলে চলে যেতে ইচ্ছে

জেগেছে। তার পেছনে সব কিছুই জট পাকানো, পরস্পরবিরোধী। অতিকষ্টে সে খাঁটিপথ খুঁজে পেয়েছিল; কিন্তু যেই সে পথে পা দিতে গেল, পেছনের মাটি উত্তুঙ্গ হয়ে উঠল, পথ হারিয়ে গেল; সে যে ঠিক পথেই যাচ্ছিল সে বিশ্বাস একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। সে বলশেভিকদের কাছাকাছি এসেছিল, অন্যদেরও কাছে টেনে এনেছিল। তারপর থমকে দাঁড়াল, তার মনটা অসাড় হয়ে গেল। 'তাহলে কি ইঝ্ভারিনই ঠিক? কাকে আমরা বিশ্বাস করব?' কিন্তু যখন সে ভাবল শিগ্গীরই বসন্তকালীন চাষের জন্যে লাঙল-মই ঠিক করতে হবে, উইলোগাছের ডাল দিয়ে গোয়ালের বেড়া বাঁধতে হবে, আর বরফ গলে মাটি যখন শুকিয়ে উঠবে, কাজের জন্যে সুড়সুড়করা হাতে লাঙলের মুঠো চেপে ধরে স্তেপের মধ্যে বেরিয়ে পড়বে; যখন মনে পড়ল, নতুন গজান ঘাস আর লাঙলের ফালে ওল্টানো মাটির সোঁদা সোঁদা মিষ্টি গন্ধে শিগ্গীরই সে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেবে, তখন ভেতরে ভেতরে মনটা নেচে উঠল। সে গরু চরাবে, খড়ের আঁটি ছুঁড়বে, শুকনো ঘাস আর গোবরের ঝাঁঝালো গন্ধ শুঁকবে। সে চায় শান্তি, সে চায় নীরবতা; ওই স্তেপ, ঘোড়াগুলো, আর বাপের পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, তার রুক্ষ চোখ-দুটিতে একটা চাপা আনন্দ বাসা বাঁধতে লাগল। সব কিছুই তার অর্ধ-বিস্মৃত বিগত জীবনের কথা মনে পাড়িয়ে দিল: বাপের গায়ের জামা থেকে ভেড়ার চামড়ার গন্ধ, দলাই-মলাই না-করা ঘোড়াগুলোর আটপৌরে চেহারা, একটা গোলাবাড়ি থেকে ভেসে আসা মোরগের ডাক। এইখানে, এই নির্জন পরিবেশে, মনে হল, জীবন কি মধুর, কি গভীর নেশায় আতুর।

॥ দুই ॥

পরের দিন বিকেলের দিকে তারা তাতার্স্ক এসে পৌঁছুল। পাহাড়ের ওপর থেকে গ্রিগর ডনের দিকে তাকাল: পেছনের বিলের ধারে সেই নলখাগড়ার সবুজ পাড়; সেই শুকিয়ে আসা পপলারের সার; ডনের পারঘাটাটা আগে যেখানে ছিল, এখন আর সেখানে নেই। সেই গ্রাম, সেই পরিচিত খামারবাড়িগুলো, সেই গির্জা, সেই বারোয়ারিতলা... নিজেদের বাড়ির দিকে চোখ পড়তেই তার রক্ত নেচে উঠল, স্মৃতির জোয়ারে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ল। উঠোনের কুয়োর সেই কপিকলটা যেন উইলোকাঠের হাত উঁচিয়ে তাকে ডাকছে।

—'ক্লান্ত চোখ জুড়িয়ে যাবার মত দৃশ্য!' চারধারে চোখ বুলিয়ে নিয়ে পান্তালিমন হাসল। নিজের অনুভূতি গোপন করার কোন চেষ্টা না করে গ্রিগর উত্তর দিল:

—'ঠিক বলেছ...আর এ যেন অফুরন্ত!'

—'বাস্তুভিটে যে কি জিনিস!' বুড়ো তৃপ্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল।

পান্তালিমন গ্রামের মাঝ বরাবর চলল। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ঘোড়াদুটো দ্রুতবেগে ছুটল, ঢিবিতে ঢিবিতে ধাক্কা খেয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে স্লেজখানা হড়হড়িয়ে চলল। বাপের মনোগত ইচ্ছা বুঝতে পেরেছিল গ্রিগর, তা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করল:

—'গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবে কেন? আমাদের বাড়ির রাস্তা ধর।'

পান্তালিমন ঘাড় ফেরাল, দাড়ির আড়ালে মুচকি হেসে চোখ টিপল:

—'আমার ব্যাটারা যখন লড়াই করতে গেল তখন ছিল সাধারণ সেপাই, আজ তারা অফিসারের দলে উঠেছে। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের মধ্যে ঘুরতে গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে, তা কি তুই জানিসনে? সবাই দেখুক, জবলে পুড়ে মরুক! বুক আমার সাতখানা হয়ে উঠেছে।'

সদর রাস্তায় পেঁছে ঘোড়াদুটোকে তাড়া দিল বুড়ো, চাবুক হাঁকড়াতে লাগল; আর ঘোড়াদুটোও, বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে বুঝতে পেরে, নতুন উদ্যমে জোরে ছুটতে শুরু করল, যেন তারা সেইদিনই পঁচিশ মাইল ছুটে আসেনি। পথ চলতি কসাকরা মাথা নুইয়ে নমস্কার করে গেল, উঠোন থেকে, জানলা দিয়ে হাতের আড়াল করে মেয়েরা তাকাতে লাগল, মুরগীগুলো রাস্তার ওপরে ক'ক্ ক'ক্ করতে করতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। চলতি ঘড়ির মত সবকিছুই অবলীলাক্রমে পেরিয়ে যেতে লাগল। তারা চলল বারোয়ারিতলার মধ্য দিয়ে। মোখোভের বেড়ার খুঁটির সঙ্গে একটা ঘোড়া বাঁধা ছিল, তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে গ্রিগরের ঘোড়াটা নাক ঝাড়ল, মাথাটা উঁচু করে তুলল। গ্রামের শেষপ্রান্ত আর আস্তাখফের বাড়ির ছাদটা নজরে পড়ল। কিন্তু চৌরাস্তার প্রথম মোড়েই এক বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। একটা ছোট্ট শুয়োরের ছানা রাস্তা পেরুতে গিয়ে বেসামাল হয়ে ঘোড়ার পায়ের নীচে গিয়ে পড়ল; ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে গড়াগড়ি খেল, তারপর শিরদাঁড়া ভাঙা পিঠটা তুলবার চেষ্টা করতে করতে চিল্লাতে লাগল।

—'সর শালা!' শুয়োরের ছানাটাকে চাবুকের একটা ঘা কসিয়ে দিয়ে পান্তালিমন চেঁচিয়ে উঠল।

দুর্ভাগ্যবশত, ছানাটা আফোংকা ওঝিয়েরোভের বিধবা বৌ আনিউৎকার। রগচটা, জাঁহাবাজ মেয়েছেলে সে। উঠোন থেকে সে দৌড়ে এল, এমন গালাগালের তুবড়ি ছুটিয়ে দিল, যে পান্তালিমন ঘ্যাঁচ্ করে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। ঘাড় ফিরিয়ে চিৎকার করে উঠল :

—'মুখ সামলে কথা বলো! অত হাঁকডাক করছ কিসের জন্যে? তোমার মরকুটে শুয়োরের দাম দিয়ে দেব।'

—'ওরে অলপ্পেয়ে মিন্সে ! শয়তান! তুই নিজে মরকুটে, ঠ্যাং খোঁড়া কুকুর! তোকে এক্ষুনি আতামানের কাছে নিয়ে যাব!' হাত নাচিয়ে সে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল, 'গরিব বিধবার পোষা জিনিস মারার জন্যে শিক্ষে দিয়ে দেব তোকে"

অনেক শুনে গেল পান্তালিমন, অবশেষে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে খেঁকিয়ে উঠল :

—'মুখ না নর্দমা!'

—'ওরে হতচ্ছাড়া তুর্কী!' আনিউৎকা সোৎসাহে উত্তর দিল।

—'তুই একটা কুত্তী, একশ শয়তানের বাচ্চা তুই!' পান্তালিমনও গলা চড়াল।

কিন্তু গালাগাল দিতে গিয়ে আনিউৎকা ওঝিয়েরোভ কখনো হটে আসে না :

—'ওরে বেজাত! খানকি-বাজ! ওরে চোর! চাষের মই চুরি করেছিল কে? এ'ড়েবাড়ির পেছনে ঘোরে কে?' চড়ুই পাখির মতই সে কিচিরমিচির করতে লাগল।

—'এই চাবুকের ঘা কসিয়ে দেব তোকে, পেত্নী! চুপ কর!' বুড়ো পাল্টা উত্তর দিল।

কিন্তু এবারে আনিউৎকা চেঁচিয়ে এমন একটা খিস্তি করে উঠল যে, পান্তালিমনের মত লোক—সারা জীবনে যে অনেক কিছুই দেখেছে, অনেক কিছুই শুনেছে, সেও ফাঁপড়ে পড়ে লাল হয়ে ঘামতে শুরু করল।

ভিড় জমতে শ্বর্ করল; ব্ড়ো মেলেখফ আর ওঝিয়েরোভের সতী সাধ্বী বৌএর মধ্যে এই আকস্মিক মধ্রবচনের লেনদেন মন দিয়ে শ্নতে লাগল। তাই দেখে গ্রিগর রাগতভাবে বলল :

—'চল, চল! কেন তুমি থামতে গেলে?'

—'কি চোপারে বাবাঃ!' থ্থ্ ছিটাল পান্তালিমন; তারপর ঘোড়ার পিঠে চাব্ক কসিয়ে দিল, তার মনোগত ইচ্ছা যেন আনিউৎকাকেই চাপা দিয়ে দেয়। নিজেদের বাড়ির নীল সার্সি পেরিয়ে গেল। পিয়োত্রার মাথায় টুপি নেই, সার্টের ওপরে বেল্ট বাঁধা নেই, সে গেট খ্লে দিল। একটা সাদা র্মালের ঝলকানি; তারপরেই জ্বলজ্বলে, হাসি হাসি চোখে দ্নিয়া সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে এল।

ভাইকে চুম্ খেতে খেতে পিয়োত্রা তার চোখের দিকে তাকাল ·

—'ভাল আছিস তো?'

—'চোট লেগেছিল।'

—'কোথায়?'

—'গ্বোকার কাছে!'

—'ওখানে কি আরও বেশ কিছ্ রক্তপাত করতে হয়েছে?' তোর অনেক আগেই বাড়ি চলে আসা উচিত ছিল।'

গ্রিগরকে বন্ধ্র মত একটা আবেগতপ্ত ঝাঁকুনি দিল সে, তারপর দ্নিয়ার হাতে ছেড়ে দিল। বোনের চওড়া কাঁধ জড়িয়ে ধরে গ্রিগর ঠোঁটে, চোখে চুম্ খেল, তারপর অবাক হয়ে পিছিয়ে এল :

—'আরে, দ্নিয়া, তোকে চিনতে পারে কার বাপের সাধ্যি! একেবারে কেমন তর্ণী হয়ে উঠেছিস, আর আমি ভাবতাম, তুই ব্ঝি তেমনি হাঁদা আর বদখতই আছিস।'

—'হয়েছে হয়েছে, দাদা!' চিমটিকাটা এড়ানোর জন্যে ঘ্রে দাঁড়াল দ্নিয়া, তারপর গ্রিগরের মতই হিহি করে হাসতে হাসতে দৌড়ে পালাল।

ইলিনিচ্না ছেলেমেয়েদ্টোকে কোলে করে বাইরে নিয়ে আসছিল, নাতালিয়া তার সামনে দৌড়ে এল। গ্রিগরের বৌ যেন ফুলের মত পাঁপড়ি মেলেছে, বিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছে তার। পাটকরে আঁচড়ানো, চকচকে কালো চুলের পেছন দিকে বড় করে বাঁধা খোঁপাটা তার আনন্দ-রক্তিম ম্খে ছায়া ফেলেছে। গ্রিগরের গায়ের সঙ্গে লেপ্টে বার-কয়েক সে আনাড়ির মত গ্রিগরের গালে, জ্লপিতে ঠোঁট ঘসল, তারপর শাশ্ড়ীর কোল থেকে ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্বামীর সামনে বাড়িয়ে ধরল। স্খের গর্বে সে চেঁচিয়ে উঠল :

--'তাকিয়ে দেখ, তোমার কি স্ন্দর ছেলে!'

—'আমার ছেলেকে দেখতে দাও!' উত্তেজিতভাবে ইলিনিচ্না তাকে ঠেলে পাশে সরিয়ে দিল। গ্রিগরের মাথাটা টেনে নীচু করে কপালে চুম্ খেল, আনন্দে, উত্তেজনায় কাঁদতে কাঁদতে এবড়োখেবড়ো হাতখানা দিয়ে ছেলের ম্খে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে লাগল।

—'আর এই তোমার মেয়ে, গ্রিগর! এই যে, ধর!'

মেয়েকে গ্রিগরের হাতের ওপর বসিয়ে দিল নাতালিয়া আর গ্রিগর ফাঁপড়ে পড়ে গেল কার দিকে তাকাবে : নাতালিয়া না মার দিকে, না ছেলেমেয়ের দিকে।' ছেলেটার চোখে বিমর্ষ দ্ষ্টি, ভুর্দ্টো কোঁচকানো, মেলেখফদের ছাঁচে গড়া : তেমনি একই রকম

কালো, কেমনতর রুক্ষ, চেরা চেরা চোখ, লালচে চামড়া। নোংরা আঙুলটা মুখের মধ্যে পুরে অবাধ্য, একবগ্‌গার মত বাপের দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটার শুধু ছোট ছোট্ট, একাগ্র কালো চোখদুটো দেখতে পেল গ্রিগর : বাদবাকি মুখখানা রুমালে ঢাকা।

দুজনকে দুহাতের ওপর নিয়ে সে সিঁড়ির দিকে এগুলো; কিন্তু পাটা ব্যথায় টনটন করে উঠল।

—'ওদের ধর তো, নাতালিয়া!' মুখ বিকৃত করে অপরাধীর মত হেসে বলল, 'নইলে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারব না।'

রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দারিয়া চুল আঁচড়াচ্ছিল। মুচকি হেসে হেলতে দুলতে সে গ্রিগরের দিকে এগিয়ে গেল, হাসিমাখা চোখদুটো বন্ধ করে গ্রিগরের ঠোঁটে ভেজা ভেজা উষ্ণ ঠোঁটদুটো চেপে ধরল।

—'তোমার ঠোঁটে তামাকের সোয়াদ!' রঙ্গভরে সে বাঁকা ভুরুদুটো নাচাল।

ভেড়ার চামড়ার জামাটা আর উর্দি খুলে গ্রিগর বিছানার পায়ের দিকে ঝুলিয়ে রাখল, তারপর চুল আঁচড়াল। একটা বেঞ্চের ওপরে বসে ছেলেকে ডাকল :

—'আমার কাছে এসো, মিশা! কেন, আমাকে চেনো না?'

হাতের মুঠোটা মুখের মধ্যে পুরেই ছেলেটা কাত হয়ে এগুতে লাগল কিন্তু টেবিলের কাছে এসে থেমে গেল। স্নেহে, গর্বে মা ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল। ঝুঁকে পড়ে মেয়ের কানে কানে কি যেন ফিসফিস করে বলল, তারপর তাকে সামনে ঠেলে দিয়ে বলল :

—'যাও, যাও না!'

দুজনকেই হাত দিয়ে জাপটে ধরে হাঁটুর ওপরে বসাল গ্রিগর, জিজ্ঞেস করল :

—'আমাকে চিনিস নে, বোকারা? তোমার বাপিকে চেনো না, পোলিয়া?'

—'তুমি তো আমাদের বাপি নও।' বোন সঙ্গে আছে, তাতে আরও আশ্বস্ত হয়ে ছেলেটা বলে উঠল।

—'তাহলে আমি কে?'

—'তুমি অন্য কোন লোক।'

—'ও, তাই বুঝি!' গ্রিগর জোরে হেসে উঠল। 'তাহলে তোমাদের বাপি কোথায়?'

—'বাপি তো পল্টনে গিয়েছে।' দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বরে মেয়েটা উত্তর দিল।

—'ঠিক বলেছিস, মনিরা, শুনিয়ে দে ওকে! এতকাল উনি বাইরে বাইরে কাটালেন, এই তাঁর বাড়ি ফেরার সময় হল!' কপট রুক্ষভাবে ইলিনিচ্‌না বাধা দিয়ে বলল, গ্রিগরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'তোর বৌও তোকে শিগ্‌গীরই তালাক দেবে! আমরা এর মধ্যেই ওর জন্যে লোক খুঁজছি!'

—'তুমি কি বল, নাতালিয়া?' গ্রিগর ঠাট্টাচ্ছলে স্ত্রীর দিকে ঘুরল।

নাতালিয়ার চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠল, কিন্তু লজ্জা দমন করে সোজা তার কাছে চলে এসে পাশে বসে পড়ল। তার গভীর আনন্দভরা চোখদুটো অনিমেষে স্বামীকে দেখতে লাগল, তপ্ত হাতে সে স্বামীর শুকনো বাদামি হাতে আস্তে আস্তে চাপড় দিতে লাগল। ইলিনিচ্‌না ডাকল :

—'দারিয়া, খাবার জোগাড় কর!'

—'ওর নিজেরই তো বৌ রয়েছে!' দারিয়া হেসে উঠল। হেলেদুলে পা ফেলতে ফেলতে উনুনের দিকে এগিয়ে গেল।

আগের মতই তন্বী, আগের মতই ছিমছাম আছে দারিয়া। লাল টকটকে পশমি মোজাজোড়া শক্ত হয়ে সুন্দর দুটি পায়ের সঙ্গে আঁকড়ে আছে, জুতোজোড়া এমন মাপ-সই যেন তার জন্যেই তৈরি করা। র‍্যাপস্-বেরি রঙের ঢেউতোলা ঘাঘরাটা তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে ঘিরে আছে, নক্সাতোলা অঙ্গ-রাখা সাদা ধবধব করছে। গ্রিগর তার স্ত্রীর দিকে চোখ ফেরাল, দেখতে পেল, সেও কিছুটা বদলে গিয়েছে। তার বাড়ি ফিরে আসার উপলক্ষে সাজসজ্জা করেছে: কব্জির কাছে শক্ত করে আঁটা লেসের হাতা দেওয়া নীল সার্টিনের জ্যাকেট সুঠাম দেহরেখা স্পষ্ট করে তুলেছে, বড় বড় নরম দুটি স্তনের ওপরে ফুলে রয়েছে, আর নক্সাতোলা, কোঁচকান, চওড়া পাড়-দেওয়া, নীল একটা ঘাঘরা কোমরটা আঁকড়ে রয়েছে। গ্রিগর তার শক্ত সমর্থ পা দুটো, উঁচু পেট আর চওড়া নিতম্বের দিকে তাকাল, ঠিক যেন ভাল দানা-পানি পাওয়া মাদী ঘোড়ার মত; মধ্যে মধ্যে ভাবল: 'হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যেও কসাক মেয়েদের চিনে নেওয়া যায়। সবকিছু দেখানোর মত করেই কসাক-মেয়েরা জামাকাপড় পরে: 'ইচ্ছে হয়, তাকিয়ে দেখ, ইচ্ছে না হয়, দেখো না!' কিন্তু 'চাষা'দের মেয়েদের পেট পাছা বুঝবার উপায় নেই, যেন বস্তা মুড়ি দিয়ে থাকে...'

গ্রিগর কি দেখছে তা বুঝতে পেরে ইলিনিচ্‌না জাঁক করে বলে উঠল:

—'আমাদের কসাকদের মধ্যে অফিসারদের বৌরা কেমন পোশাক পরে দেখ সবাই! যে-কোন শহুরে মেয়ের সঙ্গে ওরা টেক্কা দিতে পারে!'

—'এমন কথা যে কি করে বলেন, মা?' দারিয়া বাধা দিল। 'আমরা শহুরে মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দেব! আমার একটা দুল তো ভাঙা, আর একটার কানাকড়িও দাম হবে না।' তিক্তকণ্ঠে সে শেষ করল।

স্ত্রীর চওড়া পিঠের ওপর হাত রাখল গ্রিগর, মনে মনে ভাবতে লাগল: 'নাতালিয়া সুন্দরী, তা যে কোন লোকেরই চোখে পড়ে। আমাকে ছাড়া কি করে তার দিন কাটতো? মনে হয়, পুরুষেরা তার পেছনে ঘুর ঘুর করত, হয়তো সেও কোন কারুর পেছনে ঘুরত। ধরো, তাই যদি সে করে থাকে!' এই অপ্রত্যাশিত ভাবনায় তার বুকের ভেতরে ধড়ফড় করে উঠল, নাতালিয়ার গোলাপ-রাঙা, উজ্জ্বল মুখের দিকে সে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার তন্ময় দৃষ্টিতে লাল হয়ে নাতালিয়া ফিসফিস করে বলল:

—'অমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? আমার সঙ্গে আবার দেখা হওয়ায় খুশী হয়েছ?'

—'নিশ্চয়ই খুশী হয়েছি!'

অপ্রীতিকর চিন্তাকে মন থেকে সরিয়ে দিল সে, কিন্তু মুহূর্তের জন্যে স্ত্রীর ওপর প্রায় ঘেন্না জেগে উঠল।

কাশতে কাশতে ঘরে ঢুকল পান্তালিমন, আইকনের সামনে দাঁড়িয়ে ক্রশ করে, চেরাগলায় বলল:

—'আশীর্বাদ করি, সবাই তোরা বেঁচে বর্তে থাক!'

—'ভগবানের দয়া! তুমি কি শীতে জমে গিয়েছ গো? আমরা তোমার জন্যে বসে আছি। ঝোলটা গরম আছে।' চামচগুলো ঝনঝনিয়ে ইলিনিচ্‌না তড়বড় করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

গলায় বাঁধা লাল রুমালটা সে খুলে ফেলল, ভেড়ার চামড়ার জামাটা ছাড়ল, দাড়ি আর জুলপি থেকে কুচো বরফ ঝেড়ে নিয়ে, গ্রিগরের পাশে বসে বলল:

—'একেবারে জমে গেছি; কিন্তু গ্রামের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসায় বেশ গরম

হয়ে নিয়েছিলাম। আনিউৎকার শুয়োরটাকে চাপাই দিয়ে ফেললাম। মাগী কেমন তেড়ে এল! কেমন বলতে লাগল! 'দেখিয়ে দেব তোকে,' 'তুই অমুক, তুই তমুক,' 'চাষের মই চুরি করেছিল কে?' কার মই তা ভগবানই জানে!'

যে সব নাম করে আনিউৎকা গাল দিয়েছিল, তা সবই বিস্তারিত বলে গেল, শুধু এড়িয়ে গেল তার 'খানকি-বাজ' বিশেষণটা। গ্রিগর হাসতে হাসতে টেবিলের ধারে এসে বসল। ছেলের সামনে নিজের পক্ষ সমর্থনের চেষ্টায় পান্তালিমন তেরিয়া হয়ে বলল :

—'মাগীকে এক ঘা চাবুক কসিয়ে দিতাম, কিন্তু গ্রিগর সঙ্গে ছিল, আর তখন মারার মত সময়ও নয়।'

পিয়োত্রা দরজাটা খুলে দিল, একটা সুন্দর, ছোট বাছুরের গলাসি ধরে টানতে টানতে দুনিয়া ঘরে ঢুকল।

—''গ্রোভ্'-পরবে ক্ষীর দিয়ে আমরা আস্কে পিঠে খাব।' পা দিয়ে বাছুরটাকে সামনে ঠেলতে ঠেলতে পিয়োত্রা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল।

॥ তিন ॥

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর গ্রিগর তার পুঁটলি খুলে উপহারগুলো দিতে লাগল। মাকে একটা গরম শাল দিয়ে বলল, 'এটা তোমার জন্যে, মা।' ভুরু কুঁচকে, ছোট মেয়ের মত লজ্জায় লাল হয়ে ইলিনিচ্‌না শালটা নিয়ে কাঁধে জড়াল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে নিজের তারিফ করতে লাগল যে পান্তালিমন পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেল। বলে উঠল :

—'বুড়ী মাগী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কসরৎ করছেন! বাবাঃ!'

সামনের দিকে উঁচুকরা, লাল টকটকে পট্টি দেওয়া, একটা নতুন কসাকটুপি খুলে গ্রিগর তাড়াতাড়ি বলল :

—'এটা তোমার জন্যে, বাবা।'

—'বেঁচে থাক, বেঁচে থাক! আমার একটা নতুন টুপির দরকার ছিল। গত কয়বছরের মধ্যে দোকানে একটাও ছিল না। পুরনোটা মাথায় দিয়ে গির্জায় যেতে ইচ্ছে করে না। ওটা কাক-তাড়ুয়ার মাথায়ই মানায়, তবু পরে যেতে হয়।' বুড়ো রুদ্ধকণ্ঠে বলল। চারপাশে এমনভাবে তাকাতে লাগল যেন তার ছেলের দেওয়া উপহার কেউ কেড়ে নেবে।

কেমন মানায় দেখবার জন্যে সে আয়নার দিকে পা বাড়াল, কিন্তু ইলিনিচ্‌নার চোখে চোখ পড়তেই হঠাৎ ঘুরে গিয়ে সামোভারের দিকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল। সামোভারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কায়দা করে এক পাশে কাত করে টুপিটা দেখতে লাগল।

—'ওখানে করছ কি, বুড়ো হাবড়া?' ইলিনিচ্‌না ঘুরে তার দিকে দাঁড়াল কিন্তু পান্তালিমন খেঁকিয়ে জবাব দিল :

—'আহা, কি বুদ্ধি তোমার! এটা সামোভার, আয়না তো আর নয়।'

গ্রিগর তার বৌকে দিল ঘাঘরার জন্যে খানিকটা পশমী কাপড়; ছেলেমেয়েরা পেল পোয়াটেক মধুদেওয়া কেক, দারিয়া একজোড়া রুপোর দুল, দুনিয়া জ্যাকেটের কাপড় আর পিয়োত্রা সিগারেট ও তামাক। মেয়েরা উপহার নিয়ে কলরব শুরু করল আর পান্তালিমন বুক চিতিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে তাল ঠুকে বেড়াতে লাগল। পিয়োত্রা তারিফ করে বলল :

—'এই তো তোমার রক্ষী-দলের একজন খাপসুরত কসাক! আবার পুরস্কারও পেয়েছে! সম্রাট যখন দেখতে আসেন, তখন প্রথম পুরস্কার। একটা জিন আর তার সাজ-সরঞ্জাম! ইস্, তুমি...!'

গ্রিগর হেসে উঠল। সিগারেট ধরাল সবাই। আর পান্তালিমন অস্বস্তিভরে জানলার দিকে তাকিয়ে গ্রিগরকে বলল :

—'আত্মীয়স্বজন আর পাড়াপড়শিরা এসে পড়ার আগে পিয়োত্রাকে বল, ওখানে কি সব ঘটছে।'

গ্রিগর তার হাত নাড়ল। উত্তর দিল, 'ওরা লড়ছে।'

—'বলশেভিকরা কোথায়?' আরও আয়েশ করে বসতে বসতে পিয়োত্রা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করল।

—'তিন দিক থেকে আসছে: তিখোরেত্স্ক, তাগানরোগ্ আর ভোরোনেঝ থেকে।'

—'তা বেশ; তোদের বিপ্লবী সমিতি সে সম্পর্কে কি ভাবছে? আমাদের দেশের মধ্যে তাদের ঢুকতে দিচ্ছে কেন? ক্রিস্তোনিয়া আর ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ ফিরে অনেক ধানাই পানাই বলেছিল, কিন্তু আমি ওদের বিশ্বাস করিনে। ওরা যা বলে ব্যাপার ঠিক তা নয়।'

—'বিপ্লবী সমিতি অসহায়। কসাকরা ঘরমুখো ছুটছে!'

—'আর সেইজন্যেই কি সমিতি সোবিয়েতের দিকে ঝুঁকেছে?

—'নিশ্চয়ই সেই জন্যে?'

পিয়োত্রা চুপ করে সিগারেটের টান দিতে লাগল, তারপর ভাইএর দিকে গোল গোল চোখ তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল :

—'আর তুই কাদের দিকে?'

—'আমি সোবিয়েত সরকার চাই।'

—'আহাম্মুক!' পান্তালিমন বারুদের মত ফেটে পড়ল। 'পিয়োত্রা, ওকে বুঝিয়ে বল তো!'

পিয়োত্রা হাসল, ভাইএর পিঠে চাপড় মেরে বলল :

—'ও হচ্ছে টগবগে ঘোড়ার মতই তেজী। ওকে কি কেউ কিছু বোঝাতে পারে, বাবা?'

—'আমাকে কিছুই বোঝাবার নেই!' গ্রিগর চটে উঠল। 'আমি তো অন্ধ নই। গ্রামের লড়াই-ফেরতা লোকজন সব কি বলছে?'

—'লড়াই-ফেরতাদের দিয়ে আমাদের হবে কি? আহাম্মুক ক্রিস্তোনিয়াটাকে তুই এখনো পর্যন্ত চিনলি নে? ও কি বোঝে? লোকজনের বুদ্ধিসুদ্ধি ঘুলিয়ে গিয়েছে, কোন দিকে যাবে বুঝে উঠতে পারছে না। চারধারে শুধু দুঃখদুর্দশা!' পিয়োত্রা হাত নাড়ল, জুলপি কামড়াল : 'শরতকালে কি ঘটবে তা দেখবার চেষ্টা কর, তাতে তোর ধারণা পালটাবে। লড়াই করতে গিয়ে আমরা বলশেভিকদের তালে তাল দিয়েছি, কিন্তু এখন আমাদের বুদ্ধিসুদ্ধি ফিরে আসার সময় হয়েছে। 'অন্যের যা আছে, তার

কিছুই আমরা চাই নে, কিন্তু আমাদের গায়ে হাত দিও না বাপু!' যারাই আমাদের প্যানপ্যান করতে আসবে, তাদের এই কথাই কসাকদের বলে দেওয়া উচিত। কামেন্‌স্কায় যা হচ্ছে তা একেবারে যাচ্ছেতাই ব্যাপার। তারা বলশেভিকদের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়েছে, ওরা নিজেদের ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়।'

—'ভাব, তুই ভেবে দেখ, গ্রিগর।' বাপ তাকে বলল, 'তুই তো মুখ্যু নস। তোর বোঝা উচিত, একবার যে কসাক হয়, সে চিরদিনই কসাক থাকে। জঘন্য রাশিয়া আমাদের শাসন করবে, তা হবে না। আর জানিস, ভিনদেশীরা এখন কি বলে বেড়াচ্ছে? আমাদের মধ্যে সমস্ত জমি সমান ভাগ করে নিতে হবে। এ সম্পর্কে তোর কি মত?'

—'ডন অঞ্চলে যেসব ভিনদেশীরা অনেককাল ধরে আছে, আমরা তাদের জমি দেব।'

—'এক ছটাক জমিও না!' গ্রিগরের মুখের সঙ্গে বাঁকা নাকটা ঠেকিয়ে পান্তালিমন গর্জন করে উঠল।

বাইরে সিঁড়ির ওপর লোকজনের পায়ের শব্দ শোনা গেল; আনিকুশ্‌কা, ক্রিস্তোনিয়া আর ইভান তোমিলিন ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল।

—'এই যে, গ্রিগর! ছেলের বাড়ি আসা উপলক্ষে একটু পানটান হবে না, পান্তালিমন প্রোকোফিয়েভিচ্?' ক্রিস্তোনিয়া গাঁকগাঁক করে উঠল।

বাছুরটা উনুনের পাশে বসে ঝিমুচ্ছিল, তার চিৎকারে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল; তার পায়ে তখনো জোর হয়নি, নবাগতদের দিকে জুলজুলে চোখে তাকিয়ে টলমল করতে লাগল। বাছুরটা ভয় পেয়ে মেঝের ওপর সরু ধারায় পেচ্ছাব করে দিল। পিঠে একটা হাল্কা ঠোক্কর মেরে দুনিয়া তাকে থামাল, পেচ্ছাবটা মুছে দিয়ে তার পেটের নীচে একটা নোংরা বাটি ঠেলে দিল। ইলিনিচ্‌না চটেমটে বলে উঠল:

—'যে বাজখাঁই গলা, বাছুরটাকে ঘাবড়ে দিলে!'

কসাকদের সঙ্গে করমর্দন করে গ্রিগর তাদের বসতে বলল। শীগগীরই গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকেও অন্যান্য কসাকরা এসে হাজির হল। গল্পগুজব করতে করতে তারা এত তামাক পোড়াল যে, বাতিটা দপদপ করতে শুরু করল, বাছুরটারও দম আটকে আসতে লাগল।

মাঝরাত্তে অতিথিদের ঠেলেগুঁজে পাঠিয়ে দিয়ে ইলিনিচ্‌না শাপশাপান্ত করতে লাগল, 'মর মর, জ্বর হয়ে মর! যা, উঠোনে যা, উঠোনে গিয়ে তামাক টান! রান্নাঘরের চুঙ্গির মত ভস্‌ভস্ করে ধোঁয়া ছাড়ছেন সব। বেরো, বেরো বলছি! এতটা পথ এল, একটুও জিরোয় নি গ্রিগর। দিব্যি দিয়ে বলছি, বেরো সব!'

॥ চার ॥

পরদিন সকালে গ্রিগরের ঘুম ভাঙল সকলের পরে। কার্নিসে, জানলার বাইরে বসন্তকালের মত চড়ুই-পাখির কিচিরমিচিরে জেগে উঠল। রাশিকৃত সোনালী রোদ্দুর খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। গির্জায় উপাসনার ঘণ্টা বাজছে; মনে পড়ল, আজ রবিবার। নাতালিয়া তার পাশে নেই, কিন্তু পালকের বিছানায় তখনো তার দেহের উষ্ণতা জড়ানো। স্পষ্টই বোঝা গেল, বেশিক্ষণ আগে সে উঠে যায়নি। গ্রিগর ডাকল:

—'নাতালিয়া।'

দুনিয়া ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই, দাদা?'

—'জানলাটা খোল, আর নাতালিয়াকে ডেকে দে। কি করছে সে?'

—'মার হাতে হাতে কাজ করে দিচ্ছে। এক্ষুনি এসে পড়বে।'

ঘরের আলোআঁধারিতে চোখ কোঁচকাতে কোঁচকাতে নাতালিয়া এসে ঢুকল। তার হাতে মাখা-ময়দার তাজা গন্ধ। না উঠেই গ্রিগর তাকে জড়িয়ে ধরল; রাতের কথা মনে পড়তেই হেসে উঠল। বলল :

—'তোমারও উঠতে দেরি হয়েছে!'

—'উঃ! রাত্তিরবেলায় একেবারে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম।' নাতালিয়া হাসল, গ্রিগরের লোমশ বুকে মুখ লুকিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

ঘা-টা বাঁধতে সাহায্য করল নাতালিয়া; তারপর সিন্দুক থেকে সেরা পা-জামাটা বার করে জিজ্ঞেস করল :

—'তোমার ক্রশ লাগানো অফিসারের উর্দিটা তো পরবে?'

—'না না, ওটা পরব কেন?' সভয়ে সে হাত নেড়ে নাতালিয়াকে সরিয়ে দিল। কিন্তু নাতালিয়া আগ্রহের সঙ্গে যুক্তি দেখাতে লাগল :

—'পর, পর! পরলে বাবা খুশী হবেন! যদি বাক্সেই পচবে, তাহলে এসব পেতে গেলে কেন?'

তার অনুরোধ উপরোধে রাজি হল গ্রিগর। বিছানা ছেড়ে উঠে দাদার কাছ থেকে ক্ষুর চেয়ে আনল; দাড়ি কামিয়ে, মুখ আর ঘাড় ধুয়ে ফেলল। পিয়োত্রা জিজ্ঞেস করল :

—'ঘাড়ের পেছনটা কামিয়েছিস?'

—'যাঃ শালা! ভুলে গেছি!'

—'আচ্ছা, বস, আমি কামিয়ে দিচ্ছি।'

ঠাণ্ডা সাবানে ঘাড়ে যেন ছ্যাঁকা লাগল। গ্রিগর আয়নার মধ্যে দিয়ে দেখতে পেল, দাদা ক্ষুর বুলাচ্ছে আর মুখের এক কোণার দিকে জিভটা বেরিয়ে আছে।

—'তোর ঘাড়টা সরু হয়ে গিয়েছে। লাঙল টেনে টেনে বলদের যেমন হয়।' পিয়োত্রা হাসল।

—'পল্টনের খোরাকে তো আর চর্বি জমে না।'

অফিসারের তকমা আর সারি সারি ভারী ক্রশ ঝোলানো উর্দিটা গায়ে চড়াল গ্রিগর। ধোঁয়া ওঠা আয়নায় যখন নিজের চেহারা দেখল তখন নিজেই নিজেকে প্রায় চিনতে পারল না : জিপ্‌সিদের মত লাল টকটকে, লম্বা, রোগামত এক অফিসার তার দিকে তাকিয়ে আছে।

—'তোকে ঠিক কর্নেলের মত দেখাচ্ছে!' পিয়োত্রা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল; ছোট-ভাইকে তারিফ করার সময় ঈর্ষার লেশমাত্র সুরও তার গলায় বেজে উঠল না। নিজে অখুশী হওয়া সত্ত্বেও দাদার কথায় সে খুশী হল। সোজা সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। দারিয়া তার দিকে সপ্রশংসদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, আর দুনিয়া বলে উঠল :

—'ইস্! ভারী যে ফিট্‌ফাট দেখাচ্ছে!'

কথাটা শুনে ইলিনিচ্‌না চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। নোংরা অঙ্গ-রাখায় চোখ মুছে দুনিয়ার বিদ্রুপের জবাবে বলল :

—'ওরে ছুঁড়ি, তোর হোক দেখি অমন ছেলে! আমি দুটোকে পেয়েছি, দুজনেই তারা আজ দুনিয়ার সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।'

কাঁধের ওপর গ্রেট-কোটটা চাপিয়ে গ্রিগর উঠোনে বেরিয়ে এল। পায়ের ব্যথার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নামতে বেশ কষ্ট বোধ হল। রেলিংটা চেপে ধরতে ধরতে মনে মনে ভাবল, 'আমাকে লাঠি ভর দিয়ে চলতে হবে দেখছি।' মিল্লেরোভোতেই গুলিটা বার করে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু ঘা শুকিয়ে চামড়া কুঁকড়ে গিয়েছে, ভাল করে সে পা নাড়াতে পারে না।

ঘরের বাইরের একটা খাঁজের মধ্যে বেড়ালটা রোদ পোয়াচ্ছে। সিঁড়ির চারপাশে বরফ গলে গলে জল জমছে। খুশী খুশী মনে গ্রিগর উঠোনের চারধার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ঠিক সিঁড়ির পাশেই একটা খুঁটি পোঁতা, তার মাথায় একটা চাকা লাগানো। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে ওটা ওইখানেই পোঁতা আছে, মেয়েরা কাজে লাগায়। রাত্রে সিঁড়ির ওপরের ধাপে দাঁড়িয়ে তারা দুধের কেঁড়েগুলো ওরই ওপর রেখে দেয়, দিনেরবেলায় বাটি ঘটি, বাসনকোসন শুকোনো হয়। উঠোনের কিছু কিছু পরিবর্তন তখন তখনই তার চোখে ধরা পড়ল : রঙের বদলে মরাইএর দরজায় গেরি-মাটির প্রলেপ লাগান হয়েছে, চালটা নতুন করে ছাওয়া হয়েছে, খড়ের রঙ এখনো হলুদ; জ্বালানিকাঠের গাদাটা ছোট ছোট মনে হচ্ছে—সম্ভবত বেড়া সারতে কিছু লাগান হয়েছে। মাটির নীচের ভাঁড়ারের ওপরকার ঢিবিটা ছাইতে নীল হয়ে আছে; একটা কালো কুচকুচে মোরগ তার ওপর খোঁড়ার মত এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ঘিরে আছে গোটা বারো বিচিত্রবর্ণের মুরগী। শীতকাল বলে চাষের জিনিসপত্তর চালার নীচে জমা করা রয়েছে। হাড়-পাঁজরা বার করা গাড়ির কাঠামগুলো দাঁড় করান রয়েছে। ছাদের একটা ফুটো দিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে কাটাই-কলের লোহা-বাঁধানো অংশে, ঝকমক করছে সেটা। আস্তাবলের পাশে গোবরের গাদার ওপর রাজহাঁসগুলো বসে আছে: পাশ দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যাবার সময় একটা ওলন্দাজী রাজহাঁস গ্রিগরের দিকে ট্যারা-চোখে উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকাল।

খামারবাড়ির সব জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখল গ্রিগর, তারপর বাড়ির ভেতর চলে এল। রান্নাঘরে তাজা মাখন আর সেঁকা রুটির গন্ধ। দুনিয়া আপেল কুচিয়ে জলে ধুচ্ছে। তার দিকে তাকাল গ্রিগর, হঠাৎ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল :

—'নুনে-জরানো তরমুজ আছে রে?'

—'যাও না, ওকে কিছু এনে দাও, নাতালিয়া।' ইলিনিচ্‌না নাতালিয়াকে ডেকে বলল।

পান্তালিমন গির্জা থেকে ফিরে এল। পরিবারের প্রত্যেকের জন্যে এক টুকরো এক টুকরো করে ময়দার চাকতিটাকে নয় টুকরো করল, তারপর টেবিলের চারধারে সবার হাতে হাতে দিয়ে দিল। সকালের খাবার খেতে বসল সবাই। পিয়োত্রাও এই উপলক্ষে সাজসজ্জা করেছিল, এমনকি চর্বি ঘসে গোঁফটাও চকচকে করেছিল, সে এসে গ্রিগরের পাশে বসল। তাদের ঠিক উল্টো দিকে দারিয়া বসল টেবিলের ধারিতে টাল রেখে। তার গোলাপী, উজ্জ্বল মুখে রোদ্দুরের একটা মোটা রেখা এসে পড়ল, চোখ কুঁচকে, অসন্তুষ্টভাবে চকচকে ভুরুর কালো ধনুক নীচু করল। ছেলেমেয়ে দুটোকে সেদ্ধ লাউ খাওয়াল নাতালিয়া, দুনিয়া বাপের পাশে বসে রইল, আর ইলিনিচ্‌না রইল উনুনের একেবারে কাছে টেবিলের শেষপ্রান্তে।

ছুটির দিনে চিরকাল যেমন হয়, সবাই পেটপুরে খেল। মাংস দেওয়া বাঁধাকপির ঝোলের পর ঘরে তৈরি সেমাই, তারপর পাঁঠার মাংস, একটা মুরগী, ভেড়ার ঠাণ্ডা দাবনা, খোসাশুদ্ধ আলুসেদ্ধ, মাখন দেওয়া যবের খিচুরি, শুকনো চেরি মেশানো সেমাই,

আস্কোপিঠে, খোয়াক্ষীর আর নুনে জরানো তরমুজ। গুরুভোজনের পর গ্রিগর অতিকষ্টে উঠল, মাতালের মত ক্রুশ করল, তামাক টানল, তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল। পান্তালিমন তখনো বসে বসে সেমাইটুকু কায়দা করার চেষ্টা করতে লাগল : চামচে দিয়ে একটা গর্ত করে তার মধ্যে খানিকটা গরম ঘি ঢেলে দিল, আর চামচে ভর্তি করে কাদাকাদা সেমাই টেনে তুলতে লাগল। পিয়োত্রা ছেলেপুলে ভালবাসে, সে মিশাকে খাওয়াতে লাগল, রঙ্গ করে ছেলেটার মুখে নাকে ঘোল মাখিয়ে দিল। বেচারা আপত্তি জানাল :

—'জেঠু, ইয়ার্কি করো না!

—'কেন, কি হয়েছে?'

—'আমার মুখে ওসব মাখিয়ে দিচ্ছ কেন?'

—'বেশ তো, কি করবি?'

—'মাকে বলে দেব।' মিশার বিষণ্ণ চোখদুটো রাগে চকচক করে উঠল, চোখে বিরক্তির অশ্রু টলমল করতে লাগল। হাতের মুঠো দিয়ে নাক মুছল সে, মিষ্টি কথায় জ্যাঠাকে নিবৃত্ত করতে না পেরে মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল :

—'করো না বলছি, করো না! পাজি! গাধা!'

পিয়োত্রা শুধু হো হো করে হেসে উঠল, ভাইপোর নাকে মুখে আবার তেমনি মাখিয়ে দিল।

দুনিয়া গ্রিগরের পাশে বসে পড়ল, বলল : 'বড়দাটা একটা আস্ত আহাম্মুক! সব সময় নতুন নতুন ফন্দি বার করছে। সেদিন মিশাকে নিয়ে বাইরের উঠোনে গেল, ছেলেটার ভীষণ ইচ্ছে চলে আসে, জিজ্ঞেস করল, 'জেঠু, সিঁড়ি দিয়ে চলে যাব?' কিন্তু পিয়োত্রা বলল : 'না, যেতে পাবে না। আরও কিছুদূর চলে যাও।' মিশা খানিকদূর দৌড়ে গেল, জিজ্ঞেস করল : 'এখানে?' 'না, না; মরাই পর্যন্ত যাও।' মরাই থেকে ছেলেটাকে পাঠাল আস্তাবলে, আস্তাবল থেকে আবার ঝাড়াই-উঠোনে। বেচারাকে এমনই ছুটোছুটি করাল যে, শেষ পর্যন্ত তার পেণ্টুল ভরেই হয়ে গেল। আর নাতালিয়াও তেড়ে গেল ছেলেটাকে!'

পিয়োত্রা আর মিশার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে, সিগারেট পাকাতে পাকাতে গ্রিগর শুনে গেল। তার বাপ এসে দাঁড়াল কাছে। চুপি চুপি বলল :

—'ভাবছি, গাড়ি নিয়ে আজ ভিয়েশেন্স্কা যাব।'

—'কি জন্যে?'

গুরুভোজনের প্রচণ্ড ঢেকুর তুলল পান্তালিমন, দাড়িতে টোকা দিতে দিতে বলল :

—'জিন-ওয়ালার দোকানে কাজ আছে; তাকে দিয়ে দুটো যোয়াল সারাতে হবে।'

—'আজই ফিরতে পারবে?'

—'কেন পারব না? সন্ধ্যেবেলাই ফিরে আসব।'

॥ পাঁচ ॥

একটু বিশ্রাম নিয়ে বুড়ো স্লেজের সঙ্গে মাদীঘোড়াটা যুতল। ঘোড়াটা সেই বছরই অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই ভিয়েশেনস্কায় পেঁাছে গেল। প্রথমে গেল পোস্টাপিসে, তারপর জিন-ওয়ালার কাছে, সেখান থেকে যোয়াল দুটো তুলে নিল। তারপর স্লেজ চালিয়ে এল এক পুরন, গপ্পে বন্ধুর বাড়িতে, বন্ধু থাকে নতুন গির্জার ধারে। লোকটা পুরোদস্তুর অতিথিপরায়ন, তাকে দুপুরের খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত রেখে দিল। গেলাসে কি যেন একটা ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করল :

—'পোস্টাপিসে গিয়েছিলে?'

—'হ্যাঁ।' জানোয়ার-খোঁজা কুকুরের মত নাকে শুঁকতে শুঁকতে অবাক হয়ে বোতলের দিকে তাকিয়ে পান্তালিমন উত্তর দিল।

—'তাহলে খবরটা শুনেছ?'

—'খবর? না, শুনি নি তো। কি খবর?'

—'কালেদিনের। আলেক্সি মাক্সিমোভিচ্ কালেদিন আর নেই?'

—'কি বলছ তুমি?' পান্তালিমন স্পষ্টতই ফ্যাকাসে হয়ে গেল, সন্দেহজনক বোতল আর তার গন্ধের কথা ভুলে গিয়ে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল। গম্ভীর হয়ে চোখ পিটপিট করতে করতে বাড়ির কর্তা বলল :

—'আমরা টেলিগ্রাফে খবর পেয়েছি গতকাল তিনি নোভোচেরকাসে গুলিতে আত্ম-হত্যা করেছেন। এদেশে তিনিই তো ছিলেন সত্যিকারের জেনারেল। কি হিম্মৎ ছিল লোকটার! কসাকদের সম্মানের হানি হয়, এমন কিছুই তিনি করতে দিতেন না।'

—'দাঁড়াও দাঁড়াও! এখন তাহলে কি হবে?' তার দিকে এগিয়ে দেওয়া গেলাসটা সরিয়ে রেখে পান্তালিমন হতবুদ্ধির মত প্রশ্ন করল।

—'কে জানে! বড়ই খারাপ দিন আসছে। সময় যদি ভালই হবে তাহলে কি কেউ গুলিতে আত্মহত্যা করে, সেই তো আমার ভয়।'

—'কেন তিনি একাজ করলেন?'

বাড়ির কর্তা পান্তালিমনের মতই রক্ষণশীল। ক্রুদ্ধ হয়ে সে হাত নাড়ল।

—'লড়াই-ফেরতারা তাঁকে ছেড়ে গেছে, বলশেভিকদের দেশের মধ্যে ঢুকতে দিয়েছে; তাইতো আতামান এমন কাজ করে বসলেন। তাঁর মত আর কাউকে যে পাব, এতে আমার সন্দেহ আছে। কে আমাদের বাঁচাবে? কামেনস্কায় বিপ্লবী-পঞ্চায়েত, না কি একটা খাড়া করা হয়েছে, তার মধ্যে লড়াই-ফেরতারাও আছে। আর এখানে...শুনেছ সে খবর? আতামানদের খেদিয়ে, তার জায়গায় বিপ্লবী পঞ্চায়েত বসাবার জন্যে এখানে আমাদের ওপর হুকুম এসেছে। 'চাষা'রা সব মাথা তুলতে শুরু করেছে। যত সব ছুতোর, কামার, মুনিষ...এই ভিয়েশেনস্কায় মাঠের পোকার মত থিকথিক করছে।'

মাথা নুইয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল পান্তালিমন। যখন মুখ তুলল, তখন তার চোখের দৃষ্টি কর্কশ, কঠোর। জিজ্ঞেস করল :

—'তোমার এ বোতলে কি আছে হে?'

—'কড়া মদ। এক আত্মীয় ককেশাস থেকে এনেছে।'

—'বেশ, ঢাল দেখি, দোস্ত। স্বর্গীয় আতামানের নামে খাই। স্বর্গের দরজা তাঁর জন্যে যেন খোলা থাকে।'

তারা মদ খেল। বাড়ির মেয়ে খাবার নিয়ে এল। মেয়েটি লম্বা, চোখের পাতা বড় বড়। পান্তালিমন সর্বপ্রথমে তাকাল ঘোড়াটার দিকে। মনমরা হয়ে সে স্লেজের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বাড়ির কর্তা আশ্বাস দিয়ে বলল :

—'ঘোড়ার জন্যে কিছু চিন্তা করো না। ওর দানাপানির ব্যবস্থা আমি করাচ্ছি।'

॥ ছয় ॥

উত্তেজিত আলোচনা আর বোতল নিয়ে পান্তালিমন শিগ্‌গীরই তার ঘোড়া আর দুনিয়ার সবকিছু ভুলে গেল। গ্রিগরের সম্পর্কে এলোমেলো বকে গেল, আধা-মাতাল বাড়ির কর্তার সঙ্গে তর্ক করতে নামল, তর্কও করল, তারপর কেন তর্ক করছে তা একেবারেই ভুলে মেরে বসল। যখন উঠে দাঁড়াল, তখন সন্ধ্যে হয়েছে। রাত কাটানোর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে বাড়ি ফিরে যাওয়াই ঠিক করল। বাড়ির ছেলে ঘোড়াটা যুতে আনল, বাড়ির কর্তা তাকে ধরে স্লেজের মধ্যে তুলে দিল। তারপর ঠিক করল বন্ধুকে গ্রামের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে। স্লেজের পাটাতনের ওপর শুয়ে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরল। স্লেজটা প্রথম গেটের খুঁটিতে ধাক্কা খেল, তারপর কোণে কোণে টক্কর খেতে খেতে একসময় স্তেপের মধ্যে এসে পড়ল। সেখানে এসে বাড়ির কর্তা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, ইচ্ছে করেই স্লেজ থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। পায়ের ওপর উঠে দাঁড়াতে না পেরে অনেকক্ষণ চার হাতপায়ে ভর দিয়ে খিস্তি করতে লাগল। চাবুক মেরে পান্তালিমন ঘোড়াটাকে দুলকিতে ছুটিয়ে দিল। দেখতেও পেল না যে তার বন্ধু বরফের মধ্যে নাক গুঁজে রাস্তা বরাবর হামা দিয়ে চলেছে, খোস-মেজাজে হাসতে হাসতে হেঁড়ে গলায় অনুনয় করছে :

—'কাতুকুতু দিও না...দোহাই, কাতুকুতু থামাও।'

চাবুক খেয়ে ঘোড়াটা চনমন করে জোরে জোরে, কিন্তু এক অনিশ্চিত দুলকি চালে ছুটতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রভু নেশায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে, স্লেজের গায়ে মাথা রেখে এলিয়ে চুপচাপ পড়ে রইল। লাগামটা খসে নীচে পড়ে গেল, আর চালক-বিহীন, অসহায় ঘোড়াটা চাল থামিয়ে হেলেদুলে চলতে শুরু করল। প্রথম মোড়ে এসেই আসল রাস্তা ছেড়ে সে একটা ছোট গ্রামের দিকে এগুতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে সে রাস্তাটাও হারিয়ে ফেলল। খোলা স্তেপের মধ্যে দিয়ে আড়াআড়ি পথ ধরতে গিয়ে একটা বনের মধ্যে জমা গভীর বরফে আটকে এক গর্তে পড়ে গেল। ঝোপের সঙ্গে স্লেজ আটকে ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝাঁকুনি খেয়ে বুড়ো মুহূর্তের জন্যে জাগল। মাথাটা উঁচু করে হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, এই শয়তান...,' তারপর আবার শুয়ে পড়ল।

ঘোড়াটা চলতে শুরু করল। বিনা বিপত্তিতে বনটা পেরিয়ে ভালভাবেই ডনের ধারে এসে পড়ল, তারপর পুবল বাতাসে উড়িয়ে আনা ধোঁয়ার গন্ধ ধরে ধরে পাশের গ্রামের দিকে এগুলো।

গ্রামের আধ-মাইলটেক দূরে নদীর বাঁ-পাড়ে একটা খাদ। এই খাদের চারধারে ঢালির পাড় বেয়ে বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে, কিন্তু প্রচণ্ড শীতেও এখানকার জল কখনো জমে না, একটা চওড়া, অর্ধ-চন্দ্রাকার জলা হয়ে থাকে। নদীর ধারের রাস্তাটা জলাটাকে সাবধানে এড়িয়ে একদিকে হঠাৎ বাঁক নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। বসন্তকালে মাঠের জল যখন এই খাদের মধ্যে দিয়ে বান ডাকিয়ে ডনে ফিরে যায় তখন একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণীর সৃষ্টি হয়। পাড় থেকে গড়িয়ে নামা কাঠকুটোর স্তূপের পাশে গভীর জলে কার্পমাছ সারা গ্রীষ্মকাল লুকিয়ে থাকে।

অন্ধ ঘোড়াটা, এই জলার বাঁ-ধারের দিকে এগুতে লাগল। প্রায় একশ হাত দূরে যখন, পান্তালিমন পাশ ফিরে একবার চোখদুটো অর্ধেক খুলল। কালো আকাশ থেকে হলদে-সবুজ, কাঁচা চেরির মত তারাগুলো নীচের দিকে তাকিয়ে আছে। 'রাত হলো...' বুড়োর আবছা আবছা মনে হল। লাগামে প্রচণ্ড জোরে টান মেরে ঘোড়াটাকে চিৎকার করে তাড়া দিল :

—'দাঁড়া! দেখাচ্ছি তোকে রাঙা-মুলো!'

ঘোড়াটা দুলকিতে ছুটতে শুরু করল। তার নাকে এল জলের গন্ধ। কান দুটো খাড়া করে প্রভুর দিকে একবার অন্ধ, অবুঝ দৃষ্টিতে তাকাল। হঠাৎ তার কানে এল প্যাক-খাওয়া জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। পাগলের মত নাক ঝাড়তে ঝাড়তে একপাশে সরে গিয়ে সে পিছিয়ে যাবার চেষ্টা করল। জলার ধারের আধ-গলা বরফ তার খুরের চাপে মচমচ করে গুঁড়িয়ে গেল, আর হালকা বরফজমা ধারটা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। মৃত্যুর আতঙ্কে ঘোড়াটা নাকের আওয়াজ করে উঠল। পেছনের দুপায়ে ভর রেখে সমস্ত শক্তি দিয়ে সে আটকাবার চেষ্টা করল, কিন্তু ইতিমধ্যে সামনের পাদুটো জলের মধ্যে গিয়ে পড়েছে আর পেছনের দু পায়ের নীচের পাতলা বরফ ভাঙতে শুরু করেছে। মড়মড় করে বরফ ভেঙে গেল। জলার মধ্যে ডুবতে ডুবতে ঘোড়াটা ছটফট করে পেছনের পায়ে লাথি ছুঁড়ল, লাথিটা লাগল গিয়ে শ্লেজের ডাণ্ডায়। সেই মুহূর্তেই— কিছু একটা ঘটে গেল, তারই শব্দ কানে যেতেই পান্তালিমন শ্লেজ থেকে লাফিয়ে পড়ে পেছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ঘোড়ার ভারে সামনের দিকটা ডুবতে থাকায়, সে শুধু দেখতে পেল পাশের চকচকে দড়ি দুটো খুলে গিয়ে শ্লেজের পেছনটা উঁচু হয়ে উঠল, তারপর মড়াৎ করে সবুজ-কাল অতল জলে তলিয়ে গেল। টুকরো বরফ মেশানো জল সামান্য ভকভক করে উঠল, একটা ঢেউ প্রায় তার পা পর্যন্ত এসে আছড়ে পড়ল। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় হামা দিয়ে সে পিছিয়ে এল, তারপর গাঁক্‌গাঁক্‌ করতে করতে লাফিয়ে উঠে পায়ের ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়াল।

—'বাঁচাও, বাঁচাও, কে আছ! ডুবে মলাম!'

তার নেশা ছুটে গেল, যেন ঠিক তলোয়ারের একটা কোপে উড়িয়ে দিল। সে দৌড়ে এল জলার ধারে। সদ্যভাঙ্গা বরফ ঝকমক ঝকমক করছে। চওড়া, কালো অর্ধ-চন্দ্রাকার জলার ওপর দিয়ে বাতাসে বরফের কুচি উড়িয়ে নিয়ে চলেছে ঢেউগুলো সবুজ কেশর নাড়িয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করছে। চারধারে মৃত্যুর মত স্তব্ধতা। অন্ধকারের মধ্যে দূর গ্রামের আলোগুলো মিটমিট করছে। তারাগুলো যেন সদ্য তুঁষ-ঝাড়া গমের ছোট ছোট দানার মত, আকাশের ঠাস বুনুনিতে আটকে গিয়ে উল্লাসভরে ঝিকমিক করছে। মাঠ থেকে বাতাসে বরফ উড়িয়ে আনছে, হিস্‌হিস্‌ শব্দ করে গুঁড়োগুলো ছেঁড়া ফুলের মত জলার কালো গহ্বরে নিয়ে গিয়ে ফেলছে। জলা থেকে একটু একটু ধোঁয়া উঠছে। জলাটা ভয়াবহ, মারাত্মকভাবে হাঁ করে রয়েছে।

পান্তালিমন বুঝতে পারল এখন চিৎকার করার কোন মানে হয় না, চিৎকার করা বোকামো। চারদিকে তাকিয়ে ঠাহর করতে পারল নেশার ঘোরে কোথায় এসে পড়েছে। নিজের ওপর, যা ঘটেছে তার ওপরই সে রেগে কাঁই হয়ে গেল। চাবুকটা তখনো হাতে ধরা আছে : সেটা হাতে নিয়েই সে স্লেজ থেকে লাফিয়ে পড়েছিল। ভয়াবহ খিস্তি করতে করতে সে তার নিজের পিঠেই সপাং সপাং করে চাবুক মারতে লাগল, কিন্তু তাতে ব্যথা লাগল না, কারণ মোটা ভেড়ার চামড়া আঘাতের জোর কমিয়ে দিল। শুধু এই খেয়ালের জন্যেই জামাকপড় খুলে ফেলা অর্থহীন মনে হল। দাড়ি থেকে একমুঠো চুল ছিঁড়ে নিয়ে, মনে মনে ঘোড়া, স্লেজ আর যোয়ালদুটোর দাম কষতে কষতে সে পাগলের শাপশাপান্ত করত লাগল। তারপর জলার আরও কাছে এগিয়ে গেল।

—'ওরে কানা শয়তান, তোর মা হারামজাদী ছিল...' ডুবে যাওয়া ঘোড়াটাকে সম্বোধন করে কাঁপাকাঁপা আর্তস্বরে বলতে লাগল। 'তুই একটা ছুঁচো! নিজে ডুবেছিস, আমাকেও প্রায় ডুবিয়ে মারছিলি। জলার পেত্নী তোকে কোথায় টেনে নিয়ে গেল। পিঠে যোয়াল চাপিয়ে পেত্নীরা তোকে ঠিক চালাবে দেখিস, কিন্তু তাদের হাতে চাবকানোর কিছু নেই! এই ধর, চাবুকটাও নে!' খেপে গিয়ে চেরিডালের চাবুকটা সে মাথার ওপরে ঘোরাতে লাগল, তারপর জলার মাঝখানে ছুঁড়ে দিল।

চাবুকটা সাঁ করে গিয়ে পড়ল। প্রথমে জলের সর ভাঙল, তারপর অতলে তলিয়ে গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

জ্ঞান ফিরে আসার পর বানচাকের সর্বপ্রথম চোখে পড়ল আন্নার কালো চোখদুটো, অশ্রুতে, হাসিতে ঝিকমিক করছে।

তিন সপ্তাহ ধরে সে ভুল বকেছে। তিন সপ্তাহ ধরে সে আর এক, ধরা-ছোঁয়ার অতীত, অবাস্তব জগতে ঘুরে মরেছে। তার জ্ঞান ফিরেছে জানুয়ারির ছয় তারিখের সন্ধ্যের দিকে। বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আন্নার দিকে তাকিয়ে থেকে তার সঙ্গে জড়িত সবকিছু সে মনে করবার চেষ্টা করল কিন্তু শুধু আংশিকভাবে সফল হল। অদূর অতীতের অনেক কিছুই তখনো তার স্মৃতির গভীরে অনড় হয়ে ডুবে রইল।

—'একটু জল খাব...' সে শুনতে পেল, অনেক দূর থেকে তার গলার স্বর যেন ভেসে এল; তাতে মজা বোধ করে একটু হাসল। আন্নার হাতে ধরা পেয়ালাটা নেবার জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিল, কিন্তু হাত সরিয়ে দিয়ে আন্না বলল :

—'আমার হাত থেকেই জল খেতে হবে।'

বানচাকের মনে এক গভীর কৃতজ্ঞতার ঢেউ জেগে উঠল। মাথা তুলবার চেষ্টায় থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে জলটুকু খেয়ে নিল, তার পর আবার ক্লান্তিতে বালিসে এলিয়ে পড়ল। কিছু যেন বলতে চেয়ে সে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইল। কিন্তু ক্লান্তিতে পেয়ে বসল তাকে, ঘুমিয়ে পড়ল সে।

॥ দুই ॥

যখন ঘুম ভাঙল, তখনো আবার সব প্রথম তার চোখে পড়ল আন্নার সেই উদগ্রীব, ক্লেশাতুর চোখদুটো: তারপর বাতির আলো, ছাতের কাঠে গিয়ে পড়া আলোর সাদা চক্রটা।

—'আন্না, এখানে এসো!'

আন্না এগিয়ে এসে হাতটা তুলে নিল। একটা ক্ষীণ চাপ দিয়ে তার জবাব দিল বানচাক। আন্না জিজ্ঞেস করল:

—'এখন কেমন বোধ হচ্ছে?'

—'মনে হচ্ছে, আমার জিভটা আমার নয়, মাথাটা আমার নয়, পা-দুটোও তাই। যেন দুশো বছর বয়েস হয়ে গেছে।' অতি সন্তর্পণে প্রত্যেকটি কথা সে উচ্চারণ করে করে বলল। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল: 'আমার কি টাইফাস হয়েছিল?'

—'হ্যাঁ।'

চোখদুটো ঘরের চারধারে বুলিয়ে নিয়ে তারপর সে অস্পষ্টভাবে জিজ্ঞেস করল:

—'আমরা কোথায়?'

—'জারিৎসিনে।'

—'আর তুমি...তুমি এখানে কি করে এলে?'

—'আমি আপনার সঙ্গেই রয়ে গেছি।' যেন নিজের সমর্থনে কিংবা তার অব্যক্ত চিন্তাটাকে এড়াবার জন্যেই সে তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল:

—'অজানা লোকের হাতে অপনাকে পুরোপুরি ছেড়ে দিতে সাহস পাইনি আমরা। তাই আব্রামসন আর কমিটির কমরেডরা আপনাকে দেখাশোনা করতে বলেছেন.. আর তাই, বুঝতেই পারছেন, একেবারে হঠাৎই আপনার সঙ্গে চলে আসতে হল।'

চোখের দৃষ্টি আর হাতের ক্ষীণভঙ্গিতে সে ধন্যবাদ জানাল। জিজ্ঞেস করল:

—'আর ক্রুতোগোরোভ?'

—'সে লুগান্স্কে গিয়েছে।'

—'গিয়েভোর কিয়ান্ৎস?

—'সে...সে...টাইফাসে মারা গেছে।'

দুজনে চুপ করে রইল, যেন মৃতের উদ্দেশে দুজনে সম্মান জানাল। শান্ত গলায় আন্না বলল:

—'আপনার জন্যে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। খুবই অসুখ করেছিল আপনার।'

—'আর বোগোভয়?'

—'ওদের সবার সঙ্গেই যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি। কেউ কেউ কামেন্স্কায় চলে গিয়েছে। কিন্তু আপনার কথা বলা কি উচিত হচ্ছে? একটু দুধ খাবেন না?'

বানচাক মাথা নাড়ল। আনাড়ির মত পাশ ফিরল; মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল, চোখে রক্ত ঠেলে এল। কপালে আন্নার ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শ পেয়ে সে চোখ খুলল। একটি প্রশ্নই তার মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল: সেত অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল, কিন্তু

কে তাকে সেবা শুশ্রূষা করেছে? নিশ্চয়ই আন্না নয়? তার গালদুটো ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠল, জিজ্ঞেস করল:

—'তোমাকে কি একাই আমার দেখাশোনা করতে হয়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

॥ তিন ॥

জ্বর ছাড়ল, কিন্তু সামান্য একটু কানের দোষ ঘটিয়ে দিয়ে গেল। জারিৎসিন পার্টি-কমিটির পাঠানো ডাক্তার আন্নাকে বলল, পুরোপুরি সেরে উঠলে সেটা হয়ত সারানো সম্ভব হবে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে সে ভাল হতে লাগল। তার পেটে রাক্ষসের মত খিদে, কিন্তু আন্না কঠোর ভাবে মেপে মেপে পথ্য দেয়। এই ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে একাধিকবার ঝগড়া বাধল। বানচাক হয়ত বলল:

—'আমাকে আরও একটু দুধ দাও।'

—'আর দুধ আপনি পাবেন না।'

—'আমি বলছি...আন্না একটু দুধ দাও। তুমি কি চাও আমি উপোস করে মরি?'

—'ইলিয়া, আপনিত জানেন, ঠিক পরিমাণের বেশি দেওয়া উচিত হবে না।'

আহত হয়ে চুপ করে যায় বানচাক, দেয়ালের দিক মুখ ফিরিয়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে; কথা বলবে না সে। জননীসুলভ মমতায় বুক টনটন করে উঠলেও আন্না কিন্তু মাথা নোয়ায় না। একটু পরেই বানচাক পাশ ফেরে, মুখে আষাঢ়ের মেঘ। আরও মন মরা হয়ে অনুনয় করে:

—'বাঁধাকপির আচারও একটু খেতে পারি না। লক্ষ্মী, আন্না .আমার কথা শোনো ..আমার ক্ষতি হবে, এ সব ডাক্তারের বানানো কথা।'

প্রতিবারই স্থির প্রত্যাখ্যান। ফলে, মাঝে মাঝে সে আন্নাকে কড়া কড়া কথায় আঘাত দেয়:

—'আমার সঙ্গে এ ধরনের মস্করা করার কোন অধিকার তোমার নেই। তুমি একটা দয়ামায়াহীন, নিষ্ঠুর মেয়ে। তোমার ওপর ঘেন্না জাগছে।'

—'আপনার সেবা করতে গিয়ে যা কিছু ভোগান্তি হয়েছে, তার যোগ্য প্রতিদানই হবে।' আন্নাও নিজেকে সামলাতে পারে না।

—'আমার সঙ্গে তোমাকে তো থাকতে সাধিনি। তার জন্যে আমাকে ধমকে লাভ নেই। কায়দায় ফেলে সুযোগ নিচ্ছ। বেশ! দিওনা কিচ্ছু। আমাকে মেরে ফেল! যথেষ্ট দয়া দেখান হয়েছে!'

আন্নার ঠোঁটদুটো থরথর করে কেঁপে ওঠে, কিন্তু হাল ছাড়ে না ধৈর্য ধরে সমস্তই সহ্য করে। কিন্তু একদিন. একটু বাড়তি দুপুরের-খাবার নিয়ে ঝগড়া করার পর. মন শক্ত করে রাখলেও তার নজরে এল, বানচাকের চোখে জল চকচক করছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে, আপনি যে একেবারে ছেলেমানুষ!' তারপর ছুটে গিয়ে রান্নাঘর থেকে একটা প্লেট ভর্তি পিঠে নিয়ে ফিরে এল।

—'খান খান, ইলিয়া, লক্ষ্মীটি। আর রাগ করে না। এটা বেশ ভাল করে, আলাদা করে তৈরি।' কম্পিত আঙুলে একটা পিঠে বানচাকের হাতের মধ্যে গুঁজে দিল।

ভেতরে ভেতরে ভীষণভাবে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বানচাক ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পেরে উঠল না; চোখের জল মুছে, উঠে বসে সে পিঠেটা খেয়ে নিল। তার শীর্ণমুখে অপরাধীর হাসি খেলে গেল, চোখের দৃষ্টিতে ক্ষমা চেয়ে সে বলল:

—'আমি ছেলেমানুষেরও বাড়া হয়েছি। বুঝলে, প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম..'

বানচাকের সরু লিকলিকে ঘাড়ের দিকে তাকাল আন্না; কলার-খোলা সার্টের ভেতর থেকে গর্তেঢোকা, মাংসহীন বুকটা চোখে পড়ে; তাকাল তার হাড় জিরজিরে হাতের দিকে। গভীর প্রেমে আর মমতায় বুকটা টনটন করে উঠল, আর এই সর্বপ্রথম তার শুকনো, ফ্যাকাসে কপালে মমতাভরে আলতো একটা চুমু খেল।

॥ চার ॥

অপরের সাহায্য ছাড়াই ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করার মত ক্ষমতা হল পনর দিন কাটার পর। সরু বাঁকা পা-দুটো শরীরের ভারে ভেঙে পড়তে চায়, তাকে নতুন করে হাঁটা শিখতে হল।

'দেখ, দেখ, আন্না, আমি হাঁটতে পারি।' বানচাক চেঁচিয়ে উঠে আরও তাড়াতাড়ি চলবার চেষ্টা করে। কিন্তু পা-দুটো দেহের ভাব রাখতে পারে না, পায়ের নীচে থেকে মেঝেটা পিছলে যায়। সামনে যা পায় হাত বাড়িয়ে তাই চেপে ধরতে বাধ্য হয়ে একগাল হেসে ওঠে, কাঁচের মত স্বচ্ছ গালদুটো টানটান হয়ে খাঁজখাঁজ দাগ ফুটে ওঠে। বুড়োর মত, দমকে দমকে, অল্প অল্প করুণ হাসি হাসতে থাকে, আর এহেন প্রচেষ্টায় কাহিল হয়ে ধপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

তাদের ঘর দুটো জেটির খুব কাছাকাছি। জানলা থেকে, দেখতে পায় বরফঢাকা ভলগার বিস্তার, তারও পেছনে অর্ধ চন্দ্রাকারে কালো বনের ঘের বহুদূরের ক্ষেত, মাঠের উঁচুনীচু আলতো রেখা। জীবনে যে অদ্ভুত, প্রচন্ড পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আন্না প্রায়ই সেই কথা ভাবে। বানচাকের অসুখ তাদের অত্যন্ত কাছাকাছি এনে ফেলেছে। কিন্তু তারও আগে, রোস্তোভে সেই প্রথম দেখা হবার পরই, ভেতরে ভেতরে ঠান্ডা ছোঁয়ায় শিউরে উঠে অনুভব করেছে এই মানুষটির সঙ্গে সে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। একেবারে অসময়ে, যখন মারাত্মক সব ঘটনা ঘটছে, স্বপ্নের মত সংক্ষিপ্ত জীবনের উনিশটি বসন্ত পেরিয়ে ক্রমে তার অনুভূতিগুলোই তাকে পেয়ে বসেছে, তাকে বানচাকের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বানচাক সহজ এবং সরল বলেই সে তাকে পছন্দ করে নিয়েছে; লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে সে তারই সঙ্গে একান্ত হয়ে উঠেছে; সে তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, তাকে খাড়া করে তুলেছে।

প্রথম দিকে, যখন দীর্ঘ, কষ্টকর পথযাত্রার পর তারা জারিৎসিনে এসে পেঁছেছিল, তখন জীবনটাই দুর্বহ ও তিক্ত হয়ে উঠেছিল, প্রায় চোখের জল ফেলিয়ে ছেড়েছিল। যাকে ভালবাসে, তার সঙ্গে দিন কাটানোর বিপরীত দিকটা এত কাছাকাছি এমন নগ্নভাবে, আগে আর কখনো তাকে দেখতে হয়নি। দাঁতে দাঁত চেপে সে বনচাকের কাপড় বদলেছে, নোংরা চুলের মধ্যে থেকে উকুন বেছেছে; বিতৃষ্ণায় শিউরে উঠে চোরের মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে তার উলঙ্গ, পুরুষ দেহ, তার দেহের আবরণ—যার নীচে অমূল্য

জীবনের উষ্ণতাটুকু নেই বললেই চলে। তার দেহের অনুপরমাণু পর্যন্ত বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু বাহ্যিক মালিন্য তার গভীর, বিশ্বাসে লালিত অনুভূতিকে মেরে ফেলতে পারেনি। তারই প্রবল চালনায় সে নিজের বেদনা আর অবুঝপনাকে জয় করতে শিখেছে। আর অবশেষে টিকে গিয়েছে তার মমতা আর প্রেমের এক গভীর উৎস; আজ তা-ই আলোড়িত হচ্ছে, কান্নায় কান্নায় ছাপিয়ে উঠছে।

একদিন বানচাক তাকে জিজ্ঞেস করে বসল:

—'মনে হয়, এইসব ব্যাপারের পর আমাকে তোমার খুব বিশ্রী লাগছে...তাই না?'

—'আমার কঠোর পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে।'

—'কিসের? আত্ম-সংযমের?'

—'না। আমার সমস্ত অনুভূতির।'

ঘুরে দাঁড়াল সে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঠোঁটের থরথরানিটুকু থামাতে পারল না। এই বিষয়ের আর কোন উল্লেখ করল না তারা। আর কোন কথাই এখানে অবান্তর, অর্থহীন।

যখন সে সুস্থ হয়ে উঠল, তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বারেকের জন্যেও কোন ভুল বোঝাবুঝির অশান্তি দেখা দিল না। তার জন্যে আন্না যতখানি দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে, বানচাক যেন সবটুকু পুষিয়ে উঠল, তার প্রতিটি ইচ্ছাঅনিচ্ছা আগে থেকেই অনুমান করে নিতে লাগল; কিন্তু সব কিছুই স-সঙ্কোচে, অসাধারণ শিষ্টাচারের সঙ্গে। তার চোখে দৃষ্টি রুক্ষ্ম হলেও, বিনীত নম্র হয়ে, এক অন্তহীন অনুরক্তিমাখানো দৃষ্টিতে সে আন্নাকে লক্ষ্য করে চলল।

॥ পাঁচ ॥

জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে তারা ভোরোনেঝে রওনা হল। জারিৎসিন শহর আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে, গাড়ির শেষদিককার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে দেখতে আন্না বানচাকের পিঠের ওপর হাত রাখল। যে কথোপকথন অসমাপ্ত ছিল, যেন তাই সম্পূর্ণ করার জন্যে আন্না বলতে লাগল:

—'এক অসাধারণ অবস্থার মধ্যে আমাদের দেখা হয়েছে।...হয়ত দেখা না হলেই ভাল হত...একথা অবশ্য আমি ভেবেচিন্তেই বলছি, উচ্ছ্বাসের বশে বলছি না। আর জানো, কেন একথা বলছি? তাকিয়ে দেখ'. চকচকে রুপোর টাকার মত পড়ে থাকা বরফ ঢাকা স্তেপের দিকে সে আঙুল দিয়ে দেখাল। 'ওখানে জীবন আলোড়িত হয়ে উঠছে। মানুষের শক্তিকে প্রয়োগ করার জন্যে, ডাক পাঠাচ্ছে। আমার মনে হয়, এমন সময়ে স্নেহ প্রেমের অনুভূতি আমাদের লড়াই করার মানসিক স্থৈর্যকে বিচলিত করে ফেলবে। আমাদের আরও আগে দেখা হওয়া উচিত ছিল, নয়ত আরও পরে।'

—'কথাটা সত্যি নয়!' বানচাক হাসল, তাকে গায়ের সঙ্গে চেপে ধরল। 'তুমি আর আমি মিলে এক হব। তা আমাদের স্থৈর্যকে দুর্বল তো করবেই না, বরং জোরদার করে তুলবে। একটা ডালকে ভাঙা সহজ, কিন্তু দুটো জড়ানো ডালকে ভাঙা খুবই কঠিন।'

—'খুব ভাল উদাহরণ হল না, ইলিয়া।'

—'হয়তো হল না...কিন্তু এসব কথারও কোন মানে হয় না।'

—'তা সত্যি, আর তাছাড়াও, আমার খুব বেশি দুঃখও নেই যে আমরা...' একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে সে ইতস্তত করল, '...আমরা আধাআধি কাছে এসেছি। ব্যক্তিগত কোন কিছুই টুঁটি টিপে মারতে পারে না আমাদের লড়াই করার...!'

—'আর জয় করার ইচ্ছাকে, কেমন!' গায়ের সঙ্গে তাকে একটু চেপে ধরে তার কথাটাই শেষ করল বানচাক। হাতটা জঙ্গী-কায়দায় মুঠো করে ধরল।

এখনো তারা দৈহিক সংস্পর্শে আসেনি; সত্যি বলতে, এইটেই তাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা শিশুসুলভ, উত্তেজনাময় কোমল বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। মিলনকে সম্পূর্ণ করার জন্যে শেষ বাধাটুকু অতিক্রম করার কামনা তাদের পীড়িত করে না। এই অবস্থাটা আম্নার উত্তেজক আনন্দের কারণ ঘটিয়েছে, আর তার কথাই ভাবতে ভাবতে সে জিজ্ঞেস করল:

—'এ সব ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়ে থাকে. আমাদের সম্পর্ক মোটেই সে রকমের নয়, ঠিক কিনা? জারিৎসিনে আমাদের বাড়িউলি আর অন্য সকলে ভেবেছিল আমরা স্বামী-স্ত্রী, তাই না? যেন শুধু রোজকার তুচ্ছ বাধানিষেধের গণ্ডি পেরুতে পেরেছি বলেই এটা এত ভাল! লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দুজন দুজনকে ভালবাসতে শিখেছি আর আমাদের অনুভূতিকেও বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি; তাকে মলিন করতে পারেনি কোন পাশবিক, কোন পার্থিব. .

—'রোমাণ্টিক হয়ে উঠছ!' বানচাক হাসল।

—'কি বললে?' আম্না প্রশ্ন করল।

বানচাক নিঃশব্দে আম্নার মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আম্না বরফাস্তীর্ণ বিস্তারের দিকে তাকিয়ে রইল; তাকিয়ে রইল বহুদূরের গ্রামপল্লীর অস্পষ্ট সীমারেখা, বনজঙ্গলের রক্তিম অবয়ব, আর গিরি-পথের ফাটলগুলোর দিকে। অতিদ্রুত সে কথা বলে চলল। গলার স্বর খাদে, বেহালার সুরের মত টানা টানা একঘেয়ে:

—'আর তা ছাড়া, এখন এই সময়ে কারও কোন ব্যক্তিগত ছোটখাট সুখের জন্যে চেষ্টা করাটাই কেমন যেন বিষাক্ত, কেমন তুচ্ছ মনে হয়। এই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে পীড়িত মানবতা মানুষের যে সীমাহীন সুখ লাভ করবে তার সঙ্গে তুলনা করলে এর কি অর্থ হয়? ঠিক কি না? মুক্তির লড়াইতে আমরা মন প্রাণ সঁপে দেব, আমরা .. আমরা দশজনের মধ্যে নিজেদের মিশিয়ে দেব, আমাদের খণ্ড সত্তাকে ভুলে যাব।' ঘুমন্ত শিশুর মত তার কোমল কঠোর ঠোঁটের কোণে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল; হাসির জন্যেই ওপরের ঠোঁটে একটা থরোথরো ছায়া ঘনিয়ে এল। 'জানো, ইলিয়া, বহু—বহুদূরে থেকে ভেসে আসা, যাদুমন্ত্রে অপরূপ সঙ্গীতের মত আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে আমি অনুভব করতে পারি। লোকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেক সময় ঠিক যেমনটি শুনতে পায় ...তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গান শোনো? কোন পৃথক, সূক্ষ্ম সুর নয়, প্রচণ্ড—ক্রমশ উঁচু গ্রামে ওঠা, নিখুঁতভাবে মেলানো ঐকতান। সুন্দরকে কে না ভালবাসে? তার সবটুকুই আমি ভালবাসি, এমনকি তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রকাশটুকুও...সমাজতন্ত্রে জীবন কি আরও সুন্দর হয়ে উঠবে না! যুদ্ধ থাকবে না, দারিদ্র্য থাকবে না, পীড়ন না, জাতিগত বৈষম্য না...কোন কিছুই না! মানুষ জগৎটাকে কি করে কলুষিত করেছে, বিষিয়ে তুলেছে। মানুষের কত চোখের জলই ঝরিয়েছে।' আবেগভরে সে বানচাকের

দিকে ফিরল, হাতের দিকে হাত বাড়াল। 'বলো, তার জন্যে প্রাণ দেওয়া কি মধুর হয়ে উঠবে না? বলো, বলো! কই? তাই যদি না হয়, তাহলে কি বিশ্বাস করার রইল? মানুষ বাঁচবে কিসের জন্যে? মনে হয়, যদি লড়াই করতে গিয়ে মরি...' বানচাকের হাতটা বুকের সঙ্গে এমনভাবে চেপে ধরল যে তার হৃৎপিণ্ডের চাপা ধুকধুকিটুকু শুনতে পারা গেল; আর গভীর ছায়াঘন দৃষ্টিতে বানচাকের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল: '...আর যদি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু না হয়, তাহলে শেষ যা আমি অনুভব করব তা হবে ভবিষ্যতের সেই বিজয়ী, আলোড়নজাগানো সঙ্গীত।'

বানচাক মাথা নীচু করে শুনে গেল। তার এই যৌবনদীপ্ত, আবেগতপ্ত বিস্ফোরণে আগুনের জ্বালা ধরে গেল; তার মনে হল, চাকার তালে তালে, কামরার ঘসড়ানিতে, লাইনের ঘটাং ঘটাং আওয়াজের মধ্যেই ধরা-ছোঁয়ার অতীত, এক মহান সঙ্গীত শুনতে পেল। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিরশিরানি নেমে এল। বাইরের দিকের দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বুটের এক লাথিতে দরজাটা খুলে দিল। বাতাস শিস দিয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল, তারই সঙ্গে ঢুকে পড়ল ধোঁয়া, বরফমাথা, কিচকিচে ধুলো আর ইঞ্জিনের একটানা জোরালো গর্জন।

॥ ছয় ॥

জানুয়ারির উনত্রিশ তারিখে বানচাক আর আন্না ভোরোনেঝে এসে পৌঁছুল। সেখানে দুদিন কাটাল, তারপর, চোরনেৎসোভের আক্রমণে ডনের বিপ্লবী কমিটি কামেনস্কা থেকে বিতাড়িত হয়েছে শুনতে পেয়ে তার পেছন পেছন মিল্লেরোভোয় এসে হাজির হল।

জনসমাগমে মিল্লেরোভো জীবন্ত কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে, সেখানে বানচাক মাত্র কয়েক ঘণ্টা রইল, পরের ট্রেন ধরেই গ্লুবোকা রওনা হয়ে গেল। পরদিন একটা মেসিন-গানদলের ভার নিয়ে সকালেই লড়াইতে নেমে পড়ল; সেই লড়াই শেষ হল চোরনেৎসোভের পরাজয়ে।

চোরনেৎসোভকে চূর্ণ করার পরই অপ্রত্যাশিতভাবে আন্নার সঙ্গে বানচাকের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। একদিন সকালবেলায় উত্তেজিত হয়ে, একটু বিষণ্ণ মনেই আন্না সদর-দপ্তর থেকে দৌড়ে এল।

—'জানো, আব্রামসন এখানে আছে। তোমার সঙ্গে তিনি ভীষণ দেখা করতে চাইছেন। আর আমিও কিছু খবর এনেছি...আজই আমি চলে যাচ্ছি।'

—'কোথায় যাচ্ছ?' বানচাক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—আব্রামসন, আমি আর জনকয়েক কমরেড প্রচারের জন্যে লুগান্স্কে যাচ্ছি।'

—'তাহলে আমাদের দল তুমি ছেড়ে যাচ্ছ?' উদাসীনের মত প্রশ্ন করল বানচাক।

হেসে উঠল আন্না, বানচাকের বুকে লজ্জায় রাঙা মুখটা গুঁজে দিল।

—'স্বীকার কর! দল ছেড়ে যাচ্ছি বলে তোমার মুখ ভার নয়, মুখ ভার, তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি বলে! কিন্তু অল্প কিছুদিনের জন্যে! তোমার সঙ্গে থাকার চেয়ে এতেই আমি ভাল কাজ করতে পারব বলে মনে হয়। মেসিনগানের চেয়ে প্রচারের কাজই আমার ধাতে সয় বেশি—দুষ্টুমিভরা চোখে সে বানচাকের দিকে তাকাল—, 'এমনকি বানচাকের মত অভিজ্ঞ কমান্ডারের অধীনে থাকা সত্ত্বেও।'

কাপড় ছাড়বার জন্যে আন্না পরদার আড়ালে চলে গেল। যখন ফিরে এল তার

—'খুব ভাল উদাহরণ হল না, ইলিয়া।'

—'হয়তো হল না...কিন্তু এসব কথারও কোন মানে হয় না।'

—'তা সত্যি, আর তাছাড়াও, আমার খুব বেশি দুঃখও নেই যে আমরা...' একটু হ্যাবাচাকা খেয়ে সে ইতস্তত করল, '...আমরা আধাআধি কাছে এসেছি। ব্যক্তিগত কোন কিছুই টুঁটি টিপে মারতে পারে না আমাদের লড়াই করার...!'

—'আর জয় করার ইচ্ছাকে, কেমন!' গায়ের সঙ্গে তাকে একটু চেপে ধরে তার কথাটাই শেষ করল বানচাক। হাতটা জঙ্গী-কায়দায় মুঠো করে ধরল।

এখনো তারা দৈহিক সংস্পর্শে আসেনি; সত্যি বলতে, এইটেই তাদের সম্পর্কের মধ্যে একটা শিশুসুলভ, উত্তেজনাময় কোমল বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। মিলনকে সম্পূর্ণ করার জন্যে শেষ বাধাটুকু অতিক্রম করার কামনা তাদের পীড়িত করে না। এই অবস্থাটা আন্নার উত্তেজক আনন্দের কারণ ঘটিয়েছে, আর তার কথাই ভাবতে ভাবতে সে জিজ্ঞেস করল:

—'এ সব ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়ে থাকে, আমাদের সম্পর্ক মোটেই সে রকমের নয়, ঠিক কিনা? জারিৎসিনে আমাদের বাড়িউলি আর অন্য সকলে ভেবেছিল আমরা স্বামী-স্ত্রী, তাই না? যেন শুধু রোজকার তুচ্ছ বাধানিষেধের গণ্ডি পেরুতে পেরেছি বলেই এটা এত ভাল! লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দুজন দুজনকে ভালবাসতে শিখেছি আর আমাদের অনুভূতিকেও বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি; তাকে মলিন করতে পারেনি কোন পাশবিক, কোন পার্থিব...

—'রোমাণ্টিক হয়ে উঠছ!' বানচাক হাসল।

—'কি বললে?' আন্না প্রশ্ন করল।

বানচাক নিঃশব্দে আন্নার মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আন্না বরফাস্তীর্ণ বিস্তারের দিকে তাকিয়ে রইল; তাকিয়ে রইল বহুদূরের গ্রামপল্লীর অস্পষ্ট সীমারেখা, বনজঙ্গলের রক্তিম অবয়ব, আর গিরি-পথের ফাটলগুলোর দিকে। অতিদ্রুত সে কথা বলে চলল। গলার স্বর খাদে, বেহালার সুরের মত টানা টানা একঘেয়ে:

—'আর তা ছাড়া, এখন এই সময়ে কারও কোন ব্যক্তিগত ছোটখাট সুখের জন্যে চেষ্টা করাটাই কেমন যেন বিষাক্ত, কেমন তুচ্ছ মনে হয়। এই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে পীড়িত মানবতা মানুষের যে সীমাহীন সুখ লাভ করবে তার সঙ্গে তুলনা করলে এর কি অর্থ হয়? ঠিক কি না? মুক্তির লড়াইতে আমরা মন প্রাণ সঁপে দেব, আমরা... আমরা দশজনের মধ্যে নিজেদের মিশিয়ে দেব, আমাদের খণ্ড সত্ত্বাকে ভুলে যাব।' ঘুমন্ত শিশুর মত তার কোমল কঠোর ঠোঁটের কোণে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠল; হাসির জন্যেই ওপরের ঠোঁটে একটা থরোথরো ছায়া ঘনিয়ে এল। 'জানো, ইলিয়া, বহু—বহুদূর থেকে ভেসে আসা, যাদুমন্ত্রে অপরূপ সঙ্গীতের মত আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে আমি অনুভব করতে পারি। লোকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেক সময় ঠিক যেমনটি শুনতে পায় ...তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গান শোনো? কোন পৃথক, সূক্ষ্ম সুর নয়, প্রচণ্ড—ক্রমশ উঁচু গ্রামে ওঠা, নিখুঁতভাবে মেলানো ঐকতান। সুন্দরকে কে না ভালবাসে? তার সবটুকুই আমি ভালবাসি, এমনকি তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রকাশটুকুও...সমাজতন্ত্রে জীবন কি আরও সুন্দর হয়ে উঠবে না! যুদ্ধ থাকবে না, দারিদ্র্য থাকবে না, পীড়ন না, জাতিগত বৈষম্য না...কোন কিছুই না! মানুষ জগৎটাকে কি করে কলুষিত করেছে, বিষিয়ে তুলেছে। মানুষের কত চোখের জলই ঝরিয়েছে।' আবেগভরে সে বানচাকের

দিকে ফিরল, ছুতের দিকে হাত বাড়াল। 'বলো, তার জন্যে প্রাণ দেওয়া কি মধুর হয়ে উঠবে না? বলো, বলো! কই? তাই যদি না হয়, তাহলে কি বিশ্বাস করার রইল? মানুষ বাঁচবে কিসের জন্যে? মনে হয়, যদি লড়াই করতে গিয়ে মরি ..' বানচাকের হাতটা বুকের সঙ্গে এমনভাবে চেপে ধরল যে তার হৃৎপিণ্ডের চাপা ধুকধুকানিটুকু বুঝতে পারা গেল; আর গভীর ছায়াঘন দৃষ্টিতে বানচাকের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল: ' আর যদি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু না হয়, তাহলে শেষ যা আমি অনুভব করব তা হবে ভবিষ্যতের সেই বিজয়ী, আলোড়নজাগানো সঙ্গীত।'

বানচাক মাথা নীচু করে শুনে গেল। তার এই যৌবনদীপ্ত, আবেগতপ্ত বিস্ফোরণে আগুনের জ্বালা ধরে গেল, তার মনে হল, চাকার তালে তালে, কামরার খসড়ানিতে, লাইনের ঘটাং ঘটাং আওয়াজের মধ্যেই ধরা-ছোঁয়ার অতীত, এক মহান সঙ্গীত শুনতে পেল। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিরশিরানি নেমে এল। বাইরের দিকের দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বুটের এক লাথিতে দরজাটা খুলে দিল। বাতাস শিস দিয়ে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল, তারই সঙ্গে ঢুকে পড়ল ধোঁয়া, বরফমাখা, কিচকিচে ধুলো আর ইঞ্জিনের একটানা, জোরালো গর্জন।

॥ ছয় ॥

জানুয়ারির উনত্রিশ তারিখে বানচাক আর আন্না ভোরোনেঝে এসে পৌঁছুল। সেখানে দুদিন কাটাল, তারপর, চোরনেৎসোভের আক্রমণে ডনের বিপ্লবী কমিটি কামেনস্কা থেকে বিতাড়িত হয়েছে শুনতে পেয়ে তার পেছন পেছন মিস্ত্রেরোভোয় এসে হাজির হল।

জনসমাগমে মিস্ত্রেরোভো জীবন্ত কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে সেখানে বানচাক মাত্র কয়েক ঘণ্টা রইল, পরের ট্রেন ধরেই গ্লুবোকা রওনা হয়ে গেল। পরদিন একটা মেসিন-গানদলের ভার নিয়ে সকালেই লড়াইতে নেমে পড়ল, সেই লড়াই শেষ হল চোরনেৎসোভের পরাজয়ে।

চোরনেৎসোভকে চূর্ণ করার পরই অপ্রত্যাশিতভাবে আন্নার সঙ্গে বানচাকের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। একদিন সকালবেলায় উত্তেজিত হয়ে, একটু বিষণ্ণ মনেই আন্না সদর-দপ্তর থেকে দৌড়ে এল।

—'জানো, আব্রামসন এখানে আছে। তোমার সঙ্গে তিনি ভীষণ দেখা করতে চাইছেন। আর আমিও কিছু খবর এনেছি আজই আমি চলে যাচ্ছি।'

—'কোথায় যাচ্ছ?' বানচাক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

—আব্রামসন, আমি আর জনকয়েক কমরেড প্রচারের জন্যে লুগানস্কে যাচ্ছি।'

—'তাহলে আমাদের দল তুমি ছেড়ে যাচ্ছ?' উদাসীনের মত প্রশ্ন করল বানচাক। হেসে উঠল আন্না, বানচাকের বুকে লজ্জায় রাঙা মুখটা গুঁজে দিল।

—'স্বীকার কর। দল ছেড়ে যাচ্ছি বলে তোমার মুখ ভার নয় মুখ ভার তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি বলে। কিন্তু অল্প কিছুদিনের জন্যে! তোমার সঙ্গে থাকার চেয়ে এতেই আমি ভাল কাজ করতে পারব বলে মনে হয়। মেসিনগানের চেয়ে প্রচারের কাজই আমার ধাতে সয় বেশি—দুষ্টুমিভরা চোখে সে বানচাকের দিকে তাকাল—, 'এমনকি বানচাকের মত অভিজ্ঞ কমান্ডারের অধীনে থাকা সত্ত্বেও।'

কাপড় ছাড়বার জন্যে আন্না পরদার আড়ালে চলে গেল। যখন ফিরে এল তার

খাকি সৈনিকের খাকি উর্দি, কোমরে চামড়ার বেল্ট, পুরোনো কাপড় আজকাল জায়গায় জায়গায় তালি দেওয়া হলেও একটু ময়লার ছোপও কোথাও নেই। হালে সে চুল বড় রেখেছে, চুলগুলো বেড়ে উঠে খোঁপার বাঁধন থেকে খুলে পড়েছে। গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল। তার গলার স্বরে আগেকার সেই সজীবতা আর নেই; সে স্বর ম্রিয়মান, অনুনয়কাতর।

—'আজকের হামলায় কি তুমি থাকবে?'

—'নিশ্চয়ই। আমি হাত কোলে করেতো আর বসে থাকব না।'

—'তাই জিজ্ঞেস করছিলাম...শোনো, সাবধানে থাকবে কিন্তু। আমার কথা মনে করে সাবধানে থাকবে, থাকবে না? একজোড়া বাড়তি গরম মোজা রেখে যাচ্ছি। ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফেলো না, পা দুটো সবসময় শুকনো রাখার চেষ্টা করো। লুগানস্ক থেকে চিঠি দেব।'

তার চোখ থেকে হঠাৎ আলো নিভে গেল। বিদায় নিতে গিয়ে সে স্বীকার করল:

—'বুঝতেই পারছ, তোমাকে ছেড়ে বড়ই কষ্ট হবে। আব্রামসন যখন আমার লুগানস্কে যাবার কথাটা পাড়লেন, তখন খুশী হয়েছিলাম, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তুমি ছাড়া ওখানে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। স্নেহ-প্রেম যে বর্তমানে শুধু পথের কাঁটা, এটা তার আর একটা প্রমাণ। সে যাই হক, আচ্ছা, এখন চলি।'

বিদায় নেবার সময় কেমন নিস্পৃহ চাপা হয়ে গেল সে। কিন্তু বানচাক বুঝতে পারল, তার ভয় হয়েছে পাছে মনের জোর ভেঙে পড়ে।

তাকে বিদায় দিতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গেল বানচাক। কাঁধ ঝাঁকিয়ে জোর পায়ে আন্না হেঁটে চলে গেল, পেছন ফিরেও তাকাল না। তাকে একবার ডাকবার ইচ্ছে হল, কিন্তু বিদায় নেবার শেষ মুহূর্তে চোখের কোণে জল চকচক করতে দেখেছিল। মনের ইচ্ছা দমন করে, খুশীর ভাণ করে সে চেঁচিয়ে বলল:

—'রোস্তোভে দেখা হবে, আশা করি। ভাল ভাবে থেকো, আন্না!'

আন্না ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল, তারপর জোরে জোরে পা চালিয়ে দিল।

সে চলে যাবার পর বানচাক হঠাৎ তার ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করল। দৌড়ে বাড়ির মধ্যে ফিরে এল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার দৌড়ে বাইরে চলে গেল, যেন বাড়িতে আগুন লেগেছে। সেখানকার সব কিছুতেই তার স্মৃতি জড়ানো। সব কিছুতেই তার গন্ধ মাখানো: ভুলে ফেলে যাওয়া রুমাল, ফৌজী ব্যাগ, তামার মগ,—যা কিছুই সে হাত দিয়ে ছুঁয়েছে।

রাত না হওয়া পর্যন্ত বানচাক স্টেশনে ঘুরে বেড়াল, মনে এক অস্বাভাবিক উদ্বেগ আর অনুভূতি জেগে উঠল, কি যেন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই নতুন অবস্থার সঙ্গে সে কিছুতেই খাপ খাইয়ে উঠতে পারল না। শূন্য দৃষ্টিতে রেড-গার্ড আর কসাকদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল, কাউকে কাউকে চিনল, কেউ কেউ তাকেও চিনতে পারল। একজন কসাক তাকে আটকাল, রুশ-জার্মান যুদ্ধের সময় একসঙ্গেই দুজনে পল্টনে ছিল। লোকটা তাকে ধরে তার বাড়িতে নিয়ে এল, জনকয়েক রেড-গার্ড আর জাহাজীর সঙ্গে তাস খেলার আমন্ত্রণ জানাল। তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে বসে বসে তাস পিটতে লাগল, কেরেন্স্কির ছাপ মারা নোট খচরমচর করতে লাগল, একটানা খিস্তিখেউড় আর চিৎকার চলল। খোলা হাওয়ার জন্যে বানচাকের বুকের মধ্যে আঁকুপাঁকু করে উঠল, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হামলায় যেতে হবে এই ওজর দিয়ে, কাউকে বিদায় সম্ভাষণ না করেই সে বেরিয়ে পড়ল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

প্রতি-বিপ্লবীদের শেষ আশাও পচা কাঠের খুঁটির মত ভেঙে পড়ছে। বলশেভিকদের ফাঁস জড়িয়েছে, ডন প্রদেশের গলায় শক্ত হয়ে এ'টে বসছে। বিপ্লবী বাহিনী রোস্তোভের দিকে এগিয়ে আসছে, শহরে থাকাটা বিপজ্জনক বুঝতে পেরে কোর্নিলোভও বাইশে ফেব্রুয়ারি পশ্চাদপসরণের সিদ্ধান্ত করল।

সেইদিনই সন্ধ্যের দিকে সৈন্যদের এক দীর্ঘ সারি রোস্তোভ থেকে বেরুবার পথ ধরে আধ-গলা বরফের ওপর দিয়ে জোরপায়ে মার্চ করে এগুতে লাগল। বেশির ভাগের গায়েই অফিসারের উর্দি, প্লেটুনগুলোর ভার পড়েছে ক্যাপ্টেন আর কর্ণেলের ওপর। দলের মধ্যে রয়েছে জুংকাররা, এন্‌সাইন থেকে কর্ণেল পর্যন্ত নানা স্তরের অফিসার। মালপত্তরের অগণিত গাড়ির পেছনে পেছনে চলেছে উদ্বাস্তুর দল: ওভারকোট গায়ে, গোলোশ পায়ে, ভাল ভাল জামাকাপড়পরা বয়স্ক ভদ্রলোক, হিলতোলা জুতো পায়ে ভদ্রমহিলারা। ক্যাপ্টেন লিস্তনিৎস্কি রয়েছে একটি কোম্পানিতে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। বরফ পড়ছে। ডনের মুখ থেকে নোনা, ভ্যাপসা হাওয়া উঠে আসছে। বহুজনের পায়ে মাড়ানো রাস্তার এখানে ওখানে হলদে জলে ভর্তি গর্ত। পথ চলা কষ্টকর, বুটের মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা ঢুকে পড়ে। লিস্তনিৎস্কি চলতে চলতে সামনের অফিসারদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। পশমের জ্যাকেট আর একটা সাধারণ কসাক টুপি মাথায় এক অফিসার বলছিল·

—'তাকে আপনি দেখেছেন, লেফটানান্ট? স্টেট দুমার প্রেসিডেন্ট রোদ্‌জিয়াংকো, বুড়ো মানুষ, তিনি পর্যন্ত পায়ে হে'টে যেতে বাধ্য হয়েছেন '

—'রাশিয়া গোলগোথার মশানে চলেছে .'

একজন বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করল:

—'গোলগোথার মশানই বটে .একটা পার্থক্য শুধু এই যে, পাথরবাঁধানো রাস্তার বদলে এখানে বরফ আর হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা।'

—'ধূম-পানের কিছু আছে?' একজন লেফটানান্ট লিস্তনিৎস্কিকে জিজ্ঞেস করল। তার দেওয়া সিগারেট নিয়ে লোকটা ধন্যবাদ জানাল, তারপর সেপাইদের মত হাতের ওপরেই নাক ঝাড়ল, পরে কোটের গায়ে আঙুল মুছল। এক লেফটানান্ট-কর্ণেল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হাসল:

—'আপনি দেখছি গণতান্ত্রিক অভ্যাস রপ্ত করছেন, লেফটানান্ট।'

—'ইচ্ছে না থাকলেও করতে হয়। আপনি কি করতেন? ডজনখানেক রুমাল বাঁচিয়ে আনতে পেরেছেন?'

লেফটানান্ট-কর্ণেল কোন উত্তর দিল না। তার লাল-পার্টকিলে গোঁফ থেকে ছোট ছোট, সবুজ বরফের কণা ঝুলছে। ওভারকোট ফুঁড়ে কনকনে ঠাণ্ডা ঢুকছে, ভুরুদুটো কুঁচকে মাঝে মাঝেই সে নাকের ঘড়াৎ ঘড়াৎ আওয়াজ করতে লাগল।

—'রাশিয়ার যৌবন!' রাস্তা ধরে এ'কে বে'কে চলা সারিগুলোর দিকে তাকিয়ে গভীর অনুকম্পায় জিহ্ন্নিংশিক মনে মনে ভাবল। অন্যমনস্কভাবে কথাবার্তা শুনতে শুনতে ইয়াগোদনোয়ে বাবা আর আকসিনিয়ার কাছ থেকে চলে আসার কথাটা মনে পড়ে গেল। হঠাৎ এক আর্তির অনুভূতিতে দম আটকে এল। তার সামনে রাইফেল আর বেয়নেটগুলো দুলছে, পা-ফেলার তালে তালে গলাসী-টুপি আর মাথা-ঢাকাগুলো হেলছে টলছে, ওইদিকে তাকিয়ে সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পা ফেলতে লাগল। মনে মনে ভাবতে লাগল:

—'এই নির্বাসিত পাঁচ-হাজারের প্রত্যেকেই আমার মত, প্রত্যেকেই অন্তহীন ক্রোধ আর ঘৃণার বারুদ বয়ে বেড়াচ্ছে। শুয়োরের বাচ্চারা আমাদের রাশিয়ার বাইরে ঠেলে ফেলেছে। আমরাও দেখে নেব! কোর্নিলোভ তবুও আমাদের মস্কোয় নিয়ে যাবে।'

॥ দুই ॥

চব্বিশে মার্চের আগে পর্যন্ত স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনী,, রোস্তোভের মাইলকয়েক দক্ষিণ-পূর্বে ওলগিনস্ক জেলায় কেন্দ্রীভূত হয়ে রইল। জেনারেল পোপোভের আগমন প্রত্যাশায় কোর্নিলোভ আর নড়াচড়া করা মুলতুবি রাখল। পোপোভ্ ডনকসাক বাহিনীর নবনিযুক্ত আতামান, ষোলশ সৈন্য, পাঁচটা ফিল্ড-কামান আর চল্লিশটা মেসিনগান নিয়ে নোভোচেরকাশ্ থেকে হটে ডনের পূর্বদিকের স্তেপ অঞ্চলে এসেছে। পোপোভ তার দপ্তরের প্রধান সিদোরিন আর এক জন কসাক পাহারাদারকে নিয়ে ছাব্বিশ তারিখে ওলগিনস্কে এসে পৌঁছুল। কোর্নিলোভের বাড়ির সামনে বারোয়ারিতলায় রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে ঘোড়া থেকে নামল, তারপর আস্তে আস্তে বারান্দার দিকে এগুল। সিদোরিন পেছনে পেছনে।

হলের মধ্যে ঢুকে নবাগত দুজন আলোচনার জন্যে সমবেত জেনারেলদের অভিবাদন করে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। তাদের পথযাত্রা আর নোভোচেরকাশ্ ছেড়ে আসা সম্পর্কে আলেক্সেভ্ গোটা কয়েক অবান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। কুতেপোভ্ এসে ঢুকল। তার সঙ্গে কিছু অফিসার, কোর্নিলোভ তাদের আলোচনায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

শান্তশিষ্টভাবে টেবিলের ধারে বসে থাকা পোপোভের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে কোর্নিলোভ জিজ্ঞেস করল:

—'বলুন দেখি জেনারেল, আপনার দলটা কতবড়?'

—'পনেরশ তলোয়ার-ধারী, একটা ব্যাটারী, সাজসরঞ্জাম সমেত চল্লিশটা মেসিনগান।'

—'স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনী কি অবস্থার মধ্যে রোস্তোভ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে তা আপনারা জানেন। গতকাল আমরা আলোচনা সভা ডেকেছিলাম, সেখানে ঠিক করেছি কুবানে ইয়েকাতেরিনোদারের দিকে যাব, সেখানে কিছু কিছু স্বেচ্ছাসৈন্যদল ইতিমধ্যেই তৎপর হয়ে উঠেছে। আমরা এই রাস্তা ধরে যাব!'

পেন্সিলের ভোঁতা দিকটা ম্যাপের ওপর চালিয়ে সে তড়বড় করে বলে চলল: 'চলতে চলতে আমরা কসাকদের দলে টেনে নেব; বিশৃঙ্খল, দুর্বল রেড-গার্ডদের দুচারটে দল হয়ত পথের বাধা হতে পারে, তাদের চূর্ণ করে দেব। আমরা প্রস্তাব

করছি, আপনারা দলবল নিয়ে স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে আমাদের সঙ্গে ইয়েকাতেরিনোদারে চলুন। আমাদের স্বার্থেই আমাদের শক্তি ভাগ করা উচিত হবে না।'

—'আমি তা পারব না।' পোপোভ মুখের ওপরই দৃঢ়ভাবে বলে উঠল।

আলেক্সেভ তার দিকে ঝুঁকে পড়ল, বলল, 'কেন পারবেন না, তা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

—'তার কারণ, ডন অঞ্চল ছেড়ে কুবানে সরে যাওয়া আমার চলবে না। উত্তর দিকে ডনের আড়ালে থেকে স্তেপের ঘটনাবলীর জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। শত্রুর দিক থেকে সক্রিয় কোন তৎপরতা আমরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনছি না, কারণ শিগ্গীরই বরফ গলতে শুরু করবে, ডন পেরিয়ে ভারী কামান আর ঘোড়সোয়ার পাঠান অসম্ভব হয়ে উঠবে। যে অঞ্চলটা আমরা বেছে নিয়েছি, সেখানে প্রচুর দানা-পানি, খাবারদাবার। যে কোন দিকে, যে কোন সময়ে আমরা সেখান থেকে গেরিলা আক্রমণ চালাতে পারব।'

দম নেবার জন্যে সে একটু থামল, কিন্তু কোর্নিলোভ বলতে যাচ্ছে দেখে গোঁ-ভরে মাথা ঝাঁকাল।

—'আগে আমাকে শেষ করতে দিন। এছাড়াও আরও একটা গুরুতর কারণ আছে, আমরা যারা নেতৃত্বে আছি তাদের এটা সমঝে দেখতে হবে। তা হচ্ছে কসাকদের মনোভাব। আমরা যদি কুবানে হটে যাই, তাহলে দল ভেঙে যাবার ভয় আছে। কসাকরা যেতে অস্বীকার করতে পারে। এটা ভুললে চলবে না যে আমার বাহিনীর স্থায়ী এবং সবচেয়ে শক্তিশালী দলগুলোই কসাক, আর তারা মনের দিক থেকে কোনক্রমেই আস্থাভাজন নয়.. এই যেমন, আপনার নিজের লোকদের মতই। আমার সমস্ত দলগুলো হারানোর ঝুঁকি আমি নিতে পারব না। আমাকে ক্ষমা করবেন: আমাদের সিদ্ধান্ত আপনাদের জানালাম, আর একথাও জানিয়ে দিচ্ছি, সিদ্ধান্ত পালটাবার কোন উপায়ই আমাদের নেই। আমি যা বললাম সেটা ধরে নিয়েই আমার অভিমত হচ্ছে, কুবানে হটে না গিয়ে, ডনের ওপারে, স্তেপ অঞ্চলে ডন-বাহিনীর দলবলের সঙ্গে যোগ দেওয়াই স্বেচ্ছাসৈন্যবাহিনীর পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেখানে জিরিয়ে, বিশ্রাম করে, শক্তি সঞ্চয় করে নিতে পারবে, আর বসন্তকালে রাশিয়া থেকে পাঠানো নতুন স্বেচ্ছাসৈন্য দিয়ে দলভারী করতে পারবে...'

কোর্নিলোভ আলেক্সেভের দিকে তাকাল। কোন পথে যাবে, স্পষ্টতই দ্বিধায় পড়ে অপরের কাছ থেকে সমর্থন চাইল। কোন প্রশ্নের দ্রুত সিদ্ধান্তে পোঁছতে আলেক্সেভ অভ্যস্ত; গুটিকয়েক কথায় সে ইয়েকাতেরিনোদারে যাওয়া কেন উচিত তা জলের মত বুঝিয়ে দিল। শেষ করল এই বলে:

—'ওই দিকেই বলশেভিকদের বেষ্টনী ভেঙে, ইতিমধ্যেই যে সব দল তৎপর হয়ে উঠেছে, তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হবে।'

—'কিন্তু যদি আমরা তা না পারি?' লুকোম্‌স্কি সাবধানে জিজ্ঞেস করল।

ম্যাপের ওপর আঙুল চালাতে চালাতে আলেক্সেভ বলল, 'যদি তা নাও পারি, তাহলে তখনো ককেশাসের পাহাড়ে হটে যাবার সুযোগ থাকবে, সেখানে সৈন্যদল ছারিয়ে দেওয়া যাবে।'

আরও কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা চলল, কিন্তু অধিকাংশ জেনারেলই সমর্থন করায়, ওই ভুল পথ ধরেই কুবানে যাবার সিদ্ধান্তে কোর্নিলোভ অনড় হয়ে রইল। ঠিক হল পথে পথে অশ্বারোহীবাহিনীর জন্যে ঘোড়া জোগাড় করে নেওয়া হবে।

আলোচনা সভা ভাঙল। পোপোভের সঙ্গে কোর্নিলোভ দুচারটে কথা বলল,

মিত্রুৎস্কায় বিদায় নিয়ে তারপর নিজের ঘরে চলে গেল। তার পেছনে পেছনে আতেলোভিচ। কর্ণেল সিদোরিন বারান্দায় গিয়ে তার দেহ-রক্ষীকে সহর্ষে চেঁচিয়ে বলল:

—'ঘোড়া নিয়ে এসো!'

এক তরুণ, লাল-মুখ, কসাক ক্যাপ্টেন তার কাছে এগিয়ে এল। সিঁড়ির একেবারে নীচের ধাপে দাঁড়িয়ে গিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল:

—'তাহলে, কি ঠিক, কর্ণেল?'

—'খারাপ কিছু নয়!' অতিরিক্ত স্ফূর্তিতে সিদোরিন চাপাগলায় বলল, 'আমরা কুবানে যেতে অস্বীকার করেছি। এক্ষুণি আমাদের যেতে হবে। তুমি তৈরি আছ ইজ্‌ভারিন?'

—'হ্যাঁ, ওরা ঘোড়া নিয়ে আসছে।'

দেহরক্ষীরা ঘোড়া নিয়ে এল। গ্রিগরের পুরনো বন্ধু ইজ্‌ভারিন তার নিজের ঘোড়ায় চেপে ঘোড়াদুটোকে রাস্তায় নিয়ে আসতে হুকুম দিল। জনকয়েক জেনারেলের সঙ্গে পোপোভ আর ইজ্‌ভারিন সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। একজন রক্ষী পোপোভের ঘোড়াটা ধরে, রেকাবে তার পা ঢোকাতে সাহায্য করল। কসাক চাবুকটা দুলিয়ে পোপোভ ঘোড়াটাকে দুলকিতে ছেড়ে দিল, আর রেকাবের ওপরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে সিদোরিন, অন্যান্য অফিসার আর কসাকরা তার পেছনে পেছনে চলতে লাগল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

কালেদিনের মৃত্যুর পর নোভোচেরকাসে এক ফৌজী পরিষদ আহ্বান করা হয়েছিল, তাতে প্রাদেশিক আতামান নিযুক্ত করা হয়েছিল জেনারেল নাঝারোভকে। মাত্র জনকয়েক প্রতিনিধি তাতে হাজির হয়েছিল। এই ক্ষীয়মান পরিষদের সমর্থনেই নাঝারোভ সতর থেকে পঞ্চান্ন পর্যন্ত প্রত্যেক কসাককে পল্টনে যোগ দেবার নির্দেশ জারী করল। নির্দেশ কার্যকরী করার জন্যে গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র বাহিনী পাঠানোর আশঙ্কা ও হুমকি সত্ত্বেও কসাকরা হুকুম তামিলে টালবাহানা করতে লাগল।

ক্ষমতার দিক থেকে এই পরিষদ দুর্বল। সবাই বুঝতে পারল, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিণতি কি হবে তাত আগেই জানা। পরিষদের অধিবেশনের মধ্যেই আগের দিনের সেই উৎসাহী, ডাকসাইটে জেনারেল নাঝারোভ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল, যেন কি এক জটিল জিনিস ভাবতে লাগল।

অনেকদূর থেকে চক্রাকারে ঘুরে নোভোচেরকাস দখল করে নেবার জন্যে বিপ্লবী কমিটি গোলুবোভের দলকে পাঠিয়েছিল, বানচাকও গেল তাদের সঙ্গে। সবার আগে আগে ঘোড়ায় চেপে, ঘোড়ার পিঠে অধৈর্য হয়ে চাবুক মারতে মারতে গোলুবোভ তার ডিভিসনকে নিয়ে জোরকদমে এগিয়ে চলল। সকাল বেলায় একটা ছোট্ট গ্রামের মধ্যে

নিয়ে এগতে লাগল। গ্রামটা তখনো জনশূন্য, কিন্তু বারোয়ারিতলায় কুয়োর ধারে বসে এক বুড়ো কসাক বরফ ভাঙছিল। গোলুবোভ তার দিকে এগিয়ে গেল, এদিকে ডিভিজনটা থমকে দাঁড়িয়ে রইল। বুড়োকে নমস্কার করে কমাণ্ডার বলল:

—'ভালত, কর্তা?'

লোকটা আস্তে আস্তে দস্তানাপরা হাতটা টুপি পর্যন্ত তুলল, তারপর বিরূপকণ্ঠে উত্তর দিল:

—'ভাল।'

—'আচ্ছা, দাদু, তোমাদের যোয়ানরা কি নোভোচেরকাসে গিয়েছে? তোমাদের গ্রামে কি ফৌজের তলব এসেছিল?'

কোন উত্তর না দিয়ে লোকটা তাড়াতাড়ি তার কুড়ুলটা তুলে নিয়ে উঠোনের ঢোকার মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—'এগোও!' গোলুবোভ চিৎকার করে উঠে খিস্তি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

॥ দুই ॥

সেইদিনই নোভোচেরকাস ছেড়ে আসার জন্যে ফৌজী পরিষদ তোড়জোড় করছিল। ডন বাহিনীর নবনিযুক্ত আতামান জেনারেল পোপোভ ইতিমধ্যেই শহর থেকে সশস্ত্র-বাহিনী সরিয়ে নিয়েছিল, সামরিক মালপত্তরও সরিয়ে দিয়েছিল। কোন বাধা না পেয়েই গোলুবোভের ঘোড়সোয়াররা অপ্রত্যাশিতভাবে নোভোচেরকাসে ঢুকে পড়ল। কসাকদের একটা দল নিয়ে গোলুবোভ স্বয়ং ফৌজী পরিষদের সদর দপ্তর পর্যন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এল। গেটের সামনে একদল দর্শক হাঁ করে ভিড় জমিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, জেনারেল নাঝারোভের জিন চাপানো ঘোড়াটা নিযে একজন আর্দালিও অপেক্ষা করছিল।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে বানচাক তার হাত-মেসিনগানটা চেপে ধরল। গোলুবোভ আব অন্যান্য কসাকদের সঙ্গে সে বাড়ির মধ্যে ছুটে গেল। দড়াম করে দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ কানে যেতেই প্রশস্ত হলঘরের মধ্যে জমায়েত পরিষদ প্রতিনিধিরা ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েই সাদা মেরে গেল।

—'উঠে দাঁড়াও!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে গোলুবোভ হুকুম করল, যেন কুচকাওয়াজ হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সে টেবিলের সামনে এগিয়ে গেল, কসাকরা তাকে ঘিরে রইল। বাশভারী চিৎকার শুনে পরিষদের সদস্যরা শব্দ করে চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল, শুধু বসে রইল নাঝারোভ। ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে ধমক দিল·

—'ফৌজী-পরিষদের অধিবেশনে বাধা দিতে এসেছ, আস্পর্দাত কম নয়?'

—'চোপ্! সবাইকে গ্রেপ্তার করা হল!' গোলুবোভ্ চটে লাল হয়ে উঠল। নাঝারোভের কাছে দৌড়ে গিয়ে উর্দি থেকে জেনারেলের তকমাটা ছিঁড়ে ফেলে হেঁড়ে গেলায় চেঁচিয়ে উঠল: 'উঠে দাঁড়ান, উঠে দাঁড়ান বলছি! নিয়ে যাও একে! কার সঙ্গে কথা বলছি? জেনারেল!'

দরজার মুখে মেসিন-গান বসিয়েছিল বানচাক। পরিষদের সদস্যদের ভেড়ার

পোঁজোর মত এক জায়গায় জড় করা হল। জনকয়েক কসাক ল্যাব্যাজোভকে, পরিষদের সভাপতি জেলেজ্নিয়াকোভ আর কিছু সদস্যকে বানচাকের পাশ দিয়ে টেনে নিয়ে চলে গেল। একজন সদস্য তার জামার হাতা টেনে ধরল:

—'কর্নেল-সাহেব, আমাদের কোথায় যেতে হবে?'

আর একজন গোলুবোভের ঘাড়ের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল; 'আমাদের কি ছেড়ে দেওয়া হল?'

—'মরগে হারামজাদারা!' তাদের ধাক্কা দিয়ে কমাণ্ডার চেঁচিয়ে উঠল; বানচাকের কাছে পেঁৗছে তাদের দিকে সে ঘুরে দাঁড়াল, মাটিতে পা ঠুকে বলল, কেটে পড় এখান থেকে! তোদের আমি চাইনে। আরে, দাঁড়িয়ে আছিস কিসের জন্যে?'

বানচাক সে রাত্তিরটা মায়ের সঙ্গে কাটাল। পরদিন খবর এল, রোস্তোভ দখল হয়েছে। সে তখনি গিয়ে গোলুবোভের কাছে রোস্তোভে যাবার অনুমতি চাইল। পরদিন সকালেই ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেল।

॥ তিন ॥

রোস্তোভে পেঁৗছে দুদিন সে সদর দপ্তরে কাজ করল, বিপ্লবী কমিটির আফিসও ঘুরে এল। কিন্তু আব্রামসন কি আন্না কেউ সেখানে নেই। তৃতীয় দিনে আবার গেল বিপ্লবী কমিটিতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে একটা ঘর থেকে আন্নার গম্ভীর গলার স্বর কানে এল। বানচাকের বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। চলার গতি কমিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে দিল।

তামাকের ধোঁয়ায় ঘরটা অন্ধকার। দেখতে পেল, দরজার দিকে পেছন দিয়ে আন্না জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটুর নীচে হাত রেখে আব্রামসন জানলার ধারিতে বসেছে, আর তার পাশে দাঁড়িয়ে লম্বামত, লেতিস্ চেহারার এক রেড-গার্ড। লোকটা সিগারেট পাকাতে পাকাতে গল্প করছে; গল্পটা যে কোন মজার ঘটনার তাতে সন্দেহ নেই, কারণ প্রাণখোলা হাসিতে আন্নার মাথাটা ঘাড়ের সঙ্গে গিয়ে ঠেকেছে, হাসিতে আব্রামসনের মুখে ফাটা ফুটির মত খাঁজ খাঁজ দাগ ফুটে উঠেছে।

সোজা এগিয়ে গিয়ে বানচাক আন্নার পিঠে হাত রাখল

—'এই যে, আন্না!'

আন্না ঘুরে দাঁড়াল। মুখে তার রক্ত ঠেলে এসে কণ্ঠার হাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, দুই চোখে জল টলমল করে উঠল:

—'তুমি কোত্থেকে হাজির হলে? দেখুন, দেখুন, আব্রামসন। কেমন ছিমছাম ফিটফাট, আর আপনি লোকটার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।' চোখ না তুলেই আন্না তোৎলাতে লাগল। নিজের উত্তেজনা সংযত করতে না পেরে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

বনাচাক আব্রামসনের গরম হাতটায় চাপ দিল, দুচারটে কথা বলল, তারপর অপরিসীম আনন্দে বোকার মত একগাল হেসে আন্নার কাছে চলে এল। আন্না নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানাল, নিজের এই আকুলতার জন্যে একটু চটেও গেল।

—'তারপর আছ কেমন?' আন্না জিজ্ঞেস করল। কখন এলে? নোভোচের্কাস্ক থেকে এলে? তুমি কি গোলুবোভের ডিভিসনে ছিলে? তারপর, খবর বল দেখি?'

তার মুখ থেকে গাঢ়, নিস্পলক দৃষ্টি না সরিয়েই বানচাক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিয়ে গেল। আন্নার চোখের দৃষ্টি উঠল, নামল, বানচাকের দৃষ্টি থেকে সরে গেল। আন্না প্রস্তাব করল:

—'চল, একটু রাস্তা থেকে ঘুরে আসি।'

যাবার জন্য পেছন ফিরতেই আব্রামসন ডেকে বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরছেন তো? আপনাকে দেবার মত কাজ হাতে রয়েছে, কমরেড বানচাক। আপনাকে কাজে লাগাব আগেই ঠিক করে রেখেছি।'

—'একঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি।' বানচাক উত্তর দিল।

রাস্তায় এসে আন্না সোজা বানচাকের চোখের দিকে তাকাল, চটে মটে হাত দোলাল:

—'ইলিয়া, ইলিয়া, কেমন বিশ্রীভাবে এলোমেলো হয়ে পড়েছিলাম! ঠিক ছোট্ট খুকির মত! তার কারণ, তোমার সঙ্গে একেবারে হঠাৎ দেখা, আর আমাদের দুজনের মধ্যেকার আধাআধি সম্পর্ক। সত্যিইত, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কি? কাব্যিক 'স্বামী স্ত্রী'র সম্পর্ক'? জানো, লুগানস্কে একদিন আব্রামসন জিজ্ঞেস করেছিলেন:

—'তুমি বানচাকের সঙ্গে থাকছ?' আমি তা অস্বীকার করেছিলাম; কিন্তু মানুষটার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, আজ যা তাঁর চোখের সামনে ঘটে গেল তা দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। কিছু বলেননি বটে, কিন্তু তাঁর চোখ দেখেই বলতে পারি তিনি সে কথা বিশ্বাস করেন নি।'

—'কিন্তু তোমার সব কথা বল দেখি।'

—'ও, সেই কথা, লুগানস্কে কেমন কাজকর্ম করে এলাম! দুশ এগারজন বন্দুক-ধারীর একটা দল গড়ে দিয়ে এসেছি। আমরা সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজকর্মও চালিয়ে এসেছি. কিন্তু দুচার কথায় তো তোমাকে সব বলা যায় না! তুমি হঠাৎ এসে পড়ায় আমি এখনো এলোমেলো হয়ে আছি। তুমি আছ কোথায়...রাত্রে কোথায় ঘুমুচ্ছ?

—'এক কমরেডের বাড়িতে।' তোৎলাতে তোৎলাতে মিথ্যেটা বলে ফেলল বানচাক, কারণ রাত্তির দুটো পর্যন্ত সে সদর দপ্তরে কাটিয়েছে।

—'আজই তুমি আমাদের বাড়িতে চলে আসবে। মনে আছে কোথায় আমি থাকি? একবার বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলে।'

—'খুঁজে নেব। কিন্তু...তোমাদের ঘেঁসাঘেঁসি হবে না?'

—'বোকার মত কথা বলো না! কারুর ঘেঁসাঘেঁসি হবে না। আর সে যাই হক না কেন, এ সম্পর্কে আর কোন কথা নয়।'

তাই ঠিক হল। সন্ধ্যেবেলায় তার পেট-মোটা ফৌজী ব্যাগের মধ্যে জিনিসপত্র পুরে, আন্না যেখানে থাকে শহরতলির সেই রাস্তায় এল বানচাক। একটা ছোটমত দালানে ঢুকবার মুখে এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আন্নার সঙ্গে তার চেহারার দূরগত সাদৃশ্য আছে; সেই রকমই দুই চোখে নীলচে-কালো ঝকমকানি, একটু বাঁকা নাক, কিন্তু খাঁজ খাঁজ তামাটে চামড়া, আর তোবড়ানো গালে বয়সটা ধরা পড়ে। বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করল:

—'তুমি বানচাক?'

—'হ্যাঁ।'

—'এসো, ভেতরে আসবে না? আমার মেয়ে তোমার কথা বলে গেছে।'

বৃদ্ধা তাকে একটা ছোট ঘরে নিয়ে এল, জিনিসপত্র কোথায় রাখতে হবে দেখিয়ে দিল, বাতে বাঁকা আঙুল দিয়ে ঘরের চারপাশ দেখাতে দেখাতে বলল:

—'ওইখানে তুমি ঘুমুবে। ওইটে তোমার বিছানা।'

তার কথায় ইহুদি-টান স্পষ্ট। সে ছাড়াও বাড়িতে অল্পবয়সী আর একটা মেয়ে আছে। আন্নার মত তারও চোখদুটি টানাটানা।

কিছুক্ষণ পরে আন্না নিজেই এসে হাজির হল, সঙ্গে নিয়ে এল প্রাণ-চাঞ্চল্য আর সজীবতা। জিজ্ঞেস করল:

—'কেউ এসেছিল? বানচাক এসেছে?'

মা ইঙ্গিতে উত্তর দিল। বড় বড় পা ফেলে আন্না বানচাকের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। হেঁকে বলল:

—'ভেতরে আসতে পারি?'

—'এসো, এসো।' চেয়ার থেকে উঠে বানচাক তার দিকে এগিয়ে গেল।

হাসিহাসি পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আন্না জিজ্ঞেস করল:

—'কিছু খেয়েছ? এ ঘরে এসো।'

আমার হাতা ধরে টানতে টানতে বড় ঘরটার মধ্যে নিয়ে এসে বলল·

—'মা, এই আমার 'কমরেড।' বলেই সে একটু হাসল।

রাতের বেলায় রোস্তোভের বুকে গুলির শব্দ বাবলার পাকা ফলের মত ফাটতে লাগল। মাঝে মাঝে মেসিনগান কট্ কট্ কট্ কট্ করে বেজে উঠল· তারপর আওয়াজ মিলিয়ে গেল, আর সেই রাত, সেই উদার, বিষণ্ণ মার্চের রাত আবার পথঘাট স্তব্ধতায় মুড়ে দিল। তকতকে ঝকঝকে ছোট্ট ঘরখানায় অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে রইল বানচাক। আন্না বলল:

—'আমার ছোট বোনের সঙ্গে আমি এখানে থাকতাম। দেখেই বুঝতে পারছ, কেমন সাদাসিদেভাবে থাকতাম—ঠিক মঠের সন্ন্যাসিনীর মত। সস্তা দামের ছবি নেই, কোন ফটো নেই, এমন কিছুই নেই যাতে বুঝতে পারা যায় আমি হাই স্কুলের ছাত্রী ছিলাম।'

—'কি করে চলত?' বানচাক জিজ্ঞেস করল।

একটু গর্বের সঙ্গেই সে উত্তর দিল. 'আমি কারখানায় কাজ করতাম, আর পড়তাম।'

—'আর এখন?'

—'মা সেলাই করে। দুজনের খুব সামান্যই প্রয়োজন হয়।'

বানচাক নোভোচেরকাস দখলের বিস্তারিত বর্ণনা করল, সে চলে যাওয়ার পর যতগুলো লড়াইতে নেমেছে সবগুলোর গল্প বলল। সেও লুগানস্ক আর তাগানরোগের কাজের ধারণা দিল। এগারোটার সময় মা তার ঘরের আলো নিভিয়ে দিতেই শুভরাত্রি জানিয়ে বানচাকের কাছ থেকে উঠে পড়ল।

॥ চার ॥

ডনের বিপ্লবী কমিটির সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবী আদালতে বানচাকের কাজের ভার পড়ল। আদালতের লম্বামত, গাল তোবড়ানো সভাপতি—একটানা কাজ আর বিনিদ্র রাত্রির ফলে চোখে ম্লানদৃষ্টি—তাকে ঘরের জানলার ধারে নিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল:

—'আপনি কবে পার্টিতে এসেছেন? বাঃ, চমৎকার! তাহলে, আপনিই আমাদের কমাণ্ডার হবেন। গতকাল রাত্রে আগের কমাণ্ডারকে কালেদিনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, সে ঘুষ নিচ্ছিল। লোকটা নিষ্ঠুর, পশুরও অধম ছিল, ও ধরনের লোককে আমরা দলে চাইনে। যে-কাজ করছি তা জঘন্য, কিন্তু পার্টির প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। যা বলছি তা ঠিক ঠিক বুঝে নিন। (এই কথাটার ওপর সে বিশেষ জোর দিল।) আমাদের মানবতা বজায় রাখতে হবে। প্রয়োজনের খাতিরে আমরা প্রতিবিপ্লবীদের কোতল করছি, কিন্তু এটাকে রং তামাসার ব্যাপার করে তুলব না। আমার কথা বুঝতে পারছেন? বেশ, ভাল কথা। যান, এখন গিয়ে কাজে লাগুন।'

সেই রাতেই রেডগার্ডের একটা দল নিয়ে বানচাক শহরের প্রায় মাইল তিনেক দূরে গিয়ে ষোলজন প্রতিবিপ্লবীকে গুলি করে মারল। তাদের মধ্যে দুজন ছিল কসাক, বাদবাকি রোস্তোভের লোক। তারপর থেকে প্রায় প্রত্যেক রাতেই তারা মৃত্যুদণ্ডিতদের শহরের বাইরে নিয়ে যায়, তাড়াহুড়ো করে কবর খোঁড়ে, কোন কোন রেড-গার্ড আর আসামীরা পাশাপাশিই খুঁড়তে থাকে। তারপর বানচাক তার রেডগার্ডের দলটাকে লাইন বেঁধে দাঁড় করায়, কাঁপা গলায় নির্দেশ দেয়.

—'বিপ্লবের শত্রুদের ..' রিভলবারটা দুলে ওঠে। 'গুলি কর!'

॥ পাঁচ ॥

একাজের সাতদিনের মধ্যেই বানচাক শুকিয়ে গেল, গায়ের রঙ্ কালি হয়ে এল। চোখ দুটো গর্তে বসে গেল; স্নায়ুর বিকারে চোখের পাতা মিটমিট করে, নিরুত্তাপ জ্বলজ্বলে দৃষ্টিকে গোপন করতে গিয়ে হার মানল। আন্নার সঙ্গে দেখা হয় শুধু রাত্রে। কারণ, সে কাজ করে বিপ্লবী কমিটিতে, ফেরে অনেক রাত্রে। কিন্তু রোজই সে জেগে বসে থাকে, যতক্ষণ না জানলায় পরিচিত টোকা শুনে বুঝতে পারে বানচাক ফিরে এল।

একদিন বানচাক নিয়মমাফিক মাঝরাতের পর ফিরল। আন্না দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল:

—'কিছু খেয়েছ?'

বানচাক উত্তর দিল না, মাতালের মত টলতে টলতে নিজের ঘরে চলে গেল। যেমন

ছিল ঠিক তেমন ভাবেই, গ্রেট কোট, বুট, আর টুপি শুদ্ধই বিছানায় আছড়ে পড়ল। কাছে এসে আম্না তার মুখের দিকে তাকাল: চোখে আতঙ্কর মত ছানি পড়েছে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু গড়িয়ে পড়ছে, টাইফাসের পর চুল পাতলা হয়ে গিয়েছিল—সেই চুল ভিজে গোছা হয়ে কপালের সঙ্গে আটকে আছে।

তার পাশে বসল আম্না। মমতায়, বেদনায় বুকের ভেতরটা থামচে ধরল:

—'একাজে কি তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে, ইলিয়া?'

বানচাক তার হাতটায় চাপ দিল, দাঁত কড়মড় করল, তারপর দেয়ালের দিকে পাশ ফিরল। একটা কথাও না বলে ওইভাবেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ঘোরে করুণভাবে কি সব বিড়বিড় করতে লাগল; লাফিয়ে ওঠারও চেষ্টা করল। আতঙ্কিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আম্না এক অজানা ভয়ে শিউরে উঠল। চোখদুটো অর্ধেক বুজে সে ঘুমুচ্ছে, পাতার নীচে ফুলো ফুলো শ্বেতাংশ জ্বরতপ্তের মত জ্বলজ্বল করছে।

—'তুমি এখান থেকে চলে যাও!' সকালবেলায় আম্না বানচাককে বলল। 'বরং ফ্রন্টে চলে যাও। তোমাকে দেখাচ্ছে যেন তুমি এ জগতেরই নও। এ কাজ করতে গেলে তুমি খতম হয়ে যাবে, ইলিয়া।'

—'চুপ কর!' রাগে চোখ পিটপিট করতে করতে সে চিৎকার করে উঠল।

—'চিৎকার করো না! তোমার রাগের কিছু করেছি?'

তৎক্ষণাৎ সে শান্ত হয়ে গেল, যেন চিৎকারের মধ্যে দিয়েই তার বুকে জমা ক্রোধ ছাড়া পেয়ে গেল। হাতের চেটোয় ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি মেলে সে বলল:

—'মানুষ নামধারী নোংরাগুলোকে ধ্বংস করাটা নোংরা ব্যাপার। বুঝতেই পারছ, তাদের গুলি করে মারা শরীর ও মনের পক্ষে ক্ষতিকর। ধুত্তোর নিকুচি করি তোর, ' এই প্রথম বানচাক আম্নার সামনে অকথ্য খিস্তি করে উঠল। 'একাজ যারা স্বেচ্ছায় করে তারা নির্বোধ, পশু, নয়ত অন্ধ উন্মাদ। আমরা সবাই বাস করতে চাই ফুলের বাগানে, কিন্তু জাহান্নমে যাক সবাই! ফুলগাছ লাগাবার আগে ময়লা সরাতে হবে মাটিতে সার দিতে হবে! হাতেও ময়লা লাগাতে হবে!' আম্না নিঃশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে নিলেও সে গলা চড়াল। 'জঞ্জালগুলোকে ধ্বংস করতেই হবে, তবু লোকে এই কাজের জন্যে খুঁতখুঁত করে!' টেবিলের ওপরে দুম দুম করে ঘুঁসি মারতে মারতে, রক্ত-রাঙা চোখদুটো পিট পিট করে সে চিৎকার করে উঠল।

আম্নার মা ঘরের মধ্যে উঁকি মারতেই সে নিজেকে সামলে নিযে বেশ একটু শান্ত গলায় বলে চলল:

—'আমি এ কাজ ছাড়ব না! আমি দেখতে পাবছি, বুঝতে পারছি, এখানে কাজের মত কাজ করছি। সব জঞ্জাল আমি আঁচড়ে তুলব, মাটিতে সার দেব যাতে মাটি আরও সারালো হয়ে ওঠে। আরও উর্বরা! একদিন সুখী মানুষেরা এই মাটিতে হেঁটে বেড়াবে সেখানে!' নিরানন্দের মত টেনে টেনে সে হাসল। 'ভাবীকালের সঙ্গীত .. মনে আছে, আম্না? এই ধরনের কত সাপ, কত এ'টুলিকে আমি গুলি করে মেরেছি! এ'টুলি হচ্ছে এমন পোকা যে গায়ের মাংস কুরে কুরে খায়। এই হাতে আমি তাদের গন্ডায় গন্ডায় মেরেছি।' বড় বড় নখওয়ালা লোমশ-কালো হাত দুটো বাড়িয়ে শকুনের নখের মত বেঁকিয়ে ধরল, তারপর ধপ করে হাঁটুর ওপর হাত দুটো ফেলে ফিস ফিস করে বলল: 'সব কিছু এই সঙ্গে জাহান্নমে চলে যাক! আগুন জ্বলছে জ্বলুক, যাতে ফুলকি উঠতে পারে, শুধু শুধু না ধোঁয়ায়. .শুধু, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি. .এটা সত্যি। আর অল্প কিছুদিন, তারপর আমি ফ্রন্টে চলে যাব ..তুমি ঠিক বলেছ ..'

আন্না শান্ত গলায় বলল:

—'হ্যাঁ, ফ্রন্টে চলে যাও, নয়ত অন্য কোন কাজ নাও। তাই করো, ইলিয়া, নইলে তুমি...তুমি পাগল হয়ে যাবে।'

তার দিকে পেছন ফিরে জানলার গায়ে আঙুল বাজাল বানচাক:

—'না...আমি শক্ত আছি। ভেবোনা যে লোহা দিয়ে তৈরি কোন মানুষ হতে পারে। আমরা সবাই একই ধাতুতে গড়া। বাস্তব জীবনে এমন কোন মানুষ নেই, যে লড়াই করতে গিয়ে ভয় পায় না, এমন কেউ নেই যে বিনা দ্বিধায়...মনে মনে আঁচড় না খেয়ে মানুষ মারতে পারে। অফিসারদের জন্যে আমার কোন দুঃখ হয় না। তোমার আমার মতই তারা শ্রেণী-সচেতন। কিন্তু গতকাল ওদের সঙ্গে তিনজন কসাককে মারতে হয়েছিল...তিনজনই মেহনতী মানুষ। একজনকে বাঁধতে শুরু করলাম...' তার গলার স্বর কাঁপা আর অস্পষ্ট হয়ে এল, যেন সে দূরে থেকে বহুদূরে সরে যাচ্ছে। 'তার হাতে হাতটা ঠেকে গিয়েছিল, জুতোর তলার মত শক্ত কড়া হাত, গিঁটে গিঁটে ভর্তি। কালো কঠিন হাত—ফাটা ফাটা, ডুমো ডুমো...যাক, আমাকে যেতে হবে।' একটা বিশ্রী হেঁচকি খেয়ে আচমকা থেমে গিয়ে বানচাক গলায় হাত ঘসতে লাগল।

তারপর বুট চড়িয়ে, এক গেলাস দুধ খেয়ে সে বাইরে চলে এল। আন্না বারান্দায় এসে তাকে ধরে ফেলল। তার ভারী লোমশ হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, অবশেষে তপ্তগালে হাতখানা একবার চেপে ধরে দৌড়ে উঠোনে চলে গেল।

॥ ছয় ॥

দীর্ঘায়িত দিনগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে সময় কাটতে লাগল। আবহাওয়ায় গরম ভাব দেখা দিল। ডন এলাকায় বসন্ত জানান দিয়ে হাজির হয়ে গেল। ইউক্রেনীয় আর জার্মানদের কাছ থেকে তাড়া খেয়ে এপ্রিলের শুরুতেই রেড-গার্ড দলগুলো রোস্তোভে ঢুকতে শুরু করল। খুন, রাহাজানি, বে-আইনি জবরদখলের ঘটনা ঘটতে লাগল শহরে। একেবারে মনোবল ভেঙ্গে যাওয়া গোটাকয়েক দলকে বিপ্লবী কমিটি নিরস্ত্র করতে বাধ্য হল। সে ব্যাপার বিনা সংঘর্ষে, গুলিগোলা না চালিয়ে সমাধা করা গেল না। নোভোচেরকাসের চারধারের কসাকরা চঞ্চল হয়ে উঠল। পপলারের ফোঁড়ের মত, মার্চ মাসে কসাক আর রুশ বাসিন্দাদের মধ্যে গ্রামে গ্রামে মাথা ফাটাফাটি শুরু হল, এখানে ওখানে বিদ্রোহের গুরুগুরু ধ্বনি শোনা গেল, প্রতি-বিপ্লবী ষড়যন্ত্রও ধরা পড়ল। রোস্তোভে কিন্তু কামনাতপ্ত, পরিপূর্ণ জীবন বয়ে চলল। সন্ধ্যের দিকে সৈন্যরা, জাহাজীরা, মজুররা দল বেঁধে বড় রাস্তায় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। তারা সভা করে, সূর্যমুখী ফুলের বিচি ছাড়ায়, রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলা জলের ছোট ছোট ধারায় থুথু ফেলে, মেয়েমানুষের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে। আগের মতই তারা কাজ করে, খায়দায়, মদ গেলে, ঘুমোয়, মরে, সন্তানের জন্ম দেয়, প্রেম করে, ঘৃণা করে, সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়, বৃহৎ ও তুচ্ছ কামনাবাসনায় পিষ্ট হয়ে দিন কাটায়। রোস্তোভের আতঙ্কের দিন এগিয়ে আসছে। বরফগলা কালো মাটি আর আশু সংঘর্ষের রক্তের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠছে।

রোদে ঝলমলকরা এক মনোরম দিনে বানচাক রোজকার চেয়ে আগে বাড়ি ফিরে এল, আম্মা ইতিমধ্যেই ফিরে এসেছে দেখে অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল:

—'কিন্তু তুমিত রোজই দেরি কর; আজ এত আগে কেন?'

—'শরীরটা ভাল লাগছে না।'

আম্মা তার পেছন পেছন ঘরে এসে ঢুকল। বাইরের জামা-কাপড় ছেড়ে থরোথরো আনন্দের হাসিতে বানচাক বলল:

—'আম্মা, আজকের দিনটা গেলেই আর আদালতে আমি কাজ করব না।'

—'কি বলছ তুমি? কোথায় যাচ্ছ?'

—'বিপ্লবী কমিটিতে। আজ ক্রিভোশ্লিকোভের সঙ্গে কথা হল। তিনি কথা দিয়েছেন আমাকে জেলার কোথাও পাঠাবেন।'

দুজনে একসঙ্গে রাতের খাবার খেল, তারপর সে ঘুমুবার জন্যে শুয়ে পড়ল। মানসিক উত্তেজনায় বহুক্ষণ ঘুম এল না। শক্ত বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে শুয়ে শুয়েই সিগারেট টানতে লাগল। আদালতের কাজ ছাড়তে হওয়ায় খুবই খুশী হয়েছে সে, কারণ বেশ বুঝতে পারছে আর সামান্য কিছুদিন হলেই সে আর বাঁচত না, এর ভারে ভেঙ্গে পড়ত। চতুর্থ সিগারেটটি সবে শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় কানে এল, দরজাটা একটু ক্যাঁচ করে উঠল। মাথা তুলতেই আম্মাকে দেখতে পেল। খালি পায়ে, শুধু সেমিজ গায়েই আম্মা চৌকাঠ পেরিয়ে নিঃশব্দে বিছানার দিকে এগিয়ে এল। শার্সির ফাঁক দিয়ে চাঁদের কুয়াশাচ্ছন্ন সবুজ আলো তার খোলা কাঁধের ওপর এসে পড়ল। বানচাকের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে গরম হাতটা তার ঠোঁটের ওপর রেখে বলল:

—'সরে শোও...একটি কথাও বলোনা...'

দুজনে শুয়ে রইল। আম্মার পা-দুটো হাঁটুর কাছ থেকে থরথর করে কাঁপতে লাগল। কনুয়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে' তপ্ত কামনায় কানে কানে ফিস ফিস করে বলল:

—'তোমার কাছে এলাম আস্তে...খুব আস্তে. .মা ঘুমিয়ে আছে।'

অধৈর্য হয়ে সে আঙুরের থোলোর মত ভারী চুলের গোছা কপাল থেকে সরিয়ে পেছনে ঠেলে দিল। এক নীল আগুনে তার চোখদুটো ধূমায়িত হয়ে উঠল, কর্কশ, পীড়িতকণ্ঠে ফিসফিস করে বলল·

—'আজ যদি না হয়, কাল হয়ত তোমাকে আমি হারাতে পারি .আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে আমি ভালবাসতে চাই।' নিজের সিদ্ধান্তে সে থরথর করে ভয়ানক কেঁপে উঠল। 'কই, তাড়াতাড়ি কর!'

তার আঁটোসাঁটো উপচে পড়া, নুয়ে থাকা, শীতল স্তনদুটিতে চুমু খেল বানচাক, সঁপে দেওয়া দেহে হাত বুলাতে লাগল। কিন্তু তার চেতনায় এক দুঃসহ লজ্জার চাবুক খেয়ে মহা আতঙ্কে সে অনুভব করল, সে অক্ষম। যন্ত্রণায় মাথাটা কেঁপে উঠল, গালদুটোয় আগুন ধরে গেল। একটু পরে আম্মা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, রাগের মাথায় তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল। সেমিজটা টেনে নামাতে নামাতে ঘৃণা আর বিরক্তি মাখানো গলায় অবজ্ঞাভরে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল:

—'তুমি...তুমি কি পুরুষত্বহীন? না, কি তোমার...অসুখ? উঃ, কি জঘন্য!... ছেড়ে দাও আমাকে!'

বানচাক তার আঙুলগুলো এত জোরে চেপে ধরল যে মট করে একটু আওয়াজ উঠল; ঘাড়টা পক্ষাঘাতের মত নড়তে লাগল, আর তার বিস্ফারিত, শোকাচ্ছন্নের মত কালো, ক্রুদ্ধ চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করল:

—'কেন? আমাকে দোষারোপ করছ কিসের জন্য? হ্যাঁ, আমার ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে...! এ সত্ত্বেও আমি শুধু এখনকার মতই অক্ষম। আমার অসুখ হয়নি...বুঝলে! আমি শুধু একেবারে ফোঁপরা হয়ে গিয়েছি...'

বোকার মত সে গাঁক গাঁক করে উঠল। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর জানলার ধারে গিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, যেন সে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। আন্না উঠে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল, শান্তভাবে মায়ের মত তার ভুরুতে একটা চুমু খেল।

॥ সাত ॥

কিন্তু সপ্তাহখানেক পর, তারা যা কামনা করেছিল তা যখন ঘটে গেল, বানচাকের হাতের নীচে তপ্ত মুখখানা আড়াল করে আন্না স্বীকার করল:

—'আমি ভেবেছিলাম..তুমি হয়ত অন্য কারুর সঙ্গে. .আমি বুঝে উঠতে পারিনি যে, তুমি অতখানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে।'

আর বহুদিন পর্যন্ত বানচাক শুধু এক অভিলষিত নারীর আলিঙ্গন আর উত্তাপই অনুভব করল না, এক মায়ের তপ্ত, সদা প্রবহমান আশা-উদ্বেগও অনুভব করতে লাগল।

তাকে গ্রামাঞ্চলে পাঠান হল না। পোদ্‌তিয়েলকোভ গোঁ ধরে রইল তাকে রোস্তোভে থাকতে হবে। প্রাদেশিক সোভিয়েতের অধিবেশন আর ডন অঞ্চলে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা প্রতি-বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে ডনের বিপ্লবী কমিটি কর্মতৎপরতায় টগবগ করে উঠল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

নদীর ধারের উইলো বনের পেছনে ব্যাঙ্ ডাকছে। নদীর স্রোত বরাবর পাহাড়ের গায়ে সূর্য হেলে পড়েছে। সিয়েত্রাকোভ্ গ্রামের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সন্ধ্যার হিম ঢুকছে। বাড়িগুলোর বিশাল বাঁকা ছায়া ধুলোমাখা রাস্তার ওপর আড়াআড়ি পড়ে আছে। গ্রামের গরুবাছুর স্তেপ থেকে ধীর মন্থর গতিতে ফিরে আসছে। ডালের পাঁচনবাড়ি চালিয়ে তাদের তাড়িয়ে আনছে মেয়েরা, চলতে চলতে গল্পগুজব করছে। পাশের গলিতে গুলিতে খালিপায়ে, রোদে পোড়া ছেলেপুলেরা ব্যাঙ্‌লাফানো খেলছে। বাড়ির দেয়ালের আলসেয় বুড়োরা বসে আছে সার বেঁধে।

গ্রামের ঝালসজ্জী বীজ বোনা শেষ হয়েছে। শুধু এখানে ওখানে সূর্যমুখী ফুল আর ভোলনার প্যলাটা তখনো চলছে।

গ্রামের বাইরে একটা বাড়ির কাছে পড়ে থাকা ওক গাছের ওপর জনকয়েক কসাক বসে আছে। বাড়ির কর্তা, মুখে দাগওয়ালা এক গোলন্দাজ, রুশ-জার্মান যুদ্ধের কোন ঘটনার ব্যাখ্যান করছিল। তার শ্রোতা, এক বুড়ো পড়শী আর তার জামাই, চুপচাপ শুনছে। গোলন্দাজের বৌটা খানদানি ঘরের মেয়েছেলের মতই গোলগাল। সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। ঘাঘরার মধ্যে গোঁজা জামাটা কনুইয়ের কাছে ছেঁড়া, তামাটে সুঠাম বাহুদুটো বেরিয়ে পড়েছে। হাতে দুধের কেঁড়ে নিয়ে এমন স্বচ্ছন্দ, দ্রুত, মনোরম ভঙ্গিতে গোয়ালের দিকে পা ফেলে চলে গেল, যা কসাক মেয়েদেরই বৈশিষ্ট্য। সাদা রুমালের মধ্যে থেকে চুলগুলো বেরিয়ে পড়ল, উঠোনের গজানো সবুজ আগাছার ওপরে আলতো চাপ দিয়ে খালিপায়ের চটি-দুটো একটানা ফটর ফটর আওয়াজ করতে লাগল।

কেঁড়ের ধারিতে আছড়ে পড়া দোহা দুধের চড়বড় শব্দ কসাকদের কানে ভেসে এল। বাড়ির গিন্নি দুধ দোহা শেষ করে, বাঁ-হাতে দুধ ভর্তি কেঁড়েটা নিয়ে একটু কুঁজো হতে হতে ঘরে ফিরে এল। সিঁড়ির ওপর থেকেই হেঁকে বলল:

—'সিমিওন, তুমি বরং উঠে গিয়ে বাছুরটা একটু দেখ।'

—'মিৎকা কোথায়?' স্বামী জিজ্ঞেস করল।

—'কে জানে; কোথাও হয়ত পালিয়েছে।'

সে ধীরে সুস্থে উঠে রাস্তার কোণের দিকে চলে গেল। বুড়ো আর তার জামাইও বাড়ি ফেরার জন্যে গা তুলল। কিন্তু কোণ থেকেই সে ডাকল:

—'দেখুন, দেখুন, দোরোফেই গাভ্রিলিচ্! এখানে আসুন!'

দুজনে তার কাছে গিয়ে পৌঁছুলেই সে নিঃশব্দে স্তেপের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। পদাতিক, ঘোড়সোয়ার আর গাড়ির চাকায় ওড়া একটা লালধুলোর মেঘ রাস্তা বরাবর এগিয়ে আসছে।

—'সেপাই, নিশ্চয়ই?' অবাক হয়ে বুড়ো চোখ কোঁচকাল, সাদা ভুরুর ওপর হাতের চেটোর আড়াল দিল।

—'কারা বটে?' বাড়ির কর্তার তাক লেগে গেল।

উঠোনের গেট দিয়ে তার বৌ-ও বাইরে এসে দাঁড়াল, জ্যাকেটটা কাঁধের ওপর ঝোলানো। স্তেপের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে উৎকণ্ঠায় আর্তনাদ করে উঠল:

—'ওরা কারা? ওরে বাবা, কত লোক ওরা!'

—'ভালো কিছু করার জন্যে ওরা আসছে না, এটা নিশ্চিত..'

বুড়ো পেছন ফিরে নিজের আঙিনায় গিয়ে উঠল, জামাইকে চেঁচিয়ে ডাকল·

—'আঙিনায় ঢুকে পড়; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার কোন মানে হয় না।'

ছোটছোট বাচ্চা আর মেয়েরা রাস্তার কোণে দৌড়ে এসে দাঁড়াল, পুরুষরা তাদের পেছনে পেছনে ভিড় করে এল। গ্রাম থেকে মাইল খানেক দূরে স্তেপের মধ্যে রাস্তা বরাবর সৈন্যদলটা বাঁক ঘুরছে। বাতাসে তাদের গলার স্বর, ঘোড়ার নাকঝাড়ার আওয়াজ আর চাকার ঘড়ঘড়ানি ভেসে আসছে।

—'ওরা কসাক নয়; ওরা আমাদের লোক নয়।' গোলন্দাজের বৌ তার স্বামীকে বলল। গোলন্দাজ কাঁধ ঝাঁকাল:

—'ওরা কিছুতেই কসাক নয়। জার্মান হবে হয়ত? না, ওরা রুশ। ওই যে, ওদের লাল-ঝাণ্ডা দেখা যাচ্ছে...'

একজন লম্বামত কসাক এগিয়ে এল। দেখলেই বোঝা যায়, সে ম্যালেরিয়ায় ভুগছে, একেবারে হলদে মেরে গিয়েছে; বুট আর ভেড়ার চামড়ায় আপাদমস্তক ঢাকাঢুকি দিয়ে আছে। জরাজীর্ণ লোমের টুপিটা উ'চু করে সে বলল:

—'ঝাণ্ডাটা দেখতে পাচ্ছ? ওরা বলশেভিক।'

—'তারাই হবে বটে।'

সামনে থেকে জনকয়েক ঘোড়সোয়ার দলছুট হয়ে গ্রামের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে লাগল। দৃষ্টিবিনিময় করে কসাকরা নিঃশব্দে সরে পড়তে শুরু করল; মেয়েরা আর বাচ্চারা চারদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। দু-এক মিনিটের মধ্যেই রাস্তাটা একেবারে জনশূন্য। ঘোড়সোয়াররা ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রামের ধারে সেই ওকগাছটার কাছে—যেখানে কয়েকমিনিট আগেও লোক তিনজন বসে ছিল, এসে হাজির হল। গোলন্দাজ তার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। ঘোড়সোয়ারদের পাণ্ডার গায়ে কুবানের উর্দি, খাঁকি সার্টের ওপর আড়াআড়িভাবে গাঢ় লাল রঙের একটা বিশাল সিল্কের রুমাল বাঁধা। সে সামনে এগিয়ে এল:

—'ভাল তো কর্তা! গেটটা খুলে দিন।'

বাড়ির কর্তা ফ্যাকাসে হয়ে মাথার টুপিটা খুলে নিল। জিজ্ঞেস করল:

—'আপনারা কারা বটেন?'

—'গেট খুলে দাও।' দলের পাণ্ডা চিৎকার করে উঠল।

শয়তানী দৃষ্টিতে আড়চোখে তাকিয়ে লাগামের কাঁটা চিবুতে চিবুতে ঘোড়াটা বেড়ার গায়ে সামনের পায়ের লাথি ছুঁড়ল। বাড়ির কর্তা গেট খুলে দিল। ঘোড়সোয়াররা সার বেঁধে উঠোনে এসে ঢুকল। তড়াক করে জিন থেকে লাফিয়ে নেমে দলের পাণ্ডা ঘরের সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। আর সকলে নামতে নামতেই সে সিঁড়ির কাছে পেঁছে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল, তারপর বাড়ির কর্তাকে বাক্সটা এগিয়ে দিল। কিন্তু সে নিল না।

—'তামাক খান না?'

—'ধন্যবাদ।'

—'এখানে সবাই আপনারা পুরনো পন্থী খৃষ্টান না?'

—'না, আমরা গ্রীক মতের। আপনারা কে বটেন?'

—'আমরা দু নম্বর সমাজতন্ত্রী ফৌজের রেড-গার্ড।'

ঘোড়ার লাগাম ধরে অন্যান্য ঘোড়সোয়াররাও সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এল। রেলিং-এর সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে রাখল। তাদের মধ্যে একজনের সরু সরু ঠ্যাঙ, চুলগুলো ঘোড়ার কেশরের মত কপালে ঝেঁপে পড়েছে। সে ভেড়ার খোঁয়াড়ের দিকে এগিয়ে গেল। এমনভাবে দরজাটা ধাক্কা মেরে খুলল, যেন সে-ই বাড়ির কর্তা। একটু ঝুঁকে পড়ে খুপরির ভেতরে হাতড়ে, শিং ধরে একটা বড়মত ভেড়া টেনে বার করে আনল। অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে উঠল.

—'পেয়োত্রা, এগিয়ে এসে একটু হাত লাগাও।'

অস্ট্রীয় উর্দি গায়ে এক সেপাই দৌড়ে এল তাকে সাহায্য করতে। বাড়ির কর্তা দাড়িতে একটা ঝাড়া দিয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল, যেন সে অন্য কারুর বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। একটা কথাও সে বলল না, তলোয়ারের চোপে গলাকাটা অবস্থায় ভেড়াটা যখন সরু সরু ঠ্যাং খিঁচতে লাগল শুধু তখনই সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে ঘরের ভেতরে চলে গেল।

কুবান সেপাইটি আর দুজন—একজন চীনা, অন্যজন রুশ—তার পেছন পেছন রান্নাঘরে এসে ঢুকল। চৌকাঠ পেরুতে পেরুতেই দলের পাণ্ডা চেঁচিয়ে উঠল, 'রাগ করোনা, দাদা। যা নেব সব কিছুরই দাম দেব।'

পা-জামার পকেটের গায়ে একটা চাপড় মেরে সে হো হো করে হেসে উঠল। কিন্তু বাড়িওয়ালার স্ত্রীর দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ তার হাসি নিভে গেল। উনুনের পাশে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সে আতঙ্কিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চঞ্চল দৃষ্টিতে রান্নাঘরের চারধারে চোখ বুলাতে বুলাতে দলের পাণ্ডা চীনেটার দিকে ফিরে বলল:

—'এই বুড়োর সঙ্গে যাও।' বাড়ির কর্তাকে সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। 'ওর সঙ্গে যাও, ঘোড়ার জন্যে ঘাস দেবে। আমাদের কিছু ঘাস চাই।' তারপর বাড়ির কর্তার দিকে ঘুরে বলল, 'এর জন্যে ভালো দাম দেব। রেড-গার্ডরা কখনো লুটপাট করে না। যাও হে, যাও!' তার গলার স্বরে কাঠিন্য ফুটে উঠল।

চীনেটা আর অপর সেপাইটাকে সঙ্গে করে সে ঘরের বাইরে চলে এল। সবে সিঁড়ি দিয়ে নামছে, এমন সময় তার স্ত্রীর কান্না কান্না গলার ডাক শুনতে পেল। দৌড়ে সে বারান্দায় উঠে এল। দলের পাণ্ডা মেয়েছেলেটার কনুয়ের ওপরে চেপে ধরে সামনের আলো-আঁধারি ঘরের দিকে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। সেও বাধা দিচ্ছে, হাত দিয়ে বুকে ধাক্কা মারছে। কোমরটা জড়িয়ে ধরে পাঁজাকোলা করে তুলে নিতে যাচ্ছিল কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘটাং করে দরজাটা খুলে গেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে রান্নাঘরের মধ্যে এগিয়ে এসে বাড়ির কর্তা স্ত্রীর সামনে আড়াল দিয়ে দাঁড়াল। চাপা কঠিন স্বরে বলে উঠল:

—'আমার বাড়িতে আপনারা অতিথি হয়ে এসেছেন...কিসের জন্যে আমার ইস্তিরিকে অপমান করছেন? বেরিয়ে যান! আপনাদের বন্দুক দেখে আমি ভয় পাইনে। যা খুশি তাই নিয়ে যান, সব কিছু লুটে নিয়ে যান কিন্তু ইস্তিরির গায়ে হাত দেবেন না। তা করতে হলে আগে আমাকে মারতে হবে। আর, নুরা, তুমি..' তার নাকের পাশ দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল, স্ত্রীর দিকে ফিরে বলল, 'দোরোফেই খুড়োর বাড়ি চলে যাও। তোমার এখানে থাকার কোন মানে হয় না।'

সার্টের পট্টিটা ঠিক করতে করতে দলের পাণ্ডা বাঁকা হাসি হাসল:

—'অল্পেই ঘাবড়ে যাও, কত্তা। মানুষকে একটু আধটু হাসিঠাট্টাও করতে দেবে না। আমি গোটা রেজিমেণ্টের ভাঁড়, তা জানো? ইচ্ছে করেই করছিলাম হে। ভাবলাম, মেয়েছেলেটা কেমন, একটু বাজিয়ে দেখি· কিন্তু ও অমনি হাঁউ মাউ শুরু করে দিল। ঘাস দিয়েছ আমাদের? ঘাস নেই? আচ্ছা, তোমার পাশের বাড়িতে আছে?'

চাবুকটা বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে ঘোরাতে শিস্ দিতে দিতে সে বাইরে চলে গেল। তার কিছুপরেই গোটা দলটাই গ্রামের মধ্যে এসে ঢুকল। বন্দুকধারী ও তলোয়ার-ধারী মিলিয়ে প্রায় আটাশ জন হবে। রেডগার্ডদের মধ্যে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগই চীনা, লেৎ ও অন্যান্য বিদেশী জাতের। তারা গ্রামের বাইরে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করল। স্পষ্টই বোঝা গেল, এই কিম্ভূত, উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদের গ্রামের ভেতরে রাখবার মত আস্থা তাদের কমাণ্ডারের নেই।

॥ দুই ॥

ইউক্রেনীয় সৈন্য আর দখলদার জার্মান-বাহিনীর সঙ্গে লড়াইতে পর্যুদস্ত হয়ে দু নম্বর সমাজতন্ত্রী ফৌজের এই দলটি রাস্তা করে করে ডনের দিকে হটে এসেছে, উত্তর-দিকে ভোরোনেঝে চলে যাবার চেষ্টা করছে। দলের মধ্যে যে সব চোর-বদমাস মাথা তুলেছে তাদের প্রভাবে মনোবল হারিয়ে পথে পথে হৈ হল্লা করে বেড়াচ্ছে। সে রাত্রে, কমাণ্ডারের ধমকানি ও নির্দেশ সত্ত্বেও তারা দলে দলে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ল, ভেড়া কাটতে লাগল, গ্রামের প্রান্তে দুটি কসাক মেয়েছেলেকে ধর্ষণ করল বারোয়ারিতলায় নিরর্থক গুলিগোলা চালাল, নিজেদেরই একজনকে আহত করে ফেলল। সঙ্গে বয়ে আনা মদ গিলে রাতের বেলায় নেশায় চুর হয়ে রইল।

কিন্তু পাশের গ্রামগুলোকে সাবধান করে দেবার জন্যে ইতিমধ্যেই কসাকরা তিনজন কসাককে পাঠিয়ে দিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে কসাকরা ঘোড়ায় জিন কসল, হাতিয়ার বেঁধে নিল, তাড়াতাড়ি লড়াই ফেরতা দলগুলো আর বয়স্কদের জড় করে ফেলল। বিভিন্ন গ্রামে যে সব সার্জেণ্ট, আর অফিসার আছে, তাদের নেতৃত্বে গিরিপথ আর রেড-গার্ড শিবিরের চারপাশের উঁচু উঁচু টিলার আড়ালে আড়ালে তড়িঘড়ি সিয়েল্রা-কোভের দিকে ছুটল। রাতের মধ্যেই আশপাশের সমস্ত গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে হাজির হল।

আকাশে ছায়াপথ জ্বলে জ্বলে নিভে আসছে, কালো মোলায়েম পশমের মত রাতের আবরণ খসে খসে পড়ছে, ফ্যাকাসে হয়ে আসছে। এমন সময় ভোরের দিকে রেড-গার্ডদের চারধার থেকে গর্জন করতে করতে কসাক ঘোড়সোয়াররা বরফের ধ্বসের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা মেসিন-গান গর্জন করে উঠে থেমে গেল; আবার গুলি ছুটল, তারপর আবার চুপ হয়ে গেল।

এক ঘণ্টার মধ্যেই কাজ ফতে হল; দলটা পুরোপুরি চুরমার হয়ে গেল; দুশজনেরও বেশি গুলিতে মরল, কচুকাটা হয়ে গেল, প্রায় শ পাঁচেককে বন্দী করা হল। চারটে করে ভারী কামানের দুটো ব্যাটারী, ছাব্বিশটা মেসিনগান, হাজার হাজার রাইফেল আর ফৌজী সাজসরঞ্জাম কসাকদের হাতে পড়ল।

পরদিন রাস্তায়, ঘাটে, জেলার সর্বত্র ঘোড়া ছুটিয়ে যাওয়া খবরদারদের লাল-ঝাণ্ডাগুলো ফুলের মত ফুটে উঠল। গ্রামগুলো উত্তেজনায় টগবগ করতে লাগল। সোবিয়েতগুলো হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ল, তাড়াহুড়ো করে আতামান নিয়োগ হয়ে গেল। মে মাসের গোড়ার দিকেই ডন প্রদেশের উত্তরের জেলাগুলো ডনের বিপ্লবী কমিটির আওতা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। নতুন জেলার কেন্দ্র নির্বাচন করা হল জনবহুল ভিয়েশেনস্কাকে, নাম হল 'উত্তর ডন'। বারটি কসাক জেলা ও একটা ইউক্রেনীয় জেলাকে কুক্ষিগত করে, ডন প্রদেশের মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে উত্তর ডনের এলাকা নিজের মত চলতে শুরু করে দিল। ঝাখার আকিমোভিচ্ আলফেরভ্ নামে ইয়েলান্স্ক জেলার এক কসাক জেনারেলকে তাড়াতাড়ি করে আঞ্চলিক আতামান নিযুক্ত করা হল। লোকে বলে, সামান্য অফিসার থেকে সে একেবারে জেনারেলের পদে

উঠেছে শুধু তার স্ত্রীর জোরে। তার স্ত্রী-রত্নটি অত্যন্ত কর্মিষ্ঠা ও বুদ্ধিমতী। শোনা যায়, অপদার্থ স্বামীটিকে সে কান ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়েছে, তিন তিন বার ফেল করে ফৌজী কলেজের পরীক্ষায় চারবারের বার পাশ না করা পর্যন্ত তাকে সোয়াস্তি দেয়নি।

আজকের দিনে আলফেরভের এই সব নিয়ে যদি গল্পগুজব হয়ও, তবে তা অতি সামান্যই। কসাকদের মন এখন অন্য অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

মাঠ থেকে জল সরতে শুরু করেছে। বাগানের বেড়ার ধারে ধারে বাদামি মাটি জেগে উঠেছে, বানের জলে পেছনে ফেলে যাওয়া শুকনো নল-খাগড়া, গাছের ডাল আর পচাপাতার সীমানার দাগ আঁকা রয়েছে। ডনের ধারের বানভাসা জঙ্গলে উইলো চারা-গুলোয় সবুজ রঙ্ ধরতে শুরু করেছে, চুলের বিনুনির মত 'ক্যাটকিন' ফুল ঝুলছে। পপলারের কোঁড়গুলো ফোটো ফোটো। গ্রামের খামারে খামারে এ্যালডারের ফেক্ড়ি-গুলো পায়ের কাছে ডোবার মধ্যে নীচু হয়ে ঝুলে পড়েছে, হাঁসের বাচ্চার গায়ের মত তুলতুলে হলদে কুঁড়িগুলো বাতাসে ঢেউতোলা জলের মধ্যে ডুবছে ভাসছে। সূর্যোদয় সূর্যাস্তের সময় বুনো হাঁসের ঝাঁক খাবার খুঁজতে বেড়ার ধার পর্যন্ত চলে আসে, বিলের জলে জলপিঁপিঁগুলো চিঁ চিঁ করে। দুপুরবেলায় হাওয়ায় কাঁপানো ডনের বুক, সাদাপালকওয়ালা বালিহাঁসে বিচিত্র ও মধুর হয়ে ওঠে।

সে বছর চলতি পথে বহু পাখি এসে হাজির হল। ভোরের দিকে নদীর জলে যখন মদের মত লাল সূর্যোদয়ের ছটা রক্তের ছোপ ধরায়, কসাক জেলেরা জালের কাছে নৌকো বেয়ে যেতে যেতে প্রায়ই দেখতে পায়, জঙ্গলে ঢাকা জলের ওপর বুনো রাজহাঁস-গুলো চুপচাপ জিরোচ্ছে। কিন্তু খ্রিস্তোনিয়া আর মাৎভেই কাশুলিন গ্রামে যে খবর নিয়ে এল সেইটেই সবচেয়ে আজব। খামারের কাজের জন্যে গোটাকয়েক ওকের চারা খুঁজতে তারা গিয়েছিল সরকারী জঙ্গলে। একটা ঝোপের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় বাচ্চাশুদ্ধ একটা বুনোছাগলকে তারা চমকে দিল। রোগা, হলদে-বাদামি ছাগলটা কাঁটা গাছগাছড়াগজানো ফাঁকাজায়গা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এসে তাদের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল, সরু ঠ্যাংগুলো ভয় পেয়ে কাঁপতে লাগল। বাচ্চাটা গায়ের সঙ্গে লেপ্টে রইল। খ্রিস্তোনিয়া অবাক হয়ে আঁক্ করে উঠতেই, শব্দ শুনে ওকের চারাগুলোর মধ্যে এত জোরে দৌড়ে গেল, যে তার নীলচে-ধূসর খুর আর খাটো লেজের উটের মত রংটুকু তাদের চোখে পড়ল কি পড়ল না।

—'জিনিসটা কি?' অবাক হয়ে কুড়ুলটা মাটিতে ফেলে দিয়ে মাৎভেই কাশুলিন প্রশ্ন করল।

এক দুর্বোধ্য গর্বে খ্রিস্তোনিয়া যাদুমন্ত্রে স্তব্ধ বন কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল:

—'নিশ্চয়ই ছাগল। বুনো ছাগল! কার্পেথিয়ার পাহাড়ে আমি দেখেছি।'

—'তাহলে লড়াইয়ের সোরগোলে তাড়া খেয়ে স্তেপেতে ঢুকে পড়েছে।'

সায় দেওয়া ছাড়া ক্রিস্তোনিয়ার আর কোন উপায় রইল না। বলল: 'তা-ই হবে। ওর সঙ্গে বাচ্চাটা দেখেছেন? ভারী সুন্দর, মাইরি! যেন মা আর ছেলে।'

গ্রামে ফেরার সারাটা রাস্তা তারা এ অঞ্চলের এই অপ্রত্যাশিত আগন্তুকের কথাই আলোচনা করল। বুড়ো মাৎভেইর মনে সন্দেহ জাগতে লাগল। সে জিজ্ঞেস করল:

—'যদি ওটা ছাগলই হবে, তাহলে শিঙ্ কোথায় ছিল?'

—'শিঙ্ দিয়ে আপনি কি করবেন?'

—'শিঙ্ দিয়ে আমার দরকার নেই! শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম, যদি ছাগলই হবে, তাহলে ওটা ঠিক ছাগলের মত নয় কেন? শিঙ্ ছাড়া ছাগল দেখেছ কখনো? কথাটা হল এই। কোন জাতের বুনো ভেড়া হতে পারে তো?'

—'বুড়ো কত্তা, আপনাদের দিনকাল শেষ হয়ে গেছে!' ক্রিস্তোনিয়া চটে গেল। 'যান, মেলেখফদের বাড়ি গিয়ে দেখুন না। গ্রিগরের একটা ছাগলের লেজের চাবুক আছে। তাহলে তো আপনি বিশ্বাস করবেন না, কি?'

দেখা গেল, বুড়ো মাৎভেই সুযোগমত সেইদিনই মেলেখফদের বাড়ি গিয়ে হাজির হল। গ্রিগরের চাবুকের গোড়াটা যে বুনো ছাগলের ঠ্যাঙের চামড়ায় মোড়া তাতে ভুল নেই; এমন কি গোড়ার ছোট্ট খুরটাও পুরোপুরি তামার নালের সঙ্গে কায়দা করে লাগান আছে।

॥ দুই ॥

'লেণ্ট'-পরবের শেষ সপ্তাহে বুধবার দিন মিশা কোশেভয় বনের ধারে নদীতে পেতে-রাখা জাল দেখতে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ল। ঘর থেকে বেরুল ভোরের আগে। সকালের বরফে মাটি কঠিন আস্তরণে ঢাকা পড়েছে, পায়ের নীচে মচমচ করে ভেঙ্গে যাচ্ছে। মাথার পেছনদিকে টুপিটা ঠেলে দিয়ে, সাদা পশমি মোজার মধ্যে পা-জামা গুঁজে, ভোরের মন-মাতানো বাতাস আর মিস্টি সোঁদা গন্ধে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে, ঘাড়ের ওপর বিশাল একখানা বৈঠা ফেলে মিশা হেঁটে চলল। ধাক্কা দিয়ে নৌকোটা জলে নামিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শক্তহাতে বৈঠায় টান দিয়ে জোরে জোরে বাইতে লাগল।

জালগুলো সে টেনে টেনে দেখল, শেষেরটা থেকে একটা মাছ খুলে নিল, জালটা আবার জলে ফেলে রাখল, তারপর অনায়াসে নৌকো বাইতে বাইতে একটু তামাক টানতে ইচ্ছে হল। সূর্যোদয়ের ছটায় আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। পূবদিকের কুয়াশাচ্ছন্ন নীল আকাশখানাকে মনে হল, নীচে থেকে যেন রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছে। দিগন্তে রক্ত ঝরে পড়ছে, তারপর লালচে-সোনালি রঙ হয়ে উঠছে। সিগারেট ধরাতে ধরাতে মিশা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, একটা বুনো হাঁস আস্তে আস্তে উড়ে গেল। তামাকের ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে, গাছের ডালে গিয়ে আটকাতে লাগল, তারপর মেঘের মত হাওয়ায় ভেসে চলল। তিনটে মাঝারি জাতের স্টারলেট, সের চারেক কার্প আর এক রাশ

চুনোপুঁটি—ভোরের এই শিকারের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে ভাবল:

—'কিছুটা বেচতে হবে। শুকনো চোরির বদলে ট্যারা লুকিয়েশ্‌কা নেবে। তা দিয়ে মা আচার বানাতে পারবে।'

নৌকো বেয়ে সে ঘাটের কাছে এল। বাগানের বেড়ার ধারে যেখানে সে নৌকো রাখে, একটা লোক সেখানে বসে আছে। একটু কাছে আসতেই দেখতে পেল, ভালেত উবু হয়ে বসে খবরের কাগজ দিয়ে পাকানো বিশাল একটা সিগারেট টানছে। তার কুতকুতে ছোট ছোট চোখদুটো ঘুমপাওয়ার মত জ্বলজ্বল করছে; গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। মিশা চিৎকার করে বলল:

—'কি চাই হে?' গলার শব্দ জলের ওপর দিয়ে বলের মত গড়িয়ে গড়িয়ে গেল।

—'কাছে এসো।'

—'কিছু মাছ চাই নাকি?'

—'মাছ দিয়ে কি করব?'

কাশির একটা দমকে ভালেত কেঁপে কেঁপে উঠল, থুথু করে কফ ফেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল। তার বেমানান গ্রেটকোটটা কাক-তাড়ুয়ার কোটের মত ঝুলছে। খোঁচা খোঁচা ময়লা কানদুটো টুপির ঢাকার নীচে চাপা পড়েছে। একেবারে হালে সে গ্রামে ফিরে এসেছে, সঙ্গে এনেছে রেড গার্ড সেপাইয়ের সন্দেহজনক খ্যাতি। দল ভেঙ্গে যাবার পর এতদিন সে কোথায় ছিল, কসাকরা তাকে একথা জিজ্ঞেস করেছিল। বিপজ্জনক প্রশ্নগুলোকে এড়িয়ে ভালেত ভাসাভাসা উত্তর দিয়েছে। শুধু ইভান আলেক্সিয়েভিচ্‌ আর মিশা কোশেভয়-এর কাছেই স্বীকার করেছে চারমাস সে ইউক্রেনের রেড-গার্ডদলে ছিল, ইউক্রেনীয় জাতীয় বাহিনীর হাতে বন্দী হয়েছিল, সেখান থেকে পালিয়ে রোস্তোভের কাছে লাল-ফৌজে ঢুকে পড়েছিল, এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে সেবেস্তুরে ওঠার জন্য ছুটি পেয়েছে।

টুপিটা খুলে নিয়ে ভালেত শুয়োরের কুঁচির মত চুলে হাত বুলিয়ে নিয়ে চারপাশে তাকাল, তারপর নৌকোর কাছে এগিয়ে গিয়ে বিড়বিড় করে বলল:

—'ব্যাপার-স্যাপার বড্ড খারাপ—বড্ড খারাপ! তোমার মাছ ধরা বন্ধ রাখ। নইলে আমরা মাছই ধরে বেড়াব, সব কিছু ভুলে মারব।'

—'তোমার খবর কি?' আঁশটে-গন্ধ হাত দিয়ে ভালেতের হাতে চাপ দিয়ে একগাল হেসে মিশা জিজ্ঞেস করল। তারা বহুদিনের পুরনো বন্ধু।

—'গতকাল মিগুলিন্‌স্কের কাছে রেড-গার্ডরা চুরমার হয়ে গেছে। লড়াই শুরু হয়ে গেছে, ভায়া! তুলো উড়তে শুরু করেছে!'

—'কোন রেড-গার্ডরা? মিগুলিন্‌স্কে গেল কেমন করে?'

—'তারা এই জেলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। কসাকরা তাদের পাকড়াও করে ফেলেছে, বন্দীদের কারগিনে নিয়ে গিয়েছে। তারা এরই মধ্যে কোর্ট-মার্শাল শুরু করে দিয়েছে। আজ তাতার্স্কের সবাইকে ফৌজে ডাকতে আসবে।'

নৌকো বেঁধে কোশেভয় মাছগুলো ঝুড়িতে ঢালল, তারপর আবার লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। বাচ্চাঘোড়ার মত তার সামনে লাফাতে লাফাতে ভালেতও চলল। কোটের ঝুলটা পত পত করে উড়তে লাগল, হাতদুটো দুলতে লাগল।

—'ইভান আলেক্সিয়েভিচ্‌ আমাকে বলল। আমাকে সে এক্ষুণি ছুটি করে দিল; কারখানা সারারাত ধরে চলেছে। একজন অফিসার মোখোভের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

মিশার বহুবছরের লড়াইতে পোড়খাওয়া ফ্যাকাশে মুখে উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠল। আড় চোখে ভালেতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

—'এখন কি হবে?'

—'আমাদের গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে।'

—'কোথায় পালাবে?'

—'কামেনস্কায়।'

—'কিন্তু সেখানকার কসাকরা তো বিরোধী।'

—'তাহলে আরও বাঁ-দিকে।'

—'কি করে গলিয়ে যাবে?'

ইচ্ছে থাকলেই তা করা যায়। ইচ্ছে না হলে, ঘরে বসে থাক, মরো!' ভালেত খেঁকিয়ে উঠল। 'কোথায় যাবে' 'কোথায় যাবে'? তা আমি কি করে জানব? চারধারে দেখেশুনে গলিয়ে যাবার পথ খুঁজে নেওয়া যাবে।'

—'রাগ করো না। ইভান কি বলে?'

—'ইভানকে নড়াতে নড়াতেই. '

– 'অত জোরে না! একটা মেয়েছেলে তাকিয়ে আছে।'

এক অল্পবয়সী মেয়েছেলে উঠোন থেকে গরু বার করে দিচ্ছে। তার দিকে তারা ভয়ে ভয়ে তাকাল। রাস্তার প্রথম মোড়ে এসেই মিশা পেছন ফিরল। ভালেত অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল:

—'যাচ্ছ কোথায়?'

পেছনে না তাকিয়েই মিশা বিড়বিড় করে বলল:

—'জালগুলো তুলে আনতে যাচ্ছি।'

—'কি জন্যে?'

—'ওগুলো খোয়াতে চাইনে।'

—'তাহলে আমরা যাচ্ছি?' খুশী হয়ে ভালেত বলে উঠল।

বৈঠেটা নাড়িয়ে চলতে চলতে মিশা বলল:

—'ইভান আলেক্সিয়েভিচের ওখানে চলে যাও। জালগুলো বাড়ি রেখেই আমি আসছি।'

॥ তিন ॥

ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ এরই মধ্যে খবরটা সহানুভূতিসম্পন্ন কসাকদের জানিয়ে দিতে পেরেছে। ছোট ছেলেটাকে মেলেখফদের ওখানে পাঠিয়েছিল, গ্রিগর তার সঙ্গেই এসেছে। খবর না পেয়েই ক্রিস্তোনিয়া এসে হাজির হয়েছে, আগে থেকেই সে আসন্ন বিপদের গন্ধ পায়। কিছুক্ষণ পরে কোশেভয়ও হাজির হল; তারা পরিস্থিতি আলোচনা করতে বসল। যে কোন মুহূর্তে পাগলা-ঘণ্টি বেজে উঠতে পারে এই আশঙ্কায় তারা তড়বড় করে একই সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। গরম গরম কথা বলে ভালেত তাদের তাতাতে লাগল:

—'চল আমরা এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ি। আজই ওরা লাগাম পরিয়ে দেবে।'

—'তোমার কারণগুলো আমাদের বল? কেন আমরা যাব?' ক্রিস্তোনিয়া প্রশ্ন করল।

—'কি বলছ, 'কেন আমরা যাব'? তারা যে ফৌজে নাম লেখাবার হুকুম জারী করবে। তুমি কি ভাবছ এড়াতে পারবে?'

—'আমি যাব না, তাহলেই সব মিটে যাবে।'

—'ঘাড় ধরে নিয়ে যাবে!'

—'নিক তো দেখি! আমি তো আর যোয়ালের বলদ নই।'

ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ তার ট্যারা বউটাকে বাইরে পাঠিয়ে দিল, তারপর চটে-মটে নাকের আওয়াজ করে বলল:

—'ধরে নিয়ে যাবেই! ভালেত ঠিকই বলেছে। কিন্তু আমরা যাব কোথায়? সেইটেই হল প্রশ্ন।'

—'সে কথাতো আমি আগেই ওকে বলেছি।' মিশা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—'বেশ, তোমাদের যা খুশি তাই কর। তোমরা কি ভাব, তোমাদের মত লোকের আমার দরকার পড়েছে।' ভালেত দাঁত খিঁচিয়ে উঠল। 'আমি একাই সরে পড়ব। কোন বিপ্লবের শত্রুকে আমি সঙ্গে নিতে চাই না। 'ঠিক বটে কিন্তু কেন'! 'ঠিক বটে, কিন্তু কোথায়'! বেশ গরম গরম দেবে ওরা, বলশেভিক মতের জন্যে জেলে নিয়ে পুরবে। বসে বসে রং তামাসা করছ কি করে? এখন এই রকম সময়ে? সব কিছু জাহান্নামে যাবে!'

দেয়াল থেকে খুলে নেওয়া একটা মরচেধরা পেরেক, চাপা ক্রোধে হাতের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে গ্রিগর স্পষ্টভাষায় ভালেতকে দমিয়ে দিল:

—'বেশি বোকো না! তোমার কথা আলাদা, তোমার যেখানে খুশি সেখানেই যেতে পার! কিন্তু আমাদের ভালভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমার বৌ রয়েছে, দুটো ছেলেমেয়ে রয়েছে। তুমি যে চোখে দেখছ আমি তা পারি না।' কালো ক্রুদ্ধ চোখদুটো কুঁচকে, দাঁত খিঁচিয়ে সে চিৎকার করে উঠল: 'যত খুশি বচন ঝাড়তে পার, ঝাড়ো, বাক্যবাগীশ! তুমি যা ছিলে তাই থাকবে। গায়ের জামাটা ছাড়াতো আর কিছুই নেই তোমার..'

—'গাঁক গাঁক করছ কিসের জন্যে?' ভালেতও চেঁচিয়ে উঠল। 'অফিসারী কায়দা দেখাচ্ছ! চেঁচিও না। তোমার তোয়াক্কাও আমি করি না।' তার খাঁদা নাকটা রাগে সাদা হয়ে গেল, কুতকুতে চোখদুটো দুঃখে চকচক করে উঠল।

রেড-গার্ডরা জেলায় যে-বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সেই খবরে গ্রিগরের মানসিক শান্তি বিচলিত হওয়ায় যে-রাগ জমেছিল ভালেতের ওপরেই তা উগরে দিয়েছিল। এবার থাপ্পড় খেয়ে যেন সে লাফিয়ে উঠল; ভালেত যে টুলের ওপরে বসে ছটফট করছিল, লম্বা লম্বা পায়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাপ্পড় মারার ইচ্ছেটা অতি কষ্টে দমন করে বলল:

—'চুপ, শয়তান! নাকের শিকনি! ঠুঁটো জগন্নাথ! তুই হুকুম করার কে? তোর যেখানে খুশি সেখানে যা! ভাগ এখান থেকে, নইলে পচা গন্ধ ছড়াবি! একটা কথা বলবি নে, 'যাচ্ছি' বলবারও দরকার নেই।'

—'থামো, গ্রিগর! এটা উচিত হচ্ছে না!' ভালেতের নাকের সামনে থেকে গ্রিগরের পাকানো মুঠোটা সরিয়ে দিয়ে কোশেভয় চেঁচিয়ে উঠল। 'তোমার ও সব কসাক অভ্যেস ছাড়া উচিত। লজ্জা করে না তোমার? ছি ছি, মেলেখফ। ছি ছি!'

অপরাধীর মত কাশতে কাশতে ভালেত উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। চৌকাঠ-পর্যন্ত পেঁাছে আর সে নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, বাক্যবাণে গ্রিগরকে বিঁধল:

—'আর উনি ছিলেন রেড-গার্ড দলে! জারের চৌকিদার! তোর মত লোককে আমরা গুলি করে মেরেছি...'

এতে গ্রিগরও নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না। এমনভাবে লাফ দিয়ে উঠল যেন সে রবারের তৈরি: ধাক্কা মেরে ভালেতকে বারান্দায় ফেলে দিয়ে বুটশুদ্ধ পা-দুটো মাড়িয়ে দিল; বিশ্রী গলায় সে তড়পাতে লাগল:

—'ভাগ এখান থেকে, নইলে ঠ্যাং দুটো ছিঁড়ে ফেলব।'

সায় না দিয়ে মাথা নাড়ল ইভান আলেক্সিয়েভিচ, গ্রিগরের দিকে বিরূপ দৃষ্টিতে তাকাল। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মিশা চুপচাপ বসে পড়ল, স্পষ্টই বোঝা গেল, জিভের ডগায় যে রাগের কথাগুলো এসে পড়ছে তা সামলাবার চেষ্টা করছে।

—'আরে, লোকে কি করবে না করবে ও তা বলতে আসে কেন? আমাদের সঙ্গে ওর মত মিলছে না কেন?' একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গ্রিগর নিজের আচরণকে চোখ-সহা করার চেষ্টা করল। ক্রিস্তোনিয়া তার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল। তার চোখে চোখ পড়তেই গ্রিগর শিশুর মত সহজ সরল হাসি হাসল। 'ওকে প্রায় মেরে বসেছিলাম আর কি! একখানা ঝেড়ে দিলেই রক্তারক্তি হয়ে যেত!'

—'যাক, কি ভাবছ বল? আমাদের একটা সিদ্ধান্তে পেঁাছুতে হবে তো।'

প্রশ্নটা করল মিশা কোশেভয়; তার ইস্পাতকঠিন দৃষ্টিতে নড়ে চড়ে, বেশ একটু চেষ্টা করেই ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ উত্তর দিল:

—'কি ভাবছি, মিখায়েল? একদিক থেকে গ্রিগরই ঠিক। ঝটপট জিনিসপত্তর নিয়ে পালাই কি করে? পরিবারের কথাও তো ভাবতে হবে। এখন একটু দেখা যাক।' মিশার অধৈর্য দৃষ্টি লক্ষ্য করে সে বলে চলল 'হয়ত কিছুই হবে না...কে বলতে পারে? সিয়েব্রাকোভে ওরা দলটাকে ভেঙ্গে দিয়েছে, আর কেউ আসবে না। আমার বৌ আছে, ছেলেপুলে আছে, কাপড়চোপড় ছিঁড়েছে, ঘরে ময়দা নেই। তাই যাই কি করে? ওদের দেখবে কে?'

মিশা বিরক্তিতে ভুরু উঁচিয়ে মাটির মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। আস্তে আস্তে বলল:

—'তাহলে পালাবার কথা ভাবছ না?'

—'আমি ভাবছি অপেক্ষা করে দেখাই ভাল। পালাবার সময় কখনো যাবে না। কি বল হে, গ্রিগর? আর, ক্রিস্তোনিয়া তুমি?'

ইভান ও ক্রিস্তোনিয়ার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সমর্থন পেয়ে গ্রিগর আরও উত্তেজিত হয়ে বলল:

—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই: এই কথাই তো আমি বলছিলাম। এই জন্যেই তো ভালেতের সঙ্গে লেগে গেল। সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে নাকি? এক, দুই, ব্যস অমনি লাগাও ছুট! ভেবে চিন্তে দেখতে হবে...আমার কথা, ভেবে চিন্তে দেখ।'

সে শেষ করতেই হঠাৎ গির্জার গম্বুজ থেকে ঘণ্টা বেজে উঠল, আর সেই শব্দ বারোয়ারিতলায়, রাস্তায়, গলিতে বন্যার মত ছড়িয়ে পড়ল। ঘোলাটে বানের জলের মাথার ওপর দিয়ে, পাহাড়ের ভিজে, খড়িরঙের ঢালু বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তার রণরণি টুকরো টুকরো হয়ে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। তারপর আরও একবার অস্বস্তিকর অবিশ্রান্ত বাজতে শুরু করল:

—'ঢং ঢং ঢং ঢং...'

—'ওই শুরু হয়ে গেল!' ক্রিস্তোনিয়া চোখ পিটপিট করল। 'আমি নৌকোয় গিয়ে উঠছি। ওপারে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে। তারপর খুঁজে বার করুক দেখি আমাকে!'

—'বেশ, এখন কি হবে?' কোশেভয় বুড়ো মানুষের মত নিজেকে কোন রকমে টেনে তুলল।

—'আমরা এক্ষুণি যাচ্ছিনা।' আর সকলের হয়ে গ্রিগরই উত্তরটা দিল।

মিশা আর একবার ভুরু উঁচাল, কপাল থেকে সোনালী চুলের একটা ভারী গোছা পেছনে সরিয়ে দিল। বলল:

—'আচ্ছা, চলি...আমাদের রাস্তা এখন পৃথক, এটা পরিস্কার হয়ে গেল।'

ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ যেন ক্ষমা চাইল এমনভাবে হাসল:

—'তোমার বয়স কম, মিশা, রক্ত টগবগে। তুমি ভাবছ রাস্তা আর এক হবে না? হবে হবে! নিশ্চিন্ত থাক তুমি!'

অন্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে চলে এল কোশেভয়। উঠোনের মাঝ বরাবর পাশের মাড়াই উঠোনোর দিকে চলল। ভালেত গর্তের মধ্যে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে বসে ছিল। সে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল মিশা ওই রাস্তায় যাবে। উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল:

—'তারপর?'

—'ওরা আসবে না।'

—'গোড়া থেকেই জানতাম, আসবে না। ওরা দুর্বল. .আর গ্রীসকা—তোমার ওই দোস্তটা একটা খ্যাপা কুকুর। ও শুধু নিজেরটুকুই জানে। শুয়োরটা আমাকে অপমান করল! ওর গায়ে জোর আছে, শুধু এই জন্যে। আমার কাছে হাতিয়ার ছিল না, নইলে ওকে খুন করে ফেলতাম।' বলতে বলতে তার গলা ধরে এল।

তার পাশে পাশে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে চলতে শুয়োরের কুঁচির মত চুলের দিকে তাকিয়ে মিশা মনে মনে ভাবল, 'আর সেও ওকে খুন করে ফেলত, জানোয়ার কোথাকার!'

তারা চোটপায়ে হাঁটতে লাগল, ঘণ্টার প্রত্যেকটি আওযাজ যেন চাবুক মেরে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। মিশা বলল: 'আমার বাড়িতে চলে এসো। কিছু গিলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। পায়ে হেঁটেই যাব; আমি ঘোড়াটা রেখে যাব। তোমার কিছুই নেবার নেই?'

—'আমার কিছুই নেই।' ভালেত মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'দালান কোঠা কিংবা জমিদারি কেনার মত তো আর টাকা জমাতে পারিনি। এমন কি গত পনের দিনের মাইনেও পাইনি। ভুঁড়িওয়ালা মোখোভ তাই নিয়ে আরও মোটা হক! মাইনে দিতে হল না দেখে আনন্দে হাত তুলে নাচবে।'

ঘণ্টা বাজা থামল। তন্দ্রাচ্ছন্ন অখণ্ড স্তব্ধতা। রাস্তার ধারে ধারে ছাইয়ের গাদায় মুরগীর বাচ্চাগুলো ঠুকরে বেড়াচ্ছে, বাছুরগুলো বেড়ার নীচে ঘাসপাতা খুঁজছে। মিশা পেছন ফিরে তাকাল: কসাকরা তাড়াহুড়ো করে বারোয়ারিতলার সভায় ছুটছে, কেউ কেউ চলতে চলতেই জামার বোতাম আটকে নিচ্ছে। একজন ঘোড়সোয়ার বারোয়ারি-তলার মধ্যে জোরসে ছুটে গেল। ইস্কুলের পাশে একটা ভিড় জমেছে; মেয়েদের মাথায় সাদা রুমাল, পরনে সাদা ঘাঘরা, পুরুষের কালো পোশাক।

কলসি নিয়ে চলতে চলতে একটি মেয়েছেলে তাদের রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে পড়ল, তার কুসংস্কার, সামনে দিয়ে রাস্তা পেরুবে না। সে চটে-মটে বলল:

—'চলে আয়, চলে আয়! আমি তোদের সামনে দিয়ে রাস্তা পেরুব না।'

মিশা তাকে নমস্কার করতেই হাসিতে ঝলমলে হয়ে সে জিজ্ঞেস করল:

—'কসাকরা সবাই সভায় যাচ্ছে। তোরা কোথায় যাচ্ছিস। অন্য রাস্তায় যাচ্ছিস যে, মিশা।'

—'বাড়িতে একটু কাজ আছে।' মিশা উত্তর দিল।

তারা একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে দেখা যায় মিশাদের বাড়ির ছাদে একটা শুকনো চেরিডালে বাঁধা পাখির খাঁচাটা বাতাসে দোল খাচ্ছে। উঁচু টিলাটার ওপর হাওয়া-কলের পালগুলো আস্তে আস্তে ঘুরছে, পালের ছেঁড়া কাপড় পত পত করে উড়ে উড়ে খাড়া ছাদের পাতলোহার গায়ে বাড়ি মারছে।

রোদ খুব জোরালো না হলেও, বেশ গরম। ডনের দিক থেকে তাজা হাওয়া বইছে। এক উঠোনে জনকয়েক মেয়ে বিশাল একটা ঘরের দেয়ালে কাদা লেপছে, ইস্টার পরবের জন্যে চুনকাম করে রাখছে। একজন গোবর দিয়ে মাটি মাখছে। ঘাঘরাটা উঁচু করে ধরে গোল হয়ে ঘুরছে, এঁটেল কাদার মধ্যে থেকে অতিকষ্টে গোলগাল পা দুটো টেনে টেনে তুলছে। আঙুলের ডগায় ঘাঘরাটা আটকে রেখেছে, সুতির ফিতেটা হাঁটুর ওপরে টেনে তোলা, মাংসের মধ্যে শক্ত হয়ে কেটে বসেছে। রুমালে চোখ পর্যন্ত মুখ ঢেকে অন্য দুজন মই বেয়ে নল-খাগড়ার চাল অবধি উঠে চুনকাম করছে। জামার হাতা কনুইএর ওপরে গুঁজে সামনে পেছনে তুলি টানছে, গায়ের ওপর চুনকাম ছটকে পড়ছে। কাজ করতে করতে তারা গান গাইছে। সকলের বড় মারিয়া—বোগাতিরিয়েভের এক ছেলের বিধবা বৌ,—প্রকাশ্যেই মিশার মনজয়ের চেষ্টায় আছে। মুখে দাগ সত্বেও মেয়েটা সুশ্রী। গলার স্বর প্রায় পুরুষোচিত, সারা গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত। নীচু গলায় সে গাইল:

'হায়রে, এমন কেউ কাঁদেনা আর...'

অন্যেরা গানের কথাগুলো ধরে নিল। তিনটি গলায় অকপট, অনুযোগের, তিক্ত গান সুরেল্য হয়ে বেজে চলল:

'যুদ্ধে গিয়ে আমার বঁধুর মত।
বঁধু আমার চোস্ত্ গোলন্দাজ,
সারা সময় আমার কথাই ভাবে।'

গানটা শুনতে শুনতে মিশা আর ভালেত বেড়ার খুব কাছে চলে এল:

'হঠাৎ এল লেখন, তাতে লেখা
আমার বঁধু হঠাৎ গেছে মারা।
হায়রে, বঁধু নেইরে, মারা গেছে
ঝোপের নীচে এখন আছে শুয়ে।'

রুমালের নীচে মারিয়ার উষ্ণ নিবিড়, কটাশে, চোখদুটো চকচক করে উঠল, নীচের দিকে ঝুঁকে সে মিশার দিকে তাকাল। চুনকামের ছিট-লাগা মুখখানা হাসিতে ঝলমল করে উঠল। গম্ভীর, কামনাতপ্ত গলায় গাইল:

'তার সেই চুল, সোনালী চুলের গোছা,
দমকা হাওয়ায় এধার ওধার ওড়ে।
তার সেই চোখ, গাঢ় দুটি কালো চোখ,
কালো দাঁড়কাক ঠুকরে নিয়েছে তুলে।'

মিশা কোমল হাসি হাসল; তার এই হাসিটুকু সবসময়েই মেয়েদের জন্যে তোলা থাকে। মারিয়া চারপাশে তাকাল, তার পর মই থেকে ঝুঁকে বলল:

—'কোথায় গিয়েছিলে, গো?'

—'মাছ ধরতে।'

—'বেশিদূর যেওনা। গোলাঘরে গিয়ে একটু জড়াজড়ি করব।'

—'থাম বেহায়া ছুঁড়ী!'

মারিয়া জিভ দিয়ে টকাস করে আওয়াজ করল, তারপর হেসে উঠে ভিজে তুলিটা মিশার দিকে দোলাল। মিশার জামায় টুপিতে চুনের ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ল।

—'অন্তত ভালেতকেও ধার দিয়ে গেলে পারতে। ঘর সাফাইতে হাত লাগাতে পারত।' দুধের মত সাদা দাঁতগুলো বার করে হাসতে হাসতে অন্যজন তাদের পেছনে চিৎকার করে বলল। মারিয়া তাকে অস্ফুটকণ্ঠে কি যেন বলতেই তারা হো হো করে হেসে উঠল।

—'ছেনাল মাগীরা!' ভালেত ভুরু কুঁচকে জোরে জোরে পা চালিয়ে দিল। কিন্তু ম্লান, শান্ত হাসি হেসে মিশা তাকে শুধরে দিয়ে বলল:

—'ছেনাল নয়, শুধু ফুর্তিবাজ।' গেটের মধ্যে দিয়ে উঠোনে ঢুকতে ঢুকতে আরও বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি বটে কিন্তু আমাব ভালবাসার জনকে পেছনে ফেলে যাচ্ছি।'

॥ চার ॥

কোশেভয় চলে যাবার পর কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে রইল। গ্রামের মাথার ওপরে পাগলা-ঘণ্টি বেজে চলল, ঘরের ছোট ছোট শার্সিগুলো খট খট করে নড়তে লাগল। ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। চালাঘরের সকালের ছায়া টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে পড়েছে। তাজা ঘাসের ওপরে শিশিরের ধূসর আস্তরণ পড়েছে। কাঁচের ভেতর থেকেও দেখা যায় আকাশ গাঢ় নীল। ক্রিস্তোনিয়া মাথা নীচু করে বসেছিল, সেই দিকে তাকিয়ে ইভান বলল

—'হয়ত এখানেই ইতি হয়ে যাবে? মিগুলিন্স্কের লোকেরা রেড-গার্ডদের চুরমার করে দিয়েছে আর তারা আসবে না..'

—'না!' গ্রিগরের সারাদেহ মুচড়ে উঠল। 'ওরা শুরু করেছে ওরা চালিয়ে যাবেই। আচ্ছা, আমরা কি বারোয়ারিতলায় যাব?'

ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ টুপিটা নিতে হাত বাড়াল। সন্দেহ প্রকাশ করে প্রশ্ন করল·

– 'আমরা হয়ত শেষটায় মরচে ধরে গেলাম? মিখায়েলের মাথা গরম, কিন্তু সে কাজের ছেলে। আমাদেব দুযো দিয়ে গেল।'

কেউ উত্তর দিলে না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে তারা বারোয়ারিতলার দিকে চলল।

মাটির দিকে চোখ রেখে চিন্তা করতে করতে ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল। সে ভুল পথে চলেছে, বিবেকের নির্দেশ সে মানেনি, এই চিন্তাটাই

তাকে পীড়া দিতে লাগল। ভালেত আর মিশা ঠিক কাজ করেছে, বিনা দ্বিধায় তাদেরও চলে যাওয়া উচিত ছিল। নিজের আচরণকে সমর্থন করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। ঘোড়া যেমন করে পায়ের খুর দিয়ে মাঠের পাতলা বরফ গুঁড়িয়ে ফেলে, তার অন্তরেও এক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, বিদ্রুপাত্মক কণ্ঠস্বর তাদের গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলল। একটি সিদ্ধান্তই তার মনে জোরদার হয়ে উঠল, প্রথম সুযোগেই সে বলশেভিকদের দিকে পালাবে। বারোয়ারিতলার দিকে যেতে যেতে এই সিদ্ধান্তই মনে মনে স্পষ্ট নির্দিষ্ট হয়ে উঠল, কিন্তু সে কথা সে ক্রিস্তোনিয়াকেও বলল না, গ্রিগরকেও না; শোকাচ্ছন্নের মত অনুভব করতে লাগল, ওদের মনের মধ্যে যে লড়াই চলছে, তা তার চেয়ে পৃথক; আর মনের গভীরে সে ইতিমধ্যে ওদের জন্যে ভীত হয়ে উঠেছে। তিনজনেই একসঙ্গে তারা ভালেতের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, প্রত্যেকেই পরিবারের ওজর দেখিয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকেই জানে সে ওজর অমীমাংসিত. তাদের আচরণের সমর্থন তাতে হয় না। এখন প্রত্যেকেরই অপরের সঙ্গ বিশ্রী লাগছে, যেন তারা নোংরা, লজ্জাকর কিছু একটা করে ফেলেছে। এতক্ষণ সবাই চুপচাপ ছিল, কিন্তু মোখোভের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে ইভান আলেক্সিয়েভিচ্ আর এই অস্বস্তিকর স্তব্ধতা সহ্য করতে না পেরে বলে উঠল:

—'লুকিয়ে চুরিয়ে লাভ নেই। লড়াই থেকে আমরা বলশেভিক হয়ে ফিরে এলাম, আর এখন ঝোপের নীচে সেঁধুচ্ছি। আমাদের জন্যে অন্য সবাই লড়ুক, আমরা মাগ নিয়ে ঘরে বসে থাকব!'

—'আমি আমার ভাগের লড়াই লড়েছি, এখন অন্যেরা লড়ুক।' গ্রিগর দাঁত খিঁচিয়ে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে নিল।

—'আর ওরা কি?' ক্রিস্তোনিয়া টিপ্পনী কাটল। 'একদল ডাকাত! যাওয়া উচিত ওদের সঙ্গে? ওদের কোন জাতের রেড-গার্ড বলে? মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার করছে, কসাকদের সব লুটে পুটে নিচ্ছে। কি করছি, তা আমাদের চোখ তাকিয়ে দেখতে হবে। অন্ধ সবসময়ে চেয়ারের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে মরে।'

—'এসব তুমি চোখে দেখেছ, ক্রিস্তোনিয়া।' ইভান কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল।

—'লোকে বলাবলি করছে...'

—'ও...লোকে বলছে...'

॥ পাঁচ ॥

কসাকদের পট্টিদেওয়া পা-জামা আর টুপিতে বারোয়ারিতলা ঝলমল করছে, এখানে ওখানে একটা দুটো ঝাঁকড়ালোমের ভালো টুপিও চোখে পড়ে। কোন মেয়েছেলে নেই, শুধু বুড়োরা, লড়াই-ফেরতা বয়স্ক আর অল্পবয়সী ছোকরারা। থুনথুনে বুড়োরা সামনে লাঠি ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে: তারা বিনা মাইনের হাকিম, গির্জার পরিষদের সদস্য, ইস্কুলের পরিচালক, গির্জার তত্বাবধায়ক। গ্রিগর তার বাবার কাঁচা-পাকা দাড়িটা খুঁজতে লাগল; দেখতে পেল, বাবা মিরন গ্রিগরিয়েভিচের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সামনেই পার্টাকলে রঙের পুরোউর্দি চাপিয়ে, মেডেল এঁটে বুড়ো গ্রীসাকা গিঁটতোলা লাঠিটায় ভর দিয়ে রয়েছে। মিরন আর পান্তালিমনের সঙ্গেই

গ্রামের মাতব্বররা। তাদের পেছনে অল্পবয়সীরা, গ্রিগরের সঙ্গে তাদের অনেকেই লড়াই করেছে। গ্রিগর দেখতে পেল, ঘরের অন্যদিকে তার দাদা পিয়োত্র দাঁড়িয়ে আছে। সেণ্ট জর্জ-ক্রুশের গোলাপী-কালো ফিতের জামাটার বাহার খুলেছে। বাঁদিকে মিৎকা কোরশুনোভ প্রোখোর ঝিকোভের হাত থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিচ্ছে। সবার পেছনে ভিড় করে আছে উঠতি বয়সের কসাকরা। ঘরের মাঝখানে নরম ভিজে মাটিতে একটা নড়বড়ে টেবিলের চারটে পায়া চেপে বসানো। টেবিলের পাশে গ্রামের বিপ্লবী কমিটির সভাপতি বসে। ফিতে দেওয়া খাঁকি টুপি, তকমাআঁটা চামড়ার জ্যাকেট আর খাঁকি চোস্তপরা এক লেফটানাণ্ট—গ্রিগর তাকে চেনে না—পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বিপ্লবী কমিটির সভাপতি তার সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। অফিসারটি সামনে একটু ঝুঁকে সভাপতির দাড়ির সঙ্গে কান লাগিয়ে শুনছে। গোটা জমায়েত মৌ-চাকের মত স-রব। কসাকরা গল্পগুজব, হাসি ঠাট্টা করছে বটে, কিন্তু তাদের চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ। একজন আর না থাকতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল:

—'শুরু করে দিন! দেরি করছেন কেন? প্রায় সকলেইত এখানে এসে গিয়েছে।'

অফিসারটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে টুপিটা খুলে নিল। তারপর যেন নিজের পরিবার-পরিজনদের সঙ্গে কথা বলছে এমন সহজভাবেই বলতে লাগল·

—'গ্রামের মাতব্বররা, আর আপনারা, লড়াইফেরতা কসাকরা! সিয়েস্ত্রাকোভ গ্রামে কি ঘটেছে তা আপনারা সবাই জানেন? দু'একদিন আগে রেডগার্ডদের একটা দল গ্রামে এসে পৌঁছেছিল। জার্মানরা ইউক্রেন দখল করেছে, আর ডন প্রদেশের দিকে এগিয়ে আসার মুখে তারা রেডগার্ডদের রেল লাইন থেকে পেছনে হটিয়ে দিয়েছে। রেড-গার্ডবা গ্রামে ঢুকেই কসাকদের সম্পত্তি লুটপাঠ তাদের মেয়েদেব ধর্ষণ, বে-আইনী গ্রেপ্তার ইত্যাদি নানারকম ব্যাপার করতে শুবু করেছিল। কি ঘটেছে জানতে পেরে আশেপাশের গ্রামের লোকেরা হাতিয়াব নিয়ে· তাদের ওপর ঝাঁপিযে পড়ে। দলের অর্ধেক মারা পড়ে, বাকী সবকে বন্দী করা হয়। মিগুলিন্স্ক আর কাঝান্স্ক জেলার কসাকবা তাদের এলাকা থেকে বলশেভিক সরকারকে উচ্ছেদ করেছে। ডনের শান্তিরক্ষার জন্যে ছোটবড় সমস্ত কসাকই কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। ভিয়েশেন্স্কায় বিপ্লবী কমিটিকে ঝাড়ে বংশে উচ্ছেদ করা হযেছে, জেলার আতামান নির্বাচন করা হয়েছে; বেশির ভাগ গ্রামেই এই একই ব্যাপার ঘটেছে।'

বক্তৃতাব এইখানে বুড়োরা চাপা ক্ষোভে বিড়বিড় করে কি যেন বলল, আর ফাঁদে পড়া নেকড়ের মত বিপ্লবী কমিটির সভাপতি তার চেয়ারে ছটফট করে উঠল।

—'সব জায়গাতেই দল বাঁধা হচ্ছে। এই বর্বর, ডাকাতদের হাত থেকে জেলাকে বাঁচানোর জন্যে লড়াই ফেরতা কসাকদের নিয়ে আপনাদেরও দল বাঁধা উচিত। আমরা নিজেদের শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলব। বলশেভিক সরকার আমরা চাইনে, তাতে শুধু ব্যাভিচারই আনবে, স্বাধীনতা আনবে না! ওই 'চাষারা' আমাদের স্ত্রী ভগিনীদের ধর্ষণ করবে, আমাদের গ্রীকমঠের ধর্মবিশ্বাসকে ঠাট্টার বস্তু করে তুলবে, পবিত্র মন্দির অপবিত্র করবে, আমাদের ধনসম্পত্তি লুঠ করবে এ আমরা হতে দেব না। আপনারা মাতব্বররা কি একমত?'

গোটা জমায়েতই বজ্রগর্জন করে উঠল, 'একমত, একমত'। অফিসারটি এক ঘোষণাপত্র পড়তে শুরু করে দিল। কাগজপত্র ফেলে রেখেই সভাপতি টেবিলের সামনে থেকে কেটে পড়ল। একটি কথাও না বলে মাতব্বররা শুনতে লাগল। পেছনের লড়াই ফেরতা কসাকরা নিজেদের মধ্যে প্রাণহীনের মত ফিসফিস শুরু করল।

অফিসার পড়া শুরু করতেই গ্রিগর ভিড়ের মধ্যে থেকে গলিয়ে বেরিয়ে বাড়ির পথ ধরল। সে চলে যাচ্ছে তা মিরন গ্রিগরিয়েভিচের নজরে পড়ল; পান্তালিমনকে কনুয়ের গুঁতো মেরে সে ফিসফিস করে বলল:

—'তোমার ছোট ছেলে—কেটে পড়ছে যে!'

ঘেরের মধ্যে থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এসে পান্তালিমন চোখ পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

—'এই, গ্রিগর!'

অর্ধেক ঘুরে, পেছনে না তাকিয়েই গ্রিগর থেমে গেল।

—'ফিরে আয়, বাবা!'

—'চলে যাচ্ছ কেন হে? ফিরে এসো!' ভিড়ের মধ্যে থেকে বহুকণ্ঠের গর্জন উঠল; মুখের একটা পাঁচিল যেন গ্রিগরের দিকে ঘুরে গেল।

—'উনি আবার অফিসার ছিলেন!'

—'ও নিজেইত বলশেভিকদের মধ্যে ছিল।'

—'অনেক কসাকের ও রক্তপাত করেছে!'

—'লাল শয়তান!'

তাদের চিৎকার গ্রিগরের কানেও পৌঁছুল। দাঁতে দাঁত ঘসে সে শুনল; স্পষ্টই বোঝা গেল, সে নিজের সঙ্গে যুঝছে। মনে হল, পেছনে না তাকিয়ে যেন সেই মুহূর্তেই সে চলে যাবে। কিন্তু ইতস্তত করে তারপর মাটির দিকে চোখ রেখে তাকে ভিড়ের দিকে ফিরতে দেখে পান্তালিমন আর পিয়োত্রা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

ধমকেধামকে বুড়োরাই সবকিছু চালিয়ে নিয়ে গেল। অস্বাভাবিক তাড়াহুড়ো করে মিরন গ্রিগরিয়েভিচ্‌কে আতামান নির্বাচিত করা হল। মেচেতাপড়া ফ্যাকাশে মুখে ঘেরের মধ্যে গিয়ে পূর্বতনের হাত থেকে সে আতামান ক্ষমতার প্রতীক তামা-বাঁধানো লাঠিটা হাতে নিল। আগে কোনদিন সে আতামান হয়নি। তার নাম উঠলে প্রথমে ইতস্তত করে, নিজে নিরক্ষর এই অজুহাত তুলে অস্বীকার করল, সবিনয়ে জানাল, সে এ পদের যোগ্য নয়। কিন্তু বুড়োরা জেদ ধরে রইল; নির্বাচনের পারিপার্শ্বিক আর জেলার আধা-যুদ্ধের অবস্থাটা এমনই অস্বাভাবিক যে অবশেষে তাকে স্বীকার করে নিতে হল। নির্বাচনটা ঠিক আগের দিনের নির্বাচনের মত হল না। আগের দিনের নির্বাচনে জেলার আতামান গ্রামে এসে বাড়ির কর্তাদের সব জমায়েতে ডাকত, তারপর ভোট নেওয়া হত। এখন শুধু বলা হল: 'যাঁরা কোরশুনোভের দিকে, তাঁরা ডান দিকে যান,' আর অমনি হুড়মুড় করে সবাই সেই দিকেই গেল। এক মুচির রাগ ছিল কোরশুনোভের ওপর, সে-ই শুধু মাঠের মাঝখানে বাজ-পড়া ওকগাছের মত নিজের জায়গায় একা দাঁড়িয়ে রইল।

মিরন চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই লাঠিটা তার হাতের মধ্যে গুঁজে দেওয়া হল, আর অমনি গর্জন উঠল:

—'আমাদের খাওয়ানোর কি হবে হে?'

—'নতুন আতামানকে কাঁধে তুলে নাও!'

অফিসারটি কিন্তু বাধা দিয়ে বাকী সমস্যাগুলোর কার্যকরী সমাধানের দিকে বেশ কায়দা করে এগিয়ে নিয়ে গেল। গ্রামের দলের কমাণ্ডার নির্বাচনের প্রশ্নটা তুলল। সে নিশ্চয়ই ভিয়েশেন্‌স্কায় গ্রিগরের কথা শুনেছিল, কারণ সে গ্রিগর আর গ্রিগরের প্রসঙ্গ তুলে গোটা গ্রামেরই প্রশংসা জুড়ে দিল। সে বলতে লাগল:

—'অফিসার কোন কাউকে কমাণ্ডার হিসেবে পেলে খুবই ভাল হয়। লড়াই বাধলে লড়াই জেতা সহজ হবে, ক্ষয় ক্ষতিও কম হবে। আপনাদের গ্রামেই তো অনেক বীর আছেন। আমি আমার মত চাপাতে চাইনে, তবু আমার দিক থেকে আমি কর্ণেল মেলেখফকে নির্বাচন করার সুপারিশ করছি।'

—'কোন জন? দুজন মেলেখফ আছে।'

অফিসার ভিড়ের গায়ে চোখ বুলাল; তারপর একটু হেসে চেঁচিয়ে উঠল:

—'গ্রিগর মেলেখফ! আপনারা কি বলেন?'

—'ভাল লোক!'

—'গ্রিগর মেলেখফ! একটা ঘাগী লোক বটে!

—'ঘেরের মধ্যে এগিয়ে এসো। মাতব্বররা দেখতে চাইছেন।'

পেছন থেকে ধাক্কা খেয়ে গ্রিগর লাল টকটকে মুখে ঘেরের মধ্যে হাজির হয়ে চারধারে বিষদৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

—'আমাদের যোয়ানদের তুমি চালিয়ে নিয়ে যাবে!' মাত্‌ভেই কাশুলিন লাঠি ঠুকে সাড়ম্বরে ক্রশ করে বলল। 'চালিযে নেবে, পথ দেখাবে, যাতে মন্দা রাজহাঁসের পেছনে মাদী হাঁসের ঝাঁকের মত তারা তোমার পেছনে পেছনে থাকে, মন্দা রাজহাঁস যেমন পরিবারকে রক্ষা করে, মানুষ ও জানোয়ার দুয়ের হাতে থেকেই বাঁচিয়ে রাখে তুমিও তেমনি নজর রেখ! আরও চারটে ক্রশ পাও, ভগবান সে ইচ্ছা পূর্ণ করুন!'

—'একখানা ছেলের মত ছেলে তোমার পান্তালিমন!'

—'কি সাফ মাথা!'

– 'ওহে ন্যাংড়া, এবার মদ খাওযাবে না?'

—'মাতব্বররা! চুপ করুন! স্বেচ্ছাসেবক না ডেকেই কি আমরা সৈন্যদলের তলবের কাজ শুরু করে দেব? স্বেচ্ছাসেবকরা যেতেও পারে, নাও পারে '

—'না, স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেই ডাকা হক!'

—'তুমি নিজে যাও, কে ধরে রাখছে বাপু?'

ইতিমধ্যে গ্রামের উত্তর-পাড়ার চারজন মাতব্বর নবনিযুক্ত আতামানের সঙ্গে ফিসফাস করে কি যেন আলোচনা করছিল। তারা অফিসারের দিকে ঘুরল। তাদের মধ্যে থেকে একজন, ছোটখাটো, দাঁতফোকলা বুড়ো কথা বলতে এগিযে এল আর সবাই পিছিয়ে রইল। বুড়ো বলল.

—'হুজুর, বুঝতে পারা গেল আপনি এ গ্রাম সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানেন না, জানলে আপনি গ্রিগর মেলেখফকে কমাণ্ডার ঠিক করতেন না। আমরা মাতব্বররা এটা সায় দিতে পারছি না। তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ করার আছে।'

—'কিসের অভিযোগ? ব্যাপার কি?'

—'ও নিজে রেড-গার্ডদলে ছিল, তাদের কমাণ্ডার ছিল, আমরা কি করে ওকে বিশ্বাস করি। আর এইত মাত্র দুমাস আগে চোট নিয়ে ওদের দল থেকে ফিরে এসেছে।'

অফিসারের মুখখানা লাল টকটকে হযে গেল মনে হল কানদুটো যেন রক্তের চাপে ফুলে উঠল।

—'সত্যি নাকি একথা? আমিত শুনিনি। কেউত এ সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেনি।'

—'সত্যি কথা, ও বলশেভিকদের দলে ছিল।' অন্য একজন মাতব্বর কর্কশকণ্ঠে সায় দিয়ে বলল। 'আমরা ওকে বিশ্বাস করতে পারি না!'

—'ওকে পালটে দিন! আমাদের ছেলেছোকরারা কি বলছে জানেন? বলছে, লড়াইয়ের প্রথম চোটেই ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে!'

—'শুনুন!' ডিঙি মেরে উ'চু হয়ে অফিসার জমায়েতের দিকে চিৎকার করে বলল, 'মাতব্বররা শুনুন! আমরা এইমাত্র গ্রিগর মেলেখফকে কমান্ডার নির্বাচিত করেছি, কিন্তু তার মধ্যে কি বিপদ নেই? এইমাত্র আমাকে বলা হল, শীতকালে সে নিজে রেডগার্ডদের দলে ছিল। আপনারা ছেলেদের, নাতিদের তার হাতে স'পে দিয়ে বিশ্বাস করেন? আর আপনারা, লড়াই-ফেরতা ভাইরা, আপনারা কি নিশ্চিন্ত মনে তার নির্দেশমত চলতে পারবেন?'

মুহূর্তের জন্যে কসাকরা চুপ করে রইল, তারপর পরস্পর-বিরোধী চিৎকার উঠল, একটা কথাও তার মধ্যে বোঝা গেল না। চিৎকার থামলে বুড়ো বোগাতিরিয়েভ ঘেরের মাঝখানে এগিয়ে এল. টুপিটা খুলে নিয়ে চারপাশে তাকিয়ে বলতে শুরু করল:

—'আমি বোকাসোকা লোক আমার মনের কথা এইরকম। গ্রিগরকে আমরা এ পদ দিতে পারি না। সে ভুল পথে গিয়েছিল, তা আমরা সবাই শুনেছি। আগে প্রথম সে আমাদের বিশ্বাস অর্জন করুক, অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করুক। তারপর আমরা ভেবে দেখব। সে যে ওস্তাদ লড়ুয়ে, তা আমরা জানি...কিন্তু কুয়াশার জন্যে সূর্য দেখা যায় না; তার পুরনো দিনের কেরামতিও আমাদের চোখে পড়ছে না; বলশেভিকদের জন্যে সে যে কাজ করেছে, তাতে বাধা ঘটেছে।'

—'ও দলের মধ্যে সাধারণ একজন হয়ে থাক।' ছোকরা আন্দ্রেই কাশুলিন মারমুখী হয়ে চিৎকার করে উঠল।

—'পিয়োত্রা মেলেখফকে কমান্ডার করা হক।'

—'গ্রীসকা দলের মধ্যে থাক।'

—'তাই থাকব। আমি এ পদ চাই না! কেন মরতে আমাকে এগিয়ে দিয়েছিলে?' উত্তেজনায় রাঙা হয়ে গ্রিগর চিৎকার করে উঠল। হাত নেড়ে আবার বলল। 'তোমরা চাইলেও আমি ও পদ নেব না!' পা-জামার পকেটে হাতদুটো চালিয়ে দিয়ে মাথা নীচু করে সে বেরিয়ে এল। পেছনে চিৎকার উঠতে লাগল:

—'হাড় হারামজাদা! এই হচ্ছে তুর্কী-রক্তের খেল!'

—'চুপ করে থাকতে পারে না! ট্রেঞ্চের মধ্যেও অফিসারদের সামনে মুখ বুজে থাকে না।'

—'ফিরে এসো হে!'

—'ধর ধর! দুয়ো! দুয়ো!'

জমায়েত শান্ত হতে বহুক্ষণ লাগল। তর্কাতর্কির উত্তেজনায় একজন অন্য-জনকে ধাক্কা মারল, একজনের নাক দিয়ে রক্ত গড়াতে লাগল, একজন ছোকরার চোখের নীচেটা হঠাৎ ঢিবি হয়ে ফুলে উঠল। অবশেষে যখন শৃঙ্খলা ফিরে এল, পিয়োত্রা মেলেখফকে কমান্ডার নির্বাচিত করা হল। পিয়োত্রা তো গর্বে প্রায় ঝলমল করে উঠল। খুব উ'চু বেড়ার সামনে পড়ে যাওয়া বেয়াড়া ঘোড়ার মত অফিসারটি কিন্তু এবারে এক নতুন বাধার মুখে গিয়ে পড়ল। যখন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নাম লেখানোর ডাক এল, কেউ তখন এগিয়ে এল না। লড়াই ফেরতারা আগাগোড়াই সংযত ব্যবহার করে আসছিল, তারা ইতস্তত করতে লাগল, তাদের নাম লেখাতে অনিচ্ছা। অবশ্য তারা অন্যদের উৎসাহ দিতে লাগল:

—'তুমি যাওনা কেন, আনিকেই?'

কিন্তু আনিকুশ্‌কা বিড়বিড় করে বলল:

—'আমি একেবারে ছেলেমানুষ. .গোঁফের রেখাই দেখা দেয়নি!'

—'ও সব রসিকতা রাখো! আমাদের হাসিঠাট্টার বস্তু করে তুলছ?' ঠিক তার কানের কাছেই বুড়ো কাশুলিন গর্জন করে উঠল।

—'আপনার ছেলের নাম লেখান গে!' আনিকুশ্‌কাও পাল্টা জবাব দিল।

—'প্রোখোর ঝিকোভ্‌!' টেবিল থেকে আওয়াজ উঠল, 'তোমার নাম কি লিখব?'

—'জানি না...' প্রোখোর উত্তর দিল।

মিৎকা কোরশুনোভ গম্ভীরমুখে টেবিলের সামনে এগিয়ে গিয়ে হাঁক দিল:

—'আমার নাম লিখুন।'

—'বেশ, আর কে? তোমার কি ব্যাপার, ফিওদোৎ বোদোভ্‌স্কোভ?'

—'আমার হার্নিয়া হয়েছে!' সলজ্জভাবে চোখ নামিয়ে বিড়বিড় করে বলল। লড়াই-ফেরতারা হো হো করে হেসে উঠল, তাকে নির্মমভাবে বিদ্রূপ করতে লাগল:

—'বৌকে সঙ্গে নিও। যদি বেশি ঠ্যালা দেয়, বৌ সারিয়ে দেবে!'

মাতব্বররা কিন্তু বিরক্ত হয়ে গেল, গালাগাল দিয়ে বলল·

—'থাক থাক যথেষ্ট হয়েছে! এত ফুর্তি কিসের বাপু?'

—'হাসিঠাট্টারই সময় বটে এখন!'

—'লজ্জা করে না তোমাদের!' তাদের একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'ধর্মে সইবে? ভগবানের চোখ এড়াবে না! লোকে মরছে, আর তোমরা . ভগবানের কথা ভাবো!'

—'ইভান তোমিলিন!' অফিসার চারপাশে তাকাল।

—'আমি তো গোলন্দাজ।' তোমিলিন উত্তর দিল।

—'নাম লিখব কি? আমাদের গোলন্দাজেরও দরকার আছে।'

—'আচ্ছা, ঠিক আছে; লিখে নিন।'

আনিকুশ্‌কা ও আরও জনকয়েক তোমিলিনকে ঠাট্টা করতে শুরু করল·

—'উইলো গাছের গুঁড়ি দিয়ে আমরা তোমাকে একটা কামান বানিয়ে দেব। গোলার বদলে তুমি কুমড়ো আর আলু ছুঁড়ো।'

হাসিঠাট্টা হৈ হুল্লোড় করতে করতে প্রায় জন ষাটেক লোক নাম লেখাল। ক্রিস্তোনিয়া লেখাল সকলের শেষে। সোজা টেবিলের কাছে গিয়ে ভেবেচিন্তেই বলল:

—'আমার নাম লিখে নিন। শুধু বলে রাখছি যে, আমি কিন্তু লড়ব না।'

—'তাহলে নাম লেখাচ্ছ কেন।' বিরক্ত হয়েই অফিসার প্রশ্ন করল।

—'আমি শুধু দেখে যাব। আমি দেখতে চাই।'

—'লিখে নিন!' অফিসার কাঁধ ঝাঁকাল।

জমায়েত যখন ভাঙল, তখন প্রায় দুপুর। ঠিক হল. মিগুলিনস্কের লোকদের সাহায্যের জন্যে পরদিনই একটা দল পাঠানো হবে।

॥ ছয় ॥

পরদিন সকালে ষাটজনের মধ্যে মাত্র চল্লিশজন বারোয়ারিতলায় হাজির হল। গ্রেট-কোট গায়ে, উঁচু বুট পায়ে, ফিটফাট পিয়োত্রা কসাকদের তদারক করল। অনেকেরই কাঁধের পট্টিতে পুরনো রেজিমেণ্টের নম্বর লেখা। জিনের সঙ্গে বাঁধা থলের মধ্যে খাবারদাবার, জামাকাপড় আর ফ্রন্ট থেকে আনা কার্তুজ বোঝাই করা। সকলের রাইফেল নেই, কিন্তু বেশির ভাগের হাতেই তলোয়ার আছে।

তাদের বিদায় দেবার জন্যে আবালবৃদ্ধবনিতার ভিড় জমল বারোয়ারিতলায়। টগবগে ঘোড়ায় চেপে পিয়োত্রা আধা কোম্পানিটাকে সার বেঁধে দাঁড় করাল; নানা রঙের ঘোড়াগুলো, গ্রেট-কোট পরা সওয়ার, উর্দি, পালের কাপড়ের বর্ষাতি সব কিছু দেখে-শুনে গ্রাম ছাড়ার হুকুম দিল। দলটাকে সে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে এল। কসাকরা বিষণ্ণমুখে গ্রামের দিকে একবার পেছন ফিরে তাকাল, শেষ সারের একজন একটা গুলি ছুঁড়ল। পাহাড়ের মাথায় উঠে পিয়োত্রা দস্তানাটা হাতের মধ্যে গলিয়ে নিয়ে জুলপি দুটোয় হাত বুলাল, ঘোড়াটাকে এমনভাবে টান মারল যে কাৎ হয়ে সে এগিয়ে এল, তারপর বাঁ-হাত দিয়ে টুপিটা চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল:

—'কোম্পানি, কদমে ছোটাও!'

রেকাবের ওপরে দাঁড়িয়ে চাবুক দোলাতে দোলাতে কসাকরা ঘোড়াগুলো কদমে ছুটিয়ে দিল। বাতাস মুখে ঝাপটা মেরে, ঘোড়ার লেজ আর কেশর কাঁপিয়ে গুঁড়ো বৃষ্টি ছিটাতে লাগল। গালগল্প, হাসিঠাট্টা শুরু হয়ে গেল। ক্রিস্তোনিয়ার কালো কুচকুচে ঘোড়াটা একবার হোঁচট খেল। শাপান্ত বাপান্ত করতে করতে চাবুক মেরে ক্রিস্তোনিয়া তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। বেচারী ঘাড় বেঁকিয়ে চার পা তুলে ছুটল, দল ছেড়ে চোঁচা দৌড়ুতে লাগল। কারগিনে পেঁছুবার আগে পর্যন্ত খোস-মেজাজেই রইল তারা। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস কোন লড়াই-ই হবে না, মিগুলিনস্কে যা ঘটেছে. সেটা কসাকদের দেশে বলশেভিকদের আকস্মিক বিস্ফোরণ মাত্র।

॥ সাত ॥

তারা যখন কারগিনে পেঁছুল তখন বিকেল গড়িয়ে গিয়েছে। সে অঞ্চলে কোন লড়াই-ফেরতাই আর নেই: সবাই গিয়েছে মিগুলিনস্কে। বারোয়ারিতলায় দলটাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে, থাকার জায়গা ঠিক করতে পিয়োত্রা গেল আতামানের কাছে। দেখতে পেল, বাড়ির সিঁড়ির ওপর বসে সে তামাক টানছে। লোকটার বিশাল চেহারা, সার্টের নীচে চিতানো, লোহার মত শক্ত বুক আর হাতের পেশী তার অসাধারণ শক্তির প্রমাণ। পিয়োত্রা জিজ্ঞেস করল:

—'আপনিই জেলার আতামান?'

গালপাট্টার নীচে থেকে ভক্ করে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে লোকটা উত্তর দিল:

—'হ্যাঁ, আমি জেলার আতামান। মহাশয়ের নাম? নিবাস?'

পিয়োত্রা নাম বলল। হাতে চাপ দিয়ে মাথাটা একটু নুইয়ে আতামান নমস্কার করল:

—'আমার নাম ফিওদোর দিমিত্রিয়েভিচ্ লিখোভিদোভ্।'

সিয়েত্রাকোভের ব্যাপারের পর পরই ১৯১৮ সালের শরৎকালে লিখোভিদোভ্ জেলার আতামান নির্বাচিত হয়েছে। নতুন আতামান কঠোরভাবে কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। রেড গার্ডদের হত্যাকাণ্ডের পরদিনই প্রথম ধাপেই সে সিয়েত্রাকোভ জেলায় প্রতিটি লড়াই-ফেরতাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছে। জেলার এক-তৃতীয়াংশই বিদেশী, প্রথমে তারা যেতে চায়নি; আর সৈন্যরা—তাদের মধ্যে অনেকেই গোঁড়া বলশেভিক—প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু লিখোভিদোভ্ নিজের গোঁ বজায় রেখেছে; মাতব্বররা তার প্রস্তাবিত ফতোয়া সই করেছে,—যে-সমস্ত বিদেশী ডনের প্রতিরক্ষায় অংশ নেবে না, তাদের জেলা থেকে বার করে দেওয়া হবে। গান গাইতে গাইতে, একর্ডিয়ন বাজাতে বাজাতে গোটা কুড়ি গাড়ি বোঝাই হয়ে সৈন্যরা মিগুলিনস্কের দিকে রওনা হয়েছে। বিদেশীদের মধ্যে মাত্র জনকয়েক তরুণ সৈন্য রেড-গার্ডে যোগ দেবার জন্যে পালিয়েছে।

পিয়োত্রা এগিয়ে আসার সময় লিখোভিদোভ্ তার হাঁটা দেখেই বুঝতে পেরেছিল, নীচে থেকে সে অফিসারের পদে উঠেছে। তাই আর তাকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল না। ভালমানুষের মত একটু আত্মীয়তার ভাব দেখিয়ে বলল:

—'না, বাপু, মিগুলিনস্কে তোমাদের আর করার কিছুই নেই। তোমাদের ছাড়াই ওরা কাজ হাসিল করে ফেলেছে; গতকাল সন্ধ্যায় আমরা টেলিগ্রাম পেয়েছি। এখন বাড়ি ফিরে গিয়ে, এর পরে কি নির্দেশ যায়, তার জন্যে অপেক্ষা করে থাক। কসাকদের ভাল করে তাতাও! অত বড় গ্রাম তাতার্স্ক, মাত্র চল্লিশজন লড়তে এসেছে? খচ্চরদের ঝুঁটি ধরে নাড়া দাও গে! তাদেরই জান বাঁচানোর দায় এখন। আচ্ছা এসো, ভালোয় ভালোয় বাড়ি পৌঁছোও।'

বুট মচ্মচ্ করতে করতে অবলীলাক্রমে বিশাল বপু নিয়ে সে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। পিয়োত্রা বারোয়ারিতলায় কসাকদের কাছে ফিরে এল। তারা তাকে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। সে যে খুশী হয়েছে, তা গোপন করার কোন চেষ্টা না করে হেসে উত্তর দিল:

—'এবার বাড়ি। আমাদের ছাড়াই ওরা কাজ ফতে করে ফেলেছে!'

দাঁত বার করে হাসতে হাসতে কসাকরা দল বেঁধে ঘোড়াগুলোর দিকে এগুলো। ক্রিস্তোনিয়াও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, যেন তার পিঠ থেকে ভারী বোঝা নেমে গেল। তোমিলিনের কাঁধে চাপড় মেরে বলল:

—'আমরা তাহলে বাড়ি ফিরছি, গোলন্দাজ!'

॥ আট ॥

পরিস্থিতি বিবেচনা করে তারা ঠিক করল, কারগিনে রাত কাটাবে না, এক্ষুণি ফিরে যাবে। এলোমেলোভাবে ছোট ছোট দলে তারা গ্রাম ছেড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারা কারগিনে এসেছিল দো-মনা করে, ক্বচিৎ কখনো ঘোড়াকে কদমে ছুটিয়েছিল, কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে যত জোরে সম্ভব ঘোড়া ছোটাতে লাগল। অনাবৃষ্টিতে ফুটি-ফাটা মাটি ঘোড়ার খুরের নীচে গুমগুম আওয়াজ করতে লাগল। ডনের ওপরে, দূরে পাহাড়ের বলয়রেখায় বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল।

তাতার্স্কে এসে পৌঁছল মাঝরাতে। পাহাড় থেকে নীচে নামতে নামতে আনিকুশ্কা তার অস্ট্রিয়ান রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ল, তাদের ফিরে আসার জানান দিতে কড়কড় করে অনেকগুলো গুলি ছুটে গেল। প্রত্যুত্তরে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ ডাক জুড়ে দিল; বাড়ির পথের গন্ধ পেয়ে, একটা ঘোড়া নাকের ঘড়াৎ আওয়াজ করে চিঁহিঁ চিঁহিঁ ডেকে উঠল। গ্রামের মধ্যে তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেল।

পিয়োত্রার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মার্তিন শামিল সোয়াস্তিতে কলরব করে উঠল:

—'তাহলে, লড়াই খতম হয়ে গেল! ভাল, ভাল।'

অন্ধকারে হাসল পিয়োত্রা, বাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। পান্তালিমন এসে ঘোড়া ধরল, জিন খুলে তাকে আস্তাবলে নিয়ে গেল। দুজনে একসঙ্গে ঢুকল ঘরের মধ্যে। জিজ্ঞেস করল:

—'সব চুকেবুকে গেছে তো?'

—'হুঁ!'

—'ভগবান মঙ্গল করুন! আর যেন ও সব না শুনতে হয়!'

ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে দারিয়া উঠল। স্বামীকে কিছু খাবার এনে দিতে হবে। লোমশ বুকখানা চুলকোতে চুলকোতে আধা জামা কাপড়েই গ্রিগর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল; পিয়োত্রাকে চোখ টিপে রঙ্গ করে টিপ্পনি কাটল:

—'তাহলে ওদের সাবাড় করে এলে?'

—'ঝোল যা বেঁচেছে তা আমি সাবাড় করে দিতে পারি।'

—'ঝোলটুকু সাবাড় করতে পার ঠিকই, বিশেষ করে, আমি যদি তোমার সঙ্গে হাত লাগাই!'

॥ নয় ॥

ইস্টারের আগে পর্যন্ত লড়াই-এর নামগন্ধও পাওয়া গেল না। কিন্তু ইস্টার শনিবারে ভিয়েশেন্‌স্কা থেকে এক খবর-দার হাজির হল গ্রামে। কোরশ্‌নোভের গেটের সামনে ফেনা ওঠা ঘোড়াটাকে রেখে সে দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে উঠল।

—'খবর কি?'

—'আতামানকে চাই। আপনি-ই?'

—'হ্যাঁ।'

—'এখ্‌নি কসাকদের হাতিয়ার নিতে বল্‌ন। পোদ্‌তিয়েল্‌কোভ রেড-গার্ডদের নিয়ে নাগোলিন্‌স্ক জেলায় ঢুকেছে। এই যে হ্‌কুমনামা।' বাণ্ডিলটা বার করার জন্যে সে টুপির ঘামে ভেজা আস্তরের কাপড়টা উল্টে দিল।

কথাবার্তার আওয়াজ শ্‌নে ব্‌ড়ো গ্রীসাকা বেরিয়ে এল। দ্‌জনে মিলে আঞ্চলিক আতামানের হ্‌কুমনামাটা পড়ল। রেলিঙে হেলান দিযে খবর-দার জামার হাতা দিয়ে ম্‌খের ধ্‌লো ঝাড়তে লাগল।

উপোসভাঙার পর ইস্টার রবিবারেই কসাকরা গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। জেনারেল আলফেরোভ-এর হ্‌কুম বড় কড়া: সে ভয় দেখিয়েছে, যারা যেতে অস্বীকার করবে তাদের কসাক পদবী থেকে বঞ্চিত করা হবে। তাই আগের মত এবার আর চল্লিশজনের দল হল না, দল হল একশজনেরও বেশি কসাককে নিয়ে; তাদের মধ্যে কিছ্‌ কিছ্‌ বয়স্ক লোক, বলশেভিকদের বেশ দ্‌চার ঘা দেবার ইচ্ছায় তাদের পেয়ে বসেছে। তর্‌ণরা গেল দো-মনা করে; বয়স্করা গেল সোরগোলের উত্তেজনায়।

গ্রিগর মেলেখফ রইল একেবারে শেষের সারিতে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে ঝিরঝির করে ব্‌ষ্টি পড়ছে। সব্‌জ স্তেপের ওপর দিয়ে মেঘ গড়িয়ে চলেছে। পাহাড়ের অনেক উঁচুতে একটা ঈগল উড়ছে। আস্তে আস্তে ডানা নেড়ে নেড়ে বাতাসের আগে প্‌ব দিকে উড়ে চলেছে। বাদামি রঙের একটা বিন্দ্‌র মত দ্‌র হতে দ্‌রে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে।

ব্‌ষ্টি-ভেজা সব্‌জ স্তেপ ঝকমক ঝকমক করছে। এখানে ওখানে গত বছরের হাতিশ্‌ড়ো গাছ, 'ওয়ার্মউডে'র ঝাড়। নাবাল জমিতে পাটকিলে রঙের ঝোপগ্‌লো নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে।

কারগিনের কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেল একটা ছোট ছেলে মাঠে গর্‌ তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। চাব্‌ক দোলাতে দোলাতে খালিপায়ে ছেলেটা গব্‌র সঙ্গে হন হন করে ছ্‌টছে। ঘোড়-সওয়ারদের দেখতে পেয়ে সে দাঁড়িয়ে গেল, কাদামাখা ঘোড়াগ্‌লোকে নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগল। তোমিলিন জিজ্ঞেস করল:

—'তোর বাড়ি কোথায় রে?'

—'কারগিনে।' একটু হেসে ব্‌ক ফুলিয়ে ছেলেটি উত্তর দিল। কোট দিয়ে তার মাথাটা ঢাকা।

—'তোদের কসাকরা চলে গেছে?'

—'চলে গেছে। রেড-গার্ডদের সাবাড় করতে গেছে। সিগারেটের তামাক হবে, দাদু?'

—'কে সিগারেট খাবে, তুই?' গ্রিগর লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে গেল।

ছেলেটা তার কাছে দৌড়ে এল। তার পা-জামা গুটানো পা-দুটো ভিজে, পাট্টি দুটো লাল টকটকে। সাহস করে গ্রিগরের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল:

—'পাহাড়ের নীচের দিকে নামতে গিয়ে এক্ষুণি মড়া দেখতে পাবে। গতকাল আমাদের গ্রামের কসাকরা রেড-গার্ডদের ওখানে নিয়ে গিয়ে মেরেছে। ওই ঝোপটার আড়ালে বসে আমি তখন গরু দেখছিলাম, দেখলাম সবাইকে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটল। বাপরে, কি ভয়ঙ্কর! তলোয়ার ঘোরাতেই তো হাউমাউ করতে করতে ওরা চারধারে ছুটল...পরে গিয়ে আমি ভাল করে দেখলাম, বেশির ভাগই চীনা। একজনের কাঁধ থেকে আড়াআড়ি কেটে ফেলেছে, তখনও দেখতে পাচ্ছিলাম হৃদ্‌পিন্ডটা ধুকপুক ধুকপুক করছে, পেচ্ছাবের নীল থলিদুটো...কি ভয়ঙ্কর!' আবার সে বলল। কসাকরা ভয় পেল না দেখে সে অবাক হয়ে গেল। গ্রিগর ক্রিস্তোনিয়া আর তোমিলিনের অবিকৃত কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে অন্তত এইটেই সে সিদ্ধান্ত করে নিল।

সিগারেট ধরিয়ে গ্রিগরের ঘোড়ার ঘাড়ে সে একটা চাপড় মারল; তারপর, 'ধন্যবাদ, মশাই,' বলেই দৌড়ে তার গরু বাছুরের কাছে ছুটে গেল।

রাস্তার ধারে, বৃষ্টির জলে ধোওয়া একটা অগভীর গর্তের মধ্যে, মাটির হালকা আস্তরণের নীচে রেড-গার্ডদের মৃতদেহ পড়ে আছে। একখানা কালচে-নীল মুখ দেখা যাচ্ছে, ঠোঁটে রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধেছে। নীল পা-জামার ভেতর দিয়ে একখানা খালি-পা মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে রয়েছে।

—'ভাল করে কবর দেওয়া উচিত ছিল! শুয়োরের বাচ্চারা!' ক্রিস্তোনিয়া বিড়বিড় করে উঠল। আচমকা সে ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে গ্রিগরকে ছাড়িয়ে তীরবেগে নীচের দিকে নেমে গেল।

—'তাহলে, ডনের মাটিতে রক্ত বইতে শুরু করেছে!' তোমিলিন হাসল, কিন্তু গালদুটো থরথর করে কেঁপে উঠল। 'গ্রিগর, রক্তের পচা গন্ধ পাচ্ছ? গন্ধ পাচ্ছ, না?'

নবম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

সকালবেলায় আবহাওয়ার আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে গেল। বেলা নটা পর্যন্তও রীতিমত গরম ছিল, কিন্তু দুপুরের দিকে দক্ষিণ থেকে বাতাস ধেয়ে এল, আকাশে মেঘ ভেসে চলল। রোস্তোভের শহরতলিতে পপলারের রসালো কাঁচপাতা, রোদে পোড়া ইঁট আর মাটির মনমাতানো গন্ধ।

আগের দিন আন্না আর বানচাক বাছাই-করা একটা দল নিয়ে স্টেশনে একটা বিদ্রোহী সন্ত্রাসবাদী দলকে নিরস্ত্র করেছিল। আগের দিন বানচাকের কপালে ভ্রূকুটিতে খাঁজ পড়েছিল। কিন্তু আজ এই দক্ষিণা বাতাসে তার সমস্ত উদ্বেগ মিলিয়ে গিয়েছে;

দরজার চৌকাঠের কাছে বসে সে গৃহস্থের মত একটা প্রাইমাস স্টোভ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, আন্নার মুখে বিদ্রুপের হাসি, সেই দিকে সে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে।

সে নাকি চাটনি দিয়ে খুব ভাল কাটলেট বানাতে পারে, সকালে খেতে বসে সে এই ধরনের কিছু একটা বলেছিল। আন্না সন্দেহ প্রকাশ করেছিল :

—'সত্যি বলছ?'

—'সত্যি।'

—'শিখলে কোথেকে?'

—'যুদ্ধের সময় একজন পোল মেয়েছেলে আমাকে শিখিয়েছিল, বুঝলে।'

—'বেশ, বানাও তো। আমার কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

সেইজন্যেই এই প্রাইমাস স্টোভ। সেইজন্যেই বানচাকের ভ্রূ-কুঞ্চন আর আন্নার হাসি। সে হাসি এমন দুষ্টুমি-মাখা যে বানচাকের কাছে তা অসহ্য মনে হল। কড়াইতে আলুগুলো কসে নেড়ে আর একবার ভুরু কোঁচকাল সে :

—'অবিশ্যি, ঘাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে তুমি যদি এমনি করে ঠাট্টা কর, তাহলে কিছুই হবে না, আর একে কি স্টোভ বলে? যেন একটা কারখানার ফার্নেস।'

আন্না আস্তে আস্তে, প্রায় স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বলল :

—'তুমি কেন বাবুর্চি হলে না? কত রকম রান্না করতে পারতে! কেমন বাদশাহী চালে রান্নাঘরে দাপট করে বেড়াতে! সত্যি, রন্ধনশিল্পটায় কেন তুমি মন দিলে না?'

—'বড্ড বাড়াবাড়ি করছ কিন্তু!'

আঙুলের সঙ্গে একগোছা চুল জড়িয়ে নিয়ে আন্না খেলতে শুরু করল। চোখের পাতার ফাঁক দিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে খিলখিল করে হেসে উঠল :

—'দাঁড়াও, আজই আমি তোমার সাঙ্গপাঙ্গদের বলছি, মেশিনগানার হিসেবে তুমি গুল মেরে বেড়াচ্ছ, তুমি কোন নামজাদা লোকের বাড়িতে বাবুর্চি ছিলে।'

যখন চাটনির বদলে বদগন্ধ, বিশ্রী স্বাদের একটা পদার্থ তৈরি হল তখন সত্যি-সত্যিই সে মন-মরা হয়ে গেল। আন্না কিন্তু পরম পরিতোষে খেয়ে ফেলল, এমন কি প্রশংসাবাদও শুরু করে দিল :

—'মোটেই খারাপ হয়নি! চমৎকার চাটনি। একটু বেশি ঝাল, এই যা।'

—'সত্যি ভাল হয়েছে?' বানচাক উৎসাহিত হয়ে উঠল। 'কিন্তু এখন যদি একটু মুলো কুচিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে...' আন্না যে বীরের মত ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে সদিকে লক্ষ্য না করেই সে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল।

খেতে খেতে শেষ দিকে আন্নার সারা দেহ যেন কালিয়ে এল অবসন্নের মত সে হাই তুলল, বানচাকের কথার উত্তর না দিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগল। পরে উঠে বাগানের বেড়ার ধারে রোদ্দুরে এসে দাঁড়াল। অন্যমনস্কের মত দাঁতের ফাঁকে একটা খড় চিবুতে লাগল।

তার মাথাটা কাঁধের সঙ্গে চেপে ধরে, চুলের মিষ্টি গন্ধ বুক ভরে টেনে নিয়ে বানচাক জিজ্ঞেস করল :

—'এত চুপচাপ কেন? কি হয়েছে?'

আন্না নতচোখে তার দিকে তাকাল, তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্লাউজের কলারের বোতাম একবার খুলতে লাগল, আবার আটকাতে লাগল। জিজ্ঞেস করল :

—'তুমি কি শহরে যাচ্ছ?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে চাপা ঠোঁটের ফাঁকে বলল, 'শিগ্‌গীরই আমাকে দলছুট হয়ে পড়তে হবে, ইলিয়া...'

—'কেন?'

কাঁধদুটো ঝাঁকাল সে, পপলার গাছের নীচে ছড়িয়ে পড়া রোদ্দুরের দাগগুলো দেখতে লাগল। নীচু বেড়ার গায়ে বুক চেপে ধরে অপ্রত্যাশিত বিরক্তিতে বলে উঠল :

—'আমি অপেক্ষা করেছিলাম, প্রথমেই বিশ্বাসই করিনি। এখন বুঝতে পারছি। সাত মাস কি সাড়ে সাত মাসের মধ্যেই আমি মা হব।'

সমুদ্রের হাওয়ার ঝাপটায় পপলারের পাতা নেচে উঠল, চুলগুলো আন্নার মুখে এলোমেলো ছড়িয়ে দিয়ে গেল। পেছনে সরিয়ে দেবার কোন চেষ্টা করল না সে। বানচাক নির্বাক। আন্নার হাতে সে হাত বুলাতে লাগল। বানচাককে আঘাত দিয়েছে বুঝতে পারলেও আন্না তার আদরে কোন সাড়া দিল না। টলতে টলতে ঘরের দিকে ফিরল।

বানচাক পেছন পেছন ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর অস্থির মনের সঙ্গে আর লড়াই করতে না পেরে জিজ্ঞেস করল :

—'এখন তাহলে কি হবে?'

—'কিচ্ছু হবে না।' উদাসীনের মত আন্না উত্তর দিল।

স্তব্ধতা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। বানচাক কথা খুঁজতে লাগল, কিন্তু মনের মধ্যে চিন্তাগুলো নির্বোধের মত এলোমেলো জড়িয়ে যেতে লাগল।

—'হক না। ততদিনে আমরা প্রতি-বিপ্লবকে খতম করে ফেলতে পারব। কেন, ছেলেপুলে হওয়াটা কি এতই খারাপ?' কি ভাবে কথা বলবে তা যেন হঠাৎ সে সহজাত সংস্কারের বশেই বুঝতে পারল; ভ্যাবাচাকা খেয়ে একটু হেসে সে তাড়াতাড়ি আরও বলতে লাগল: 'বাচ্চাটাকে পেটে ধরতেই হবে। আন্না, যেন একটা ছেলে হয়: হৃষ্টপুষ্ট, স্বাস্থ্যবান, মোটাসোটা একটা ছেলে। আমি তালাচাবির মিস্ত্রি হবো, তুমি তো জানো, জীবনটা কি সুখেরই হবে! বছর তিনেকের মধ্যেই তুমি মুটিয়ে যেতে শুরু করবে, আর আমার ইয়া বড় একটা ভুঁড়ি হবে। আমরা নিজেদের ছোট্ট একটা বাড়ি কিনব। আর জানলার ধারে জিরেনিয়ম ফুল থাকবে নিশ্চয়ই, খাঁচার মধ্যে একটা ক্যানারি পাখি। রবিবারে রবিবারে বন্ধুবান্ধব আসবে, আমরাও গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে দেখা করতে যাব। তুমি পিঠে বানাবে, ময়দা যদি ঠিকমত মাখা না হয়, তাহলে তুমি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদবে। আমরা পয়সা বাঁচিয়ে. .'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রথমদিকে আন্না একটু বিষণ্ণ হাসি হাসল, কিন্তু শেষের দিকে ঘড়াৎ করে নাকের আওয়াজ করল :

—'ছোঃ, কি স্বপ্নবিলাসী!'

—'পছন্দ হয় না তোমার?'

—'শুনতে তো ভালই লাগে!'

॥ দুই ॥

দুজনে মিলে শহরে গেল তারা। সৈনিক, মজুর, আর ছেঁড়া-খোঁড়া জামাকাপড়-পরা লোকের ভিড়ে রোস্তোভ শহর গিসগিস করছে। বেড়ায় বেড়ায় ছেঁড়া ফতোয়া আর ইস্তাহারগুলো বাতাসে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। ঝাড়ু না দেওয়া রাস্তায় ঘোড়ার নাদ আর গরম পাথরের গন্ধ। শহরের রূপ-পরিবর্তন আন্নার চোখে ধরা পড়ল :

—'দেখ, ইলিয়া, শহরটাকে কেমন সাদাসিধে দেখাচ্ছে। কোথাও একটা 'বোলার' টুপি কিংবা 'ত্রোয়্‌কা' নজরে পড়ে না। সবকিছুই যেন পাথুরে রঙের।'

—'শহর হচ্ছে বহুরূপী। আজ যদি 'হোয়াইট্‌রা' আসে, তাহলে রঙ্‌ কেমন পালটে যাবে!' বানচাক হাসল।

চুপচাপ তারা পাশাপাশি হেঁটে চলল, চুপচাপ তারা দুজন দুজনকে ছেড়ে গেল। নোভোচের্‌কাশের কসাকদের যে দলটা এগিয়ে আসছে, তাদের বাধা দেবার জন্যে একটা দল জড় করতে পোদ্‌তিয়েলকোভ যখন সন্ধ্যের দিকে ডনের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনের মাঝখানে এসে বাধা দিল, তখন আবার তাদের দেখা হল, একই দলে তারা মার্চ করে চলল।

—'ফিরে যাও, আন্না!' তার হাতটা ছুঁয়ে বানচাক অনুনয় করে বলল।

সে কিন্তু গোঁয়ারের মত ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রইল।

শহরতলির শেষ বাড়িটাও তারা মার্চ করে ছাড়িয়ে এল। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসা কসাকদের দিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। রেড-গার্ডদেব সাবের এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত দাপাদাপি করতে করতে পোদ্‌তিয়েলকোভ উৎসাহ দিতে লাগল :

—'গোলাগুলির কার্পণ্য করো না, ভাই সব! যথেষ্ট গোলাগুলি আছে, যথেষ্ট খরচ করতে পার!'

ঠোঁট থেকে নোনা ঘাম চেটে নিয়ে, বানচাক তাড়াহুড়ো করে, মাটি খোঁড়ার হাতিয়ার দিয়ে একটা অগভীর গর্ত খুঁড়ে ফেলল, মেসিন গানটা ধরাধরি করে বসিয়ে দিল। মেসিনগানার কার্তুজের ফিতেটা পরিয়ে নিল।

বানচাকের মেসিনগানার তাতার্স্ক গ্রামের সেই কসাক মাক্‌সিম গ্রিয়াঝ্‌নোভ্‌। কুতেপোভের স্বেচ্ছাবাহিনীর সঙ্গে লড়াইতে সে ঘোড়াটা হারিয়েছিল, সেই থেকে প্রচণ্ড মদ খাওয়া আর জুয়াখেলা শুরু করেছিল। ঘোড়াটা যখন মারা পড়ে, জিনটা খুলে নিয়ে প্রায় মাইল তিনেক বয়ে নিয়ে এসেছিল, পরে যখন বুঝতে পেরেছিল এভাবে এগুলে সে স্বেচ্ছাসৈন্যদের হাত থেকে জ্যান্ত ফিরতে পারবে না, তখন জিনের দামী ধাতুর তৈরি মাথাটা ছিঁড়ে নিয়েছিল, ঘোড়ার মুখোসটাও খুলে নিয়েছিল, নিজের ইচ্ছাতেই সে লড়াই ছেড়ে চলে এসেছিল। রোস্তোভে পৌঁছে দেখতে না দেখতে সে রূপো বাঁধানো তলোয়ারখানা দিয়ে জুয়ো খেলল। লড়াইতে কাটাপড়া এক ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে তলোয়ারখানা বাগিয়েছিল। সঙ্গে করে ঘোড়ার যে সাজসরঞ্জাম এনেছিল তাও জুয়োয় হারল, এমন কি নিজের পা-জামা আর বুট পর্যন্ত খোয়াল। সে

যখন বানচাকের দলে যোগ দিল তখন প্রায় উলঙ্গ অবস্থা। হয়তো সে আবার সামলে উঠতে পারত, কিন্তু প্রথম দিনের লড়াইতেই একটা গুলি এসে মুখে বিঁধল, নীল চোখ দুটো বুকের ওপর নুয়ে পড়ল, চূর্ণবিচূর্ণ মাথার খুলির পেছন থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। স্পষ্টই মালুম হল, তাতার্স্ক গ্রামের কসাক গ্রিয়াঝনোভ, অতীতের ঘোড়া-চোর আর হালের মাতাল গ্রিয়াঝনোভ ইহলীলা সংবরণ করেছে।

মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করা দেহটার দিকে একবার তাকিয়ে বানচাক মেসিনগানের চোঙা থেকে সযত্নে রক্তের দাগ মুছে ফেলল। প্রায় তখন তখনই পিছু হটে আসা জরুরি হয়ে পড়ল। বানচাক মেসিনগানটা পেছনে টেনে নিয়ে চলল। সার্টের মাথাটা ঢাকা দিয়ে গ্রিয়াঝনোভের তামাটে দেহটা কড়া রোদ্দুরে পড়ে রইল, তপ্ত মাটিতে শুয়ে একটু একটু করে ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল।

॥ তিন ॥

শহরতলির চৌ-রাস্তার প্রথম মোড়ে রেড-গার্ডের একটা প্লেটুন রুখে দাঁড়াল। জরাজীর্ণ পশমের টুপি মাথায় এক সৈনিক বানচাককে মেসিন-গান বসাতে সাহায্য করল। আর সবাই রাস্তায় একটা এবড়োখেবড়ো ব্যারিকেড খাড়া করে ফেলল। বানচাকের পাশে শুয়ে পড়ল আন্না।

হঠাৎ ডানদিকের রাস্তায় পায়ের শব্দ। নয় দশজন রেড-গার্ড কোণের দিকে ছুটে গেল। একজন চেঁচিয়ে উঠল:

—'ওরা আসছে!'

মুহূর্তের মধ্যে মোড়টা জনশূন্য, নিস্তব্ধ হয়ে গেল। তারপরই ধুলোর একটা ঝড়। টুপিতে সাদা পট্টি আঁটা, বুকের সঙ্গে বন্দুক চেপে কোণেব দিকে এক কসাক ঘোড়সওয়ার হাজির হল। এত জোরে সে লাগামে টান মারল যে, জানোয়ারটা পেছনের দু'পায়ের ওপর একেবারে বসে পড়ল। পিস্তলের একটা গুলি ছুঁড়ল বানচাক। ঘোড়ার ঘাড়ের ওপরে একেবারে নুয়ে পড়ে কসাকটা জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে গেল। ব্যারিকেডের আড়ালে সৈন্যরা নিরুৎসাহে ইতস্তত করতে লাগল; দুজন পাঁচিল বরাবর ছুটতে ছুটতে একটা গেটের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। স্পষ্টই বোঝা গেল, এক্ষুণি তারা দো-মনা করে পিছু হটবে। কঠিন স্তব্ধতা আর তাদের শঙ্কিত দৃষ্টিতে দৃঢ়তার চিহ্ন মাত্র নেই...

এরপর যা ঘটল, তার একটি মাত্র মুহূর্তই দুর্মর, জ্বলন্ত হয়ে বানচাকের মনে রয়ে গেল। রুমালটা মাথার পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে, আলুথালু বেশে, চেনা যায়না এমন উত্তেজিত হয়ে আন্না রাইফেল হাতে পেছন থেকে লাফিয়ে উঠল, চারধারে তাকিয়ে, কসাকটা যার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল সেই বাড়িটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল, তারপর ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল: 'আমার পেছনে এসো!' অনিশ্চিত পদক্ষেপে হোঁচট খেতে খেতে সে কোণের দিকে ছুটে গেল।

বানচাক মাটি থেকে উঁচু হয়ে উঠল। গলা থেকে এক দুর্বোধ্য আর্তনাদ ঠেলে বেরিয়ে এল। পাশের একজনের হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে

আন্না‌র পেছনে পেছনে ছুটল। দুই পায়ে এক অপ্রতিরোধ্য কম্পন জেগে উঠল। চিৎকার করে তাকে পেছন ফিরতে, ফিরে আসতে বলার আতঙ্কজনক, অক্ষম চেষ্টায়, তরা মুখখানা কালো হয়ে গেল। তার পেছনে জনকয়েক লোক ছুটছে, তাদের নিঃশ্বাস টানার শব্দ কানে এল। সমস্ত সত্তা দিয়ে এই কথাটাই সে অনুভব করল, যে এই অপূর্ব সুন্দর অথচ অর্থহীন প্রচেষ্টার ফলে এমন একটা কিছু ঘটে যাবে যা ভয়ঙ্কর, যা আর সংশোধন করা যাবে না।

কোণের দিকে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই সে আন্নার পাশে এসে গেল। কসাকরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে, ছুটতে ছুটতে এলোমেলো গুলি ছুঁড়ছে। একধারে পুরোপুরি কাত হয়ে বানচাক তাদের দিকে ছুটল? বুলেটের একটানা শিস্। আন্নার মৃদু আর্তনাদ। তারপরই সে দেখতে পেল, হাতদুটো ছড়িয়ে শূন্য দৃষ্টিতে আন্না রাস্তার ওপরে ভেঙ্গে পড়ল। কসাকরা যে পেছন ফিরল তা সে দেখতে পেল না, আন্নার হঠকারী প্রচেষ্টায় উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে, দেরি করে হলেও, লাল-সৈন্যরা যে তাদের পেছনে পেছনে তাড়া করে গেল, তাও সে দেখতে পেল না। আন্না, শুধু আন্নাই, তার দৃষ্টি জুড়ে রইল। আন্না তার পায়ের কাছে ছটফট করছে। তাকে তুলে নেবার জন্যে, বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে উল্টে দিল। দেখতে পেল, বাঁ-দিক থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে নীল ব্লাউজের ছেঁড়া টুকরোগুলো ক্ষতের চারধারে ছড়িয়ে রয়েছে; বানচাক বুঝতে পারল, দমদম বুলেট বিঁধেছে; বুঝতে পারল, আন্না মারা যাচ্ছে: দেখতে পেল, ম্লানায়মান চোখে মৃত্যু উঁকি মারছে।

কি তীব্র কামনায় বানচাক তার ওই চোখদুটো, প্রায় পুরুষোচিত হাতদুটোয় বারংবার চুমু খেল, বাঁচিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় কতবার তাকে ধরে টানাটানি করল.. ! কে যেন তাকে একপাশে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল; তারা ধরাধরি করে তাকে বয়ে এনে একটা চালার ছায়ার নীচে শুইয়ে দিল।

সৈন্যটি তার ক্ষতে একরাশ তুলো চেপে ধরল, তারপর রক্তে ভেজা টুকরোগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল। নিজেকে সামলে নিয়ে বানচাক তার জ্যাকেটের কলারের বোতাম খুলে ফেলল, নিজের সার্ট থেকে একটা টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে জড় করে ক্ষতের মুখে চেপে ধরল। কিন্তু গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল। চোখে পড়ল, মুখখানা নীল হয়ে আসছে, কালো ঠোঁট দুটো যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপছে। বাতাসের জন্যে একটা ঢোক গিলল, বুকখানা হাপরের মত ফুলে উঠল; মুখ দিয়ে, ক্ষত দিয়ে আবার বাতাস বেরিয়ে এল। বানচাক তার ছেড়া সার্টটা ছুরি দিয়ে কেটে মৃত্যুর ঘামে ভেজা দেহটা বিনা সঙ্কোচে অনাবৃত করে দিল। কোনরকমে ক্ষতের মুখ বন্ধ করে দেওয়া গেল, কয়েক মিনিট পরেই তার জ্ঞান ফিরে এল। কালো কোটর থেকে নিষ্প্রভ চোখদুটো মুহূর্তের জন্যে বানচাকের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল, তারপর থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে পাতাদুটো দৃষ্টির ওপরে যবনিকা টেনে দিল।

—'জল, জল! বড় গরম!' ছটফট করতে করতে আন্না আর্তনাদ করে উঠল। ঝরঝর করে সে কেঁদে ফেলল। 'ইলিয়া, আমি বাঁচতে চাই! ওগো...! উঃ!'

বানচাক তার আগুনের মত গালে ফোলা ফোলা ঠোঁট দুটো চেপে ধরল। বুকের ওপর খানিকটা জল ঢেলে দিল। কণ্ঠার হাড়ের নীচের গর্তের মধ্যে জলটুকু কানায় কানায় ভরে উঠল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই শুকিয়ে গেল। তার সারাদেহ যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। মুচড়ে দুমড়ে বানচাকের হাত থেকে নিজেকে সে ছাড়িয়ে নিল। —'বড় গরম...আগুন...!'

দেহের শক্তি কমে আসতেই সে একটু শান্ত হয়ে পড়ল, জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল:

'ইলিয়া, এমন হল কেন? তুমি তো বোঝ, এ কত সহজ...তুমি অদ্ভুত লোক... এতো জলের মত সহজ...ইলিয়া, ওগো, তুমি নিশ্চয়ই...ওই যে মা।' চোখ দুটো অর্ধেক খুলে, যন্ত্রণা ও আতঙ্ক দমন করার চেষ্টা করতে করতে অস্পষ্টভাবে সে বলে চলল, যেন কিসে তাকে পীড়ন করছে। 'প্রথমে শুধু বুঝতে পারলাম.. জোরে একটা চোট লাগল, আগুন জ্বলে গেল...এখন সব কিছুই দাউ দাউ করে জ্বলছে..বুঝতে পারছি... আমি মারা যাচ্ছি।' বানচাক মাথা ঝাকিয়ে 'না,' 'না' করে উঠল, তা চোখে পড়তেই আন্না ভুরু কোঁচকাল। 'অমন করোনা! ভেতরে ভেতরে রক্ত ঝরছে। ফুসফুস রক্তে ভরে উঠেছে...বড় কষ্ট...উঃ...দম ফেলতে বড় কষ্ট হচ্ছে!'

দমকে দমকে, থেমে থেমে, অনেক কথা বলে গেল আন্না, যা কিছু বোঝা হয়ে আছে, সব কিছুই যেন বানচাককে বলবার চেষ্টা করল। সীমাহীন আতঙ্কে বানচাক লক্ষ্য করল, তার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, ক্রমশই স্বচ্ছ হয়ে আসছে, কপালের দিকে হলদে ছোপ ধরছে। দেহের পাশে হাতদুখানা অসাড় হয়ে পড়ে আছে. সেই দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, পেকে ওঠা নীলচে কুলের মত নখের ডগায় ডগায় গোলাপী নীল রং ফুটে উঠেছে।

—'জল! বুকের ওপরে জল দাও...উঃ, কি গরম লাগছে!'

জলের জন্যে বাড়ির মধ্যে ছুটে গেল বানচাক। ফিরে এসে আর চালার নীচে আন্নার নিঃশ্বাসের ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনতে পেল না। শেষ আক্ষেপে কুঞ্চিত মুখের ওপরে, ক্ষতের গায়ে চেপে ধরা তখনো-উষ্ণ হাতের ওপরে—মোমের মত অস্তসূর্যের আলো এসে পড়েছে। আস্তে আস্তে কাঁধের নীচে হাত দিয়ে বানচাক তাকে উ'চু করে ধরল; কুঞ্চিত নাক আর দুই চোখের মাঝখানের সরু সরু কালো রেখার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই, কালো ভুরুর নীচে চোখের তারার নিভে আসা ঝলকটুকু চোখে পড়ে গেল। অসহায়ভাবে নুয়ে পড়া মাথাটা নীচু হয়ে ভেঙ্গে পড়ল, তার রোগাটে কণ্ঠায় জীবনের স্পন্দনটুকু শেষবারের মত ধুকপুক করে থেমে গেল।

তার আধ-বোজা, কালো চোখের পাতায় শীতল ঠোঁটদুটো চেপে বানচাক ডেকে উঠল:

—'আন্না! আন্না!'

তারপর সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে দুইপাশে চেপে ধরা হাতদুটো একটুও না নড়িয়ে অস্বাভাবিক ঋজুভঙ্গিতে হে'টে চলে গেল। অন্ধের মত গেটের খুটিতে ধাক্কা খেল, ধরা গলায় একবার আর্তনাদ করে উঠল, তারপর এক ভৌতিক কান্নার তাড়া খেয়ে হাতে পায়ে ভর দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ফেনাওঠা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অব্যক্ত শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল। মাটির সঙ্গে মুখটা প্রায় ঠেকিয়ে, শক্ত কাঠ হয়ে, আধ-মরা জন্তুর মত দেওয়ালের নীচে কেবলি ছে'চড়ে বেড়াতে লাগল। রেড-গার্ড তিনজন তার দিকে শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে এ ওর সঙ্গে চোখোচোখি করতে লাগল। মানুষের দুর্দশার এই ভয়াবহ, নগ্ন প্রকাশ দেখে তারা যেন ধন্দ হয়ে গেল।

॥ চার ॥

এর পরের দিনগ্নলো বানচাক যেন টাইফাসের বিকারের ঘোরে কাটাল। এধারে ওধারে ঘ্নরল, কাজকর্ম করল, খেল, ঘ্নমনল, কিন্তু সব কিছ্নই যেন ধন্দমত, ঘ্নমঘ্নম নেশার ঘোরে। ব্নদ্ধিভ্রষ্টের মত গোলগোল চোখে তার চারপাশের জগতের দিকে অবশ-দ্নষ্টিতে তাকিয়ে রইল, বন্ধ্নবান্ধবকেও চিনতে পারল না, এমনভাবে তাকাতে লাগল যেন নেশায় চুর হয়ে আছে, নয়ত, প্রচণ্ড অস্নখ থেকে যেন সদ্য সদ্য এই উঠেছে। আন্নার ম্নত্যুর ম্নহ্নর্ত থেকে স্বল্পকালের জন্যে তার বোধশক্তিই ল্নপ্ত হয়ে গেল। সহকর্মীরা হয়ত বলল, 'খাও, বানচাক!'; বানচাক খেল, চোয়ালদ্নটো আস্তে আস্তে উঠল নামল। যখন ঘ্নমোবার সময় হল, তারা বলল, 'এবার ঘ্নমোও!' বানচাক শ্নয়ে পড়ল।

বাস্তব জগত থেকে বিচ্যুত হয়ে চার চারটে দিন এমনিভাবেই কেটে গেল। পঞ্চম দিনে রাস্তায় ক্রিভোশ্নলিকোভের সঙ্গে দেখা হতেই সে তার হাত চেপে ধরল। ক্রিভোশ্নলিকোভ বলল:

—'আরে, এই যে! তোমাকেই যে খ্নজে বেড়াচ্ছি।' কি ঘটেছে তা সে জানে না। বানচাকের পিঠে বন্ধ্নর মত চাপড় মেরে উদ্বেগের হাসি হেসে বলল: 'কি হয়েছে তোমার? মদ টদ ধরনিতো? কসাকদের জড় করার জন্যে ডনের উত্তর অঞ্চলে আমরা একটা দল পাঠাচ্ছি, তা শ্ননেছ? পোদ্নতিয়েলকোভ্ দলটাকে নিয়ে যাচ্ছে। উত্তরের কসাকদের ওপরেই আমাদের যা কিছ্ন আশা ভরসা। নইলে এখানে ফাঁদে পড়ে যাব। তুমি যাবে? প্রচারের জন্যে কিছ্ন লোকের দরকার। তুমি চল, যাবে?'

—'যাব।' বানচাক সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

—'বাঃ, চমৎকার হবে। কালই আমরা যাচ্ছি।'

সেই একই রকম পরিপ্নর্ণ মানসিক নির্বেদে বানচাক যাত্রার গোছগাছ করল; পরদিনই দলের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে রওনা হল।

॥ পাঁচ ॥

এই সময় ডনের সোবিয়েত সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর মারাত্মক হয়ে উঠেছে। জার্মান দখলদার-বাহিনী ইউক্রেন থেকে প্নবম্নখে এগিয়ে আসছে, ডনের ভাটি অঞ্চলের জেলাগ্নলো প্রতি-বিপ্লবী বিদ্রোহে টগবগ করছে। ডনের ওপারে স্তেপ অঞ্চলে পোপোভ ওৎ পেতে আছে, যে কোন ম্নহ্নর্তে সে নোভোচেরকাশ আক্রমণ করে বসতে পারে। বিদ্রোহী কসাকদের হাত থেকে রোস্তোভকে বাঁচাবার জন্যে সে মাসের প্রথম দিকে প্রাদেশিক সোবিয়েতের কংগ্রেসের অধিবেশনে একাধিকবার বাধা পড়ল। শ্নধ্ন ডনের উত্তরেই বিপ্লবের আগ্নন তখনো পর্যন্ত জ্বলছে, ভাটি অঞ্চলে, সমর্থনের

সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ ও অন্য সকলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওই আগুনের দিকে আকৃষ্ট হল। পোদ্‌তিয়েল্‌কোভ হালে ডনের গণ-কমিশারদের কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। লাগুতিনের উদ্যোগে পোদ্‌তিয়েলকোভ ঠিক করল, উত্তরে গিয়ে লড়াই-ফেরতাদের দু-তিনটে রেজিমেণ্ট জড় করবে, তাদের নিয়ে জার্মান আর ভাটি অঞ্চলের প্রতিবিপ্লবীদের বাধা দেবে। পাঁচজনকে নিয়ে সৈন্য জড় করার এক জরুরি কমিশন তৈরি হল, পোদ্‌তিয়েলকোভ তার সভাপতি; সই কাজের জন্যে কোষাগার থেকে সোনা আর জারের টাকায় এক কোটি রুবল নেওয়া হল; প্রধানত কামেন্‌স্কা জেলার কসাকদের নিয়ে তাড়াহুড়ো করে পাহারাদার দল গড়া হল। ১৪ই মে অভিযাত্রী দল উত্তরের পথ ধরল।

ইউক্রেন থেকে হটে আসা রেড-গার্ডরা রেল-পথে ভিড় জমিয়েছে। বিদ্রোহী কসাকরা পুল ভেঙে দিচ্ছে, ট্রেন ধ্বংস করছে। প্রত্যেক দিন সকালে জার্মান উড়ো-জাহাজের ঝাঁক রেললাইন বরাবর নোভোচের্‌কাশ থেকে কামেন্‌স্কায় উড়ে যায়, শকুনের ঝাঁকের মত নীচে ছোঁ মেরে রেড-গার্ড দলগুলোর ওপরে মেসিন-গান চালায়। সর্বত্রই সীমাহীন ধ্বংসের চিহ্ন: আগুনে পোড়া, চূর্ণবিচূর্ণ কামরা, টেলিগ্রাফের খুঁটির চারপাশে ঝোলা ছেঁড়া তার, ধ্বসে পড়া বাড়ি, আর নিশ্চিহ্ন বেড়া. যেন ঘূর্ণিঝড়ে সবকিছু ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

পাঁচদিন ধরে অভিযাত্রী দল রেললাইন বরাবর মিল্লেরোভোর দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। ছয় দিনের দিন পোদ্‌তিয়েল্‌কোভ্‌ কামরার মধ্যে কমিশনের সভা ডাকল। সে প্রস্তাব করল:

—'এভাবে আর এগুনো যায় না। আমার মতে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বাকি রাস্তা হেঁটে যাওয়াই উচিত।'

—'বলছেন কি?' লাগুতিন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'আমরা এগিয়ে যাবার পথেই 'হোয়াইট'রা সোজাসুজি ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

—'এখান থেকে বড় দূর।' ম্রিখিনও সন্দেহ প্রকাশ করল।

ম্যালেরিয়ায় ভুগে. কুইনিন খেয়ে খেয়ে ফ্যাকাশে ক্রিভোশ্‌লিকোভ গ্রেটকোট মুড়ি দিয়ে চুপচাপ বসে ছিল। সে আলোচনায় কোন অংশ নেয়নি, চিনির বস্তার মত জবুথবু হয়ে পড়ে ছিল। পোদ্‌তিয়েল্‌কোভ রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করল:

—'ক্রিভোশ্‌লিকোভ্‌, তুমি যে বোবা হয়ে রইলে; তোমার কি মত?'

—'প্রশ্নটা কি?'

—'তুমি শুনছিলে না? আমাদের পায়ে হেঁটে এগুতে হবে, নইলে ধরা পড়ে যাব। তুমি কি মনে কর? তুমি তো আমাদের সকলের চেয়ে বেশি লেখাপড়া শিখেছ।'

—'হেঁটে এগুনো যায়।' ক্রিভোশ্‌লিকোভ্‌ ভেবেচিন্তে মত দিল।

—'বেশ!' পোদ্‌তিয়েল্‌কোভ খুশী হল।

একটা ম্যাপ খুলল সে, ম্রিখিন দুইকোণা ধরে উঁচু করে রইল। 'আমরা এই রাস্তা ধরে যাব।' ম্যাপের গায়ে তামাকের ছোপলাগা আঙুল বুলাতে বুলাতে পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ বলল। 'শ-দেড়েক মাইল হবে বোধহয়। তাই না?'

—'ওই রকমই হবে।' লাগুতিন সায় দিল।

অন্যদের চটাবার মত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ক্রিভোশ্‌লিকোভ, বলল:

—'আমি কোন আপত্তি তুলছি না।'

—'তাহলে কসাকদের এক্ষুণি ট্রেন থেকে নামতে বলে আসি। আর সময় নষ্ট

কন্নার অর্থ হয় না।' ম্রিখিন উদ্বিগ্ন হয়ে চারধারে তাকাল; আর কোন বাধা না পেয়ে তড়াক করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে গেল।

॥ ছয় ॥

গ্রেটকোটে মাথা ঢেকে বানচাক কামরার মধ্যে শ্রুয়েছিল। অতীতের সেই চেতনা, সেই একই যন্ত্রণার ঘটনাচক্রের মধ্যে সে বারবার ঘ্রুরপাক খাচ্ছিল। তার বাষ্পাচ্ছন্ন দ্রুষ্টির সামনে বরফ-ঢাকা স্তেপ দ্রুর দিগন্তের অরণ্যরেখার ঘের দেওয়া বিশাল একটা র্পোর টাকার মত পড়ে রইল। তার মনে হল, যেন ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগছে, আন্না তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তার কাল চোখ ম্রুখের কঠোর কোমল রেখাগ্রুলো, নাকের ওপরে মেচেতার ছোট ছোট বিন্দ্রু, ভুর্রুর চিন্তিত কুঞ্চন বানচাকের চোখে পড়ছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে যে-কথাগ্রুলো বেরিয়ে আসছে তা সে ধরতে পারছে না: কথাগ্রুলো অস্পষ্ট, অদ্ভুত কণ্ঠস্বর আর খিলখিলে হাসিতে ভাঙা ভাঙা। কিন্তু চোখের তারার ঝলকানি আর চোখের পাতার কম্পনেই বানচাক ব্রুঝতে পারল সে কি বলছে।

কিন্তু তারপরই সে আর এক আন্নাকে দেখতে পেল: ম্রুখখানা নীলচে-হল্দে, গালে চোখের জলের ছোপ, নাকটা কোঁচকানো, ঠোঁটদ্রুটো যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে। তার কালো চোখে চুম্রু খাওয়ার জন্যে ঝ্রুঁকে পড়ল বানচাক। আর্তনাদ করে উঠে, ফোঁপানি থামানোর জন্যে নিজের টুঁটিই নিজে টিপে ধরল। ম্রুহ্রুর্তের জন্যেও আন্না তার চোখের সামনে থেকে সরে গেল না। এতটা সময় কেটে গেল, তব্রু তার ম্রুর্তি অস্পষ্ট হল না কিংবা মলিন হল না। তার ম্রুখ, তার অবয়ব, হাঁটা, ভঙ্গি, ভুর্রুর বঙ্কিমতা, সব কিছ্রু মিলে তাকে জীবন্ত, প্রুর্ণায়তন করে তুলল। তার কথা, তার কল্পনারঙীন উচ্ছ্বাস, একসঙ্গে থাকতে গিয়ে যা কিছ্রু দেখেছে শ্রুনেছে সবই মনে করতে লাগল বানচাক। আর স্ম্রুতিতে জাগ্রত সে-ম্রুর্তি এমনই জীবন্ত হয়ে উঠল যে তাতে তার যন্ত্রণা আরও দশগ্রুণ বেড়ে গেল।

নিজের বর্তমান মানসিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করার কোন চেষ্টাও সে করল না, য্রুক্তিহীনের মত, অন্ধ পশ্রুর মত, নিজেকে সে শোকের হাতে স'পে দিল। আর এমনি করে শোকের শেকলে বাঁধা পড়ে সে মরতে বসল: পোকায় গোড়া-খাওয়া ওকগাছ যেমন করে মরে।

যখন গাড়ি থেকে নেমে পড়ার হ্রুকুম এল, তাকে জাগানো হল। সে জাগল, উদাসীনের মত নিজেকে টেনে তুলে বাইরে চলে গেল। মালপত্তর নামাতে সাহায্য করল। সেই একই রকম ঔদাসীন্যে একটা গাড়িতে উঠে ঘোড়া ছ্রুটিয়ে দিল।

ঝিরঝিরে ব্রুষ্টি পড়ছে। রাস্তার দ্রু-পাশের নীচু নীচু ঘাসগ্রুলো ভিজে উঠেছে। উন্ম্রুক্ত, উদার স্তেপ; ঢাল্রুতে, খানায়, খন্দে বাধাবন্ধনহীন বাতাস ঝাপটা দিয়ে ফিরছে। পেছনে ইঞ্জিনের ধোঁয়া, স্টেশনের লাল লাল চকবন্দী বাড়িগ্রুলো। পাশের গ্রাম থেকে ভাড়া করা চল্লিশখানা গাড়ি রাস্তা ধরে গড়িয়ে চলল। ঘোড়াগ্রুলো আস্তে আস্তে চলতে লাগল। ব্রুষ্টিতে ভেজা, আঠালো মাটিতে চলার বাধা ঘটতে লাগল। চাকার সঙ্গে কাদা আটকে গেল, কালো পশমের তালের মত ছটকে ছটকে পড়তে লাগল। তাদের

সামনে পেছনে দলে দলে খনিমজুররা পালিয়ে চলেছে; পরিবার পরিজন নিয়ে, হৃত-দরিদ্র সম্পত্তি নিয়ে কসাকদের প্রতিহিংসার হাত থেকে বাঁচার জন্যে তারা পালাচ্ছে পুবমুখো।

॥ সাত ॥

বেশ কয়েকদিন ধরে চলে চলে অভিযাত্রীদল ডন প্রদেশের একেবারে অভ্যন্তরে এসে পেঁছুল। ইউক্রেনীয়দের গ্রামগুলোর লোকেরা তাদের সর্বত্র একই রকম আতিথেয়তায় অভ্যর্থনা জানাল, স্বেচ্ছায় খাবারদাবার, ঘাসবিচালি বেচল, আশ্রয় দিল।

কিন্তু যতই কসাকদের দেশের দিকে এগুতে লাগল, পোদ্‌তিয়েল্‌কোভ ও অন্যান্য নেতারা ততই শঙ্কিত হয়ে পড়তে শুরু করল। লোকের ভাবভঙ্গির পরিবর্তন চোখে ধরা পড়ল, তারা প্রকাশ্য বিদ্বেষের ভাবই দেখতে লাগল। অনিচ্ছায় খাবারদাবার বেচে, কিছু জিজ্ঞাসা করলে এড়িয়ে যায়। তাদের এই শীতল অভ্যর্থনায় খেপে চটে মরিয়া হয়ে, অভিযাত্রীদলের একজন কসাক এক গ্রামের বারোয়ারিতলার মাটিতে তলোয়ারের কোপ মেরে গর্জন করে উঠল।

—'তোরা মানুষ না শয়তান? চুপ করে আছিস কেন, শালারা? তোদের অধিকারের জন্যে আমরা নিজেদের রক্ত ঢালছি, আর শালা, তোরাই কাছে ঘেঁসবি নে! সব এক হয়ে গেছে, ভাইসব, কসাক আর 'হোখোল' বলে আর কিছু নেই, কেউ তোমাদের গায়ে হাত দেবে না। এখুনি ডিম নিয়ে এসো, মুরগী নিয়ে এসো, আমরা সব কিছুর দামই জারের টাকায় দেব।'

খোয়ালের সঙ্গে বাঁধা ঘোড়ার মত ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণভাবে ছয়জন ইউক্রেনীয় তার কথা শুনে গেল। একজনও তার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় কোন সাড়া দিল না। বিভিন্ন দিকে কেটে পড়তে পড়তে মাত্র একটি কথাই বলে গেল: 'অমন গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে লাভ নেই!'

সেই গ্রামেই একজন ইউক্রেনীয় স্ত্রীলোক এক কসাককে প্রশ্ন করল:

—'তোমরা সব কিছু লুটে নেবে, সবাইকে কেটে ফেলবে, একথা কি সত্যি?'

নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কসাকটি উত্তর দিল:

—'হ্যাঁ, সত্যি। সবাইকে কাটতে নাও পারি, কিন্তু সব বুড়োদের কেটে ফেলব।'

—'ওরে বাবারে! কিন্তু তাদের কাটবে কিসের জন্যে?'

—'আমরা কাবাব রেঁধে খাই যে। ভেড়ার মাংসে তেমন খুশবু নেই, তত সোয়াদও নেই, তাই বাপঠাকুর্দাদের আমরা হাঁড়িতে চাপিয়ে খাসা ঝোল রেঁধে ফেলি...'

—'সত্যি বলছ, ঠাট্টা করছ না তো?'

—'না, মা, ও মিছে কথা বলছে!' ম্রিখিন বাধা দিল, তারপর কসাকটির দিকে ফিরে বলল:

—'ঠাট্টা রসিকতা কেমন করে করতে হয়, কার সঙ্গে করতে হয়, সেটা শেখ! এই সব গল্প ছড়িয়ে বেড়াচ্ছ কেন? এখুনি গিয়ে সবাইকে বলে বেড়াবে, আমরা বুড়োদের কেটে ফেলি।'

॥ আট ॥

উদ্বেগ ও আশঙ্কায় পীড়িত পোদ্‌তিয়েলকোভ্ পথের মাঝখানে থামা ও রাত্রি-কালীন বিশ্রামের সময় কমিয়ে দিয়ে অভিযাত্রীদলকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলল। ডনের উত্তর এলাকায় পা দেবার আগের দিন লাগ্‌ুতিনের সঙ্গে তার অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল। সে বলল:

—'খুব বেশিদূর আর যাওয়ার মানে হয় না, ইভান। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সৈন্যদল জড় করার কাজ শুরু করে দেব। সৈন্যদলে নাম লেখাবার একটা ঘোষণা জারি করব, ভাল মাইনে দেব, চলতে চলতেই লোক জড় করব। মিখেইলোভ্‌স্কোয়েয় পেঁছুনোর মধ্যেই একটা ডিভিসন হাতে পেয়ে যাব। তোমার কি মনে হয়, লোক জড় করা যাবে না?'

—'যাবে, যদি সবকিছু তখনো পর্যন্ত শান্ত থাকে,'

—'তাহলে, তোমার মনে হচ্ছে 'হোয়াইট'রা আগেই শুরু করে দিতে পারে?'

—'কে জানে?' লাগ্‌ুতিন তার পাতলা দাড়িতে টোকা মারল, তারপর, হতাশভাবে বলল:

—'আমরা দেরি করে ফেলেছি...আশঙ্কা হচ্ছে, আমরা ব্যর্থ হব। অফিসাররা ইতিমধ্যেই ওখানে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে..'

—'আমরা তাড়াতাড়ি তো করছিই! ভয় পেওনা! তোমার ভয় পেলে চলবে না!' পোদ্‌তিয়েলকোভ্ উত্তর দিল, তার চোখদুটো ঝকঝক করে উঠল। 'আমরা ভেঙ্গে বেরিয়ে যাব। দু সপ্তাহের মধ্যে আমরা ডন থেকে জার্মান আর হোয়াইটদের ঝেঁটিয়ে তাড়াব।' সিগারেটে জোরে জোরে টান দিয়ে সে তার গোপন চিন্তাই ব্যক্ত করল: 'যদি আমাদের খুব বেশি দেরি হয়ে থাকে, তাহলে সব শেষ, আর আমাদের সঙ্গে ডনের সোবিয়েত শাসনও খতম! আমাদের বেশি দেরি হলে চলবে না। যদি আমাদের পেঁছুনোর আগেই অফিসাররা বিদ্রোহ ঘটিয়ে থাকে, তাহলে এখানেই যবনিকা পতন।'

॥ নয় ॥

পরদিন সন্ধ্যের দিকে তারা কসাকদের মাটিতে পা দিল। সবচেয়ে আগের গাড়িতে লাগ্‌ুতিন আর ক্রিভোশ্‌লিকোভের সঙ্গে পোদ্‌তিয়েলকোভ্ বসে। প্রথম গ্রামখানার কাছে আসতেই দেখতে পেল স্তেপেতে গরুবাছুর চরছে। লাগ্‌ুতিনকে বলল, 'চল, গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করি।'

দুজনে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে লম্বালম্বা পা ফেলে গরুবাছুরের পালের দিকে এগিয়ে গেল। যে গরু চরাচ্ছিল তাকে পোদ্‌তিয়েলকোভ্ নমস্কার করে বলল:

—'সব ভালত, কর্তা!'
—'ভাল!' লোকটা উত্তর দিল।
—'তারপর, তোমাদের এদিককার হালচাল কি?'
—'বলার মত কিছুই নেই। কিন্তু আপনারা কারা বটেন?'
—'আমরা সব সেপাই, বাড়ি ফিরছি।'
—'সেই পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌টা আপনাদের সঙ্গে আছে, তাই না?'
—'হ্যাঁ।'

স্পষ্টই বোঝা গেল উত্তর শুনে লোকটা ভয় পেল, সে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ জিজ্ঞেস করল:

—'ব্যাপার কি, কর্তা?'
—'কেন, ওরা যে বলে, আপনারা সব 'সনাতনী' খৃষ্টানদের মেরে ফেলবেন।'
—'বাজে কথা। এ সব কেচ্ছা কে ছড়াচ্ছে?'
—'দুদিন আগের জমায়েতে আতামানইতো সেই কথা বলল।'
—'তাহলে আবার তোমাদের আতামান হয়েছে?' পোদ্‌তিয়েলকোভের দিকে একবার তাকিয়ে লাগুতিন প্রশ্ন করল।
—'কয়েকদিন আগে আমরা একজনকে ঠিক করেছি। সোবিয়েত ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ লম্বা লম্বা পা ফেলে গাড়ির কাছে ফিরে গিয়ে কোচোয়ানকে খেঁকিয়ে উঠল, 'ঘোড়া ছোটাও!' গাড়ির মধ্যে জবুথবু হয়ে বসে আরো জোরে ছোটানোর জন্যে কসাক কোচোয়ানকে হরদম তাড়া দিতে লাগল।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আকাশ মেঘে ঢাকা। শুধু পূবদিকে সূর্যাস্তের রঙ মাখানো উৎকট-নীল আকাশের একটা টুকরো মেঘের ফাঁকে উঁকি মারছে। ঢালু পথে একটা ছোট পল্লীর দিকে নামতে নামতে তারা দেখতে পেল লোকজন দৌড়ুচ্ছে, গোটাকয়েক গাড়ি পল্লীর বাইরের রাস্তা বরাবর পাল্লা দিয়ে ছুটছে।

—'ওরা পালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেখে ভয় পেয়েছে...' অন্য সকলের দিকে তাকিয়ে লাগুতিন হতবুদ্ধির মত বলে উঠল।

পল্লীর মধ্যে দিয়ে অভিযাত্রীদলের গাড়িগুলো গড়গড়িয়ে চলল। জনশূন্য রাস্তায় বাতাস ঘুরপাক খেয়ে ফিরছে। এক বাড়ির উঠোনে একটি বৃদ্ধা গাড়ির মধ্যে বালিশগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে, খালি পায়ে খালি মাথায় তার স্বামী ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

এদের কাছ থেকে জানতে পারল, থাকার জায়গা ঠিক করার জন্যে আগেভাগে যাকে পাঠানো হয়েছিল, কসাক টহলদাররা তাকে পাকড়াও করে নিয়ে চলে গিয়েছে। স্পষ্টই বোঝা গেল, কসাকরা খুব বেশি দূরে নেই। ফিরে যাওয়া হবে কি না সে সম্পর্কে অভিযাত্রীদলের নেতারা অল্পক্ষণ আলোচনা করল। প্রথমদিকে পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ এগিয়ে যাবার জন্যেই পীড়াপীড়ি করল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার সে দোমনা করতে লাগল। একজন কসাক প্রচারক তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল:

—'আপনার কি বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে! আপনি আমাদের কোথায় ঠেলে দিতে চান? প্রতি-বিপ্লবীদের হাতে? আমরা ফিরে যাচ্ছি! আমাদের মরার কোন ইচ্ছে নেই! ওটা কি? দেখুন, ওই যে?' গ্রামের মাথার ওপরের ঢালুর দিকে সে আঙুল দিয়ে দেখাল।

সবাই পেছন ফিরে পাহাড়ের দিকে চোখ তুলে তাকাল। পাহাড়ের চূড়োয় আকাশের পটভূমিকায় তিনটি ঘোড়-সওয়ারের মূর্তি স্পষ্ট হয়ে আছে। লাগুতিন চেঁচিয়ে উঠল:

—'ওটা ওদের একটা টহলদার দল!'

—'আর ওদিকে; দেখুন দেখুন!'

আরও কয়েকজন ঘোড়-সওয়ারকে দেখা গেল, তারা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, আবার বেরিয়ে এল।

পোদ্‌তিয়েলকোভ ফেরার নির্দেশ দিল। তারা প্রথম ইউক্রেনীয় গ্রামে ফিরে আসতেই দেখতে পেল, লোকজন লুকোবার চেষ্টা করছে, পালাবার আয়োজন করছে; স্পষ্টই বোঝা গেল, কসাকরা আগে থাকতেই সাবধান করে দিয়েছে।

সন্ধ্যে নামল। ঝিরঝিরে, কনকনে বৃষ্টিতে জামা কাপড় ভেদ করে সকলের গা পর্যন্ত ভিজে গেল। রাইফেল উঁচিয়ে ধরে সবাই গাড়ির পাশে পাশে হেঁটে চলল। রাস্তাটা ঘুরপাক খেয়ে এক উপত্যকার মধ্যে নেমে সোজা এগিয়ে গিয়ে ওদিকের টিলা বেয়ে উঠেছে। পাহাড়ের মাথায় মাথায় কসাক টহলদার দলগুলো একটানা আসছে, যাচ্ছে; তারা অভিযাত্রীদলের সঙ্গে সঙ্গেই চলেছে, পিছু হটা বিচলিত বলশেভিকদের অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলছে।

উপত্যকার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা নদীর কাছে এসে পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ তার গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে লোকজনকে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিল, 'তৈরি হও!' নদীর জলে শরতের বন্যার নীল ছায়া। বাঁধ দেওয়া একটা পুকুরের মধ্যে গিয়ে জল পড়ছে। বাঁধটা ঝোপঝাড়ে ঢাকা, বাঁধের নীচের পুকুরে শ্যাওলার পুরু আস্তরণ। এইখানেই পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ চোরা হামলার আশঙ্কা করেছিল, কিন্তু এগিয়ে যাওয়া টহলদারদের কাউকেই দেখতে পেল না।

—'এখানে ওদের দেখা পাবে, তা মনে করো না।' ক্রিভোশ্‌লিকোভ পোদ্‌তিয়েল-কোভ্‌কে ফিসফিস করে বলল। 'ওরা এখন আক্রমণ করবে না। রাতের জন্যে অপেক্ষা করবে।'

॥ দশ ॥

পশ্চিমে নিবিড় মেঘ জমল। রাত্রি নামল। অনেকদূরে ডনের দিকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কমলা রঙের বিদ্যুতের চমকানি আধ-মরা পাখির ডানার মত কেঁপে কেঁপে উঠছে। গাঢ় মেঘের নীচে সূর্যাস্তের আভাটুকু ম্লান হয়ে এল। নিস্তব্ধতা আর কুয়াশায় গোটা স্তেপ কানায় কানায় ভরে উঠেছে: ক্ষীয়মান দিবালোকের শোকাচ্ছন্ন উজ্জ্বলতা উপত্যকার ভাঁজে ভাঁজে ওৎ পেতে আছে। মে মাসের এই সন্ধ্যায় কেমন যেন শরতের রঙ্‌ ধরেছে। এমন কি ঘাসগুলো থেকেও এক অবর্ণনীয় ক্ষয়ের গন্ধ ছড়াচ্ছে। পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ পথ চলতে চলতে সিক্ত ঘাসের পাঁচ-মেশালি গন্ধ শুঁকল। মাঝে মাঝে থেমে নীচু হয়ে সে বুটের কাদা ছাড়াল, আবার সোজা হয়ে বিশাল দেহটা টেনে টেনে ক্লান্ত পায়ে চলতে লাগল।

রাত ঘনিয়ে আসার পর তারা পরের গ্রামটায় এসে পেঁৗছল। কসাকরা গাড়ি ছেড়ে দিল, থাকার জায়গার খোঁজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগল। পাহারা বসানর জন্যে পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ নির্দেশ দিল, কিন্তু সে কাজের জন্যে লোক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর হল। তারা যেতে সোজাসুজি অস্বীকার করল।

—'এই মুহূর্তে সব কটাকে কোর্ট মার্শালে চড়াও! হুকুম তামিল না করার জন্যে গুলি করে মার!' ক্রিভোশ্‌লিকোভ্‌ গর্জন করতে লাগল। কিন্তু পোদ্‌তিয়েল-কোভ্‌ তিক্ত অঙ্গভঙ্গি করে বলল:

—'পথ চলায় ওদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে। ওরা নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টাও করবে না। আমাদের সব শেষ, মিশা!"

লাগুতিন কোনরকমে জনকয়েক লোক জড় করল, তাদের গ্রামের বাইরে পাহারায় দাঁড় করিয়ে দিল। পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ বাড়ি বাড়ি চক্‌কর দিয়ে, যাদের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে তাদের বলতে লাগল:

—'ঘুমিয়ো না, বাছারা! তাহলে ওরা আমাদের পাকড়াও করে ফেলবে!'

হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে সারা রাত সে টেবিলের ধারে বসে রইল, আহত জন্তুর মত জোরে জোরে, টেনে টেনে দম নিতে লাগল। ভোরের ঠিক আগে ঘুমে চোখ ভেঙ্গে এল, টেবিলের ওপর মাথাটা নুয়ে পড়ল। কিন্তু প্রায় তখন তখনই আরও পিছু হটে যাবার প্রস্তুতির জন্যে তাকে জাগানো হল। দিনের আলো ফুটছে। পোদ্‌তিয়েলকোভ উঠোনে এসে দাঁড়াল। বারান্দায় বাড়িউলীর সঙ্গে দেখা হতেই সে নিস্পৃহের মত বলল:

—'পাহাড়ের ওপরে আরও অনেক ঘোড়সওয়ার ঘুরছে।'

উঠোনে দৌড়ে এসে পোদ্‌তিয়েলকোভ তাকাল: গ্রামের মাথার ওপরে, গোচারন মাঠের উইলোগাছগুলোর ওপরে কুয়াশার আবরণ ঝুলছে, তারও পেছনে কসাকদের বড় বড় দল চোখে পড়ছে। গ্রামের চারপাশ ঘিরে লৌহ-চক্রের বেষ্টনী ঘন করে তারা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে।

পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ যেখানে দাঁড়িয়েছিল, অন্যান্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে কসাকরা সেই উঠোনে এসে হাজির হল। একজন তার কাছে এগিয়ে এসে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল:

—'কমরেড পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌...এক্ষুণি ওদের কাছ থেকে প্রতিনিধিরা এসে পেঁৗছেছে।' হাত নেড়ে সে পাহাড়ের দিকে দেখাল। 'ওরা আপনাকে বলতে বলেছে, আমাদের হাতিয়ার ফেলে দিয়ে এখুনি আত্মসমর্পণ করতে হবে। নইলে ওরা আক্রমণ করবে।'

—'ওরে...শুয়োরের বাচ্চা! এতবড় কথা বলার সাহস হল কি করে তোর?' পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ লোকটার গ্রেট-কোটের কলার চেপে ধরে একপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর গাড়ির কাছে ছুটে গেল। বন্দুকের চোঙ্গাটা চেপে ধরে সে পেছন ফিরল, কর্কশ, হেঁড়ে গলায় কসাকদের চিৎকার করে বলল:

—'আত্মসমর্পণ করব? প্রতি বিপ্লবের সঙ্গে আবার কি কথা হতে পারে? আমরা ওদের সঙ্গে লড়ব! এসো আমার পেছনে! হাতিয়ার নাও!'

জনকয়েক কসাক তার পেছনে পেছনে উঠোন থেকে ছুটে এল, তারা দল বেঁধে গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে দৌড়ে গেল। শেষের বাড়িগুলোর কাছে এসে পেঁৗছুতেই খ্রিস্টিন পোদ্‌তিয়েলকোভকে ধরে ফেলল। চেঁচিয়ে বলল:

—'লজ্জার কথা, পোদ্‌তিয়েলকোভ! আমাদের কি নিজেদের ভাই বেরাদারের রক্তপাত করতে হবে? ফিরে এসো!'

অভিযাত্রীদলের অতি সামান্যই তার পেছনে এসেছে, তাই দেখে. লড়াই হলে পরাজয় যে অনিবার্য, তা তলিয়ে বুঝতে পেরে পোদ্‌তিয়েলকোভ ভেঙেপড়া মানুষের মত নিঃশব্দে টুপি নাড়ল:

—'কোন লাভ নেই, ভাই সব! গ্রামে ফিরে চল!'

সবাই ফিরল। পাশাপাশি তিনটে উঠোনে গোটা অভিযাত্রী দল জমায়েত হল। কয়েক মিনিট পরে চল্লিশজন কসাক-ঘোড়-সওয়ারের একটা দল গ্রামে এসে ঢুকল। চারপাশের পাহাড়ে পাহাড়ে শত্রুর মূল দলগুলো যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। আত্মসমর্পণের সর্ত আলোচনার জন্যে পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌কে গ্রামের শেষ প্রান্তে যেতে হল। রাস্তা দিয়ে যাবার সময় বানচাক তাকে ধরে ফেলল, পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে এসে তাকে থামাল। বানচাক জিজ্ঞেস করল:

—'আমরা আত্মসমর্পণ করছি?'

—'গায়ের জোরে ওরা ছাতু বানাবে। আর কি করার আছে?'

—'আপনি মরতে চান?' আপাদমস্তক থর থর করে কেঁপে উঠল বানচাক। বলে দিন 'আমরা আত্মসমর্পণ করব না!' নিরুত্তেজ ভোঁতা গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি আর আমাদের নেতা নন। কার সঙ্গে আপনি আলোচনা করেছেন? কার হুকুমে আপনি আমাদের ধরিয়ে দিতে যাচ্ছেন?'

পেছন ফিরে, লম্বালম্বা পা ফেলে, রিভলবারটা দোলাতে দোলাতে বানচাক চলে এল। আঙ্গিনায় পেঁৗছে সে কসাকদের বোঝাবার চেষ্টা করল, যাতে তারা ভেঙ্গে বেরিয়ে, লড়তে লড়তে রেল-লাইনে পেঁৗছুতে পারে। কিন্তু বেশির ভাগই প্রকাশ্যে আত্মসমর্পণের পক্ষে গেল। কেউ কেউ সরে পড়ল, কেউ কেউ চটে মটে বলল·

—'তুমি নিজে গিয়ে লড়ো; আমরা নিজেদের ভাই বেরাদারকে গুলি করতে যাচ্ছি না।'

—'হাতে হাতিয়ার না থাকলেও ওদের কাছে আমরা নিশ্চিন্ত।'

—'আজ ইস্টার রবিবার, আর আপনি চাইছেন রক্তপাত করতে?'

বানচাক তার গাড়ির কাছে ফিরে গেল। গাড়ির নীচে ওভার-কোটটা বিছিয়ে, হাতের মুঠোয় রিভলবারের বাঁটটা শক্ত করে ধরে শুয়ে রইল। প্রথমটায় সে ভাবল, পালাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু চুপি চুপি দল ছেড়ে পালানোয় তার মন সায় দিল না, পোদ্‌তিয়েলকোভের ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

॥ এগার ॥

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে পোদ্‌তিয়েলকোভ ফিরে এল, বিরাট একদল কসাককে গ্রামের মধ্যে সঙ্গে করে নিয়ে এল। মাথাটা উঁচু করে উদ্ধতভঙ্গিতে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছে। তার পাশে বিদ্রোহী কসাকদের কমাণ্ডার স্পিরিদোনোভ সে একসময় পোদ্‌তিয়েল্‌কোভের সহকর্মী ছিল। তার পেছনে এক কসাক বুকের সঙ্গে সাদা-নিশানের ডাণ্ডাটা চেপে ধরে ঘোড়ায় চলেছে।

যে আঙিনাগ্লোয় অভিযাত্রীদলের গাড়ি কখানা ছিল, তার সামনের রাস্তা কটি নবাগত কসাকদের ভিড়ে গাদাগাদি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বহুকণ্ঠের সোরগোল উঠল। তাদের অনেকেই পোদ্তিয়েলকোভের কসাকদের ভূতপূর্ব সহকর্মী: এ ওকে চিনতে পেরে খুশির চিৎকার, হাসির হররা ছুটল।

—আরে, তুমি প্রোখোর না? তুমি কোত্থেকে উদয় হলে হে?'

—'তোমাদের সঙ্গে প্রায় খুনোখুনি বেধেছিল আর কি!' প্রোখোর জবাব দিল। 'মনে আছে হে, অস্ট্রিয়ানদের কেমন করে কুকুরতাড়া করেছিলাম?'

—'আরে, দানিলো দাদা যে! কিন্তু কবর থেকে উঠেছেন, দাদা।'

—'সত্যিই উঠেছেন!' দানিলো ইস্টারের শুভেচ্ছার জবাব দিল। চুমু খাওয়ার প্রচণ্ড শব্দ উঠল। তারপর দুজনে গালপাট্টায় হাত বুলাতে বুলাতে এ ওর দিকে তাকাতে লাগল, হেসে হেসে এ ওর পিঠে চাপড় মারতে লাগল।

—'আমরা এখনো উপোস ভাঙিনি...'একজন লাল-কসাক বলে উঠল।

—'কিন্তু তোমরা তো বলশেভিক: তোমাদের আবার কিসের উপোস ভাঙতে হয়?'

—'হুঁম! আমরা বলশেভিক হতে পারি, কিন্তু ভগবানেও বিশ্বাস করি ঠিকই।'

—'দূর! মিছে কথা!'

—'মাইরি, দিব্যি।'

—'ক্রুশ পরো?'

—'নিশ্চয়ই। এই তো।' রেড-গার্ডটা উর্দির কলারের বোতাম খুলে সার্টের নীচে থেকে একটা তামার ক্রুশ টেনে বার করল।

ক্ষেতের নিড়ুনি আর খন্তা কুড়ুল নিয়ে যে বুড়োর দল 'ডাকাত' পোদ্তিয়েল-কোভকে ঠেঙাতে এসেছে তারা অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। 'কেন, ওরা যে বলল তোমরা খৃষ্টানধর্ম ত্যাগ করেছ।' একজন বলে উঠল, 'আমরা শুনেছি তোমরা গির্জা লুট করছ, পাদ্রীদের খুন করছ।'

—'সব মিথ্যে কথা!' তাকে আশ্বস্ত করার জন্যে বেশ জোর দিয়ে রেড-গার্ডটি বলল। 'ওরা যত সব মিথ্যে কথা তোমাদের বলছে। এই তো, রোস্তোভ থেকে আসার আগে আমি গির্জায় গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছি।'

রাস্তায়, আঙিনায় উত্তেজিত আলোচনার গুঞ্জন উঠতে লাগল। আধঘণ্টাটেক পরে ধাক্কা দিয়ে ভিড় সরাতে সরাতে একদল কসাক এসে ঢুকল। তারা চেঁচাতে লাগল, 'পোদ্তিয়েলকোভের দলের লোকজন সার বেঁধে দাঁড়াও।'

তাদের পেছনে পেছনে এল লেফটানাণ্ট স্পিরিদোনোভ। টুপিটা খুলে নিয়ে সে বলতে শুরু করল:

—'পোদ্তিয়েলকোভের দলের যারা, তারা সবাই বেড়ার ধারে এগিয়ে যাও। অন্য সবাই ডান দিকে। লড়াই-ফেরতা, ভাই সব! তোমাদের নেতাদের সঙ্গে একযোগে আমরা ঠিক করেছি তোমাদের হাতিয়ার ছাড়তে হবে, কারণ, তোমাদের হাতে হাতিয়ার থাকলে লোকজন ভয় পাবে। তোমাদের রাইফেল আর অন্যান্য হাতিয়ার গাড়ির মধ্যে রাখ। আমরা একযোগে পাহারা দেব। তোমাদের আমরা ক্রাস্নোকুৎস্কে পাঠাচ্ছি, সেখানে যার যার হাতিয়ার আবার ফেরত পাবে।'

রেড-গার্ড কসাকদের মধ্যে থেকে অসন্তোষের তীব্র গর্জন উঠল, একজন চিৎকার করে বলল:

—'আমরা হাতিয়ার ছেড়ে দেব না!'

স্পিরিদোনোভের অধীনের কসাকরা ডান দিকে সরে গেল, রেড-গার্ডরা রাস্তার মাঝখানে মনমরা হয়ে এলোমেলো ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল। ক্রিভোশ্লিকোভ্ চারধারে বিষদৃষ্টিতে তাকাতে লাগল, ওদিকে লাগুতিন ঠোঁট কামড়াতে লাগল। বানচাক স্থির সিদ্ধান্ত করেছিল, সে হাতিয়ার হাতছাড়া করবে না। রাইফেলটা টানতে টানতে পোদ্তিয়েলকোভের দিকে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল। বিড়বিড় করে বলল:

—'আমরা কিছুতেই হাতিয়ার ছেড়ে দেব না! শুনছেন?'

—'বড্ড দেরি হয়ে গেছে এখন।' পোদ্তিয়েলকোভ্ ঘাড় ফিরিয়ে ফিস ফিস করে বলল।

সে-ই সকলের আগে রিভলবারের খাপ খুলল। সেটা হাতে তুলে দিতে দিতে ভাঙাগলায় বলল:

—'আমার তলোয়ার আর রাইফেলটা গাড়িতে আছে।'

রেড-গার্ডরা মনমরা হয়ে হাতিয়ারগুলো তুলে দিল, কেউ কেউ বেড়ার আড়ালে, উঠোনে রিভলবার লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করল। বানচাকের নেতৃত্বে জনকয়েক রাইফেল ছেড়ে দিতে অস্বীকার করল, জোর করে তাদের হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া হল। মেসিন-গানের ট্রিগার নিয়ে একজন গানার গ্রাম ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করল। হৈচৈ সোরগোলের মধ্যে জনকয়েক ডুব মারল। স্পিরিদোনোভ তৎক্ষণাৎ পোদ্তিয়েল্কোভ আর বাদবাকির সামনে পাহারা দাঁড় করিয়ে দিল, খানাতল্লাস করে নাম ডাকার চেষ্টা করল। কিন্তু বন্দীরা অনিচ্ছুকভাবে উত্তর দিতে লাগল, চেঁচাতে লাগল:

—'নামের ফর্দ মেলাচ্ছেন কেন? সবাই এখানে আছি।'

—'আমাদের ক্রাস্নোকুৎস্কে নিয়ে চলুন।'

—'রং তামাসা বন্ধ করুন।'

টাকার সিন্দুক শিল করে কড়া পাহারায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। স্পিরিদোনোভ বন্দীদের জড় করল। সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর ও মুখের ভাব পালটে হুকুম দিল:

—'দু-সার করে! বাঁ-দিকে! কুইক মার্চ! কথা বলা চলবে না!'

রেড-গার্ডদের সারের ওপর দিয়ে বহুকণ্ঠের এক হুঙ্কার গড়িয়ে গেল। তারা অনিচ্ছায় মার্চ করতে করতে তাড়াতাড়ি সার ভেঙে, এলোমেলো ভিড় করে হেঁটে চলল।

পোদ্তিয়েলকোভ্ যখন তার লোকজনকে হাতিয়ার তুলে দিতে বলেছিল, নিঃসন্দেহে তখনো তার আশা ছিল, এ ব্যাপারের অনুকূল পরিণতি হবে। কিন্তু বন্দীদের গ্রাম থেকে বার করে আনার সঙ্গে সঙ্গেই, পাহারাদার কসাকরা বাইরের লোকজনের গায়ে দু-পাশে চাপ দিতে শুরু করল। বানচাক বাঁ দিক ধরে হাঁটছিল। লাল টকটকে দাড়িওয়ালা, বহুদিনের ব্যবহারে জীর্ণ, কালো মাকড়ি-কানে এক বুড়ো কসাক তাকে অহেতুক চাবুকের বাড়ি মেরে বসল। চাবুকের ডগা তার গালে লাগল। ঘাড় ফিরিয়ে সে হাতটা মুঠো করল, কিন্তু আরও তীব্র দ্বিতীয় এক বাড়ি খেয়ে বন্দীদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে বাধ্য হল। আত্মরক্ষার সহজাত সংস্কারের তাড়াতে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে এমন ধারা করতে হল; মানুষের বাঁচার ইচ্ছাটা কত প্রচণ্ড, কত প্রবল, অবাক হয়ে এইটেই অনুভব করে, আন্নার মৃত্যুর পর তার এই সর্বপ্রথম ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল।

কসাকরা বন্দীদের পিটতে শুরু করল। অসহায় শত্রুদের দেখতে পেয়ে ক্ষিপ্ত

বন্ধের দল তাদের গায়ের ওপরেই ঘোড়া চালিয়ে দিল, জিন থেকে ঝুঁকে পড়ে চাবুক আর তলোয়ারের চ্যাপ্টা দিক দিয়ে ঠেঙাতে লাগল। গুঁতোগুঁতি করে, চেঁচাতে চেঁচাতে, বন্দীরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাঝখানে পেঁছুবার চেষ্টা করতে লাগল। একজন লম্বামত রেড-গার্ড মাথার ওপরে হাত ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে উঠল:

—'যদি মারতে চাস তো এখুনি আমাদের মেরে ফেল। নিকুচি করেছি তোদের! এত যন্ত্রণা দিচ্ছিস কেন?'

কিছুক্ষণ পরে বুড়োদের নিষ্ঠুরতা কমল। একজন বন্দীর প্রশ্নের জবাবে এক পাহারাদার বিড়বিড় করে বলল:

—'তোমাদের পোনামারিওভে নিয়ে যাওয়ার হুকুম। ভয় পেয়োনা, ভাইসব; তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না।'

যখন তারা পোনামারিওভে এসে পেঁছুল, স্পিরিদোনোভ তখন একটা ছোট দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে। বন্দীরা একে একে ভেতরে ঢুকতে লাগল, আর সে জিজ্ঞেস করতে লাগল:

—'পদবী কি? নাম? কোথায় বাড়ি?'

বানচাকের পালা এল। 'তোমার পদবী?' কাগজের গায়ে সাগ্রহে পেন্সিল ঠেকিয়ে স্পিরিদোনোভ জিজ্ঞেস করল। রেড-গার্ডের থমথমে মুখের দিকে একবার তাকাল সে। থুথু ছোটানোর জন্যে তার ঠোঁটদুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠতে দেখেই তড়াক করে সরে এসে চেঁচিয়ে উঠল:

—'এগিয়ে যা, শুয়োরের বাচ্চা! তুই বে-নামেই মরবি।'

বানচাকের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে পরের সবাই নাম বলতে অস্বীকার করল, বে-নামে মৃত্যুই তাদের কাম্য। যখন সর্বশেষ বন্দীটি দোকান ঘরের মধ্যে ঢুকল, স্পিরিদোনোভ দরজায় তালা মেরে চার পাশে পাহারা দাঁড় করিয়ে দিল।

॥ বার ॥

অভিযাত্রীদলের গাড়িগুলো থেকে লুঠের মাল নিযে যখন দোকানের কাছে ভাগাভাগি চলছে, তখন, যারা এই পাকড়াও করার ব্যাপাবে অংশ নিয়েছিল সেই সমস্ত গ্রামের প্রতিনিধিদের তাড়াহুড়ো করে গড়া ফৌজী আদালতের বৈঠক চলছে কাছাকাছি একটা বাড়িতে। বিরাট তাগড়াই চেহারার, হলদে চুলো এক ক্যাপ্টেন আদালতের সভাপতি। টেবিলের ওপরে কনুই দুটো ছড়িয়ে সে বসে আছে, টুপিটা মাথার পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া। তার তেলতেলে, খুশীখুশী চোখ দুটো আদালতের সদস্যদের একজন থেকে আর একজনের দিকে সপ্রশ্নভাবে ঘুরছে। সে আবার প্রশ্ন করল:

—'মাতব্বররা বলুন, ওদের আমরা কি ব্যবস্থা করব? ওরা আমাদের ঘরবাড়ি লুট করতে কসাকদের ধ্বংস করতে আসছিল, ওই দেশদ্রোহীদের নিয়ে আমরা কি করব?'

ঢাকনা খোলা বাক্স থেকে স্প্রিংয়ের পুতুলের মত এক বুড়ো লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল:

—'গুলি করে মারুন! সবকটাকে গুলি করে মারুন!' ভূতে পাওয়ার মতো মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উন্মত্তদৃষ্টিতে চারধারে তাকাতে লাগল। থুথু ছিটাতে ছিটাতে সে চেঁচাতে লাগল:

—'কোন দয়ামায়া দেখান হবে না, যত সব বিভীষণ! কোতল করুন! গুঁড়ো করে ফেলুন! গুলির মুখে পাঠিয়ে দিন!'

—'দ্বীপান্তরে পাঠাবেন?' পাঠাবেন?' একজন সদস্য দো-মনা করে প্রস্তাব তুলল।

—'গুলি করে মারুন!'

—'মৃত্যুদণ্ড!'

—'প্রকাশ্যে ফাঁসি!'

—'গুলি করে তো মারা হবেই। ও নিয়ে কেন সময় নষ্ট করছেন?' স্পিরিদোনোভ চটেমটে চেঁচিয়ে উঠল।

সেই চিৎকারে সভাপতির মুখের আত্মসন্তুষ্ট, ভালমানুষী ভাবটুকু মিলিয়ে এল। ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে এঁটে গেল। কেরানীকে হুকুম করল:

—'লেখ! গুলি করে মারা হবে!'

—'পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ আর ক্রিভোশলিকোভ্‌? তাদেরও কি গুলি করা হবে? সেটা তো ওদের পক্ষে মঙ্গলই হল।' জানলার ধারে বসে থাকা এক নাদুসনুদুস চেহারার কসাক আগুন হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

—'নেতা হিসেবে তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে।' সভাপতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল। কেরানীর দিকে ঘুরে হুকুম করল, 'লেখ: আদালতের রায়। আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারীরা...'

তেলের অভাবে আলোটা দপ দপ করে উঠল, পলতে ধোঁয়াতে শুরু করল। ঘরের ছাতে মাকড়সার জালে আটকা পড়া একটা মাছির ভনভনানি, কাগজের ওপরে কলম চলার খস খস শব্দ, আর আদালতের একজন সদস্যের টানাটানা হাঁপানির নিঃশ্বাস স্তব্ধতার মধ্যে স্পষ্ট কানে আসতে লাগল।

আসামীদের সকলের নাম লেখা শেষ হলে পাশের লোকটির হাতে কলমট গুঁজে দিয়ে কেরানী বলল:

—'সই করুন!'

আড়ষ্ট আঙুলে কলম ধরে সে অপরাধীর হাসি হেসে বলল, 'আমার লেখাটেখা তত আসে না।' আদালতের সমস্ত সদস্য সই করার পর সভাপতি উঠে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

—'এর জন্যে পরপার থেকে কালেদিন আমাদের ধন্যবাদ দেবেন।' কেরানীকে দেয়ালের গায়ে কাগজটা সাঁটতে দেখে একজন হাসল।

কেউ সে রসিকতার জবাব দিল না। নিঃশব্দে ঘর থেকে সবাই বেরিয়ে এল।

—'হে যিশু...' বারান্দার অন্ধকারে কে একজন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

॥ তের ॥

তালাবন্ধ ঘরের মধ্যে সে রাতে কোন বন্দীর চোখেই তেমন ঘুম এল না। কথাবার্তা ঝিমিয়ে পড়ল। বন্ধ-বাতাস আর উদ্বেগে দম আটকে আসে। একজন সন্ধ্যের দিকে পাহারাদারকে জিজ্ঞেস করেছিল:

—'দরজা খোলো, কমরেড। বাইরে যেতে হবে যে...'

—'ওসব 'কমরেড' টমরেড চলবে না।' অবশেষে একজন পাহারাদার উত্তর দিয়েছিল।

—'দরজাটা খোলো, ভাই!' বন্দীও সম্বোধনটা পালটে নিয়েছিল।

রাইফেল মাটিতে নামিয়ে রেখে পাহারাদার সিগারেট শেষ করেছিল, তারপর দরজার ফাঁকে মুখ লাগিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল:

—'পেণ্টুল ভরেই পেচ্ছাব কর, শুয়োরের বাচ্চারা! রাতের মধ্যে তোদের পেণ্টুল পচবে না, সকালে ভেজা পেণ্টুলেই সগ্গে পাঠিয়ে দেব..'

বন্দীরা ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে আছে। কোণের দিকে বসে পোদ্তিয়েলকোভ্ পকেটগুলো ওলটালো, বিড়বিড় করে শাপ শাপান্ত করতে করতে একতাড়া নোট টেনে টেনে ছিঁড়ল। তারপর ক্রিভোশ্লিকোভের হাতটা ছুঁয়ে ফিসফিস করে বলল:

—'এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে...ওরা জোচ্চুরি করেছে। জোচ্চুরি করেছে, খচ্চররা! কি অপমান, মিখায়েল! যখন ছোট ছিলাম, বাবার গাদা বন্দুকটা নিয়ে জঙ্গলে শিকার করতে যেতাম। বুনো হাঁস বসে থাকতে দেখে গুলি করতে গিয়ে গড়বড় করে ফেলতাম, মনে মনে এমন খচে যেতাম যে লজ্জায় নিজে নিজেই কেঁদে উঠতাম। এখানেও আমি সবকিছু এমন বিশ্রী গড়বড় করে ফেলেছি। যদি তিনদিন আগেও রোস্তোভ থেকে বেরুতে পারতাম, তাহলে এখানে এমন করে মৃত্যুর মুখে পড়তে হত না। সব কিছু ওলট পালট করে দিতে পারতাম।'

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ক্রিভোশ্লিকোভও পাল্টা ফিসফিস করে বলল:

—'চুলোয় যাক, ওরা মারুক আমাদের! মরতে আমি ভয় পাই না। আমার শুধু ভয়, পরলোকে গিয়ে আমরা কেউ কাউকে চিনতে পারব না। সেখানে তুমিও থাকবে, আমিও থাকব, ফিওদোর, কিন্তু একেবারে অচেনা, অজানা, কি ভয়ঙ্কর..!'

—'ও প্রসঙ্গ থাক!' পোদ্তিয়েলকোভ্ স্পর্শকাতরের মত গাঁক করে উঠল, 'ওটা কোন সমস্যা নয়!'

বানচাক দরজায় হেলান দিয়ে বসেছিল। দরজার ফাঁক দিয়ে যে বাতাসটুকু আসছিল, সাগ্রহে তাই সে বুকভরে টেনে নেবার চেষ্টা করছিল। মনটা অতীতচারী হলে মুহূর্তের জন্যে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। বেদনার তীক্ষ্ণ সূচিমুখে আচমকা খোঁচা খেয়ে ভাবনাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য হল, আন্নার স্মৃতি ও হালফিল দিনের দিকে মনটাকে ফেরাল। এতে সে ভয়ানক স্বস্তি ও শান্তি অনুভব করল। ওরা যে তাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছে, এই চিন্তায় তার শিরদাঁড়া বেয়ে চিরাচরিত কম্পন, কিংবা এই ধরণের কোন আর্তি জেগে উঠল না। মৃত্যুকে মনে হল, তিক্ত, যন্ত্রণাকর পথযাত্রার শেষে এক আনন্দহীন বিশ্রাম: ক্লান্তি যখন প্রচণ্ড, সারাদেহে যখন তীব্র বেদনা, তখন পথের শেষে পৌঁছে আনন্দ বোধ করা অসম্ভব।

একটু দূরে বসে একজন বন্দী কথা বলছে। কখনো খুশী হয়ে, কখনো বিষণ্ণ হয়ে, মেয়েমানুষের কথা, প্রেমের কথা, নিজেদের জীবনের বিরাট ও তুচ্ছ আনন্দের কথা বলাবলি করছে। পরিবার, স্বজন পরিজন, বন্ধুবান্ধবের কথা বলছে। এবার যে ভাল ফসল হয়েছে, তারা তারই কথা বলছে: এখনই গমের ক্ষেতে কাক উড়ে পড়লে চোখে পড়ে না। ভদ্‌কার জন্যে তারা উসখুস করছে, মুক্তির জন্যে ছটফট করছে, পোদ্তিয়েলকোভ্‌কে অভিশাপ দিচ্ছে। কিন্তু অনেকের চোখেই তন্দ্রার কালো ডানার আড়াল নেমে এল: দেহে মনে বিধ্বস্ত হয়ে শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তারা ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন ভোর হয়ে আসছে তখনও তাদের একজন—ঘুমিয়েছিল, না জেগেছিল—হাউহাউ করে কে'দে উঠল। পূর্ণবয়স্ক, কর্কশ মানুষগুলো, যারা সেই ছেলেবেলার পর থেকে চোখের জলের নোনা স্বাদ ভুলে গিয়েছে—তারা যখন কাঁদতে শুরু করে, সেটা বড়ই ভয়াবহ। সঙ্গে সঙ্গে একাধিক কণ্ঠের ধমকে তন্দ্রাচ্ছন্ন স্তব্ধতায় আলোড়ন জাগল:

—'থাম, আ মোলো যা!'

—'মেয়েমানুষ নাকি হে!'

—'সকলে ঘুমুচ্ছে, কোন জ্ঞানকাণ্ড নেই নাকি!'

লোকটা ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল, নাক ঝাড়ল, তার পর চুপ মেরে গেল। এখানে ওখানে সিগারেটের লাল বিন্দুগুলো জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল, কিন্তু কেউ একটা শব্দও করল না। মানুষের গায়ের ঘামে, ঘে'সাঘে'সি করে বসা সুস্থ সবল দেহের উত্তাপে, সিগারেটের ধোঁয়া, আর রাত্রিতে ঝরা শিশিরের গন্ধে ঘরের হাওয়া জমাট, ভারী।

গ্রামের মধ্যে একটা মোরগ সূর্যোদয়ের ঘোষণা জানাল। দোকানের বাইরে পায়েব শব্দ, লোহার ঠুন ঠুন আওয়াজ।

—'কে যায়?' একজন পাহারাদার চে'চিয়ে উঠল।

—'বেরাদর! পোদ্‌তিয়েলকোভের লোকজনের জন্যে গোর খ‍ু'ড়তে যাচ্ছি।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রত্যেকেই উসখুস শুরু করে দিল।

॥ চোদ্দ ॥

পিয়োত্রার অধীনে তাতার্স্ক গ্রামের কসাক দলটা সেইদিন সকালেই পোনামারিওভ গ্রামে এসে পে'ছিুল। তারা দেখল, কসাকদের বুটের খটখট আওয়াজে গোটা গ্রাম সরগরম হয়ে উঠেছে, ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দলে দলে লোকজন গ্রামের শেষপ্রান্তে ছুটছে। গ্রামের মাঝখানে দলটাকে থামিয়ে পিয়োত্রা ঘোড়া থেকে নামবার হুকুম দিল। কয়েকজন কসাক তাদের দিকে এগিয়ে এল। একজন জিজ্ঞেস করল:

—'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

—'তাতার্স্ক থেকে।'

—'একটু দেরি হয়ে গেছে, দাদা। আপনাদের সাহায্য ছাড়াই আমরা পোদ্‌তিয়েল-কোভকে পাকড়াও করে ফেলেছি। খাঁচার মধ্যে মুরগীর বাচ্চার মত ওদের ওখানে আটকে রাখা হয়েছে।' একগাল হেসে সে হাত তুলে দোকান ঘরের দিকে দেখাল।

ক্রিস্তোনিয়া, গ্রিগর ও আরও কয়েকজন লোকটার কাছে ঘে'সে এল। ক্রিস্তোনিয়া প্রশ্ন করল, 'ওদের কোথায় পাঠাচ্ছে?'

—'যমের বাড়ি।'

—'কি বললেন? মিথ্যে কথা!' গ্রিগর লোকটার গ্রেটকোট চেপে ধরল।

—'একটু ভদ্রভাবে কথা বলুন, মশাই!' কোট টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে লোকটা পাল্টা

উত্তর দিল। 'তাকিয়ে দেখুন না; এরই মধ্যে ফাঁসিকাঠ খাড়া করা হয়ে গেছে।' বেঁটে বেঁটে দুটো উইলো গাছের মধ্যে চালিয়ে দেওয়া আড়-কাঠের সঙ্গে ঝোলানো দুটা দাড়ির ফাঁসের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল সে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছে। গ্রামের বাইরে মেয়ে পুরুষের বিশাল ভিড় জমেছে। সকাল ছটায় ফাঁসি হবে খবর পেয়ে. পোনামারিওভের লোকজন স্বেচ্ছায় ছুটে এসেছে, যেন দুর্লভ এক মজাদার দৃশ্য দেখতে এসেছে। মেয়েরা পরবের পোশাক পরেছে; অনেকে তাদের বাচ্চাদেরও সঙ্গে এনেছে। লোকজন চষা ক্ষেতের মধ্য ভিড় জমিয়েছে, ফাঁসিকাঠ আর চার হাত গভীর খাদের পাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। খাদের একপাশে স্তূপ করা নতুন খোঁড়া কাদার ওপর বাচ্চাগুলো হামাগুড়ি দিয়ে উঠছে; মেয়েরা গোমড়ামুখে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে।

সিগারেট টানতে টানতে আদালতের সভাপতি এসে হাজির হল। কসাক পাহারাদারকে ধমক দিয়ে বলল:

—'গর্তের কাছ থেকে লোকজন হটিয়ে দাও। স্পিরিদোনোভকে বল প্রথম দলকে পাঠিয়ে দিতে।' ঘাড় দেখল সে। এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় দেখতে লাগল। পাহারাদারদের তাড়া খেয়ে চিত্রবিচিত্র অর্ধ-চক্রাকারে লোকজন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

কসাকদের একটা দল নিয়ে স্পিরিদোনোভ তাড়াতাড়ি দোকানঘরের দিকে চলে গেল। পিয়োত্রা মেলেখফের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হতেই জিজ্ঞেস করল·

—'তোমাদের গ্রাম থেকে কেউ স্বেচ্ছাসেবক হবে?'

—'কিসের জন্যে স্বেচ্ছাসেবক?'

- 'জল্লাদের কাজের জন্যে।'

—'না, তেমন কেউ নেই, কেউ হবেও না।' পিয়োত্রা কর্কশভাবে জবাব দিলে। স্পিরিদোনোভ রাস্তা আটকে আছে দেখে তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

কিন্তু তাতার্স্ক থেকেও স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া গেল. মিৎকা কোরশুনোভের টুপির নীচে একগোছা চুল বেরিয়েছিল, তাতে হাত বুলাতে বুলাতে অভব্যের মত পিয়োত্রার কাছে এসে, সবুজ চোখদুটো কুঁচকে সে বলল.

—'আমি যাব। 'না' বললে কেন তুমি? আমিই তো আছি। আরও কিছু কার্তুজ দাও। আমার মাত্র এক দফা কার্তুজ আছে।'

তার সঙ্গে গেল আন্দ্রেই কাশুলিন—তার ফ্যাকাসে মুখে ক্রূরতার ছাপ, আর ফিওদোৎ বোদাভ্স্কোভ।

॥ পনের ॥

কসাকদের পাহারায় দশজন আসামীর প্রথম দলটা দোকান ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই গাদাগাদি করা ভিড়ের মধ্যে থেকে গর্জন ও চাপা আর্তনাদ উঠল। সবার আগে আগে খালিপায়ে পোদ্তিয়েলকোভ্ আসছে, কালো সুতির চোস্ত্ শুধু পরনে, চামড়ার জার্কিনটার বোতাম খোলা, দু-পাশে সরানো। বিশাল পা-দুটো কাদার মধ্যে ফেলতে ফেলতে এগিয়ে আসছে. একবার পা হড়কাতেই বাঁ-হাতটা শূন্যে উঁচিয়ে টাল

সামলে নিল। তার পাশে ক্রিভোশ্লিকোভ্, মৃত্যুর মত পাণ্ডুর, অতিকষ্টে পা টেনে টেনে চলেছে। তার চোখদুটো উদগ্রভাবে জ্বলজ্বল করছে, যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে উঠছে। পেছনে ঝোলানো গ্রেট-কোটটা সে গায়ে জড়িয়ে নিল, কাঁধদুটো ঝাঁকালো, যেন ভয়ানক শীত করছে। কেন জানি, এই দুইজনেরই জামাকাপড় রাখতে দেওয়া হয়েছে, অন্য সকলের একেবারে নীচেরটা ছাড়া সমস্ত কিছুই খুলে নেওয়া হয়েছে। লাগুতিন বানচাকের পাশে পাশে হাঁটছে। দুজনেই খালি পা, সার্ট ছাড়া যৎসামান্য জামাকাপড় গায়ে। লাগুতিনের ছেঁড়া ইজেরের ফাঁক দিয়ে লোমশ উরু দেখা যাচ্ছে, লজ্জালজ্জাভাবে সে ঢাকবার চেষ্টা করছে। পাহারাদারদের মাথার ওপর দিকে দূরে আকাশের ধূসর মেঘের আস্তরণের দিকে বানচাক তাকিয়ে আছে। শান্ত, কঠিন চোখ-দুটো কি এক দৃঢ় প্রত্যাশায় জ্বলছে নিভছে; কলারখোলা সার্টের নীচে চ্যাটালো হাতখানা ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে বুকে বুলাচ্ছে। তাকে দেখলে মনে হয়, সে এমন একটা কিছুর প্রত্যাশা করছে যা কখনো লাভ করা যায় না, অথচ তার কথা ভাবতে আনন্দ বোধ হয়। অন্যান্যদের মধ্যেও অনেকে উদাস মুখ করে আছে; একজন অবজ্ঞাভরে হাত দুলিয়ে কসাক পাহারাদারদের পায়ের কাছে থুথু ছুঁড়ে মারল। কিন্তু দু-তিনজনের চোখে এমনই এক আর্তি, বিকৃত মুখে এমনই অন্তহীন আতঙ্ক ফুটে উঠল যে, চোখে চোখ পড়তেই পাহারাদাররাও চোখ ফিরিয়ে নিল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে তারা এগিয়ে চলল। ক্রিভোশ্লিকোভ হোঁচট খেতেই পোদ্তিয়েল্কোভ হাত বাড়িয়ে দিল। সাদা রুমাল বাঁধা, লাল ও নীল টুপি পরা ভিড়ের কাছে তারা এসে পড়ল। ভিড়ের দিকে তাকিয়ে পোদ্তিয়েল্কোভ উঁচুগলায় খিস্তি করে উঠল। লাগুতিন তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখতে পেয়েই সে ঝট্ করে জিজ্ঞেস করল:

—'ব্যাপার কি?'

—'এ কয়দিনের মধ্যেই আপনি বুড়িয়ে গেছেন...'

—'বুড়িয়ে যাব না?' পোদ্তিয়েল্কোভ জোরে একটা দম নিল, কপালের ঘাম মুছে ফেলে আবার বলল, 'বুড়িয়ে যাব না? খাঁচায় পুরলে নেকড়ে পর্যন্ত বুড়িয়ে যায়; আর আমি তো মানুষ।'

আর একটা কথাও কেউ বলল না। জনতা জমাট হয়ে সামনে এগিয়ে এল। ডান দিকে কালো গভীর, কবরের দীর্ঘ খাদটা। স্পিরিদোনোভ হুকুম দিল.

—'থাম!'

পোদ্তিয়েলকোভ্ তৎক্ষণাৎ এক পা সামনে এগিয়ে এল। ভিড়ের সামনের সারির গায়ে ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি বুলাল। বেশির ভাগই পাকাচুলো বুড়ো। লড়াই-ফেরতারা বিবেকের দংশনে পেছনে কোথাও গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পোদ্তিয়েল্কোভের নুয়ে পড়া গোঁফজোড়া ঈষৎ কেঁপে উঠল। জোর দিয়ে দিয়ে, কিন্তু স্পষ্ট করে, সে বলতে লাগল:

—'মাতব্বররা! আমাদের কমরেডরা কেমন করে মৃত্যু বরণ করে তা দেখবার সুযোগ আমাকে আর ক্রিভোশ্লিকোভ্কে দিন। আমাদের পরে ফাঁসি দেবেন. আমরা আগে বন্ধু ও কমরেডদের দেখতে চাই, যাদের মন দুর্বল তাদের সাহস দিতে চাই।'

জনতা এমন স্তব্ধ হয়ে গেল যে টুপির ওপরে বৃষ্টির ফোঁটার চড়বড় শব্দও কানে আসতে লাগল।

তার পেছন থেকে তামাকের ছোপ লাগা দাঁত বার করে ক্যাপ্টেন হাসল, কোন আপত্তি করল না। বুড়োরাও ধরাগলায় চেঁচিয়ে সম্মতি জানাল। পোদ্তিয়েল্কোভ

ও ক্রিভোশ্লিকোভ ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল, ভিড় ফাঁক হয়ে সরু একটা রাস্তা করে দিল। খাদ থেকে একটু দূরে এসে তারা থামল। তাদের চারপাশ থেকে লোকজন ঘিরে ধরল, শত শত চোখের দৃষ্টি এসে পড়ল। কসাকরা রেড-গার্ডদের খাদের দিকে পেছন দিয়ে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিতেই তারা চোখ তুলে তাকাল। পোদ্তিয়েলকোভ্ স্পষ্ট দেখতে পেল, কিন্তু ক্রিভোশ্লিকোভকে গলা বাড়িয়ে ডিঙ্ মেরে দাঁড়াতে হল।

একেবারে বাঁ-দিকে বানচাককে চিনতে পারা গেল, কাঁধদুটো জড় করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে, মাটি থেকে চোখ তুলছে না। তার পাশে দাঁড়িয়ে লাগুতিন তখনো ইজের ধরে টানাটানি করছে। তার পরের জনকে একেবারে চিনতে পারা যায় না, যেন কুড়ি বছর বয়স বেড়ে গিয়েছে। আরও দুজন খাদের দিকে এগিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। একজন অতিস্পর্ধায় তীব্র গালাগাল দিতে দিতে, স্তব্ধ জনতার দিকে মুঠো তুলে শাসাতে শাসাতে, প্রতিদ্বন্দ্ব জানানোর ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। শেষের জনকে টেনে আনতে হল। পেছনে এলিয়ে পড়ে, মাটির ওপরে নির্জীব পা দুটো ঘসড়াতে ঘসড়াতে সে কসাক পাহারাদারদের আঁকড়ে ধরল, তারপর, চোখের জলে ভেজা মুখটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে, আঁতকে উঠে হাঁউ মাউ করতে লাগল:

—'ছেড়ে দাও, দাদারা! যিশুর দোহাই, ছেড়ে দাও! ও দাদারা! ও ভাই সব! কি করছ তোমরা? জার্মান যুদ্ধে আমি চারটে ক্রশ পেয়েছি। আমার ছেলেপুলে আছে। ভগবান, আমি নির্দোষ। ওরে বাবারে, কেন তোমরা এসব করছ...?'

একজন লম্বামত কসাক তার বুকে হাঁটুর গুঁতো মেরে গর্তের দিকে এগিয়ে দিল। আর তখনই শুধু পোদ্তিয়েলকোভ্ তাকে চিনতে পারল। তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল: তার রেড-গার্ডদের মধ্যে ভয়লেশহীন, অন্যতম দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, এক সুশ্রী তরুণ, চুলগুলো ভারী সুন্দর; সেণ্ট জর্জ পাওয়ার চার চারটে ধাপই সে পেরিয়ে এসেছে। কসাকরা তাকে টেনে খাড়া করে দাঁড় করিয়ে দিল, কিন্তু সে আবার পড়ে গেল; কসাকরা যে-বুট দিয়ে তার মুখে লাথি মারতে লাগল—তাদের পায়ের কাছে হাঁচোড় পাঁচোড় করতে সেই বুটেই সে ঠোঁট চেপে ধরতে লাগল, আর ভয়াবহ, রুদ্ধকণ্ঠে হাঁউ মাউ করতে লাগল:

—'আমাকে মেরো না! দয়া কর, দয়া কর! আমার তিন তিনটে বাচ্চা, তার মধ্যে একটা মেয়ে...ও দাদারা, ও ভাই সব!'

লম্বা কসাকটার হাঁটু দুটো সে জড়িয়ে ধরল, কিন্তু সে ছাড়িয়ে নিয়ে ছটকে পিছিয়ে এল, তারপর লোহার নাল-লাগানো গোড়ালি দিয়ে কানের ওপর দড়াম করে একটা লাথি কসিয়ে দিল। কান থেকে ঝরঝর করে রক্ত গড়িয়ে সাদা কলার বেয়ে পড়তে লাগল।

—'ওকে দাঁড় করিয়ে দাও!' স্পিরিদোনোভ্ ক্ষিপ্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

তারা কোনরকমে তাকে টেনে তুলল, খাড়া করে দিয়ে দৌড়ে পিছিয়ে এল। উল্টোদিকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে জল্লাদের দল বন্দুক তাক করল। জনতা আর্তনাদ করে কাঠ হয়ে গেল। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ বোকার মত কঁকিয়ে উঠল।

ওই আকাশের ধূসর আস্তরণ, ওই শোকাচ্ছন্ন ধরিত্রী যার বুকের ওপর বানচাক উনত্রিশটি বছর বিচরণ করেছে, ইচ্ছে হল, আর একবার, শুধু আর একবার তাদের সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। চোখ তুলতেই সে দেখতে পেল, হাত পনর দূরে কসাকদের দলটা ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখল একটি লোককে—লম্বা, সবুজ

চোখদুটো কোঁচকানো, সাদা কপালে ঝেঁপে পড়া একগোছা চুল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপা, সামনে দিকে ঝুঁকে সে সোজা বানচাকের বুকের দিকে তাক করে আছে। বন্দুক গর্জন করে ওঠার ঠিক আগের মুহূর্তে এক সুদীর্ঘ চিৎকারে বানচাকের কানে যেন তালা ধরে গেল। সে ঘাড় ফেরাল: মুখে দাগওয়ালা এক তরুণী এক হাতে বুকের সঙ্গে একটা বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরে, অন্য হাতে চোখ চাপা দিয়ে, ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে গ্রামের দিকে ছুটছে।

এলোমেলো গুলির পর, খাদের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা আটজন লোক যখন ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে গেল, জল্লাদরা দৌড়ে গর্তের কাছে ছুটে এল। মিৎকা যে রেডগার্ডটাকে তাক করেছিল সে তখনো ছটফট করছে, কাঁধ কামড়ে কামড়ে ধরছে দেখে, আরও একটা গুলি চালিয়ে দিয়ে আন্দ্রেই কাশুলিনকে ফিসফিস করে বলল:

—'তাকিয়ে দেখ শালাকে! কাঁধ কামড়ে একেবারে রক্ত বার করে ফেলেছে। একটা 'উঃ', 'আঃ' না করেই শালা নেকড়ের মত মরেছে।'

আরও দশজনকে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে গর্তের কাছে নিয়ে যাওয়া হল।

দ্বিতীয় ঝাঁক গুলির পরই ভিড়ের মধ্যে থেকে মেয়েরা আর্তনাদ তুলে ধাক্কাধাক্কি করতে করতে, বাচ্চাদের টানতে টানতে পালাতে শুরু করল। কসাকরাও সরে পড়তে লাগল। হত্যাকাণ্ডের বীভৎস দৃশ্য, মরণোন্মুখদের চিৎকার ও আর্তনাদ, যাদের পালা আসছে তাদের হাঁউ মাউ, অতিরিক্তমাত্রায় পীড়াদায়ক। জনতার পক্ষে এই মর্মান্তিক দৃশ্য সহ্য করা কষ্টকর। যারা প্রাণভরে মৃত্যু দেখেছে সেইসব লড়াই-ফেরতারা, আর বুড়োদের মধ্যে সবচেয়ে কঠ্ঠকরাই শুধু রয়ে গেল।

খালিপায়ে, খালিগায়ে নতুন নতুন রেডগার্ড দলকে আনা হতে লাগল, স্বেচ্ছা-সেবকদের নতুন নতুন দল সামনে এসে দাঁড়াল, গুলির ঝাঁক ছুটতে লাগল। ফাঁকে ফাঁকে একক গুলির শব্দে বাতাসে কাঁপন জাগল, অর্ধ-মৃতদের সাবাড় করা হতে লাগল। ট্রেঞ্চের মধ্যে আগের দলের মৃতদেহের ওপরে তাড়াহুড়ো করে মাটি চাপা পড়তে লাগল। যারা পালার অপেক্ষায় আছে, পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ ও ক্রিভোশ্‌লিকোভ্‌ তাদের কাছে গিয়ে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাদের সব কথাই অর্থহীন হয়ে গেল: গাছের পাকা ফলের মত যাদের জীবন দু-এক মিনিটের মধ্যেই ঝরে পড়বে, অন্য আর এক প্রবল শক্তি তাদের একেবারে অভিভূত করে ফেলল।

গ্রামে ফিরে যাবার জন্যে গ্রিগর মেলেখফ ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসছিল। সে একবারে পোদ্‌তিয়েল্‌কোভের মুখোমুখি পড়ে গেল। ভূত-পূর্ব নেতা এক পা পেছনে হটে গিয়ে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল:

—'তুমিও এখানে মেলেখফ?'

গ্রিগরের দুই গালে নীলচে একটা রং ছড়িয়ে গেল, সেও থামল।

—'এই তো। দেখতেই পাচ্ছেন...'

—'তাই বল...' যেন ঘৃণায় ফেটে পড়বে, এমনিভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে পোদ্‌তিয়েলকোভ্‌ বাঁকা হাসি হাসল: 'বেশ, তাহলে নিজের ভাই বেরাদরকেই গুলি করে মারছ? তুমি ভোল পালটেছ? তুমি তো ..' লম্বা লম্বা পা ফেলে সে গ্রিগরের কাছে এগিয়ে এসে ফিস ফিস করে বলল, 'তাহলে তুমি আমাদের দলেও রইলে, ওদের দলেও, যে বেশি দাম দিতে পারে, তাই না? বাঃ, তুমি...'

গ্রিগর তার জামার হাতাটা চেপে ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করল:

—'গ্লুবোকার লড়াইয়ের কথা মনে আছে? মনে পড়ে, ওরা কেমন করে অফিসারদের গুলি করে মেরেছিল? আপনার হুকুমেই মেরে ছিল না? এ্যাঁ? আজ আপনার পালা। কাঁদবেন না যেন! একমাত্র আপনিই অপরকে সায়েস্তা করার মালিক নন! মস্কোপন্থী কমিশনারদের সভাপতি, আপনার ভবলীলা আজ সাঙ্গ! আপনারা শুয়োরের বাচ্চা, ইহুদিদের হাতে কসাকদের বেচে দিয়েছেন! আরও বলতে হবে?'

ক্ষিপ্ত গ্রিগরকে হাত দিয়ে বেড়ে ক্রিস্তোনিয়া সরিয়ে নিয়ে এল। বলল, 'চল, চল, ঘোড়ার কাছে যাই। এখানে করার কিছুই নেই। ভগবান, মানুষের ভাগ্যে কি দিনকালই আসছে?'

কিন্তু পোদ্‌তিয়েলকোভের আবেগতপ্ত উঁচু গলার স্বর শুনতে পেয়ে তারা থেমে গেল। বুড়ো আর লড়াই-ফেরতাদের ঘেরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করছে:

—'আপনারা অন্ধ...অজ্ঞ। অফিসাররা আপনাদের ধোঁকা দিয়েছে. আপনাদের জাতভাইদের খুন করতে বাধ্য করেছে। আপনারা কি মনে করেন, আমাদের মৃত্যুতেই এর শেষ হবে? না! আজ আপনারা কায়দায় পেয়েছেন, কিন্তু কালই আপনাদের পালা আসবে, গুলি খেয়ে মরতে হবে। গোটা রাশিয়া জুড়ে সোবিয়েত সরকার কায়েম হবে। আমার কথা মনে করে রাখবেন! আপনারা বৃথাই আমাদের রক্তপাত করলেন! আপনারা মূর্খের দল!'

—'যারা যারাই আসবে, আমরা তাদের ব্যবস্থা করব।' এক বুড়ো পাল্টা জবাব দিল।

—'সবাইকে তো গুলি করে মারতে পারবেন না. কর্তা।' পোদ্‌তিয়েলকোভ্ হাসল। 'ফাঁসিকাঠে গোটা রাশিয়াকে তো ঝোলানো যাবে না! নিজের মাথা বাঁচাবার কথা ভাবুন। একদিন ভাবতেই হবে. কিন্তু তখন বড্ড দেরি হয়ে যাবে।'

গ্রিগর আর শুনবার জন্যে দাঁড়াল না, যেখানে তার ঘোড়াটা বাঁধা ছিল. প্রায় ছুটতে ছুটতে সেই আঙ্গিনার দিকে চলে গেল। জিনটা কষে নিয়ে সে আর ক্রিস্তোনিয়া ঘোড়া ছুটিয়ে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে গেল, একবারও পেছনে না তাকিয়ে পাহাড়ের ওপরে গিয়ে উঠল।

॥ ষোল ॥

সমস্ত রেড-গার্ডদের খতম করা হলে মৃতদেহে ট্রেঞ্চ বোঝাই হয়ে উঠল। তাদের ওপরে মাটি চাপা দিয়ে পায়ে পায়ে মাড়িয়ে সমান করা হল। কালো মুখোসপরা দুজন অফিসার পোদ্‌তিয়েল্‌কোভ আর ক্রিভোশ্‌লিকোভকে ফাঁসিকাঠের দিকে টেনে নিয়ে চলল। উদ্ধত ভঙ্গিতে মাথাটা উঁচু করে, বীরের মত পোদ্‌তিয়েলকোভ্ ফাঁসিকাঠের নীচের টুলটার ওপর গিয়ে উঠল। তারপর বাদামি রঙের চওড়া ঘাড়ের পাশ থেকে কলারের বোতাম খুলে দিয়ে নিজে নিজেই চর্বিমাখানো দড়িটা পরে নিল, একটা পেশিও তার কাঁপল না। একজন অফিসার ক্রিভোশ্‌লিকোভকে টুলের ওপর তুলে দিয়ে দড়িটা মাথার ওপর দিয়ে গলিয়ে দিল। পোদ্‌তিয়েল্‌কোভ শেষ অনুরোধ জানাল:

—'মরার আগে শেষবারের মত আমাদের গোটাকয়েক কথা বলতে দিন।'

—'বল, বল! বলে যাও!' লড়াই-ফেরতারা চিৎকার করে উঠল।

যে ছোট দলটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দিকে সে হাতদুটো বাড়িয়ে দিল।

—'দেখুন, আমাদের ফাঁসি দেখার জন্যে মাত্র কজন রয়ে গেছে!' পোদ্‌তিয়েলকোভ্ শুরু করল। 'তাদের বিবেকে জ্বালা ধরেছে। আমরা মেহনতী মানুষের পক্ষ নিয়ে, তাদের স্বার্থ বাঁচানোর জন্যে দেশদ্রোহী জেনারেলদের বিরুদ্ধে লড়েছি, নিজেদের জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করিনি। আর আজ আমাদের মরতে হচ্ছে আপনাদের হাতে! তবু আপনাদের আমরা অভিশাপ দেব না! ওরা আপনাদের চরম ধোঁকা দিয়েছে। বিপ্লবী সরকার আসবেই, তখন বুঝতে পারবেন কোনদিকে সত্য। ডনের সেরা ছেলেদের আপনারা ওই গর্তের মধ্যে মাটি চাপা দিয়েছেন..'

বহুকণ্ঠের গর্জন ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠল, সেই সোরগোলে তার কথা ডুবে গেল। এরই সুযোগ নিয়ে, একজন অফিসার লাথি মেরে তার পায়ের নীচের টুলটা ফেলে দিল। বিশাল দেহটা ঝুলে পড়ে দুলতে লাগল, কিন্তু পা গিয়ে মাটিতে ঠেকে গেল। গলায় ফাঁস আটকে গিয়ে দম আটকে এল, তাকে ঠেলে ওপর দিকে তুলে দিল। খালিপায়ের আঙুল দিয়ে কাদা মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে সে ডিং মেরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসের জন্যে খাবি খেতে লাগল। ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখদুটো ভিড়ের গায়ে বুলিয়ে শান্তগলায় বলল:

—'কি করে মানুষকে ঠিকমত ফাঁসি দিতে হয়, তাও তোরা শিখিসনি...আমার হাতে যদি ভার থাকতো, মাটিতে তোর পা ঠেকতো না, স্পিরিদোনোভ..!'

তার মুখ থেকে অনর্গল থুথু বেরিয়ে আসতে লাগল। মুখোসধারী অফিসার দুজন আর ধারেকাছের লোকজন মিলে অতি কষ্টে তার অসহায় বিশাল দেহটা টুলের ওপর দাঁড় করিয়ে দিল।

ক্রিভোশ্‌লিকোভের কথা শেষ করতে দেওয়া হল না। পায়ের নীচের টুলটা ছটকে গিয়ে ফেলে রেখে যাওয়া একটা বেলচার গায়ে ঘটাং করে লাগল। একহারা, পেশি-বহুল দেহটা অনেকক্ষণ ধরে এধারে ওধারে দুলল, বেঁকে দুমড়ে জড়সড় হয়ে হাঁটুদুটো চোয়ালে এসে ঠেকল, তারপর আবার অন্তিম কম্পন তুলে টানটান হয়ে গেল। পোদ্‌-তিয়েলকোভের পায়ের নীচে থেকে যখন দ্বিতীয়বার টুলটা লাথি মেরে ছটকে ফেলা হল, তখনো সে ছটফট করছে, ঠেলে বেরিয়ে আসা কালোজিভটা তখনো মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। বিশাল দেহটা আবার ঝপাং করে পড়ে গেল, কাঁধের কাছ থেকে চামড়ার জারকিনের সেলাই পট পট করে ছিঁড়ে গেল; আবার সেই পায়ের আঙুল মাটিতে গিয়ে ঠেকল। কসাক জনতা আর্তনাদ করে উঠল; কেউ কেউ ক্রশ করতে করতে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিল। সকলে এমনই বিহ্বল, এমনই ধন্দ হয়ে গেল যে পোদ্‌তিয়েলকোভের পাথরের মত কঠিন আড়ষ্ট দেহের দিকে আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে মিনিটখানেক অচল, অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু তার বাকরোধ হয়ে গেল; ফাঁসটা গলায় শক্ত হয়ে এ'টে বসেছে। সে শুধু চোখ বড় বড় করে তাকাতে লাগল, দুই চোখ থেকে ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল, মুখ কুঁচকে কুঁচকে উঠতে লাগল। যন্ত্রণা কমাবার জন্যে গোটা দেহ ভয়ঙ্করভাবে এ'কে বেঁকে খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

অবশেষে একজন নিজে নিজেই একটা সমাধান খুঁজে বার করল, একটা বেলচা নিয়ে তার পায়ের নীচে থেকে মাটি খুঁড়তে শুরু করে দিল। প্রত্যেকটি ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে

তার দেহটা আরও আড়ষ্ট হয়ে ঝুলতে লাগল, গলাটা এমনই লম্বা হয়ে আসতে লাগল, মাথাটা পেছন দিকে কাঁধের ওপর ভেঙ্গে পড়ল। তার বিশাল ভারী দেহটা দড়িতে ধরে রাখতে পারছে না; আড়কাঠে ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজ তুলে দড়িটা আস্তে আস্তে দুলতে লাগল। আর পোদ্‌তিয়েল্‌কোভও তার রক্তজমাট, কালো হয়ে ওঠা মুখখানা, গলগলকরে বেরিয়েআসা থুথু আর তপ্ত চোখের জলে ভেজা বুকখানা, তাদের দেখিয়ে দেখিয়ে এই দুলুনির তালে তালে চারধারে ঘুরতে লাগল।

দশম পরিচ্ছেদ

॥ এক ॥

তাতার্স্ক গ্রাম ছেড়ে আসার পরের রাত্রেই মিশা কোশেভয় আর ভালেত কারগিন ছেড়ে এল। কুয়াসায় স্তেপ ঢাকা পড়েছে, কুয়াসা পাহাড়ের ফোকরে ফোকরে গিয়ে জমেছে, পাহাড়ের গায়ের ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। নতুন গজানো ঘাসের মধ্যে তিতির ডাকছে। নলখাগড়া আর শ্যাওলায় ঢাকা বিলের মধ্যে সবকটি পাঁপড়ি মেলেধরা শ্বেত-পদ্মের মত আকাশের মখমলে চাঁদ ভাসছে।

হাঁটতে হাঁটতে ভোর হয়ে এল। আকাশে ছায়াপথ মিলিয়ে আসছে। গুঁড়ো গুঁড়ো শিশির ঝরছে। তারা একটা গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়ল। কিন্তু গ্রামের মাইল কয়েক দূরে থাকতেই ছজন কসাক-ঘোড়সওয়ারের হাতে ধরা পড়ে গেল। মিশা আর ভালেত রাস্তা ছেড়ে পালাতে পারত, কিন্তু ঘাসগুলো বড় ছোট ছোট, মাথার ওপরেও উজ্জ্বল চাঁদ।

কসাকরা তাদের পাকড়াও করে কারগিনের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। একটা কথাও না বলে তারা প্রায় শ-দুয়েক হাত চলে এল। তারপরই একটা গুলির শব্দ উঠল। ভালেত পায়ের ওপরে থমকে দাঁড়িয়ে কাত হয়ে গেল, নিজের ছায়া দেখে আঁতকে উঠে ঘোড়া যেমন করে কাত হয়ে যায়। সে ঠিক পড়ে গেল না, কেমন বিতিকিচ্ছি ভাবে মাটির ওপর ভেঙ্গে পড়ল, মুখটা ধূসর 'ওয়ার্মউড'-ঝোপে গিয়ে ঠেকল।

পাঁচ মিনিট প্রায় মিশা হেঁটে এল, কানের মধ্যে রিনরিন করা ছাড়া দেহের আর কোন সাড়ই রইল না। তারপর জিজ্ঞেস করল:

—'গুলি করছিস না কেন, শুয়োরের বাচ্চারা? দগ্ধে দগ্ধে মারছিস কেন?'

—'এগো, এগো! মুখ সামলে কথা বল!' একজন কসাক বেশ একটু করুণা-ভরেই বলল, 'আমরা 'চাষা'টাকে মারলাম, কিন্তু তোর পর দয়া হল। জার্মান যুদ্ধে আমরা বার নম্বর রেজিমেণ্টে ছিলাম, তুইও ছিলি না?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেশ তো, আবার আমরা বার নম্বরে কাজ করব। তুই তো এখনো একেবারে কাঁচা। একটু বেপথে গিয়েছিস বটে, তা এমন কিছু বড় ধরনের পাপ নয়। তোকে প্রাচিত্তির করিয়ে নেব।'

॥ দুই ॥

তিনদিন পর কারগিনের এক ফৌজী আদালতে মিশার 'প্রাচিত্তিরে'র ব্যবস্থা করা হল। তখনকার দিনের আদালতে দুই রকমের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল: গুলি করা, আর চাবকানো। যাদের গুলি করে মারার হুকুম হত, রাত্রে তাদের স্তেপের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হত। কিন্তু যাদের সংশোধনের আশা থাকত, বারোয়ারিতলায় তাদের প্রকাশ্যে চাবকানো হত।

রবিবার দিন সকালে লোকজন জমতে শুরু করল। বারোয়ারিতলা ভর্তি হয়ে গেল, লোকে বেঞ্চের ওপর, চালায়, ঘরের ছাদে, দোকান ঘরে গিয়ে উঠল।

প্রথমে সাজা দেওয়া হল এক পাদ্রীর ছেলেকে। লোকটা কঠ্ঠর বলশেভিক, তাকে গুলি করেই মারা হত; কিন্তু তার বাপ একজন ভাল পাদ্রী, সবাই তাকে ভক্তি করে, তাই পাদ্রীর ছেলেকে কয়েক ঘা চাবুক মারার সিদ্ধান্ত হল। তার পা-জামা টেনে খুলে ন্যাংটো করে একটা বেঞ্চের ওপর উপুড় করে শোয়ানো হল, বেঞ্চের নীচে হাতদুটো বেঁধে দিয়ে একজন কসাক পায়ের ওপর চেপে বসল, একগোছা উইলো গাছের কাঁচা ডাল নিয়ে দুজন পাশে এসে দাঁড়াল। চাবুক মারা হল। শেষ হলে লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিল, পা-জামা টেনে তুলে চারধারে মাথা ঝুঁকিয়ে নমস্কার করল। গুলির হাত থেকে বেঁচে গিয়ে লোকটা বড়ই খুশী, তাই সে নমস্কার করে কৃতজ্ঞতা জানাল:

—'ধন্যবাদ, মাতব্বররা!'

—'এতেই যেন ওষুধের ফল ফলে!' কে একজন উত্তর দিল।

এমন একটা বিশাল হাসির হর্‌রা ছুটল যে একটু দূরে চালার নীচে বসে বন্দীরা পর্যন্ত হেসে ফেলল।

রায় অনুযায়ী মিশাকে কুড়ি ঘা চাবুক মারা হল—গরম গরম, তরতাজা। কিন্তু আরও বেশি তরতাজা হয়ে উঠল তার অসহ্য অপমান। বুড়ো, গুঁড়ো, এ অঞ্চলের সবাই এই দেখতে ভেঙ্গে পড়েছে। মিশা পা-জামাটা টেনে তুলল, কাঁদতে শুধু বাকী রইল। যে তাকে চাবুক মেরেছিল সেই কসাকটাকে বলল:

—'এটা কিন্তু ঠিক হল না!'

—'কি ঠিক হল না?'

—'গোল বাধালো আমার মাথা, আর তার দাম দিতে হল পাছাকে। সারা জীবনের মত কলঙ্ক রয়ে গেল।'

—'ভাবনা কি, কলঙ্ক তো আর ধোঁয়া নয়; চোখ কুটকুট করবে না।'

কসাকটি তাকে সান্ত্বনা দিল। তারপর একটু উৎসাহ দেওয়ার ইচ্ছায় বলল:

—'তোর তাগদ আছে, ছোকরা! দু-দুটো বাড়ি জব্বর জোরে মেরেছিলাম। ভেবেছিলাম, দেখি তুই কাঁদিস কিনা, কিন্তু কাঁদাতে পারলাম না। সেদিন একজনকে যখন চাবকানো হচ্ছিল, সেতো হেগেই ফেলল। লোকটা বোধহয় খুবই পেট-রোগা ছিল।

পরদিনই মিশাকে ফ্রন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

॥ তিন ॥

দুদিনের আগে ভালেতের কবর দেওয়া হয়ে উঠল না। ছোটখাট একটা গর্ত খোঁড়ার জন্যে আতামান সবচেয়ে কাছের গ্রাম থেকে দুজন লোককে পাঠিয়ে দিল। গর্তের মধ্যে প্া দোলাতে দোলাতে, তামাক টানতে টানতে একজন বলল:

—'এখানকার মাটি বড্ড শক্ত।

—'ঠিক লোহার মত। আমার জীবনে তো এতে কোনদিন লাঙল পড়েনি। বছরের পর বছর এই রকমই পড়ে থেকে শক্ত হয়ে উঠেছে।'

—'সত্যি, ছেলেটা এখানে ভাল মাটিতেই শুয়ে থাকবে, ঠিক পাহাড়ের মাথায়। এখানে হাওয়া আছে, রোদ আছে। তাড়াতাড়ি পচবে না, গলবে না।'

ঘাসের ওপরে জবুথবু হয়ে পড়ে থাকা ভালেতের মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে তারা উঠে দাঁড়াল:

—'কাপড়-চোপড় খুলে নেব?'

—'নিশ্চয়ই। ওর পায়ের বুট-জোড়া ভারী সুন্দর।'

পূর্বদিকে মাথা রেখে খৃষ্টানী কায়দায় তারা তাকে কবরের মধ্যে শুইয়ে দিল, বেলচা দিয়ে কালো উর্বরা মাটি গায়ের ওপর চাপাল। মাটি যখন কানায় কানায় সমান হয়ে উঠল, ওদের মধ্যে অল্পবয়সী কসাকটি জিজ্ঞেস করল:

—'পা দিয়ে মাড়াব?'

—'দরকার কি, ওইরকমই থাক না!' অপরজন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। 'দেবদূতেরা যেদিন কেয়ামতের শিঙে বাজাবে, তখন তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে পারবে।'

দু-সপ্তাহের মধ্যেই ছোট্ট ঢিবিটা 'ওয়ার্ম-উড্' আর বুনো-ঝোপে ঢেকে গেল; বুনো ওট্‌গাছ ঢিবির ওপরে দুলতে লাগল, ঢিবির পাশেই সরষে গাছের ফুলে হলুদ রং ধরল, শ্যামা-ঘাস মাথা তুলল, 'টিম'-লতা, 'স্পার্জ' আর পাতার রসালো গন্ধে বাতাস ম-ম করতে লাগল।

তার কিছু পরেই গ্রাম থেকে এক বুড়ো লোক ঘোড়া ছুটিয়ে সেইখানে এসে হাজির হল, কবরের মাথার দিকে একটা ছোট গর্ত খুঁড়ে, সদ্য কেটে আনা একটা ওকের খুঁটির ওপরে এক বেদি খাড়া করল। বেদির কুলুঙ্গির তিন-কোনা কার্নিশের নীচের ছায়ায় ঈশ্বরের জননীর শোকাচ্ছন্ন মূর্তি, তারও নীচে প্রাচীন শ্লাভ অক্ষরে রং দিয়ে লেখা:

'ক্ষুব্ধ পীড়িত অশান্ত দিনকালে
ভায়ের হাতে কি ভায়ের বিচার চলে!'

বেদিটা ওইভাবে রেখে বুড়ো লোকটা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। স্তেপের মধ্যে যারা ওই পথ দিয়ে হাঁটবে, তাদের মন বেদনায় আর্দ্র হয়ে উঠবে, ওই বেদির অনন্ত-কালের মত বিষণ্ন দৃষ্টি তাদের মনে এক বোবা আকুতি জাগিয়ে তুলবে।

অনেক পরে, জুন মাসে, ওই বেদির চারধারে দুটো পুরুষ তিতির মারামারি করতে লাগল। পাকা শ্যামা-ঘাসের বন তছনছ করে মাদী পাখিটার জন্যে, টিকে থাকার অধিকারের জন্যে কাম ও বংশবৃদ্ধির জন্যে লড়াই করতে করতে তারা নীল 'ওয়ার্মউড'

ঝোপের মধ্যে একটুখানি জায়গা ফাঁকা করে নিল। তারও আবার কিছুদিন পরে, ওই ঢিবিতেই, ঠিক বেদির পাশে, পুরনো 'ওয়ার্ম-উড' ঝোপের জীর্ণ আশ্রয়ে মাদী তিতিরটা ছিটছিট, ধোঁয়াটে-নীল ন-টা ডিম পাড়ল; তারপর, চকচকে ডানায় ঢেকে, নিজের দেহের উত্তাপ দিয়ে সেই ডিমের ওপরে তা দিতে বসল।

॥ সমাপ্ত ॥

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	২১	তাতারের জন্যে	ভাতারের জন্যে
২	২৭	মুখ নেই	সুখ নেই
২৩	২৭	মাথালেব	মাথালের
২৯	১১	পাহাড়ের চড়োয়	পাহাড়ের চুড়োয়
৭১	৪|৫	পাতা শর-গুলো	পাকা শর-গুলো
৭৫	৪০	ঘাটের ঘোল	ঘাটের জল
১৯৫	২৯	অলভার বনের	অলডার বনের
২১৪	৩১	অবাস্তর কল্পনা	অবাস্তব কল্পনা
২১৭	৬	হলুদ বস্তার	হলুদ বিস্তার
২২৫	২০	সদ্যপ্রত্যাশী দূরবিস্তর	সদাপ্রত্যাশী দূরবিস্তার
২৪১	২২	জাবনার ডানা	জাবনার ডাবা
২৬২	৩	হলেও	হলেত
২৭২	১৫	আমি আসছি	আমি আছি
২৭৯	২২	মৃত্তিকার	কৃত্তিকার
২৮৩	৯	লবণ-জমি	নোনা-জমি
২৮৪	১৪	বসিয়ে	রসিয়ে
২৯৮	৩২	নোট গুলন	নোট গুনল
৩১৪	১৬	সাময়িক	সামরিক
৩২৯	৯	সৈন্য-জর্জ	সেণ্ট জর্জ
৩৭৫	৬	গিফসার, জুংবোর	অফিসার, জুংকার
৩৮২	১৭	মুখের মত	সুখের মত
৩৯৯	২৪	গল কমিসারদের	গণ-কমিসারদের